ইতিহাস অনুসন্ধান ১১

সম্পাদনা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ★ ★ ★ ১৯৯৬

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৬

প্রকাশক · ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড,
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :

ইউনিক গ্রাফিক্‌স্‌
২ ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

১. ইতিহাসে ধনতন্ত্র—ইরফান হাবিব ১

২. মধ্যযুগে পর্যটক ভারতীয়—সুরেন্দ্র গোপাল ১৭

৩. সতেরশ' সাতান্ন—রজতকান্ত রায় ৩৪

৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৪-১৯৩৪ পর্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য—শোভনলাল দত্তগুপ্ত ৮২

৫. চীনা পরিব্রাজক সুয়ান সাঙ ও ই-চিঙ-এর বর্ণনায় নালন্দা মহাবিহার—কৃষ্ণেন্দু রায় ৯৯

৬. বাঙালি জাতির পরিচয়ে ও সংস্কৃতির উৎসে চণ্ডালগোষ্ঠীর অবদান—অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় ১১০

৭. প্রাচীন বঙ্গে গ্রীক প্রভাব—শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭

৮. ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের আলোকে আর্য সমাজ জীবনের রূপরেখা—চিরকিশোর ভাদুড়ি ১২৪

৯. প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক উদ্যোগে প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের ভূমিকা—সুরজিৎ কুমার ধর ১৩০

১০. হরিকেল: আল মারভাজির বিবরণ অনুসারে—রীতা ঘোষ রায় ১৩৫

১১. দামোদর কোশাম্বীর ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা—সুপ্রতিম দাশ ১৪০

১২. বাঙালির খাদ্যাভ্যাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ—প্রণব রায় ১৪৬

১৩. প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক (মৌর্যযুগ-গুপ্তযুগ)—দূর্ব্বা আইন ১৬০

১৪. হর্ষচরিতে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি—ময়লকুমার দাস ১৬৫

১৫. ভারতীয় লেখমালায় নামসংখ্যার ব্যবহার—সত্যসৌরভ জানা ১৭৫

১৬. প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের সামন্ত—রঞ্জুশ্রী ঘোষ ১৭৯

১৭. উল্কি — ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে—সঙ্গীতা চৌধুরী ১৮৫

১৮. প্রসঙ্গ 'পার্থব'—অমর্ত্য ঘোষ ১৯১

১৯. প্রাচীন বঙ্গে সূর্যোপাসনা—শম্ভুনাথ কুণ্ডু ১৯৩

২০. নারী : চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎ-শিল্পে—গৌরীশঙ্কর দে ১৯৯
২১. মহানাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও নাথতন্ত্র—সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০৪
২২. প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচেতনা : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র
—কোরক চৌধুরী ২০৬
২৩. মুঘল মহিলা-মহল—অর্ধেন্দুশেখর দাশগুপ্ত ২১৫
২৪ মুঘল ইতিহাসে কয়েকটি নারী—মৃদুচ্ছন্দা পালিত ২১৯
২৫. প্রাপ্ত মূর্তির আলোকে মল্লভূমের শিব—প্রভাত কুমার সাহা ২২৯
২৬. মল্লভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম : প্রবেশ ও প্রয়োগ—শেখর ভৌমিক ২৩৭
২৭. সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলায় ফরাসী কোম্পানী ও দুটি ফার্মান
—অনিরুদ্ধ রায় ২৪৭
২৮. সরস্বতীর ধারায় বাংলায় জীবনভাষ্য—জিয়াউল হক্ ও সুলেখা মুখার্জী ২৫২
২৯. মেদিনীপুরের লোকধর্মাচরণে মূর্তি ও প্রতীক—রাজর্ষি মহাপাত্র ২৫৬
৩০. উনিশ শতকে ভট্টপল্লীর সংস্কৃতি চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
—শমিতা সিংহ ২৬৭
৩১. বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৪০-এর
একটি সমীক্ষা—ইরা মিত্র ২৭৭
৩২. আজকের বিবেকানন্দ—স্বরূপ কুমার দাস ২৮৩
৩৩. ঐতিহাসিক তথ্যের ভ্রম সংশোধন—বসন্ত কুমার সামন্ত ২৮৬
৩৪. স্বাদেশিকতা ও ধূর্জটিপ্রসাদ—অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা ২৯২
৩৫. উত্তাল চল্লিশ ও আর সি পি আই—অমিতাভ চন্দ্র ৩০১
৩৬. চৈতন্যপুরের সংগ্রাম, কৃষক আন্দোলনের একটি নতুন পর্যায়
—মহঃ ইনামুর রহমান ৩১১
৩৭. লবণ আন্দোলনে চব্বিশ পরগণার কালিকাপুর ও নীল
—পুষ্পরঞ্জন সরকার ৩১৬
৩৮. স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার
'পথের আলো' বুলেটিন, ১৯৩১-১৯৩৩—বিমলকুমার শীট ৩২৩

৩৯. মিউনিসিপ্যালিটি ও মিল : বরানগর উনবিংশ শতকের শেষ
ভাগ—সৌমিত্র শ্রীমানী ৩৩০
৪০. জিম করবেট, পরিবেশ ভাবনা ও উপনিবেশের প্রেক্ষিতে একজন
ইউরোপীয়ের ভারতদর্শন—শুভাশিস বিশ্বাস ৩৩৯
৪১. উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে নারী মানসে নারী ভাবনা
—জয়শ্রী সরকার ৩৪৮
৪২. 'গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী' কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও তাঁর
'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' : কিছু প্রসঙ্গ—নির্মল বন্দোপাধ্যায় ৩৫৩
৪৩. বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি ফরাসী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী,
১৯০৭-১৯১৯—অময়ি ঘোষ ৩৬২
৪৪. ঔপনিবেশিক যুগে প্রথম দুটি সর্বভারতীয় বন আইনেব প্রেক্ষাপটে
দার্জিলিঙে বনব্যবস্থা—দিগন্ত চক্রবর্ত্তী/রত্না রায় সান্যাল ৩৭২
৪৫. আঠারো শতকের মেদিনীপুরের এক কাপড় ব্যবসায়ী
—মৃণালকুমার বসু ৩৮৪
৪৬. প্রাক-পলাশী বাংলায় গ্রন্থাগার—শ্রীকান্ত বসু ৩৮৮
৪৭. বন্দর-নগর কলকাতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার
—ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩৯৬
৪৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ও সমসাময়িক বাংলার সমাজচিন্তা
—সংযুক্তা রায় ৪০২
৪৯. প্রাক স্বাধীনতার যুগে জলপাইগুড়ির শিক্ষার বিস্তার: একটি সমীক্ষা
—প্রবাল সেনগুপ্ত ৪০৮
৫০. উত্তরাখণ্ড আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা—সোনালী চক্রবর্তী ৪১৭
৫১. ভারতে পঞ্চায়েততন্ত্রের উদ্ভব : আধুনিকীকরণ ওপ্রগতির পথে
পঞ্চায়েত—তপতী দাশগুপ্ত/আর.এন. চট্টোপাধ্যায় ৪২৪
৫২. চুঁচুড়া-চন্দননগরের নারী আন্দোলন (১৯৬৫-৭৫)
—পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায় ৪৩৩
৫৩. মাতৃভাষার নবায়নে 'ইয়ংবেঙ্গল'দের ভূমিকা
—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৪৩৭

৫৪. ১৯১৫ সালের ভারতব্যাপী অভ্যুত্থান একটি অসমাপ্ত বিপ্লব
—সুধন্য মণ্ডল ৪৫৫
৫৫. বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলন
(১৯০৬)-একটি পর্যালোচনা—শ্যামাপদ ভৌমিক ৪৬৪
৫৬. বাংলার রেলশ্রমিক আন্দোলনের একটি রূপরেখা
(১৯২০-৪৭)—নির্বাণ বসু ৪৭২
৫৭. ভারতের পূর্বাঞ্চলে কয়লা শিল্প ও রেল যোগাযোগের বিকাশ
(১৮৫০-১৯১৪)-একটি পর্যালোচনা—শশধর মিস্ত্রী ৪৮২
৫৮. লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুর—প্রদ্যোতকুমার মাইতি ৪৮৬
৫৯. কোচবিহার রাজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কমিশনারদের ভূমিকা
ও কার্যাবলী (১৭৮৯-১৮৬১)—বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪৯৩
৬০. ঔপনিবেশকতাবাদ ও কোচবিহার বিবাহ-একটি সমীক্ষা
—কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ৪৯৯
৬১. রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে শিক্ষার প্রসার
—নীলাংশুশেখর দাস ৫০৪
৬২. মেট্রোপলিটন ও মফস্বল: উনিশ শতকে মফঃস্বল ব্রাহ্ম সমাজগুলির
কার্যবিধি—অমলশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ৫১০
৬৩. উইলসন : হিন্দু কলেজ : ইংরেজী শিক্ষা—ভবতোষ কুণ্ডু ৫১৭
৬৪. আক্রমণের নানান দিক : প্রসঙ্গ ডিরোজিও—বোধিসত্ত্ব কর ৫২৪
৬৫. কালনা মহকুমার অপরাধ প্রবণতার ইতিহাস (১৯৭০-’৯৫) :
একটি সমাজবীক্ষণমূলক রচনা—মনিরুল ইসলাম ৫৩১
৬৬. আধুনিক ভারতের রাজস্ব ইতিহাসের কয়েকটি
গুরুত্বপূর্ণ দিক—রঞ্জিত সেন ৫৩৬
৬৭. “বঙ্গীয় ইতিহাসতত্ত্বের” সন্ধান : প্রাসঙ্গিক ভাবনা
—অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪২
৬৮. ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ-সাহিত্যিক—সুস্নাত দাশ ৫৪৮
৬৯. মুর্শিদাবাদি ওসোয়াল সমাজ—কাজী সুফিউর রহমান ৫৫৭

৭০. ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ · তত্ত্ববোধিনী সভা ও উনিশ শতকের বাংলায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা—অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ৫৬৮
৭১. উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন—গৌতম নিয়োগী ৫৭৭
৭২. কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের চোখে গান্ধী—ধ্রুব গুপ্ত ৫৮৭
৭৩. ধর্মে বাস্তবতা : বাস্তবতার ধর্ম-আমেরিকার প্রেক্ষিতে বৈষ্ণববাদ—মহুয়া সরকার ৫৯৩
৭৪. বৃহৎ সাতটি দেশের ডাকটিকিটের ইতিহাস—প্রবীর কুমার লাহা ৫৯৭
৭৫. জাতীসমস্যা প্রসঙ্গে লেনিন—নন্দিনী ভট্টাচার্য ৬০৫
৭৬ ইন্দোনেশিয়ায গণআন্দোলন জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদ —জহব সেন ৬১৪
৭৭ নাম পবিবর্তনেব আবর্তে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী—সতী দত্ত ৬২১
৭৮ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশেব ছাত্র আন্দোলন —শিহরণ চক্রবর্তী ৬২৮
৭৯ ভুটানবাসী নেপালি শরণার্থী সমস্যা—দেবমিত্রা মিত্র ৬৩২
৮০. ভারত-তাই সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া ঃ তাই-অহম পর্বের ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য—লিপি ঘোষ ও অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী ৬৩৭
৮১. অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন-একটি পর্যালোচনা—কিশলয় মজুমদার ৬৪২
৮২. সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ পর্বে ট্রটস্কী চর্চা (১৯৮৫-১৯৯১) —কুণাল চট্টোপাধ্যায় ৬৪৯
৮৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ —দীপক রঞ্জন দাস ৬৫৯

ইতিহাসে ধনতন্ত্র

ইরফান হাবিব

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদেব সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়।

যে মহানুভবতা থেকে আপনারা আমাকে আজ এই সম্মান প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে আমি গভীবভাবে সচেতন। আমাদেব দেশেব প্রত্যেকে বাংলাব ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে কতখানি পেয়েছি তা বলার আপেক্ষা রাখে না। ভারতীয় ইতিহাসেব যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দিক যখনই বিশ্লেষনের প্রয়োজন হয় তখন আর সি দত্ত, যদুনাথ সবকার, সুশোভন সবকাব এবং আরও অনেকেব নাম এসে যায়। স্বভাবতঃ তাই, তাঁদেব প্রধান সম্মেলনে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সহকর্মীদেব আগ্রহেব প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানকাব ভাষণের জন্য আমি খুব বড় এক বিষয় বেছে নিয়েছি, যাকে বলা হয় 'ইতিহাসে ধনতন্ত্র'। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোনও বিশেষজ্ঞতার দাবী করি না বলে আপনাদের বিশেষ আনুকূল্য প্রার্থনা করি। যে কারণে আমি তৎপরতার সাথে বিষয়টি মনোনীত করেছি তা হলো আমি মনে করি এটি এমন এক বিষয় এখন যার প্রতি সমস্ত সৎ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বিংশ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসছে, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই, তখন এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে যে ধনতন্ত্রই হলো বর্তমান এবং ভবিষ্যতের একমাত্র সম্ভাব্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা। এমনকি সেদিন পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বে 'মিশ্র' বা 'জনকল্যাণকর' অর্থনীতির বা রাষ্ট্র নির্দেশিত, রাষ্ট্র সুরক্ষিত উন্নয়নের যে সব তত্ত্বেব রমরমা ছিল আজ সেগুলিও প্রভাবশালী মহলে বাতিল বলে গণ্য হচ্ছে। 'স্বাধীনতা'র বদলে 'বিশ্বায়ন'-এর স্লোগানই আজ রাষ্ট্রনেতাদের মুখে বেশি শোনা যাচ্ছে। দৃঢ় বিপ্লবীও দেশীয় ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে আপসে যাচ্ছে এই আশা করে যে, তা হবে সাময়িক। ফলে বিপদ থেকে যাচ্ছে ঐতিহাসিকদের কাছেও ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক জীবনের এত স্বাভাবিক ঘটনা বলে প্রতীয়মান হতে থাকবে যে অন্তত সেই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হবে যে ইতিহাসেরই অবসান হচ্ছে। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই প্রলুব্ধ হয়েছেন পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের অস্ত্রগুলোর থেকে রসদ সংগ্রহ করতে—প্রান্তিক থেকে আধুনিক উত্তর পর্যন্ত।

শুধু এই কারণেই আমার মনে হয় ধনতন্ত্রের এই আপাতদৃশ্য চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্ত হচ্ছে ধনতন্ত্রেব ঐতিহাসিক পরিচিতিকে নতুন কবে পবীক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আমাদের হাতে যে ক্রমবর্ধমান তথ্যসম্ভার এসেছে এবং পিছনে ফিবে তাকানের যে সমৃদ্ধ সুযোগ আমরা পাচ্ছি, তার আলোকে বহুবার উচ্চারিত প্রশ্নগুলিকে আবার তুলে ধবা প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন হলো, ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং আধিপত্য বিস্তার সংক্রান্ত, বিশেষ করে প্রথম শিল্পোন্নত দেশ ইংল্যাণ্ডে। *ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি* (১৮৫৯) গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিব পরম্পরা সম্পর্কে যে তালিকা করেছিলেন, তা থেকে এটা সাধারণভাবে ধবে নেওয়া হয যে অনিবার্যভাবেই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ধনতন্ত্রের শিকড় ছিল। ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার[১]। *ক্যাপিটাল* (১৮৬৭)-এ মার্কস-এর নিজের উল্লেখ "সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তর"-এই ধারণাকে আরো পুষ্ট করেছে[২]। আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো যার কোন অনুমোদনই মার্কস-এ মিলবে না। ১৯৩১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনগ্রাদ আলোচনা থেকে এর সূত্রপাত। এই ধারণা মতো "সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা" বলতে পুরনো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কৃষিভিত্তিক এলাকাকে বোঝানো হতো[৩]। মরিস ডবে'র ধনতন্ত্রের উত্থান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রচনায় একটি ধারণা খুবই প্রবল ছিল। তা হলো প্রত্যেক এলাকায় উৎপাদন পদ্ধতিতে সমস্ত বড়ো পরিবর্তন "অভ্যন্তরীণ" উপাদান বা দ্বন্দ্বের ফলে ঘটেছে[৪]। এখান থেকে ধরে নেওয়া যায় যে সমস্ত দেশে কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতি ও কোন এক ধরণের পণ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারা সকলেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং আরো কিছু সময় পেলে তারা নিজস্ব ধনতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারবে। যেমন মাও জে-দঙ্ (১৯৩৯) বলেছিলেন যে, প্রাক উপনিবেশ চীন "ধনতান্ত্রিক সমাজে নিজে থেকেই উন্নীত হতো, এমনকি বিদেশী ধনতন্ত্রের প্রভাব ছাড়াই[৫]"। রজনীপাম দত্ত (১৯৪০) ধারণা করেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ দখলদারির আগে "বিকাশের স্বাভাবিক পথে (দেশীয়) বুর্জোয়াশক্তি" গড়ে ওঠার সম্ভাব্যতা ছিলো[৬]।

আমার মনে হয় প্রাক ধনতান্ত্রিক অথবা 'সামন্ততান্ত্রিক' সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক উদগত অঙ্কুর থেকে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ বিকাশের এই তথাকথিত সর্বজনীন ধারণা ধনতন্ত্রের জন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হলো শক্তির ভূমিকা এবং বিশ্বজুড়ে বহির্দেশীয় অর্থনীতিগুলিকে দখল করার কথা। এই দুই যমজ উপাদান ছাড়া সোজা কথায় ধনতন্ত্র ইংল্যাণ্ডে বা পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্যকারী উৎপাদন ব্যবস্থা হয়েই উঠতে পারত না। *ক্যাপিটাল* প্রথম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসাধারণ পরিচ্ছেদে এই জায়গাতেই জোর দেওয়া হয়েছে।[৭] এখন তত্ত্ব এবং ইতিহাসের ঘটনার আলোকে এই যুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

ডবে'ব ***স্টাডিজ ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম*** প্রকাশিত হওয়ার পরে একটি আলোচনাচক্রে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্ব নির্ধারিত তত্ত্বে বিশ্বাসীদের একটি গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। দাস ব্যবস্থাব অবসান (যা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দেই যথেষ্ট পরিণত) এবং 'পুঁজির যুগ' যা অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর আগে শুরু হতে পারেনা, এর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কী হবে? বস্তুত এই সময়ের পার্থক্য ছিলো আরো অনেক দীর্ঘ। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে যদি দাস ব্যবস্থা পিছোতে শুরু করে থাকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের আগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধিপত্য বিস্তার করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যা দেখা গেছে তা হলো বাজারের জন্য উৎপাদন করতে মজুরিশ্রম নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এই সব 'ধনতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠানগুলি মোট উৎপাদনের অত্যন্ত অল্পভাগ উৎপাদন করতো। ডব নিজেই স্বীকাব করেছেন, "তথ্য বলছে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে গৃহভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি ছিলো[৮]"। অন্যভাবে বলতে গেলে কৃষক ও ক্ষুদ্র কারিগরদের উৎপাদনই ছিলো প্রধান, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন নয়।

ইতিহাসের তথ্যে বা মার্কসের রচনায় এই জাতীয় উৎপাদনকে 'সামন্ততান্ত্রিক' বলে শ্রেণীবদ্ধ করার কোন অনুমোদন পাওয়া যাবে না। ফলে কেবলমাত্র তুড়ি মেরে ১৪৫০ থেকে ১৭৫০ —এই তিনশো বছরের শূন্যস্থানও পূরণ করা যাবে না। শিল্পবিপ্লব তার পরে শুরু হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রকে এভাবে টেনে বাড়ানোর কাজটা করা হয় মূলত ভূমিদাসত্ব শব্দটির পরিধিকে অতিবিস্তৃত করে। ভূমিদাসত্ব বলতে কেবল ভূমিতে বাঁধা কৃষক, বেগার শ্রমদানকারী কৃষক বা পণ্যে খাজনা দেওয়া কৃষককেই বোঝানো হয় না, নগদে খাজনা দেওয়া কৃষককেই বোঝানো হয় না, নগদে খাজনা দেওয়া আইনত স্বাধীন কৃষককেও ধরে নেওয়া হয়। এই দুই শ্রমদানের প্রক্রিয়া চরিত্রের দিক থেকে এতই পৃথক যে তাদের একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংহত ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ডব দাবি করেছিলেন মার্কস নগদ খাজনাকে সামন্ততান্ত্রিক খাজনা বলে "স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছিলেন[৯]"। মোটেই তা নয়, বরঞ্চ মার্কস সরাসরি বলেছেন যে নগদ খাজনা "বাণিজ্যের নগর শিল্পের সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরেই ঘটে থাকতে পারে[১০]"। এই বাস্তবকে মেনে নিতে হবে যে সামন্ততান্ত্রিক সঙ্কটের পরেও শিল্প বিপ্লবের শুরুর আগে পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে পন্য উৎপাদনের একটি ব্যবস্থার মধ্যে খাজনা গ্রহীতা ভূস্বামীরাই ছিল অর্থনৈতিক ভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী।

এই ব্যবস্থাকেই মার্কস নাম দিয়েছিলেন ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা (পেটি মোড অব প্রোডাকসন)। সামন্ততন্ত্র থেকে নয়, এই ব্যবস্থা থেকেই ধনতন্ত্র জন্ম নিয়েছিলো এবং একেই ধ্বংস করে ধনতন্ত্র বিজয়ী হয়েছিল। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট[১১]। "নিশ্চিতভাবেই এই ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতি দাসব্যবস্থা, ভূমিদাসত্ব এবং

অন্যান্য ধবনের অধীনত্বের পবিস্থিতিতে বিরাজ করে। কিন্তু তা বিকশিত হয়, তার সমগ্র শক্তিকে মুক্ত করে দেয়, তার চিরায়ত রূপে উপনীত হয় কেবল সেখানেই যেখানে শ্রমিক নিজেই তার শ্রমের উপায় সমূহের ব্যক্তিগত মালিক এবং যেখানে সে নিজেই তাকে সচল রাখে[১০]"।

একবার এই পরিস্থিতি ষোড়শ শতকে তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ধনতন্ত্রের উদ্ভবের রাস্তা খুলে গেল। কেননা পণ্য উৎপাদন ধনতন্ত্রের জন্মের পূর্বশর্ত ছিল। সম্পদশালী কারিগর এবং কৃষকরা এখন শ্রম ভাড়া করে "ছোট পুজিপতিতে" পরিণত হওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু মার্কস দেখেছিলেন পুঁজিবাদী বিকাশকে এতে বড়জোর 'শম্বুকগতি' দেওয়া যেতে পারত[১১]। বস্তুত আরো বেশি শ্রম ভাড়া করে মুনাফা অর্জনের সীমা খুব তাড়াতাড়ি বোঝা গেল। সম্পদশালী কৃষকরা এরপর জমি কিনতে থাকলেন, জমির মালিকে পরিণত হলেন, যাতে "যেখা ন কারখানা হবে সেখান থেকে ভাড়া নেওয়া যায়"। তাঁরা ব্যবসায়ে হাত লাগালেন। এই হচ্ছে টনির 'কৃষি ধনতন্ত্র' (মার্কসের নয়) যাকে টনি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডেব অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে ওঠার ভিত্তি হিসাবে দেখেছেন[১২]। কারিগরদের মধ্যে অন্যরা নিজেদের গৃহের উৎপাদন বাড়ানোর পরে তাদের বৃহত্তর আয় আরো বেশি হাত ভাড়া করার কাজে বিনিয়োগ না করে অন্য গ্রামীণ পরিবারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে নিজেরা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করত। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো পারিবারিক শ্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করা যায় এবং গৃহে নিযুক্তদের ব্যয় তুলনায় সস্তা হওয়ায় কৃষির শুখা মরসুমকে ব্যবহার করা যায়। এটা হচ্ছে "প্রোটো ইণ্ডাসট্রিয়ালিজম" বা আদি শিল্পায়ন, এখন মেণ্ডেলসের সূত্রে যার সাথে আমরা পরিচিত[১৩]। কিন্তু ডব নিজে লক্ষ্য করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের সাধাবণ প্রবণতা ছিল "বিরাট কোম্পানির অস্থায়ী বাহিনীর মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা কাবিগরদের একাংশের বণিক-নিয়োগকর্তার ক্রমবর্ধমান আধিপত্য[১৪]"।

অন্যভাবে বলতে গেলে ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে আপনা থেকে কাজ করতে দিলে স্বতস্ফূর্ত প্রবণতাই ছিল ভূস্বামী শোষণ তীব্র করা (ভূস্বামী অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান শক্তির জোরে) এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকের পুঁজির বিনিময়ে বাণিজ্য পুঁজি বাড়িয়ে তোলা। এই বিয়য়টি সম্ভব হচ্ছিল তহবিল সুদে খাটানোর ব্যবস্থার ফলে ("পুটিং আউট" প্রথা বলে পরিচিত)। মার্কস এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্পষ্টই যুক্তি দেখিয়েছেন যে তা যথাযথ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্মকে দেরি করিয়ে দিয়েছে[১৭]।

নিয়োগকর্তা দ্বারা বাজারে বিন্যস্ত, উৎপাদনের জন্য তৈরী শ্রমিকদের কেন্দ্রীভবন না থাকলে যথাযথ পুঁজিবাদ বিকশিত হতে পারেনা। এই কেন্দ্রীভবনের প্রথম রূপ হচ্ছে 'ওয়ার্কশপ' যার ভিত্তি শ্রমনিবিড় (মার্কসের ভাষায় ম্যানুফ্যাকচার)। দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমের বিভাজনের ফলে উদ্ভূত সুবিধা এখানে পাওয়া যেত। অ্যাডাম স্মিথ (১৭৭৬) এর ধ্রুপদী বর্ণনা দিয়েছেন,[১৮] এবং ব্রদেল এখন এই ওয়ার্কশপগুলির চমকপ্রদ ঐতিহাসিক বিবরণও হাজির করেছেন[১৯]। এই প্রক্রিয়ায় অনিবার্য সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে শ্রমের বিভাজনের বিকাশ শ্রমের সচলতাকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখত। ফলে কম

মজুরি ব্যয় এবং পুঁজিব অধিকতর মুনাফার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রলেতারীয় ''মজুত বাহিনী'' তৈরীর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছিল।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দ্বিতীয় এবং প্রকৃত একক হল ফ্যাক্টরি বা কারখানা' যা যন্ত্র নির্ভর। রিকার্ডো (১৮২১) প্রথম এর পরিচয় ঘটিয়ে দেন[১০]। ফ্যাক্টরিতে শ্রম বিভাজন ভেঙে পড়ে, যন্ত্র সমস্ত শ্রমিককেই অদক্ষ শ্রমিকে নামিয়ে দেয়. শ্রমের সচলতা বাড়ে এবং গণ হারে প্রলেতারিয়েত প্রবেশ করে ইতিহাসে। *ক্যাপিটালের* প্রথম খণ্ডে মার্কসের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ওয়ার্কশপ ও ফ্যাক্টরির অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈপরীত্য তুলে ধরা[১১]। যন্ত্র শিল্পের সৃষ্ট ফ্যাক্টরি কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এসে শিল্প সংগঠনের প্রধান রূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়, তাও প্রথমে শুধু ইংল্যাণ্ডেই। দীর্ঘ কালপর্বের গৃহ উৎপাদনের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারই ছিল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। তাহলে হঠাৎ কিভাবে ফ্যাক্টরির জন্ম হল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

ব্রদেল সঠিকভাবেই বলেছেন যে 'ম্যানুফ্যাক্টারি থেকে ফ্যাক্টরিতে রূপান্তর কোনো স্বাভাবিক যুক্তিপূর্ণ ঘটনা ছিলনা'।[১২] আদি শিল্পায়ন থেকে যন্ত্রশিল্পে এজাতীয় রূপান্তর আদৌ ছিল না। যখন গ্রামীণ উদ্যোগীরা পরিবারের শোষণ করার বদলে ফ্যাক্টরির শ্রমকে শোষণ করতে শুরু করলেন সেই সুবর্ণ মুহূর্তটি গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের দ্বারা মোটেই পূর্ব নির্ধারিত ছিল না।

সাধারণ পাঠ্যবইয়ে শিল্পবিপ্লবের পেছনে ১৭৬০-উত্তর ইংল্যাণ্ডের হঠাৎ প্রায় দৈব যান্ত্রিক উদ্ভাবনকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। ডব চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন প্রযুক্তি কেন স্বাধীন উপাদান হতে পারে না[১৩]। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপীয় কারিগর ও তাত্ত্বিকদের বিপুল সাফল্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে শিল্পবিপ্লবের যুগে উদ্ভাবকরা যে সমস্ত মৌলিক যান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তি করে এগিয়েছিলেন তার প্রায় সবকটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত। নিউকমেনের ইঞ্জিন কাজ শুরু করে ১৭১২-তে, কয়লা থেকে জ্বালানি উৎপাদনের রহস্য আবিষ্কৃত হয় ১৭০৯-র ধারেকাছে, স্টিয়ারিং হুইল ১৭০৫ সালেই ব্যবহৃত হয়। বস্তুত, দেখলে মনে হবে এর পরের পঞ্চাশ বছরে প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া যেন থেমে দাঁড়িয়েছিল (একমাত্র ব্যতিক্রম ১৭৩৩-এ আবিষ্কৃত কে'র ফ্লাই-শাটল)। সুতরাং, ১৭৬০-র পর থেকে হঠাৎ কেন নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হতে থাকলো তার ব্যাখ্যা অনুকরণের প্রেরণা বা প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। নিঃসন্দেহেই ডবের ভাষায়, 'শিল্পের পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক সম্পদের' সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিলো[১৪]।

মূল কথা হলো 'অর্থনৈতিক সম্পদ'। 'শম্বুক-গতিতে' চলা কোন উৎপাদন ব্যবস্থা কি নব-আবিস্কৃত যন্ত্র কিনে তা ব্যবহার করার মতো বা সেই যন্ত্রের উৎপাদিত সস্তা কিন্তু প্রচুর অনুকৃত অ-বিলাসপণ্যের বাজার তৈরী করার মতো বৃহৎ পরিমাণ পুঁজির জন্ম দিতে সক্ষম? মার্কসের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে কেবল ক্ষুদ্র উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পুঁজিপতির সঞ্চয় থেকে এই অর্থনৈতিক সম্পদ আসতে পারে না।

অ-ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্র ও অর্থনীতি থেকে অর্জিত ধনসম্পদ থেকেই এই পরিমাণ বিপুল 'আদিম' বা 'প্রাথমিক' পুঁজি সঞ্চয়ন ঘটেছিল[১]।

(২)

প্রাথমিক সঞ্চয়ের দুটি প্রধান উৎস ছিলো— অভ্যন্তরীণ শোষণ, যা কৃষকদের নিঃস্ব করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের বিস্তার মারফৎ বর্হিদেশীয় লুণ্ঠন।

যখন ভূমিদাস প্রথার অবক্ষয় ঘটতে থাকে, ইংল্যাণ্ডে মনিবপ্রথা (লর্ডশিপ) জমিদারিপ্রথায় রূপান্তরিত হয়, মৌজার জমি হয়ে যায় লর্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ভূমিদাসের জমি সামগ্রিকভাবে খাসজমিতে আইনী রূপান্তরের অন্যদিকটি ছিল বাধ্যতামূলক শ্রমের আর্থিক খাজনায় রূপান্তর। লর্ডের কাছ থেকে অন্যান্য সমস্ত প্রধান সামরিক ও বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব কর্তব্য সরিয়ে নেওয়ার পর তিনি পুরোপুরি একজন বেসরকারী জমির মালিকে পরিণত হলেন, যার শোষণের মূল হাতিয়ার হলো খাজনা। ফ্রান্সের থেকে পরিস্থিতি আলাদা হয়ে গেল। সেখানে কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষকের জমির মালিকানা দাবি না করেও 'সেনিওর' হিসেবে কৃষকদের ওপর নানা ধরণের কর বসাতেন জমিদাররা[১]। ইংল্যাণ্ডেব কৃষক টের পেল সে কী হারিয়েছে, যখন টিউডর এনক্লোজারে বিরাট পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমিকে জমির মালিকরা ভেড়াপালনের জমিতে পরিণত করে ফেলল। ভূস্বামীদের চাপে নিয়মকানুন বদলে গেল। ১৫৪০-১৬৪০ পর্বে খাজনা বৃদ্ধি মূল্য বিপ্লবের মুদ্রাস্ফীতিকে পেছনে ফেলে দিল। অষ্টাদশ শতকেও আবার তা ঘটেছিল[১]। খাজনার লোভ অষ্টাদশ শতকের এনক্লোজারের জন্ম দিল কেননা বৃহৎ জমির মালিকরা দেখলেন যে নিউ হাসব্যাণ্ড্রি পদ্ধতি ব্যবহার করে পুঁজিপতি কৃষকরা তাদের চড়া হরের খাজনা দিতে পারেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের বড় অংশই হয় ব্যক্তিগত এনক্লোজার (যেখানে বৃহৎ জমির মালিকদের সম্পদ মোটামুঠি সংহত ছিলো) বা সংসদীয় এনক্লোজার (মিশ্র সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে প্রজাস্বত্ব উৎখাতে সংসদের আইন প্রয়োজন হতো) মারফত উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের কাছেই অবশ্য ব্যক্তিগত এনক্লোজারের ব্যাপারটি কোনদিনই তেমন আপত্তির ছিল না। ইদানীং সংসদীয় আইনে উচ্ছেদের সপক্ষেও বিদ্বৎজনের সওয়াল দেখা যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের প্রায় পূর্ণাঙ্গ নির্মূল হয়ে যাওয়ার এই ঘটনা মানব ইতিহাসে অভিনব। অথচ এক ধরনের ইতিহাস-ব্যাখ্যাতাদের কাছে এ যেন অতি স্বাভাবিক ঘটনা, মালিকের ইচ্ছের কাছে প্রজাদের আত্মসমর্পণ মাত্র।

খাজনার লোভ যেমন এহেন ভয়ঙ্কর সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল তেমনই আন্দাজ করা যায় শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত আগে ও শিল্প বিপ্লবের সময়ে ইংল্যাণ্ডের জমিদার শ্রেণীর রাজস্বের কতটা বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছিল। খাজনা-রাজস্বের এই বৃদ্ধির সঙ্গেই সমতালে গ্রামীণ সর্বহারার জন্ম হচ্ছিল যারা পরিশেষে ব্রিটেনের নগর শিল্পের মজুত বাহিনীতে পরিণত হয়। দু'টি প্রক্রিয়া ছিল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ[১৮]।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা, এমনকি ডব ও ১৯৫০-র দশকের প্রথমদিকে *রূপান্তর* বিতর্কের শরিকরা, মার্কস চিহ্নিত প্রাথমিক সঞ্চয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসাহটিকে খাটো করে দেখেছেন । এই উদাসীনতা দুর্ভাগ্যজনক। কেননা ঔপনিবেশিকতাকে উপলব্ধি না করে ধনতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার কথা কল্পনাই করা যায় না।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়- আমেরিকায় বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে স্পেনের রৌপ্য খনন; আটলান্টিকের এপার থেকে ওপার লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে জোর করে দাস হিসেবে চালান করা এবং এশিয়ার নৌ চলাচল ও জমির ওপর কর চাপানো। শক্তিপ্রয়োগে অ-ইউরোপীয় অর্থনীতির দখলদারি ও ধ্বংসের এই তিনটি প্রক্রিয়াই প্রায় সমসাময়িক ছিল। ইংল্যাণ্ড এই তিনটি থেকেই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল।

স্পেনীয় দখলদারির মুহূর্তে (১৫১৮) মধ্য মেক্সিকোর জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৬২০ তে তা কমে দাঁড়ায় ওই সংখ্যার মাত্র তিন শতাংশে। বলা চলে, সম্পূর্ণ মারণযজ্ঞ । কেবল পুরনো দিনের মহামারীই নয়, রৌপ্য খনির জন্য জোর করে শ্রমিক সংগ্রহ মেক্সিকো ও পেরুর এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য দায়ী। কিন্তু স্পেন ও পশ্চিম ইউরোপ প্রায় বিনামূল্যেই রূপো পেত। ১৫০০ থেকে ১৬৫০-র মধ্যে সরকারী পথেই স্পেনে বার্ষিক প্রথায় ১১২.৫ মেট্রিক টন রূপো চালান হয়েছে। ই জে হ্যামিলটন এই পরিসংখ্যান পেশ করার পাশাপাশি আন্দাজ করেছেন ইউরোপে তথাকথিত মূল্য বিপ্লবের ওপর এর কী প্রভাব পড়েছিল। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিয়োগকর্তা ও বণিকরাই উপকৃত হয়েছিল, ক্ষতি হয়েছিল মজুরি শ্রমিক ও খাজনাবদ্ধ কৃষকের। তাঁর ধারণা, পশ্চিম ইউরোপে এর ফলে যে পুঁজি তৈরী হয় তা থেকেই পরিশেষে শিল্প বিপ্লবের চাকা ঘুরতে শুরু করে। এখানে স্পষ্ট বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে ধনতন্ত্রের জন্মের সঙ্গে নেহাত ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন আর্থিক প্রক্রিয়ার যোগসূত্রের কথা বলা হচ্ছেনা। ধনতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে আমের-ইণ্ডিয়ান জনসমষ্টিকে বেপরোয়া লুণ্ঠনের যোগাযোগই এখানে লক্ষণীয়। যুদ্ধাস্ত্রের ঘাটতির কারণে এই জনসমষ্টি লোভী আগ্রাসকদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিলেন।

রূপো বেড়ে যাওয়ার আরেকটি দিক আছে। পশ্চিম ইউরোপে রূপোর মজুত বাড়তে থাকায় এবং বছরের পর বছর স্বর্ণমূল্যে রূপোর দাম বাড়তে থাকায় বাণিজ্যের লেনদেনে পশ্চিম ইউরোপ ক্রমাগতই অবশিষ্ট বিশ্বের সুবিধা পেতে থাকলো। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপ থেকে বছরে সম্ভবত ১০০ টন রূপো রপ্তানি হতো, সপ্তদশ শতাব্দীতে তা বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে বার্ষিক ১৫০-১৬০ টন। এশিয়ার কারখানাজাত উৎপন্ন বিশেষ করে বস্ত্র এবং অন্তঃ আঞ্চলিক পরম্পরাগত বাণিজ্যিক পণ্য, যেমন মশলা বা ওষুধ পাইকারীহারে চলে যেতে থাকলো পশ্চিম ইউরোপে। সবই রূপোর বিনিময়ে। নতুন বাণিজ্য প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করতো ইউরোপীয় বাণিজ্য-পুঁজি, যার নেতৃত্বে ছিল নেদারল্যাণ্ডস ও ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলি। রূপো রপ্তানির

ফলে এই পুঁজির ক্রমাগত সম্প্রসারণ ইউরোপীয় বাণিজ্যিক পুঁজির পরিমাণকে দারুণভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

আমের-ইণ্ডিয়ান জনসংখ্যা দারুণভাবে কমে যাওয়ায় ব্রাজিল, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা মহাদেশের (পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বাগিচায় শ্রমিক সরবরাহের বিকল্প উৎসের প্রয়োজন দেখা দিল। আটলাণ্টিক ছুঁয়ে থাকা আফ্রিকার সমস্ত প্রান্ত ও মোজাম্বিক থেকে আফ্রিকানদের দাস বানিয়ে চালান করে এই সমস্যা মেটানো হল। কোন সংখ্যা বিচার না করলে এই ঘটনার বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যায়না। কার্টিন পরিমাপ করেছেন, ১৪৪০ থেকে ১৮৬০-র মধ্যে মোট ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ আফ্রিকানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে হিসেব করে দেখা গেছে অন্তত ১ কোটি মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরো অন্তত ১০ লক্ষ আসা-যাওয়ার পথেই প্রাণ হারান। অষ্টাদশ শতকেই ছিল দাস ব্যবস্থার রমরমা, তখন ৬০ লক্ষের বেশি মানুষকে চালান করা হয়েছে[১১]। নিঃসন্দেহে এটিই ইতিহাসে বৃহত্তম বাধ্যতামূলক মানব-অভিবাসন। অষ্টাদশ শতকে সবচেয়ে বড়ো নৌ সম্ভারের অধিকারী ইংল্যাণ্ডই ছিল দাস ব্যবসার বৃহত্তম শরিক।

দাসেরা কাজ করতেন আটলাণ্টিক সমুদ্রপাড়ের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকা ও নতুন পৃথিবীর দ্বীপে। চিনি, তামাক, সুতো, কফি ও নীল চাষে তাঁদের লাগানো হতো। এই এলাকায় অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বেশ বড়ো সড়ো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল। শুধু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকেই ইংল্যাণ্ড ১৭৮৫-৯৪ পর্বে ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের আমদানি বিনা ব্যয়ে নিয়ে এসেছিল[১২]। এরিক উইলিয়ামস এই সাদাসাপটা তথ্য ও ল্যাঙ্কাশায়ারে পুঁজিবাদী বস্ত্র শিল্পের উদ্ভবের মধ্যে যোগসূত্রটি যথাযথভাবেই আন্দাজ করেছেন। মনে রাখতে হবে, দাস ব্যবসার প্রধান বন্দর ছিল লিভারপুল[১৩]।

এশিয়ায় নৌ চলাচলের ওপর পর্তুগীজদের চাপানো কর এবং জাভার কৃষকদের ওপর নেদারল্যাণ্ডসের কর দিয়ে শোষণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পলাশীর (১৭৫৭) পর ভারতে ব্রিটিশ দখলদারি ছিলো তার চূড়ান্ত মুহূর্ত। ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দখলকৃত এলাকার সমস্ত রাজস্বই নিজেদের মুনাফা হিসেবে নিয়ে যেত। এদের তুলনায় পর্তুগীজ বা ওলন্দাজদের আগেকার সম্পদ নিতান্তই সামান্য ছিল। এভাবেই শুরু হলো কুখ্যাত 'সম্পদ চলান'। একটি বিশদ সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী ভারত থেকে রপ্তানি-আমদানির শেষে ইংল্যাণ্ডের মোট লাভ ১৭৮০-র দশকে ছিল গড়ে বার্ষিক ৪৯ লক্ষ ৩০ পাউণ্ডেরও বেশি[১৪]।

বশ্যতাজনিত এই কর মূলত যেত ভারতীয় বস্ত্রের আকারে। এর আবার একাংশ ব্যয় করা হতো আফ্রিকার ক্রীতদাস কিনতে। অর্থাৎ এই পর্বে ভারতে ব্রিটিশ দখলদারি আফ্রিকান ক্রীতদাস ব্যবসার তেজীভাবের অন্যতম কারণ ছিল।

বহির্দেশীয় উৎস থেকে ইংল্যাণ্ড যে প্রতি বছরে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করতো তা নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে উইলিয়াম পিট

হিসেব করে দেখেছিলেন পরিমাণটা হলো বছরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু এর সঙ্গে শিল্প বিপ্লবেব বিনিয়োগ সংক্রান্ত যোগসূত্রেব ব্যাপাবে ব্রিটিশ পণ্ডিতরা বিস্ময়কব রকমের নীরবতা দেখিয়েছেন। ডিন ও কোল রায দেওয়া স্থগিত রেখেছেন এই বলে যে 'বিস্তারিত গবেষণা ছাড়া কিছু বলা অসম্ভব'[১৮]। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদেব মধ্যে ডব তাঁর *স্টাডিজ ইন দি ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থে এ নিয়ে কিছুই বলেননি। সুইজি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন 'এই (বহির্দেশীয়) সঞ্চয় ঠিক কিভাবে শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে তা নিয়ে মার্কস প্রায় কিছুই বলেননি'। তাঁর *স্টাডি*এ দাবি করেছিলেন, প্রাথমিক সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় যে জমির মালিকরা জমি দখল করেছিলেন, এখন তারা ভূসম্পত্তি বিক্রি করে শিল্পে বিনিয়োগ করলেন। সুইজি প্রশ্ন তুললেন, সেই সম্পত্তি কিনলো কোন শ্রেণী[১৭] ডব কোন পূর্বনির্দিষ্ট ধাবণা ছাডাই কোনক্রমে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনেব প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। ডব লিখলেন ''অষ্টাদশ শতকে অবসবপ্রাপ্ত ইস্ট ইণ্ডিয়ান 'নবাব'-দের মতো লোকদেব কাছে প্রচুব পবিমাণে বণ্ড ও ভূসম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছিল। বিক্রেতাব সেই অর্থ ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। অতএব বলা যায যে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্প বিপ্লবকে উর্বরতা দিয়েছে। এই অনুমান অনুসন্ধানেব যোগ্য নিশ্চযই''।

উপনিবেশ থেকে পাওয়া মজুরি-পণ্য (চা, তামাক, আখের বস, সূতীবস্ত্র) এবং কাঁচামাল (রেশম, নীল) জাতীয় হিসেবের স্তরে দেখলে 'বিনামূল্যেই' মিলতো। ফলে, ব্যয় কমিয়ে শিল্প পুঁজিকে তা সম্প্রসারিত করেছে। বিশ্বজুড়ে বিবাট পবিমাণ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ কোন রসদ সংগ্রহ করেছে কিনা তা বুঝতে এরপরেও কেন যে 'বেসরকাবী প্রতিষ্ঠানের নথি' ঘাঁটতে হবে, তা বোঝা দুস্কর।

প্রাথমিক সঞ্চয়ের ইতিহাস থেকে নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের জন্ম হতো না যদি না সেখানে কৃষক সমাজকে ধ্বংস কবা হতো এবং বিশ্বজুড়ে অন্য দেশের অর্থনীতিকে দখল ও শোষণ করা হতো। ধনতন্ত্রের আবির্ভাব কোন স্বাভাবিক অভ্যন্তরীন ঘটনা নয়। বর্হিদেশীয় অর্থনীতিকে দখল করা অভ্যন্তরীণ শিল্প পুঁজি গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিলো। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্রুবতম উপনিবেশবাদ কেবল ধনতন্ত্রের উদ্ভবের একটি সঙ্গী নয়, তা ছিলো ধনতন্ত্রেব একটি মৌলিক, অনিবার্য পূর্বশর্ত। ক্ষুদ্র উৎপাদনের মধ্যে ধনতন্ত্রেব বিকাশের 'শম্বুক গতি' অবশেষে দ্রুত বিকাশের চেহারা পেল। প্রমাণিত হলো, উপনিবেশের মূল ভিত্তি শক্তি প্রয়োগ 'নিজেই একটি অর্থনৈতিক শক্তি'[১৮]।

(৩)

উপনিবেশবাদ যদি ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হয়ে থাকে, সাম্রাজ্যবাদও ধনতন্ত্রের সমান প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। এই শতাব্দীর মার্কসবাদী আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই একটি দুর্ভাগ্যজনক ফাঁক হলো এই অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যটিকে উপেক্ষা করা। তার বদলে সাম্রাজ্যবাদকে কেবল ধনতন্ত্রের শেষ পর্বের একটি বিকাশ

হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর অনেকটাই ঘটেছিলো অবাধ-বাণিজ্যপন্থী উদারনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হবসনের সাম্রাজ্যবাদ (১৯০২) গ্রন্থটির প্রভাবে। রোজা লুক্সেমবার্গ (১৯১২) সাম্রাজ্যবাদকে সংজ্ঞায়িত কবলেন 'অ-ধনতান্ত্রিক পরিবেশের যতটুকু এখনও উন্মুক্ত রয়েছে তার জন্য প্রতিযোগিতায় পুঁজিব সঞ্চয়েব রাজনৈতিক প্রকাশ' বলে। পুঁজিবাদী সঞ্চয়েব সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদকে যুক্ত করে দেখা নিশ্চয়ই অর্ন্তদৃষ্টিব পরিচয় বহন কবে। কিন্তু আবাব যখন পৃথিবীতে 'অ-ধনতান্ত্রিক' এলাকা কমে প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে গেছে, শুধু সেই পর্বেব মধ্যে সাম্রাজ্যবাদকে সীমায়িত রাখার ফলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের অনেকটাই ছেঁটে দেওয়া হল। লেনিন একটি পৃথক এবং আরও সুনির্দিষ্ট মাত্রা যুক্ত করেছিলেন। ১৯১৬ তে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে ধনতন্ত্রের একচেটিয়া পর্বের ফসল বলে সংজ্ঞায়িত করলেন। তিনি এমনকি এও বললেন, 'গ্রেট ব্রিটেনে অবাধ প্রতিযোগিতার সর্বাধিক বিকাশের পর্বে, অর্থাৎ ১৮৪০ থেকে ১৮৬০-ব মধ্যে, শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতারা ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধী ছিলেন'।

ডব এই থেকে সাম্রাজ্যবাদকে 'বৈদেশিক বাণিজ্যেব সুবিধাপ্রাপ্ত অংশেব মানসিকতা'-য় কমিয়ে আনলেন। এ এমন এক বৈশিষ্ট্য যা কেবল উনবিংশ শতাব্দীব শেষ দুই দশকে দেখা গেছে। অবাধ বাণিজ্যেব পর্বে যে অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদ থাকতেই পারে না, ডব তার ইঙ্গিত দিলেন এই বলে যে উল্লিখিত মানসিকতা 'আগেব আগের শতকের মার্কেণ্টাইলিজমের অনুরূপ'।

ইতিহাসের তথ্যের আলোকে আজ সাম্রাজ্যবাদের এই ধারণাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে মনে হয়। ধনতন্ত্রে নিখুঁত প্রতিযোগিতাব অভিমুখে প্রবণতার সঙ্গেই মুনাফার গড় হার কমতে থাকে। কয়েকটি উপাদান দিয়ে এই প্রবণতা সামলানো যায়। মার্কস এই উপাদানগুলির মধ্যে কম অগ্রসর দেশগুলিব সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যেব সম্প্রসাবণকে চিহ্নিত করেচিলেন। সেক্ষেত্রে প্রতিযোগীব আগে একটি নতুন আবিষ্কার ব্যবহার করে একজন উৎপাদক যে মুনাফা করবে তার চেয়ে অনেক বেশি 'উদ্বৃত্ত মুনাফা'র সুযোগ থাকছে। স্পষ্টতই, বৈদেশিক বাণিজ্যকে এ হেন উদ্বৃত্ত মুনাফা অর্জন করতে হলে অগ্রসর দেশকে অবাধ বাণিজ্য জোর করে চালু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মেট্রোপলিটন দেশের গড় হারের তুলনায় উপনিবেশে বিনিয়োগ করা পুঁজিতে বেশি মুনাফা হবে। কেননা 'দাস, কুলি ইত্যাদিদের ব্যবহার' করা যাচ্ছে। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করতে হবে। বস্তুত, কেবলমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্রিটেনের পূর্ণ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতের মতো দেশের থেকে চীনের মতো আধা-স্বাধীন দেশে জোর করে বাণিজ্য বাধা ভেঙ্গে ফেলা সত্ত্বেও পণ্য নিয়ে যেতে অনেক বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে কেননা প্রথম ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্রিটিশরা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ চালু করতে পেরেছিল। সুতরাং ব্রিটেনকে অবাধ বাণিজ্য থেকে 'উদ্বৃত্ত-মুনাফা' অর্জন করতে হলে ভূখণ্ডের ওপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা জরুরী ছিলো।

প্রাক-একচেটিয়া ধনতন্ত্রেরএই অন্তর্নিহিত অভিমুখ সম্পর্কে ধারণা ছিল বলেই মার্কস অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তাদের শান্তিবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী ভনিতায় প্রতারিত হননি। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে দখলদারির ক্ষেত্রে 'ইংল্যাণ্ডের সমস্ত দলের নীরবতা' লক্ষ্য করেছিলেন মার্কস। এমনকি তাঁরাও, মার্কসের ভাষায় যাঁরা 'ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে শান্তি নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার হবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তবে তাদের তীব্র মানবদরদ দেখানোর জন্য আগে সাম্রাজ্যটা তো তাদের পাওয়া চাই'' । ১৮৫৭ র ভারতীয় বিদ্রোহ দমনকে তিনি দেখেছিলেন ''ম্যাঞ্চেস্টারের অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তাদের ভারতীয় বাজারে একচেটিয়া অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে'' ভারতের ''গৌরবজনক' পুনর্দখল'' হিসেবে''।

১৯৫৩ তে জে. গালাঘার এবং আর. রবিনসন 'অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ' আবিষ্কারের অনেক আগেই মার্কস সাম্রাজ্য বিস্তার ও অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন'' । এই দু'জন অবশ্য যথার্থভাবেই দেখিয়েছেন যে ১৮৪০-র সেই সময়েই, যখন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারা শান্তিপূর্ণ অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জোর করে ভারত ও তার চারপাশে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় বিরাট অংশের জনবসতি এলাকা দখল করেছে। ১৮৫০ ও তার পরেও এই আক্রমণাত্মক নীতি রূপায়িত হচ্ছে। সাধারণভাবে গালাঘার ও রবিনসনের থিসিস শক্ত জমিতেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় জোর সমালোচনা উঠেছে যে কোন কোন ব্যক্তি নীতিনির্ধারক অবাধ বাণিজ্যনীতির আন্তরিক ও অবিরত ভক্ত ছিলেন কিনা। মূল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তথ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি।

অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা হলো কেবল গ্রেট ব্রিটেনই এই পথে চলছিল। সেই অর্থে, এটি ছিলো অন্তর্বর্তীকালীন সাম্রাজ্যবাদ যেমন ব্রিটেন কেবলমাত্র অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যই একমাত্র শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি ছিলো। ১৮৭০-র দশক পর্যন্ত ব্রিটেন শিল্পে সব চেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ ছিল। স্বভাবতই সমস্ত অবাধ বাণিজ্যেই ব্রিটেন লাভবান এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংরক্ষণমূলক নীতি নিলেও হয়তো তাদের ওপর অবাধ বাণিজ্য চাপিয়ে দিতে পারতো না ব্রিটেন। কিন্তু দুর্বলতর দেশগুলির ওপর নিজের কর্তৃত্ব চাপাতো, সরাসরি বা 'বেসরকারী' সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকা বা প্রভাবের এলাকার মাধ্যমে নিজের বাণিজ্যের অনিয়ন্ত্রিত পথ উন্মুক্ত করেছিল তারা। বিশ্বের একটি বিরাট অংশে অবাধ বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই ব্রিটেন গড়ে তুলেছিল সেই সাম্রাজ্য যেখানে সূর্য অস্ত যেত না।

একটি বিষয় চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যদি হবসনের বদলে মার্কসকে দিয়ে শুরু করতেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ঠিক কী ধারণা তাঁদের গড়ে উঠতো। (একটি কথা বলে রাখা ভালো, নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে মার্কসের রচনার কথা সম্ভবত রোজা লুক্সেমবার্গ বা লেনিন জানতেন না) যদি প্রচুর মুনাফার লক্ষ্যে ধনতন্ত্রের বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ (এমনকি যদি অবাধ বাণিজ্যের কারণেও) এবং

পূর্ণাঙ্গ উপনিবেশের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সাম্রাজ্যবাদেব পথেই চলতে হতো—তা সে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার পর্বেই হোক বা একচেটিয়া পর্বে হোক। বোজা লুক্সেমবার্গের ধারণা ছিলো উদ্বৃত্ত মূল্য কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক ও অ-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে বিনিময়েই তৈরী হতে পারে। তা যদি হয়, তাহলে সব স্তরেই ধনতন্ত্রের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ আরো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলতে গেলে ফিন্যান্স পুঁজি ও একচেটিয়ার উদ্ভব হোক বা নাই হোক অবাধ-বাণিজ্যের পর্ব থেকেই সাম্রাজ্যবাদ অব্যাহত থাকতো। ১৮৭০-র পরে একাধিক শিল্পসমৃদ্ধ শক্তির আত্মপ্রকাশের পর অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিতভাবেই সংরক্ষণের বাধা পেত, কেননা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকায় নিজেদের বাজার নিশ্চিত করতো। নিশ্চিতভাবেই আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকায় নিজেদেব বাজার নিশ্চিত কবতো। নিশ্চিতভাবেই আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত সৃষ্টি হত। ১৮৭০-র দশকেব মাঝামাঝি থেকে ১৮৯০-ব দশকেব প্রথম পর্বে বিস্তৃত গ্রেট ডিপ্রেশন-র মতো সঙ্কটে তা আরো তীব্র হতো।

সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের উৎস ছিল, এই অবস্থান মেনে নিলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্ব আরো জোরদার হয়। উপনিবেশের পুঁজি রপ্তানির ওপর সম্ভবত লেনিনবাদী তত্ত্বে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।'' ১৯১৪ পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে রেলওয়ে বাদ দিয়ে এ-জাতীয় বিনিয়োগের খুব বেশি গুরুত্ব ছিল না। মনে হয়, বিশুদ্ধ পুঁজি-বপ্তানিভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় পূর্বে উল্লিখিত প্রাক-একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদের ধরনই এখানে বেশি খাপ খাচ্ছে।''

যেটায় জোব দেওযা উচিত তা হলো শিল্প-ধনতন্ত্রের তৈরি ও প্রতিযোগী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়ার জন্য দারুণভাবে তীব্র হয়েছে। মার্কস যখন পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের 'কেন্দ্রীভবনে'র' প্রবণতা বর্ণনা করছিলেন, তখনই তাতে একচেটিয়া র ধারণা নিহিত ছিল। শিল্পের সব শাখাতেই প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পুঁজিবাদীর সংখ্যা কমতে থাকে, পুঁজিবাদীরা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আর আয়তনে বাড়ে।'' একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর একচেটিয়া পুঁজি একচেটিয়া বাজারের মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। কেননা সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য উৎপাদনকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে না যেখানে প্রান্তিক ব্যয় মূল্যের সমান হয়ে যায়, ততদূর পর্যন্ত যাবে যেখানে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। একই সঙ্গে, অ-একচেটিয়া বাজারে প্রতিযোগিতা আর তীব্র হবে। ফলে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেক সংস্থা ও সংস্থাগুলির পক্ষে সংরক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্যের এলাকাকে বাড়ানো সুবিধাজনক হবে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের অভিমুখে অভিযান আরো তীব্র হবে। এই যুক্তিতে, সাম্রাজ্যবাদের যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে তা প্রাক-একচেটিয়া পর্বের সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত নয়, বরঞ্চ তারই অবিরত প্রক্রিয়া ও তীব্রতাবৃদ্ধি।

অবশ্যই আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, হিলফারডিং-এর (১৯১০) 'ফিন্যান্স পুঁজি'। ফিন্যান্স পুঁজির সূত্র ছিল ব্যাঙ্কের বিকাশ, যা শিল্প পুঁজির সঙ্গে মিশ্রিত

হচ্ছে এবং তার ওপর আধিপত্য করছে। এই পুঁজির শক্তির উৎসে ছিল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যাপ্তি এবং সবচেয়ে এগিয়ে থাকা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাদের কার্যত ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব। এই ঐক্য (চেক প্রথা বা নগদ-জমা অনুপাতের মাধ্যমে) ব্যাঙ্কগুলির টাকা 'তৈরী করার' ক্ষমতা বা ঋণের মাধ্যমে গতিবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছিল। এর ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে তৈরি তহবিলের অতিরিক্ত পুঁজি সঞ্চয়ের একটি নতুন উৎস তৈরি হল। এর ফলে একটি পুনর্বণ্টনের প্রতিক্রিয়া হল। কেননা জমানো টাকার প্রকৃত সম্পদের অবক্ষয় ঘটিয়েই এই মূলধন তৈরি হল। যদি শুধু উদ্বৃত্ত মূল্যই পুঁজির একমাত্র উৎস থাকতো তাহলে যা হতে পারতো তার থেকে অনেক দ্রুততর বিকাশ ঘটলো পুঁজির। (ডব পর্যন্ত মার্কসবাদীদের আলোচনায় এই প্রক্রিয়াটি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি বলে আমার ধারণা)। পুঁজির এহেন দ্রুত আয়তনবৃদ্ধি থেকে দু'টি প্রতিক্রিয়া ধাবণা করা যায়। বৃহত্তর বিনিয়োগের ফলে বৃহত্তর সংস্থা অনেক বড় মাত্রার উৎপাদনই শুধু করতে পারলো না, মূলধনী পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আরো বৃহত্তর বিনিয়োগও সম্ভব হল। এর ফলে একচেটিয়া আরো বাড়লো, তবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে আটকানোর জন্য একচেটিয়া চেষ্টাও খর্বিত হলো।

আরেকটি ফলাফল হল উদ্বৃত্ত পুঁজির ক্রমবর্দ্ধমান রপ্তানি। পুঁজি রপ্তানির ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাইরে থেকে আসা আয়বৃদ্ধির ব্যাখ্যা মিলবে এখানেই। সাধারণভাবে মিত্র ধনতান্ত্রিক দেশে ও নিজেদের উপনিবেশেই পুঁজি রপ্তানি করা হত। এই জাতীয় বিনিয়োগ রাজনৈতিক সুরক্ষায় ঘেরা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। যাতে একই এলাকায় বিনিয়োগে আগ্রহী প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করা যায়। ফলে আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিভাজন ও বিভিন্ন জোট গঠনের প্রক্রিয়া আরো বেড়ে যাবে।

কাউৎস্কি মনে করতেন, আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী সংঘাত হচ্ছে কৃষি প্রধান বা কম শিল্পোন্নত উপনিবেশকে ঘিরে। লেনিন সঠিকভাবেই এই প্রশ্নে কাউৎস্কির সমালোচনা করেছিলেন[১১]। সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যেক শক্তি চাইত শক্তি প্রয়োগে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করতে বা দুর্বল করতে, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা দখল করতে এবং তথাকথিত 'যাদের আছে' আর 'যাদের নেই' তেমন শক্তিগুলির মধ্যে উপনিবেশের পুনর্বন্টন করতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দু'টি পরস্পরবিরোধী জোটের মধ্যে এহেন সংঘাত থেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি বাড়তি মাত্রা যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে নির্মূল করার চেষ্টায়। অভূতপূর্ব জাতীয় বিদ্বেষ, হিংসা, গণহত্যার এই যুদ্ধগুলি কেবল কয়েকজন ব্যক্তি উন্মাদের কার্যকলাপের ফল নয়, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমার অযোগ্য অভিযানেই এই যুদ্ধ ঘটেছে। এই উন্মাদদের জায়গা করে দিয়েছে তারাই।

অতীতে যে সমস্ত শক্তি সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে তারা আজও আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দীর্ঘ প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঢেউ নিঃসন্দেহেই সাম্রাজ্যবাদের রূপ ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই

পবিবর্তনগুলি ক্রমাগত পর্যালোচনা কবা উচিত। দুই বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী শক্তিব প্রথম সাবি থেকে পিছু হঠেছে। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র পৃথিবীব বিবাট এলাকায় অঘোষিত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৭০-ব চ্যালেঞ্জহীন ব্রিটেনেব মতই আজ তাদেব অবস্থা। কিন্তু পশ্চিম ইউবোপ ও পূর্ব এশিযাব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলি এগোচ্ছে। আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা ও অস্থিবতাব মৌলিক উপাদানগুলি বজায় আছে। যুদ্ধাস্ত্রেব ওপব মার্কিন যুক্তবাস্ট্রেব কার্যত একচেটিয়া আধিপত্য, তাব অর্থনৈতিক প্রভাবেব বিরুদ্ধে জনগণেব তৎপবতা এবং সমাজতন্ত্রেব শক্তিব পুনরুভ্যুত্থানে এই চিত্র আবো বদলাবে কিনা তা দেখা যাবে ভবিষ্যতেই।

সূত্র নির্দেশ

(উল্লিখিত গ্রন্থ ও অন্যান্য উল্লেখ মূলানুসাবী ই বাজিতেই বাখা হলো।)

১। The Asiatic the ancient the feudal and the modern bourgeois modes of production (A Contribution to the Critique of Political Economy tr N I Stone Bharati Library Calcutta n d p 13)

২। Capital I Moore-Aveling tr ed Dona Torr London 1938 (facsimile ed of the original Swan Sonnenschein ed London 1887) p 776 (f Transition from feudal to Capitalist mode of production in Capital III Foreign Languages Publishing Moscow 1959 p 327

৩। Cf Karl A Wittfogel Oriental Despotism a Comparative study in Total Power New Haven 1957 pp 402 4

৪। Studies in the Development of Capitalism London 1946

৫। Selected Works of Mao Tse tung II Foreign Languages Press Peking 1967 p 309

৬। India Today Peoples Pub House Bombay 1947 p 85

৭। Capital I pp 774-86

৮। Studies in the Development of Capitalism pp 142 3

৯। The Transition from Feudalism to Capitalism London 1954

১০। Capital III p 778

১১। Chapter on Historical Tendency of Capitalist Accumulation Capital I pp 786-90

১২। Capital I p 787

১৩। Capital I p 774 ডব মানে কবতেন ক্ষুদ্র উৎপাদকবা অসাধাবণ' ভূমিকা পালন কবেছিল। মার্কসেব সঙ্গে তাঁব পার্থক্য।

১৪। R H Tawney Rise of the gentry Economic History Review XI (1941) I reprinted in E M Carus- Wilson op cit pp 153-206 esp pp 186-7

১৫। Franklin F Mendels 'Proto-industrialization the first Phase of the Industrialization Process' Journal of Economic History XXXII (1972) pp 241-61

১৬। Studies p 134

১৭। Capital III p 331 See also ibid p 322 'The independent development of

merchant's capital therefore stands in inverse proportion to the general economic development of society

১৮। An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations Dent & Co London 1910 I pp 4 11

১৯। The Wheels of Commerce Fontana London 1985 pp 329-44

২০। David Ricardo The Principles of Political Economy and Taxation Dent & Co London 1911 pp 263 71 (being chapter XXXI on Machinery inserted in the 3rd ed of 1821)

২১। Capital I pp 511 474

২২ Braudel Wheels of Commerce p 502 কিন্তু ব্রদেল মনে করেছিলেন যে মার্কস অন্যরকম ভাবতেন।

২৩। Studies & c pp 268 71

২৪। ibid p 271

২৫। মার্কসের মৌলিক সংজ্ঞার জন্য Capital I 736 Cf Irfan Habib Essays in Indian History Towards a Marxist Perception Tulika New Delhi 1995 pp 272-3

২৬। Marc Bloch's perceptive remarks in French Rural History an Essay in Basic Characteristics London 1966 pp 126 ff

২৭। Eric Kerridge Movement of Rent 1540-1640 Economic History Review 2nd ser VI (1953) I reprinted E M Carus-Wilson (ed) Essays in Economic History II London 1966 pp 208-26 and R A C Parker Coke of Norfolk and the Agrarian Revolution Economic History Review 2nd ser VIII (1955) 2 reprinted in Carus-Wilson op cit p 329

২৮। Capital I p 775

২৯। Cf Marx The discovery of gold and silver in America the extirpation enslavement and entombment in mines of the aboriginal population the beginning of the conquest and looting of the East Indies the turning of Africa into a Warren for the commercial hunting of black skins signalised the rosy dawn of the era of capitalist production These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation (Capital I p 775)

৩০। Sherbourne F Cook and Woodrow Borah Essays in Population History Mexico and California Berkely 1979 III pp 1 52 168-76

৩১। Eric J Hamilton American Treasure and the Rise of Capitalism Economica November 1929 Cf P Vilar A History of Gold and Money London 1976 pp 103-193

৩২। Philip Curtin The Atlantic Slave Trade A Census Madison 1976 See also Eric R Wolf Europe and the people without History Berkely 1982 pp 195-6 Herbert S Klein in Tracy ed The Rise of Merchant Empires & c p 288 Stuart B Schwartz in Indian Historical Review XV (1988-89) pp 23-24 By 1750 about one-tenth of those transported still died on the voyage (Klein op cit p 304)

৩৩। Cf Savera I Habib proceedings of the Indian History Congress 36th (Aligarh) session Calcutta 1976 p xxiii

৩৪। Capitalism and Slavery Chapel Hill 1944 - (Cf Crouzet Capital Formation in the Industrial Revolution pp 7-8)
৩৫। K N Chaudhuri in Dharma Kumar (ed) Cambridge Economic History of India Cambridge 1983 II p 817
৩৬। Phyllis Deane and W A Cole British Economic Growth 1688 1959 Cambridge 1962 pp 34-35
৩৭। Transition p 20
৩৮। Ibid p 29
৩৯। Cf Capital I p 776
৪০। J A Hobson Imperialism - a study 3rd ed London 1988
৪১। The Accumulation of Capital Eng tr by A Schwarzchid London 1951 p 446
৪২। Imperialism the Highest Stage of Capitalism Eng tr Progress Publishers Moscow 1988 p 74
৪৩। Studies & c p 311
৪৪। Ricardo Political Economy and Taxation p 71 The natural tendency of profits then is to fall
৪৫। Capital III pp 232-3 Theories of Surplus Value progress publishers Moscow 1971 pp 105-6 যে মার্কস একটি দেশের মধ্যে দক্ষ-জটিল শ্রমের সঙ্গে অদক্ষ-সরল শ্রমের সম্পর্কের উদাহরণ টেনে বললেন, এ হেন পরিস্থিতিতে the richer country exploits the poorer one even where the latter gains by the exchange
৪৬। Capital III p 333
৪৭। Art in New York Daily Tribune 3 December 1859 (Marx and Engels Collected Works Moscow 1980 vol 16 p 539)
৪৮। Art in NYDT 11 July 1853 Marx and Engels On Colonialism Progress publishers Moscow 1968 p 49
৪৯। Art in NYDT 30 April 1859 Marx and Engels Collected Works Vol 16 p 286
৫০। Art of this title in Economic History Review 2nd Ser VI (1) reprinted in A G L Shaw (ed) Great Britain and the Colonies London 1970 pp 142-63
৫১। Shaw (ed) op cit pp 144-5
৫২। Cf D K Fieldhouse Economics and Empire 1830-1914 London 1984 pp 53-62
৫৩। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এবং আরো পরে ব্রিটিশদের পুঁজির অনেকটাই এদেশেই তৈরি। (See Amiya Bagchi Private Investment in India Cambridge 1972 pp 159 165 168 and Irfan Habib Essays in Indian History pp 290-93
৫৪। Capital I pp 788-9
৫৫। Imperialism the Highest Stage of Capitalism pp 86-7

মধ্যযুগে পর্যটক ভারতীয়

'মধ্যযুগের ভারত' বিভাগে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৯৫

সুরেন্দ্র গোপাল

মধ্যযুগের ভারত বিভাগে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কাছে গভীভাবে কৃতজ্ঞ।

শিক্ষাগ্রহণ ও কৌতূহল চরিতার্থ কবাব জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণের এক সুপ্রাচীন পরম্পরা ভারতীয় শিক্ষার্থীদেব আছে। মধ্যযুগে বিহারেব মিথিলা ও বাংলার নদীয়ার মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছাত্র বিনিময় হত[১]। এই যুগেই ইসলামী শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ভারতীয়রা দেশের মধ্যে অবস্থিত জৌনপুর, দিল্লী, আহমেদাবাদ ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন ছাড়াও বাইরে মধ্য এশিয়া, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, পশ্চিম এশিয়া ইত্যাদি দেশে যেতেন[২]। কিন্তু এখানে আলোচনার শুরুতে পরিষ্কার করে নিই যে আজকের প্রবন্ধের জন্য আমি যত না তথ্য নির্ভর তার চেয়ে বেশি ধরা পড়বে আমার অজ্ঞতা।

আমাদের বিভিন্ন ধর্মের দেশে সাধারণ মানুষেরা পুণ্যস্থানগুলি ও স্ব স্ব ধর্মের সাথে সম্পর্কিত তীর্থ, মন্দিরগুলি দর্শনে গভীর আগ্রহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে কিছু দুঃসাহসী ব্যক্তি সাধুর বেশ ধারণ করে দেশের মধ্যে যত্রতত্র ঘুরতেন[৩]। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটনরত সাধু ও ফকিরদের মধ্যে এক নিজস্ব ভাষার উদ্ভব ঘটে যা সাধুক্কড়ী নামে পরিচিত। একে আধুনিক হিন্দীর জনক বলা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো মন্দির, মসজিদ, মঠ, খানকাহ্, ধর্মশালা ও সরাইগুলিতে এঁরা খাদ্য ও আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

ধর্মীয়-সামাজিকআচার-অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় নারকেল, সুপারি, চন্দনকাঠ, কর্পূর ইত্যাদির মত উপকরণ সহ নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস, যেমন, লবণ ও মশলা, নানারকম ধাতু, যেমন, লোহা ও তামা প্রাপ্তিস্থান থেকে তাদের চাহিদার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। ভেষজ লতাপাতা ও বিলাসদ্রব্যও বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হত।

ভারতীয়দের মধ্যে দেশের বাইরে যাওয়ারও প্রবল আকর্ষণ ছিল। হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ ধরে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দীর্ঘ উপকূল ধরে সংলগ্ন প্রতিবেশী দেশে, এমনকি, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মত দূরবর্তী অঞ্চলেও তারা পাড়ি দিত। অনেক প্রাচীন কাল থেকেই এই সব মাধ্যমে ভারতীয় ও

বিদেশীরা পরস্পর যোগাযোগ রাখত। বাংলার তাম্রলিপ্ত ছিল উল্লেখযোগ্য বন্দর। এর পশ্চাদভূমির মধ্যে গাঙ্গেয় সমতলভূমির উল্লেখযোগ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব থাকায় প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের এই ধরনের পর্যটনের প্রকৃত হিসাব ও ব্যাপ্তি হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না। ভারতীয়রাও তাঁদের ভ্রমণের কোনওরকম বৃত্তান্ত রেখে যাননি।

মধ্যযুগে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে পর্যটক ভারতীয়দের সম্পর্কে অনেক গভীর ও বিস্তৃতভাবে জানা যায়। আরব ও চীনা নাবিকেরা ভারতবর্ষকে একদিকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় দেশ ও অপরদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলির সাথে যুক্ত করে। দশম শতকে ফতিমীয় খলিফার আনুকূল্যে পশ্চিম উপকূলে ভারতীয় বন্দরগুলিতে লোহিত সাগর থেকে নিয়মিত জাহাজ আসত। ভারতীয় মুসলমানরা তীর্থ করতে মক্কা ও মদিনায় যেতেন। কিন্তু আমাদের কোনও মার্কো পোলো (যদিও ডঃ ফ্রান্সেস উড বলেন যে তাঁর রচনা বানানো গল্প), ইবন বতুতা বা মা হুয়ান নেই যাঁরা এইসব পরিভ্রমণের কথা আমাদের শোনাবেন।

ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউরোপীয় সূত্র থেকে বহির্দেশে গমনকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে বাড়তি তথ্য পাওয়া যায়। যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে আসার জন্য মুসলমান শাসিত উত্তর আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্য এড়িয়ে নতুন কোনও সমুদ্রপথ বের করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। স্পেনীয় ইহুদী টুডেলার বেঞ্জামিন ১১৫৯/৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় দুই দশক পর ভারতবর্ষে পৌঁছান[১]। এইভাবে, এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়। তাঁকে অনুসরণ করেন মার্কো পোলো, ফ্রানসিসকান সাধু পোর্দেননের ওডোরিক, ফ্রায়ার জোর্ডানস, নিকোলো কণ্টি, কোবিলহাম ইত্যাদি। সর্বশেষে ভাস্‌কো-ডা-গামা ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের কালিকটে (বর্তমান কোঝিকোড়) এসে পৌঁছান ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে যাতায়াতের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সমকালীন আরও একটি ঘটনাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ইরানে সাফাবিদ, তুর্কিস্তান ও পশ্চিম এশিয়ায় অটোমান এবং ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সংলগ্ন তিনটি সাম্রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডর (যা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত) উপরপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, শান্তি, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাদি এমন এক অনুকূল পরিস্থিতির জন্ম দেয় যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর নিরাপদ ও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতকে ভারতীয়দের আফ্রিকার পূর্বকূলে, আরব উপদ্বীপ, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ইরান, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি জায়গায় বসবাস করতে দেখা যায়[২]।

ভারতীয়দের বহির্দেশে যাত্রা এই উপমহাদেশের অভ্যন্তরে মানুষজনের চলাচলের সাথে জড়িত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাটদের বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ, শাসনবিভাগে নূতন নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক-ধর্মীয় নীতিগুলি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে মানুষ ও দ্রব্য উভয়েরই চলাচল বাড়িয়ে দেয়। জাহাজের

উপব নিয়ন্ত্রণ বন্দর ও পশ্চাদভূমির মধ্যে কেনাবেচা বৃদ্ধিকরে। বানজারাদের[১০] মাধ্যমে এই সংযোগ বজায় থাকে যারা উত্তর ভারত থেকে সমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জায়গায় এবং গুজরাটের বরোদা, আহমেদাবাদ, ক্যাম্বে ও সুরাট ইত্যাদি বন্দরে আনা নেওয়া করত।

যমুনা নদী ধরে নৌবহরগুলি দিল্লী থেকে আগ্রা হয়ে গঙ্গায় পৌঁছাত এবং সেখান থেকে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বন্দব শহরগুলিতে ভীড়ত[১১]। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে হুগলী মুখ্য বন্দর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আকবরের সময় থেকে সম্পূর্ণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রাজপুত বাহিনীসহ মুঘল সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য দেশের মধ্যে দিয়ে যেত। এর ফলেও ব্যবসায়ীরা ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ছিল গুজরাটী ও রাজস্থানী (জৈন ও হিন্দু), হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের অগ্রওয়াল এবং উত্তরভারতের খত্রি ও অরোরা-রা[১২]। পরাজিত অঞ্চলের উপর শাসনব্যবস্থা কায়েম করার সময়ে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য এবং হিসাবরক্ষক ও রাজস্ব কর্মচারী হিসাবে এদের প্রয়োজন পড়ত। কিছু রাজপুত সৈন্য সেইসব অঞ্চলেই বসবাস করতে শুরু করে। এইভাবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে একজন খত্রির কথা উল্লেখ করা হয়[১১]।

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দশকগুলিতে ইউরোপীয়রা বিশেষত নীল ও সুতীবস্ত্রের জন্য উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে বাজার সম্প্রসারণ শুরু করলে ভারতীয়দের দেশের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত ও স্থায়ী বসবাস বৃদ্ধি পায়। দালাল, ব্যাঙ্কার ও ব্যাখ্যাকারী হিসাবে ভারতীয়দের প্রয়োজন ইউরোপীয়দের ছিল। ইউরোপীয় বাণিজ্যবৃদ্ধির সাথে তাদের ভারতীয় সহযোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল এবং গুজরাট, সুরাট ও ক্যাম্বে বন্দর শহরের মধ্যে মানুষ ও পণ্যদ্রব্য চলাচল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে[১০]। ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিমের বর্ধিত উপকূলীয় বাণিজ্য বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করে যদিও অঞ্চলগুলির আনুগত্য বিভিন্ন শাসকের প্রতি ছিল। শাহজাহানের শাসনকালে জগৎ শেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পাটনায়[১১] এসে বসবাস শুরু করেন। পরে তাঁর বংশধরেরা মুর্শিদাবাদে চলে আসেন।

স্থানান্তরে যাতায়াতকারী ভারতীয়দের এই দুটি সুবিদিত ঘটনা ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তির কথা জানা যায় যাঁরা পূর্বভারতে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন, যেমন, ননু গোধা, হীরানন্দ মুকিম, ধন্নরাই ইত্যাদি[১৪]। আমার মনে হয় সময় এসেছে তাঁদের ইতিহাস লেখার। 'বাংলার জৈনরা' একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে। পূর্ব ভারতে অরোরা ও খত্রিদের নানা জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। এর থেকে পূর্বভারতে শিখধর্মের প্রসার সম্পর্কেও জানা যেতে পারে।

বাংলায় জৈনদের বিষয়ে অধ্যয়ন করার ব্যাপারটি সাহস করে এই কারণে বিবেচনা করতে বলছি যে জৈনরা তাঁদের পর্যটনের কিছু বৃত্তান্ত রেখে গেছেন। কিছু জৈন ব্যবসায়ী এবং ধর্মমূলক আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এমন কিছু

জৈন সাধুর আত্মজীবনী পাওয়া গেছে। এইরকম কিছু রচনা হলো সংস্কৃতে রচিত **ভানুচান্দগণিচরিত**[১৭], হিন্দীতে **অর্ধকথানিক**[১৮] এবং অপ্রধান রচনার মধ্যে **বীর শাসন কে প্রভাবক আচার্য**[১৯], **প্রমুখ জৈন পুরুষ ও মহিলায়েঁ**[২০] **খাণ্ডেলওয়াল, জৈনসমাজ কা বৃহৎ ইতিহাস**[২১] ইত্যাদি। পি.সি.নহরের **জৈন ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌স্‌** এর কথাও উল্লেখযোগ্য।

জৈন রচনাগুলির সাথে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির নথিপত্র মিলিয়ে পড়লে তথ্য সংযোজন ও শুদ্ধ করা সম্ভব। এই কোম্পানীগুলি সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকগুলি থেকেই সক্রিয় ছিল এবং এরা একে অপরের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। অষ্টাদশ শতকে বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জৈনদের ভূমিকাটিও বিশদ করা যেতে পারে এবং এর উৎস খোঁজা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে "বাংলার আর্মেনিয়রা" বিষয়টিও দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। ষোড়শ শতকেই বাংলার সাথে আর্মেনিয়দের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যখন, পর্তুগীজরা উড়িষ্যা ও বাংলার বন্দর গুলিতে কিছুটা জায়গা করে নিয়েছে, খচিকিয়ানের রচনায় ১৬৮২ থেকে ১৬৯৩ পর্যন্ত বছরগুলিতে একজন আর্মেনিয় বণিকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাওয়া যায়[২২]।

একথাও মনে রাখা দরকার যে ভারতের অন্যান্য অংশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলিতে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করত। এখানে মালাবার উপকূলের মপিল্লা বা মালাবারী[২৩], তামিলনাড়ুর চেট্টি[২৪], বাংলার সুবর্ণবণিক[২৫] এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির কথা উল্লেখ করা যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেছিল, যেমন, পট্টর[২৬] বলে পরিচিত তামিল ব্রাহ্মণদের একটি গোষ্ঠী সপ্তদশ শতকে গোলমরিচের ব্যবসা শুরু করে। বণিক সম্প্রদায়গুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগৃহীত হলে পরে তাঁদের ঝুঁকিপূর্ণ এইসব উদ্যোগের মূল্যায়ন ও মন্তব্য সম্ভব। তীর্থ যাত্রীরাও বহুদূর ভ্রমনের ঝুঁকি নিত। ধনী জৈনরা 'সংঘ বা মিলিত তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করতেন। সহ-তীর্থযাত্রীর ব্যয় ব্যক্তিগতভাবেও কোনও জৈন বহন করতেন'। সমসাময়িক জৈন সূত্রগুলিতে বারবার সংঘের কথা পাওয়া যায়।

মুসলমানদের একটি অংশ বাৎসরিক হজযাত্রার জন্য লোহিত সাগরীয় অঞ্চল মক্কা ও মদিনায় যেতেন। তাঁদেরকে এই উপমহাদেশের মুসলমান শাসকেরা জাহাজ, অর্থ ও রক্ষিদল দিয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। পর্তুগীজরা যখন এই জাহাজগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো ভারতীয় শাসকেরা কূটনীতি ও সশস্ত্র শক্তি উভয়ই ব্যবহার করতেন[২৭]। গুজরাট ও সিন্ধু বন্দরগুলি থেকে যেসব জাহাজ যেত তাতে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং কখনও মধ্য এশিয়া থেকেও তীর্থযাত্রী থাকত। হঠাৎ কখনও কোনও সাহসী অভিযাত্রী স্থলপথে ভারতবর্ষ থেকে ইরাণ হয়ে জাহাজে পারস্য উপসাগর পেরিয়ে অথবা মরুভূমি অতিক্রম করে মক্কা এবং মদিনায় পৌঁছাতেন[২৮]। এটা পরিষ্কার যে ইউরোপীয় কর্তৃত্ব ভারতীয়দের বহির্দেশে গমন বন্ধ করতে পারেনি। অনেকে আবার ইউরোপীয়দের জাহাজে স্থান করে নিয়ে পাড়ি দিত যেহেতু এগুলি ছিল অধিক নিরাপদ এবং জলদস্যুতা দমনের জন্য যথোপযুক্তভাবে সজ্জিত।

ইউরোপীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নথি এবং ইউরোপীয়দের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আরব উপদ্বীপের বন্দর-শহর মোচা ও এডেন এবং এইসাথে অন্তর্দেশীয় নগর তৈফ ও সানা-য়, ইরাকের বসরা ও ইরাণের সর্বত্র শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় উপস্থিতির কথা জানা যায়। ইউরোপীয়রা এঁদের বহিষ্কার করার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অবশ্য ভারতীয়রা ইরাণেই বেশী সক্রিয় ছিল। এর অবশ্য কয়েকটি কারণ ছিল যার ব্যাখ্যা সম্ভব।

অরমুজের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার সাথে পর্তুগীজরা পারস্য বন্দরগুলিতে যাতায়াতকারী জাহাজগুলির উপর কড়া নজর রাখত। ফলে ভারতীয়রা সমুদ্রপথের ব্যবহার কমিয়ে ফেলে। এমনকি তখনও পর্তুগীজ ও গুজরাটীদের যৌথউদ্যোগ কিছু ভারতীয়র বাণিজ্যোদ্দেশ্যে উপসাগর যাওয়া নিশ্চিত করেছিল। মনে রাখা দরকার যে লিনসকোটেন উল্লেখ করেছেন পর্তুগীজ রাজধানী গোয়ায় যোড়শ শতকের শেষে একটি সরণির সম্পূর্ণটা জুড়ে ছিল গুজরাটী বণিকেরা।

অরমুজ দ্বীপে এইসব ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরাও ছিল। ষোড়শ শতকের পর্যটক রালফ ফিচের মতে তারা মূর্তি পূজা করত। সম্ভবত তাদের অধিকাংশ গুজরাট থেকে এসেছিল বলে এরা 'বানিয়া' নামে পরিচিত ছিল।

মুঘলদের সাথে সাফাবিদদের সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতক জুড়ে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যদিও মাঝে মাঝে এতে চিড় ধরত। দূত, পণ্ডিত ও শিল্পীর পারস্পরিক আদান-প্রদানও চলত। বহুসংখ্যক ভারতীয় কান্দাহারের মধ্য দিয়ে স্থলপথে ইরাণে গিয়েছিলেন। এঁরা সাধারণত ইয়েজ্দ্, শিরাজ, ইস্পাহান, তেহেরান, রেস্ত্, গিলান ইত্যাদি নগরে বসত শুরু করেছিল। উত্তর-পূর্ব ইরাণের অন্তর্গত খোরাসানের বিভিন্ন নগরে (যেমন মাশাদ) যাওয়ার জন্য কাবুল-হেরাত পথটি বেশী পছন্দের ছিল।

ইরাণের অভ্যন্তরে নগরগুলিতে যেসব ভারতীয় বসবাস করত তারা পাঞ্জাবের প্রান্তীয় নগর মুলতানের নামানুসারে মুলতানী বলে পরিচিত ছিল। অরমুজের মত এখানেও ভারতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট হিন্দু ও জৈন ছিল। মূর্তি পূজা, কপালের সম্মুখভাগে তিলক চন্দনের চিহ্ন এবং মৃতের সৎকার পদ্ধতি (শবদাহ) খুব সহজেই তাদের চিনিয়ে দিত।

অ্যাংলো-ইরাণীয় সৈন্যদের দ্বারা অরমুজ পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হলে ইরাণের সামনে সমুদ্রপথ খুলে যায়। সমস্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি এর পূর্ণ সুযোগ নেয় এবং তাদের কাজকর্মের পরিধি বৃদ্ধি করে। নিজেদের কাজের জন্য যেমন বহু ভারতীয় ইরাণে পৌঁছায় তেমনি অনেকে আবার ইউরোপীয় সংস্থাগুলির দ্বারা দালাল, ব্যাঙ্কার বা ব্যাখ্যাকারী মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে আহূত হয়েও সেখানে পৌঁছায়।

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের পর ইরাণে আগমনকারী ভারতীয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কারণ এই সময় স্থল ও সমুদ্র উভয় পথই সহজগম্য হয়ে যায়। ইউরোপীয় জাহাজে

চেপেও তারা সেইসময় পৌঁছাতে পারত। মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এই ভারতীয়রা সিন্ধু, গুজরাট, পশ্চিম উপকূলের সুলতানশাসিত বিজাপুর করোমণ্ডলের গোলকুণ্ডার সুলতানী ও বাংলা ইত্যাদি স্থান থেকে গিয়েছিল। আরও পরে ভারতীয় পার্সীরা, যাবা একসময় পারস্য থেকেই এসেছিল, ইরাণে পৌঁছায়[১]।

ক্রমবর্ধমান চলাচল সামাল দেওয়ার জন্য পারস্যের শাহ অরমুজের বিপরীতে গোমব্রুন বা বন্দর আব্বাস নামে নুতন বন্দরটির প্রতিষ্ঠা করেন[২]। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবু শেহর-এর অনুকূলে পারসিকদের বন্দর আব্বাস পরিত্যাগ পর্যন্ত[৩] ভারতীয়রা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে এখানে বসবাস করে। বাণিজ্য পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত।

অমুসলমান ব্যবসায়ীরা 'বানিয়া'[৪] নামে অভিহিত হতো সম্ভবত এই কারণে যে বেশীব ভাগই ছিল গুজরাট থেকে আসা মদ্যপান বর্জিত ও নিরামিষাশী।

বিভিন্ন ইউরোপীয় ইরাণে বসবাসকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে লিখেছেন। খ্যাতনামা ইংরেজ পর্যটক ফ্রায়ার[৫] সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে সেখানে বানিয়াদের একটি মন্দির ছিল যেখানে একজন পুরোহিত নিযুক্ত ছিলেন সেখানে তারা উপাস্য দেবতার মূর্তি পূজা করত ও উৎসব পালন করত। ইরাণের শাহ-র ধর্মীয় সহনশীলতা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন সম্ভব করেছিল।

দেখা যাচ্ছে ভারতীয়রা ইরাণের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরে বসবাস করত। সপ্তদশ শতকে রাজধানী ইস্পাহানে যথেষ্ট ভারতীয় ছিল। এই সংখ্যা বিভিন্ন মতানুযায়ী এক থেকে দশ হাজারের মত। অন্যান্য যেসব শহরে ভারতীয়রা ভালোভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল সেগুলি হল শিরাজ, তেহেরান, তাব্রিজ, রেস্‌ত্‌, কুম, গিলাস, ইয়েজদ্‌ ইত্যাদি।

এরকম শক্ত ভিত্তি ও দীর্ঘ বিস্তৃত সংযোগের জোবে ইরাণের বিভিন্ন শহর থেকে ভারতীয়রা প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেত। তারা ককেশীয় অঞ্চলে যেত এবং সেখান থেকে ১৬৩০-এর প্রথম দিকে জারশাসিত রাশিয়ায় যেত[৬]। ককেশীয় অঞ্চলের পশ্চিম কাস্পিয়ানের বাকু-কে তারা বসতির জন্য বেছে নিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় তাদের বসতির প্রধান অঞ্চল ছিল কাস্পিয়ানের উত্তর তীরে অবস্থিত অস্ত্রাখান[৭], এখানে ভলগা সাগরে মিশেছে। জারদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য তারা সেখানে দেড়শতকের অধিককাল থেকে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যায়। এখানে অমুসলমান ভারতীয়রা সাধারণত মুলতানী হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত ও নিজস্ব পুরোহিত নিয়ে যেত। স্বদেশবাসীর শবদাহের অনুমতিও তারা পেয়েছিল।

রুশ-পারসীক বাণিজ্যে ভারতীয়দের অপরিহার্য গুরুত্ব জারেরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং প্রয়োজনের সময় ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। ইরাণ থেকে ভারতীয়রা নিয়মিতভাবে কাস্পীয় বন্দর বাকু, দেরবেন্ট[৮] ও অস্ত্রাখানে

যেত এবং অস্ত্রাখানে বসবাসকারী কিছু ভারতীয় ইরাণের নগরগুলিতে এবং কখনও কখনও ভারতবর্ষেও যেত।

অস্ত্রাখান থেকে ভারতীয়রা রাশিয়ার অন্যান্য শহর যেমন, মরতভ, সমর, কাজান, নিঝ্‌নি নোরগোরোদ, ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌ ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজধানী মস্কোতে এসে তারা প্রাচ্য বণিকদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। একজন ভারতীয় ভিখারীও নাকি ব্যবসা শুরু করে। 'লাহোরি বানিয়া' নামে একজন ভারতীয় যথেষ্ট সম্পদ অর্জন করেন। নামে বোঝা যায় তিনি পাঞ্জাবের লাহোর থেকে এসেছিলেন"। রুশি ছাড়াও অস্ত্রাখানের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ী যেমন, আর্মেনিয়, বুখারীয়, মধ্য এশিয়, তাতারদের সাথেও আদানপ্রদান করত[১]।

ইরাণ ও রাশিয়ার ভারতীয়রা মধ্য এশিয়ার, বিশেষত বুখারা ও সমরখন্দের নগরগুলির বাজারে প্রবেশ করেছিল। দুটি নগরই ইরাণীয় ও রাশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সাথে লেনদেন করত[১]। উল্লেখ্য যে বেশীরভাগ ভারতীয় মধ্য এশিয়ায় এসেছিল বহুব্যবহৃত স্থলপথ ধরে যা লাহোর থেকে মুলতান বা পেশোয়ার হয়ে কাবুলে ঠেকেছিল। এটি সেখান থেকে অক্ষু নদী পেরিয়ে উত্তর সির দরিয়ার অববাহিকায় অবস্থিত সমরখন্দ, বুখারা ও তাসখন্দে পৌঁছেছিল। ভারতীয়দের অপর দলটি এসেছিল লাদাখ, পামীর মালভূমি এবং ইয়ারকন্দ-কাসগড় পথ ধরে[১]। কাসগড় থেকে পশ্চিমে গিয়ে এটি মধ্য এশিয়া তৃণভূমিতে ও সেখানকার শহর আন্দিজান ও কোপান্দ পৌঁছেছিল।

মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য বাজারগুলিতে ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরাও ছিল। জীবনধারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেমন, কঠোরভাবে নিরামিষ আহার গ্রহণ, অন্যান্য দেশের লোকের সাথে আহার গ্রহণ না করা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত। ইস্পাহান ও অস্ত্রাখানের স্থানীয় শাসকেরা তাদের ভিন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তারা আচার অনুষ্ঠানগুলি অবাধে পালন করতে পারে। এখানে অবশ্য প্রকাশ্য মূর্তিপূজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে মধ্য এশিয়ায় অপর এক দল ভারতীয়ের দাস হিসাবে আগমন ঘটেছিল"। এর মধ্যে কিছু ছিল কেনা এবং কিছু ছিল মুঘলদের মধ্য এশিয়া অভিযানের সময়কার যুদ্ধবন্দী। মালিদের জন্য তাদের কায়িক শ্রম করতে হতো। কিছু ভারতীয় পামীরে পৌঁছেছিল এবং কিছু খোটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতেও অভিযান চালিয়েছিল এবং এমনকি রাজধানী লাসাতেও পৌঁছেছিল। এদের মধ্যে বেশীরভাগ এসেছিল কাশ্মীর, লাদাখ, পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল এবং হিমাচল প্রদেশ থেকে। এই ভারতীয়দের মধ্যেও হিন্দু ও শিখ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলা থেকে তিব্বতে যে সব ভারতীয় গিয়েছিল তাদের ইতিহাস বলার কিছু চেষ্টা করা যায়"। ভারতের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা লাসা উত্তরবঙ্গের অনেক কাছে। শুধু তাই নয়, এটি পরম্পরাগতভাবে নেপাল ও তিব্বত যাওয়ার দরজা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

অবশ্যই উল্লেখ্য যে ভারতীয়রা শ্রীলঙ্কায় ও পূর্বে বার্মা, থাইল্যাণ্ড মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশেও গিয়েছিল। এরকম ধারণা আছে যে এসব অঞ্চলে গমনকারী ভারতীয়দের মধ্যে বেশীরভাগই এসেছিল করমণ্ডল উপকূল এবং উড়িষ্যা ও বাংলার বন্দর শহর থেকে। কিন্তু যথেষ্ট গুজরাটীদের সেখানে উপস্থিতির সাক্ষ্য আছে''। পর্তুগীজরা দাবী করে যে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তারা মালাবারী জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। মালয়ের আন্তর্গত মালাক্কার শাহ্‌বন্দর যখন পর্তুগীজদের অধীনে তখন এক গুজরাটীর বিরোধিতার খবর পাওয়া যায়''। মালাবারীরা পর্তুগীজ জাহাজ অনুসরণ করে তাদের নাজেহাল করে। উপকূল অঞ্চল থেকে আসা প্রায় সব হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাড়ি দেয়।

এই মুহূর্তে কতজন ভারতীয় চীনে গিয়েছিল বলা সম্ভব নয়। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের হরপ্রসাদ রায় এই বিষয়টির উপর কাজ করছেন'।

অষ্টাদশ শতকে আমাদের দেশের মধ্যে ও চাবপাশের অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সপ্তদশ শতকের তিনটি সাম্রাজ্যের মধ্যে পারস্যের সাফাবিদ সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং অটোমান ও মুঘল সাম্রাজ্যেও ভাঙ্গন শুরু হয়। ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ গ্রাস করে ও প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ ও ফরাসীদের বহিস্কার করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবশ্য ভারতীয়দের পর্যটনে ইতি টানতে পারেনি। তবে তাদের সংখ্যা ও দর্শনীয় দেশের ক্ষেত্রে নিশ্চিত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়।

লোহিত সাগরে ব্যবসা করার সুযোগ ভারতীয়রা হারায় যেহেতু জরাজীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের আর সেখানে দাবী প্রতিষ্ঠা করার মত বা জলদস্যুতা দমন করার মত অবস্থা ছিলনা। ভারতীয়রা বেশী করে ইউরোপীয় জাহাজগুলির উপর নির্ভর করতে শুরু করে কারণ দস্যুতা প্রতিরোধের জন্য তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। ইউরোপীয়রাও এ ব্যাপারটিতে বিমুখ ছিল না কারণ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয়দের বিশেষ জ্ঞান, সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। এছাড়া মাসুল বাবদও তাদের আয় হতো।

উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয়রা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ইরাণে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ধাক্কা খায়। আফগানরা ইরাণ দখল করলে দেশের সংহতি রক্ষায় সাফাবিদদের চরম অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়''। ১৭৩০ সালে নাদীর শাহ ইরাণীয় প্রতিরোধকারীদের নেতৃত্ব দিয়ে শুধু আফগানীদের বহিষ্কারই করেন নি, এমন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন যা কৃষ্ণ সাগর থেকে ভারতের যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতে হয় এবং এরপর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়''। ইরাণে এরপর জান্দ্‌ ও পরে কাজার বংশ শাসনক্ষমতায় আসেন।

ইরাণের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ভারতীয়রা করে। নাদির শাহের রাজত্বকালে যখন জীবন ও সম্পত্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে অনেকেই রাশিয়ায় চলে যায়। রাশিয়ার প্রাচ্য বাণিজ্যে

ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবদান সম্পর্কে অবহিত জার তাঁর সাহায্য প্রসারিত করেন। রাশিয়ার নাগরিকত্ব প্রার্থনাকারীদের আবেদন তিনি মঞ্জুর করেন।

যখন রুশীরা ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ওরেনবার্গ প্রতিষ্ঠা করে[৬১] এবং ভারতের সাথে তাদের বাণিজ্যে এটিকে প্রধান কেন্দ্র করতে চায় তখন তিনশত গুজরাটী পরিবার সেখানে বসবাসের জন্য চলে আসে।

রাশিয়ার অস্ত্রাখান থেকে ভারতীয়রা ইরাণে বাণিজ্যের প্রয়োজনে যাতায়াত অব্যাহত রাখে। ইরাণে রাজনৈতিক কিছু স্থিতি ফিরে আসার সাথে সাথে ভারতীয়রা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৭৬০ সালে পারসিকরা বন্দর আব্বাস পরিত্যাগ করলে প্রতিবেশী বন্দর বাসাতুর এবং আবু শহর বা ইরাণের অভ্যন্তরের নগর বা ইরাকের প্রাচীন বন্দর বসরায় স্থানান্তর করতে ভারতীয়দের কোনও অসুবিধা হয়নি। বসরায় ভারতীয়রা সপ্তদশ শতক থেকেই যেতে শুরু করে[৬২]। কিছু শিয়া মুসলমানও নজফ নগরে তীর্থ করতে যাওয়ার সময় বসরার মধ্য দিয়ে যেতেন।

সমস্ত অষ্টাদশ শতক জুড়ে ভারতীয়রা সমুদ্র বা স্থলপথ ধরে ইরাণে প্রবেশ অব্যাহত রাখে এবং তাদের শিরাজ, ইস্পাহান, তাব্রিজ, ইয়েজ্‌দ্‌, তেহেরাণ, গিলান ইত্যাদি প্রধান প্রধান শহরে দেখা যেতে থাকে। শুধু ভারতীয়দের জন্য খাবার প্রস্তুত হতো এরকম একটি সরাই তখনও চালু ছিল[৬৩]। আগের শতকের মতই তারা ইরাণ থেকে মধ্য এশিয়া, জারের সাম্রাজ্য এবং ককেশীয় অঞ্চলে যেত। আধুনিক আজারবাইজানের রাজধানী বাকু-তে হিন্দুদের একটি মন্দির ছিল যেখানে শাশ্বত অগ্নির পূজা হতো[৬৪]। এক পুরোহিতও সবসময় হাজির থাকতেন। এই শতকের শেষে রাশিয়ায় ভারতীয়দের গুরুত্ব কমে যায়। অস্ত্রাখানে তাদের সংখ্যা খুব নেমে যায়। পারস্য-রাশিয়ার বাণিজ্যে তাদের আর কোনও ভূমিকা ছিল না। রাশিয়ায় তাদের গুরুত্ব কমে গেলেও ইরাণে তা অব্যাহত থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইরাণের শাহ-র সাথে এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করেন[৬৫]। এতে শর্ত থাকে যে, যে কোন পারসিক সমুদ্রবন্দরে কর না দিয়ে ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বণিকদের বসবাস করতে দিতে হবে ও শাহ্-র রাজ্যে বাণিজ্যিক উদ্যোগে নিরাপত্তা দিতে হবে।

ইরাণে গমনকারী ভারতীয়দের কাঠামোয় একটি পরিবর্তন আসে। অমুসলমান ভারতীয়রা সাধারণত 'বানিয়া' বা 'মুলতানি' আখ্যায় অভিহিত হতো। এখন 'শিকরপুরী' নামে নতুন একটি উপাদান যুক্ত হয়[৬৬]। এরা সিন্ধুর অন্তর্গত পুক্কুর জেলার একটি ছোট শহর থেকে এসেছিল, খুব তাড়াতাড়ি তাদের জোরদার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় এবং এরা এত গুরুত্ব অর্জন করে যে ভারতীয় বলতে এদেরকেই বোঝাতে শুরু করে। খুব তাড়াতাড়ি তারা মধ্য এশিয়ার শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরের শতকে তাদের পামীর পাহাড়ের চারপাশে দেখা যেতে থাকে। মনে হয় এই শিকর পুরীরা প্রথম দিকে টাকা ধার দিত এবং ব্যাঙ্কের মালিক ছিল যদিও তারা পণ্যদ্রব্য লেনদেনের সাথেও যুক্ত ছিল।

মারোয়াড়ি আখ্যাটিও এই প্রথম পাওয়া যায়[১১]। মারোয়াড়ি বরায়েব ও রাজারাম মারোয়াড়ি নামে দুজন ব্যক্তি ইরাণে যান এবং সেখান থেকে রাশিয়া পৌঁছান। প্রথম জন যথেষ্ট সম্পদ অর্জন করেন এবং রুশী কর্তৃপক্ষ ভারতের সাথে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার সময়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করেন। রুশীরা যখন অষ্টাদশ শতকে ভারতের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনে ওরেনবার্গকে একটি কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাব চেষ্টা করেন যখন তিনি সেখানে চলে আসেন। শেষ পর্যন্ত, রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অন্যায়কারী হিসাবে বন্দী করেন। মুক্ত হওয়ার পর তিনি খ্রীষ্টান হয়ে যান। রুশ পারসিক বাণিজ্যে রাজাবাম মারোয়াড়ী সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ দিকের কাজকর্ম আমরা জানিনা।

অমুসলমানরা মুখ্যত বাণিজ্যে উৎসাহী ছিল। বুখারাতে তারা তাদের নিজস্ব সরাইখানা[৮] চালাচ্ছিল। তারা স্ব স্ব সামাজিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করত। এমন নয় যে এসব সবসময় কর্তৃপক্ষ মেনে নিতেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিত। কর্তৃপক্ষ অনুতপ্ত হয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতেন। এই বণিকদের সাথে কিছু দুঃসাহসী জুটত যারা শুধু সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে চাইত।

রুশ সাহিত্য থেকে একজন ভারতীয় ভিখারীর কথা জানা যায় যে সপ্তদশ শতকের শেষে সাইবেরিয়া যাচ্ছিল[১]। এই শ্রেণীতে বাংলার পর্যটক স্বামী প্রাণপুরী বা গিরিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় যিনি ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্মসূত্রে তিব্বত গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ভ্রমনের উদ্দেশ্যে রাশিয়া যান।

অবশ্য, ভ্রাম্যমান এই ভারতীয়দের নিয়ে সমস্যা হলো তাঁবা কেউই তাঁদের ভ্রমণকথা রেখে যান নি। তাঁদের কথা অন্যের লেখা পড়ে জানা গেছে, প্রধানত ইউরোপীয়দের বিবরণ পড়ে, অবশ্য অষ্টাদশ শতকে একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। কিছু কিছু ভারতীয় ভ্রমণকারী তাঁদের দেখা মানুষ ও স্থান সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ও পর্যবেক্ষণ লিখে রাখতে শুরু করেন। সর্বপ্রাচীন এরকম বিবরণটি হলো একজন কাশ্মীরী বণিকের যাঁর নাম রাজা আব্দুল করিম। নাদির শাহের দলে থেকে ১৭৪১ সালে ইনি ভারতে থেকে ইরাণে ফিরছিলেন। তাঁর বিবরণ ফারসিতে লেখা[৮]।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব ভারতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কলকাতা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিভূমি হয়। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতারা এরপর দুটি কাজ করে। কোম্পানী যতই মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে স্থানীয় শাসনের সাথে জড়িয়ে পড়ে তত বেশী সংখ্যায় বাঙালীদের নিম্নস্তরে শাসনবিভাগে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করতে থাকে। এর ফলে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বাঙালী বাংলা ছেড়ে কর্মোপলক্ষে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও কোম্পানী আধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলে যেতে শুরু করে। উনবিংশ শতকে বাঙালীদের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, বহির্দেশে গমনকারী ভারতীয়রা নতুন একটি দেশ গন্তব্য হিসাবে পায়। তা হলো তাদেরই ঔপনিবেশিক প্রভুদের বাসভূমি ইংল্যাণ্ড। অষ্টাদশ শতকে এই ধারাটি

ছিল ক্ষীণ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল ভারতীয় ভ্রমণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখতে শুরু করে।

এইরকম এক ব্যক্তি ছিলেন ইসামুদ্দীন যিনি ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে (১১৮০ হিজরি) ইংল্যাণ্ডে যান। দেশে ফিরে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ লেখেন **শিগর্ফ-নামা-বিলায়ৎ**[১১]। এরপর যান দীন মহম্মদ। এঁর জন্ম পাটনায় ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি ১৭৮৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের কর্কে আসেন। ইংল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই মারা যান। তাঁর গ্রন্থ **দ্য ট্রাভেল অব্ ডীন মোহ্‌মেত**[১২]। তাঁর রচনাটি সম্প্রতি পাওয়া গেলেও ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় পর্যটক মির্জা আবুতালের অষ্টাদশ শতকের শেষে রচিত তার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণবৃত্তান্তে এর উল্লেখ করেন। কিন্তু মির্জা আবু তালেব ফারসি ভাষায় লিখেছিলেন[১৩]।

এরপর থেকে অবশ্য ভারতীয়রা তাদের পরিদর্শন করা দেশগুলি সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। কখনও ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা এগুলি লেখেন। এরকম লেখার মধ্যে আছে মীর ফজলুল্লাহ রচিত **তারিখ-ই-মানাজিল-ই-বুখারা** এবং মধ্য এশিয়া সম্পর্কে মীর ঈজেত-উল্লাহ্-র বিবরণ[১৪]। সময়ের অগ্রগতির সাথে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় ভাবতীয়রা দেশের বাইরে যেতে শুরু করে এবং দেশের বাইরে ও অভ্যন্তরে ভারতীয়দেব ভ্রমণবৃত্তান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

সম্ভবত ছাপাখানার সংখ্যা বৃদ্ধি ও ইউরোপীয় ভাযার সাথে পরিচিতি এই বিশেষ শ্রেণীর রচনা প্রচুর লিখতে ভারতীয়দের উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

সূত্র নির্দেশ

(উল্লিখিত-গ্রন্থ ও অন্যান্য উল্লেখ মূলানুসারী ইংরাজীতেই রাখা হলো)

1 The exchange of scholars between Bihar and Bengal since ancient times has been repeatedly mentioned in historical literature See Sudeshna Basak **Socio-Cultural Study of A Minority Linguistic Group (Bengalees in Bihar 1858-1912)** New Delhi 1991 pp 11-15 Tapan Kumar Raychoudhuri **Bengal Under Akbar And Jahangir**. Calcutta 1953 p 15

2 The Case of Maulana Hamid bin Fazl-ul-lah, popularly known as Durwish Jamali died C 1536 A D may be cited He started his journey in 1488 and travelled to Multan Mecca Madina, Herat, Shiraz Khurasan Tabrez Baghdad, Damascus etc Mahmud Husain Siddiqui. **The Memoirs of Sufis Written in India** Baroda 1979, Ch. V Mahdi Hussain **The Rehla of Ibn Battuta**. 1976. p xxxx

3 Ibn Battuta. p 275 All Gujarati Bohras were expected to visit their Mullaji in Yemen at least once

4 Moti Chandra. **Sarthavah** (in Hindi). Patna. 1966

5 Shafaat Ahmed Khan (ed). **John Marshall in India, London, 1927, pp. 125-27, 149-56.**

6 India has been repeatedly attacked by foreign hordes since the invasion of

Darius the Iranian ruler in 516 B C to the present day The attack of Alexander the Great the Greek emperor intensified Indian contacts with the outside word Megasthenes was the envoy of the Greek ruler Seleucus to the court of the Mauryan ruler Chandragupta

7 Visits of Indians to foreign countries since the dawn of history have been noted

8 D S Richards (ed) **Islam and the Trade of Asia,** Oxford 1970 p 107 Habib and Raychoudhury (ed) **The Cambridge Economic History of India,** Vol I Delhi 1984 p 131 The Chinese maritime expeditions to the Persian Gulf had begun in 1130 A D The use of mariner's compass had been assigned to the year 1119 A D

Aldo Ricci (tr) **The Travels of Marco Polo** London 1931 When Marco Polo set sail for his home from China in 1291 he travelled to Southeast Asia India and finally left his ship on the island of Ormuz in the Persian Gulf in 1294

For Chinese expeditions to the east coast of Africa in the fifteenth century see Jacques Gernet **A History of Chinese Civilization** Cambridge 1982 pp 401-402 P C Bagchi Political Relations between Bengal and China in the Pathan period **Visva-Bharati Annals** Vol 1945 pp 46-134

9 See **Infra** f n 3

10 Major **India in the Fifteenth Century** New York 1977 p xliv It appears that the Jews had emerged as the chief carriers of goods between the orient the Islamic world and Europe after the Arabs had conquered West Asia and North Africa Bernard Lewis **The Arabs in History** London 1958 pp 88-89

11 Gernet p 375 Gole **Early Maps of India,** Delhi 1976 pp 34-35 Major op cit pp lix lxxxii lxxxix lxxx and Hudson **Europe and China,** London 1961 p 187

12 Surendra Gopal 'Indians In Central Asia 16th and 17th Centuries **Proceedings,** Indian History Congress 52nd Session, New Delhi, 1992 p 220. For Indians in Central Asia see also N B Baikova **Ro I Srednei Azii V Russko- Indiskikh Torgovykh Svyazakh.** Tashkent 1964

For Indians in the Red Sea area see Ibn Battuta p xliv. See also **Infra,** f n 33

13 Peter Mundy **The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608-1667** Vol II London, 1914 p 79-81

14 J N Sarkar, **Medieval Bihar Economy,** Calcutta, 1978, p 65

15 Surendra Gopal "Jains In Agra In The Seventeenth Century - A Study of Some Sources' **Journal of the Bihar Puravid Parishad,** Vols VII and VIII, 1983-84 pp 426-32. Idem. "The Sociological And Historical Background of Literary Activities of Jains In The Seventeenth Century".

Parisamvad (4) Jain Vidya Avam Prakrit, p 99 Idem Social Attitudes of Indian Trading Communities in the Seventeenth Century **Essays in Honour of Prof S C Sarkar** New Delhi 1976 pp 193 98 Idem The Jain Community and Akbar M N Bhattacharya (ed) Jainism and Prakrit in Ancient and Medieval India Delhi 1994 pp 421 30

16

17 Surendra Gopal **Commerce and Crafts in Gujarat,** New Delhi 1975 Chapter III pp 121 45

18 Surendra Gopal Jains in Bihar in the Seventeenth Century **Jain Journal,** 1973 p 81 J H Little **House of Jagat Seth,** Calcutta 1967 p vi Hiranand Shah the founder of the house arrived in Patna in 1652

19 Idem Jain Merchants in Eastern India under the Great Mughals Dwijendra Tripathi (ed) **Business Communities in India,** Delhi 1984 pp 69-81

20 M D Desai (ed) **Bhanucandracarita** (in Sanskrit) Ahmedabad Calcutta 1941

21 Banarasidas **Ardha Kathanak** Nathuram Premi (ed) Bombay 1970

22 Johrapurkar and Kasliwal **Veer Shasan Ke Prabhavak Acharya,** (in Hindi) New Delhi 1975

23 Kasturchand Kasliwal **Khandelwal Jain Samaj Ka Brihad Itihas** Vol I Jaipur 1989

24 Levon Khachikian The Ledger of the Merchant Hovhannes Joughayets **Journal of the Asiatic Society of Bengal,** Vol VIII No 3 1966

25 Sinnappah Arasaratnam speaks of Kannada and Komatti Chetties Konkani and Saraswat Brahmans working as merchants in port towns of Basrur Bhatkal Honavar and Mangalore on the Canara coast in the state of Karnatak today Subsequently the Konkan is penetrated southwards into Malabar

The Mapilla Muslims sailed to West Asia to Bengal and to the southeast Asia Some Tamil Brahmins and Tamil and Telugu Chettis also traded in the ports of Malabar Sinappah Arasaratham **Maritime India in the Seventeenth Century,** Delhi 1994 pp 199-204

26 Ibid pp 204-09 The Tamil Telugu and Karnatak Chettis were the chief merchants Chulia Muslims of South Coromandel traded to Southeast Asia Bengal Maldives

27 **Business Communities in India,** p 245

28 **Arasaratnam** p 202

29 **Pramukh Aitihasik Jain Purush Aur Mahilaiyen** p 285

30 N R Farooqui **Mughal-Ottoman Relations** Delhi 1989 ch Four pp 144-72 Pearson speaks of the pilgrim traffic to the Red Sea M N Pearson **Coastal Western India** Delhi 1981 p xii Ashin Das Gupta noted that About twenty Gujrati ships sailed every year from Surat to Mocha and

Jedda carrying pilgrims for the hajj as well as annual trade of much of northern and western India Ashin Das Gupta Gujarati Merchants and the Red Sea Trade 1700-1725 in Blair B Kling and M N Pearson (eds) **The Age of Partnership** Honolulu 1979 p 124

31 Farooqi p 150

32 Gujarati merchants and the Red Sea Trade 1700-1725 pp 123-158 on p 132 Ashin Das Gupta writes There were two kinds of Banias engaged in the Red Sea trade There were those who came and went every year doing their own trade and handling the business of others who remained at home in much the same manner as the Muslim merchants were wont to do Banias from lower Gujrat particularly from the cities of Surat and Cambay were of this kind Others had been long settled in Yemen and were found not only in every Yemeni city but in the port towns of Habash and Hadramaut as well Apparently Banias from Kathiawar the Kapol Banias of the peninsula were predominant among those who settled in Yemen and immigrants from the ports of Gujarat and Kathiawar continued to come to Yemen throughout the first decades of the eighteenth century The Bania merchants of the Yemeni cities and the Habash ports controlled much of the commercial life of the area but in Yemen at any rate they lived like second-class citizens

33 John Jouradain **The Journal of John Jourdain 1608-17**, Cambridge 1907 p 95

34 Ibid p 96

35 Abbe Carre **The Travels of Abbe Carre in India and the Near East 1672-1674**, vol I London 1947 pp 89 92 94

35a **Coastal Western India**, p 123

36 Even in 1549 Ormuz had a colony of Hindus and Jains who were described 'as complete vegetarians and worshippers of cows' Donald Lach **Asia in the Making of Europe**, vol I Book I Chicago 1965 p 439

37 Linschoten speaks of streets of Gujarati merchants and artisans in Goa in 1580s Linschoten **The Voyage of Johan Huyghen Van Linschoten to the East Indies**, Vol I London 1885 p 228 The Gujaratis were so well entrenched that on one occasion the Portuguese delayed the departure of the cambay fleet on their request **Coastal Western India**, p 109

38 William Foster **Early Travels in India**, New Delhi, 1985, p 11

39 See my unpublishe paper 'Indians in Iran in the Seventeenth and the Eighteenth Centuries"

40 Kotov, F A **O khodu v Persidskoye Tsartsvo v Turskyuy zemlyu i I Indiyu i v urmuz** Moskva, p 45

41 Ibid

42 Foster **The English Factories in India** (1622-23) London, p xi After

ormuz was freed from Portuguese control Gombroon renamed as Bandar Abbas became the major entry point into Iran for foreign shippers

43 R P Karkaria Akbar and the Parsis **The Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society**, vol xix (1895-97) pp 298-99

44 See **Supra** f n 43

45 Malcolm **The History of Persia**, Vol II London 1828 pp 135 144

46 Herbert who visited Iran towards the end of 1620s described non Muslim Indians as Banias Thomas Herbert **Travels In Persia 1627-29**, London 1928 pp 178 179 Herbert and Several other European visitors to Iran during the seventeenth century use this term for non-Muslim Indians

47 John Fryer **A New Account of East India and Persia Being Nine Years Travels 1672-81**, Vol II London 1912 pp 167-324 325 336-38

48 Oldberg Antonova and Lavrentshova (eds) **Russko-Indiiskiye othnoshenniya v xviiv** (hereafter cited as **R-I o. v XVII v**) Moskva 1958 doc no 12

49 Ibid doc no 15 For the next two centuries Indians continued to reside in Astrakhan and had separate quarters of their own

50 Ibid doc nos 76 141/x 143 1 203 223 For details see Surendra Gopal A Brief Note on Business organisation of Indian Merchants In The 17th Century **Journal of the Economic and Social History of Orient (JESHO)** Vol xxxix pp 205-12

51 Ibid doc no 202 The Indians continued to visit the caucasian cities throughout the eighteenth centuries See Surendra Gopal Trading Activities of Indians in Russia in the Eighteenth Century **Indian Economic and Social History Reviex, (Ieshr)**, pp 141-148

52 **R-I.o. v XVII v.**, doc no 103 He reached Moscow in 1672 and was accompanied by an agent of the Shah of Persia See also doc no 44

53 See A Brief Note on Business Organization of Indian Merchants In Russia In the 17th Century **JESHO**, xxxix pp 205-12 and Trading Activities of Indians in Russia in the Eighteenth Century **IESHR** pp 141-48

54 Indians in Central Asia 16th and 17th Centuries **Proceedings**, Indian History Congress 52nd Session 1992 pp 219-231

55 Jos Gommans Mughal India and Central Asia in the Eighteenth Century pp 51-70

56 Indians in Central Asia 16th And 17th Centuries **Proceedings** Indian History Congress pp 225 27 See also D A Kolf **'Naukar', Rajput and Sepoy, The Ethnography of the Military Labour Market in Hindustan 1450-1850**, Cambdridge 1990 pp 10-15

The exports of slaves from Bengal in the sixteenth and seventeenth centuries is mentioned by Tapan Kumar Raychoudhury pp 73-74

57 **Business Communities in India**, p 260

58 Tapan Kumar Raychoudhury writes of the presence of a colony of Bengali traders in Achin in Indonesia in 1599 Tapankumar Raychoudhury p 181 Arasaratnam Chapters 5 and 6 Arasaratnam writes about numerous Hindu and Muslim groups on the Indian coast from Cutch and Gujarat in the west to Chittagong in the east whose chief occupation was seafaring and whose services were sought by the Europeans the Portuguese the Dutch the English etc in the sixteenth and the seventeenteenth centuries Arasaratnam pp 260-60

59 **Commerce and Crafts in Gujarat** pp 12-13

60 Haraprasad Roy **Trade and Diplomacy In India-China Relations**, New Delhi 1993

61 Laurence Lockhart **The Fall of the Safavid Dynesty and the Afghan occupation of Persia**, Cambridge 1958 pp 164-65 Percy Sykes **A History of Persia**, Vol II p 233

62 Brydgees **The Dynasty of The Kajars**, London 1833 p XCIX

63 Gommans **loc.cit.**, p 57

64 **Supra**, f n 44

65 Francklin who visited Shiraz in 1787 found a caravanserai exclusively meant for the residence of Indians William Francklin **Observations Made on A Tour From Bengal to Persia**, Calcutta 1788 p 59

66 George Forster **A Journey From Bengal to England**, Vol II Patiala 1970 p 292 Forster undertook this journey towards the end of the eighteenth century

67 Malcolm II p 127

68 Iqbal Ahmad Memon Shikarpur the Eighteenth Century Commercial Emporium of Asia M Yaqub (ed) **Studies on Sindh**, Jamshoro 1988 p 99 There are numerous refrences to the presence of Shikarpuri Hindus in Iranian and Central Asian cities throughout the nineteenth century Their presence was so visible that they became synonymous with Indians as the terms Multanis and the Multanis and the Banias were in the seventeenth and the eighteenth centuries

69 Antonova and Goldberg (ed) **Russko-Indiiskiye otnoshenia v XVIII v.** Moskva 1965 doc nos 72 74 75

70 **Puteshestviya Rafaila Banibegashvili v Indiyu, Birmu i Drugiye Strany Azii 1795-1827**, Moskva 1969. P M Shastitko (ed). **Rossiskiye Puteshestvenniki v Indii XIX - nachalo XX v.**Moskva, 1990, Mir Izzet Ullh "Travels beyond the Himalaya" **Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal** Vol VII p 323-24 326

71 'See the following articles (i) A.A Akhmedov and P G Bulgakov

Srednea/iatskoc - indiiskive svla/i v oblasti tochnykh nauk' (ii) K M Muniros K istorii nauchnykh i kulturnykh svva/ei Srednei A/ii i Indii in Khairullaev Khasimov et al (eds) **Is Istorii Kulturnikh Svva/ei Narodov Srednei A/ii i Indii** Tashkent 1986

72 Mir I//et Ullah Travels Beyond The Himalaya **Journal of The Royal Asiatic Society Bengal,** Vol VII p 335

73 I V Lapteva and M P Lukichev Documents of the USSR State Archive of Ancient Acts Pertaining to the History of Russian - Indian Relations **Proceedings,** Indians Historical Records Commission Vol III Srinagar October 1988 p 53 His name was Pandu and he was permitted to visit the cities of Toblosk Yeniseisk and Irkutsk during 1681-1683

74 Francis Gladuri (tr) **The Memoirs of Khojeh Afdulkurrem,** Calcutta 1987 He travelled to West Asia and went on a pilgrimage to the holy city of Mecca

75 The book was written in 1766 Its date of publication is not known though Beals **Oriental Biographical Dictionary** speaks of an English translation p 186

76 The author died in 1851 at the age of 92 **The Times of India** (Patna) 23 Sept 1995 His work is referred to by Mirza Abu Talib who met him during his visit to the U K in the 1790's Charles Stuart (tr) **Travels of Mirza Abu Talib Khan,** New Delhi 1972 p 46

77 Ibid The English translation was first published in 1874

78 Hafiz Muhammed Fazil Khan **Tarikh-i-Manezil-i-Bukhara** Srinagar 1981 Mir Izzet Ullah Travels beyond the Himalaya **Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal** Vol VII

সতেরশ' সাতান্ন

'আধুনিক ভারত' বিভাগে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৯৫

রজতকান্ত রায়

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!
—সুকুমার রায়, 'ছায়াবাজি'

১

অনেক কাল আগেকার কথা। এ দেশে তখন স্বদেশ প্রেমের হাওয়া বইছে। সেই স্বদেশীর যুগে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বাঙালী ও ইংরাজের মধ্যে একটা তর্কাতর্কি হয়েছিল। একদিকে ছিলেন বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। ১৮৯৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ্‌র জীবনী নিয়ে তিনি এক তথ্যনিষ্ঠ গবেষণানির্ভর বই রচনা করলেন। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সাড়া পড়ে গেল। অপরদিকে ইংরাজরাও চুপ রইলেন না। লর্ড কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত মহাফেজখানার অধিকর্তা ছিলেন এস. সি. হিল। ১৯০৫ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল সহ সুবিপুল গ্রন্থ রচনা করে ঐতিহাসিক সমাজকে তিনি চিরঋণী করে ফেললেন। দু'দলে যে তর্ক বাধল তার মধ্যে একটা বিতর্কিত বিষয় আজকের দিনে একটু কৌতুক উদ্রেক করবে। তর্ক উঠল, কে 'শান্তিপ্রিয়'? সিরাজ না ইংরাজ? ইংরেজ সাহেবরা বললেন, নবাবই মিছিমিছি তেড়ে ঝগড়া করতে এসেছিলেন। বাঙালী ভদ্রলোকেরা বললেন, মোটেই না, নবাব প্রাণপণে শান্তিরক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

আজকের দিনে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ডবলিউ সি. ব্যানার্জী বা রাজা রামমোহন রায়কে টপকে একেবারে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে হাতড়ে বেড়ানো হয়, তখন ঐতিহাসিকরা সঙ্গত কারণেই সিরাজ শান্তিকামী ছিলেন কি না এ প্রশ্ন নিয়ে আর মাথা ঘামান না। কারণ প্রশ্নটা পুরনো হয়ে গেছে। দেশ আজ স্বাধীন — প্রশ্নটার কোনো মানে নেই আর। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে কেন, কিভাবে সংগ্রাম করেছিলেন, জনসমাজ ও ঐতিহাসিক মহল তাই নিয়ে ভাবিত। নবাব 'শান্তিপ্রিয়' ছিলেন কি না এ নিয়ে নিতান্ত প্রাচীনপন্থী না হলে কেউ

আর বড় একটা বিচলিত হন না। তবে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। সর্বাধিক প্রচলিত বাংলা দৈনিকে একজন মধ্যযুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে সম্প্রতি বলেছেন, ইংরেজরাই শান্তিভঙ্গকারী। তাঁর বক্তব্য মীরজাফরের এক বংশধরের সঙ্গে মিলে যায় ঃ মীরজাফর আসল ষড়যন্ত্রী নন। ইংরেজরাই যতো নষ্টের গোড়া।

'ইসলামিক হিস্ট্রী অ্যান্ড কালচার'-এর অধ্যাপক ডক্টর সুশীল চৌধুরী (উক্ত সমালোচক) অন্যত্র বলছেন, "ওল্ড থীম্স্ (ইন প্লেস অফ হ্যাবিট্স্!) ডাই হার্ড।"[২] মৈত্রেয় মহাশয়ের মতো তিনিও হিল সাহেবের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রমাণ করেছেন, সিরাজউদ্দৌলাহ্ অনর্থক লড়াই করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে তিনি কোথায় ছাড়িয়ে গেছেন, সে কথাও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। সিরাজকে আগেকার কালে যাঁরা সমর্থন করতেন, সেই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত (ডঃ চৌধুরীর লেখাতে এঁরা একই পংক্তিভুক্ত) ছিলেন 'নন-প্রোফেশনাল' (মৈত্রেয় মহাশয় সুশীলবাবুর মতো চাকুরীজীবী ঐতিহাসিক ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর ইতিহাস কি নাটক পর্যায়ের রচনা?)। এবং ওঁদের লেখায় ছিল 'টু মাচ্ ন্যাশনালিস্টিক ফ্লেভার'।[২]

সুশীলবাবুর নিজের লেখা যে ও রকম প্রাচীনপন্থী নয় এবং তাতে যে 'নতুন ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখা গেছে', বাংলা খবরের কাগজের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের দৃষ্টি তিনি সেই দিকে আকর্ষণ করেছেন।*[২] অতএব 'ওল্ড থীম্স্' বা 'ওল্ড হ্যাবিট্স্' সহজে মরে না, এ কথা তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন এমন মনে করার কারণ নেই। তিনি সে প্রকৃতির লোক নন। শুধু প্রাচীনপন্থীদের সম্বন্ধে নয়, পলাশীর সমস্ত বর্তমান ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য করেই তিনি এ কথা বলেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় এঁরা সকলে হিলসাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এঁদের নামের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছেন তাতে রয়েছেন ব্রিজেন গুপ্ত, পিটার মার্শাল, ক্রিস বেইলি এবং বর্তমান লেখক। হিল সাহেবের সঙ্গে বা এঁদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ আছে কি না সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা এই যে, এই পদাঙ্কনুসারীরা আজো সিরাজের মানহানির চক্রান্তে লিপ্ত। কার্জন প্রবর্ত্তিত এই বিরামহীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন ডক্টর সুশীল চৌধুরী। তাঁর মতে, সিরাজ ছিলেন 'ধনরত্নের প্রতি আসক্তিহীন' (সিরাজ হ্যাড রিয়ালি নো লাস্ট ফর মানি) এবং 'মানবতামণ্ডিত' (হি ওয়াজ কোয়াইট হিউমেন)।

তাঁর এই গবেষণা নতুন কি না সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অন্যদের মতভেদ হতে পারে, কিন্তু এতদিন বাদে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে তিনি যে আজকের দিনে এক ও অনন্য সে কথা স্বীকার করতে হবে। নতুন হোক বা না হোক, 'ন্যাশনালিস্টিক' মৈত্রেয় মহাশয়ের মতো প্রাচীনপন্থীর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলতে পারে না। বরং সিরাজ শান্তিকামী, এই মতাবলম্বীকে প্রাক্তনপন্থী বলে চিহ্নিত করাই একালে আরো সঠিক বলে মনে হয়। যা প্রাচীন তা সনাতন হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। যা প্রাক্তন তা ভূত হয়ে যায়। সুশীলবাবু যাই বলুন, ব্রিজেনবাবু, মার্শাল সাহেব, ক্রিস বেইলি বা আমি ঐ 'শান্তিপ্রিয়' না 'জঙ্গিবাজ' তর্কের মধ্যে নেই, তিনি আমাদের জোর করে টেনে নিয়ে

গেলেও নয়। তিনিই স্বদেশী যুগের হিরণ্যাশিপু দানব এস সি হিলের সঙ্গে একক সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং যেহেতু দানো মরে গেছে একথা অনস্বীকার্য তাই থেকে থেকে বলে উঠছেন, দানোটা ভূত হয়ে আজো বেঁচে আছে -- কখনো সে ব্রিজেন গুপ্ত, কখনো বা পি জে মার্শাল, কখনো বা ডক্টর বেইলি, কখনো এই লেখক। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ফ্রম প্রসপারিটি টু ডিক্লাইন ঃ এইটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল' (নিউ দিল্লী, ১৯৯৫) নামক বইয়ে তিনি সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন যে হিলের ভূতটা এখনো জলজ্যান্তো আছে ('দ্য ঘোস্ট অফ হিল ইজ্ ভেরি মাচ অ্যালাইভ') এবং ফুটনোটে নির্দেশ করেছেন যে ঐ অশরীরী আত্মাটা বিশেষ করে পিটার মার্শাল ও রজতকান্ত রায়ের স্কন্ধে ভর করেছে -- পৃঃ ৩০৭)। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, সে হিল সাহেবও নেই, সেই মৈত্রেয় মহাশয়ও নেই। আছেন শুধু ডক্টর সুশীল চৌধুরী। আর আছে ভূতপূর্ব, অধুনা এক তরফা তর্ক -- ইংরাজীতে যাকে বলে শ্যাডো - বক্সিং, বাংলায় 'ছায়াবাজি'। সকলে জানেন সে রাম ও নেই, সে রাবণও নেই -- আছেন হনুমান। হনুমানের রামভক্তি প্রাচীন, শাশ্বত, সনাতন বস্তু। সুশীলবাবুর সিরাজভক্তিকে সেই পর্যায়ে গণ্য করলে প্রাচীন ও প্রাক্তনের ভেদ ঘুচে যায় এবং তাতে হনুমানের প্রতি অবিচার করা হয়। সুশীলবাবুর লেখায় ভুল তথ্য ও জাল প্রমাণের ব্যাপারটা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জার্নাল 'মর্ডান এশিয়ান স্টাডিজ' এ প্রকাশ করে দিয়েছেন ডক্টর ওম প্রকাশ।

কেউ যেন না ভাবেন, এই ওম প্রকাশ একটা মারমুখো লোক। যতো দূর জানি, লোকটি নিরীহ। এমন কি, লোকটি পদাঙ্কনুসারীও নয়। সিরাজ ভালো না মন্দ সে বিষয়ে তাঁর কোন বক্তব্য নেই। তবে সে কালের বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর এবং ডক্টর কে এন চৌধুরীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে, ঐতিহাসিক মহল যা শ্রদ্ধাসহকারে বিবেচনা করেন। সুশীলবাবুও মূলত সেকালের বাণিজ্যের ঐতিহাসিক, এ গবেষণায় তিনি ডঃ কে এন. চৌধুরীর কাছে গবেষণা করে ডক্টরেট লাভ করেন। কে. এন. চৌধুরীর 'সুপারভিশনে' রচিত সেই গবেষণা গ্রন্থটিতে নতুন তত্ত্ব থাকুক বা না থাকুক, তথ্য অনেক আছে। কিন্তু সুশীলবাবু নিজের গন্ডিতে ফিরে যাবার পর সেই গণ্ডির কাছাকাছি যাঁরা অবস্থান করেন -- অর্থাৎ যাঁরা অষ্টাদশ শতকের বাণিজ্য বা সিরাজ-ইংরাজ তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করতে যান -- তাঁরা প্রায় সকলেই আক্রান্ত হয়েছেন।

কেম্ব্রিজ কর্তৃক প্রকাশিত উপরোক্ত জার্নালে সুশীলবাবু ওমপ্রকাশ ও কে. এন. চৌধুরীর ভুল ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কে. এন. চৌধুরী শিষ্যের আক্রমণ উপেক্ষা করলেও ওম প্রকাশ ঐ পত্রিকাতেই প্রত্যুত্তরে সুশীলবাবুকে বেকায়দায় ফেললেন। শক্ত ঠাঁইতে প্রতিহত হয়ে সুশীলবাবু ঐ একই সূত্র ধরে ব্যাপারটা ইংরাজ-সিরাজ সংবাদে টেনে নিয়ে যাঁরা বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাসের চর্চা করেন তাঁদের দিকে নজর দিলেন। অতএব ঐ বাণিজ্যের বিতর্ক ও পলাশী বিতর্ক দুটো আলাদা হলেও এ দুটোর মধ্যে কিছু সম্পর্ক আছে, অন্তত সুশীলবাবু একটা সম্পর্ক খাড়া করেছেন। তাই ওম প্রকাশ বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন্ জাল প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন, পলাশীর খবর করতে গিয়ে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সুশীলবাবু বলতে গিয়েছিলেন যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলায় ইওরোপীয় কোম্পানীগুলির বাণিজ্য বিস্তার দেশীয় বণিকদের সুবিপুল বাণিজ্যের তুলনায় তেমন কিছু ব্যাপার নয়। ওম প্রকাশ এবং সেই সঙ্গে সুশীলবাবুর ভূতপূর্ব গুরু কে. এন. চৌধুরী এ ব্যাপারটা বড্ডো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছেন। আসল তথ্য এই যে, ইওরোপীয় কোম্পানীদের তুলনায় এশিয়ান সওদাগররা অনেক অনেক বেশী কাপড় বাংলা থেকে রপ্তানী করত। আর তার একটা অকাট্য প্রমাণ হল এই যে, তৎকালীন ডাচ কোম্পানীর ডিরেক্টর টেলফার্ট স্বয়ং হিসেব কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ওলন্দাজদের বাদ দিয়ে তখনকার দিনে বাংলা থেকে ৭৬ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি হতো এবং তার মধ্যে এশিয়ান সওদাগররা অন্তত ৪৫-৫০ লক্ষ এবং ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী বড় জোর ২৫-৩০ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি করত।[৮]

ডক্টর ওমপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ ঐ পত্রিকায় দেখিয়ে দিলেন' — (১) টেলফার্ট শুধু মোট ৭৬ লক্ষ টাকার অঙ্কটা উল্লেখ করেছিলেন। বাকি টুকু অর্থাৎ এশিয়ান বণিক ও ইংরেজ-ফরাসী কোম্পানীর অংশ ভাগের হিসেব সুশীলবাবুর নিজের উদ্ভাবন, (২) টেলফার্ট ঐ জাল অঙ্ক (৭৬ লক্ষ টাকা) উল্লেখ করে একটা জালিয়াতির মতলবে ছিলেন এবং (৩) ইওরোপীয়দের বাণিজ্যের পরিমাণ যথার্থ হিসেব করলে টেলফার্টের অঙ্ক অনুযায়ী এশীয় বণিকদের খাতে আর প্রায় কিছুই থাকে না — অঙ্ক তখন নিম্নরূপ আকার ধারণ করে —

ইওরোপীয় — ৫৫-৬০ লক্ষ টাকা
এশীয় — ১৫-২০ লক্ষ টাকা

ওমপ্রকাশ প্রকাবান্তরে আরো একটা কথা প্রকাশ করে দিলেন। তাহল এই যে জাল প্রমাণের মধ্যেও কিছু স্তরভেদ আছে। এক. জালিয়াতের কথা বিশ্বাস করে ফাঁদে পড়ে যাওয়া — সেটা নির্বুদ্ধিতা, বা ভালো চোখে দেখতে গেলে, ভালোমানুষি। দ্বিতীয়, জালিয়াতের সাক্ষ্য থেকে কিছু সাবধান বাণী বাদ দিয়ে (জালিয়াতরা অঙ্ক উল্লেখের সময় নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য মৃদুভাবে একটু সাবধান থাকতে বলে), সেই প্রমাণ দরকার মতো আংশিকভাবে পেশ করা অথবা প্রমাণ পেশের সময় জালিয়াতের সাবধান বাণী উল্লেখ করতে ভুলে যাওয়া। এটা ভুলো মানুষির পরিচয়, তবে নিন্দুকে এটা ভালোমানুষি বলে স্বীকার নাও করতে পারে।

সে কালে ভারতে ইওরোপীয় কোম্পানীগুলির বাণিজ্যের ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা এখন জেনে গেছেন যে ভারতে নিযুক্ত সাহেব কর্মচারীরা সাগর পারে কোম্পানীর বড়কর্তাদের কাছে ঝুরি ঝুরি জাল অঙ্ক ও মিথ্যা খবর পাঠাতেন। কারণ, তাঁরা গোপনে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, যা মূলত কোম্পানীকে ঠকিয়ে চালানো হত। কেন কোম্পানীর বাণিজ্যে ক্ষতি হচ্ছে এবং যথেষ্ঠ পরিমাণ ভালো কাপড় যোগাড় হচ্ছে না, এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে টেলফার্ট সাহেবও হল্যান্ডে মনিবদের কাছে সাফাই গাইছিলেন। কৈফিয়ৎ খানা এই যে ডাচ কোম্পানীর প্রতিযোগীরা সবাই এতো কাপড়

কিনছে যে ওলন্দাজরা আর যথেষ্ঠ কাপড় কিনে উঠতে পারছে না। টেলফার্ট এই হিসেব দাখিল করেছিলেন খুব সাবধানে, যাতে ধরা না পড়েন —

'এমন অনেক বছর গেছে যখন কাপড় কিনবার জন্য (ওলন্দাজ) কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলি, আর্মানী বণিকবৃন্দ ও অপরাপর বণিকরা ৬০ লক্ষ টাকার অগ্রিম দিয়েছে। আর যদি ১৬ই জুন ১৭৪১-এ গৃহীত হুগলীর রেজলিউশন বিশ্বাস করা যায় — আমি অবশ্য বলছি না বিশ্বাস করা যায় — তবে বাংলার বিভিন্ন তাঁতকেন্দ্রে কাপড় কেনার জন্য ৭৬ লক্ষ টাকার ওপর পাঠানো হয়েছে।'

এই বাক্য থেকে দুটো বিকল্প হিসেব পাওয়া গেল। হুগলীতে গৃহীত প্রস্তাবনুযায়ী, ওলন্দাজ কোম্পানী বাদে আর সবাই ৭৬ লক্ষ টাকার কাপড় কিনে রপ্তানি করেছে। টেলফার্ট চান, মনিবদের যেন একথা বিশ্বাস হয়। তবে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হবার ভয়ে তিনি এই অঙ্কটাকে (৭৬ লক্ষ) সার্টিফিকেট দিতে পারছেন না। আর মনিবরা যদি নেহাতই অবিশ্বাস করেন, তবে তাঁরা এটুকু সন্দেহই না করে মেনে নিন যে প্রতিপক্ষরা অন্তত ৬০ লক্ষ টাকার কাপড় কিনে রপ্তানি করে টেলফার্টকে হয়রান করেছে (টেলফার্ট ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা গোপনে নিজেদের খাতে কত কাপড় চালান করেছেন সেটা সম্পূর্ণ উহ্য)।

ঐ একটাই বাক্য — ওমপ্রকাশ চিঠি থেকে পুরোটা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। গবেষণার সময় সুশীলবাবু ও নিশ্চয় পুরোটা পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন — অবশ্য ওলন্দাজ ভাষা যদি তাঁর কাছে পুরোপুরি 'ডাচ' না হয়ে থাকে। ওমপ্রকাশ ও অন্য ঐতিহাসিকদের কড়া কড়া কথা শোনাবার সময় তিনি কিন্তু শুধু ঐ ৭৬ লক্ষ টাকার অঙ্ক দাখিল করেছেন। ঘৃণাক্ষরেও ৬০ লক্ষ টাকার অঙ্ক তাঁর কোনো লেখায় পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও সূত্র সেই টেলফার্টের চিঠি। টেলফার্টের কথা বিশ্বাস করেছেন — এটা তাঁর ভালোমানুষি। আর টেলফার্টের হিসেব থেকে বিকল্প অঙ্কটি বাদ দিয়েছেন, এটা তাঁর ভুলো মানুষি।

সে যাই হোক, ৭৬ লক্ষ টাকার অঙ্কটা ওমপ্রকাশ তর্কের খাতিরে মেনে নিলেন। কিন্তু টেলফার্টের চিঠি থেকে ঐ টাকার মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর খাতে কত টাকা এবং এশীয় বণিকদের খাতে কত টাকা লগ্নি ছিল তা কিছুই পাওয়া গেল না। বোঝা গেল হিসেবটা সুশীলবাবু নিজেই কষেছেন। ওমপ্রকাশ হিসেব করে দেখালেন ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর খাতেই রপ্তানির জন্য ৪০ লক্ষ টাকার মতো কাপড় কেনা হতো এবং এছাড়াও দিনেমার ইত্যাদি ছোটো-খাটো ইওরোপীয় কোম্পানী ও ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রাইভেট ট্রেডাররা ছিল (ডাচ কোম্পানী বাদে), যাদের হিসেব রাখতে সুশীলবাবু বেমালুম ভুলে গেছেন। ওলন্দাজ কোম্পানী বাদ দিয়ে ইওরোপ থেকে আগত আর সবাইকে ধরলে হিসেব ৫৫-৬০ লক্ষ টাকার অঙ্কে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে এশিয়ার বণিকদের খাতে রইল বাকি মাত্র ১৫-২০ লক্ষ টাকার কাপড় — অবশ্য এ হিসেব পুরোটাই অনর্থক।

এই প্রসঙ্গে সুশীলবাবুর আরো একটা বক্তব্য ছিল এই যে, দেশীয় ও আর্মানী বণিকরাই প্রধানত টাকাপয়সা ও সোনারূপা আমদানি করত, বিদেশী কোম্পানীগুলি নয়। এ-বিষয়ে কোম্পানীগুলির ভূমিকা ওমপ্রকাশ ও কে এন. চৌধুরী বাড়িয়ে বলেছেন। কারণ দেশীয় ও আর্মানী বণিকবাই বেশী পরিমাণে কাপড় ইত্যাদি রপ্তানি করত, আর সেই কাপড় কেনার জন্য তাবাই অধিকতর সোনারূপা আমদানি কবত। এখন, কারা বেশী কাপড় বপ্তানি কবত এই তর্কে সুশীলবাবু যেহেতু ওমপ্রকাশের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নি, অতএব ঐ সূত্র ধরে দেশী বণিকেরা অধিকতব সোনারূপা আমদানি করত তাঁর এই যুক্তিও কাটা পড়েছে।

কিন্তু অতো যুক্তি-তর্কের মধ্যে না গিয়ে সহজ তথ্যগুলো দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এ কথা না হয় ধরেই নেওয়া গেল যে দেশী বণিকরাই বেশী কাপড় রপ্তানি করত। কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, অষ্টাদশ শতকে তারাই বেশী রূপা আমদানি করত। এ কথা সুবিদিত যে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় প্রধানত ইওরোপীয় কোম্পানীগুলিই বাংলায় রূপা আনত, কাবণ তারা এদেশে নিজেদের দেশের জিনিস চেষ্টা করেও ভালো বেচতে পাবত না। অন্যদিকে দেশীয় বণিকরা সন্ধানসুলুক জানতো — কি করে রূপা আমদানি না করেও জিনিসের বদলে জিনিস বেচা যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে বাংলাদেশ থেকে কাপড়, রেশম ইত্যাদি রপ্তানির বিনিময়ে যা আসত, তা হল প্রধানত, নানা রকমের ধাতু, তুলা, তামাক, গোলমরিচ, হাতি, হাতির দাঁত ইত্যাদি। এগুলো প্রধানত দেশীয় বণিকরা আমদানি করতেন। আর বিদেশীরা প্রধানত সোনারূপা আনতেন, যা তাদের কাছ থেকে জগৎশেঠ কিনে নিতেন। বাংলার বাণিজ্যের এই কাঠামো সুপরিজ্ঞাত।

যদি পাঠক অধীর হয়ে জানতে চান পলাশীর সঙ্গে এ সবের কি সম্পর্ক, তাহলে বলতে হয়, সুশীলবাবুই এরকম একটা সূত্র ধরে টানা হেঁচড়া করছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যই হল সব ঐতিহাসিককে কাছির এক টানে কুপোকাৎ করে ফেলা। কথাটা তিনি কিভাবে পেড়েছেন তা খুলে বললে পাঠকদের ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে।

তাঁর 'প্রতিপক্ষ'রা বলেছেন, ইওরোপীয় কোম্পানীগুলো সোনারূপা আমদানি করে বাণিজ্যের বড় অংশীদার হয়ে ওঠায় দেশী বণিকরা ব্যবসাসূত্রে তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সেজন্য ইংরেজরা সিরাজ কর্তৃক বিতাড়িত হবার পর দেশী বণিকরা ষড়যন্ত্রে যোগ দিযে সিরাজের পতন ঘটিয়েছিল। কিন্তু সুশীলবাবুব মতে, কোম্পানীগুলি মোটেই বাণিজ্যের বড় অংশীদার ছিল না, অতএব, দেশী বণিকবা মোটেই ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল ছিল না এবং সোনারূপা আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে তাদের ষড়যন্ত্রে যোগদানেরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। ওমপ্রকাশ কর্তৃক তাঁর প্রমাণাদি খণ্ডিত হয়ে যাবার পরেও তিনি ঢাকায় একই প্রমাণ পেশ করে বলেছেন দেশী বণিকরাই অধিক সোনা, রূপা আমদানী করত।[৬] তর্কের খাতিরে তাঁর যুক্তি মেনে নিলেও কি এটা প্রমাণিত হয় যে ইংরেজরা বিতাড়িত হবার পর বড় বড় দেশী বণিকরা এবিষয়ে নিরুৎসুক ছিলেন? তা যে প্রমাণ হয় না সুশীলবাবুও সেটা প্রকারান্তরে স্বীকার

করেছেন। বড় বড় দেশী বণিকদেব কারবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কোম্পানীগুলির সঙ্গে লেনদেন। এই দু'পক্ষ বাংলার বাণিজ্য জগতে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। 'অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিল' এ কথাটা আমার বানানো নয়। সুশীলবাবুর নিজের কথা। বহুদিন আগে তিনি একটা হক্ কথা বলেছিলেন ঃ 'এই সব বড় বড় বণিকদের ভাগ্য ইওরোপীয়ান বাণিজ্য কোম্পানীগুলির ভাগ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছিল।'[৭]

'ছায়াবাজি'ব একটা বড় বিপদ হল এই যে ছায়ার সঙ্গে ছায়া গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজ' ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝত ঃ 'পাৎলা ছায়া ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো'। সুশীলবাবু ছায়ার সঙ্গে ছায়া গুলিয়ে ফেলে একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলছেন, ইংরেজদের সঙ্গে বড় বড় সওদাগরদের প্রাক্-পলাশী যোগসাজসে তত্ত্ব হল কেম্ব্রিজের 'কোলাবোরেশন' থিসীসের ছায়া ঃ 'In short, the favourite collaboration thesis, with the emphasis now that the initiative came from the Indian side, conveniently reduces the role of the British in the Plassey conspiracy.'[৮] এককালীন কেম্ব্রিজের কোলাবোরেশন থিসীস ছিল এই যে, ভাবতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যাঁরা লড়াই করেছিলেন সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ইত্যাদি জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ আসলে ওঁরা কোলাবোরেটার। এ হল একটা থিসীস — এর ক্ষেত্র হল উনিশ শতকের ভারত ও স্বাধীনতা সংগ্রামেব গোড়াপত্তন। এর সঙ্গে কি ঐ অন্য থিসীস — অষ্টাদশ শতকের বাংলার বাণিজ্য ও রাজনীতিতে কোম্পানী ও সওদাগরদের পারস্পরিক নির্ভরতা — এক হল? দুটোর বিষয়, ক্ষেত্র, নিহিত অর্থ কি এক? এ কথা সবাই জানে যে সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বাল গঙ্গাধর তিলক ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাই কেউ যদি বলে তাঁরা আসলে ইংরেজদের সহযোগী, তাহলে লোকের পিলে চমকে যায়, আর সেটা একটা চমকপ্রদ 'থিসীস' বলে চিহ্নিত করার কারণ ও যুক্তি থাকে। আবার এ কথাও সবাই জানে যে জগৎশেঠ, আমীরচন্দ (সুশীলবাবুর ভাষায় উমিচাঁদ) ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল, তাই কেউ যদি বলে তাঁরা আসলে কোলাবোরেটার বা সহযোগী, তাহলে কি লোকের পিলে চমকে যাবে? এবং সেটা একটা 'থিসীস' বলে চিহ্নিত করে ঐ অন্য থিসীসের অন্তর্গত করে দেওয়া যাবে? না যদি যায়, তাহলে 'ছায়াবাজি'র যেসব সমস্যা ছায়াবাজ বুঝিয়ে বলেছিল সে সম্বন্ধে সুশীলবাবুর অবহিত থাকা দরকার সম্যকভাবে। ছায়াবাজ বলেছিল ঃ

ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জানো না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি!

রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া আলাদা আলাদা ছায়া, এ সব ছায়া ধামায় চেপে ধরতে যাবার সময় সেগুলি গুলিয়ে ফেললে পুঁজি নষ্ট হয়। এখন সুরেন বাঁড়ুজ্যে কোলাবোরেটার এবং জগৎশেঠ কোলাবোরেটার, এ দুটো তত্ত্ব বা তথ্যের মধ্যে কোন্‌টা রোদের ছায়া আর কোনটা চাঁদের, তা সুশীলবাবু ঠিক করুন, কিন্তু ধামায় পোরার সময় যেন

সতর্কভাবে লেবেলটা লাগিয়ে রাখেন কোন্‌টা কি। কারণ সুরেন বাড়ুজো কোলাবোরেটার আর জগৎশেঠ কোলাবোরেটার, এ দুটো এক পর্যায়ের কথা নয়।

২

ছায়াবাজি খেলার সব কিছু কিন্তু ছায়াবাজি নাও হতে পারে। চৌধুরী মশায় ছন্দ ধরতে ধরতে আমার সম্বন্ধে যে কয়েকটা কথা বলে নিয়েছেন, তাতে কেমন একটা ব্যক্তিগত আক্রমণের ছোঁয়াচ আছে। 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' নামে আমার বইয়েব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ 'চোখ কান বন্ধ রেখে ইতিহাস চর্চা হয় না। .... লেখক যে চোক কান বন্ধ করে ছিলেন তার প্রমাণ, সাম্প্রতিক গবেষণার পলাশীর যে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখা গেছে (সভাপতির ভাষণ, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, মধ্যযুগ, ১৯৮৯, ইণ্ডিয়ান হিস্টারিকাল রিভিউ, জুলাই ১৯৮৬— জানুয়ারী ১৯৮৭) সে সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নীরব। এই নতুন বক্তব্য খণ্ডন, বর্জন বা গ্রহণ করাব কোনও প্রচেষ্টাই তাঁব নেই। সাধারণ ভাবে এ বক্তব্য হল - ইংবেজরাই পলাশীব মূল ষড়যন্ত্রকারী। ইংবেজদেব নেতৃত্বেই পলাশীর ষড়যন্ত্র পূর্ণ অবয়ব পেয়েছিল এবং তাদের কার্যকবী অংশ ছাড়া এ চক্রান্ত পবিপূর্ণ রূপ নিয়ে নবাবেব পতন ঘটাতে পারত না।'

পাঠকের মনে কৌতূহল হতে পারে যে কে এই সভাপতি যাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় নতুন ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখা গেছে এবং যাঁর ভাষণ ও লিখনেব দিকে আমার চোখ কান এমন বিশ্রীভাবে বন্ধ ছিল। সুশীলবাবু নামটি বিনয়বশত প্রকাশ করেন নি। অতএব পরিচয় কবিয়ে দিই, এই স্বেচ্ছায় আত্মগোপনকারী সভাপতি ডক্টর সুশীল চৌধুরী স্বযং। 'নতুন বক্তব্য' সম্বন্ধে আমার যে রহস্যজনক নীরবতা তাঁর ক্ষোভ ও উষ্মার উদ্রেক করেছে, তার একটা সহজ কারণ আছে। ঐ বক্তব্য যে নতুন সেটা আমি ধরতে পারি নি।

সভাপতির ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে চৌধুরী মশায় কয়েক বছর ফার্সি শেখার চেষ্টা করে ছেড়ে দেন এবং বুঝতে পারেন যে ইওরোপীয় কোম্পানীগুলিব দলিলপত্রই তাঁর প্রকল্পিত বাণিজ্যিক ইতিহাসের পক্ষে সর্বোপযোগী। তাঁব আরো বোধোদয় হয় যে ফার্সি ইতিহাসগুলি ইংরেজ মনিবদের আদেশে লিখিত বিকৃত ইতিহাস এবং এগুলির ওপর নির্ভর করে সিরাজের ইতিহাস লেখা যাবে না। তবে কি থেকে লেখা যাবে — কোম্পানীর কাগজপত্র থেকে কি না — এ ব্যাপারে তিনি সতর্কভাবে নীরব। কারণ ইদানীংকালে ঐতিহাসিকরা জেনে গেছেন যে ঐ সব কাগজপত্র যে শুধু জাল করা হতো তাই নয়, তা থেকে ইতিহাসের যে দৃষ্টিকোণটি ধরা পড়ে তা হল 'ইউরো-সেন্ট্রিক'। ঐ উপাদান দিয়ে দেশীয় সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

ইসলামিক হিস্ট্রী ও কালচারের ঐতিহাসিকরা জানেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দেশীয় ফার্সি ঐতিহাসিক 'সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন্‌' রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান

তাবতাবাঈ। তাঁর ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান ঐতিহাসিকগণ দেশীয় সমাজের অভ্যন্তর থেকে বাংলার ওমরাও মহলের প্রকৃতি, সিরাজের চরিত্র, পলাশীর যুদ্ধে বিভিন্ন ওমরাও দলগুলির অবস্থান এবং দেশীয় সমাজের ওপর পলাশীর পরাজয়ের ভয়ঙ্কর প্রভাব নির্ণয় করতে অগ্রসর হন। দাদাভাই নওরোজী ও রমেশ চন্দ্র দত্তের অন্তত একশো বছর আগে তিনিই প্রথম ইংরাজ কর্তৃক বাংলা থেকে ধন-নিষ্কাশন তত্ত্ব ('ড্রেন থিয়োরী') বিশ্লেষণ করে দেখান কিভাবে দেশীয় সমাজ তাঁর চোখের সামনে তছনছ হয়ে যায়। তিনি সিরাজকেও ছেড়ে কথা বলেন নি, 'সিয়ারে মুতাখ্খিরীন' এ নবাব চরিত্রের দোষগুলো স্পষ্ট দেখানো আছে। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতো আমিও দেশীয় দৃষ্টিকোণটি ধরবার জন্য 'সিয়ার' ও অন্যান্য ফার্সি ইতিহাসের ওপর নির্ভর করেছি — অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে। সুশীলবাবু যখন সিরাজের পক্ষ ধরে বলেন এসব ফার্সি ইতিহাস 'মহামান্য ইংরাজ বাহাদুরের' পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ধামাধরাদের লেখা, তখন মনে প্রশ্ন জাগে, অষ্টাদশ শতকের ফার্সি বুদ্ধিজীবীদের জগৎ সম্বন্ধে তিনি চোখ কান কতটা খোলা রেখেছেন? শুধু তো ঐতিহাসিক শিরোমণি গোলাম হোসেন খান নন, অখ্যাত ফার্সি লেখকরাও কেউ কেউ ছিলেন যাঁদের হাতে 'ধামা' চাপিয়ে সুশীলবাবু এই সন্দেহের উদ্রেক করেছেন। মীর কাশিমের অনুগত ইউসুফ আলি খান পরাজিত প্রভুর সঙ্গে এলাহাবাদে গিয়ে ১৭৬৩-তে তারিখ-ই-বাংগালা-ই-মহাবৎজঙ্গী' লিখেছিলেন। লেখার সময় সিরাজের 'ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার, গর্ব ও জাঁক' উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' রচয়িতা গোলাম হোসেন সলীম আদি দু-একজন ফার্সি লেখক ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ইউসুফ আলি খান তো তা নন। এ কথা ঠিক যে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাব্তাবায়ী কিছু দিন ইংরেজদের চাকরী করেছিলেন (রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর থেকেও বেশী দিন করেছিলেন), আশা করা যায় তাই থেকে ইসলামিক হিস্ট্রী অ্যান্ড কালচারের অধ্যাপক সিদ্ধান্ত করেন নি যে গোলাম হোসেন খান আর একজন ধামাধরা।

এ সব কথার তাৎপর্য এই যে দেশীয় সমাজ, মানসিকতা ও রাজনীতি বুঝতে হলে দেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে ভেতর থেকে দেখতে হবে। সিরাজ ভালো লোক ছিলেন না মন্দ লোক ছিলেন সেটা বড় কথা নয়, কেন তিনি ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলেন সেটা তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। অপরপক্ষে, শুধু ইংরেজদের দিক থেকে নবাবঘাতী ষড়যন্ত্র পর্যবেক্ষণে ক্ষান্ত না হয়ে মুর্শিদাবাদের চক্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে দেশীয় আমিরদের অবস্থান সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হবে — ঐ বিকৃত, ধামাধরা ফার্সি লেখকদের ব্যতিরেকে যেটা সম্ভব নয়। ওমরাও মহলের অবস্থান বুঝতে হলে গোটা সমাজের প্রেক্ষাপট বাদ দিলে চলবে না। জনমানসে আমীরদের ষড়যন্ত্র কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তাও ধরতে হবে এবং তার জন্য বাংলা উপাদানগুলিও ত্যাজ্য নয়। সুশীলবাবু প্রশ্ন তুলেছেন, আমি কেন পলাশীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে আজু গোঁসাই, রামপ্রসাদ বা গোপাল ভাঁড়কে টেনে এনেছি। আমার বইয়ে বা প্রচ্ছদপটে কোথাও বলা হয়নি যে এই লোকেরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত, একটু

মন দিয়ে পড়লে সেটা আশা কবি তিনি বুঝতে পারবেন। ষড়যন্ত্র যে সমাজে ঘটেছিল সেই সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে এমন কিছু কিছু লোকের কথা এসে পড়ে যাঁরা ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত নন। সিরাজ কর্তৃক রানী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী হরণ প্রচেষ্টা ঐ 'ন্যাশনালিস্টিক', 'নাট্যকারপ্রতিম' ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় অবিশ্বাস করতেন না, আমিও অবিশ্বাসের সঙ্গত কারণ দেখি না। সত্যি হলেও সে ঘটনা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত — সুশীলবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, সত্য কি মিথ্যা সেটা বড় কথা নয়, দেশীয় লোকেরা পববর্তীকালে ষড়যন্ত্রের যে ছবি মনে মনে এঁকেছেন সেইটে বুঝতে গিয়ে ঐ জনশ্রুতি পর্যালোচনা করেছিলাম। ইওরোপীয় দলিলের সাহায্যে কোম্পানীগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের বাণিজ্যের ভিতর অনেক দূর নজর চলে বটে, কিন্তু ইওরোপীয় বাণিজ্যের হুগলী নদী ঠেলে মুর্শিদাবাদ রাজনীতির খরস্রোতা গঙ্গায় সাঁতার দিতে গেলে হাবুডুবু খাবাব বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সন্তরণ ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। সুশীলবাবুর হাতেও দ্-একটি খড়কুটো এসেছে। এরকম একটি খড়কুটো হল একজন অজ্ঞাতনামা ইংরেজ লেখকের 'হিস্টরিকাল স্কেচ অফ ট্যাক্সেস অন দা ইংলিশ কর্মাস ইন বেঙ্গল ফ্রম ১৬৩৩ টু ১৮২০' নামক পাণ্ডুলিপি।

এই অজ্ঞাতনামা লেখকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সুশীলবাবু একটু হানাহানি করেছেন। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক স্বর্গীয় নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এটি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু সমসাময়িক দলিল নয় তাই এর উল্লেখ না করেই তিনি এর ভিত্তিতে একটা তথ্য পেশ করেন। তা হল এই যে, নবাবজাদা সিরাজের ধারণা হয়েছিল, ১৭১৭ সাল থেকে বাদশাহ ফাররুকশিয়ারেব ফারমানেব অপব্যবহার কবে ইংরেজরা নবাব সরকারকে জাল দস্তক দেখিয়ে এসেছে এবং দেড় কোটি টাকার সাইর বা শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে। কোনো সমসাময়িক দলিলে এ খবর নেই। আছে ঘটনাব অন্তত ৬৪ বছর পরে ১৮২০ বা তারও পর, অজ্ঞাতনামা লেখকের অপ্রকাশিত ইংরেজী পাণ্ডুলিপিতে। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের জমা তুমরি তেশকিশ অনুযায়ী সুবা বাংলার মোট বাৎসরিক সাইর জমা ছিল নয় লক্ষ টাকা। অতএব ১৭১৭ থেকে ১৭৫৬ পর্যন্ত ৩৯ বছর ধরে সাইর খাতে নবাব সরকারের মোট প্রাপ্য সাড়ে তিন কোটির মতো টাকা। এই টাকা বিভিন্ন ইওরোপীয় প্রাইভেট ট্রেডার এবং সমস্ত দেশী বণিক সমাজের কাছ থেকে প্রাপ্য ছিল। মোট অঙ্কটাই যদি সাড়ে তিন কোটি হয়, তাহলে ইংরেজ প্রাইভেট ট্রেডার ও তাদের গোমস্তাদের খাতে দেড় কোটি টাকা ফাঁকি পড়া সম্পূর্ণ অবাস্তব। বাংলার বাণিজ্যে তাদের অত বড় অংশ ছিল না। যাই হোক অধ্যাপক সিংহ যে তথ্য পেশ করেছিলেন তা মেনে নিয়েই আমি বলেছিলাম, 'নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এই তথ্যের উৎস উল্লেখ করেন নি। এ হয়তো জনশ্রুতি।' ১৮২০ বা তার পরেকার খবরকে জনশ্রুতি ছাড়া কি বলা যায়? কিন্তু জনশ্রুতি আমিও উপযুক্ত মতে ব্যবহার করার পক্ষপাতী এবং এ জন্য অধ্যাপক সিংহের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই, অশ্রদ্ধা প্রকাশ তো দূরে থাক।

তাই সুশীলবাবু যখন আপাত-অদৃশ্য কারণে সহসা ভয়ানক রুষ্ট হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় উক্তিও পীড়াদায়ক', তখন বিস্ময় ও কৌতূহল হয়েছিল। কি এই রোষের উৎস? কেন এই পীড়াবোধ? ডক্টর চৌধুরী একজন কঠোর সমালোচক বলে পরিচিত। তিনি অন্যান্য ঐতিহাসিকদের ভুল দেখিয়ে দিতে অভ্যস্ত, তাঁদের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতার উদাহরণ বিরল। তবে কেন অধ্যাপক সিংহের প্রতি এই সহানুভূতি?

খোঁজখবর করতে গিয়ে অভ্রান্ত উত্তর বেরিয়ে এল। নরেনবাবু যে খবর সূত্র নির্দেশ না করে পেশ করেছেন, সুশীলবাবু তাঁর লেখায় সেই সূত্র, মানে অজ্ঞাতনামা লেখকের পাণ্ডুলিপি নির্দেশ করে বলেছেন, এই দেড় কোটি টাকার ফাঁকিতে পড়ে সিরাজ ইংরাজদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তা সিরাজ সেই কারণে ইংরেজদের ওপর ক্রুদ্ধ হন বা না হন, সুশীলবাবু কেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন তা বোঝা গেল ঐ সূত্র নির্দেশ থেকে। কার কোথায় ব্যথা লাগে সেটা বুঝতে হলে কেন ব্যথা লাগে জানা চাই। নরেনবাবুর অপমান হয়েছে বলে সুশীলবাবু কেন অমন অপ্রত্যাশিতভাবে পীড়া বোধ করলেন তার কারণ ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের পাণ্ডুলিপি। 'দেশ' পত্রিকায় (১৩৯৬ বিনোদন সংখ্যা, সূত্র ৮, পৃঃ ৪০) সুশীলবাবুর লেখা অনুযায়ী এই পাণ্ডুলিপি তাঁর নিজের 'আবিষ্কার'। অন্তত চৌষট্টি বছর বা তারো পরবর্তী অজ্ঞাতনামা পাণ্ডুলিপিকারকে তিনি 'নিয়ার কনটেমপোরারী'' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর যে লেখাটির প্রতি আমার চোখ কান বন্ধ ছিল বলে আমায় তিরস্কার করেছেন সেই বহুমূল্য লেখাটিতে ঐ অমূল্য পাণ্ডুলিপিটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে এর 'অথেনটিসিটি' একেবারে 'বিয়ণ্ড ডাউট'' (তাঁর নিজের লেখাটি কেন বহুমূল্য তাও প্রকারান্তরে বলতে ভোলেন নি ঃ লেখাটি তিনি ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর সভায় পাঠ করেন, ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ফেলোশিপ দেন এবং লেখাটির 'বৃহত্তম' অংশ রচিত হয় Maison des Sciences de l'Homme Inst. Paris এ)। এমন একটি লেখার প্রতি চোখ কান বন্ধ রাখলে এবং অমন একটি অজ্ঞাতনামা লেখকের চৌষট্টি বছর পরেকার 'প্রায় সমসাময়িক' পাণ্ডুলিপিকে কেউ জনশ্রুতি বললে, রাগ তো হতেই পারে, পীড়াবোধ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এখনকার মতো তোলা থাক। আপাতত লক্ষ্য করার মতো কথা এই যে নিয়ার কনটেমপোরারী ইওরোপীয় দলিলের ওপর এমন অপরিসীম আস্থা থাকা সত্ত্বেও এই ফার্সি-বিরূপ, ইওরোসেন্ট্রিক ঐতিহাসিক ক্ষেত্রবিশেষে এবং প্রয়োজন মতো কনটেমপোরারী ইওরোপীয় দলিলের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। আস্থা না থাকাই ভালো। কিন্তু সুশীলবাবুর আস্থালোপের মধ্যে একটা ডিজাইন লক্ষ্য করা যায় ঃ যে ইওরোপীয় ডকুমেন্টগুলো তাঁর মতের বিরুদ্ধে যায় সেগুলির প্রতি তিনি তৎক্ষণাৎ আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং অন্য কোনো ঐতিহাসিক সেই দলিল উল্লেখ করলেই ঐটে জাল বলে ঘোষণা করেন। যেমন, ডক্টর ফোর্থ কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে শওকৎ জঙ্গের ওপর চড়াও হবার আগে সিরাজ জগৎশেঠকে সওদাগরদের কাছ

থেকে দেড় কোটি টাকা তোলার জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং তিনি ওলন্দাজ সূত্রে জানতে পেরেছেন যে নবাব জগৎশেঠকে চড় মেরেছেন। সুশীলবাবু বলছেন, এটা জাল. ওলন্দাজদের কাগজপত্রে তিনি এই খবরটি পান নি। ওলন্দাজদের কাগজে যথাযথ ভাবে খবরটি সন্নিবিষ্ট নাও হতে পারে বা তাঁর অনুসন্ধান প্রণালী যথাযথ নাও হতে পারে। ইংরেজ সাহেবরা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের কুকীর্তি গোপন করার জন্য জাল খবর পাঠাত কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে খামোখা জাল রাষ্ট্রীয় খবর পাঠাত না। তাতে উভয়েরই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এ ব্যাপারে সুশীলবাবু 'দেশ' পত্রিকায় আগে যা লিখেছিলেন (৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, চিঠিপত্র) তা থেকে মোটেই প্রতিপন্ন হয় না যে জগৎশেঠকে চড় মারার গল্প ইত্যাদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কাল্পনিক।

সুশীলবাবুর এই প্রয়োজনভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক আস্থা-অনাস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে অবহিত থাকা ভালো। সিরাজের উদ্ধত পার্শ্বচর ছিলেন মোহনলাল। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান মঁসিয় ল ছিলেন তাঁর মিত্রপক্ষ। কিন্তু ল সাহেব জানতেন যে লোকটি বদমাশ (Coquin)। সুশীলবাবু এখানে ল এর সাক্ষ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন (অবশ্য প্রয়োজনানুযায়ী ল এব সাক্ষ্যে তাঁর আস্থা ফিরে আসাও আমরা যথাস্থানে দেখবো)। সুশীলবাবুর ধারণা, মোহনলাল সময়মত ইংরেজদের বিরুদ্ধে চন্দননগরের ফরাসীদের কাছে সাহায্য পাঠাতে পারেন নি বলে এবং শেষ পর্যন্ত ল নিজে কাশিম বাজার ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায়, 'ফ্রাস্টেশন' বশত ল মোহনলালকে স্কাউনড্রেল বলে অভিহিত করেন। এই হল তাঁর মনস্তত্ত্ব নির্ণয়।[১১] ল' এর স্মৃতিকথা খুঁটিয়ে পড়লে কিন্তু দেখা যায় যে এক্ষেত্রে অ্যামেচার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। ল জানতেন যে মোহনলাল শত্রুর বিষপ্রয়োগের ফলে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় ইচ্ছাসত্ত্বেও সময়মতো ফরাসীদের সাহায্য করতে পারেন নি।[১২]

সিরাজ জগৎশেঠকে চড় মেরেছিলেন একথা আমি উড়িয়ে দিতে রাজী নই দেখে সুশীলবাবু কেমন 'অকাট্য' প্রমাণাদি দাখিল করেছেন তা আমরা দেখলাম। সেই সঙ্গে তিনি নিজেব প্রমাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে এও বলেছেন যে 'তথ্যের এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়তো পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।' দু-একটা উদাহরণ দিলে তাঁর এই পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বিচারের পদ্ধতি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ডাক্তার ফোর্থ প্রেরিত জগৎশেঠ চপেটাঘাত বৃত্তান্ত সম্পর্কে গভীরভাবে সন্দিহান হলেও সুশীলবাবু হঠাৎ অন্য এক বৃত্তান্তে ডাক্তার ফোর্থের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ফিরে পেয়ে তাঁর একটি মাত্র চিঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করে বসেছেন, 'সাম মুসলিম মার্চেন্টস্ ওয়্যার ইন দ্য থিক অফ দ্য কনস্পিরেসি'। এই অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য, যা শুধু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা কেন ডাক্তার ফোর্থ নিজেও জানতেন না, সুশীলবাবুর ঐ বহুমূল্য লেখাটিতে তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যার প্রতি চোখ-কান বন্ধ রেখে আমি তাঁর বিরাগভাজন হয়েছি। দু'জন মুসলমান সওদাগর সিরাজ কর্তৃক লুণ্ঠিত হবার ভয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে চুঁচুড়ায় পালিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তার ফোর্থের প্রেরিত সংবাদ ঐ পর্যন্ত। এ থেকে 'সিরাজ হ্যাড রিয়্যালি নো লাস্ট ফর মানি' প্রমাণিত হয় কি না জানি না তবে, 'সাম মুসলিম মার্চেন্টস্ ওয়্যার ইন দ্য থিক অফ

দ্য কনস্পিরেসি' নিশ্চয় প্রমাণ হয় না। ইওরোপীয় দলিল-দস্তাবেজের দিকে যদি সুশীলবাবু তাঁর চোখ-কান আর একটু খোলা রাখতেন তা হলে দেখতেন যে এর পরবর্তী একটি দলিলও নেই যা থেকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে মুসলমান সওদাগরদের অংশগ্রহণ প্রমাণিত হয। আমি বিশ্বাস করি আর্মেনী বণিক খোজা ওয়াজিদ যিনি শেষ মুহূর্তে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন. কিন্তু যেহেতু এই ধর্মান্তর বিষয়ে সুশীলবাবু আমার সঙ্গে একমত নন, তাই ঐ নজিরটিও তিনি দিতে পারছেন না।

প্যারিসে লিখিত ও ঢাকাতে পঠিত রচনাটি থেকে তাঁর 'পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বিশ্লেষণ' এর আর একটি নমুনা দিই। ফার্সি গাল-গল্পো নয় তিনি খাস ইংরেজী দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'Kwaja Wajid ..... went four times to Calcutta in order to persuade the gentlemen to make up matters with the Nawab but was threatened to be ill used if he came again on the same errand.' অর্থাৎ সুশীলবাবুর মতানুযায়ী বণিকশ্রেষ্ঠ ওয়াজিদ নিজেই কষ্ট করে চারবার কলকাতা গিয়ে সিরাজ-ইংরেজ বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করেন কিন্তু ইংরেজরা ফকরুৎ-তুজ্জব বা বণিকশ্রেষ্ঠ ওয়াজিদকে উত্তম-মধ্যম দেবার ভয় দেখিয়ে কলকাতা থেকে দূর করে দেয়। সুশীলবাবুর একবারো মনে হল না যে বাংলার সর্বপ্রধান সওদাগর ট্রাভেলিং সেলস্‌ম্যান-এর মতো চার বার কলকাতা যাতায়াত করতে পারেন কি না বা ইংরেজরা অমন একজন ধনপতিকে উত্তম-মধ্যমের ভয় দেখিয়ে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে কি না। কিছু না হোক, ওয়াজিদ যে এ সময ফরাসীদের ও নবাবের মিত্রপক্ষ ছিলেন এবং ইংরেজরা যে তাঁকে শত্রুপক্ষ মনে করত, এটা ধৈর্য্য ধরে চিন্তা করলে সুশীলবাবু ঐ দলিলটি অন্য দলিলের সঙ্গে মিলিয়ে আরো একটু খুঁটিয়ে দেখতেন। বাক্যটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে তিনি যে তিনটি ফুটকি দিয়ে কিয়দংশ বাদ দিয়েছেন সেটি সমেত পুনরুদ্ধৃত করছি : "Coja Wazeed, the greatest merchant in Bengal who resides at Houghly and had great influence with the Nabob, his duan told us that he went four times to Calcutta in order to persuade the gentlemen to make up matters with the Nabob but was threatered to be ill used if he came again on the same errand." বাক্যটি পড়ে বিভ্রান্ত হবার একটু সম্ভাবনা আছে বটে। এবং সুশীলবাবু বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু একটু 'পরিশ্রম' ও 'সময়' ব্যয় করে অন্য দলিল দেখলে তিনি বুঝতে পারতেন যে ওয়াজিদের দেওয়ান ছিলেন শিববাবু, তিনিই কলকাতায় যাতায়াত করতেন এবং বাজে গুজব রটেছিল যে ইংরাজরা শিববাবুকে হয়তো গ্রেপ্তার করতে পারে।[১০]

সুশীলবাবুর চোখে আমার পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বিশ্লেষণ বিমুখতার একটি প্রমাণ এই যে, আমার মতে, ইংরেজদের বিক্রম দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে নবাব আলিনগরের সন্ধি করেন। তিনি বলেন, তা নয়, নবাব আবদালির বাংলা আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ধি করে ফেলেন। কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু তিনি যত

চট্ করে 'আবদালি' সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আমি তত দ্বিধাহীন হতে পারে নি। কারণ সিরাজের সমসাময়িক দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান এবং রবার্ট ওর্ম ক্লাইভের অতর্কিত নৈশাভিযানে বিধ্বস্ত সিরাজের সহসা ভীতিকেই আলিনগরের আহাদনামার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন, একবারো আবদালির দিল্লী আক্রমণের উল্লেখ করেন নি।[৮] সুশীলবাবু যেসব দলিল দেখে আবদালি ভীতিকে আহাদনামার প্রকৃত কারণ বলে নির্দেশ করে থাকবেন, সেগুলি ওর্মের নিজের সংগ্রহেও ছিল এবং আমার অনুমান ওর্ম গণনা করে দেখেন যে আবদালির দিল্লী আগমনের খবর নবাবের শিবিরে পৌঁছয় সুলেনামা সম্পাদনের দিন বা তারপর। পরবর্তীকালে এস সি. হিল যিনি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে দলিল সংগ্রহ করেন তাঁরও ধারণা ক্লাইভের আচমকা হানায় ভয় পেয়ে সিরাজ সন্ধি করেন। দলিলগুলো থেকে তারিখ পরম্পরা খুব সুস্পষ্টভাবে না পেলেও আমার সন্দেহ হয় সন্ধির প্রস্তাব পাঠানোর দিন নবাব আবদালির দিল্লী অধিকারের খবর জানতেন না, কয়েকদিন বাদে সন্ধি স্বাক্ষরের দিন সে খবর শিবিরে পৌঁছয়।

আলিনগরের উপকণ্ঠে নবাবের শিবিরে ক্লাইভ হানা দেন ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা। পরদিন ৬ তারিখে নবাব আহাদনামার প্রস্তাব পাঠান। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী সুলেনামা সম্পাদিত হয়। ১১-১২ ফেব্রুয়ারী নবাব মুর্শিদাবাদ অভিমুখে কুচ করতে শুরু করেন। আবদালির আগমন বার্তার প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি ক্লাইভ লিখিত ২২শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে। তাতে লন্ডনের সিক্রেট কমিটিকে ক্লাইভ জানাচ্ছেন, নবাব সন্ধি করেছেন এবং তার পরেই মুক্সাদাবাদ রওনা হয়ে গেছেন। 'ঠিক ঐ সময় তিনি খবর পেয়েছেন যে আফগানরা মোগলদের হারিয়ে দিয়েছে।'[১৮] এ ব্যাপারে মঁসিয় ল যা বলেছেন তাও তাৎপর্যপূর্ণ : 'নবাব মঁসিয় রেনোল্টকে খবর পাঠালেন দিল্লীতে গণ্ডগোলের জন্য তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু এ স্রেফ তাঁর কাপুরুষতা ঢাকবার প্রয়াস। দিল্লীর গণ্ডগোল থেকে তাঁর ভয় পাবার কিছু ছিল না, তাতে তাঁর চুপচাপ নিজের রাজধানীতে বসে থাকায় কোনো বাধা সৃষ্টি হয় নি।'[১৫] আবদালি কর্তৃক দিল্লী দখলের সংবাদ যদিও নবাবের আলিনগর অবস্থানকালে পৌঁছয়, আবদালি বাংলা আক্রমণ করতে আসছেন এখবর মুর্শিদাবাদে আসে অনেক পরে, মার্চ-এপ্রিল মাসে। সেই ভয়ে নবাব ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণে বাধা দিতে ইতস্তত করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন। এসব সত্ত্বেও বলব, নবাব সুলেনামার আগেই হয়তো কানাঘুষোয় আবদালির দিল্লী দখলের খবর পেয়ে থাকবেন, সেটা অসম্ভব নয় এবং সেটাও আলিনগরের আহাদনামার একটা গৌণ কারণ হতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে কোনো নিশ্চয়তায় উপনীত হতে পারি নি বলেই আমি সুশীলবাবুর মতো তড়িঘড়ি সন্ধির কারণ স্বরূপ আবদালি-বার্তা নির্দেশ করতে অক্ষম হয়েছিলাম। সুলেনামা সম্পাদন ও আবদালি সংবাদের তারিখ পারম্পর্য আলিনগরের উপকণ্ঠের কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে। সুশীলবাবু সে সমস্যা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন এমন কোনো আভাস তাঁর সমালোচনায় নেই।

৩

ছায়া যেমন নানারকমের হয়, ছায়াবাজিও তেমন দেশী বিলাতী নানা প্রকারের হতে পারে। বিলেতে মেলার সময় গ্রামের লোক কাঠের পুতুল তৈরী করে তার মুখে পাইপ দিয়ে পাইপের মধ্যে কাঠি ছুঁড়ে মারে। ঐ কাঠের মেয়েকে বলে 'আন্ট স্যালী'। তর্কাতর্কির বেলা প্রতিপক্ষের মুখে একটা অসম্ভব কথা আরোপ করে সে কথা নস্যাৎ করে দেওয়ার পদ্ধতি সুপরিচিত। প্রতিপক্ষকে আন্ট স্যালী বানিয়ে সে যা বলে নি তাই তার মুখে আরোপ করা শুধু বিলেতে সীমাবদ্ধ নেই।

সভাপতির ভাষণে চৌধুরী মশায় বলেছেন : 'কিন্তু কারো কারো দুর্ভাগ্যবশত অথচ আশা করি বেশীরভাগ লোকের বিরুদ্ধবাদী না হয়েও আমি সম্পূর্ণ আলাদা গল্প শুরু করেছি।' শুধু কারো কারো দুর্ভাগ্য? পলাশী সংক্রান্ত কোন্ গবেষকের বক্তব্য তিনি আগে বিকৃত করে নিয়ে পরে খণ্ডন করার প্রয়াস পান নি? আর গল্পটাই বা কতোটা আলাদা হয়েছে?

সুশীলবাবুর চোখে পলাশী সংক্রান্ত সমস্ত গবেষক জগৎ তাঁর বিরুদ্ধবাদী বা ঘুরিয়ে বলতে গেলে, তিনি সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে। এবং সমগ্র জগৎটাই ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে এক। তাঁর চোখে একমাত্র তিনিই এখনো লর্ড কার্জনের রেকর্ড কীপার হিল সাহেবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন — সিরাজের হয়ে। আর যাঁরা যাঁরা গবেষণা করছেন সবাই হিলের চক্রান্তে জড়িত, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে। নব্বই বছর আগে ঐ কলকাতাবাসী সাহেব যে চক্র গঠন করে যান, দেশে বিদেশে তা এখনো সচল রয়েছে। কি ব্রিজেন গুপ্ত কি বা পি. জে. মার্শাল, কি সি. এ. বেইলী কি বা রজতকান্ত রায়, সবাই ইংরেজদের হয়ে সাফাই গাইবার চক্রান্তে লিপ্ত। সবারই মতলব এক, কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাৎ নেই।

হিল এ কথা বাস্তবিক বলেছিলেন যে সিরাজ বিনা প্রয়োজনে ইংরেজদের সঙ্গে খামোখা ঝগড়া বাঁধিয়ে ছিলেন। ব্রিজেন গুপ্ত সে কথা অসিদ্ধ প্রমাণ করে দেবার পর এই নিয়ে আর তর্কাতর্কি করার প্রয়োজন মিটে গেছে। মার্শাল ও বেইলী সে দিক দিয়েই আর যান নি, তাঁরা দেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টি চালনা করে লড়াইয়ের কারণগুলোর ওপরে অন্য দিক থেকে আলোকপাত করেছেন। আমিও দেশীয় সমাজের অভ্যন্তর থেকে ষড়যন্ত্রের কি চেহারা দেখা যায় সেটা ধরতে আগ্রহী ছিলাম। মার্শাল ও বেইলীর মতে, পলাশীর যুদ্ধের ফলে দেশীয় সমাজ তছ্‌নছ্ হয়ে যায় নি, আমার মতে ধননিষ্কাশন ও শোষণের নালি ধরে পুরাতন সমাজের প্রাণরস নির্গত হয়ে গেছিল। সুশীলবাবু এঁদের ও আমার মত যথাযথভাবে ব্যক্ত করে তারপর খণ্ডন করার কাজে নামলে বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সুশীলবাবু তাঁর প্যারিসে লিখিত ও ঢাকায় পঠিত লেখাটিতে অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি স্বকপোলকল্পিত 'কনসেন্‌সাস' দেখতে পেয়েছেন। তা হল এই যে, সিরাজ একতরফাভাবে কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়ার জন্য দায়ী। এরকম কোনো 'কনসেনসাস্' বর্তমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে তো নেইই, এমন কি কোনো একজন বর্তমান ঐতিহাসিকও এই মত পোষণ করেন না।

হিল সাহেব নেই, অতএব তাঁকে ধরে আন্ট স্যালি খাড়া করবায় বাধা পাবার সম্ভাবনা কম। হিল সাহেব, সুশীলবাবুর মতে, এই মত পোষণ করতেন যে সিরাজ সমঝোতার কোনো চেষ্টা না করে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হন। হিল সাহেবের মুখে এই বক্তব্য আরোপ করে তারপর সেটা সুশীলবাবু অনায়াসে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আয়াস করতে হয় নি, কারণ যে দলিলগুলি থেকে সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলি হিল সাহেবই অনেক পরিশ্রম করে তাঁর বিপুল গ্রন্থে যথাযথভাবে মুদ্রিত করেছিলেন। সুশীলবাবু সেই দলিলগুলিই ব্যবহার করেছেন।[১১] হিল সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে অমন কথা বলেন নি, বলতে পারেন না, কারণ দলিলগুলির সঙ্গে তাঁর যেমন গভীর পরিচয় ছিল, রবার্ট ওর্ম ছাড়া আর কারো তত পরিচয় ছিল না বা নেই। হিল সাহেব দলিলগুলির সাহায্যে দেখিয়েছেন, নবাব ইংরাজদের 'বশে আনার' ('রিডিউসিং টু সাবমিশন') চেষ্টা করেছিলেন, তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি ('দ্য নওয়াব রোট দ্যাট হি উড নট ড্রাইভ দ্য ব্রিটিশ আউট অফ দ্য কানট্রি ইফ দে উড সাবমিট টু হিজ কনডিশনস্')।[১২]

এ কথা ঠিক যে হিল মনে করতেন, সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি এনেছিলেন সেগুলি অজুহাত মাত্র। ঐ অজুহাতগুলি সম্পূর্ণ অসত্য না হলেও হিলের মতে আসলে নবাব সেই কারণে লড়াই করতে নামেন নি। তিনি চাইছিলেন ইংরেজদের বশে আনতে। হিলের এই মত এখন আর কেউ গুরুতর ভাবে নেন না। সুশীলবাবুর অনেক অনেক আগে ব্রিজেন গুপ্ত সুন্দরভাবে দেখান, নবাবের অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে সত্য। ইংরেজরা সত্যিই বেআইনীভাবে গড় সুরক্ষিত করেছিল, নবাবের পলাতক প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং দস্তক জাল করে বহু মাশুল ফাঁকি দিয়েছিল। আর নবাব এই জন্যই শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হন। সুশীলবাবুর এ ব্যাপারে কোনো 'আলাদা' কিছু বলার নেই। ব্রিজেন গুপ্ত কর্তৃক প্রমাণিত হয়ে যাবার পর এ নিয়ে পুনরায় হিল সাহেবকে আক্রমণ করা অর্থহীন।

ব্রিজেন গুপ্তর প্রতি যথাযথভাবে তাঁর ঋণ স্বীকার করা দূরে থাক, গুপ্ত মহাশয়ের মুখে নানান অসংলগ্ন কথা আরোপ করে সুশীলবাবু তাঁকে আক্রমণ করেছেন। আবার সেই আন্ট স্যালি খাড়া করার অনর্থক প্রচেষ্টা। ব্রিজেন গুপ্ত কোথাও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা বলেন নি। সুশীলবাবু তাঁর মুখে 'হিন্দু রিভাইভালিজম্' থিসীস এবং 'schism in society along communal lines' থিসীস আরোপ করেছেন।[১২] এই শব্দের চয়ন সুশীলবাবুর নিজের, ব্রিজেনবাবুর নয়। হিল সাহেব কতক পরিমাণে এরকম কথা বলেছিলেন বটে। সুশীলবাবুর মতে এই ব্রিজেন গুপ্ত লোকটা হিল সাহেবের পদাঙ্কানুসারী। ব্রিজেনবাবু তা নন। হিলের সঙ্গে গুপ্তের প্রভেদ প্রসিদ্ধ। ব্রিজেন গুপ্ত এ ব্যাপারে যা বলেছিলেন তা মোটামুটি এই রকম ঃ হিন্দু বণিকশ্রেণী ও ইওরোপীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ তৈরী হয়েছিল, ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নিয়ে নানা চিন্তা করত এবং এটা কাজে লাগানোর আশা রাখত এবং দরবারে ক্ষমতার লড়াই থেকে নানা দলের উদ্ভব হয়, যাকে তিনি 'Schism in the

Bengal body politic' বলে অভিহিত করেছেন। গুপ্ত মশায়ের এই দলাদলি জনিত রাষ্ট্রীয় বিভেদ সুশীলবাবুর আরোপিত সম্প্রদায়ভেদ জনিত সামাজিক বিভেদ নয়। ব্রিজেন গুপ্ত এ কথাও বলেছেন যে হিন্দুরা নিজেদের হাতে রাজ্য কেড়ে নেবার কথা চিন্তা করত না, তারা এক মুসলিম শাসকের পরিবর্তে আরেক নতুন মুসলিম শাসক খাড়া করতে আগ্রহী ছিল।"

এক ব্যাপারে ব্রিজেন গুপ্তর সঙ্গে সুশীল চৌধুরীর 'বিস্ময়কর সাযুজ্য' (যেটা না কি তিনি পিটার মার্শাল ও ক্রিস বেইলীর সঙ্গে আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন) আছে। ব্রিজেন গুপ্ত মনে করতেন ইংরেজরা পলাশীর অনেকদিন আগে থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন করবার মতলব ভাঁজছিল। সুশীল চৌধুরীও তাই মনে করেন এবং এর প্রমাণাদিও কতক পরিমাণে ব্রিজেন গুপ্তর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তবে এই 'সাযুজ্যের' কথাটা প্রকাশ করেন নি। বেইলী ও মার্শালের লেখা আমার প্রথম লেখার প্রায় পরে পরেই প্রকাশিত হয়েছিল, তাই সাযুজ্য যেটুকু দেখা যায় সেটুকু কাকতালীয়। ব্রিজেন গুপ্ত বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজদের একটা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, মার্শাল, বেইলী ও আমার মতে এরকম কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। আলাদা আলাদাভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয় মুর্শিদাবাদ দরবারে, পরে ইংরেজরা তাতে জড়িয়ে পরে। সুশীলবাবুর মতে মার্শাল, বেইলী ও আমি আসলে হিলের প্রতিধ্বনি করেছি। এটা ভুল। হিল এমন কথা বলেননি যে দেশীয় ক্ষমতার অন্দরমহল থেকে পলাশীর ষড়যন্ত্র উদ্ভূত হয় এবং ঘটনাক্রমে তাতে ইংরেজ কোম্পানী আকৃষ্ট হয়। অতএব এক্ষেত্রে হিলের পদাঙ্কানুসরণের প্রশ্নই ওঠে না। এটি ইদানীংকালের ধারণা, যবে থেকে দেশীয় সমাজ ও দেশীয় রাজনীতিকে দেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধরবার আগ্রহ জেগেছে তবে থেকে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে।

বেইলী, মার্শাল ও আমার লেখায় এই আগ্রহ প্রায় একই সঙ্গে ফুটে উঠলেও অন্য এক প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঘটেছে ঃ তা হল ইংরেজদের ক্ষমতা লাভের ফলে দেশীয় সমাজে একটা বড় বিপর্যয় ঘটল কি ঘটল না? আমি যে প্রলয়ের কথা বলেছি সে প্রলয় তাঁরা মানেন না। সুশীলবাবু এ দিকে লক্ষ্য রাখেন নি। ঐতিহাসিকদের মধ্যেকার অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সুশীলবাবু এই গোটা জগৎকে 'আমি এবং ওরা' এই দুটো ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুশীলবাবুর কাছে ইতিহাস যত সরল, ঐতিহাসিক মহল ততোধিক সরল।

৫

বাণিজ্য ইতিহাস প্রসঙ্গে ওমপ্রকাশের বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে যে, সুশীলবাবু ভালোমানুষ ও ভুলো মানুষ। তিনি ভালো মনে জাল সাক্ষ্য পাশ করে দেন। এবং ভুলো মনে সাক্ষ্যের মনোমত অংশ উল্লেখ করে যে অংশ তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায় সেটি পেশ করতে ভুলে যান। সিরাজ-ইংরাজ প্রসঙ্গে তাঁর ভালোমানুষি ততোটা চোখে পড়ে

না যতোটা পড়ে তাঁর ভুলোমানুষি। কারণ জাল হোক সত্যি হোক, সিরাজের সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র নিয়ে কি ফার্সি কি ফরাসী কি ইংরাজী একটা সমসাময়িক প্রশংসাসূচক সাক্ষ্যও নেই যা সুশীলবাবু ভালো বা মন্দ মনে পাশ করে দিতে পারেন।

মনে করুন, আদালতে একটি কিশোর খুনীর বিচার চলছে। খুনে ছোকরার মামার কাছ থেকে নিম্ন আদালতের মুনসেফ সাক্ষ্য নিচ্ছেন, ছোকরার চরিত্র কেমন তর। মুনসেফ মশাই যা যা প্রশ্ন করলেন এবং মামার কাছ থেকে যে যে উত্তর পেলেন তা এই রকম ঃ

মুনসেফ ঃ ছেলেবেলায় আপনার ভাগ্নের চরিত্র কেমন দেখেছিলেন?

মামা ঃ কি বলবো, ছেলেটা হাড় বজ্জাত ছিল। তবে কি না, সকলের মনে আশা ছিল, আমারো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বড় হয়ে ছেলেটার চরিত্র শুধরে যাবে, এমন কত লোকের শুধরে যায়, তারই বা শুধরোবে না কেন?

মুনসেফ ঃ বড় হয়ে ছোকরার চরিত্র শুধরেছিল তো? (নিম্ন স্বরে) ভয় নেই, আমায় বলতে পারেন।

মামা ঃ আপনি সজ্জন, আপনাকে বলতে বাধা নেই, একটুও শুধরোয় নি, বরং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গুণগুলি উত্তরোত্তর প্রকাশ পেতে লাগল। তবে মশায় এ কথা প্রকাশ না পেলে বাধিত হবো।

এখন মুনসেফ যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে জজ সাহেবের কাছে খালি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দাখিল করে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর চেপে যান, তাহলে মামা সেটা সজ্জন ব্যক্তির গুণ বলে ধার্য করতে পারেন, কিন্তু জানতে পারলে জজসাহেব কি ধার্য করবেন তা বলা যায় না।

সে যা হোক এ তো নিছক বানানো গল্প। কিন্তু যদি জজের জায়গায় ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী ক্লিও দেবী, ছোকরার জায়গায় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ্, মামার জায়গায় ফরাসী মিত্রপক্ষ মঁসিয় ল এবং মুনসেফের জায়গায় ডক্টর সুশীল চৌধুরীর নাম বসানো যায় তাহলে বানানো গল্পটা বাস্তব জীবনে কি আকার নেয় লোকের জানতে কৌতূহল হতে পারে। 'দেশ' পত্রিকায় (১৮।৫।৯১) সুশীলবাবু যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, সেটা স্মরণ করলেই পাঠক বাস্তব ঘটনাটা অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন।

সুশীলবাবু বলতে চেয়েছিলেন, আলিবর্দি খানের জীবৎকালে নবাবের নাতি সিরাজ কিছু কিছু কুকীর্তি করেছিলেন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেসব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নবাব হয়ে তাঁর আচরণ কেমন হয়েছিল সেটাই ধার্য্য। তখ্তে চড়ে তিনি আর শরাব স্পর্শ করেন নি। মঁসিয় ল, যিনি নবাবজাদার অল্প বয়েসের নানা কুকীর্তির গল্প বলে গেছেন, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে নবাব হয়ে সিরাজের স্বভাব-চরিত্র আমূল সংশোধিত হয়ে গেছিল। সুশীলবাবুর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ

'এমন পরিবর্তন যে অসম্ভব নয় (যদিও নাটকীয় হতে পারে) এবং তার যে সম্ভাবনাও ছিল সেটা আমাদের জানাচ্ছে সেই মঁসিয়ে জাঁ ল, যিনিই প্রধানত সিরাজের

চরিত্রের কদর্য রূপটি তুলে ধরেছেন। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সিরাজের এই যে চরিত্র তা নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর আগে। তার বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : "People however flattered themselves that when he [Siraj] became Nawab he would be more humane." তিনি নিজেও আশা করেছিলেন যে হয়ত "সিরাজ একদিন (নবাব হওয়ার পরে?) সজ্জনে পরিণত হতে পারে।" তাঁর এরকম বিশ্বাসের কারণও ছিল। তিনি লিখছেন তরুণ নবাব (ঢাকার) নওয়াজিস মহম্মদ খাজা সিরাজের চেয়ে বেশী বই ত কম দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল না কিন্তু পরে সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'

এই হল মঁসিয় ল এর সাক্ষ্যের প্রথম ভাগ। সুশীলবাবু চিত্তাকর্ষকভাবে উদ্ধৃত করেছেন। পড়ে আকৃষ্ট পাঠকের কৌতূহল হবে : তারপর? তারপর ল কি বললেন? সিরাজের চরিত্রেব কোন 'নাটকীয় পরিবর্তন' ল এর পরবর্তী সাক্ষ্যে ফুটে উঠল? কেমন করে ল এর কলমের ডগা থেকে সিরাজের নতুন সচ্চরিত্র সর্বজনপ্রিয় চেহারাটি নাটকীযভাবে বেরিয়ে এল?

এ-ব্যাপারে তখনকার মতো 'দেশ' পাঠকদের একটু নিরাশ হতে হয়েছিল। সুশীলবাবু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করেন নি। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, ল শুধু এই চমকপ্রদ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। আর কিছু বলেন নি। বস্তুত তা কিন্তু নয়। ল পরে সমস্যার মীমাংসা খুব স্পষ্টভাবে করেছিলেন। এ সেই মুনসেফের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মামার জবাবের মতো — ল এর সাক্ষ্যের দ্বিতীয় ভাগ। ক্লিওর দরবারে ল'-এর দ্বিতীয় ভাগ উদ্ধৃত করি — পাঠকরা দেখবেন প্রথম ভাগের চেয়ে এটি কিছু কম 'তাৎপর্যপূর্ণ' নয়।

'যারা সবচেয়ে ধনবান নবাব ছিলেন তাদের মধ্যে একজন সিরাজুদ্দৌলা। ..... তবু তিনি শুধু নিজের ধনদৌলত বৃদ্ধির কথা ভাবতেন। কোনো অসাধারণ বড় খরচ পড়লে তিনি চাঁদা ধার্য্য করতেন এবং তা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে আদায় করতেন। ....,বাস্তবিক তাঁর ব্যবহার থেকে মনে হতো সবার সর্বনাশ ঘটানোই তাঁর লক্ষ্য। তিনি কাউকে ছেড়ে দিতেন না, নিজের আত্মীয়স্বজনদের পর্যন্ত নয়, তাঁদের কাছ থেকেও আলিবর্দি খানের আমল থেকে তাঁরা যেসব ভাতা ও পদ উপভোগ করছিলেন সে সব তিনি কেড়ে নেন। এমন লোকের পক্ষে কি তখ্ত বজায় রাখা সম্ভব? যারা তাঁকে ভালো করে জানত না, তারা যখন দেখল সব শত্রুকে পরাজিত করে তিনি মহান মোগলের ফারমান পেয়ে সুবাদার পদে পাকাপাকি নিযুক্ত হয়েছেন, তারা তখন নাচার হয়ে ভাবল নিশ্চয় ওঁর চরিত্রে এমন কোনো গুণ আছে যা তাঁর দোষগুলো কাটিয়ে দেয়। কিন্তু রাজ্য পরিচালন ব্যাপারে লোকের মনে ভয় উৎপাদন করা ছাড়া এই মাথাঘোরা তরুণের অন্য কোনো গুণ ছিল না, এও চালু ছিল যে, পুরুষ মানুষদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় কাপুরুষ। প্রথমে তিনি ফৌজের নায়কদের কিছুটা সমঝে চলতেন, কারণ সুবাদার পদে পাকাপাকি নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি এর প্রয়োজন বুঝতেন। এমন কি তাঁকে মুক্তহস্ত বলে মনে হতো, কিন্তু এই গুণ যেটি সম্পূর্ণ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ শীগ্‌গিরই

উবে গেল, তার বদলে দেখা দিল হিংস্র আচরণ ও লোভাতুর মনোভাব। এর ফলে যারা যারা তিনি সুবাদার হয়ে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার করবেন এই আশায় তাঁর উন্নতি সমর্থন করেছিল তারা বেঁকে বসল।'[২২]

ল এর সাক্ষ্যের এই অংশটি উল্লেখ করতে সুশীলবাবু কেন ভুলে গেলেন তা বুঝতে গিয়ে ভালো লোকে ভোলাবাবা ও মন্দ লোকে মুনসেফ স্মরণ করবে। কিন্তু সেসব অনুমানের মধ্যে যাওয়া নিরর্থক। যা অনর্থক নয় তা হল 'তথ্যের এমন চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ'। এই 'পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ' কাজ তিনি কি রকম সম্পন্ন করেছেন তার আর একটা নমুনা দিই। ইউসুফ আলি খান রচিত 'তারিখ ই বাংগালা ই মহাবৎজঙ্গী' থেকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে নবাব হয়ে প্রথমেইসিরাজ তাঁর প্রতিপক্ষ গহসেটি বেগমের দলবল ও জমাদারদের "বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্তির সঙ্গে" বশ মানিয়েছিলেন। ল এর যে সাক্ষ্য ওপরে উদ্ধৃত করেছি তার সঙ্গে ইউসুফ আলি খানের সাক্ষ্য ভালো করে মিলিয়ে পড়লে অন্য আর একটা ছবি ভেসে ওঠে। যতদিন নবাব পাকাপাকিভাবে তখ্‌তে বসতে পারেন নি তত দিন তিনি দায়ে পড়ে ফৌজের লোকজন ও জমাদারদের সমঝে চলতেন। কিন্তু কলকাতা ও পূর্ণিয়া বিজয়ের পর তিনি নিজ মূর্তি প্রকাশ করলেন। ইউসুফ আলি খান এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'যে সব জমিদার তাঁর হয়ে শওকৎ জঙ্গের সাথে বিশ্বস্তভাবে লড়াই করেছিল তিনি তাদের ওপর গালাগালি বর্ষণ করে আর নানান দাবি-দাওয়া করে ক্ষেপিয়ে তুললেন। অনুক্ষণ তিনি আমীর ওমরাওদের অপমান করতে লাগলেন আর মোহনলালের ওপর বেশী বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। যদিও সাধারণ খেতাবের ও যোগ্যতা তার ছিল না তবু দিন দিন তার পদবৃদ্ধি করে চললেন।' ইংরেজদের কাছে আলিনগরের কুয়াশায় মোক্ষম ঘা খেয়েও তাঁর চৈতন্য হল না। 'তিনি আগের মতো এমনই কুকীর্তি চালাতে লাগলেন যে ওমরাও থেকে আমজনতা সবাই তাঁকে ঘেন্না করতে লাগল।'[২২] এ কথা যিনি বলেছেন সেই ইউসুফ আলি খান মীর কাশিমের অনুচর, ইংরেজদের ধামাধরা নন। মিত্রপক্ষ মঁসিয় ল এবং নিরপেক্ষ ইউসুফ আলি খানের এসব সাক্ষ্য সত্ত্বেও সুশীলবাবু কেন নবাবের নিষ্ঠুর ও উদ্ধত আচরণ সম্বন্ধে 'ইতিহাসে এর সোজাসুজি সাক্ষ্যপ্রমাণ কিছু নেই' বলে মত প্রকাশ করেছেন তা বিচার করলে এটা 'চোখ কান বন্ধ রেখে ইতিহাস চর্চার' একটা সম্ভাব্য নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা যায় না কি?

সুশীলবাবুর অভিযোগ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতো আমিও সিরাজকে 'ভিলেন' হিসেবে দেখানোর ষড়যন্ত্রে জড়িত। তবে বোধ করি আচার্য যদুনাথ সরকারও তাই এবং স্যার যদুনাথ যাঁর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেছেন, ইংরেজদের প্রতিপক্ষ সেই মঁসিয় ল ও তাই।[২৩] সুশীলবাবু সিরাজের চরিত্র নিয়ে অনর্থক ঝগড়াঝাঁটি করে আসল প্রস্তাব থেকে সরে যাচ্ছেন। নবাবের চরিত্র ভালো কি মন্দ এ তর্ক বহুদিন আগে হয়ে গেছে। এই তর্কের আর প্রয়োজন নেই। কারণ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের কারণ সিরাজের চরিত্রের মধ্যে নিহিত নেই। সিরাজ ইংরাজদের সঙ্গে কেন লড়াই করতে গেছিলেন এটাই প্রকৃত প্রশ্ন। এর উত্তর সুশীলবাবুর লেখার অনেক আগেই ঐ 'পদাঙ্কানুসারী' ব্রিজেন গুপ্ত সঠিকভাবে দিয়েছেন। সিরাজ অত্যন্ত সঙ্গত কারণে ইংরেজদের শায়েস্তা

করতে গেছিলেন। এ ব্যাপারে আমিও এক মত তিনি মোগল শাসকের মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে উদ্ধত ইংরেজদের 'বিদ্রোহ' দমন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, অন্যত্র আমি তা দেখাবার চেষ্টা করেছি।[১৯]

৬

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের তর্কবিতর্কের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচয় না থাকলে সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। ধনরত্ন লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তার এ দুটো এক বস্তু নয়। মাহমুদ গজনবী এ দেশে এসে ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিলেন। মহম্মদ গোরী এদেশে এসে সুলতানাৎ স্থাপন করেন। রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় চড়াও হয়ে ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। লর্ড ওয়েলেসলী সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে informal empire ও formal empire নামে একটি স্তরভেদ জন গ্যালাহার ইত্যাদির লেখা থেকে অনেকদিন হল বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলায় informal empire ক্লাইভ কর্তৃক দেওয়ানী সনদ আদায়ের সময় থেকে শুরু হয়। যেহেতু কোম্পানী মহম্মদ রেজা খানের মাধ্যমে ১৭৭২ পর্যন্ত দেওয়ানী পরিচালনা করে এবং ঐ বছর রেজা খানকে সরিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানীকে পুরোধা রূপে দেওয়ান ঘোষণা করেন ('standing forth as the Diwan') অতএব বাংলায় informal empire এর সময়সীমা ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত করা যেতে পারে। তবে পাকাপাকি ভাবে কোম্পানী কর্তৃক ভারত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় ওয়েলেসলীর হাতে মারাঠাদের পরাজয়ের পর। বাংলায় ইংরেজদের ধনরত্ন লুণ্ঠনের সঙ্গে private trade ও informal empire এর যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু সুশীলবাবু ইওরোপীয়দের Private trade আলোচনা করতে গিয়ে তার সঙ্গে 'স্বায়ত্ব সাম্রাজ্যবাদ' বা 'sub-imperialism' কথাটি জুড়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অধীনে যখন কোনো দেশীয় সহকারী সম্প্রদায় পরাধীন সমাজের ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব উপভোগ করে তখন তাকে sub-imperialism বলে চিহ্নিত করা হয়। আফ্রিকায় ইউরোপীয় শাসকদের অধীনে একটি উপজাতি অন্যান্য উপজাতির ওপর যে কর্তৃত্ব চালাত তাকেই বিশেষ করে sub-imperialism বলা হতো। ভাবতে যদি এরকম sub-imperialism চিহ্নিত করতেই হয় তবে ইংরেজ শাসকদের অধীনে অসমীয়া, ওড়িয়া ও বিহারীদের ওপর বাঙালী ভদ্রলোকের কর্তৃত্বকে স্মরণ করা যায়, অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ প্রাইভেট ট্রেডারদের কর্তৃত্বকে নয়। শেষেরটি হল informal empire। কিন্তু সুশীলবাবু বলছেন, কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রাইভেট স্বার্থগুলিকে sub-imperialism আখ্যা দেওয়া যায়।[২১] চৌধুরী মশায় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের চর্চা করেন না বলে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন।

ওয়েলেসলীর প্রসারিত মনে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল ক্লাইভ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের ঘোলাটে মনে তা ছিল না, ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠনের অদম্য অভিলাষ। মীরজাফরের সঙ্গে তাঁরা যে গোপন চুক্তি করে নবাবের সর্বনাশ করেন তাতে

তাঁরা নির্দ্বিধায় সরকার চালনার কর্তৃত্ব দেন সেনাপতির হাতে, নিজেদের ভাগে রাখেন মোটা মোটা টাকার অঙ্ক। সে চুক্তিতে কোম্পানীর জন্য কলকাতা ও চব্বিশ পরগনা ব্যতীত একটিও নতুন জমি বা মাশুলহীন সওদা ছাড়া একটিও নতুন ক্ষমতা নির্দিষ্ট হয়নি। সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, ধনরত্ন লুণ্ঠন, ফরাসীদের বিতাড়ন এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন নবাব সরকার স্থাপন, এই ছিল ক্লাইভের লক্ষ্য। সেই থেকে informal empire-এর গোড়াপত্তন, এর পরিণতি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী কর্তৃক ভারতজোড়া 'প্যারামাউন্টসি' লাভ। এরই মধ্যে আস্তে আস্তে বাংলা থেকে মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে ও উত্তর ভারতে formal empire গড়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালে এর কোনো ছক বা পরিকল্পনা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল এক নয়। যে লুণ্ঠন, শোষণ ও শাসনের ক্রমাগত প্রসারে ভারতীয় সমাজ ১৮১৮ পর্যন্ত গোটা দেশ জুড়ে বিধ্বস্ত হতে থাকে, ১৭৫৭ সালে সেই বিস্তারের পরিকল্পনা হয় নি, ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে (সুশীলবাবুর মতানুযায়ী) তো নয়ই।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অপরিচিত এলাকায় নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে চৌধুরী মশায় কতকগুলি মজাদার তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, ইংরেজদের ফরোয়ার্ড পলিসি শুরু হয় লর্ড লিটনের আমলে নয়, এমন কি লর্ড অকল্যান্ডের সময়েও নয়, এ আরম্ভ হয় একেবারে স্যর জোসায়া চাইল্ডের অনুপ্রেরণায় (১৬৮১) বাদশাহ আরওরঙ্গজেবের সময়। এ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন অনাদি (জেরাল্ড অঞ্জিয়ার, জোসায়া চাইল্ড কর্তৃক পূর্বপরিকল্পিত) অন্য দিকে তেমন অনন্ত (পিটার মার্শাল, ক্রিস বেইলী এবং রজত কান্ত রায় মিলে এর জের টানছেন)। গীতার আত্মার মতো এ হল 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' এর যে কোনো কালক্রম বা ইতিহাসবাহী ধারা আছে সুশীলবাবুর লেখা পড়লে তা মনে হবে না। এ বাড়ে না এ কমে না, এ পরিবর্তনশীল নয়, সমস্ত দেহান্তরের মধ্যে দিয়ে এ এক।

আরো এক মজার কথা এই যে ক্লাইভের 'গর্ভনর জেনারেল' হবার বাসনাকে তিনি 'রাজ্য বিজয়' ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষণ বলে ভেবে নিয়েছেন : 'ক্লাইভ তাঁর পিতাকেই শুধু 'ভারতের গর্ভনর-জেনারেল' হওয়ার গোপন উচ্চাভিলাষের কথা জানিয়েছিল এবং তাকে 'ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপনীয়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন' করতে বলেছিল।' লিখতে গিয়ে তাঁর একবারো মনে হল না যে রাজ্য বিজয় করতে হবে ভারতবর্ষে, তার জন্য বিলেতে বুড়ো বাপকে লিখে কি হবে? লেখার সময় যদি তিনি একবার স্মরণ করতেন যে সাম্রাজ্য স্থাপনের শ খানেক বছর আগে থেকে ইংরেজ কোম্পানীর বড় সাহেবদের 'গর্ভনর' পদে নিয়োগ করা হতো এবং ফরাসী কোম্পানী সাম্রাজ্য বিস্তার করতে না পেরেও 'গভর্নর জেনারেল' পদে বড় সাহেব নিয়োগ করতে বাধা বোধ করে নি, তাহলে বিলেতে বাবাকে ঐ চিঠি লেখার সঙ্গে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে কোনো সম্পর্ক নেই সেটা বুঝতে পারতেন। কলকাতা পুনর্দখলের পর ক্লাইভের মনে আশা জেগেছিল কোম্পানী এবার গভর্নর জেনারেল পদ সৃষ্টি করে তাঁকে ঐ পদে নিয়োগ করবে এবং তখন তিনি বাবাকে লিখেছিলেনঃ

'I have written to my Lord Chancellor, the Archbishop. Mr. Fox and to my Lord Barrington, Secretary at war ...... I am desirous of being appointed Governor-General of India if such an appointment should be necessary. I have opened myself to Mr. Mabot; however I would have you manage this affair with great prudence and discretion and not mention the word Governor-General without you find it hinted at by other hands .. ..

I expect to return very shortly to the coast as all is over.'

সামরিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকলে সুশীলবাবু এখানে দুটো আলাদা রাজনীতির জগৎ দেখতে পেতেন। ক্লাইভের লক্ষ্য বিলেতের রাজনীতির জগৎ যেখানে অত্যন্ত গোপনে তিনি কোম্পানীর মধ্যে একটি নতুন পদ সৃষ্টির খেলা খেলতে চান। কিন্তু লন্ডনে গোপন চাল দিয়ে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার হয় না এটা বলাই বাহুল্য। 'অত্যন্ত গোপনে' রাজ্য জয় হয় না এবং বিলেতে চাল চেলে বাংলায় রাজ্য জয় তো হয়ই না। বাংলার রাজতন্ত্র আর এক রাজনীতির জগৎ এবং তখনো পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্যের বাইরে। কারণ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়লেই বোঝা যাবে যে কলকাতা পুনরুদ্ধার ও আলিনগরের আহাদনামার পর তিনি ঐ মুহূর্তে আর বাংলায় যুদ্ধবিগ্রহের কথা চিন্তা করছিলেন না। তিনি সে সময় খুব শীগ্‌গির মাদ্রাজ ফিরে যাবেন আশা করছেন। দেশীয় রাজনীতি যে তাঁকে মাদ্রাজ ফিরতে না দিয়ে পলাশী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে সেটা তিনি তখনো জানতেন না ('অল ইজ ওভার')।[২৫]

ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে মাদ্রাজ কাউন্সিল পাঠিয়েছিলেন এবং মাদ্রাজ কাউন্সিল অভিযানের উদ্দেশ্য বিশদভাবে রেজলিউশনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'ফ্রম প্রস্পারিটি টু ডিক্লাইন' নামক বইয়ে সুশীলবাবু লিখেছেন, 'দিস অ্যাকচুয়ালি ওপেনড্ দ্য ফ্লাডগেট্‌স্ অফ দ্য কন্‌স্‌পিরেসি' এবং প্যারিসে লিখিত ঢাকায় পঠিত রচনাটিতে লিখেছেন, 'ইট ওয়াজ দ্য ম্যাড্রাস রেজলিউশন হুইচ ওপেনড্ দা ফ্লাড গেট্‌স্ অফ দ্য কন্‌স্‌পিরেসি'। 'ফ্লাডগেট্‌স' খুলে একটা 'কন্‌স্‌পিরেসি' করা আশ্চর্য প্রক্রিয়া হতে পারে তবে সফল প্রক্রিয়া হতে পারে কি? বার বার বিভিন্ন লেখায় সুশীলবাবু মাদ্রাজ রেজলিউশন থেকে কয়েকটি বাছা বাছা বাক্য বা একই বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন। বারে বারেই রেজলিউশনে লিখিত বিপরীত কথাগুলি সযত্নে বাদ দিয়ে গেছেন। মাদ্রাজ কাউন্সিল থেকে ক্লাইভ যেমন নবাবের বিরুদ্ধ দলগুলির সঙ্গে যোগসাজসের পরামর্শ পেয়েছিলেন আবার তেমনি এ আদেশও পেয়েছিলেন যে নবাব শান্তির প্রস্তাব করলে যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়ে যেন তাঁর সঙ্গে সমঝোতায় আসা হয়। এই কথা মতো নবাবের সঙ্গে আলিনগরের সুলেনামা সম্পাদিত হয় এবং তারপর ক্লাইভ ও ওয়াটসন বাংলা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মাদ্রাজ ফিরবার তোড়জোড় করেন (All operations therefore are now over, and I may hope in [a] few days to take my passage for the coast with the satisfaction of having left your affairs well re-

established and a general tranquility in the province (Clive to Secret committee at London, 22 February 1757)। এমন সময় ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই বেঁধে যাওয়ায় চাকা ঘুরে গেল। মুর্শিদাবাদে যে চক্রান্ত মাদ্রাজ কাউন্সিলের চক্রগঠন পরামর্শের আগেই শুরু হয়ে গেছিল তা পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠল।

সুশীলবাবুর বক্তব্য, চক্রান্ত মীরজাফর শুরু করেন নি। তিনি দাবার চালের বোড়ে ছাড়া কিছু নন। তিনি কার হাতের বোড়ে এ কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলছেন কোম্পানী, আর একবার জগৎশেঠ। এ দুটো কথা যে একই সঙ্গে সমানভাবে সত্যি হতে পারে না সেটা তাঁর খেয়াল হয় নি। যদি এ কথা বলতেন যে জগৎশেঠও আসলে কোম্পানীর হাতের বোড়ে, তাহলে অবশ্য এই আপাত বিরোধ মিটে যেত, কিন্তু তা তিনি বলছেন না এবং কথাটা সত্য ও নয়। জগৎশেঠ ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, বরঞ্চ ইংরেজরাই জগৎশেঠের ওপর কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল বলা চলে। এখন প্রশ্ন হল, মীরজাফর আদৌ বোড়ে কি না এবং বোড়ে হলে কার হাতের বোড়ে, কোম্পানীর না জগৎশেঠের?

প্রথমে সুশীলবাবু কোম্পানীর কথা তুলেছেন। তাঁর মতে ষড়যন্ত্রের 'আইডিয়া' প্রথমে মীরজাফরের মাথায় খেলে নি, এ আইডিয়া সর্বপ্রথম মাদ্রাজ কাউন্সিল থেকে প্রসূত হয়েছিল।[১১] কালক্রমে দেখলে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মাদ্রাজ কাউন্সিল ক্লাইভকে যোগসাজশ করার পরামর্শ দেবার আগেই মীরজাফর পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎ জঙ্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিলেন। সে চক্রান্ত শওকৎ জঙ্গের মৃত্যুতে ভেস্তে যাওয়ার পর তিনি খোজা পেত্রস মারফৎ ইংরেজদের সঙ্গে সাজশ করেন। চক্রান্ত মাদ্রাজে বা কলকাতায় নয়, শুরু হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। পূর্ণিয়ার সঙ্গে যোগসাজশ ফলপ্রসূ না হওয়ায় কলকাতার সঙ্গে যোগসাজশ করতে হয়েছিল। ফার্সি 'সিয়ার' প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবতাবায়ী, শওকৎ জঙ্গের অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা ছিলেন এবং পূর্ণিয়ার নবাবের সব গোপন চিঠিপত্র দেখতেন। তিনি স্বচক্ষে মীরজাফরের লেখা এক চিঠি দেখেছিলেন। ফার্সি তাওয়ারিখের প্রতি ইসলামিক হিস্ট্রী ও কালচারের অধ্যাপকের অনীহা সুপরিজ্ঞাত। ইংরেজদের ধামাধরা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান ডক্টর চৌধুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ঐ চিঠি জাল করে রেখেছিলেন, এমন একটা সন্দেহ সুশীলবাবু পোষণ করেন কি না জানি না। তবু মীরজাফর শওকৎ জঙ্গকে কি লিখেছিলেন 'সিয়ার' থেকে তা তুলে দিচ্ছি :

'এখানকার বহু আমীর ওমরাও মনসবদারান্ এবং মীরজাফর স্বয়ং, সৈয়দ আহমদ খানের বেটার দিকে (অর্থাৎ শওকৎ জঙ্গের দিকে) চেয়ে আছেন, একমাত্র তিনিই সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র রোজ রোজ বেড়ে ওঠা জুলুম থেকে সকলকে খালাস করতে পারেন। তিনি (মীরজাফর) কসম দিয়ে বলছেন, তাঁকে (শওকৎ জঙ্গকে) সকলে জান কবুল করে মদৎ করবে, কারণ এই অভিযান খুব সহজে সম্পন্ন হবে, শুধু একজনের তখ্‌তে বসা দরকার। এবং সেক্ষেত্রে কতকগুলি শর্তে অন্যরা সকলে মিলে তাঁকে (শওকৎ জঙ্গকে) তখ্‌তে বসাতে তৈরী থাকবে।'

এই চিঠি মীরজাফর কলকাতা থেকে ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে লিখেছিলেন। তখনো মাদ্রাজ থেকে ফৌজ পাঠাবার যোগাড়যন্ত্র হয় নি। ষড়যন্ত্র মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষদের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, পরে তাতে কোম্পানীর সাহেবরা ঢুকে পড়েন। সেটা ঘটনাক্রমে। শওকৎ জঙ্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্র সফল হলে মোগল রাজপুরুষরা সাবিৎ জঙ্গ অর্থাৎ ক্লাইভের দিকে ঝুঁকতেন না। বস্তুত মীরজাফর প্রথম দিকটায় ইংরেজদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি। তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা দূরে থাকুক, রীতিমত লড়াই করে তিনি তাদের ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উৎখাত করেছিলেন। তাঁর নজর নিবদ্ধ ছিল শওকৎ জঙ্গের দিকে। সেখানে নিরাশ হয়ে তিনি সাবিৎ জঙ্গের দিতে নজর দিতে বাধ্য হন।

সৈয়দ গোলাম হোসেন খানের ধারণা ছিল, মীরজাফরের পিছনে জগৎশেঠ গোপনে আছেন। তবে শওকৎ জঙ্গের মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নি। জগৎশেঠের কাছ থেকে কোনো চিঠি পেলে তিনি উল্লেখ করতেন।[২৮]

তবে কি মীরজাফর জগৎশেঠেব বোড়ে? সুশীলবাবু বলছেন, তাই। আমার মনে হয় সেটা বাড়িয়ে বলা। দরবারের কোনো কোনো আমীর জগৎশেঠের কাছ থেকে ভাতা পেতেন, যেমন মীর খুদা ইয়ার খান লতিফা। কিন্তু ফৌজের বক্শী মীরজাফব ও সবের উর্দ্ধে ছিলেন। এ কথা ঠিক যে দরবারে জগৎশেঠের স্থান মীরজাফরের ওপরে ছিল (কারণ জগৎশেঠ স্বয়ং বাদশাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত, মীরজাফর সুবাদার কর্তৃক), কিন্তু বক্শী পদে নিযুক্ত মীরজাফর দরবারের প্রধান সেনাপতি রূপে গণ্য হতেন। তবে এমন ভাবলে অন্যায় হবে না যে, সব ওমরাওদের মতো মীরজাফর নিজেও কতক পরিমাণে জগৎশেঠের মুখাপেক্ষী ছিলেন। সেটা অস্বাভাবিক নয়, ওমরাওদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে উঁচু, সুবাদার নিজে, তিনিও জগৎশেঠকে সমঝে চলতেন (সিরাজ সমঝে না চলে নিজের সর্বনাশ করেছিলেন)। সে যাই হোক, মীরজাফরকে জগৎশেঠের 'বোড়ে' বলে গণ্য না করলেও জগৎশেঠকে মীরজাফরের 'মন্ত্রী' বলে গণ্য করা যেতে পারে।

তা যদি হয়, তবে মীরজাফরকে ক্লাইভের বোড়ে বলা চলে না। প্রকৃত তথ্য এই যে, জগৎশেঠই ভেতর থেকে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়িয়ে ছিলেন।[২৯] সুশীলবাবু সে কথা মানেন, শুধু মানেন বললে হবে না, তাঁর ভাবে বোধহয় এ যেন এক নতুন তথ্য যা তিনি প্রথম পেশ করেছেন। ইদানীং মীরজাফরের এক বংশধরও ঐ রকম একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও সুশীলবাবু জে. এইচ. লিট্ল্ লিখিত 'দ্য হাউস অফ জগৎশেঠ' নামক রচনাটি এই প্রসঙ্গে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি, তবু মুর্শিদাবাদের এই ইংরেজ হেডমাস্টার, যিনি 'অন্ধকূপ' গল্পের অসত্যতা দেখিয়ে দেন, তিনিই প্রথম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে পলাশীর ষড়যন্ত্রের পেছনে আসল লোক জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপ চন্দ।[৩০] সুশীলবাবু লিট্ল্ সাহেবের ধার ধারেন না। মীরজাফরের বংশধরের মতোই সুশীলবাবুও দেখাতে চাইছেন, মীরজাফর এবং বিশ্বাসঘাতক এ দুটো কথা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সমার্থক হয়ে গেছে। তিনি বলছেন, 'সন্দেহ নেই এমন একটা বিরূপ সংস্কার বহু দিন ধরে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে চলে আসছে যে পলাশীর

ষড়যন্ত্র ও পরাজয় কেবলমাত্র মীরজাফরেব কলকাঠি নাড়ানোর ফলে সংঘঠিত হয়।[৬১] সুশীলবাবুর ভাবে বোধ হচ্ছে, তিনিই এই ভুলটা প্রথম ভেঙে দিয়ে যবনিকার অন্তরাল থেকে জগৎশেঠকে টেনে বের করে এনেছেন। এ হল তাঁর 'আলাদা গল্প', তাঁর 'নতুন ব্যাখ্যার প্রয়াস'। এখন লোকে যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, এমন কটা লোক তাঁর সন্ধানে আছে যারা এই ধারণা পোষণ করে যে পলাশীর ষড়যন্ত্র কেবলমাত্র মীরজাফরের কলকাঠি নাড়ানোর ফলে সংঘটিত হয়, তবে সুশীলবাবু ধামা থেকে বের করে কটা ছায়া দেখাতে পারবেন যাদেব সঙ্গে কুস্তি করে তাঁর গায়ে ব্যথা হয়েছে? যত দূর মনে পড়ে, আমাদের স্কুলের প্রায় সব কটা ছেলেই জানত যে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন মীরজাফর, রায় দুর্লভ ও জগৎ শেঠ। ছেলেদের কাছে সুশীলবাবু কি নতুন কথা জানালেন? যে জগৎ শেঠই এঁদের মধ্যে নাটের গুরু? সে বলবাব জন্য সুশীলবাবুর অপেক্ষা বাখে না। বহু দিন আগে লিট্‌ল্ সাহেব তা বলে গেছেন।

সভাপতির বক্তৃতায় সুশীলবাবু বলছেন, '. ......without the British involvement the conspiracy would not have in all probability ripened enough to bring about the fall of the Nawab'। অথচ প্যারিসে লিখিত রচনাটিতে তার আগেই বলে রেখেছেন ঃ 'Probably there would have been a revolution in 1757 even without the role played by the English as there had been two revolutions earlier without any English hand.' দুটো কথা একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না। কোনটা যে তাঁর আসল বক্তব্য বোঝা শক্ত। কর্নেল ক্লাইভ ও মঁসিয়ে লা উভয়েব সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, 'দ্য হাউস অফ দ্য জগৎ শেঠস্ ওয়াজ্ দ্য মেইন ফোর্স বিহাইণ্ড দ্য কন্‌স্‌পিরেসি'। এখন যে হেতু তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে 'উইদাউট দ্য ইনট্রিগ্‌স্ অফ দি হাউস অফ জগৎ শেঠ, দ্য রেভলিউশন ইন বেঙ্গল উড হ্যাভ নেভার টেকন্ প্লেস'; অতএব তাঁর মত এ হতে পারে না যে 'ইন দ্য ফাইনাল অ্যানালিসিস, দ্য রেভলিউশন উড নট হ্যাভ বীন পসিবল্ উইদাউট দ্য ব্রিটিশ হু রিয়ালি সো'ড দ্য সীড্‌স্ অফ দ্য কন্‌স্‌পিরেসি'। অথচ সেটাই তাঁর ফাইনাল কথা।

সুশীলবাবুর মতে ইংরেজরাই টাকা দিয়ে দরবারের প্রধান প্রধান লোকদের বশ করে তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে জোর করে টেনে এনেছিল, যদিও তাদের বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। টাকা দিয়ে বশ করার ব্যাপারে ল এর সাক্ষ্য তিনি যথাযথ ভাবে পেশ করেন নি। মঁসিয়ে ল এবং মিস্টার ওয়াট্‌স্ ছিলেন দরবারে প্রতিপক্ষ। দুজনেই ঘুষ দিয়ে দরবারে দল গঠন করতে চেষ্টা করছিলেন। এর উদ্দেশ্য নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয়, ইংরেজ-ফরাসী প্রতিযোগিতাই এখানে মুখ্য। ল টাকা দিয়ে নবাবের ফৌজকে চন্দননগর রক্ষা করতে পাঠাতে চাইছিলেন, আর ওয়াট্‌স্ টাকা দিয়ে সেটা আটকাতে চাইছিলেন। ওয়াট্‌সের হাতে বেশী টাকা, তাই টাকার খেলায় তিনিই জিতে গেলেন। ইংরেজরা চন্দননগর থেকে ফরাসীদের উৎখাত করল, নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে ল কে বের করে দিলেন।

ওয়াট্‌স্ টাকা দিয়ে যাদের বশ করেছিলেন তারা দরবারের নিম্নস্তরের লোক — মীরজাফর, রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ নন। তাঁদের টাকা দিয়ে বশ করার মতো টাকা ইংরেজদের ছিল না, আর সেটা ইংরেজদের উদ্দেশ্যও ছিল না। তাদের লক্ষ টাকা বিলোন নয়, টাকা লুঠ করা। মীরজাফর, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার সময় তারা কড়ার নিয়েছিল যে মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে তাঁরা আড়াই কোটি টাকা বের করে তাদের হাতে দেবেন। এখানে কে কাকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করতে গেছিল সেটা ঘোলাটে ব্যাপার। শেঠ সওদাগর আমীর ওমরাহরা ভেবেছিলেন তাঁরা টাকা দিয়ে ইংরেজদের দলে টেনে নিজেরা রাজত্ব করবেন। ইংরেজরা ভেবেছিল তারা নতুন নবাবকে গদিতে বসিয়ে দু হাতে টাকা লুঠবে এবং কোম্পানীর জন্য আদায় করে নেবে অবাধ বাণিজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার। দুদিক থেকেই নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল। দেশীয় ষড়যন্ত্র বিদেশী ষড়যন্ত্রের আগে শুরু হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের এই দেশীয় দিকটা ইদানিং কালে খুঁটিয়ে দেখা শুরু হয়েছে, কিন্তু জে.এইচ. লিট্‌ল্ অনেক দিন আগেই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। ইউরো সেন্ট্রিক ঐতিহাসিকদের এ দিকে আগ্রহ কম আর সুশীলবাবু ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা বলে প্রমাণ করতে এতোই ব্যস্ত যে এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু দেশীয় রাজপুরুষদেব বাদ দিয়ে ষড়যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।

৭

সুশীলবাবু এই ষড়যন্ত্রকে দেখেছেন ইংরেজদের দিক থেকে, সেটি একতরফা হয়ে গেছে। তাঁর বক্তব্য ইংরেজী দলিলগুলো দেখলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইংরেজরাই প্রথম দরবারের অসন্তুষ্ট লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ ব্যাপারে তাঁর মতে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবতাবায়ী, রবার্ট ওর্ম এবং বর্তমান লেখকের বক্তব্য ভুল[১১], অর্থাৎ দেশী ষড়যন্ত্রীরা প্রথমে ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশ করতে আসে নি। বর্তমান লেখকের কথা থাক। দুশো বছর আগেকার গোলাম হোসেন খান এবং রবার্ট ওর্ম কালজয়ী লেখক। সুশীলবাবু ও আমার লেখা যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে তখনও 'সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরীন' এবং 'মিলিটারী ট্র্যানজ্যাকশন্‌স্ ইন ইন্দোস্তান' পঠিত হবে। ইংরেজী দলিলের প্রতি আস্থাশীল এবং বিকৃত ধামাধরা ফার্সি লেখকদেব প্রতি বিরূপ সুশীলবাবু 'সিয়ার' পড়লে অবশ্যই দেখে থাকবেন যে তা থেকে একটি ছবিই বেরিয়ে আসে। তা হল এই ঃ ষড়যন্ত্র শুরু হয় মুর্শিদাবাদে, প্রথমে যোগাসাজস করা হয় পূর্ণিয়ার নবাবের সঙ্গে, তা ভেস্তে যাবার পর ইংবেজদের সঙ্গে। ওর্ম সাহেবও একই কথা বলেছেন এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন। 'ধামাধরা' গোলাম হোসেন খানের দোহাই নাই দিলাম। ইংরেজী দলিলগুলিই ধর্তব্য থাক। সুশীলবাবু দলিলগুলি পেয়েছেন প্রধানত হিল সাহেবের সংগ্রহ থেকে, হিল সাহেব পেয়েছেন মূলত ওর্ম সাহেবের সংগ্রহ থেকে। দলিলগুলির পশ্চাৎপট ও ভিতরের অর্থ ক্লাইভের বন্ধু ওর্ম যত দূর জানতেন, তা আজ আর কেউই জানবে না, জানা সম্ভব নয়। তাই দলিলগুলি থেকে খামচি মেরে

কিছু উদ্ধৃতি দিলেই ওর্ম সাহেবকে বিভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা যাবে না। সে জন্য সুশীলবাবু এ পর্যন্ত যা করেছেন তার থেকে কিঞ্চিৎ অধিকতর 'পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ' কাজ করতে হবে।

কে আগে কার সঙ্গে সাজশ শুরু করেন, এর উত্তর ঃ- মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষরা আগে ইংরেজদের সঙ্গে সাজশ করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু এ প্রশ্ন কতক পরিমাণে অবান্তর বলেই ধরতে হবে। আসল কথা এই যে, ষড়যন্ত্র আলাদা আলাদা ভাবে আগে মুর্শিদাবাদে ও পরে ক্লাইভের শিবিরে উৎপন্ন হয় এবং জানাজানি হবার পর দুদিক থেকে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে, এ পাশ থেকে এক চাল, ও পাশ থেকে আরেক চাল। ইংরেজদের দিকের চালগুলি আমরা ইংরেজদের দলিল থেকে সহজে দেখতে পাই। মুর্শিদাবাদে রাজপুরুষদের দিকের চাল আমরা অত সহজে দেখতে পাই না, কারণ ফার্সি দলিলপত্র কিছু নেই, ইংরেজী কাগজপত্র থেকেই সেই রোজনামচা প্রস্তুত করতে হয়। দলিল থেকে রোজনামচা প্রস্তুত করতে হলে প্রধান দলিল সংগ্রাহক ওর্ম সাহেবের নির্দেশনার ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হওয়াই বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদের পক্ষে নিরাপদ।

উভয়পক্ষের জানা চালগুলি (মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্রীদের বেশীর ভাগ চালগুলি কিন্তু অজানা) তারিখ বা মোটামুটি কালসীমা অনুযায়ী সাজালে যে রোজনামচা দাঁড়ায় তার একটি অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রূপ পাঠকের সুবিধার জন্য তুলে দিচ্ছি।

১১ই জুলাই ১৭৫৬	ঃ	কলকাতা বিজয়ী সিরাজের মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন।
জুলাই-আগষ্ট	ঃ	নবাবের বিরুদ্ধে মীরজাফর ও শওকৎ জঙ্গের ষড়যন্ত্র।
আগষ্টের শেষ দিক	ঃ	শওকৎ জঙ্গের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ জগৎশেঠ অবরুদ্ধ।
২৯ আগষ্ট ১৭৫৬	ঃ	মীরজাফর কর্তৃক জগৎ শেঠ খালাস।
আনুমানিক ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৭৫৬	ঃ	সিরাজের পূর্ণিয়া অভিযান।
১৩ই অক্টোবর ১৭৫৬	ঃ	মাদ্রাজ কাউন্সিল কর্তৃক ইংরেজ ফৌজের প্রতি নবাবের বিরুদ্ধপক্ষের সহিত যোগস্থাপনের নির্দেশ।
১৬ই অক্টোবর ১৭৫৬	ঃ	শওকৎ জঙ্গ মনিহারী যুদ্ধে নিহত।
২ জানুয়ারী ১৭৫৬	ঃ	ইংরেজ ফৌজ কর্তৃক কলকাতা পুনরুদ্ধার।
৯ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ (ও তৎপর)	ঃ	আলিনগরের সুলেনামা। অতঃপর ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ওয়াট্স্ কর্তৃক মুর্শিদাবাদ যাত্রা। নবাবের পক্ষে সহযাত্রী আমিরচন্দ, কোম্পানীর পক্ষে খোজা পেত্রস।
নভেম্বর ১৭৫৬ এপ্রিল ১৭৫৭	ঃ	দরবারে নবাবের বিরুদ্ধ নানা দাবিদার সংক্রান্ত কানাঘুষোঃ (১). মারাঠা সমর্থিত কটকের নবাব

মীর্জা সালেহ্ (২) শওকৎ জঙ্গের ছেলে (৩) ভূতপূর্ব নবাব সরফরাজ খানের ছেলে আগা বাবা (৪) দোহাজারী মনসবদার মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ[৩৩]।

মার্চ ১৭৫৭ ওয়াট্‌স্ ও ল ঘুষ দিয়ে দরবারে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দল গঠন প্রতিযোগিতায় নিরত। জগৎশেঠের চক্রান্তে ওয়াট্‌সেব জয় - নবাবী ফৌজ ফরাসীদের সাহায্যার্থে চন্দননগর পৌঁছল না। 'যেভাবেই হোক নতুন নবাব বানাতে' জগৎ শেঠ আগ্রহী - নবাব ল এব মুখে একথা শুনেও জগৎ শেঠের চক্রান্তর কথা বিশ্বাস কবলেন না।

২৩ মার্চ ১৭৫৭ : ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগর দখল। অতঃপর বর্ষাশেযে মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন সঙ্কল্প।

এপ্রিলেব গোড়া : আমীরচন্দ কর্তৃক দরবারে ও জগৎ শেঠের বাড়িতে আনাগোনা এবং ইংরেজ কুঠিতে গিয়ে ওয়াট্‌সের কাছে নানা কানাঘুষো জ্ঞাপন।

৮ই এপ্রিল ১৭৫৭ : নবাগত স্ক্র্যাফটন ক্লাইভ কর্তৃক দরবারে নবাব বিরোধী দলের মতিগতি লক্ষ্য রাখার জন্য আদিষ্ট। সেই মতো ওয়াট্‌স্‌কে স্ক্র্যাফটনের উপদেশ দান।

৯ই এপ্রিল ১৭৫৭ : স্ক্র্যাফটন ওয়াল্‌শ্‌কে চিঠিতে লিখলেন, নবাব বদলের জন্য ওয়াট্‌স্‌কে দরবারে দল গঠনের পরামর্শ দেওয়া হোক।

১১ই এপ্রিল ১৭৫৭ : ওয়াট্‌স্ ক্লাইভকে লিখলেন, 'ওমিচন্দ ও আমি এমন একটা বিষয়ের ওপর আলাপ আলোচনা করতাম যে সম্পর্কে আপনাকে কি বলবো জানতাম না। স্ক্র্যাফটনের কাছে আমি মন খুলে কথা বলে তাঁর কাছ থেকে জানলাম আপনার ও মেজরের (কিলপ্যাট্রিক) জন্য আমার খিদমৎ আপনার কাছে কটু ঠেকবে না।' বিষয়টি চিঠিতে অনির্দিষ্ট। সম্ভবত নবাবের বিরুদ্ধ দলের গতিবিধি সংক্রান্ত।

১৩ এপ্রিল ১৭৫৭ : ল ও তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার দাবীতে ক্রুদ্ধ সিরাজ দরবারে ওয়াট্‌স্ এর গর্দান নেবেন বললেন। মোহনলাল বহু দিন যাবৎ বিষক্রিয়ায় শয্যাগত, ল নবাবের একমাত্র সহায়।

১৬ এপ্রিল ১৭৫৭ : জগৎ শেঠের অভিসন্ধিমূলক পরামর্শে ল বহিষ্কৃত, নবাব সহায়হীন। ষড়যন্ত্রের দ্বার উন্মুক্ত।

১৭ এপ্রিল ১৭৫৭ : আমীরচন্দ স্ক্র্যাফটনকে পরামর্শ দিলেনঃ 'যদি . নবাব.....কোনভাবে চুক্তিভঙ্গ করেন তবে আমাদের তাঁকে ত্যাগ করে অন্য নবাব খাড়া করা উচিত। (ইয়ার) লতিফ একজন উপযুক্ত, চরিত্রবান লোক যাঁকে জগৎশেঠ সমর্থন করেন এবং যিনি ২০০০ ঘোড়া নিয়ে আমাদের দলে যোগ দেবেন।'

২০ এপ্রিল ১৭৫৭ : আমীরচন্দ ইয়ার লতিফ খানকে নবাব বানানোর ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে জগৎশেঠের কুঠি গেলেন। স্ক্র্যাফটন ক্লাইভকে এ খবর চিঠিতে জানালেন।

২৩ এপ্রিল ১৭৫৭ : আমীবচন্দ উক্ত মীর খুদা ইয়ার খান লতিফেব সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। নবাব হবার জন্য লতিফ ইংরেজদের দলে টানতে আগ্রহী। ওয়াট্‌স্ ক্লাইভকে ঐ দিনই রাত্রে সেই মর্মে চিঠি লিখলেন (সম্ভবত পরের দিনই ঐ চিঠি কসিদের হাতে রওনা হয়ে ২৫ তারিখে ক্লাইভের হাতে পৌঁছয়)।

এদিকে ইংরেজ শিবিরে সিলেক্ট কমিটিব বৈঠক। ক্লাইভের নিকট স্ক্র্যাফটনের ২০ তারিখের চিঠির ভিত্তিতে সাব্যস্ত হল ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষদের বাজিয়ে দেখবেন নবাবের বিরুদ্ধে কোন অভ্যুত্থান ঘটানো যায় কি না।

২৪ এপ্রিল ১৭৫৭ : আমীরচন্দ সারা দিন জগৎশেঠকে মুরুব্বি ধরে ইয়ার লতিফ খানকে নবাব করার চক্রান্তে সক্রিয়।

আমীবচন্দকে না জানিয়ে মীরজাফর অতি সন্তর্পনে খোজা পেত্রসকে ডেকে পাঠালেন এবং পেত্রস মারফৎ ওয়াট্‌স্‌কে জানালেন, 'তিনি, রহিম খান, রায় দুর্লভ, বাহাদুর আলি খান এবং আরো কেউ কেউ দল বেঁধে নবাবকে গ্রেপ্তার করে পছন্দ মতো আর কাউকে নবাব বানানোর জন্য তৈরী আছেন'।

২৬ এপ্রিল ১৭৫৭ : ক্লাইভ অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে দরবারের খবরাখবর জ্ঞাপন করলেন। স্ক্র্যাফটন ও ওয়াট্‌সের কাছ থেকে ইয়ার লতিফ খান সংক্রান্ত যেসব চিঠি তিনি পেয়েছিলেন তা ছাড়া তিনি ইতিমধ্যে অন্য সূত্রে আর একটি খবর পেয়েছেন। লখাই কুণ্ডু নামে এক দালালের মাধ্যমে খোজা ওয়াজিদের গোমস্তা শিব বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানালেন মীরজাফর ও

জগৎশেঠ মিলে নবাবকে কেটে ফেলবার তালে আছেন। মীরজাফর ও ইয়ার লতিফ খানের চাল যে আলাদা তা তখন ক্লাইভ বোঝেন নি, তিনি অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে লিখলেন মীরজাফর লতিফকে নবাব করতে আগ্রহী (মীরজাফর কিন্তু ওয়াট্‌সের কাছে পছন্দসই নবাবের কথা বলেছিলেন, লতিফের নাম করেননি।)

কাশিমবাজার থেকে ওয়াট্‌স্ পেত্রস-মীরজাফর সংবাদ জানিয়ে ক্লাইভকে পরামর্শ দিলেন, ইয়ার লতিফ খানের প্রস্তাব অপেক্ষা মীরজাফরের প্রস্তাব আরো উপযুক্ত।

২৮ এপ্রিল ১৭৫৭ : স্ক্র্যাফটন মীরজাফরের চক্রান্ত জ্ঞাত নন বলে আমীরচন্দের প্রকল্প সমর্থন করে ক্লাইভকে লিখলেন। ক্লাইভ তখনো ওয়াট্‌সের মীরজাফর সংক্রান্ত চিঠি (২৬ এপ্রিল) পান নি, তিনি ওয়াট্‌সের কাছে জানতে চেয়ে পাঠালেন আহমদ শাহ আবদালি এসে পড়লে লতিফের চক্রান্ত ভেস্তে যাবে না তো? ওয়াট্‌স্ এদিন ক্লাইভকে খবর পাঠালেন আবদালি দেশে ফিরে যাচ্ছেন, তাই নবাব নির্ভয় হয়ে ভারী উদ্ধত ব্যবহার করছেন। মীরজাফরই তাঁর উপযুক্ত ওষুধ। কিন্তু ওয়াট্‌সের চালে একটা ভুল হল। স্ক্র্যাফটনকে না জানালেও আমীরচন্দকে তিনি পেত্রস-মীরজাফর সংবাদটা (মীরজাফরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) দিয়ে ফেললেন। আমীরচন্দ, স্ক্র্যাফটনের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁকে খবরটা দিলেন না, কিন্তু তাঁকে জানালেন, জগৎ শেঠ অন্য আরেক জন অনামা দাবীদারকে পুরো সমর্থন করেন।

৩০ এপ্রিল ১৭৫৭ : ক্লাইভ মাদ্রাজে খবর পাঠালেন, নবাবের বিরুদ্ধে জগৎ শেঠ ও খোজা ওয়াজিদের নেতৃত্বে চক্র গঠিত হয়েছে। মীরজাফরকে নবাব বানাতে তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

১ মে ১৭৫৭ : সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে মীরজাফরের প্রস্তাব গৃহীত।

উপরোক্ত রোজনামচা প্রস্তুত করতে গিয়ে আমি প্রধানত ঘটনার দিন বা তার পরের দিনকার ইংরেজী চিঠিগুলির (ক্লাইভ, ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটন লিখিত) উপর নির্ভর করেছি। সুশীলবাবুর বক্তব্য এই যে ইংরেজরাই প্রথম চাল চেলেছিল। দেশীয় রাজ

পুরুষরা প্রথম চাল চেলেছিল এই বক্তব্যটিকে তিনি ষড়যন্ত্র মনে করেন। এই ষড়যন্ত্রে জড়িত আছেন গোলাম হোসেন খান, রবার্ট ওর্ম, এস.সি.হিল, পি.জে.মার্শাল, সি.এ. বেইলী এবং বর্তমান লেখক। উদ্দেশ্য দেশীয়দের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ইংরেজদের দোষ স্খালন। তাঁর তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ভারতপ্রেমী ঐতিহাসিক জে.এইচ.লিট্‌ল্, যিনি সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'দ্য প্লট এগেনস্ট সিরাজ-উদ-দৌল্লা হ্যাড ইট্‌স্ অরিজিন ইন মুর্শিদাবাদ অ্যাণ্ড নট ইন ক্যালকাটা'।

এখন সেকালের সাক্ষ্যগুলো ঠিকভাবে যাচাই করতে হলে অন্য একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে। তা হল এই যে সে সময় ইংরেজদের দোষ স্খালনের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। বরং একটা বিপরীত ধরণের স্বার্থ নিহিত ছিল এক্ষেত্রে। তা হল ষড়যন্ত্র এ নিজের ভূমিকা বড় করে দেখিয়ে পুরস্কার অর্জন বা বাহবা কুড়োনো। জগৎশেঠ ও মীরজাফর অবশ্য নিজেদের ভূমিকা গুপ্ত রাখতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ওয়াট্‌স্, স্ক্র্যাফটন, খোজা পেত্রস এঁরা পুরস্কার বা বাহবার আশায় পলাশীর যুদ্ধের পর, এমন কি ষড়যন্ত্র চলাকালীন সপ্তাহগুলিতে পর্যন্ত নিজেদের ভূমিকা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমীরচন্দের ভূমিকাটি কেটে বাদ দিতে তাঁরা একমত হলেও নিজেদের মধ্যে তাঁদের রেষারেষি ছিল। ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটনের মধ্যে এই রেষারেষি বিশেষ করে দেখা যায়। খোজা পেত্রসও আমীরচন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এতসব স্বার্থ ভেদ করে তাঁদের সাক্ষ্য থেকে আসল ঘটনাটি বের করা সোজা নয়। কিন্তু রোজনামচায় ষড়যন্ত্রের কালক্রম অনুসরণ করলে দুটো জিনিস সবার চোখে পড়বে : ১) পূর্ণিয়ায় ষড়যন্ত্র প্রথমে এবং পলাশীর ষড়যন্ত্র তৎপরে উদ্ভূত হয় ২) পলাশীর ষড়যন্ত্রে প্রথম যাঁর গুপ্ত অবস্থান বেরিয়ে আসছে তিনি জগৎশেঠ (২৩ মার্চের অব্যবহিত আগে ল এর সাক্ষ্যে) এবং তারপর যাঁর তৎপরতা প্রকাশ পাচ্ছে তিনি আমীরচন্দ (১১ এপ্রিলের কিছু দিন আগে, ওয়াট্‌সের সাক্ষ্য ও পরে স্ক্র্যাফটনের সাক্ষ্য)।

সুশীলবাবু বলতে চান, তা নয় ইংরেজরাই প্রথম দরবারের অসন্তুষ্ট লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করে। বিশেষ করে ওয়াট্‌স্, স্ক্র্যাফটন, ক্লাইভ ও সিলেক্ট কমিটি এ ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। তাঁর লেখার ভাবে মনে হয় আমীরচন্দও যেন ইংরেজ পক্ষের লোক[৩৪]। বিপুল ধনবান আমীরচন্দ দরবারে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে অবিশ্বাস করে কলকাতা পুনর্দখলের সময় আটক করেছিল। নবাব তাঁকে চেয়েছিলেন বলে ওয়াট্‌স্ তাঁকে সাথে নিতে রাজি হন। অতএব আমীরচন্দকে একইসঙ্গে দরবারের ও ইংরেজ পক্ষের লোক বলে ধরতে হবে। বরং ক্ষুদে ব্যবসাদার খোজা পেত্রসকে শুধু ইংরেজ পক্ষের লোক বলে ধরলে তত অন্যায় হবে না। ইয়ার লতিফ খান এবং মীরজাফর সম্বন্ধে সুশীলবাবুর বক্তব্য এই যে ওয়াট্‌স্ এবং স্ক্র্যাফটন এই দুজনই আমীরচন্দের মাধ্যমে আগ বাড়িয়ে ইয়ার লতিফ খানকে ষড়যন্ত্রে টেনে আনেন, আর ওয়াটস নিজে খোজা পেত্রসের মাধ্যমে মীরজাফরের দিকে আগ বাড়িয়ে গিয়ে সেনাপতিকে পাকড়াও করেন। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি যত সরল ভেবেছেন তত সরল নয়। তথ্যের আর একটু 'চুলচেরা বিশ্লেষণ' করলে তিনি দেখতে পেতেন যে এ

ব্যাপারে আমীরচন্দ কেবলমাত্র দূতিয়ালির লোক (মিডলম্যান) ছিলেন না, আর ইয়ার লতিফখান ও মীরজাফরও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ইংরেজদের পূজো গ্রহণ করেননি। আসলে দু'দিক থেকেই চালাচালি হচ্ছিল।

২৩শে এপ্রিল ওয়াট্‌স্ ক্লাইভকে চিঠিতে লেখেন, '..... Omichand has by my disire had a meeting with Meir Godau Yar Cawn Laitty, who has engaged that whenever the Nabob breaks with us he will join us with his whole force on condition of our making him Nabob ....'। এখন এই গুরুত্বপূর্ণ খবরের যে অংশটি ওয়াট্‌সের কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ঐ 'by my desire' বাক্যাংশটি, কারণ স্ক্র্যাফটন তাঁকে টপকে স্বয়ং ক্লাইভ ও আমীরচন্দের মধ্যবর্তী রূপে ষড়যন্ত্রটা নিজের হাতে টেনে নেবার তালে ছিলেন। এর ওপরে ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটন দু'জনেরই উন্নতি নির্ভর করছিল। অতএব, ওয়াট্‌স্ নিছক খবর দেবার ছলে ও কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর একটা স্বার্থ ছিল। এখানে তাঁর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা যাবে না। ওর্ম ওয়াট্‌সের চিঠির মর্ম অবগত ছিলেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে তিনি তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করেন নি। ওর্ম বলছেন, 'On the 23rd of April an officer named Yar Khan Latty, by a private message, requested to confer with Mr. Watts in secrecy ..... Mr. Watts sent Omichand ....'।[৩৫] আমীরচন্দ যে ওয়াট্‌সের 'নিজের ইচ্ছানুসারে' লতিফের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছেন, ওয়াট্‌স্ ক্লাইভের কাছে এই কথাটা প্রতিপন্ন করার তালে ছিলেন। কিন্তু তিনি সুবিধেজনকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন যে তার আগে লতিফ নিজেই শলাপরামর্শের জন্য এত্তালা পাঠিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এর অনেক আগেই আমীরচন্দ স্বেচ্ছায় লতিফকে নবাব বানানোর প্রকল্পে মেতে উঠেছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্ক্র্যাফটনকে আগের সপ্তাহে বাজিয়ে দেখেছিলেন।

মীরজাফর — খোজা পেত্রস সংবাদ সম্বন্ধেও সুশীলবাবু পছন্দসই দলিলটি বেছে নিয়ে আসল দলিলটি বিস্মৃত হয়েছেন। ঘটনার প্রায় দু'মাস বাদে ওয়াট্‌স্ তাঁর বাবার কাছে ষড়যন্ত্রের এক অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠান। সেখানে ইয়ার লতিফ খানের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। অথচ এই পরেকার দলিলটিই সুশীলবাবুর মনঃপূত। কারণ তাতে ওয়াট্‌স্ সুশীলবাবুর মনের মতো একটা কথা লিখেছিলেন : 'I applied to Jaffier Ally Khan' — অর্থাৎ ওয়াট্‌স্ নিজেই মীরজাফরের কাছে দরখাস্ত দেন। মীরজাফর, ওয়াট্‌সের ভাষায়, 'with great willingness entered into my scheme .... on condition of his being made Nabob by our assistance.' এখন বাবার কাছে একটু বড়াই করতে কার না ইচ্ছে হয়? বিশেষ করে বুড়ো বাপের কাছে ধরা পড়ার যখন কোনো সম্ভাবনাই নেই? সেটা কিছু আশ্চর্য নয় ওয়াট্‌সের সঙ্গে সুশীলবাবুর মনের মিল। ওয়াট্‌সের 'my scheme' কথাটার তলায় তিনি দাগ দিয়েছেন। আসল ঘটনাটি সম্পূর্ণ আলাদা। সেটির বিবরণ ওয়াট্‌স্ নিজেই দিয়েছেন — ঘটনার দু'দিন বাদে, ক্লাইভের কাছে লেখা চিঠিতে। সেখানে তিনি যেভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন

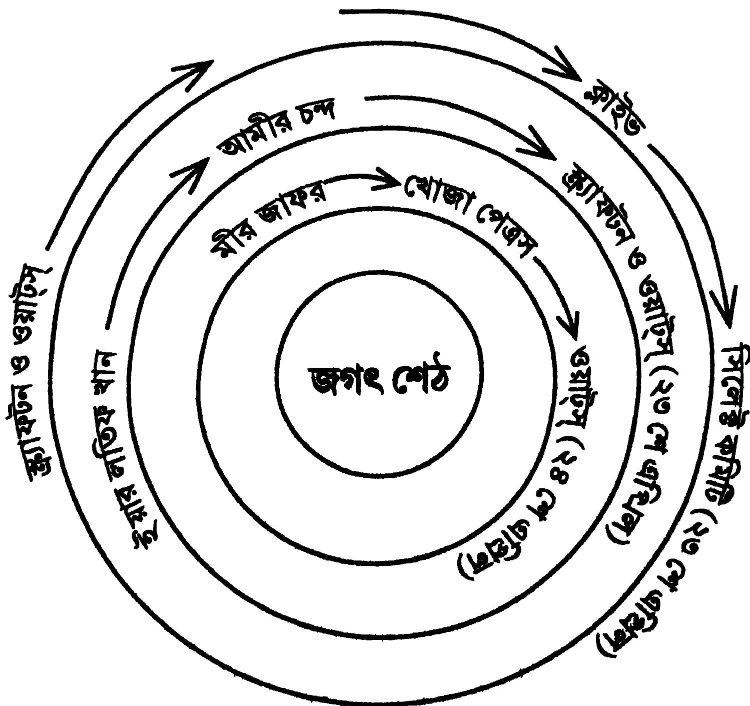
তাতে তলায় দাগ দেওয়া দূরে থাক, 'মাই স্কীম' কথাটি পর্যন্ত মুছে গেছে। তিনি লিখছেন, 'Meir Jaffier two days ago sent for Petrus privately and told him the Nabob was generally disliked, that he ill used and affronted everybody, that for his part whenever he went to visit him he expected assassination ... Meir Jaffier therefore sent for Petrus and desired him to tell me that if you are content he, Raheem cawn, Roydoolub and Bahadur Ally cawn and others, are ready and willing to join their forces seize the Nabob and set up another person that may be approved of"। ওয়াটসের সঙ্গে ডক্টর চৌধুরীর মনের মিল এইখানে যে বাবাকে লেখার সময় ওয়াটস যেমন নিজের চিঠি ভুলে গেছিলেন, বাবার কাছে লেখা চিঠি দাগ দিয়ে পড়তে গিয়ে ডক্টর চৌধুরী তেমনি ঐ আগেকার চিঠিখানা বেমালুম ভুলে গেছেন। এ ব্যাপারে খোজা পেত্রসের দৃষ্টান্তটিও ওয়াট্‌স্ ও ডক্টর চৌধুরীর প্রসঙ্গে এসে পড়ে। দেড় বছর বাদে আসল ঘটনা চেপে গিয়ে তিনি বিলেতে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সের কাছে পুরস্কারের লোভে চিঠি লেখেন যে তিনিই একটা 'নতুন ফন্দি' এঁটে 'জাফর আলি খানকে রাজি করিয়ে চক্রান্তের মধ্যে টেনে এনে' কোম্পানীর মহৎ উপকার সাধন করেছিলেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স অবশ্য তাঁর কথায় কান দেন নি।[১৩] আসল ঘটনা এই যে জগৎশেঠ ও মীরজাফর বেশ কিছুদিন যাবৎ দরবারে আমীর চন্দের তৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু ঐ লোকটির ওপর তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তারপর নিজের সময় মতো মীরজাফর ওয়াট্‌সের চাকর খোজা পেত্রসকে ডাকিয়ে নিজের চাল চালেন।

৮

ইংরেজরা কিভাবে ষড়যন্ত্রে প্রবিষ্ট হয় ওর্ম ও হিল সাহেবের গবেষণার ফলে তা আজ সুপরিচিত। কিন্তু মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষরা কেমনভাবে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়িয়ে ছিলেন, দলিলের অভাব হেতু তা তেমন পরিচিত নয়। এই দেশী দিকটার দিকে মুর্শিদাবাদের নবাবী স্কুলের হেডমাস্টার লিট্‌ল্ সাহেব প্রথম দৃষ্টি দেন। তিনি দেশী ষড়যন্ত্রটির ভিতরে জগৎশেঠের অবস্থানটি নির্ণয় করেন। এ-ব্যাপারে তিনি হিল সাহেবের 'পদাঙ্কানুসারী' ছিলেন না, পরন্তু হিল সাহেবের বিরোধীপক্ষ বলে তাঁর নামডাক। ষড়যন্ত্রের দেশীয় রূপটি সম্বন্ধে আমারো কৌতূহল হয়েছিল। যেহেতু এখানে হিল সাহেবের 'পদাঙ্ক' নেই, তাই আমার পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। লিট্‌ল্ সাহেব ষড়যন্ত্রের দেশীয় দিকটাতে জগৎশেঠের অবস্থিতি কোন জায়গায় সেটি সঠিকভাবে নিরূপন করেন। আমি সমস্ত চক্রটির গঠন এবং গতি বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম এবং এর মধ্যে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান, আমীর চন্দ, খোজা ওয়াজিদ, খোজা পেত্রস, স্ক্র্যাফটন, ওয়াট্‌স্ এবং ক্লাইভের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান কি ও কোথায় ছিল এইটে খুঁজেছিলাম। খুঁজতে গিয়ে আমার ধারণা হয়েছিল

যে এই চক্রান্ত কেবল একটি মাত্র অখণ্ড ব্যাপার নয়। মুর্শিদাবাদে খণ্ড খণ্ড ভাবে চক্রান্ত হচ্ছিল। একটি নয়, একাধিক চক্র ছিল। একটি ভেদ করলে আর একটি বেরিয়ে পড়ে। জগৎশেঠের হস্তক্ষেপে এই চক্রগুলি সম্মিলিত হয়ে যায় এবং পলাশীর চক্র গঠিত হয়।

আমার নির্ণয পদ্ধতি ডক্টব সুশীল চৌধুবীব মনঃপুত হয় নি। তিনি সমালোচনায় লিখছেন, 'এরকুল পয়রো বা নিদেনপক্ষে ফেলুদার ভক্তবৃন্দবা জানেন যে, সকল সত্যান্বেষীদের মাথায় শুধু ''গ্রে সেল'' থাকলে হয় না, তাদের সর্বক্ষণ পঞ্চ ইন্দ্রিয খুলে রাখতে হয। তেমন কোনও নিদর্শন কিন্তু গ্রন্থে পাওয়া গেল না। ''চক্রেব মধ্যে চক্রের'' কথা প্রচ্ছদে থাকলেও বইতে তার সাক্ষাৎ মেলে না।' যেহেতু বইয়ের মধ্যে সুশীলবাবু 'চক্রের মধ্যে চক্রের' সন্ধান পান নি, এখানে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বলি। পোয়ারো, ব্যোমকেশ বক্সী বা প্রদোষ মিত্রের মতো পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হবে না, ছায়াবাজেব মতো অতিন্দ্রিয় সংগ্রহ শক্তিবও প্রয়োজন নেই। সঙ্গে ছক আঁকা থাকবে। চোখ খুললেই চোখে পড়ে যাবে।



পলাশী চক্র

জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায় দুর্লভ এঁরা মোগল রাজপুরুষ। মোগল আইন ভঙ্গ করে মুর্শিদাবাদে বিদেশীদের সাহায্যে বিপ্লব ঘটানো তাঁদেব মনঃপুত ছিল না। তাই ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার চিন্তা প্রথম দিকটায় তাঁদের মাথায় আসে নি। জগৎশেঠ ও মীবজাফর মোগল আইনের আওতায় থেকে তখৎ উল্টে দেবার মতলব ভাঁজছিলেন। সিরাজেব জায়গায় বসবেন শওকৎ জঙ্গ। আইনত শওকৎ জঙ্গই সুবাদার, তিনিই দিল্লী থেকে ফরমান পেয়েছিলেন, সিরাজ তা পান নি। নবাবেব ধারণা ছিল দিল্লীতে কলকাঠি নাড়িয়ে জগৎশেঠ এই বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। ইংবাজরা কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে সাগ্রহে জগৎশেঠ, মীরজাফর ও শওকৎ জঙ্গের কার্যকলাপ লক্ষ্য কবছিল। শওকৎ জঙ্গ নবাব হলে তারা কলকাতায় ফিরতে পারবে, যুদ্ধবিগ্রহ করতে হবে না। কিন্তু শওকৎ জঙ্গের মৃত্যুতে প্রথম চক্রটি ভেঙে যাওয়ায় তাদের আশা পূর্ণ হল না। তখন ইংরেজ ফৌজ ও নওয়ারা এসে কলকাতা ও চন্দননগর দখল করে বসল। নবাবপক্ষ ও ফরাসী পক্ষ যাতে সম্মিলিত না হয়, সংগোপনে সেই মতো চাল চেলে জগৎশেঠ নবাবকে সহায়হীন করে আবার নতুন করে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার পথ পরিষ্কার করে নিলেন। কিন্তু সমস্যা হল, তখ্‌তে বসবেন কে? কটকের নবাব মীর্জা সালেহ্, শওকৎ জঙ্গের ছেলে, ভূতপূর্ব নবাব সরফরাজ খানের ছেলে আগা বাবা, জগৎশেঠের তন্‌খাভোগী মনসবদার ইয়ার লতিফ খান এঁরা সবাই দাবীদার, কিন্তু কেউই ঠিক উপযুক্ত লোক নন। ১৭৫৭ সালের মার্চ মাস থেকেই জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচন্দ চন্দননগরের লড়াইকে কেন্দ্র করে নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছিলেন। কিন্তু এ কাজ খালি বোড়ে দিয়ে হয় না, রীতিমত নবাব চাই। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ফাঁপরে পড়লেন। তাঁদের বাড়িতে আমীব চন্দ এসে রোজ সন্ধেবেলা বসে থাকতেন। লোকটাকে তাঁদের একটুও পছন্দ ছিল না। নবাবের কান ফুসলে লোকটা তাঁদের দেওয়ান রণজিৎ রায়কে মহা বিপদে ফেলেছিল, শেঠেরাও একটুর জন্য বেঁচে গিয়ে ছিলেন। এই লোকটা নিজে একটা ফন্দি এঁটে ইয়ার লতিফ খানকে নবাব বানানোর ফিকির খুঁজছিল। তাকে দিয়ে অন্তত ওয়াট্‌স্ সাহেবের মতিগতি পরখ করে নেওয়া যায়। তাই শেঠেরা চুপচাপ আমীরচন্দের বক্‌বকানি শুনে যাচ্ছিলেন।

নবাব দরবার, জগৎশেঠের কুঠি, কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি — সর্বত্র আমীরচন্দের নিত্য আনাগোনা। মুর্শিদাবাদের হালচাল কাশিমবাজার হয়ে ক্লাইভের শিবিরে পৌঁছচ্ছিল। স্ক্র্যাফটন ও ওয়াট্‌সের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে ক্লাইভ ও অন্যান্য সাহেবরা ২৩শে এপ্রিল সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে স্থির করলেন, মুর্শিদাবাদের অসন্তুষ্ট রাজপুরুষদের সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবেন। আগে যে রোজনামচা লিপিবদ্ধ করেছি, তার সঙ্গে এখানকার ছক মিলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাশিমবাজারে ওয়াট্‌স্, স্ক্র্যাফটন, চন্দননগর শিবিরে ক্লাইভ, শহরে বড় সাহেবদের সিলেক্ট কমিটি, চক্রান্ত করলেন। এই হল চক্রান্তের ইংরেজ পক্ষ। এ চক্র কিন্তু বাইরের চক্র (ছকের প্রথম চক্র)। ভেতরে ছিল আরো কতকগুলি চক্র। এগুলি

চক্রান্তের দেশী পক্ষ -- যার একেবারে কেন্দ্রস্থলে জগৎশেঠের কুঠি। এবার এই বহিশ্চক্রের বলয় ভেদ করে ভিতরের চক্রগুলি উদ্‌ঘাটন করা যাক।

যে দিন ইংরাজ শিবিরে সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ চক্রান্ত করা হল, সেদিন মুর্শিদাবাদে হবুচন্দ্র নবাব মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ এবং তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী আমীরচন্দ বৈঠকে বসে অন্য আরেক চক্রান্ত বানিয়ে ফেললেন। ওয়াট্‌সের দাবী এটা তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে হয়েছিল। স্ক্র্যাফটন সে কথা উড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিবরণানুযায়ী ইয়ার লতিফ খানই ওয়াটসের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটনের মধ্যে প্রবল রেষারেষি চলছিল। দু'জনেই ক্লাইভের কাছে দেখাতে চান, 'যা করবার আমিই করছি।' নিরপেক্ষ ওর্ম সাহেব ঘটনা যাচাই করে বলছেন, ইয়ার লতিফ খানই এত্তালা পাঠিয়েছিলেন। কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদে এসব কলকাঠি নাড়ার জন্য দৌড়দৌড়ি করে যে মোটা মানুষটি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আমীরচন্দ। কিন্তু সবাই মনে মনে ভাবছিলেন, নিশ্চয় জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় এর পেছনে আছেন। শেঠেরা যে অন্য ডিমেও তা দিয়ে যাচ্ছেন, আমীরচন্দ সেটা জানতেন না। ২৩ তারিখের শলাপরামর্শে আমীরচন্দ ও ইয়ার লতিফ খান যা স্থির করলেন তা এই : আবদালির আফগানরা বাংলার দিকে কুচ করছে, তারা আরো এগোক, নবাবের ফৌজ শহর থেকে তাদের মোকাবিলায় বের হয়ে যাক, ইত্যবসরে ইয়ার লতিফ খানের সওয়াররা ও কাশিমবাজারের ইংরেজরা মিলে শহর ও তোষাখানা দখল করে ফেলুক। তারপর ক্লাইভ এসে পৌঁছলেই কেল্লা ফতে। এইটে লতিফ ও আমীরচন্দের পরিকল্পনা (ছকের দ্বিতীয় চক্র)। কিন্তু আফগানরা না এলে কি হবে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তাঁদের কাছে ছিল না।

পরের দিন ২৪শে মে। দেশীয় চক্রান্তের অন্তঃস্থিত চক্রটি এ দিন উদ্‌ঘাটিত হল। জগৎশেঠের সম্মতিক্রমে ফৌজের বকশী মীরজাফর ফৌজের অন্যান্য মনসবদারদের সঙ্গে (ইয়ার লতিফ বাদে) শলা করে রেখেছিলেন। এ দিন খোজা পেত্রসকে ডাকিয়ে নিয়ে মীরজাফর ওয়াটসের কাছে খুব গোপনে খবর পাঠালেন, সেনাপতিরা সকলে মিলে নবাবকে গ্রেফতার করে অন্য নবাব বানাতে প্রস্তুত। ইংরেজদের সাহায্য পেলেই হয়। ওয়াট্‌স্ ব্যাপারটা এত গোপন রাখলেন যে স্ক্র্যাফটনের কাছেও ভাঙলেন না। কিন্তু না বুঝে শুনে আমীরচন্দের কাছে খবরটা প্রকাশ করে ফেললেন। পরে যখন ওয়াট্‌স্ বুঝলেন মীরজাফর আমীরচন্দকে এই গুপ্তচক্রের মধ্যে চান না, তখন আমীরচন্দ ব্যাপারটা জেনে গেছেন। এর মধ্যে দিল্লী থেকে খবর এল যে আবদালি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ফলে লতিফ-আমীরচন্দ চক্রটি ভেস্তে গেল। এদিকে ভেবে চিন্তে ওয়াট্‌স্ ক্লাইভকে ২৬ তারিখে লিখে পাঠালেন যে, লতিফ ও মীরজাফরের প্রস্তাবের মধ্যে জাফর আলি খানের প্রস্তাবটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অন্য দিক থেকেও ক্লাইভের কাছে মীরজাফরের প্রস্তাব পৌঁছে গেল। নবাবের বন্ধু ছিলেন খোজা ওয়াজিদ। আমীরচন্দ তাঁর জাতশত্রু। শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি ভারী ভয় করতেন এবং সর্বদা তাদের সমঝে চলতেন। দরবারের হাওয়া দেখে খোজা ওয়াজিদ নবাব পক্ষ ত্যাগ করে শেঠপক্ষ

অবলম্বন করলেন এবং তাঁর গোমস্তা শিববাবু মারফৎ ক্লাইভ মীরজাফরের গুপ্ত কথাটি জানতে পারলেন। ক্লাইভ খুশী হয়ে মাদ্রাজে খবর পাঠালেন যে দরবারে ভাবী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, আর এর ভেতরে আছেন জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদ। পয়লা মে সিলেক্ট কমিটি মীরজাফরের প্রস্তাবটিই গ্রহণ করলেন। আমীরচন্দ যখন দেখলেন তাঁকে বাদ দেওয়া হচ্ছে তখন তিনি সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে নবাবী দৌলতের ভাগ দাবী করে বসলেন। তাঁকে ফাঁকি দেবার জন্য ক্লাইভ একটা লাল দলিল (জাল) এবং সাদা দলিল (সত্যি) তৈরী করলেন। লাল দলিলে আমীরচন্দের ভাগ আছে, সাদাতে নেই। ঐ লাল-সাদার মধ্যে দিয়ে দেশীয় চক্রের বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। লালচক্রের মধ্যে লুকিয়ে রইল সাদা চক্র (ছকের তৃতীয় চক্র)। লাল চক্র আমীরচন্দের মনঃপূত। তার ভিতর গুপ্ত জগৎশেঠের সাদা চক্র।

সন্দিগ্ধ আমীরচন্দ মোক্ষম এক কামড় দিলেন। তাঁর ফুসলানিতে রায় দুর্লভ ও মীরজাফরের মনে ইংরেজদের ওপর অবিশ্বাস জন্মাল, আর অন্য দিকে ওয়াট্‌স্ ও ক্লাইভ ঐ দুই মোগল সেনাপতির ওপর আস্থা হারালেন। ক্লাইভ ওয়াট্‌সকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে ঠিক মতো ভরসা না পেলে তিনি আর এক পাও এগোবেন না। ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হয়ে যায় আর কি, এমন সময় জগৎশেঠের নিপুণ হস্তক্ষেপে ঠিক মতো ঘুঁটি সাজানো হল। সে কাহিনী বইয়ে বিশদভাবে লিখেছি, এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুশীলবাবু সভাপতির ভাষণে যা বলেছেন -- ইংরেজরাই জোর করে অনিচ্ছুক দেশীয় রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনে এনেছিল -— তা সত্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, ক্লাইভ ঘুরে বসতে গেছিলেন, জগৎশেঠ সামাল দেন।[১৭] শেঠেদের নির্দেশে তাঁদের বেতনভুক রণজিৎ রায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন।[১৮] সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে মীরজাফর ও ওয়াট্‌স্ গোপন চুক্তি সম্পাদন করলেন। এদিকে জগৎশেঠের পরামর্শে ইয়ার লতিফ খান মীরজাফরের দলে যোগ দিলেন। দরবারের দুটো আলাদা আলাদা চক্র শেঠেদের প্ররোচনায় নবাবের বিরুদ্ধে মিলিত হয়ে গেল।[১৯] খেল থেকে বাদ পড়লেন আমীরচন্দ। দেখা গেল চক্রের ভিতর চক্র এবং তার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচন্দ।

৯

এক জাতের 'সমালোচক' আছেন যাঁরা মূল বক্তব্য এড়িয়ে গিয়ে অবান্তর প্রসঙ্গে ছিদ্রান্বেষণ করতে থাকেন। ইংরেজীতে যাকে 'নিট-পিকিং' বলে, এঁরা সেই পেশাতে দক্ষ। নিট পিকারদের পেশা হল উকুনের ডিম বাছা। আগেই উল্লেখ করেছি যে সুশীলবাবু নিজেকে পেশাদার ভাবতে অভ্যস্ত। তিনি মনে করেন তাঁর জাত অ্যামেচার মৈত্রেয় মহাশয়ের জাত থেকে আলাদা। তাঁর এই পেশাদারী দক্ষতার কয়েকটা নমুনা অবান্তর হবে না। আমার বইয়ের একটা অধ্যায় ছিল 'ষড়যন্ত্রের পরিণাম' তাতে ইংরেজদের জয় লাভের ফলে এক কালের 'সোনার বাংলা' কিভাবে ছারখার হয়ে যায় তার বর্ণনা আছে। সুশীলবাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'পরিশেষে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে পলাশী বিপ্লবের পরিণামের বিস্তৃত আলোচনা'। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। 'সিস্তৃত

আলোচনা' করে গ্রন্থকার কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার কোনো আভাস 'সমালোচক' দেন নি। তাহলে তো পাঠকের মনে সন্দেহ জাগতে পারত যে এই গ্রন্থকার বাস্তবিক বহুকাল আগের সাম্রাজ্যবাদী এস. সি. হিলের পদাঙ্কানুসারী কি না। তাতে সমালোচকের অভ্যস্ত 'ছায়াবাজি' খেলায় বিঘ্ন সমুৎপন্ন হতো। সুশীলবাবু সেদিক দিয়ে না গিয়ে পলাশী, ১৭৫৭, এবং ষড়যন্ত্র ব্যতীত পৃথিবীর আর যাবতীয় বিষয়ে আমার 'অসংখ্য ভুলভ্রান্তি' নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন।

এখন অপরের ত্রুটি-অন্বেষণ প্রক্রিয়াটি একটু গোলমেলে। এবং এতে কিছু বিপদ আছে। ইংরেজীতে একটা বচন আছে 'Physician, heal thyself'। ভুলের প্রকারভেদ আছে। অন্য প্রসঙ্গে ভুল ও আসল প্রসঙ্গে ভুল এক বস্তু নয়। আবার কোনো কোনো ভুল অসাবধানতাজনিত এবং কোনো কোনো ভুল অজ্ঞতাপ্রসূত। কিছু কিছু উদাহরণ দিলে এই পার্থক্যগুলো স্পষ্টতর হবে। জইনউদ্দীন আহমদ খান এবং সৈয়দ আহমদ খান দুই ভাই, এঁদের দুই ছেলে যথাক্রমে সিরাজউদ্দৌলাহ্ ও শওকৎ জঙ্গ। আমার গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় এই বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। সুশীলবাবু সেটি এড়িয়ে গেছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে ১৪৪ পৃষ্ঠায় আমি সিরাজের বাবার নাম লিখেছি সৈয়দ আহমদ খান। এটি আমারই ভুল, এ ভুল অসাবধানতা জনিত। তবে ১৪১ পৃষ্ঠায় যে আমি সিরাজের বাবাব নাম যথাযথ ভাবে দিয়েছি এবং তার আগে ১৩৯ পাতায় শওকৎ জঙ্গের বাবার নাম যথাযথ ভাবে সৈয়দ আহমদ খান লিখেছি, এ কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। কারণ স্পষ্ট, নির্কি তোলার পেশাদার বলে কেই বা বদনাম কিনতে চায়? তবে দেখছি তাঁকে যতোটা দক্ষ পেশাদার ভেবেছিলাম, ও পেশায় ততটা দক্ষতা তাঁর এখনো জন্মায় নি। সিরাজের বাবার নাম 'সংশোধিত' করে লিখতে গিয়ে তিনি 'জৈলুদ্দিন' লিখেছেন। ইসলামিক হিস্ট্রী অ্যান্ড কালচারের অধ্যাপকের অবগতির জন্য জানাই ওটা 'জৈলুদ্দিন' (Zail-al-Din) নয়, ওটা হল জইনউদ্দীন (Zain-al-Din)। এটা কি অসাবধানতা জনিত ভুল? তা যদি হয়, তবে অন্যের অসাবধানতা জনিত ভুল সংশোধন করতে গিয়ে তাঁর নিজের একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল।

নিকি তোলার পেশায় অভিজ্ঞ হলেও পুরোপুরি দক্ষতা যে তিনি এখনো অর্জন করে উঠতে পারেন নি, আর একটা উদাহরণ দিলে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমায় তিরস্কার করে তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজ কোম্পানী "দাদনি" থেকে "গোমস্তা" ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ১৭৫৩ সালে। কিন্তু গ্রন্থে কোথাও ১৭৫২ (পৃঃ ১৭০), কোথায় ১৭৫৪ (পৃঃ ৩০)।' নিজের বইয়ের ১৭০ পাতা খুলে দেখলাম, ও পাতায় একবার মাত্র ১৭৫২ সালটি উল্লেখ করেছি, সেটি শেঠ বৈষ্ণবদাসের মৃত্যুর সন, গোমস্তা ব্যবস্থা চালু করার নয়। পরের পাতায় (পৃঃ ১৭১) লিখেছি, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তারা দাদনি বণিকদের সঙ্গে দাদনির চুক্তি করা ছেড়ে দিয়ে, গোমস্তা লাগিয়ে আড়ং থেকে কাপড় কেনা ধার্য করেন। আর ৩০ পৃষ্ঠায় বাস্তবিকই লিখেছি 'আমিরচন্দ এবং অন্যান্য দাদনী বণিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা [সাহেবরা] মফস্বলের আড়ংগুলিতে

নিজেদেব দেশীয় গোমস্তা লাগিয়ে কোম্পানীব ইনভেস্টমেন্টের জিনিস কিনতে শুরু কবলেন।' এ কথা এই জন্য লিখেছিলাম যে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দাদনিব পরিবর্তে গোমস্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও গোটা বছব ধরে পুরোপুরি নতুন ব্যবস্থায কাপড় কেনা চালু হয ১৭৫৪ সালে (আমি গোমস্তা মারফৎ কাপড় কেনার এমন এক বছরেব পরিসংখ্যান চাইছিলাম যার সঙ্গে পুবোপুরি দাদনি বণিক দিয়ে কাপড় কেনাব পরিসংখ্যান তুলনা কবা চলে — কিন্তু ১৭৫৩ সালে দুটি ব্যবস্থাব মাধ্যমেই কাপড় কেনা হয়)। একটা ব্যবস্থাব বদলে আর একটা ব্যবস্থায পুরোপুবি চলে যেতে যে ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৪ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে, এটা সুশীলবাবুব খেয়াল কবা উচিত ছিল। অতএব একথা স্বীকার করতে হবে যে ছায়া ধরার খেলায তিনি যত দক্ষ, নিকি তোলাব ব্যবসায়ে এখনো ততটা দক্ষতা তাঁব আয়ত্ত হয় নি।

তবে উৎকুণাল্ড বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তিনি কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। তাঁর সাফল্যের একটা নমুনা দিই ঃ 'বাংলায় বর্গী আক্রমণ শুরু হয় ১৭৪২ থেকে, কিন্তু লেখক তা করে দিয়েছেন ১৭৪০ (পৃঃ ৭৫)'। ১৭৫৭-র সঙ্গে যদিও এব তেমন যোগ নেই, তবু বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠা খুলে দেখলাম সেখানে লিখেছি ঃ

'শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে [৮৭]
বর্গির বিভ্রাট হইবে এই দেশে।।

বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ইত্যাদি গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী রাজ্যগুলি বর্গিবিভ্রাটে পর্যুদস্ত হওয়ায় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ় অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদে খাজনা আসা বন্ধ হয়ে যায়। আলিবর্দি গঙ্গার অপর তীরের রাজ্যগুলি থেকে জোর করে টাকা আদায় করে বর্গিদের মোকাবিলা করতে নামেন। .... যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য বর্গির হামলা থেকে সম্পূর্ণ ছাড়া পায়নি, তবুও খাজনার দায়ে তিনি ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর মুর্শিদাবাদে কিছুদিন আটক ছিলেন।'

এখন ১৭৪০ তারিখটি অবশ্যই ভুল। কিন্তু তারপবেই '১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পরে লেখা, যেন এর আগেই '১৭৪২' অঙ্কটি এসেছে। এ থেকে সমালোচকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারত, '১৭৪০' অঙ্কটি সঠিকভাবে অনুলিখিত বা মুদ্রিত হয়েছে কি না। সমালোচক ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রী কংগ্রেসের 'মধ্যযুগ' শাখার সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন, মধ্যযুগের গণনাপদ্ধতি তাঁর আয়ত্তে আছে এমন আশা করা অন্যায় হবে না। তিনি নিকি তোলায় মগ্ন না থাকলে পদ্যে যে হেঁয়ালির অঙ্ক (ভারতচন্দ্র রায় প্রদত্ত) উদ্ধৃত করেছিলাম সেটি নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারতেন। তাহলে দেখতেন, অঙ্কটি এরকম দাঁড়ায় ঃ শাক = শকাব্দ (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ), মাতৃকা = ১৬, যোগিনীগণ = ৬৪, ১৬৬৪ শকাব্দ = ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু মধ্যযুগের সভাপতি অত প্রাচীনযুগের সন তারিখ বা দেবদেবী সম্বন্ধে যদি ওয়াকিবহাল নাও থাকেন, তাহলে তিনি শুধু কষ্ট করে হেঁয়ালির অঙ্কের শেষে উল্লিখিত ৮৭ সংখ্যক পাদটীকা (পৃঃ ১৩১) পাঠ করে দেখতে পারতেন, লেখা আছে '১৬৬৪ শক' । অর্থাৎ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ। তবে তিনি যদি বলেন

দৈনিক কাগজ কর্তৃক নিযুক্ত সমালোচকের পক্ষে 'এমন চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ' অনর্থক, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

প্রাচীন হিন্দু দেবদেবী ও সন তারিখ বা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা আপাতত তোলা থাক। ইওরোপীয় বাণিজ্যের ইতিহাস যেহেতু সুশীলবাবুর মূল গবেষণাক্ষেত্র সেখানে তাঁর কি বক্তব্য দেখা যাক। এই জাতের গবেষণায় একটি জিনিস বিশেষভাবে প্রয়োজন অর্থনীতির সাধারণ তত্ত্বগুলির সঙ্গে মাধ্যমিক ছাত্রদের যতটুকু পরিচয় থাকে ততটুকু জ্ঞান। তার বেশী ডক্টর চৌধুরীর কাছ থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থনীতির একটা তত্ত্ব হল এই যে আমদানী ও রপ্তানি এ দুটোর গতি বিপরীত এবং এই দুটি মিলিয়ে মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ পাওয়া যায়। অর্থনীতির আরেকটি তত্ত্ব হল এই যে বহু বছর বাদে কোনো দেশের বহির্বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাপ করতে হলে দুটো সমস্যা দেখা দেয় : প্রথমত দেশে ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে। মূল্য বৃদ্ধি বা বিনিময় হার পরিবর্তন সম্বন্ধে সব তথ্য না পেলে আজকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা অন্য পন্থা নেন। তাঁরা জাহাজে আমদানি বা রপ্তানী করা পণ্যগুলির মোট ওজন পরিমাণ করে বহির্বাণিজ্য বেড়েছে কি কমেছে নির্ণয় করেন। মূল্য ও বিনিময় হার সম্পর্কিত সব তথ্য না থাকলে বাণিজ্যের মূল্য পরিমাপ অপেক্ষা বাণিজ্যের ওজন পরিমাপ করা প্রকৃষ্টতর উপায় বলে অর্থনীতিতে নির্দেশ করে। বাণিজ্যের ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন বা তাদের জানা উচিত যে মূল্য পরিমাপ ছাড়া ওজন পরিমাপও বাণিজ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের একটা বিকল্প পদ্ধতি। কিন্তু সুশীলবাবু আমার বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছেন তা থেকে মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে অর্থনীতির এই সাধারণ তত্ত্বগুলির সঙ্গে তাঁর কতটা পরিচয় আছে।

সুশীলবাবু লিখছেন, 'পলাশী বিপ্লবের আলোচনায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রেক্ষিত, রূপরেখা এবং বিশেষ করে বাংলায় ইংরেজদের কি 'স্টেক' ছিল তার আলোচনা অপরিহার্য। কিন্তু লেখক তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। যেটুকু তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যেও অসংখ্য ভুলভ্রান্তি। যেমন, ১৭১৫ থেকে সাত বছরের ইংরেজ বাণিজ্য পলাশী-পূর্ব সাত বছরের চেয়ে "অন্তত দেড়গুণ বেশী" (পৃঃ ১৫২)। সূত্রনির্দেশে আছে মার্শালের বই, সেখানে কিন্তু কলকাতায় আগত জাহাজ ও কনসুলেজের তালিকা। লেখকের তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। কে এন চৌধুরীর (১৯৭৮ -- সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য) তালিকা অনুযায়ী ১৭১৫ থেকে সাত বছরে ইংরেজ বাণিজ্যের বার্ষিক গড়মূল্য ২০ লক্ষ টাকার মতো আর পলাশীর আগের সাত বছরে তার গড় পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা। আবার অন্যত্র ব্রিজেন গুপ্তের (১৯৬২ — ভাল বই কিন্তু পরিসংখ্যানে অনেক ভুল) উপর নির্ভর করে লেখক জানাচ্ছেন ১৭৫১ সালে ইংরেজ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, ১৭৫৫তে নতুন গোমস্তা ব্যবহারের ফলে তা কমে দাঁড়াচ্ছে ১২ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা (পৃঃ ৩০)। কে. এন চৌধুরী থাকতে ব্রিজেন গুপ্তর অনেক

পুরনো বইয়ের ওপর কেন লেখক নির্ভব করলেন জানি না। চৌধুরীর তালিকা অনুযায়ী এ পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ (১৭৫১) এবং ৩৩ লক্ষ টাকা (১৭৫৫)।'

সুশীলবাবু গলদ করে ফেলেছেন একেবারে গোড়ায় — ঐ 'ইংরেজ বাণিজ্য' কথাটি নিয়ে। ইংরেজ বাণিজ্যের এই নামকরা বিশেষজ্ঞ 'ইংরেজ বাণিজ্য' বস্তুটা কি তা সঠিকভাবে ধরতে পারেন নি। উপরেব উদ্ধৃতি থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে যে সুশীলবাবু কর্তৃক নির্দিষ্ট আমাব 'অসংখ্য ভুলভ্রান্তি' আসলে সংখ্যায় দুটি। এখন ঐ দুটি কার ভুল, তাঁর না আমার, সেইটেই বিচার্য। পরপর 'ভুল' দুটি বিশ্লেষণ করা যাক।

(১) বইয়ে আমি লিখেছিলাম, '১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে সাত বছরেব মধ্যে ইংবেজদেব বাণিজ্য হু হু কবে বেড়ে গিয়ে এমন পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল যা পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সাত বছরের ইংরেজ বাণিজ্যের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ বেশী। বলতে গেলে ঐ সময়েই লোকেব অগোচবে কলকাতা গোটা বাংলাব অদৃশ্য আর্থিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল'। এব সূত্র নির্দেশ কবেছিলাম পি জে মার্শালি প্রদত্ত কলকাতায় আগত জাহাজের 'টানেজ' (অর্থাৎ মাল বোঝাই জাহাজের মালেব ওজন)। মার্শালি জাহাজের সংখ্যা এবং কনসালেজের আয়ের সঙ্গে টানেজ পবিসংখ্যানও দিয়েছেন, তাতে দেখছি ১৭২১/২৩ এ জাহাজেব মালের ওজন বেড়ে গিয়ে ৫৫০১ টন এবং ১৭৫৭/৫৮ তে কমে গিয়ে তা ২১৯০ টন। আমি একটু কমিয়েই বলেছিলাম যে ১৭২২-এ বাড়তির মুখে ইংবেজদেব বাণিজ্য, ১৭৫৭ নাগাদ কমতিব মুখে ইংরেজ বাণিজ্যের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ বেশী ছিল। চৌধুরী মশাযের ভাবে বোধ হয় ('সেখানে কিন্তু কলকাতায় আগত জাহাজ ও কনসুলেজের তালিকা') যে তিনি এই ব্যাপারটা ধরতেই পারেন নি। মার্শালের তালিকায় যে টানেজ আছে এবং ঐ 'টানেজ' যে বাণিজ্যের পরিমাণ নির্দেশ করে এটা কি তাঁর মাথায় এসেছিল? না 'টানেজ' বস্তুটি এই বাণিজ্যের ঐতিহাসিকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত? তিনি বলছেন, আমার (অর্থাৎ মার্শালের — মার্শালি দেখিয়েছেন যে ঐ টানেজ কলকাতার ইংরেজদের বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্য পরিমাপক) তথ্য 'সম্পূর্ণ ভুল'। কিন্তু বস্তুত সুশীলবাবু পরিবর্তে যে তথ্য দিচ্ছেন সেইটি সম্পূর্ণ ভুল। কে. এন. চৌধুরীর দোহাই পেড়ে সুশীলবাবু বলছেন ১৭১৫-১৭২২-এ ইংরেজদের গড়পড়তা বার্ষিক বাণিজ্যের মূল্য ২০ লক্ষ টাকা আর পলাশীর আগের সাত বছর ধরে তা ৩৩ লক্ষ টাকা। কে. এন. চৌধুরী ও রকম কোনো তথ্যই দেন নি। তিনি যা দিয়েছেন তা হল কোম্পানী কর্তৃক বাংলা থেকে রপ্তানী দ্রব্যের পাউন্ডে নির্ণীত মূল্য। সুশীলবাবু রূপীতে আড়াই শিলিং হারে সেই পরিসংখ্যান টাকায় পরিণত করেছেন, কিন্তু দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বা রূপী-পাউন্ডের বিনিময় হারের তারতম্য গণনা না করেই ঐ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন। কবে তিনি যে তথ্যটি পেয়েছেন সেটি ইংরেজদের মোট বাণিজ্যের মূল্য নয়, পরন্তু কোম্পানী কর্তৃক রপ্তানি দ্রব্যের মোট মূল্য। যদি এর সঙ্গে আমদানী দ্রব্যের মূল্য যোগ করতেন, তাহলে 'ইংরেজ বাণিজ্যের বার্ষিক গড়মূল্য' পেতে পারতেন। মার্শালি যে 'টানেজ' প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন তাতে আমদানী-রপ্তানি দুই-

ই ধরা পড়ে এবং দ্রব্যমূল্যের তারতম্যজনিত সমস্যা নেই। আমি এইটিই নিরাপদ বলে গ্রহণ করেছি।

(২) সুশীলবাবু বৃথাই ব্রিজেন গুপ্ত ঠিক না কে এন চৌধুরী, এই তর্কে গেছেন। কারণ গুপ্ত ও চৌধুরী একই বস্তুর মূল্যেব পরিসংখ্যান দেন নি। ব্রিজেন গুপ্তর বই থেকে সংগ্রহ করে ১৭৫১ ও ১৭৫৫-ব যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান আমি দিয়েছিলাম তা হল কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেন্ট'-এর মূল্য। আব সুশীলবাবু কে. এন. চৌধুরীর বই থেকে যা সংগ্রহ করেছেন (পুনরায় আড়াই শিলিং হারে পাউন্ড থেকে রূপী গণনা করে) তা হল ইংল্যান্ডে বাংলার রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য। কে. এন চৌধুরীর বই একটু ভালো করে পড়ে দেখলে সুশীলবাবু বুঝতে পারতেন যে বাংলায় কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেন্ট' এবং ইংল্যান্ডে 'বাংলা থেকে আমদানী দ্রব্য' সমার্থক নয়। আমি 'গোমস্তা ব্যবস্থা' চালু হওয়ায় 'ইনভেস্টমেন্ট' কত কমে গেল তার হিসেব করছিলাম। 'ইনভেস্টমেন্ট' কথাটির অর্থ রপ্তানি দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাংলার বিভিন্ন আড়ং-এ কোম্পানী কর্তৃক মোট বিনিয়োগ বা ব্যয়। ইংল্যান্ডে ঐ দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য এক হবে না এ কথা বলাই বাহুল্য। সে পরিসংখ্যান দিয়ে আমার কাজও হতো না, কারণ আমি দাদনী ব্যবস্থার পবিবর্তে গোমস্তা ব্যবস্থা চালু করার ফলে কত পরিমাণে 'ইনভেস্টমেন্ট' কমে গেল সেইটি অনুসন্ধান করছিলাম। সুশীলবাবু এই সহজ কথাটাই ধরতে পারলেন না, যদিও তিনি ইংরেজ বাণিজ্যের 'বিশেষজ্ঞ'।

চৌধুরী মশাই অর্থনীতির গোড়ার তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করলে তাঁর ইতিহাস রচনা আরো পরিণত এবং তাঁর কৃত সমালোচনা আরো যথাযথ হবে। পরিসংখ্যন নিয়ে তাঁর উৎকুণাণ্বেষণ এইতেই সমাপ্ত হয় নি। তিনি লিখেছেন : মুর্শিদকুলী খান দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ প্রতি বছর এক কোটি টাকার সামান্য কিছু বেশী পাঠাতেন, গ্রন্থকাব তাকে করে দিচ্ছেন দেড় কোটি টাকার উপর'। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' থেকে জানা যায় যে, মুর্শিদাকুলী খান বাদশাহকে খালসার খাতে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা পাঠাতেন এবং তার ওপরে জায়গীরের খাজনা ও তৎসহ অন্যান্য কর, পেশকাশ ও নজরানা পাঠাতেন।[৮০] ১৭২৮-এ জায়গীরগুলির মোট আয় ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে আমীর-উল-উমরা খান দওরানের জায়গীরের আয় ছিল দেড় লক্ষ টাকা যা পুরো দিল্লী যেত, কারণ পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন খান 'জায়গীর ও আড়ং-এর খাতে মুনাফার উপরে আরো দেড় কোটি টাকা অনায়াসে আদায় করে জগৎশেঠ ফতেহচন্দের কোঠি মারফৎ বাদশাহী তোষাখানায় প্রেরণ করেন'।

'দেশ' পত্রিকায় সুশীলবাবু একবার অসাবধানে লিখেছিলেন, 'রাজবল্লভ অবশ্য সাদা কাগজের চুক্তি সম্বন্ধেও আপত্তি জানাল এই বলে যে চুক্তির চাহিদা মেটাবার মতো টাকা নবাবের কোষাগারে নেই।'[৮১] বস্তুত ইংরেজদের অত টাকা দেবার বিরুদ্ধে মীরজাফরের কাছে যিনি আপত্তি তোলেন তিনি রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ নন। সুশীলবাবুর এই ভুলটি অসাবধানতাজনিত, অজ্ঞতা প্রসূত নয়। অজ্ঞতা জনিত ভুল কেমন হয় তার একটা উদাহরণ খোঁজা যাক। জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পত্রিকায়

সুশীলবাবু লিখেছেন যে চন্দননগরে ফরাসীদের সাহায্য করতে নবাব দুই দক্ষ সেনাপতি পাঠান — রায় দুর্লভ ও মীব মদন।[৪২] মীব মদন নিঃসন্দেহে দক্ষ সেনাপতি, কিন্তু রায় দুর্লভ? তাঁর মতো কাপুরুষ ও অপদার্থ সেনাপতি সে যুগের মনসবদারদের মধ্যেও মেলা ভার।[৪৩]

ধরা যাক, এ ভুলটিও অসাবধানতা জনিত, অজ্ঞতা জনিত নয়। আর একটি উদাহরণ খোঁজা যাক। সেটি এমন একটি উদাহরণ হলে ভালো হয় যা তিনি দুটি বিভিন্ন পত্রিকায় এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় আলাদা আলাদা করে বলেছেন অর্থাৎ অসাবধানে বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঘটনাক্রমে এরকম একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। 'দেশ' পত্রিকায় এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিকাল রিসার্চের জার্নালে (প্যারিসে লিখিত, ঢাকায় পঠিত প্রবন্ধ) তিনি তাঁর একটি আবিষ্কার পেশ করেছেন যা সত্যিই 'নতুন' এবং 'আলাদা'। দেশ সুদ্ধ লোক এত দিন জানত যে মীর মদন মুসলমান ছিলেন, কিন্তু উক্ত দুই পত্রিকায় তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, 'তরুণ নবাবের সব চেয়ে বিশ্বাসভাজন ছিল দু'জন হিন্দু — মোহনলাল ও মীরমদন।[৪৪] মোহনলাল কাশ্মীরি হিন্দু ছিলেন ঠিক, কিন্তু মীর মদন হিন্দু ছিলেন এ কথা সুশীলবাবু কিসেব ভিত্তিতে অনুমান করলেন? 'মদন' কথাটা সংস্কৃত এবং কামদেবতা বাচক এই ভিত্তিতে কি? ইসলামিক হিস্ট্রী অ্যান্ড কালচারের অধ্যাপকের অবগতির জন্য জানাই 'মদন' কথাটি আরবী, ফার্সি এবং উর্দুতেও অন্য অর্থে পাওয়া যায়, আরবীতে এর অর্থ 'নাগরিক', 'মার্জিত রুচি'। সেকালে হিন্দু জাতির রাজপুরুষদের খেতাব দেওয়া হতো রায় (দুর্লভ রাম, চাইন রায় ইত্যাদি) বা রাজা (রাজবল্লভ, মোহনলাল ইত্যাদি), কিন্তু মীর উপাধি কদাচ নয়। মীর মদন যে মুসলমান ছিলেন তার সমসাময়িক ইঙ্গিত আছে পলাশীর অব্যবহিত পরে বাঁধা একটি মুর্শিদাবাদ পল্লী গীতিতে, যেখানে পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখি ঃ

'একা মীর মদন সাহেব কত নেবে সয়ে।'[৮৫]

তখনকার দিনে সাহেব কথাটা মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রয়োগ কবা হতো। অতএব সুশীলবাবুর আবিষ্কার ভুল। আমি অসাবধানতা বশে যেমন ওলন্দাজ 'অস্ট ইন্ডিশ' কোম্পানী লিখতে গিয়ে 'অস্ট এন্ড' কোম্পানী লিখে ফেলেছিলাম (যেমন সুশীলবাবুর এক লেখায় 'অস্ট ইন্ডিশ' কথাটা 'কস্ট ইন্ডিশ' হয়ে গেছে[৪৬]), এ তেমন অসাবধান ভুল নয়, এটি ভুল সিদ্ধান্ত।

সুশীলবাবু বলতে চান 'মীরমদন মোটেই "একজন অখ্যাত সেনানী" বা মোহনলাল একজন "ভুঁইফোঁড়" নন'। তিনি আমার বক্তব্য যথাযথভাবে পেশ করেন নি। আমার অনেক দিনের বক্তব্য, দরবারে একটি প্রতিষ্ঠিত পুরনো দল (জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায় দুর্লভ ইত্যাদি) ছিল, যাদের বিরুদ্ধে নবাবের অনুগৃহীত নতুন ওমরাওদের একটি দল (মোহনলাল, মীর মদন, মানিক চন্দ ইত্যাদি) ভুঁইফোঁড়ের মতো সহসা গজিয়ে ওঠে।[৪৭] আমার পরে সুশীলবাবুও পুরনো দলের আসন টলে যাবার কথা আবার বলেছেন — বক্তব্যটি নতুনও নয়, আলাদাও নয়— কিন্তু তিনি পুরনো দল নতুন দল

গুলিয়ে ফেলেছেন। পুরনো উচ্চপদস্থ আমীরদের মধ্যে তিনি নিম্নপদস্থ সাইর চৌকির দারোগা হাকিম বেগকে ঢুকিয়ে ফেলে উঁচুনীচু একাকার করে ফেলেছেন এবং নতুন আমীর মানিকচন্দ্রকে তিনি ঢুকিয়ে দিয়োছন পুরনো প্রতিষ্ঠিত দলে।'[৮] এ কথা ভুললে চলবে না যে হঠাৎ 'রাজা ও 'পঞ্চহজারী মনসবদার' হওয়ার আগে মোহনলাল তরুণ নবাবজাদাব বিকৃত প্রমোদলীলার পার্শ্বচর ছিলেন, আলিবর্দির দরবারে তাঁর কোনো পদ বা মনসব ছিল না। আর মীর মদন ও আলিবর্দির আমলে ঢাকায় নিযুক্ত একজন অখ্যাত সেনানী ছিলেন, নতুন নবাব তাঁকে খাস বিসালার সেনাপতি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। মানিকচন্দ ছিলেন বর্ধমানেব বাজার দেওযান (দরবারে সে পদ নিতান্ত নিম্ন), সিরাজ রাতারাতি তাঁকে অধিকৃত আলিনগরের ফৌজদার বানিয়ে দেন। মানিকচন্দের কাছ থেকে নবাব পরে কলকাতায় লুণ্ঠিত ধনরত্ন কেড়ে নেন বটে, তবু তিনি নতুন দলেরই লোক এবং শেষ পর্যন্ত নবাবের হয়ে পলাশীতে লড়াই করেছিলেন।

১০

সুশীলবাবু আমাব কলমে নবাবকে 'রাগে অগ্নিশর্মা' দেখে আমায নবাবেব বিরুদ্ধপক্ষ সাব্যস্ত করেছেন। সেই যুক্তিতে আমার কলমে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে 'রাগে অগ্নিশর্মা' দেখে তিনি আমায় ইংরেজদের বিরুদ্ধ পক্ষ সাব্যস্ত করতে পারতেন (যদিও করেন নি)। স্বাধীনতা অর্জনের আটচল্লিশ বছর পরে এরকম পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করে ইতিহাস লেখার প্রয়োজন ঘুচে গেছে। এখন এক নজরে সে যুগের লোকগুলির ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে যায়, কারণ ঐ হানাহানির কুয়াশা কেটে গেছে। এ-ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে আমি যা বলেছিলাম তা এই ঃ 'ক্লাইভ ঠগ, জালিয়াত ও মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমীরচন্দের মতো ঝানু ব্যবসায়ীর পক্ষে যখন তাঁর চরিত্র তলিয়ে বোঝা সম্ভব হয় নি, তখন ভীতু, রাগী, অস্থিরমতি তরুণ নবাবের পক্ষে সে চরিত্রের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব ছিল না।'[৭৯]

কিন্তু ক্লাইভ ও নবাবের চরিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল আরো বৃহত্তর ব্যাপার — ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। সেই প্রেক্ষাপটে দেখতে গেলে ইতিহাসে পলাশীর ষড়যন্ত্রের স্থান খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে — ছায়াবাজি করে তা গুলিয়ে ফেলবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তবে এজন্য কেবল পরবর্তীকালের প্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভের ওপর নির্ভর করতে হয় না, সমসাময়িকদের কাছেও একটা জিনিস স্পষ্ট ছিল। সমসাময়িকরা জানতেন যে, কোম্পানীকে ছাড়াও মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্র হতে পারত। পয়লা মে ১৭৫৭-এর সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে এই ধার্য হয় ঃ 'The Nabob is so universally hated by all sorts and all degrees of men; the affection of the army is so much alienated from him by his ill usage of the officers and a revolution so generally wished for, that it is probable that the step will be attempted (and successfully too) whether we give our assistance or not.'[৮০] এখানে আত্মসমর্থনের সুর সুস্পষ্ট। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন মীরজাফরের

ষড়যন্ত্র আরো পাকিয়ে উঠল আর নবাব তার আঁচ পেয়ে গেলেন তখন ওয়াট্‌স ভয় পেয়ে ক্লাইভকে সোজা কথা লিখে পাঠালেন, 'Whether we interfere or not it appears affairs will be decided in a few days by the destruction of one of the parties.'[৭] কিন্তু ঘটনা কেবলমাত্র নবাব ও বক্‌শীর দ্বন্দ্বে আবদ্ধ রইল না। কোম্পানী হস্তক্ষেপ করল।

তার ফলে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। কারণ ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলে মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্র এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিল। পলাশীর বিপ্লবের ধাক্কায় ইতিহাসের রথচক্রে যে টান পড়ল তার ফলে সুবা বাংলা ছারখার হয়ে গেল, মোগল রাজপুরুষরা সর্বস্বান্ত হলেন, দেশে মন্বন্তর ঘটল। নবাব মীরজাফর রাগ করে অর্থগৃধ্নু ইংরেজদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা কি ভাবেন টাকার বৃষ্টি হয়?' ব্যঙ্গ করে বললেও কথাটা তিনি আক্ষরিকভাবে সত্য বলেছিলেন। টাকার গাছে নাড়া দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের ঝোলায় এত টাকা পুরল যে দেশ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায় দুর্লভ ইত্যাদি মোগল রাজপুরুষেরা নিজেরা রাজত্ব করবেন বলে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। মোগল শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্বের প্রবর্তন করা তাঁদের পরিকল্পনায় ছিল না। কিন্তু তাঁদের ষড়যন্ত্রের পরিণামে দেশ ধীরে ধীরে সেই দিকে ঢলে পড়ল। একে একে তাঁরাও নষ্ট হলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মোগল শাসন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হল। কোনো পূর্ব পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী এই ইতিহাস বিন্যস্ত হয় নি। ঘটনা কোন দিকে গড়াবে ১৭৫৭-র দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা তা জানতেন না। সমসাময়িকদের কাছে এই ভয়ঙ্কর পরিণাম গুপ্ত ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। Sushil Chaudhury. **Trade, Bullion and Conquest : Bengal in the Eighteenth Century**. Presidential address. Medieval India Section. Indian History Congress. Gorakhpur 1989. p 3

২। Sushil Chaudhury. 'Sirajuddaulah. the English Company and the Plassey Conspiracy'. **Indian Historical Review**, Vol XIII. 1986-87 p 111

৩। **আনন্দ বাজার পত্রিকা**, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

৪। Sushil Chaudhury. European Companies and the Bengal Textile Industry in the Eighteenth Century : the Pitfalls of Applying Quantitative Techniques'. **Modern Asian Studies**. Vol. 27. 1993. pp 337-338: **Trade, Bullion and Conquest**, Gorarkpur 1989. p.9.

৫। Om Prakash. 'On Estimating the Employment Implications of European Trade for the Eighteenth Century Bengal Textile Industry — a Reply'. **Modern Asian Studies**, Vol. 27. 1993. pp. 351-352.

৬। Sushil Chaudhury. 'Nawab Sirajuddaula and the Battle of Palashi'. in Sirajul Islam (ed.) **History of Bangladesh 1704-1971** (Dacca 1992). vol. p. 119.

৭। Sushil Chaudhury. 'Merchants. Companies and Rulers': Bengal in the Eigh-

teenth Century **Journal of the Economic and Social History of the Orient,** vol xxxi p 90

৮। Sushil Chaudhury **From Prosperity to Decline. Eighteenth Century Bengal** (New Delhi 1995) pp 319-320

৯। Sushil Chaudhury The Imperatives of Empire Private Trade Sub-Imperialism and the British Attack on Chandannagar March 1757 **Studies in History** vol 8 1992 p 2 Chaudhury **From Prosperity to Decline** p 310

১০। Sirajuddaulah the English Company and the plassey Conspiracy **Indian Historical Review** 1986-87 p 117 n

১১। Nawab Sirajuddaula and the Battle of Palashi **History of Bangladesh** p 124

১২। Jean law de Lauriston **Memoire Sur Quelque Affaires de l' Empire Mogol,** ed Alfred Martineau (Paris 1913) p 118 মূল ফরাসীর ইংরাজী অনুবাদ S C Hill (ed) **Bengal in 1756-57** (London 1905) vol III p 190

১৩। রজতকান্ত রায় **পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ** (কলকাতা ১৯৯৪) পৃঃ ১৭৪-৫

১৪। Seid-Gholam Hossein-Khan **Seir Mutaqherin** vol II (Delhi 1986) pp 222-3 Robert Orme **A History of Military Transactions of the British Nation in Indostan** (New Delhi 1985) vol II-I p 135

১৫। Clive to Secret Committee London 22 February 1757 Hill II pp 238-9

১৬। Law s Memoir Hill III p 183

১৭। Sushil Chaudhury **IHR** pp 120-1

১৮। Hill I, pp LV, LXIV

১৯। Sushil Chaudhury **IHR** pp 124 134

২০। Brijen K Gupta **Sirajuddaulah and the East Indian Company 1756-1757** (Leiden 1966) pp 29-32, 41-44

২১। Hill III, pp 172-3

২২। Yusuf Ali Khan **Tarikh-I-Bangla-I-Mahabatjangi,** trans Abdus Subhan (Calcutta 1982) pp 125 128

২৩। Jadunath Sarkar **The History of Bengal Muslim Period 1200-1757** (Calcutta 1973) p 469

২৪। Rajat Kanta Ray Calcutta or Alinagore Contending Conceptions in the Mughal-English Confrontation of 1756-1757 . in Indu Banga (ed) **Ports and Their Hinterlands in India 1700-1950** (New Delhi 1992)

২৫। Chaudhury **From Prosperity to Decline.** p 308

২৬। Clive to Father. 23 February 1757 Hill II p 242-3

২৭। Sushil Chaudhury. **IHR.** pp 122-123

২৮। Seir, II, pp 193 196

২৯। **Ibid**

৩০। J H Little **The House of Jagatseth** (Calcutta 1967)

৩১। **Trade, Bullion and Conquest** Gorakhpur 1969 pp 12 15

৩২। Chaudhury Nawab Sirajuddaula and the Battle of Palashi **History of Bangladesh** p 113n

৩৩। Hill II pp 207 331 III pp 163-4

৩৪। Chaudhury Battle of Palashi **History of Bangladesh** pp-113-114

৩৫। Robert Orme **Military Transactions** p 148

৩৬। Petross Arratoon to Court of Directors 20 January 1759 Hill III no 103

৩৭। রজতকান্ত রায় **পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ** পৃঃ ২৩৪ ২৩৭।

৩৮। Watts to Clive 6 June 1757 (hour not mentioned)

৩৯। Watts to Clive 6 June 1757 6 p m

৪০। Ghulam Husain Salim **Riyazu-s-Salateen** trans Abdus Salam (Calcutta 1902) pp 259-60

৪১। সুশীল চৌধুরী পলাশী — কার চক্রান্ত দেশ ১৮/৫/১৯৯১ পৃঃ ৭২।

৪২। Sushil Chaudhury The Imperatives of Empire **Studies in History**, p 11

৪৩। রজতকান্ত রায় **পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ** পৃঃ ১৪২।

৪৪। সুশীল চৌধুরী পলাশী — কার চক্রান্ত দেশ পৃঃ ৬৯, Sushil Chaudhury Sirajuddaulah the English Company and the Plassey Conspiracy **IHR** p 130

৪৫। মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা **সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা**, ১৩ পৃঃ ১৩৯-২৩৬।

৪৬। **দেশ** বিনোদন ১৩৯৬ পৃঃ ৪০ সূত্র ১৩।

৪৭। Rajat Kanta Ray Colonial Penetration and the Initial Resistance' **Indian Historical Review** Vol XII July 1985 - January 1986, pp 6-7

৪৮। Sushil Chaudhury IHR pp 132-3 Battle of Palashi **History of Bangladesh** . p 126

৪৯। **পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ**, পৃঃ ২১১, ২২০।

৫০। Fort William Select Committee Proceedings 1 May 1757 Hill II p 371

৫১। Watts to Clive 9 June 1757

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৪-১৯৩৪ পর্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

"ভারত বহির্ভূত দেশ" বিভাগে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৯৫

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

॥ ১ ॥

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে বেশ কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই কালপর্বে মূলত দুটি বিষয়ের আলোচনা বাবে বারেই প্রাধান্য পেয়েছে ইতিহাসবিদ্‌দের মহলে। এক ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের সঠিক কারণের অনুসন্ধান যদি কবতে হয়, তবে ফিরে যেতে হবে বিশ ও তিরিশেব দশকের সোভিয়েত ইউনিযনে, কারণ এই সময়েই রচিত হয় একই সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ও বিকৃতির ভিত্তিভূমিটি। দুই ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়, সোভিয়েত ইতিহাসের বহু অনভিপ্রেত ঘটনা রুশ বিপ্লবেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, — এ রকম একটা ধারণা পশ্চিমী রক্ষণশীল মহলে ও সাম্প্রতিক কালের রুশ ইতিহাসবিদ্‌দের একাংশের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও একটি ভিন্ন মতও ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং সেটি হল এই যে, বিশ ও তিরিশের দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের রণকৌশলকে কেন্দ্র করে একাধিক বিকল্প ভাবনাচিন্তাও যথেষ্ট প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিকল্পগুলিকে শুধু যে অগ্রাহ্য করা হয়, তাই নয়, এই সব বিকল্প ভাবনাচিন্তার প্রবক্তাদের প্রয়োজনমত 'দক্ষিণপন্থী' বা 'অতি-বামপন্থী' আখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয়। এঁদের অনেককেই সমাজতন্ত্রের শত্রু বা 'প্রতিবিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত করে ঠেলে দেওয়া হয় মৃত্যুর গহ্বরে। ভিন্ন মতাবলম্বী এই ব্রাত্যজনেদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা, ভাবনাচিন্তাকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে করে এঁদের লেখাপত্রকেও প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই পরিস্থিতি মিখাইল গরবাচভের 'পেরেস্ত্রোইকা পর্বের সূচনাকাল (১৯৮৫) পর্যন্ত মোটামুটি অব্যাহত ছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তাই এঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে পশ্চিমের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। পেরেস্ত্রোইকা নীতি হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির

অতীত ইতিহাস নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে আলাপ আলোচনা, চিন্তাভাবনা শুরু হয় খোদ রুশ দেশেই; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত রুশ জার্নালে নতুন তথ্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হতে শুরু করে, রচিত হয় অনেক নতুন গবেষণাগ্রন্থ, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে রুশ বিপ্লবের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত। Voprosy istorii (Problems of the History), Kommunist (Community), Voprosy istorii KPSS (Problems of the History of CPSU) প্রভৃতি গবেষণামূলক জার্নালে এফ. ফিরসভ, এ. ভাতলিন, কে. শিরিনিয়া প্রমুখ সোভিয়েত ইতিহাসবিদ্ সদ্য উন্মুক্ত বিভিন্ন রুশ মহাফেজখানার তথ্য ঘেঁটে নতুন করে আলোকপাত করতে শুরু করেন আমাদের এতদিনের লব্ধ ইতিহাস চেতনার ওপরে। তার সূত্র ধরে বদলে যেতে শুরু করে অনেক প্রচলিত বিশ্বাস, চিন্তা ও বিচারবোধ। যাঁদের অনেককেই প্রতিবিপ্লবী ও ব্রাত্য আখ্যা দিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই এৎস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ প্রমুখ ব্যক্তিকে নিয়ে, তাঁদের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপটে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার সম্ভাবনা ক্রমশই বড় হয়ে দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পরে এই প্রক্রিয়া কিছুটা ব্যাহত হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে হলেও গবেষণার এই নতুন ধারাটি বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি ইউরোপের অন্যান্য দেশেও, বিশেষত জার্মানীতে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করে এবং গত এক দশকে পশ্চিমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী রচিত হয়েছে যার প্রায় কোন কিছুই দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি। ইতিহাসচর্চার এই নতুন ধারাটি এবং তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জার্তিক তাৎপর্য সম্পর্কে উপস্থিত শ্রোতাদের অবহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার প্রতিবেদনটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

॥ ২ ॥

এই নতুন তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার সূত্র ধরে বলা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৪-১৯৩৪ কালপর্বকে কিছুটা নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে পরবর্তীকালের অনেক ভুলভ্রান্তি, ক্রটি-বিচ্যুতির উৎসমুখকে চিহ্নিত করার কাজটা সহজ হবে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাব যে ১৯২৪ ও ১৯৩৪ এই দুটি বছরই ছিল ভিন্ন ভিন্ন কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৪ সাল তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী; এক, লেনিনের মৃত্যু এবং স্তালিনের Foundations of Leninism রচনার প্রকাশ, যেখানে একটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের তত্ত্বটিকে (doctrine of Socialism in One Country) সংহত রূপ দেওয়া হয়। দুই ঃ এই বছরে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এৎস্কির রাজনৈতিক লাইন ও চিন্তাকে আক্রমণ করা হয়। তিন ঃ কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বলশেভীকরণের আহ্বান জানিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে জঙ্গী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনকে তুলে ধরা যায় এবং এই বছর থেকেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকে প্রকৃত অর্থে

স্তালিনের প্রবেশ ঘটে। ১৯৩৪ সালটিও একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক : এই বছরেই অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেস, যেটি সাধারণত বিজয়ীদের কংগ্রেস (Victors' Congress) নামে আখ্যাত হয়ে থাকে, কারণ এই কংগ্রেসেই স্তালিন সি. পি. এস ইউ.-এর অভ্যন্তরে তাঁর সমস্ত বিরোধী গোষ্ঠীকে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় করে অবিসংবাদিত নেতার স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন। দুই : এই বছরেই ঘটে যায় লেনিনগ্রাদ পার্টি সেক্রেটারী সেরগেই কিরভের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড, যার পরিণতিতে গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয ব্যাপক দমনপীড়ন এবং তার যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে এক দেশদ্রোহী, প্রতিবিপ্লবী চক্র গভীর চক্রান্তে লিপ্ত এবং তাকে পর্যুদস্ত করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই পরবর্ত্তীকালে অনুষ্ঠিত হয় মস্কো মামলা, যদিও তার প্রেক্ষাপট ছিল আরও বেশী ব্যাপক। তিনঃ তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কমিনটার্নের কাঠামোর ক্ষেত্রেও ব্যাপক রদবদল শুরু হয় এবং খুব দ্রুত গতিতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সর্বোচ্চ স্তরগুলিতে যাঁদের প্রবেশাধিকার ঘটতে শুরু করে, তাঁরা অনেকেই ছিলেন সোভিয়েত গোয়েন্দা পুলিশের পদাধিকারী ব্যক্তি। এর ফলে একদিকে যেমন কমিনটার্নের চরিত্রও দ্রুত বদলে যেতে শুরু করে, অপরদিকে তেমনি তার অভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হয় এক প্রবল কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া যেটিকে এখন অনেকে কমিনটার্নের 'স্তালিনীকরণ' বা 'আমলাতান্ত্রীকরণ' আখ্যা দিচ্ছেন।

॥ ৩ ॥

১৯২৪-৩৪ পর্বটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ১৯২৪-২৭, যেটিকে বলা যায় স্তালিন-এৎস্কি বিতর্কের অধ্যায় এবং যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত এৎস্কি সি. পি. এস. ইউ. থেকে বহিষ্কৃত হন; দ্বিতীয়তঃ ১৯২৭-২৯, যেটিকে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে স্তালিন-বুখারিন বিতর্কের পর্ব, যার সমাপ্তি ঘটে কার্যত স্তালিনের সাফল্য ও বুখারিনের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। তৃতীয়তঃ ১৯৩০-৩৪ পর্ব, যখন স্তালিনকে মুখোমুখি হতে হয় একের পর এক অনেকগুলো কঠিন চ্যালেঞ্জের এবং যে চ্যালেঞ্জগুলো উঠে আসে সি. পি. এস. ইউ.-এর ভেতর থেকে এবং শেষ পর্যন্ত এ সব কিছুকে অতিক্রম করে স্তালিন পুরোপুরিভাবে নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সংহত করতে সক্ষম হন। যেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল যে, সি. পি. এস. ইউ-এর অভ্যন্তরস্থ এই তীব্র মতবিরোধের প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয় কমিনটার্নেও এবং যার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য হয়ে দাঁড়ায় সুদূরপ্রসারী।

প্রথমতঃ স্তালিন-এৎস্কি বিতর্কের প্রেক্ষাপটে এৎস্কির বিভিন্ন রচনাকে একত্রিত করলে তাঁর সমালোচনার মূল বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এক : স্তালিনের 'একটি দেশে সমাজতন্ত্র' নির্মাণের তত্ত্ব প্রকারান্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, বড় করে দেখার এক তত্ত্বকে খাড়া করার চেষ্টা মাত্র এবং সেটি

উপেক্ষা করে এই নির্মাণপর্বের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতিকে। দুইঃ এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলা হল যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ধাঁচে সমাজতন্ত্র গঠিত হল, তার যথার্থতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের বা দ্বিধার আব অবকাশ নেই, ফলে এৎস্কির বহু পরিচিত সমাজতন্ত্রের আমলাতন্ত্রীকরণ তত্ত্বকে সরাসরি প্রতিবিপ্লবী, সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী বক্তব্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া হল। তিন ঃ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তিরূপে চিহ্নিত করা হল সি পি এস. ইউ -কে এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সারবস্তু নিহিত রয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতেই, এরকম একটি ধারণা প্রবর্তিত হবাব ফলে একদিকে যেমন সি. পি. এস. ইউ. কে সর্বোচ্চ আসনে (এৎস্কির ভাষায়, 'strictest revolutionary order) প্রতিষ্ঠিত করা হল, অপরদিকে তেমনই পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, মূল্যবোধকে দমন করা শুরু হল একই যুক্তিতে। চার ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুসৃত সমাজতন্ত্রের পথটিকে সমালোচনার ঊর্দ্ধে স্থাপন করে, তার সাফল্যের জয়বার্তাকে সদম্ভে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বল হল যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পতন আসন্ন ও অনিবার্য, সুতরাং ধনতন্ত্রের এই দুর্বলতাব সুযোগ নিয়ে প্রয়োজন হল দেশে দেশে প্রলেতারিয়েতকে জঙ্গী, আক্রমণের লড়াইয়ে সামিল করা এবং বলা হল যে এ কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে। লেনিনের অবর্তমানে ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের 'বলশেভিকীকরণের'' আহ্বানটি ছিল এই যুক্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এক কথায়, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে খাটো করে দেখা, আসন্ন ফ্যাসীবাদের পদধ্বনিকে উপেক্ষা করে এক কাল্পনিক ভাবনাকে বাস্তব বলে গণ্য করা ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। পাঁচ ঃ এই বক্তব্যের অনিবার্য পরিণতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এক আদর্শ মডেল হিসেবে দাড় করানো হল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সি পি. এস. ইউ.-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যই হয়ে দাঁড়াল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সে দেশের জনগণের প্রতি, মার্কসবাদের প্রতি, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আনুগত্যের সমার্থক।

এবারে যদি স্তালিনের বক্তব্যের মূল ঝোঁকগুলোকে আমরা কিছুটা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব যে তিনি কিন্তু কার্যতঃ এৎস্কি প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিভূমিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২] যেমন, ১৯২৪ সালে (লক্ষ্যণীয় যে এই সময় লেনিন অবর্তমান এবং যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বা War Communism-এর অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকাংশেই মুক্ত) স্তালিন সরাসরি এই কথা বলেন যে, পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে বিচার করতে হবে ১৯২১ সালে সি. পি এস ইউ.-এর দশম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, সেখানে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে পার্টির অভ্যন্তরে গোষ্ঠীচক্রের অস্তিত্বের অবসান ঘটাবার কথা ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোক্তা ছিলেন লেনিন নিজেই এবং সে জন্য তাঁকে যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে ভবিষ্যতের জন্যও বহাল

থাকবে, এরকম কোনও ভাবনা দশম কংগ্রেসের ছিল না। ১৯২৬ সালে 'সি. পি. এস ইউ যর অভ্যন্তরে বিরোধী গোষ্ঠী' শীর্ষক প্রতিবেদনে এবং 'লেনিনবাদ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন' প্রবন্ধে এই যুক্তিটিকেই আরও প্রসারিত করে স্তালিন যে বক্তব্য রাখেন তার মূল কথাটি হল ঃ এক, পার্টির অভ্যন্তরে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলাকে দুর্বল করা নয়, তাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র দরকার, কিন্তু কোনমতেই পার্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার (regime) বিরোধিতা বা সমালোচনাকে বরদাস্ত করা হবে না। দুইঃ পার্টি নেতৃত্বকে কায়েম রাখতে হলে প্রয়োজনে দমনমূলক নীতিরও আশ্রয় নিতে হবে, কারণ তার উদ্দেশ্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে জনগণের স্বার্থেই পরাভূত করা। পরবর্ত্তীকালে এই বক্তব্যের ভিত্তিতে স্তালিন কমিনটার্নের অভ্যন্তরে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার, একটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের তত্ত্বকে চূড়ান্ত মত হিসেবে গ্রহণ করার ও সি. পি. এস. ইউ.-এর কর্তৃত্বের প্রতি নিষ্ঠাশ্রয়ী আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন (এই প্রসঙ্গে ১৯২৬ সালে Reply to the Discussion on the Report on 'the Social Democratic Deviation in our Party,' ১৯২৭ সালে Report to the Joint Plenum of the Central Committee and the Central Control Commission of the CPSU (B)', 'Political Complexion of the Opposition' প্রতিবেদনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য), তাঁর পরিণতিতে পর্যায়ক্রমে প্রথমে 'বাম বিরোধীরা' (Left Opposition) যাঁরা মূলতঃ ছিলেন বুখারিনের অনুগামী, সি. পি. এস. ইউ. ও কমিনটার্ন থেকে অপসৃত হন ও উভয় ক্ষেত্রেই পুরোপুরিভাবে কায়েম হয় স্তালিনের ভাষায় সি. পি. এস. ইউ.-এর কার্যত নিয়ন্ত্রণাধীন 'পার্টিতন্ত্র' (party regime)।

এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে, সেটি হল এই বিপুল রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতা, সম্মান ও গুরুত্ব বহন করেও শেষ পর্যন্ত এৎস্কি কেন ব্যর্থ হলেন? সাম্প্রতিককালের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য যে কারণগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, সেগুলো অনেকটা এ রকম ঃ (১) এৎস্কির উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য তিনি যে পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন, এই দুই-এর মধ্যেকার বিরোধ।[৮] পার্টির অভ্যন্তরে আমলাতন্ত্রের উত্থান, গোটা রুশ দেশের পিছিয়ে পড়া অবস্থা এ সবের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা নেবার কথা এৎস্কি ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাস্রোতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সহনশীলতা বা বহুত্ববাদ (সমাজতান্ত্রিক অর্থে) অন্ততঃ বিশের দশক পর্যন্ত কোনও গুরুত্ব পায়নি। আরও স্পষ্ট করে বললে কথাটা দাঁড়ায় এ রকম ঃ তাঁর বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি মূলত যে পথের অনুসন্ধান করেছিলেন, তা ছিল বহুল পরিমাণেই রক্ষণশীল, গণতন্ত্রবিরোধী। বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত, মিলিটারী সমাধানে আগ্রহী এৎস্কি তাই ঢালাওভাবে 'লাল আতঙ্কের' যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, যেমন দ্বিধাগ্রস্ত তিনি ছিলেন না বাম মেনশেভিক, নৈরাজ্যবাদী ও ক্রনস্টাট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ নেবার ক্ষেত্রে। মস্কোর কমিনটার্ন মহাফেজখানার প্রাক্তন অধ্যক্ষ এফ. আই. ফিরসভ তাঁর অত্যন্ত

মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে এৎস্কির ভাবনাচিন্তা যেমনই হোক না কেন গোড়ার দিকে কমিনটার্নের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনিই ছিলেন কমিনটার্নের অভ্যন্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অন্যতম প্রবক্তা যখন কিন্তু স্তালিনের উত্থান হয় নি। দুইঃ এৎস্কির পক্ষে কমিনটার্নের অভ্যন্তরে কোনও বিকল্প, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি সি পি এস ইউ এর আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এ কথা মেনে নিয়েও বলতে হয় যে তিনি কিন্তু একই সঙ্গে সি পি এস ইউ এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বকে প্রাধান্য দেবার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই সোচ্চার এবং কমিনটার্নের কাঠামোগত গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নে প্রায় নির্বাক। এ সব কারণেই সম্ভবত তিরিশের দশকের গোড়ায় যখন স্তালিনের স্থান ও স্থায়িত্ব সি পি এস ইউ এর অভ্যন্তরেই হয়ে পড়েছিল গভীরভাবে সঙ্কটাপন্ন, তখন এৎস্কি ও তাঁর অনুগামীরা জনসাধারণের মনে কোনও বিকল্প, প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

সেই সময় স্তালিনের বিকল্প হিসেবে এৎস্কিকে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতিও তাই রুশ জনগণের ছিল না, যদিও ইতিহাসগতভাবে এ রকম এক সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ ছিল না এ কথা বলতে কিছুটা সংশয় জাগে। ইতিহাসের এটাই পরিহাস যে রাজনীতিতে এৎস্কি ও স্তালিন দুই বিরোধী শিবিরে অবস্থান করলেও গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় এবং তা ছিল মূলত নেতিবাচক।

॥ ৪ ॥

স্তালিন এৎস্কি বিরোধের প্রাথমিক পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ১৯২৭ সালে। এই পর্যায়ে বুখারিন স্তালিন বিরোধের সূচনা হয় এবং ১৯২৮ ২৯ পর্বে বুখারিন সাময়িকভাবে সি পি এস ইউ থেকে এবং পাকাপাকিভাবে কমিনটার্ন থেকে অপসৃত হন। এৎস্কিকে যেমন চিহ্নিত করা হয়েছিল অতি-বামপন্থী, হঠকারীতার প্রশ্রয়দাতা, দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক তত্ত্বের উদগাতা হিসেবে, বুখারিনকে চিত্রিত করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। বুখারিন একটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের তত্ত্ব বা নয়া অর্থনীতি, - এর কোনটিরই বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বুখারিন তাঁর একাধিক প্রবন্ধ, বক্তব্য ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে নানাভাবে যে কথাগুলো বলতে বা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তার সারবস্তু হল প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বদলে গণতান্ত্রিকতাকে, কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বহুত্ববাদ ও সহযোগিতার নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া।[৭] বলা বাহুল্য, বুখারিনের এই গণতান্ত্রিক মানসিকতাই পরবর্তীকালে তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এই চিন্তাধারা অচিরেই আখ্যাত হয় সংশোধনবাদী বা সংস্কারধর্মী হিসেবে এবং তার ফলস্বরূপ বুখারিন ও তাঁর অনুগামীরা হয়ে দাঁড়ালেন স্তালিনের চোখে 'দক্ষিণপন্থী', বিপ্লববিরোধী। বুখারিনের পরাজয় শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র যে সি. পি এস. ইউ. ও সোভিয়েত ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের পথকেই রুদ্ধ করে দিয়েছিল তা নয়,

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। ফিরসভ ও আলেকজান্ডার ভাতলিনের মূল্যবান গবেষণার ফলস্বরূপ কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) স্তালিন-বুখারিন বিরোধ, বুখারিনের কমিনটার্ন থেকে অপসারণ ও স্তালিনের চিন্তাধারার বিজয়ের তাৎপর্য গভীরভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই কংগ্রেসেই কমিনটার্ন প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে, সেটি পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য হয়। এই কর্মসূচীর মূল খসড়াটি রচনার দায়িত্বে ছিলেন বুখারিন এবং আজও অপ্রকাশিত এই দলিলে বুখারিন লিখেছিলেন ঃ

"..The diversity of types of capitalism in various countries and the diversity of conditions of revolutionary process also make absolutely inevitable the diversity of types of emerging new realities, which will be a definite feature of developemnt in this continuing transitional period. .... Being a unified world party of the proletariat, the Communist International has the responsibility for all its sections to carefully assess the specific position in respective countries. Only by taking into account these specific characteristics, it is possible to follow a really marxist policy."[৮]

ফিরসভ দেখিয়েছেন যে বুখারিনের স্বাক্ষরিত খসড়া কর্মসূচীটি যখন ষষ্ঠ কংগ্রেসে পেশ করা হয়, তখন স্তালিনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে উপরোক্ত অংশগুলিকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, বুখারিন যেখানে বলেছিলেন, "Only in conditions of friendly work, by removal of differences on the normal party basis by methods of intraparty democracy, it is primarily possible to surmournt the vast obstacles of the present and the great tasks of the immediate future.' স্তালিন সি. পি. এস. ইউ-এর প্রতিনিধিদলকে দিয়ে প্রস্তাব করেন যে, "the need for iron discipline in the sections of the International, about the need for the minority to listen to the majority" এই অংশটি কর্মসূচীতে জুড়ে দেওয়া প্রয়োজন।[৯]

এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলেকজান্ডার ভাতলিনের সংযোজন।[১০] তিনি দেখিয়েছেন যে বুখারিন তাঁর মূল খসড়ায় লিখেছিলেন, "Sometimes Social Democracy plays a fascist role". পরবর্ত্তীকালে সি. পি. এস. ইউ-এর নেতৃত্বের স্তরে আলোচনা করে এই বাক্যটিকে সংশোধন করে লেখা হয়, "Sometimes Social Democracy plays an openly fascist role'. সোশ্যাল ডেমোক্রেসিকে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে একত্রে বিচার করার প্রশ্নে বুখারিনের যে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল, ষষ্ঠ কংগ্রেসের কর্মসূচী সংক্রান্ত কমিশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুখারিন বলেছিলেন, "The development of Social Democracy in the direction of fascism and their definite closeness are in my opinion indisputable facts. The essence of

the problem, however, lies elsewhere. The tendencies towards this development were noticeable, but they must be formulated carefully. It would be quite wrong to throw a Social Democracy like the PPS together with fascism in one pot and identify it with fascism. Why? They have a different class basis."

কিন্তু স্তালিন ও বুখারিনের মধ্যে এই জাতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দুস্তর মতভেদ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বুখারিন স্তালিনের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। এর ফলে বুখারিন ষষ্ঠ কংগ্রেসে স্তালিনের সমালোচনায় মুখর হলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের প্রভাব কোনভাবেই অনুভূত হয় না। কমিনটার্নের এই মহাসম্মেলনে বুখারিন ১৯২১ সালে কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে জিনোভিয়েভের কাছে প্রেরিত লেনিনের একটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন : "If you drive out those not especially obedient, but the intelligent people, and retain only the obedient fools, then you will win the party for sure." তার পরে ১৯২৯ সালের ৩০ জানুয়ারী বুখারিন তাঁর একটি ঘোষণায় সরাসরি স্তালিনের বিরুদ্ধে কমিটার্নকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলার অভিযোগ আনেন এবং বলেন যে এর ফলে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে যে আমলাতান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে এই সংস্থাটির মধ্যে ভাঙন ও বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী এবং তার পরিণতিতে এটি দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য।" কিন্তু আবার একই সঙ্গে ৩০ জুলাই ১৯২৮ সালে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসেই স্তালিন, মলোতভ, ভরোশিলভ প্রমুখের সঙ্গে বুখারিন যে যৌথ ঘোষণার স্বাক্ষর করেন, তার মূল কথা ছিল এটাই যে, সি পি. এস. ইউ.-এর অভ্যন্তরে নেতৃত্বের স্তরে কমিনটার্নের কর্মসূচীর প্রশ্নে গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে এ রকম যে অপপ্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে, অর্থাৎ স্তালিনের সংশোধিত বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা বা গুরুতর মতভেদ আছে এ কথাটি বুখারিন নিজেই কার্যত অস্বীকার করলেন এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে।"

বুখারিনের এই সমঝোতা বা এক ধরণের আত্মসমপর্ণের ফলে স্তালিন ও তাঁর অনুগামীরা কমিনটার্নে দু'দিক থেকে লাভবান হন। এক : বুখারিনকে সংশোধনবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে কমিনটার্নের কর্মসূচীতে ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশল রচনার ক্ষেত্রে যে তীব্র জঙ্গী (যা ছিল কার্যতঃ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক শূণ্য এক ধরণের আগ্রাসী আস্ফালন মাত্র) বামপন্থী ঝোঁককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার সূত্র ধরে ট্রৎস্কির রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে কমিনটার্নের মতপার্থক্য কমিয়ে এনে ট্রৎস্কির অনুগামীদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় এক বড় ধরণের বিভ্রান্তি, দুই : বুখারিনের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কার্যত তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় সি. পি. এস. ইউ ও কমিনটার্ন উভয় ক্ষেত্রেই।

স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় : স্তালিন ও তাঁর অনুগামীদের অস্তিত্ব প্রথমে ট্রৎস্কি ও পরে বুখারিনের অপসারণের পর কী

এবারেই প্রথম এক শক্ত জমির ওপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল? এই সময়টিকেই কী ভবিষ্যতে যাকে স্তালিনবাদ বলা হয়েছিল, তার সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে? আপাত দৃষ্টিতে এর উত্তরটা ইতিবাচক মনে হলেও বাস্তবে তা ঘটে নি এবং তা বুঝতে হলে এই সময়ের দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এক ঃ ১৯২৮-২৯ সাল থেকে কমিনটার্নে স্তালিনের প্রভাব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং সেটি প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরে; কমিনটার্নের কর্মসূচী ও রণকৌশল রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় উগ্র বামপন্থী ঝোঁক, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে জাতীয়তাবাদকে প্রতিবিপ্লবী মনে করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। অপরদিকে কিন্তু সি. পি এস. ইউ-এর অভ্যন্তরে স্তালিনের অবস্থা ১৯২৯-৩৩ কালপর্বে ছিল গভীর সঙ্কটজনক ও অনিশ্চিত। জোরজবরদস্তি করে কৃষিতে যৌথ খামারনীতি চালু করতে গিয়ে তিরিশের দশকের গোড়ায় যে শস্য সঙ্কট দেখা দেয়, তার পরিণতিতে কী করা উচিত, সেই প্রশ্নে সি. পি. এস. ইউ-এর অভ্যন্তরে বড় রকমের মতবিরোধ ছিল। একদিকে ছিল উগ্র বামপন্থীদের, অপরদিকে ছিল বুখারিনপন্থীদের চাপ এবং স্তালিন গ্রহণ করেছিলেন এক ধরণের মধ্যপন্থী অবস্থান। যৌথ খামারনীতিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে বলপ্রয়োগের ব্যবহার যে বড় রকমের ক্ষতি ও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, তা স্তালিন নিজেও বুঝেছিলেন এবং সে কারণে তাঁর এই সময়ে প্রয়োজন ছিল বুখারিন ও বুখারিনপন্থীদের সমর্থন। তাই দেখা যায় যে, ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ-এর ষোড়শ কংগ্রেসে বুখারিন, তমস্কি ও রাইকভকে পার্টিতে পুনর্বার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুই ঃ জঙ্গী, অতি - বামপন্থীদের চাপের মুখে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তিরিশের দশকের গোড়ায় স্তালিন যখন বুখারিন ও তাঁর অনুগামীদের ওপরে এইভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন, তখন বুখারিনের পক্ষে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিকল্প কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভবপর হল না কেন? আরও স্পষ্টভাবে বললে যে প্রশ্নটি আজকের দিনে বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে দাঁড়ায়, তা হল ঃ বুখারিনের পরাজয় ও স্তালিনবাদের উদ্ভব এ দুটি ঘটনাই কী ইতিহাসে অনিবার্য ছিল? উত্তরটি সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে বলতে হবে, সম্ভবত ঃ নেতিবাচক। অর্থাৎ, বুখারিন এই পরিস্থিতির সুযোগ কেন গ্রহণ করতে পারলেন না, তার ব্যাখ্যাটি হওয়া প্রয়োজন, বিশেষতঃ এই কারণে যে সি. পি. এস. ইউ-এর অভ্যন্তরে তাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও নম্রভাষী হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও স্তালিন ও এৎস্কি উভয়ের তুলনায় অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য।

এই প্রশ্নের উত্তরে সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ দেওয়া যেতে পারে। এক ঃ কমিনটার্ন থেকে অপসারণের পরে বুখারিনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সি. পি. এস. ইউ-তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সেই কারণে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সালের পর আন্তর্জাতিক স্তরে বুখারিনের সঙ্গে কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থীদের' (যেমন, জার্মানীতে ব্রান্ডলার ও থালহাইমার গোষ্ঠী) সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ এবং বুখারিনের তরফ

থেকেও এই ধরণের সংযোগ গড়ে তোলা বা কমিনটার্নে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে বিশেষ কোনও উদ্যোগ বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। দুই ঃ জিনোভিয়েভ ও এৎস্কি সি. পি. এস. ইউ-এর অভ্যন্তরে স্তালিন ও তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের কার্যত পরিসমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হন, — বুখারিনের কাছে সেই দৃষ্টান্তটি ছিল বিশেষ শিক্ষণীয়। ক্রমশই তাঁর মনে এ রকম একটি ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে যে স্তালিনের সঙ্গে সমঝোতা করে সি. পি. এস. ইউ এর অভ্যন্তরে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাটাই তাঁর আশু কর্তব্য এবং তা করতে হলে কোনও রকমের অনিশ্চিত ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে বুখারিন এ বিষয়েও যথেষ্টই সচেতন ছিলেন যে পার্টির সাংগঠনিক স্তরে স্তালিনের তুলনায় তাঁর প্রভাব ছিল সামান্যই এবং এই অবস্থায় স্তালিনের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করে চলাটাই ছিল তাঁর পক্ষে শ্রেয় ও কাম্য। সম্প্রতি প্রকাশিত অরদঝনিকিদ্সের কাছে লেখা বুখারিনের কয়েকটি চিঠিতে এর প্রমাণ মেলে। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে লেখা তারিখবিহীন এই চিঠিগুলিতে তিনি বারে বারেই অনুরোধ করছেন যে তাঁকে যেন রাজনৈতিকভাবে খতম (purge) করা না হয়, রাজনৈতিক নির্বাসন তাঁর পক্ষে হবে জীবনহীনতার সামিল।[১৮] এই সময়ে স্তালিন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল, সেটি স্পষ্ট হয় যখন তিনি লেখেন ঃ "I am sure that if they would not have set Koba (স্তালিনের পার্টির অভ্যন্তরে ছদ্মনাম - - লেখক) against me he would have seen things with a different eye. I understand well that this is hard time for him now and he does not want to make the situation more complicated because of me, especially because the common problems are extremely complex and will be even more complex."[১৫] এরই সূত্র ধরে বলা যায় যে ১৯৩৩ সালে সি. পি. এস. ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে তিনি কেন এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তি করে পার্টির অভ্যন্তরে ও কমিনটার্নে তাঁর 'দক্ষিণপন্থী' ভুলকে স্বীকার করে নেন। তিনি সেই সঙ্গে স্তালিন ও তাঁর নেতৃত্বকে যে ভাষায় স্তুতি ও প্রশংসা করেন, তা এক কথায় তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়, বিশেষ করে যখন তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন স্তালিনবিরোধীদের, যাঁরা পার্টি ও আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় থেকে প্রতিবিপ্লবী কাজে সহায়তা করছেন বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[১৬]

বুখারিন যদি স্তালিনের বিরোধিতায় সক্রিয় হতেন বা একটি বিকল্প রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজির অনুসন্ধানে কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, তাহলে সম্ভবতঃ ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হত। এ-ব্যাপারে আন্তর্জাতিক এৎস্কি বিশেষজ্ঞ Broue তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের এই বিরল মুহূর্তে স্তালিনের অনুসৃত নীতির বিরোধিতার প্রশ্নে, বিশেষত সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রীকরণ ও বলপ্রয়োগ, দমননীতির মাধ্যমে যৌথ খামারনীতিকে বাস্তবায়িত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে এৎস্কি ও বুখারিনের চিন্তা ছিল প্রায় অভিন্ন।[১৭] তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত

বুখারিনকে লেখা ঐ সময়ে এৎস্কির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে।[১] যার মর্মার্থ একটিই : স্তালিনবাদের আসন্ন উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য বুখারিন ও এৎস্কির ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯২৮ সালের জুলাই মাসেই বুখারিন কামেনেভের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করেছিলেন আসন্ন বিপদের পূর্বাভাষ নিয়ে আলোচনার জন্য, যদিও বুখারিন আগাগোড়াই ছিলেন এই ব্যাপারে অতিমাত্রায় সতর্ক, সাবধানী ও নৈরাশ্যবাদী।[২] পরবর্ত্তীকালে বুখারিনের আত্মসমর্পণ এ রকম একটা বিকল্প ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণই বাতিল করে দেয়।

এই প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতও লক্ষণীয়। তেওদর বের্গমান ও গের্ট শেফার তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে Broue-এর এই বক্তব্য ভিত্তিহীন, কারণ এৎস্কি কোন সময়েই বুখারিনের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না এবং তাঁর কাছে বুখারিনের ধীরে চলার নীতির তুলনায় স্তালিনের জঙ্গী রাজনৈতিক দর্শন ছিল ঢের বেশী গ্রহণীয়। বিভিন্ন যে সব তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই দুই জার্মাণ বিশেষজ্ঞ তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নরওয়ের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় পত্রিকা Arbeiderbladet এ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত এৎস্কির একটি চিঠি, যেখানে তিনি বুখারিনকে চিত্রিত করেন একজন দক্ষিণপন্থী কুলাক, 'নেপ' ও বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরূপে এবং বলেন যে স্তালিনের প্রতিটি বামপন্থী পদক্ষেপকে তিনি সমর্থন করবেন।'[২]

বুখারিন-এৎস্কি সমঝোতা সম্ভবপর ছিল কি না এবং তা হলে ইতিহাসের গতি কোনদিকে যেত, সে বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ কথা মেনে নিতেই হয় যে তিরিশের দশকের গোড়ায় স্তালিন তাঁর দুই কঠিন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ, এৎস্কি ও বুখারিন, উভয়কেই সাফল্যের সঙ্গে কম বেশী নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

এখন পর্যন্ত যা বলা হল, তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এৎস্কি ও বুখারিনের অপসারণের ফলে স্তালিনবাদের দ্রুত উত্থানের ক্ষেত্রে কোন বাধাই আর রইল না। বাস্তবে কিন্তু পরিস্থিতি এ রকম ছিল না। বিশিষ্ট দুই রুশ ইতিহাসবিদ রয় মেদভেদেভ এবং ভাদিম রগোভিন তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে এর পরেও স্তালিনকে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং এ-ব্যাপারে তিরিশের দশকের গোড়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল রিয়ুতিন (Riyutin) মঞ্চ, যা সাধারণত Riyutin Platform নামে পরিচিত।[২১] এঁদের প্রায় বেশীরভাগ সমর্থকই ছিলেন বুখারিনীয় মতবাদের কাছাকাছি এবং এঁরা চেয়েছিলেন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, স্বৈরতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও রীতিনীতির অবসান এবং স্তালিনের বিকল্প একটি নেতৃত্ব। রিউতিনের উদ্যোগে গোপনে এ রকম একটি দলিল পার্টির মধ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের কায়দায় বিলি করা হয়, যদিও মূল দলিলটির

এখনও হদিশ করা সম্ভব হয় নি। রিউতিন মঞ্চের ছত্রছায়ায় সামিল হয়েছিলেন স্লেপকভ, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ এবং সম্ভবতঃ কিরভ যিনি এক সময়ে ছিলেন রিউতিনের সহযোগী। তাই এ রকম একটি ধারণায় উপনীত হওয়া খুব অস্বাভাবিক হবে না, যদি বলা যায় যে রিউতিনের সঙ্গে সম্ভবত কিরভের এক ধরণের গোপন আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ ১৯৩২-৩৩ সালে কিরভ, অর্দঝোনিকিদজে এবং কুইভিশেভ স্তালিনবাদের উত্থানের বিপদচিহ্নগুলি দেখতে পেয়ে ক্রমেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এঁরা মুখে স্তালিনের প্রশংসা করলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সংযম ও সহনশীলতার পক্ষে।[১৯] স্তালিনপর্বে প্রকাশিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসেও এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, রিউতিন মঞ্চ ছিল মূলত এক ধরনের বুখারিনীয় বিকল্প।[২০] এই বক্তব্যের সূত্র ধরে ১৯৩৪ সালে কিরভের রহস্যজনক হত্যাকান্ড, ১৯৩২ সালে রিউতিনের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা, ১৯৩৩ সালে বুখারিনের পূর্বে উল্লিখিত স্বীকারোক্তি প্রভৃতি ঘটনাবলীকে এক সূত্রে গ্রথিত করা যায় এবং তার তাৎপর্য গভীরভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। ভাদিম রগোভিন দেখিয়েছেন যে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রিউতিন মঞ্চই ছিল স্তালিনের বিরুদ্ধে সব চেয়ে শক্ত চ্যালেঞ্জ, যা তাঁকে এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে রিউতিনের সমালোচনার সময়েও এই মঞ্চ থেকে গোপনে প্রচারিত দলিলটি সেখানে পেশ করা হয় নি।[২১] রিউতিন মঞ্চ পর্যুদস্ত হলেও রিউতিনের কর্মসূচী ছিল এক অর্থে বিশেষ ইঙ্গিতবহ, কারণ ঐ সময়ে এটিই ছিল স্তালিনীয় একাধিপত্যের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র সুসংহত প্রয়াস এবং যার পেছনে ক্রমবর্ধমান সমর্থন বলশেভিক পার্টিকেও ধীরে ধীরে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এই পটভূমিকায় বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ১৯৩৪ সালের সপ্তদশ কংগ্রেসকে কেন "বিজয়ীদের মহাসম্মেলন" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল: কার্যত রিউতিন মঞ্চের কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যাবার ফলে নিজের নেতৃত্বকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে স্তালিন প্রকৃতই এবারে বাধামুক্ত হলেন।

॥ ৬ ॥

সি. পি. এস. ইউ-এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিকল্প ভাবনাচিন্তাগুলির ভবিষ্যৎ এইভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাবার তাৎপর্যটি ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে সুদূরপ্রসারী। সাধারণভাবে এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে ১৯৩৫ সালে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে দিমিত্রভের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট নীতি গৃহীত হবার পরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বামপন্থী হঠকারীতার অবাস্তব নীতি পরিহার করে বাস্তববোধের পরিচয় দেয় এবং তার পরিণতিতে সূচিত হয় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্য সঠিক কিন্তু প্রকৃত অর্থে কমিনটার্নে মধ্য তিরিশের দশক থেকে শুরু হয় নতুন করে এক জটিল ও বেদনাদায়ক পর্ব। কমিনটার্নে বুখারিনের অপসারণ ও ১৯৩৪ সালে সি. পি. এস. ইউ-এর সপ্তদশ কংগ্রেসে স্তালিনের সাফল্যের কারণে দিমিত্রভ ও তাঁর মত আরও প্রভাবশালী নেতারা (যেমন, তোগলিয়াত্তি) কমিনটার্নে যুক্তফ্রন্ট নীতি

চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও সি পি এস ইউ এর অভ্যন্তরে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের দ্রুত অবলুপ্তির প্রশ্নে ছিলেন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তোগলিয়াত্তি, দিমিত্রভ প্রমুখ নেতাদের অনেকেই চিন্তাভাবনার দিক থেকে ছিলেন স্তালিনীয় ভাবনার বিরোধী এবং এক সুস্থ, গণতান্ত্রিক বিকল্পের পক্ষে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ১৯৩৫ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত স্তালিনীয় মডেলটিকে সমর্থন ও স্তালিন অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে সায় দেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। এর ফলে কমিনটার্নের সাংগঠনিক স্তরে স্তালিনের প্রভাব দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করে এবং সেটি কিন্তু ঘটে দিমিত্রভ প্রদর্শিত যুক্তফ্রন্ট নীতিকে মেনে নিয়েই, অর্থাৎ কমিনটার্নের অভ্যন্তরে সাংগঠনিক স্তরে অনুভূত হয় রুশী ধাঁচে প্রবল কেন্দ্রীকরণ ও আমলাতান্ত্রিকরণের ঝোঁক ও একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে অনুসৃত হয় দিমিত্রভীয় যুক্তফ্রন্ট নীতি। এ রকম এক অস্বস্তিকর ও কমিনটার্নের সাংগঠনিক স্তরে প্রবল ক্ষতিকারক পরিস্থিতির সামনে দিমিত্রভ সহ গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন অন্য অনেক নেতাই ছিলেন প্রায় অসহায় এবং তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন স্তালিন ও তাঁর অনুগামীরা।

এর সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। একঃ গোটা ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসীবাদের উত্থান, স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রীদের পরাজয়ের ঘটনা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের করেছিল ঘরছাড়া এবং তাঁদের আত্মগোপন করতে হয়েছিল, আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিতে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। কমিনটার্নের কেন্দ্রীয় দপ্তরও ছিল মস্কোতে। তার ফলে ইচ্ছে থাকলেও সি পি এস ইউ এর স্তালিনীয় নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়ে, তাঁদের বিরোধিতা বা সমালোচনা করে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। দুই ঃ কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) গৃহীত কর্মসূচীর পরিণতিতে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরোধ ও তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে এবং তার ফলে ইউরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেসির চরম রক্ষণশীল অংশ কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেয়। এর ফলটা দাঁড়াল এই যে, বলশেভিকবাদকে ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে ফ্যাসীবাদের সঙ্গে তুলনা করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একের পর এক নিন্দা ও সমালোচনা করে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমিনটার্ন ও সি পি এস ইউ-এর প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করাই হয়ে দাঁড়াল বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির আশু কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব। তিন ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সি পি এস ইউ-এর প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ও সোভিয়েত রাষ্ট্র ও পার্টির ওপরে পরিস্থিতিগত কারণে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রবল নির্ভরতা কমিনটার্নকে ক্রমেই সি. পি. এস ইউ-এর ক্রীড়নকে পরিণত করে তোলে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটাই যে, ১৯৩৫ সালে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পরে যখন কার্যকরী সমিতি পুনর্গঠিত হল তখন সেখানে স্থান পেলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দাবিভাগের বিভিন্ন

প্রভাবশালী ব্যক্তি, যেমন ত্রিলিসার (মসকভিন) ও এঝভ, স্তালিনের অতি ঘনিষ্ঠ কট্টরপন্থী ঝদানভ ও মলোতভ। এর ফলে কমিনটার্নের গোটা সাংগঠনিক স্তরেই বড় রকমের গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়, যার মাশুল গুনতে হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি কথাটা বলা প্রয়োজন : সাম্প্রতিক কালের নতুন গবেষণা প্রমাণ করছে যে ১৯৩৫ সালের পর কমিনটার্নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দিমিত্রভ এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু প্রবল ঝুঁকি নিয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন কমিনটার্নকে এই স্তালিনীয় আমলাতান্ত্রিকতা ও কেন্দ্রীকরণ থেকে মুক্ত করতে। ১৯৩৭ সালে মস্কো মামলার প্রেক্ষাপটে স্তালিন ও এঝভ দিমিত্রভকে খোলাখুলিভাবেই বলেন যে কমিনটার্ন কিছু কুচক্রী, দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের কবলে পড়েছে এবং সে জন্য প্রয়োজন এঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করার।" এই যুক্তিটিকে ব্যবহার করেই বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সি. পি. এস. ইউ-এর চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও নিধনপর্ব শুরু হয়। এভাবেই পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যতঃ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এই সমকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে কমিনটার্নের অতি ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ভারগা তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়ে স্তালিনকে ২৫ মার্চ ১৯৩৮ সালে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "The Cadres are now living in a highly demoralised and despirited state on account of mass arrests. The majority of the workers of the Comintern are becoming victims of this demoralised condition and this sense spreads even over the individual members of the secretariat of the ECCI. .... Many foreigners every evening are packing up their belongings awaiting possible arrests. Moreover, owing to continuous fear many have turned semi insane, incapable of discharging thier responsibilities." এই কঠিন পরিস্থিতিতে দিমিত্রভ সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন নির্দোষ ব্যক্তিদের প্রাণে বাঁচাবার জন্য এবং তার জন্য যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে তিনি গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড মকুবের সুপারিশ করেছিলেন পার্টি ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে। তাঁর হস্তক্ষেপেই শেষ পর্যন্ত বেশ অনেকের দণ্ডাদেশ রদ করা সম্ভব হয়।" এবং শুধু তাই নয়, দিমিত্রভ উদ্যোগ নিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে মস্কোর নিয়ন্ত্রণমুক্ত কমিনটার্নের একটি বৈদেশিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে এবং তার দায়িত্বে তোগলিয়াত্তি থাকবেন, এরকম এক ভাবনাও তাঁর ছিল।" দিমিত্রভ একেবারে গোড়া থেকেই ছিলেন কমিনটার্নে কেন্দ্রীকরণ ও আমলাতন্ত্রীকরণের ঝোঁকের বিরোধী। ১৯৩৪ সালের ১ জুলাই স্তালিনকে লেখা একটি চিঠিতে দিমিত্রভ বলেছিলেন : "I think that all the experiences of the activities and leadership of the Comintern show that it is impossible to lead from Moscow all the questions of the Comintern situated in absolutely variable conditions (parties in the metropolis and colonies, parties in the highly developed

industrial countries in the agrarian countries, parties legal and illegal) [২৮] এর পরে ১৫ অক্টোবর ১৯৩৪ দিমিত্রভ অপর একটি চিঠিতে স্তালিনকে লেখেন যে সমস্ত সিদ্ধান্ত যদি মস্কোর নির্দেশ মেনে করতে হয়, তাহলে স্থানীয় স্তরে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, পরবর্ত্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসি জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা এবং গোটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটপরিবর্তন সি পি এস. ইউ এবং কমিনটার্নে বিকল্প ভাবনাচিন্তা উৎসারণের সব সম্ভাবনাকেই বাতিল করে দেয় ও তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার ভবিষ্যত।

সূত্র নির্দেশ

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত রুশ সূত্রগুলিকে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন কলকাতার [illegible] প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক হরিশ চন্দ্র গুপ্ত ও সেন্টার ফর সোভিয়েত স্টাডিজ-এর [illegible]। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। জার্মান সূত্রগুলি থেকে অনুবাদ লেখক নিজে করেছেন। এই সূত্রগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন Potsdam এর European Centre for Historical Studies সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক Mario Kessler আমি এঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।]

১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য **Third International after Lenin** (New York 1970) **The Stalin School of Falsification** (New York 1972) **The Challenge of the Left Opposition (1926-1927)** (New York 1980)

২। বিশেষভাবে উল্লেখ্য J V Stalin **On the Opposition (1921-27)** (Beijing 1975)। বেজিং সংস্করণটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত মূল রুশ সংস্করণের অনুবাদ।

৩। Enzo Traverso Der Stumme Prophet — Trotzki heute in Theodor Bergmann/Mario Kessler (eds) **Ketzer im Kommunismus — Alternativen Zum Stalinismus** (Mainz 1993) পৃঃ ৪১-৪৬।

৪। I I Iusov, Leo Trotzki und die Politik der Komintern zu Beginn der Zwanziger Jahre . ঐ পৃঃ ২৬৮-২৬৯।

৫। Alexander Watlin. **Die Komintern : 1919-1929, Historische Studien** (Mainz. 1993) পৃঃ ৯১-৯২। এটি রুশ সংস্করণের জার্মান অনুবাদ।

৬। Catherine Merridale 'Trotzki and Trotzkismus in Moskau 1924-1932'. in Theodor Bergmann/Gert Schaefer (eds) **Leo Trotzki — Kritiker and Verteidiger der Sowjetgesellschaft** (Mainz 1993). পৃঃ ২২১।

৭। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য Richard B Day (ed). **N. I. Bukharin, Selected Writings on the State and the Transition to Socialism** (Nottingham. ১৯৮২), যেখানে বুখারিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া N I Bukharin. Politicheskoe zaveshchanie Lenina' (১৯২৯) in **Izbrannye proizvedeniya** (Moscow. ১৯৮৮), পৃঃ ৪১৯-৪৩৬ উল্লেখযোগ্য. যেটি Lenin's Political Testament' নামে পরিচিত।

৮। F. I. Firsov, 'Stalin i Komintern (I)', **Voprosy istorii**, no 8, 1989, পৃ ২০।

৯। ঐ পৃ ২০।

১০। A. Vatlin পূর্বোক্ত পৃ ১৬৬-১৬৭।

১১। F. I. Firsov, 'Komintern: mekhanizm funktsionirovaniya', **Novaya i noveishaya istoriya**, no 2, 1991, পৃ ৪২।

১২। ঐ পৃ ৪১।

১৩। এই ঘোষণাপত্রটি মস্কোর কমিন্টার্ন মহাফেজখানায় দেখার সুযোগ লেখকের হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এই মহাফেজখানা থেকে বিভিন্ন দলিল সংগ্রহ করবার দায়িত্ব নিয়ে লেখক মস্কো গিয়েছিলেন এবং অনেক দলিলের সঙ্গে এটিও সংগৃহীত হয়। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে দলিলটি রক্ষিত আছে। মস্কোর মহাফেজখানায় দলিলটির নম্বর ৪৯৫/১/৩৮৬/৭।

১৪। গোপন চিঠি 'Pisma N. I. Bukharina', **Voprosy istorii KPSS**, no 11, 1988, পৃ ৪০।

১৫। ঐ পৃ ৪২।

১৬। অপ্রকাশিত এই কার্যবিবরণের পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য **Voprosy istorii KPSS**, no 1, 1991, পৃ ১২-৯৬ এবং no 3, 1991, পৃঃ ৪০-৬৩।

১৭। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Pierre-Broue', 'Bucharin and Trotzki', in Theodor Bergmann, Gert Schaefer (eds), **Liebling der Partei, Nikolai Bucharin. Theoretiker and Praktiker des Sozialismus** (Hamburg 1989), পৃ ২৭-৩০।

১৮। Leon Trotsky, **The Challenge of the Left Opposition (1926-27)**, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬-৪৬।

১৯। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Appendix A in Leon Trotsky, **The Challenge of the Left Opposition (1928-29)** (New York, 1981), পৃঃ ৩৭৭-৩৮৮।

২০। Theodor Bergmann, Gert Schaefer, 'Trotzki und Bucharin', in Bergmann, Schaefer (eds), **Leo Trotzki**, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

২১। Roy Medvedev, **Let History Judge. The Origin and Consequences of Stalinism** (Oxford, 1989), সংশোধিত সংস্করণ, পৃঃ ২৯৬-২৯৭। ভাদিম রগোভিন এই বিষয়ে অতি সম্প্রতি বিদেশে যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে রিউতিন মঞ্চের প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর এই আলোচনার সারাংশের জন্য দ্রষ্টব্য 'The Origins and Consequences of Stalin's Great Terror', A lecture by Professor Vadim Z. Rogovin. **International Workers' Bulletin**, Vol 4, no 8, May 6, 1996, পৃঃ ৪-৬।

২২। রিউতিন মঞ্চ এবং তার বুখারিনীয় চরিত্র প্রসঙ্গে উল্লেখ্য Ivan Anfert'ev, 'Ryutin protiv Stalina', in **Vozvrashchennye imena** (Moscow, 1989), Vol. II, পৃঃ ১৭৯-২০২ এবং Vladimir Aminsky, 'Na zabroshennykh grobnitsakh (N. I. Bukharin, 1888-1938), ঐ Vol. I, পৃঃ ৩৮।

২৩। **History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks). Short Course** (Moscow 1951) পৃ. ৪৫১।

২৪। Rogovin পূর্বোক্ত পৃ. ৫।

২৫। I I Firov Stalin i Komintern (II). **Voprosy istorii,** no 9 1989 পৃ: ১৫।

২৬। Firov Kamontern mekhanizm পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫।

২৭। I I Firov Defending the Innocent' **Problems of Peace and Socialism,** Vol 17 no 7 July 1989

২৮। Firov Stalin i Komintern (II) পূর্বোক্ত পৃ: ১৬।

২৯। Firov Komintern mekhanizm পূর্বোক্ত পৃ: ৪৩।

৩০। Firov Stalin i Komintern (II) পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪।

চীনা পরিব্রাজক সুয়ান সাঙ ও ই-চিঙ-এর বর্ণনায় নালন্দা মহাবিহার

কৃষ্ণেন্দু রায়

সঙঘ বা বিহারের অর্থ, সমূহ অর্থাৎ গণ তথা বিনয় পিটকের (আ: খৃ: পূ: তৃতীয় শতক) নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমবেত জীবনচর্যা। (১) ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল। বর্তমান বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার রাজগীর থেকে সাত মাইল উত্তরে ২৫°৮ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°২৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আলোচ্য নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। উৎখননস্থলের মোট পরিমাণ মোটামুটি ১৬০০ x ৪০০ ফুট অর্থাৎ ৬,৪০,০০০ বর্গফুট পরিমিত স্থান। (২) চীনা পরিব্রাজক সুয়ান সাঙ (খৃ: ৬২৯-৪৫) ও ই-চিঙ (খৃ: ৬৭৩-৮৫) ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং এঁরা দুজনেই বেশ কয়েক বছর নালন্দা মহাবিহারে কাটিয়েছিলেন। এঁদেরই দেওয়া বিবরণ এবং প্রয়োজনমত 'পাথুরে' প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে বর্তমান পত্রে নালন্দা মহাবিহার সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বোঝাবার সুবিধার্থে আলোচনাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

(ক) নালন্দা মহাবিহারের জন্মবৃত্তান্ত ও গঠন;
(খ) শিক্ষাদান ও গ্রহণ পদ্ধতি;
(গ) পরিচালন ব্যবস্থা;
(ঘ) আয়সংস্থান;
(ঙ) ধর্মচর্চা এবং
(চ) শিল্প ও পুঁথি নকল ব্যবস্থা।

(ক) নালন্দা মহাবিহারের জন্মবৃত্তান্ত ও গঠন —

আলোচ্য মহাবিহারের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে সুয়ান সাঙ-এর বক্তব্যে স্পষ্টতই দুটি অংশ —

(১) নাম সংক্রান্ত এবং (২) গঠন প্রসঙ্গ। নাম প্রসঙ্গে পর্যটক বলেছেন যে, জু-লুই নামে কোনও এক জনৈক উদারচেতা রাজা আলোচ্য অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অসীম উদারতার জন্যই নাম দেওয়া হয়েছিল নালন্দা। বস্তুত, অঞ্চলটিতে ছিল আমবাগান এবং পাঁচশত বণিক দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে এই অঞ্চলটি ক্রয় করে বুদ্ধদেবকে দান করে যান(৩) অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটি

দলগতভাবে কিছু সংখ্যক বণিক প্রচুর পরিমাণে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন, সম্ভবত একই কারণে গুপ্তরাজবংশীয় সম্রাটেরাও শক্রাদিত্য (মহেন্দ্রাদিত্য বা প্রথম কুমার গুপ্ত [আ: ৪১৩-৪৫৫ খৃ:] বুধগুপ্ত [আ: ৪৭৫-৯৫ খৃ:], তথাগত গুপ্ত, বালাদিত্য (নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য [আ: ৫১৫-২৮ খৃ:] এবং বজ্র উক্ত অঞ্চলে 'বিহার' নির্মাণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তথাগতগুপ্ত ও বজ্রের সঠিক পরিচয় অজ্ঞাত[৪]। বিশেষত 'বিহার' নির্মাণ করা হত প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে (১) বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ধ্যানের জন্য এবং (২) বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানী সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দান এবং এঁদের থাকার সুবন্দোবস্তও করা হত। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'বিহার' নির্মাণ করা পুণ্যের কার্জ[৪ক]। খুব সম্ভবত এই কারণেই উপরোক্ত বণিকরা আলোচ্য মহাবিহার নির্মাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন এবং গুপ্ত সম্রাটেরা সেখানে বিভিন্ন সময়ে 'বিহার' নির্মাণ করেছিলেন। ক্রমশ 'বিহার'গুলি যখন ধর্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল, তখন এইসব 'বিহার'গুলি জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠে এবং তখন 'বিহার'গুলি নিরাপত্তার জন্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত[৪খ]। সুয়ান সাঙ বলেছেন যে, মধ্যভারতের কোনও একজন রাজা বৃহদাকার প্রাচীর দিয়ে নালন্দাব 'বিহার'গুলিকে ঘিরে দিয়েছিলেন। চিনা পরিব্রাজক এই রাজার নাম উল্লেখ কবেননি; তবে, সম্ভবত তিনি ছিলেন যশোধর্মা (আ· ৫৩২-৩৪ খৃ:) এবং 'বিহাব'গুলি সমষ্টিগতভাবে নালন্দা মহাবিহার হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে[৫] এবং এগুলি ছিল জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র; 'ন-অলম-দাতুম' নঞর্থক হলেও, সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, 'বিহার'গুলি জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে[৫ক]। কাজেই ধরা যেতে পাবে যে, খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নালন্দা মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল।

দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট-বড় মিলিয়ে মহাবিহারবাসীদের কক্ষগুলি ছিল শিল্পকার্যে সমৃদ্ধ। মণিমুক্তখচিত স্তম্ভ, বিশেষ করে সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট স্তম্ভসমূহ কক্ষগুলিকে আরও সুদৃশ্য করেছিল। ছাদের ওপর যেসব টালি লাগানো থাকত, তাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে মহাবিহারের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করত[৬]।

(খ) শিক্ষাদান ও গ্রহণ পদ্ধতি—

নানা আকারের অনেকগুলি কক্ষবিশিষ্ট বিহার নির্মাণ করা হয়েছিল এই কারণে যে, সেখানে দেশী-বিদেশী মিলিয়ে বহু ছাত্র বসবাস করে পড়াশোনা করত। চীন, কোরিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি[৭] দেশ থেকে ছাত্রেরা নালন্দা মহাবিহারে জ্ঞান আহরণের জন্য আসতেন। ছাত্র সংখ্যা সুয়ান সাঙ-এর মতে দশ হাজার হলেও, সংখ্যাটি সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ, চীনা পরিব্রাজক নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষা ছিল অত্যন্ত কঠিন; প্রতি দশজনের মধ্যে দুই বা তিন জন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আলোচ্য বিদ্যায়তনে পড়ার সুযোগ পেত[৮]।

প্রতিদিন ১০০ জন শিক্ষক ১০০টি বিবিধ বিষয়ে ছাত্রদের পাঠদান করতেন। পাঠ্য বিষয় হিসেবে ছিল বেদ-আয়ুর্বেদ (জীবনীশক্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত), যজুর্বেদ (পূজাবিষয়ক), সামবেদ এবং অথর্ববেদ; পাঁচ ধরনের বিদ্যা শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা[৯] (সুয়ান সাঙের মতে, ভূতঝাড়ার মন্ত্র, ঔষধ, রোগ-আরোগ্য আনয়নে রত্ন পাথরের ব্যবহার, সুচবিদ্ধ করে মানবদেহের চিকিৎসা করা ইত্যাদি[১০]।) অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্যায়াম[১০ক] প্রভৃতি। আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ধরনের শিক্ষাবিভাগ ছিল (১) উচ্চ তথা গবেষণামূলক এবং (২) মাধ্যমিকস্তরের। প্রথম বিভাগে বিদেশাগত পণ্ডিত ছাত্রদের এবং দ্বিতীয় বিভাগে 'ব্রহ্মচারী', 'মানবক' প্রমুখ ছাত্রদের পড়ানো হত। ব্রহ্মচারীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতেন না; নিজেদের খরচায় অথবা সঙেঘর জন্য শ্রমদান করে লেখাপড়া শিখতেন। পাঠ্যবিষয় বৌদ্ধশাস্ত্র বহির্ভূত ছিল[১১]। পড়াশোনার সুবিধার্থে বিশাল মাপের গ্রন্থাগারও ছিল— রত্নসাগর, রত্নদোধি ও রত্নরঞ্জকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ ও উচ্চমানের গ্রন্থাগার ধর্মগঞ্জন প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের (বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রে ১০টি বিবিধ বিষয়ে উপলব্ধি সংক্রান্ত — দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায়কৌশল্য, প্রনির্বাণ, বল এবং জ্ঞান[১২]। মত বহুমূল্যবান পুঁথিসহ গ্রন্থাগার ছিল সে যুগের উন্নত জ্ঞানভাণ্ডার। বক্তব্যের সপক্ষে ই-চিঙ-এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য— তিনি পাঁচ লক্ষ শ্লোক সম্বলিত প্রায় ৪০০ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন এই গ্রন্থাগার থেকেই[১২ক]।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন প্রায় ১৫০০। সুয়ান সাঙ কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষকের নাম করেছিলেন— শীলভদ্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুমমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র প্রমুখ[১৩]। পরিব্রাজক নিজেও মহাযানী বৌদ্ধধর্মে একজন বিদগ্ধ শিক্ষক-পণ্ডিত ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের শিক্ষাগত মর্যাদা কতটা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়; সম্রাট হর্ষবর্ধনের আদেশে উড়িশ্যায় সুয়ান সাঙসহ মোট চারজন সাগরমতি, প্রজ্ঞারশ্মি ও সিংহরশ্মি— মহাযানী বৌদ্ধ পণ্ডিতকে পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য[১৪]। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতার্থে ছিল প্রাগ্রসর ছাত্রদের জ্ঞানচর্চার ও বিচারের পীঠস্থান। যে-কোনও বিষয়ে প্রদত্ত অভিমতের সামাজিক স্বীকৃতির মূলে ছিল আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিচারিকৃত প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। তাই, সে যুগে বিদ্যার্জনের শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ প্রাপ্তি। শিক্ষাগত পরিবেশ ও ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে সুয়ান সাঙ বলেছেন যে, বিগত ৭০০ বছরে এই প্রতিষ্ঠানে কোনও আইন-বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ সমাবেশ বা বিদ্রোহ ঘটেনি; পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বদাই ছাত্রেরা জ্ঞানচর্চাকে সমৃদ্ধতর করার কাজেই লিপ্ত থাকতেন[১৫]।

বর্তমান প্রসঙ্গটি ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে আর একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ই-চিঙ-এর খবর অনুযায়ী, সুয়ান সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যাওয়ার পর এবং ই-চিঙ-এর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরে আরও অনেক পণ্ডিতব্যক্তি চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য

এসেছিলেন; যেমন, উয়ানচো, শিন্-কোয়ন, তাও-হি (সংস্কৃত নাম শ্রীদেব), আর্যবর্মা (তিনি বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটকে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন), উই-ইয়ে (তিনি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বিধান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনি বেশ কিছু রচনাও করেছিলেন), তাও শিঙ (সংস্কৃত নাম চন্দ্রদেব), তাং (মহাযানী বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ), তাও লিন (সংস্কৃত নাম শীলপ্রভ, বৌদ্ধ কোশ গ্রন্থে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।), উও কিং (তিনি যোগশাস্ত্র ও কোশশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন) হয়ত আরও অনেকেই ছিলেন[১৬]। এঁদের আগমন ও বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের খবর থেকে এই কথাই প্রতিভাত হয় যে, দুই চীনা পরিব্রাজকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়েও আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল এবং সেই জ্ঞানানুশীলনের মান এতটাই উঁচু ছিল যে, অন্যান্য বিদেশী ছাত্রেরাও এখানে আসতেন। শুধুমাত্র সুয়ান সাঙ ও ই-চিঙ-ই নয়।

(গ) পরিচালন ব্যবস্থা—

স্বভাবতই, প্রতিষ্ঠানটিতে সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা ছিল বলেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মর্যাদা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুই ধরনের পরিচালন ব্যবস্থা ছিল— (১) মহাবিহারের অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা এবং (২) বহির্বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা। বৌদ্ধবিহারগুলি সাধারণত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই পরিচালিত হত। নালন্দা মহাবিহার কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। এখানে 'সভা' থাকত, যার প্রধানদের বলা হত স্থবীর; কিন্তু যে-কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত সাপেক্ষেই গৃহীত হত— যেমন, সাধুসন্তদের থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা; তাঁদের কাজের সুবিধার্থে কর্মী সরবরাহ করা; কোনরকম বিশৃঙ্খলা বা অন্যায় কিছু ঘটলে, তার নিষ্পত্তি করে দোষীর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা; অধিকন্তু কোনও সন্ন্যাসী পরলোকগত হলে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রে উপযুক্ত বণ্টনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই 'সভা'তে থাকত ছাত্রেরা; এরাই সকল বিষয়ে এমনকি বয়ঃজ্যেষ্ঠদের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী ছিল। অর্থাৎ, স্থবীরদের 'সভা'র ওপরে প্রাধিকার থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কখনই ব্যাহত হত না[১৭]। প্রাধিকার ও গণতন্ত্রের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ই-চিঙ-এর কাছ থেকে আমরা 'কর্মদান' বলে একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের খবর পাই। মানটির আক্ষরিক অর্থ হল 'যিনি কাজ দেন'; কার্যত তাঁর তত্ত্বাবধানে তিন ধরনের কাজ হত— কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব বা কোনও কাজের শুভ সূচনা ঘণ্টা বাজিয়ে হত; ভোজনালয় দেখাশোনা এবং ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহ স্নান উৎসব ইত্যাদি। বুদ্ধমূর্তিকে প্রথমে চন্দন মাখিয়ে তারপর জল দিয়ে পরিষ্কার করে শুদ্ধ কাপড় দিয়ে মুছে সুগন্ধী ফুলসহ মন্দিরে পুনঃস্থাপন করা হত। অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর ও ছন্দোময় করার উদ্দেশ্যে বালিকারা নৃত্য করত। এই হল বুদ্ধ বিগ্রহের স্নান উৎসব। সংঘের বিবিধ বিষয় ঘোষণা এবং প্রবেশদ্বারের তত্ত্বাবধান যিনি

করতেন, তাঁকে বলা হত বিহারপাল[১১]। বিহারপালকে আজকালকার নিরাপত্তারক্ষী মনে করা যেতে পারে। বোঝা যায়, উপরোক্ত দুই আধিকারিকের কাজের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের চলও ছিল। কাজেই নালন্দা মহাবিহারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে প্রাধিকার, গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র— এই তিন ধবনের উপাদান ছিল; তবে গণতন্ত্রের প্রাধান্যই ছিল বেশি।

বহির্বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে নালন্দায় প্রাপ্ত একাধিক মিলে।

নালন্দায় আবিষ্কৃত একাধিক মিলে উৎকীর্ণ বক্তব্য অনুযায়ী সিলগুলিকে মোট ২৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে[১৯]।

১। রাজগৃহে বিষয় আধিকরণস্য;
২। সঙঘ-ন্যায়-প্রতিষ্ঠিত-রাজগৃহ বিষয়স্য;
৩। রাজগৃহ বিষয়ে-পিলিপিঙ্কা ন্যয়স্য;
৪। গয়া বিষয-আধিকরণস্য;
৫। গয়া-বিষয়স্য;
৬। গয়া-আধিষ্ঠানস্য;
৭। শোনান্তরাল-বিষয়ে আধিকরণস্য;
৮। মগধভুক্তৌ কুমারামাত্য-আধিকবণস্য;
৯। শ্রাবস্তিভুক্তৌ-ন্যায়াধিকরণস্য;
১০। নগরভুক্তৌ কুমারামাত্য-আধিকরণস্য;
১১। ধর্মাধিকরণস্য;
১২। শ্রী-শীলাদিত্য-ধর্মাধিকরণস্য;
১৩। দক্ষিণ-মোরো (মতান্তরে গিরৌ) পশ্চিম স্কন্ধে সম্রদান বিষয়স্য;
১৪। ক্রিমিলা-বিষয়ে কাবাল-গ্রামে বিষয়-মহত্তম-নরস্বামিন;
১৫। ক্রিমিলা-বিষয়ে সপ্রধানস্য;
১৬। বল্লাধিহীয়-হউ -মহাজনস্য;
১৭। বল্লাধিহীয়-গ্রামস্য;
১৮। বল্লাধিহীয়-ব্রাহ্মণানাম্;
১৯। বল্লাধিহীয়-অগ্রহারস্য;
২০। বল্লাধিহীয়-রাজ-বৈশ্যানাম্;
২১। শ্রীমন-নব-কর্মঠানাম্-ত্রৈবিদ্যস্য;
২২। বণ্টাগ্রহার-বটক-গ্রাম-অগ্রহার-ত্রৈবিদ্যস্য;
২৩। রাজগৃহে-চাতুর্বৈদ্য।

উপরোক্ত মিলগুলিতে উৎকীর্ণ কথাগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্মণনাম,' 'ত্রৈবিদ্য' (এস.আই. ৮০৬), 'চাতুর্বৈদ্য' (এম-আই. ৮০৬) এবং 'অগ্রসর' (এস.আই. ৮৩০) শব্দগুলি

তাৎপর্যপূর্ণ। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা অগ্রহারী[২০] ব্রাহ্মণগণই নয়, বেদ বিদ্যাবিষয়ক ব্রাহ্মণ কৃত্যকারীগণও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সম্ভবত পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। 'রাজবৈশ্য' (এস.আই. ৬৭৩), 'রাজশ্রেষ্ঠি' কথাটিব সঙ্গে তুলনীয়; যার অর্থ হল, রাজ দরবারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান ধনপতি[২১]। এই ধনপতি সম্ভবত আলোচ্য মহাবিহারের বহির্বিভাগীয় প্রশাসনের আর্থিক দিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা হিসেবে হয়ত। একটি সিলে 'হট্ট-মহাজন' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। এর অর্থ হল, মহাবিহার সংলগ্ন যে বাজার ছিল, (বিষয়টিতে আমরা পরে আসছি।) সেই বাজারের পরিচালনায় ছিল পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিপণন সমিতি[২২]।

অধিকন্তু আমরা ছয় ধরনের প্রশাসনিক কর্মদপ্তরের খবর পাই - (১) অধিকরণ, (২) বিষয়-অধিকরণ, (৩) কুমারামাত্য-অধিকবণে, (৪) নয়-অধিকরণ, (৫) ধর্মাধিকরণ এবং (৬) বিষয়-মহত্তম। 'বিষয়' হল আধুনিককালের জেলা; 'নয়' হল জেলা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক স্তব/বিভাগ; এবং 'অধিকবণ' হল বিচারালয়। কাজেই বোঝা যায় যে, প্রশাসনিক স্তরে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তাব সুষ্ঠু নিষ্পত্তির জন্য প্রথমে নয়াধিকরণ তারপর বিষয়াধিকরণেব তত্ত্বাবধানেব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কখনও কখনও 'বিষয়ে'র একজন প্রধান থাকতেন (স-প্রধান [এস.আই. ৩৪৬, ৮০২], ও বিষয়-মহত্তম [এস.আই ৮২৪])[২৩]।

সম্ভবত, এইসব প্রধানেরাই বিষয়-এর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট অধঃস্তন কর্মীদের সাহায্যে দেখাশোনা করতেন। কাজেই নালন্দা মহাবিহারের বহির্বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বেশ বিস্তৃত ছিল এবং সপ্তম শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটির বিস্তারলাভ ঘটে[২৪] এই প্রশাসনের কয়েকটি দিক লক্ষণীয়— বিদ্যাবিষয়, ধনসম্পদ সংক্রান্ত, বিপণন বিষয় এবং আইনশৃঙ্খলা তথা বিচারবিভাগ সংক্রান্ত। 'বিষয়' বা জেলাস্তরের প্রশাসনে প্রাধিকারী, ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবও লক্ষণীয়— 'স-প্রধান', 'বিষয় মহত্তম'[২৫]। শৃঙ্খলারক্ষা প্রসঙ্গে একটি সিল উল্লেখ্য, সিল নং- এস-৯ আর-১৮ (S-9, R-18); এই সিলে উৎকীর্ণ লেখা থেকে জানা গেছে যে, কোনও একটি গ্রামে (গ্রামটির নামের শেষ ভাগ ...... দিকারি, প্রথম ভাগটি জানা যায়নি) একটি থানা ছিল এবং থানাটির নাম ছিল 'বশিষ্ট'।

'....... দিকারি গ্রামে বশিষ্ট - স্থানস্য'[২৬] । এই থানার কাজ স্বাভাবিকভাবেই ছিল সেই গ্রামে উপদ্রবকারীদের দমন করে সাধারণ মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

(ঘ) আয়সংস্থান —

খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক থেকে আলোচ্য মহাবিহারের বহির্বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বিস্তৃত ও নিবিড় হতে থাকে খুব সম্ভবত এই কারণে যে, মহাবিহারটির সঙ্গে যুক্ত ছিল শতাধিক গ্রাম (সুয়ান সাঙ-এর মতে ১০০, কিন্তু ই-চিঙ-এর মতে ২০০) এবং নিকটস্থ পণ্যদ্রব্যের বাজার। গ্রামবাসীদের চাষাবাদ, পণ্যসামগ্রীর বিপণন ইত্যাদি থেকে

মহাবিহারের আয় সংকুলান হত। বিষয়টি নেড়েচেড়ে দেখা যাক, সুয়ান সাঙ-এর মতে, বিশেষ খ্যাতনামা সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের মহাশালিধানের চালের ভাত খাওয়ানো হত; সুয়ান সাঙকেও এই চালের ভাত খাওয়ানো হত। মহাশালিধান মগধে (আধুনিক দক্ষিণ বিহারস্থ অঞ্চল) উৎপন্ন হত এবং কালো বিনের মত লম্বা দেখতে সুগন্ধী চাল। অধিকন্তু, তাঁকে প্রত্যেকদিন ১২০টি জাম্বিরস নামক ফল, ২০টি সুপারি (এটি একটি পণ্যদ্রব্য), ২০টি জায়ফল, মাসব্যাপী ব্যবহার্য তেল ইত্যাদি[২১]। এছাড়াও, সুয়ান সাঙ-এর মতে, আলোচ্য মহাবিহারে প্রতিদিন ৪৫০ মণ সাধারণ মানের চাল এবং দুধ ও মাখন মিলিয়ে মোট প্রায় ৬০০ মণ পরিমিত দ্রব্য সরবরাহ করা হত[২১]। প্রভাতী খাদ্য হিসেবে সন্ন্যাসীদের বরাদ্দ ছিল ভাত, মাখন, দুধ, ফল বিশেষ করে তরমুজ ইত্যাদি এবং তারপর মধ্যাহ্নকালীন ভোজন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে চাষাবাদ হত বলেই এতসব রকমারি ভোজন সামগ্রী জোটানো সম্ভব হত। অর্থাৎ, কৃষকদের সহযোগিতা ছিল। আরও কয়েকটি পেশাদারি গোষ্ঠী আলোচ্য মহাবিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিল— লৌহকার, কুম্ভকার, ধাতবদ্রব্য (যেমন কালির দোয়াত) প্রস্তুতকারক ইত্যাদি[২১]।

অধীনস্থ গ্রামগুলি থেকে মহাবিহারের রাজস্বপ্রাপ্তিও ঘটত[২১]। গ্রামের সংখ্যা সুয়ান সাঙ-এর মতে ১০০, কিন্তু ই-চিঙ-এর মতে ২০০ ছিল। তবে, এঁরা কেউ-ই শতাধিক গ্রামের নাম উল্লেখ করেননি। নালন্দায় কিছু সংখ্যক সিল পাওয়া গেছে এগুলির ওপরে গ্রামের নাম উল্লেখ করা আছে এবং সেজন্য এদেরকে বলা হয়েছে জনপদসিল। গ্রাম-জনপদগুলির নাম নিম্নরূপ ঃ—

অলিকপৃষ্ঠগ্রাম, অস্ফুটসত্তাগ্রাম, ভল্লাটভটক-অগ্রহার, ভূটিকা, ব্রাহ্মণীগ্রাম, চণ্ডকীরগ্রাম, চিত্রগ্রাম, চুণ্ডীরকাগ্রহার, ধন-গুন, দঙ্গাগ্রাম, দ্বিগ্রা, যণ্ডক্রম, ধনাগুন, জক্কুরকা, জটালবিস, (বর্তমানে এলাহাবাদ জেলায় অবস্থিত), জয়োগ্রাম (সম্ভবত এলাহাবাদ জেলায় অবস্থিত) কালপিনাকগ্রাম, কালীগ্রাম, কাবালগ্রাম, মক্কুয়গ্রাম, মল্লিরসালগ্রাম, সঙনয়িকা, মেষকাগ্রহার, নন্দনগ্রাম, নন্দীবন, নবকা (বর্তমানে বিহার প্রদেশের নওয়াদা অঞ্চল), পাদপাগ্রাম (বর্তমানে রাজগীরের নিকটস্থ পড়পাগ্রাম), পঞ্চমুটিকা পাযুকল্প, প্রক্ষকল্লাক, ক্ষুরিকাগ্রহার, রডিকোট (এলাহাবাদ জেলায় অবস্থিত), শাকবেনুক, সেবথে হলিকগ্রাম, সুচণ্ডাদকীয়, টটাকগ্রাম, তিপাসিকাগ্রহার, উদ্রদ্বারস্থান, উদুম্বরসগ্রাম, উপগোদ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের গোণ্ড জেলা), বৈতালিগ্রাম, বণ্টাগ্র-বাটক-অগ্রহার, বল্লদীহ, বরকীয়, বরাষক, বশিষ্ট, বেরনাবত-অগ্রহার এবং বিচিগ্রাম। উপরোক্ত গ্রামগুলির অধিকাংশেরই আধুনিক পরিচয় জানা যায়নি। তবে, যেহেতু গ্রামগুলি থেকে অদায়ীকৃত রাজস্ব দিয়ে মহাবিহারের ব্যয় নির্বাহ করা হত; অতএব বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এইসব গ্রামগুলির সঙ্গে আলোচ্য মহাবিহারের নিয়মিত প্রশাসনিক যোগাযোগ ছিল[৩১]।

আলোচ্য মহাবিহারের আয় প্রসঙ্গে যশোবর্মাদেবের (খৃঃ ৫৩৩-৩৪) নালন্দা লেখমালার সাক্ষ্য বিবেচ্য। এখানে বলা হয়েছে যে, যশোবর্মাদেবের মন্ত্রী নালন্দা

মহাবিহারের নিকটস্থ দোকান থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী ক্রয় করে উক্ত মহাবিহারে দান করে দেন[৩২]। খুব সম্ভবত, আলোচ্য মহাবিহারের সন্নিকটে পণ্যসামগ্রীর বাজার ছিল। কারণ 'ধর্মহট্ট', 'দেবপালদেবহট্ট' ইত্যাদির হদিস পাওয়া গেছে[৩৩]। নাম থেকে বোঝা যায় এই হট্টগুলি পাল যুগের (খৃ: ৭৫০-১২০০); তবে ই-চিঙের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। মৃত সন্ন্যাসীর জিনিসপত্রের বিতরণ-ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি মহাবিহারের নিকটস্থ দোকানের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক থেকেই এই অঞ্চলে বিপণন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, মৃত সন্ন্যাসীর যদি কোনও অর্থ সংক্রান্ত দলিলপত্র থাকত এবং যদি সেগুলির মেয়াদ পূর্ণ না-হত, তবে সেইগুলিকে মহাবিহারের 'সভা'র জিম্মায় রাখা হত; কিন্তু যদি পূর্ণ হয়ে যেত, তবে সেই দলিলপত্র ভাঙিয়ে টাকা-পয়সা বিতরণ করা হত। তবে, এইসব দলিল পত্র হট্টের সঙ্গে লিখিত চুক্তিপত্রের নমুনা কিনা, সে কথা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কারণ, অন্য কোনরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে ই-চিঙের এই দলিল সংক্রান্ত বক্তব্যকে যাচাই করা যেতে পারে। দলিলপত্রের মাধ্যমে হট্টের সঙ্গে মহাবিহারের সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে[৩৪]। যাই হোক, এইভাবেই মহাবিহারের আয়-ব্যয় চলত।

(ঙ) ধর্মচর্চা —

নালন্দা মহাবিহারে ধর্মচর্চা মূলত ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক । সুয়ান সাঙ ও ই-চিঙ-এর খবর অনুযায়ী— তারা, অবলোকিতেশ্বর, হারিতি, বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের পূজা হত আলোচ্য মহাবিহারে[৩৫]। 'তারা' হলেন স্বর্গীয় মাতা রক্ষাকর্ত্রী; ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভের পুত্র অবলোকিতেশ্বর হলেন হিন্দু বিষ্ণুদেবতার বৌদ্ধ প্রতিরূপ; শিশু রক্ষাকর্ত্রী হলেন মাতৃকা হারিতি; মহাযনী বৌদ্ধধর্মমতে প্রত্যেক বুদ্ধই হলেন জ্ঞানোদীপ্ত বোধিসত্ত্ব[৩৬]। পূজার্চনাই নয়, ই-চিঙ আরও বলেছেন যে, নালন্দা মহাবিহারে সন্ন্যাসীরা মহাযনী বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভূক্ত আরও কিছু ক্রিয়াকাণ্ডও করতেন। যেমন, সন্ন্যাসীদের সমবেত প্রভাতী স্নান; পবিত্র বুদ্ধমূর্তির সুগন্ধযুক্ত জলে স্নান এবং বালিকানৃত্য ও গীত সহযোগে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; এবং চৈত্যাবদানচর্চা। চৈত্যাবদান হল, প্রতিদিন অপরাহ্নে বিশেষ স্তোত্র, শমন্ত্র এবং সূত্র আবৃত্তি করে একটি স্তূপকে তিনবার প্রদক্ষিণ করা। ই-চিঙ বলেছেন যে, নালন্দায় হাজার হাজার সন্ন্যাসীর এক স্থানে জমায়েত করা কঠিন হত বলে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এক প্রকোষ্ঠ থেকে অন্য প্রকোষ্ঠ, এইভাবে চৈত্যাবদানচর্চা চলত; এই কাজে সহযোগিতা করত মহাবিহারের অন্যান্য সাধারণ কর্মী ধূপ ও মালা বহন করে। কিছু কিছু সন্ন্যাসী নিজেরাই এই কাজ করে নিতেন— গন্ধকটি পূজাস্থলের দিকে মুখ করে একাকী বসে বুদ্ধের নাম অন্তরে স্মরণ করতে করতে; অথবা কোনও একটি মন্দিরে কয়েকজন সন্ন্যাসী হাঁটুগেড়ে পাশাপাশি পূজার ভঙ্গিমায় বসেও এই চৈত্যাবদান চর্চা করতেন[৩৭]।

(চ) শিল্পচর্চার কেন্দ্র হিসেবে নালন্দা মহাবিহার—

নালন্দা মহাবিহারে পুঁথি প্রস্তুত করা হত। এখানে তারিখসহ তিনটি পুঁথি পাওয়া গেছে; প্রথম ও তৃতীয়টি হল 'অষ্টসাহস্রিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা' এবং দ্বিতীয়টি হল 'ধারণী' গ্রন্থ। এইসবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভিক্ষুসঙ্ঘ অধ্যুষিত বিহারে লিপি ও চিত্রকর্মের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল[৩১] প্রথম পুঁথিটি প্রথম মহাপালদেবের (৯৭৭-১০২৭ খৃ:) ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে (অর্থাৎ আ: ৯৮৩ খৃ:) লিখিত। তৃতীয়টি রামপালদেবের (আ: ১০৭২-১১২৬ খৃ:) পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে (অর্থাৎ আ: ১০৮৭ সালে) লিখিত এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ধারণী' গ্রন্থ নয়পালদেবের (আ: ১০২৭-৪৩ খৃ:) চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে (অর্থাৎ ১০৪১ সালে) লিখিত। পুঁথি নকল করার কাজ পালযুগের অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য সময়সীমার অনেক পরেকার হলেও, এই কাজ অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে আছে, মাটি খুঁড়ে মাটি ও ধাতু-নির্মিত কালির দোয়াত পাওয়া গেছে[৩২]। ই-চিঙ বলেছেন যে, উন্নতমানের হলুদ, নীল, সবুজ রঙ এবং সিন্দুর মূর্তি রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হত[৩৩]। সম্ভবত, চিত্রাঙ্কনের কাজও আলোচ্য মহাবিহারে হত। চীনা শিল্পী সিঙ য়ুন (সংস্কৃত নাম প্রজ্ঞাদেব) এই মহাবিহারে থাকাকালীন বোধিবৃক্ষ ও মৈত্রেয়বুদ্ধের চিত্র এঁকেছিলেন বলে জানা যায়।

সবশেষে, সুয়ান সাঙ-এর ভাষায় বলা যেতে পারে যে, নালন্দা মহাবিহার বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে অখিল ভারতীয় বিতর্ক মহাসভাস্থল হয়েও, ই-চিঙের ভাষায়, এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যথার্থ জ্ঞানদান ও অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পবিত্র স্থল, যার গৌরবময় স্মৃতি উক্ত চীনা পরিব্রাজকদ্বয়ের লেখায় আজও ভাস্বর হয়ে আছে এবং এর বাস্তবিকসাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ।

সূত্র নির্দেশঃ

(১) ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, **ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস**, কলিকাতা পৃ· ১৫৯।

(২) শাস্ত্রী হীরানন্দ, **নালন্দা অ্যাণ্ড ইটস্ এপিগ্রাফিক মেটিরিয়াল (না.এ.মে)**, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ: ২০, তুলনীয় মিত্র দেবলা, **বুদ্ধিস্ট মনুমেন্টস** পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৮০ পৃ: ৮৫।

(৩) ওয়াটার্স টমাস, **অন উয়ান চুয়াঙস্ ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া (উ.ট্রা.ই)**, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, দিল্লি, ১৯৬১, পৃ: ১৬৪; তুলনীয় শাস্ত্রী হীরানন্দ, **নালন্দা অ্যাণ্ড ইটস্ এপিগ্রাফিক মেটিরিয়াল (না.এ.মে)**, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ: ৪, ১৪-১৫।

(৪) সরকার দীনেশচন্দ্র ডঃ, **পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত (পা.পূ.ব)**, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ১০৭।

৪ (ক) সাঙ্কালিয়া এইচ.ডি, **দ্য ইউনিভার্সিটি অব নালন্দা, (ইউ.না)**, দিল্লি, ১৯৭২, পৃ: ২৯-৩০, ৩১-৩২।

৪ (খ) সাঙ্কালিয়া এইচ.ডি. **তদেব**, পৃ: ৩১-৩২।

(৫) দত্ত সুকুমার, **বুদ্ধিস্ট মঙ্কস অ্যাণ্ড মনাস্টারিস অব ইণ্ডিয়া (বু.ম.ম.ই)**, নতুন দিল্লি, ১৯৬০, পৃ· ৩২৯-৩১।

৫।ক) সাঙ্কালিয়া এইচ.ডি, **ইউ.না**, পৃ: ৩৮।

(৬) দত্ত সুকুমার, **তদেব**, পৃ: ৩৪০-৪১:
বিল সামুয়েল, **দ্য লাইফ অব হিয়েন সাঙ্ (লাইফ)** প্রথম ভারতীয় সংস্করণ দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ. ১১১ ১২।

(৭) মুখার্জী রাধাকুমুদ, **এনশেন্ট ইন্ডিয়ান এডুকেশন (এ.ই.এ)**, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৮৯, পৃ: ৫৬৪।

(৮) ওয়াটার্স টমাস, **অন উয়ান্ চুয়াঙস ট্রাভেল্স ইন ইন্ডিয়া** (উ.ট্রা.ই), দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, দিল্লি, ১৯৬১, পৃ: ১৬৫।

(৯) চিকিৎসাবিদ্যা যে শেখানো হত, তার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। ১নং সংঘারামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অপর একটি যে বিহার (নং আই.এ) আবিষ্কৃত হয়েছে, তার আঙিনায় সমান্তরালভাবে অনেকগুলি উনুনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। হীরানন্দ শাস্ত্রীর মতে, সম্ভবত এখানে ঔষধপত্র তৈরি করা হত এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগীয় দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত ('ভিক্ষুকশালা'), শাস্ত্রী হীরানন্দ, **না.এ.মে**, পৃ· ২৩।

(১০) বিল সামুয়েল, **সি.ইউ.কি** খণ্ড ১, বুক ২, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিল্লি, ১৯৮৩, পৃ: ৭৮; তুলনীয়, জিস্ক্ কিনিথজি **অ্যাসেটিসিজম্ অ্যান্ড হিলিং ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া** (এ এইচ এ আই), দিল্লি, ১৯৯১, পৃ· ৪৭।

১০।ক) বিল সামুয়েল, **লাইফ**, পৃ· ১২১।

(১১) মুখার্জী আর.কে, **এ.ই.এ**, পৃ: ৫৬৪-৬৬:
তুলনীয়, বিল সামুয়েল, **লাইফ**, পৃ: ১২১।

(১২) লিবার্ট গোস্টা, **আইকোনোগ্রাফিক ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ানস্** দ্বিতীয় সংস্করণ, দিল্লি ১৯৮৬, পৃ: ২২৫।

১২।ক) মুখার্জি আর.কে, **এ.ই.এ**, পৃ: ৫৭৪।

(১৩) ওয়াটার্স টমাস, **উ.ট্রা.ই**, পৃ: ১৬৫।

(১৪) বিল সামুয়েল, **লাইফ**, পৃ: ১৬০-৬১।

(১৫) মুখার্জি আর.কে, **এ.ই.এ** পৃ: ৫৬৪-৬৫; তুলনীয়, ওয়াটার্স টমাস, **উ.ট্রা.ই**, পৃ: ১৬৫।

(১৬) মুখার্জি আর.কে, **এ.ই.এ**, পৃ: ৫৭৯-৮০।

(১৭) মুখার্জি আর.কে, **তদেব**, পৃ: ৫৭০।

(১৮) তাকাকুসু, জে, **এ রেকর্ড অব দ্য বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়ান অ্যাজ প্র্যাকটিসড্ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য মলয় আরকিপিলাগো** (রে.বু.রি.ই.এম.এ/ই-চিঙ) দিল্লি, ১৯৬৬, পৃ: ১৪৭-৪৯; পাদটিকা নং- ১, দ্রষ্টব্য (পৃ: ১৪৮)।

(১৯) শাস্ত্রী হীরানন্দ, **না.এ.মে**, পৃ: ৩৩-৩৪।

(২০) 'অগ্রহার' হল ধর্মস্থান বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূ-সম্পদ দান। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে অবশ্য পাঠ্য চক্রবর্তী রণবীর, **প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে**, কলিকাতা, ১৩৯৮, সপ্তম অধ্যায়, পৃ: ১৫৪-৭৮।

(২১) সরকার ডি.সি. **ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফিক্যাল গ্লোসারি (ই.এ.গ্লো)**, প্রথম সংস্করণ, দিল্লি, ১৯৬৬, পৃ: ২৭৩।

(২২) সরকার ডি.সি, **তদেব**, পৃ: ২৩৩; তুলনীয় শাস্ত্রী হীরানন্দ, **না.এ.মে.** পৃ: ৩৪।

(২৩) শাস্ত্রী হীরানন্দ, **না.এ.মে.** পৃ: ৩৫; তুলনীয় সরকার ডি. সি, **ই.এ.গ্নো.** পৃ:২৩৩।

(২৪) শাস্ত্রী হীরানন্দ, **তদেব**, পৃ: ৩৪।

(২৫) সরকার ডি.সি. **ই.এ.গ্নো.** পৃ: ১৯০, ২৫৪।

(২৬) শাস্ত্রী হীরানন্দ, **না.এ.মে.** পৃ: ৫৪।

(২৭) বিল সামুয়েল, **লা.হি.** পৃ: ১০৯, ১১২-১৩।

(২৮) মজুমদার আর. সি এবং দাশগুপ্ত কে. কে (সম্পাদক) **এ কম্প্রিহেনসিভ (ক.হি.ই) হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া**, দিল্লি, ১৯৮১, খণ্ড ৩, অংশ ১, পৃ: ২৭৪।

(২৯) ঘোষ.এ. **এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইন্ডিয়ান আরকেওলজি (এ.ই.আ)** খণ্ড ২, দিল্লি, ১৯৮৯, পৃ: ৩০৬।

(৩০) মজুমদার আর. সি. এবং দাশগুপ্ত কে. কে. (সম্পাঃ), **ক.হি.ই.** পৃ: ২৭৩।

(৩১) গুপ্ত পরমানন্দ, **জিওগ্রাফি ফ্রম এনশেন্ট ইন্ডিয়ান কয়েনস অ্যান্ড মিলস (জি.এ.ই.ক.সি)**, দিল্লি, ১৯৮৯, পৃ: ১৯৬-২০৭; তুলনীয় শাস্ত্রী হীরানন্দ, **না.এ.মে.** পৃ: ৪৫ থেকে।

(৩২) শাস্ত্রী হীরানন্দ (সম্পাঃ), 'নালন্দা স্টোন ইন্‌সক্রিপশনস্ অব দ্য রেন অব্ যশোবর্মাদেব' **এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা (এ.ই)**, খণ্ড ২০, নং- ২, শ্লোক নং- ১০, লাইন নং- ১৪, পৃ: ৪৪, ৪৬।

(৩৩) মুখার্জি বি.এন, 'কমার্স অ্যান্ড মানি ইন দ্য ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড সেন্ট্রাল সেকটর্স অব্ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' (আ: ৭৫০ খৃ. — ১২০০ খৃ:) **ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন (ই.সি.বু)**, ১৯৮২, পৃ: ৬৭, বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য পৃ: ৭৭, পাদটিকা নং- ৩৮।

(৩৪) তাকাকুসু, জে, **এ রেকর্ড অব্ দ্য বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়ান অ্যজ প্র্যাকটিসড ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য মলয়, আর্কিপেলাগো** (খৃ: ৬৭১ — '৯৫ খৃ:) **(ই-চিঙ)**, দিল্লি, ১৯৬৬, পৃ: ১৯০।

(৩৫) মুখার্জি আর. কে, **এ.ই.এ**, পৃ: ৫৮২।

(৩৬) লিবার্ট গোস্টা, **আইকোনোগ্রাফিক ডিকশ্যনারি অব্ দ্য ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ানস্ (আই.ডি.ই.রি)**, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ: ২৯৫ ২৯, ১০২, ৪৪।

(৩৭) তাকাকুস, জে, **ই-চিঙ**, পৃ: ১৫২-৫৫, তুলনীয় মুখার্জি আর. কে, **এ.ই.এ**, পৃ: ৫৮২-৮৩।

(৩৮) সরস্বতী সরসীকুমার, **পালযুগের চিত্রকলা**, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ: ৩৭, চিত্র নং- ১; পৃ: ৪০, চিত্র নং- ৬, পৃ: ৪৩, চিত্র নং- ১০ এবং পৃ: ৯৪।

(৩৯) ঘোষ অমলানন্দ, **এ.ই.আ**, পৃ: ৩০৬।

(৪০) তাকাকুসু জে, **ই-চিঙ**, পৃ: ১৯১।

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ও সংস্কৃতির উৎসে চণ্ডালগোষ্ঠীর অবদান

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায় অগণিত আদিম অধিবাসী ও বহুভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর শারীরবৃত্তের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এই বহুবিধ নরগোষ্ঠীর বিচিত্র সংস্কৃতির আদানপ্রদান ও মিলনের সমন্বিত রূপই বঙ্গসংস্কৃতি বা বাঙালির সংস্কৃতি। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতির উৎস সন্ধানের বিরাট পরিমণ্ডলে এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র 'চণ্ডালগোষ্ঠী'। ফিক (Fick) যথার্থই এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, চণ্ডালগোষ্ঠী সুপ্রাচীন আদিম অনার্য উপজাতি গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম[১]। এরা ব্রাহ্মণ্য জাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়রূপে একেবারে নিম্নস্তরে স্থান পেয়েছিল। চণ্ডালগোষ্ঠীর সমাজে নিম্নস্তরে অবস্থান, বসতি, জীবনচর্চা, জীবিকা, দেহের গঠন, আকৃতি, গায়ের রং, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তকের গড়ন, স্বভাব-চরিত্র, দোষ-গুণ, ধর্ম-কর্ম, শিল্পকলা ইত্যাদির বিবৃতি পাওয়া যায় যজুর্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, উপনিষদ্, জাতক, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র, রাজতরঙ্গিণী, বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মনুসংহিতা, বাংলার প্রাচীনতম প্রমাণ্যগ্রন্থ চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে ও বিদেশী লেখক ও ভ্রমণকারী টলেমি, ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবৃতিতে[২]। পাল-সেনযুগের লেখমালা থেকেও বাঙালি জাতিগঠনে ও সংস্কৃতি রূপায়ণে চণ্ডালগোষ্ঠীর অবদানের সন্ধান পাওয়া যায়।

চণ্ডালগণ চাঁড়াল, চাঙ, ডোম, ডোম্ব, স্বপাচ, স্বপাক, নমশূদ্র, নম ও নিষাদ ইত্যাদি নামে সাধারণ্যে পরিচিত[৩]। 'চণ্ডাল' শব্দ চণ্ড + অল্ (চণ্ড + আলন) থেকে উদ্ভূত[৪]। চণ্ডাল শব্দের অর্থ অত্যন্ত ক্রোধ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। 'কণ্ডাল' শব্দের পরিমার্জিত রূপ 'চণ্ডাল'। টলেমি 'কন্দলি' (Kandali, Kandaloi) নামে উপজাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। এই কন্দলি সম্ভবত 'গণ্ডলি' যাদের একীকরণ করা হয়েছে 'গন্দ' বা 'গণ্ডলি' নামে মহারাষ্ট্রের এক উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে[৫]।

চণ্ডালদের জাতি/বর্ণ ভিত্তিক উৎপত্তি সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তারা অসবর্ণ যৌন মিলনের সন্তান[৬]। প্রতিলোম যৌন মিলনের ফলে অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পুরুষ ও 'উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গম বা বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে চণ্ডাল

নামে পরিচয় লাভ করে ও ব্রাহ্মণ সমাজ ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে স্থান পায়। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে, শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সঙ্গমে চণ্ডালের জন্ম[৭]। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে[৮]। সগোত্র সঙ্গমের সন্তানও 'চণ্ডাল' বলে অভিহিত[৯]। অর্থশাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে, শূদ্র পুরুষ ও উচ্চবর্ণের স্ত্রীর সঙ্গমে যে সন্তান জন্মায় তাকে আয়োগব (Ayogava) 'ক্ষত্ত' (Kshatta) ও চণ্ডালগোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে[১০]। বেদব্যাসস্মৃতি (১.৯.১০) ও শাস্ত্রকারেরা ঐ একইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন[১১]। চণ্ডালদের জন্ম ও পরিচয়ের এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের। প্রতিলোম বিবাহের ফলে ও ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করলে তাদের সন্তান চণ্ডাল নামে অভিহিত ও সমাজে তাদের সর্বনিম্নে স্থান দিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজব্যবস্থায় গ্রহণ করেছে।

তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে। এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে, কতকগুলি তাম্রশাসনে চণ্ডালগোষ্ঠীকে অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই তাম্রশাসনগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়— যে কোনও রাজকীয় ভূমিদানের বিজ্ঞপ্তি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে জানানো হ'ত। একটি উক্তি প্রায় সব তাম্রশাসনেই পাওয়া যায়— তা হ'ল- 'চণ্ডালপর্যন্তান্'[১২]। দেবপালের মুঙ্গের লেখতে, নারায়ণপালের ভাগলপুর লেখতে নিম্নস্তরের অগণিত লোকদের একসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্" অথবা 'আচণ্ডালান্' অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত[১৩]। মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল, চণ্ডাল ছাড়াও পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি আদিম নরগোষ্ঠীর উল্লেখও পাওয়া যায়।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে ডোম/ডোম্বীরা (যাদের চণ্ডালদের সঙ্গে একীকরণ করা হয়েছে) বিশদভাবে বর্ণিত। শহর, নগর বা গ্রামের বসতির সীমানার বাইরে ছিল ডোম, চণ্ডালদের বসবাস[১৪]। ঃ— নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িয়া (কুঁড়ে ঘর)/তান্তি (তাঁত) বিকণঅ ডোম্বি অরবনা চ্যাংগেডা (বাঁশের চাঙাড়ি)[১৫] এই চর্যাগীতি থেকে পরিস্ফুট হয় যে, ডোমেরা গ্রাম ও নগরের বাহিরে কুঁড়ে বেঁধে বাস করত ও বাঁশের তাঁত, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করত। চর্যাপদেই প্রতিফলিত হয়েছে পাহাড়ের ওপরে ডোম্বীর কুঁড়ে ঘরে আগুন লেগেছে, আগুন নেভাবার জন্য ও আগুনের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে যাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য জল সিঞ্চন করা হচ্ছে।

জাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি/সসহর লৈ সিঞ্চহুঁ পাণী[১৬]।

বঙ্গের লেখমালা বিশেষ করে পালযুগের যথা দেবপালের মুঙ্গের, নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর, প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়, মদনপালদেবের মনোহলি তাম্রপত্রে 'চণ্ডালপর্যন্ত্যম্', 'পুরোগমোদন্ধতো' প্রভৃতি সম্বোধন ও উক্তি থেকে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের জনগণ শহর ও গ্রামের সীমানার ভিতরে আর অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য চণ্ডালগণ নগর বাহিরে বসতি স্থাপন করত[১৭]। ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবৃতিতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। মুঙ্গের তাম্রশাসনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য[১৮]। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যে বলা হয়েছে, উচ্চবর্ণের লোকেদের চণ্ডালকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। স্পর্শ করলে তাকে স্নান করে পবিত্র হতে হবে[১৯]। আপস্তম্বে এমনও

উল্লিখিত আছে যে, চণ্ডালের সঙ্গে কথা বলা বা দৃষ্টিপাত করাও পাপ[২০]। অর্থশাস্ত্রেও আপস্তম্ভের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। একথাও বলা হয়েছে, চণ্ডালগণ যে পুষ্করিণী বা জলাধার থেকে জল সংগ্রহ করে অন্য কোনও বর্ণের লোক তা ব্যবহার করবে না[২১]। কলহনের রাজতরঙ্গিণীতে চণ্ডালগণ অস্পৃশ্যগোষ্ঠী, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ বলে বর্ণিত[২২]।

চণ্ডালগোষ্ঠীর বৃত্তিও ঘৃণ্য বলে চিহ্নিত ছিল। প্রাচীন লিখিত উপাদান থেকে জানা যায় যে, তারা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেত ও দাহ করত। বৌদ্ধগ্রন্থে চণ্ডালগণ শববহনকারী রূপে বর্ণিত[২৩]। এখন ডোমেরাই একাজ করে থাকে। মনুসংহিতা থেকে জানা যায় মৃতের জামা কাপড়, গহনা ইত্যাদি চণ্ডালগণ বা ডোমেরাই ব্যবহার করত। (বাসাংসি মৃতছেলানি)[২৪] তারা কালো লোহার ও সীসার গহনা পরত[২৫]। গলায় চামড়ার গলাবন্ধের মত ঝোলানো থাকত। জাতকে তাদের পোশাকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তারা লাল কাপড়ের ওপর নোংরা একটা আচ্ছাদন পরত[২৬]। তারা লাল ফুলের মালা পরতে ভালবাসত[২৭]। তাদের হাতে থাকত মাটির পাত্র[২৮]। এরকমভাবেই তারা বিচরণ করত। তারা বনে জঙ্গলে যা আহরণ করত, শিকার করত তাই ভক্ষণ করত। মনু বলছেন, তাদের ভাঙা পাত্রে খাবার দেওয়া হত। কাক বা কুকুরকে যে ভাবে অবহেলায় উচ্ছিষ্ট খাবাব ছুঁড়ে দেওয়া হত, চণ্ডালকেও সেভাবেই দেওয়া হ'ত[২৯]। শবদাহ করা ছাড়াও তারা জল্লাদের কাজ করত অর্থাৎ যাদের ফাঁসি দেওয়া হত তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া ও ফাঁসির দড়ি টেনে বধ করার কাজ তাদেরকেই করতে হত[৩০]। বিষ্ণু ও অর্থশাস্ত্রতে এরকম নানা বৃত্তির উল্লেখ আছে[৩১]। এতদ্ব্যতীত গান গেয়ে, তাঁত বুনে, বাঁশের কাজ করে, নৌকা তৈরি করে, শিকার করে, কম্বল, মাদুর এসব তৈরি করে জীবিকা অর্জন করত। তাবা পুরনো জিনিস সারাই করায় পারদর্শী ছিল[৩২]।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চণ্ডালগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ ও চতুর্বর্ণের উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের কাছে ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, জনগোষ্ঠী। অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, ইন্দো-আর্য, অ্যালপিনয়েড নরগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মিলনেই বাঙালির সংস্কৃতি। অমরকোষে চণ্ডালগণ নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, পুক্কস প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠীর সমগোত্রীয় বলে বর্ণিত হয়েছে[৩৩]। নিষাদ, শবর গোষ্ঠীর সঙ্গে চণ্ডালদের জীবনযাত্রা প্রণালীর সম্পূর্ণ মিল আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অবিভক্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ডোম, হাড়ি, পোদ, নমশূদ্রকে চণ্ডালগোষ্ঠীর বংশধর বলে অভিহিত করেছেন। আবার হাবার্ট রিজলি বলেছেন, পোদ, ভুঁইমালি, করাল, কোটওয়াল, নুমিয়ান, বেরুয়া সম্প্রদায় নমশূদ্রের নানা শাখাপ্রশাখা[৩৪]। নমশূদ্র নাম কোনও ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না। চণ্ডালরাই এই নামকরণ করেছে।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে চণ্ডালগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। রামায়ণ থেকে জানা যায়, তাদের গায়ের রং নীল, এলোমেলো চুল, গলায় শ্মশানের মালা, গায়ে ছাই মাখা, লোহার গহনা পরা (নীল বস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ চিত্যমাল্যাংগরা গশ্চ আয়সাভরণো ভবৎ)[৩৫] ওয়াইজ (Wise) সাহেব বলেছেন যে, চণ্ডালদের গায়ের রং কালো ও বাদামি, দেখতে ছোটখাট, স্বাস্থ্যবান

চেহারা, বুকের ছাতি বেশ চওড়া। কেউ কেউ আবার কালো হলেও দেখতে বেশ সুন্দর, মনোমুগ্ধকর, চক্‌চকে চোখ. মুখমণ্ডল বেশ হাসিখুশি[৩৬]। মস্তিষ্কের গড়ন ও মাপ সম্বন্ধে হাবার্ট বিজলি বলেছেন যে, চণ্ডালগোষ্ঠীর মস্তক ছিল প্রশস্তকরোটিযুক্ত[৩৭] (brachycephaly) কিন্তু রিজলিব নৃতাত্ত্বিক তথ্যের বিচারে এটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নমশূদ্রগণের মস্তক বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের চাইতেও লম্বাকরোটিযুক্ত (dolichocephaly)[৩৮]। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, নমশূদ্রগণ কি চণ্ডালদের বংশধর? কিংবা বিবিধ নরগোষ্ঠীব সংমিশ্রণের ফলে মস্তকের গড়নে প্রশস্ত ও লম্বা উভয় করোটি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া নমশূদ্রেরা ফর্সা ও লম্বকর্ণযুক্ত (leptorrhine) দেখা যায়[৩৯]। চণ্ডালদের মধ্যেও গায়ের রং ফর্সা, লম্বা ও বেশ সুস্বাস্থ্যের লোকজন দেখা যায়।

আবার ডোম ও চণ্ডালগণ সমগোত্রীয়। সেক্ষেত্রে তাদের শারীরিক গঠন প্রণালীও একইরকম হওয়া উচিত। বঙ্গ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলেব ডোমদের মধ্যে চেহারায় ও গায়ের রঙের মিলও লক্ষ করা যায়। বিম্ (Beames), শেরিং (Sherring) এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন[৪০]। পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) ডোমদের লম্বা লম্বা কালো, খস্‌খসে চুল, গায়ের রং নীলচে কালো অপেক্ষা বাদামি বং লক্ষ করা যায়। রিজলি সাহেব তাদের এক কথায় অনার্যগোষ্ঠীর বংশধর বলে মনে করেন[৪১]। হাড়ি ডোমদের একটি শাখা। আবার কখনো কখনো ডোমদেরই হাড়ি বলা হয়। নমশূদ্রদের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তদের গায়ের রং ফর্সা বা বাদামি, তারা লম্বাকরোটিযুক্ত ও লম্বকর্ণ সমন্বিত গোষ্ঠী। তাছাড়া তারা মাঝারি থেকে লম্বা আকৃতির, শক্তপোক্ত স্বাস্থ্যবান, ঢেউ খেলানো চুল সমন্বিত মধ্যম নাসিকাযুক্ত (Mesorrhine) সম্প্রদায়[৪২]। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ডোম, নমশূদ্র. এমনকি চণ্ডালগোষ্ঠীব লোকদের মধ্যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে।

চণ্ডালগোষ্ঠী মূলত সুপ্রাচীন আদিবাসী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। বিভারলে (Beverlev) চণ্ডালদের রাজমহল পাহাড়েব মালদের সঙ্গে একীকরণ করেছেন[৪৩]। মালরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীভুক্ত ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী। সেক্ষেত্রে চণ্ডালগণ দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীভুক্ত। এই শনাক্তকরণ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেননি। তবে, কালক্রমে অস্ট্রোএশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছিল। ক্রমশ এই মিশ্র নরগোষ্ঠীর ওপর আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর যৌনমিলন ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে এদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে একই রক্তস্রোত ও এক নরগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় না। চণ্ডালগোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ সংমিশ্রণ হয়েছিল। বাঙালি জাতির মধ্যে চণ্ডাল তথা বহুবিধ উপজাতিগোষ্ঠীর ধমনীর রক্তধারা প্রবহমান।

বঙ্গ সংস্কৃতিতেও চণ্ডালদের কিছু অবদান আছে। ডোমেরা বাঁশের তৈরি নানারকমের তাঁত, বাক্স, পেটিকা, চাঙাড়ি, ঝুড়ি, মাদুর, কম্বল ইত্যাদি তৈরি করে ও ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। চর্যাপদে এদের বাঁশের তৈরি কাজের শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়[৪৪]। এছাড়া তারা নৌকা তৈরি করে ও নদী

পারাপারের কাজ করে বেশ উপার্জন করত[৪৫]। এ প্রসঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত গুহক চণ্ডালের নাম উল্লেখনীয়। নমশূদ্রগণ কৃষিকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য, কাঠের কাজ, দোকানদারি ইত্যাদি কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। নৃত্যগীতে চণ্ডালগোষ্ঠী বিশেষ পারদর্শী ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে[৪৬] ও চর্যাপদে চণ্ডালগোষ্ঠীর আকর্ষণীয় নৃত্যগীতের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মের চৌষট্টি পাপ্‌ড়ির কেন্দ্রে তাদের অপূর্ব নৃত্যকলার বর্ণনা পাওয়া যায়[৪৭]। অর্থাৎ মনে হয় নৃত্যকলার বহুবিধ শাখা তারা আয়ত্ত করেছিল। আদিম উপজাতির গোষ্ঠীর মতো তারাও নৃত্যগীতে উচ্চবর্ণের লোকদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করত। স্বভাবে তারা ছিল অস্থির ও অশান্ত। তারা আদিম উপজাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় রীতিনীতি, সংস্কার ও পূজার্চনায় বিশ্বাস করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা বাস্তুপূজা, নদীর দেবতা বনশূর, সর্পপূজা বা মনসাপূজা, নৌকা পূজা ইত্যাদি পালন করত[৪৮]। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিল।

চণ্ডালগোষ্ঠীর শিল্প-কলা, নৃত্যগীত নৈপুণ্যের আলেখ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় চণ্ডালগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বহুলাংশই অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি। নৌকা তৈরি, বাঁশের কাজ, মাদুর তৈরি, নৃত্যগীতে নৈপুণ্য, লোহার গহনা পরা এ সবই বঙ্গ সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের অবদান। বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ও সংস্কৃতির উৎসে চণ্ডালগোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য।

সূত্র নির্দেশঃ

১। ফিক, আর (ইংরাজি অনুবাদক এস কে মৈত্র) দি সোস্যাল অরগ্যানিজেশনস্ ইন্ নর্থ-ইস্ট ইণ্ডিয়া ইন বুদ্ধজ টাইম, পৃ ২০৫ (কলিকাতা ১৯১০)।

২। বাজসনেয়ী সংহিতা, ৩০, কানে, পি. ভি, হিস্ট্রি অব দি ধর্মশাস্ত্র, ভল্যুম টু, পার্ট ওয়ান পৃ· ৪৪-৪৫, ৮১ ৮২ (পুণা, ১৯৩০-৫৩); ওয়াটার্স, টি (অনুবাদক), অন ইউয়ান চোয়াংস ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম ওয়ান, পৃ· ১৬৮-১৭০, ১৪৭-৪৮, (দিল্লি, ১৯৬১); লেগে, জে. এ. ফাহিয়েনস্ রেকর্ড অব দি বুধিষ্ট কিংডম, পৃঃ ৪৩, (অক্সফোর্ড ১৮৮৬), উইলসন, ইণ্ডিয়ান কাস্ট, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৫৭; ওপার্ট, জি, দি ওরিজিন্যাল ইনহ্যাবিট্যাণ্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৫৬ (দিল্লি, ১৯৭১); টলেমি, জিওগ্রাফি, ৭,১,৬৬; শামশাস্ত্রী, আর, (অনুবাদক), কৌটিল্যাম্ অর্থশাস্ত্র (৮ম সংস্করণ) বুক তৃতীয়, চ্যাপ্টার ৭, পৃঃ ১৯০

৩। বৃহৎসংহিতা, ১৪, ২৫।

৪। দাশগুপ্ত শশিভূষণ ও ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৯); দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৭৪২ (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৯) ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১০,৭,৪; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩,৪,১৭।

৫। টলেমি, পূর্বোক্ত, ৭,১,৬৬; উইলসন, ইন্ডিয়ান কাস্ট, পূর্বোক্ত; পৃঃ ৫৭; ম্যাকডোনাল্ড অ্যাণ্ড কিথ, বেদিক ইনডেক্স অব নেমস্ অ্যাণ্ড সাবজেক্টস্, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ২৫৩; মজুমদার রমেশচন্দ্র, দি ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্টস্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৮২ (কলিকাতা, ১৯৬০)।

৬। শামশাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০; কানে, পূর্বোক্ত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডনম্ ইত্যাদি।

৭। বিদ্যাভূষণ, শ্যামাকান্ত, মনুসংহিতা (বাংলা) দশম অধ্যায়, ১২, পৃঃ ২৯৩ (কলিকাতা)।

৮। তর্করত্ন পঞ্চানন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, চ্যাপ্টার দশ, পৃ: ২৮-৩৩ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৩০ শকাব্দ)।

৯। মিত্র অশোককুমার, দি ট্রাইব্স্ এ্যাণ্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল (সেন্সাস ১৯৫১) পৃ: ৫২, (কলিকাতা, ১৯৫৩)।

১০। শ্যামশাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯০।

১১। ওপার্ট, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২, কানে, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃষ্ঠা ৮১।

১২। মাইতি শচীন্দ্রকুমার ও মুখার্জি রমারঞ্জন, করপাস্ অব বেঙ্গল ইন্সক্রিপসন্স বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন্স্ অব বেঙ্গল, পৃ: ২০২, ২১৫ (কলিকাতা, ১৯৬৭)।

১৩। তদেব।

১৪। তর্করত্ন পঞ্চানন, মহাভারত, ভল্যুম টু, অনুশাসনপর্ব (ত্রয়োদশ) ৪৮, ১১, পৃ: ১৯১৫ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৩০ শকাব্দ) জাতক, চতুর্থ, ৩৭৬, ৩৯০, ষষ্ঠ, ১৫৬, ৪, ২০০ (চণ্ডালগাম), ৪, ৩৭৬, ৩৯০ (চণ্ডালবাটকম্, ৬, ১৫৬); বিষ্ণু, ১৬, ১৪: বোস, অতীন্দ্রনাথ, সোস্যাল অ্যাণ্ড রুরাল ইকনমি অব নর্দান ইণ্ডিয়া, পৃ: ৪৪১ (কলিকাতা, ১৯৪২-৪৫)।

১৫। চর্যা ১০, দে সত্যব্রত, চর্যাগীতি পরিচয়, পৃ: ১১৪।

১৬। দাশগুপ্ত শশিভূষণ, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি পৃ: ১২০, (কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।

১৭। মাইতি ও মুখার্জি, পূর্বোক্ত।

১৮। তদেব, পৃ: ১১৯, ১৩১।

১৯। শ্যামাকান্ত, মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ২৩৯, পৃ: ৮৫, পঞ্চম অধ্যায়, ৮৫ গরুড় ধর্মশাস্ত্র, ১৪, ৩০; যাজ্ঞবল্ক্য, ৩, ৩০, আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র, ২, ১, ২, ৮; ইত্যাদি। বোস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪১।

২০। তদেব।

২১। শামশাস্ত্রী, পূর্বোক্ত বুক ওয়ান, চতুর্দশ অধ্যায় পৃ: ২৫; বসাক রাধাগোবিন্দ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ১৮ (কলিকাতা, ১৯৬৪)।

২২। স্টেন অউরেল (অনুবাদক), রাজতরঙ্গিণী অব কলহন, ৫, ৩৫৪: ৬, ১৮২: ৬, ১৯২ (লন্ডন, ১৯০০), কানে, পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, পার্ট ওয়ান, চ্যাপ্টার টু, পৃ: ৮২।

২৩। মৈত্র, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২১।

২৪। বোস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৯।

২৫। শ্যামাকান্ত, মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক ৫১, পূর্বোক্ত।

২৬। কানে, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২, বোস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৭।

২৭। জাতক, তৃতীয়, ৩০।

২৮। মাতঙ্গ জাতক, চতুর্থ ৩৭৯ (মত্তিকাপত্তং আদায়) বোস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৭।

২৯। মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক ৫২ ....; তৃতীয় অধ্যায়, ৯২, বোস, পূর্বোক্ত পৃ: ৪৪৩।

৩০। বিষ্ণুপুরাণ, ষোড়শ, ১১; শামশাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, বুক থ্রি, চ্যাপ্টার তিন, পৃ: ১৭৯; বসাক, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ২৪৩; তর্করত্ন পঞ্চানন, মহাভারত, ভল্যুম টু, অনুশাসনপর্ব, চ্যাপ্টার ৪৮, ১১, পৃ: ১৯১৫।

৩১। তদেব, মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক ৫১; শামশাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, বুক নবম্, চ্যাপ্টার টু, পৃ: ৩৭৬: মহাভারত, পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, শান্তিপর্ব, পৃ: ১৫০৭-০৯; বোস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৯।

৩২। জাতক, চতুর্থ, ২০০; পঞ্চম, ৪২৯; মনুসংহিতা, দশম, ৩৮; বোস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৯-৪০; চর্যা ১০ (কাহ্নপাদ), দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯।

৩৩। অমরকোষ, ২, শূদ্রবর্গ (১০), ২০-২১, ওপার্ট, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৩৪। রিজলি হাবার্ট. দি ট্রাইব্‌স্‌ অ্যাণ্ড কাস্টস্‌ অব বেঙ্গল. ভল্যুম ওয়ান, পৃ. ১৮৪, (কলিকাতা, ১৯৮১)।

৩৫। বসু রাজশেখর, রামায়ণ, সর্গ ৫৭-৬০, পৃ: ৪২-৪৪ (কলিকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ)।

৩৬। রিজলি পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯।

৩৭। রিজলি, দি পিপল্‌ অব ইণ্ডিয়া, পৃ· ২৭ (কলিকাতা, ১৯০৮, লন্ডন, ১৯১৫)

৩৮। তদেব, পৃ· ৪০১।

৩৯। হাটন, জে এইচ, কাস্ট ইন্‌ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩১ (কেমব্রিজ, ১৯৪৬)।

৪০। এলিয়ট, মেময়ার্স অব দি রেসেস্‌ অব দি নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস্‌ অব ইণ্ডিয়া, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ৮৫; রিজলি, টি সি বি, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ২৪০-৪১, শেরিং, হিন্দু ট্রাইব্‌স্‌ অ্যাণ্ড কাস্ট্‌স অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেড ইন বেনারস, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ৪০১ (কলিকাতা, ১৮৭২)।

৪১। রিজলি, টি সি বি, ভল্যুম ওয়ান, পৃ. ২৪১।

৪২। হাটন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১।

৪৩। রিজলি, পূর্বোক্ত, (টি সি বি), ভল্যুম ওয়ান, পৃ· ১৮৫।

৪৪। চর্যা ১০ (কাহ্নুপাদ); দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২১।

৪৫। চর্যা, ১৪ (শান্তিপাদ); দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২১।

৪৬। তদেব; স্টেন, রাজতরঙ্গিণী, ৫, ৩৫৪; ৬, ১৮২. ১৯২, কানে, পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, পার্ট ওয়ান, চ্যাপ্টার টু, পৃ: ৮২।

৪৭। চর্যা, ১০ (কাহ্নুপাদ); দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯-২০ (এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী। তহিঁ চড়ি নাচ অ ডোম্বী বাপুড়ী।।)

৪৮। রিজলি (টি সি বি) পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ১৮৭-৮৮।

প্রাচীন বঙ্গে গ্রীক প্রভাব

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও গ্রীস অতি প্রাচীন দুটি দেশ। সভ্যতাও বহু পুরাতন। আলেকজেন্দারের অনেক আগে থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের আদানপ্রদানের মাধ্যমে দু'টি দেশ পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। ভারতবর্ষের উত্তব-পশ্চিম অঞ্চল ছাড়াও প্রাচীন কালে গ্রীকদের সঙ্গে সুদূব বঙ্গদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলেই মনে হয়। দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সংস্কার সংস্কৃতির অনেক সাক্ষ্য আজও আমরা বহন করে চলেছি এবং আগামী দিনেও চলতে হবে। ইউরোপীয় আচার আচরণে অভ্যস্থ গ্রীকদের অনেক সংস্কার, খাদ্যপ্রীতি, পারিবারিক পরিবেশ বা ভাষা এখনও ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালিদের সঙ্গে মিলে যায়। এখানে অতীতের পাতা থেকে বাঙালি ও গ্রীকদের ঘনিষ্ঠতাব কিছু নজির উপস্থাপন করা হবে।

প্রাচীন সভ্যতা মূলত নদীকেন্দ্রিক ছিল। নদীর ধারে গড়ে উঠত বন্দর শহর। দেশী-বিদেশী বহু মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জড়ো হতেন ঐ সকল শহরে। এক দেশ অন্য দেশের শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হত। প্রাচীন বঙ্গে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত ও মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত ছিল গঙ্গে বন্দর।

তাম্রলিপ্ত বন্দর ঃ— বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরই হচ্ছে প্রাচীন বন্দর-শহর তাম্রলিপ্ত। ভাগীরথীর শাখা রূপনারায়ণের দক্ষিণ তীরে ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। রূপনারায়ণ এখনও আছে। কিন্তু পূর্ব স্থান থেকে সে যেমন সরে গেছে, তেমনি সরে গেছে সাগরও। তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে মহাভারত ও পুরানে। 'শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভারতের কাল'....'দশম খ্রী: পূর্ব শতকের মধ্যভাগ' (রমেশচন্দ্র দত্তের ঋক্‌বেদ সংহিতার ভূমিকা, পৃ: ৫)। সুতরাং, তাম্রলিপ্ত বন্দর-শহরের অস্তিত্ব ৯৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দেও ছিল।

গঙ্গে বা দ্বিগঙ্গা বন্দর ঃ— বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা গ্রামের কোনও স্থানে ছিল দ্বিগঙ্গা বন্দর। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের দু'টি পথের উল্লেখ করেছেন। তিনি 'দ্বিতীয় পথের শেষ প্রান্তে সাগর তীরে তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাবন্দর, চন্দ্রকেতুগড়'.... ও 'মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠার আগেও এই পথ দুটির অস্তিত্ব ছিল' বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, 'গঙ্গাবন্দর' ও 'চন্দ্রকেতুগড়' উভয়ই প্রাচীন এবং পৃথক স্থানে অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, 'হুগলীর সপ্তমগ্রাম ও মহানাদ; .... ধামরাই, বামপাল ও সোনারংগ প্রভৃতি প্রাচীন' স্থানের 'তুলনায় ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড় প্রাচীন।' চন্দ্রকেতুগড় যমুনা নদীর শাখা পদ্মা বা পদ্মাবতীর

তীরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাবন্দরের অবস্থান ছিল বিদ্যাধবী নদীর তীরে কোনস্থানে। বিদ্যাধী যমুনা নদীরই আব এক শাখা। পদ্মা যমুনা থেকে নির্গত হয়ে বর্তমান দেগঙ্গা থানাব কোনও স্থানে বিধ্যাধীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে নদীয়া জেলার হরিণঘাটার কাছে আবার যমুনায় পতিত হয়। সুতরাং, বন্দব-শহর চন্দ্রকেতুগড় ও গঙ্গাবন্দর উভযই সুপ্রাচীন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

গ্রীক ও বাঙালির যোগসূত্র ঃ— জীবনধারণের জন্য গ্রীকদের নৌবাণিজ্য বেছে নিতে হয়েছিল। প্রাচীন কালে তারা বাণিজ্যিক কারণে দেশ-বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল। ভারতীয উপমহাদেশও তাদের নাগালের বাইবে ছিল না। বাণিজ্যের কাবণে প্রাচীন কালে তাদের বাঙালিদেব সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব নয়।

গ্রীক-বঙ্গ বাণিজ্য ঃ— গ্রীসে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল অত্যন্ত কম। খাদ্যসামগ্রী তারা বিদেশ থেকে আমদানি করত। আঙ্গুরের মদ, জলপাই তেল এবং হস্ত শিল্প ছাড়া তাদের অন্য কোনও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য ছিল না। আবার এই রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কোনটিই সর্বসাধারণেব জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। সেই জন্য প্রাচীন গ্রীক অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে আমদানি বাণিজ্য নির্ভর ছিল। তারা নিজেদের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য, লবণ. নোনা মাছ ইত্যাদি আমদানি কবত।

মাইসেনীয় যুগের পর খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কোনও এক সময় 'ফোনিকীয়দের' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় গ্রীকগণ 'আবার' নৌবাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং অনেক দেশেব সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হয়। খ্রিঃ পূর্ব ৫ম শতকে আথেন্সের নেতৃত্বে গ্রীক নৌবাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। গ্রীকদের পক্ষে সুদূর পূর্বভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত ও গঙ্গেবন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল না। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়— 'প্রাচীন বাংলার অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম এবং প্রধান উপায় ছিল বাণিজ্য।' 'খ্রীষ্ট পূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্তই বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণ যুগ।' আবার 'সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্ত. তাহাও সুস্পষ্ট।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন. 'গঙ্গাবন্দরের রপ্তানী দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমেই পাইতেছি তেজপাতা।' গঙ্গেবন্দরের আর একটি রপ্তানিদ্রব্য হল পিপ্পলি (পিপুল)। 'প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রপ্তানি হত।' ঐ পুস্তকেই (বাঙ্গালীর ইতিহাস) পিপ্পলির সমশব্দ 'পেপেরি' বা 'পেপ্পের' বলা হয়েছে। কিন্তু 'পেপেরি' বা 'পেপ্পের' গ্রীক শব্দ। সুতরাং, অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, গাঙ্গেয় পিপ্পলি বা পেপেরি গ্রীক দেশে রপ্তানী হত। ঐ পুস্তকেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবাণ রপ্তানি দ্রব্য গাঙ্গেয় সূক্ষ্ম বস্ত্রসম্ভার।' বঙ্গের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে হীরা ও স্বর্ণের উল্লেখ আছে। নিম্নবঙ্গের সুবর্ণরেখা নদীতে একসময় প্রচুর পরিমাণে 'dust gold' পাওয়া যেত। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় আরও উল্লেখ করেছেন, 'ইহার কিছু কিছু পশ্চিম এশিয়াদেশ, ইজিপ্ট, গ্রীস, রোমে রপ্তানি হত।' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, গ্রীক বণিকগণ প্রাচীন বঙ্গ থেকে

তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা, ঔষধী হিসাবে পিপ্পল, সোনা, হীরা, গাঙ্গেয় মুক্তা, প্রবাল ও বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলীন প্রভৃতি শৌখিন দ্রব্য সংগ্রহ করত এবং পশ্চিম এশীয় দেশ, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ ও উত্তর আফ্রিকার দেশ সমূহের ধনী ও রাজ পরিবারের লোকজনের নিকট বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জন করেছে। আর 'পেপেরি' একটি ভেষজ ঔষধ। প্রাচীন গ্রীস চিকিৎসা বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। সুতরাং, ভেষজ 'পেপ্পের' বঙ্গদেশ থেকে সংগ্রহ করা তাদেব পক্ষে অসম্ভব ছিল না। প্রাচীন বঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থাগম হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখন 'আধসের পিপ্পলি বা পেপেরির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার।' 'বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানি মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা।'

অনুমান ৬ষ্ঠ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে পণ্য বিনিময় বাণিজ্য মুদ্রা-বাণিজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। 'খ্রীষ্টপূর্ব ৭ শতাব্দীতে আথেন্স রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। সমগ্র গ্রীসে ঐ মুদ্রার প্রচলন হয়।' আবার খ্রিঃপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর শেষ অর্ধে ম্যাসিডনিয়ার রাজা ফিলিপস্‌ও মুদ্রাব প্রচলন করেন। স্পষ্টতই বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাচীন বঙ্গে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার আমদানি হত। স্বর্ণ মুদ্রা 'দিনার' আর রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল 'দ্রক্ষা' দ্রাক্ষা (drachm)। স্বর্ণ মুদ্রা দিনার সম্ভবত ফিনিকীয় মুদ্রা ছিল। দশম খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বা ঐ রকম কোনও সময়ে বর্তমানে লেবানন, তুরস্ক, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের কোনও এক স্থানে ফিনিসীয়দের বসবাস ছিল। আজ আর তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উত্তর কালে ইরাক, যুগস্লাভিয়া প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি কোন সূত্র ধরে তাদের মুদ্রার নামকরণ করে 'দিনার'। কিন্তু 'দিনার' বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে কোনও প্রভাব ফেলেনি। অপর পক্ষে গ্রীক রৌপ্য মুদ্রা দ্রাক্‌মা (Drachma) থেকে বাংলা 'দাম' শব্দটি এসেছে (দ্রাক্‌মা > দ্রাক্ষা > দাক্ষা > দাম)। সুতরাং, নিশ্চিতভাবে বলা যায় দ্রাক্‌মা মুদ্রা বাঙালির সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এর থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, গ্রীকরা ব্যবসা করতে এসে প্রাচীন বঙ্গসমাজ জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

গ্রীক ও বাঙালি জীবনে পারস্পরিক প্রভাব ঃ— গ্রীক শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলাকে যেমন একদিকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি ভারতীয় দর্শন প্রভাবিত করেছে গ্রীক জীবন ছন্দকে। ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের সমাজ-জীবন, সংস্কার-সংস্কৃতি, দেবদেবী, ভাব-ভাষার মধ্যে মিল আজও খুঁজে পাওয়া যায়। কে, কাকে, কীভাবে প্রভাবিত করেছে বলা কঠিন। তবে, একমাত্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক এইভাবে একে অন্যের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে হয় না।

বঙ্গের প্রাচীন শিল্পকর্মে গ্রীক প্রভাব ঃ— তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্পকলার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, দুই স্থানের শিল্পকর্ম সমসাময়িক কালের। তাছাড়া, উভয় শিল্পে শৈলীর মধ্যে বৈদেশিক শিল্পকলার প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

খ্রিস্ট পূর্ব ৪র্থ শতকে মৃত্তিকানির্মিত অলঙ্কারবর্জিত গ্রীক নারীমূর্তির পরিহিত কাপড় স্মরণ করিয়ে দেয় দৃপ্তিময়ী অবগুণ্ঠিত বাঙালি গ্রাম্য বধূর মূর্তি। আজ দিন বদলেছে। তারা ইউরোপ দেশীয়। আধুনিক ইউরোপীয় ছন্দে, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন প্রাচীনত্বের কোনও চিহ্ন রাখেনি।

তাম্রলিপ্ত মৃত্তিকা ফলক সমূহের কিছু কিছুতে ইউরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট। ডঃ পি. কে. মণ্ডল তাঁর গবেষণা গ্রন্থ, 'Interpretation of Terracottas from Tamralipta'-তে উল্লেখ করেছেন, "The representations of alian motifs of art on stones illustrating the columns surmounted by lions and bells for instances - stand for the evedience of Hellenistic influence." অনুরূপভাবে চন্দ্রকেতুগড় প্রাপ্ত মৃত্তিকা ফলকে অঙ্কিত স্থাপত্য শিল্প গ্রীক স্থাপত্য শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কিছু কিছু নারী মূর্তির পোশাক-পরিচ্ছদ ও কেশবিন্যাস সুস্পষ্টভাবে হেলেনীয় প্রভাবকেই প্রমাণ করে। তাই কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিম ভারত নয়, সুদূর পূর্বভারতে বঙ্গদেশের শিল্পকলাতেও গ্রীক প্রভাব পড়েছিল বলেই মনে হয়।

দু'দেশের দেবদেবী ঃ— দেবদেবীর কল্পনাতেও দু'দেশের মধ্যে মিল দেখা যায়। তবে, প্রাচীন গ্রীক দেবদেবীর মধ্যে নারী দেবী অপেক্ষা পুরুষ দেবতার সংখ্যা অনেক বেশি। বঙ্গে প্রচলিত দেবদেবীর মধ্যে মাতৃদেবীরই আধিক্য। গ্রীকদের প্রাচীন দেব-দেবীর মধ্যে কেউ ত্রিশূল হস্তে আমাদের মহাদেবেব ন্যায়। আমাদের সমুদ্র দেবতা আছে, ওদেরও সমুদ্র দেবতা আছে, নাম পোসাইদন। প্রকৃতি পূজারী ও গ্রীকদের নির্মাণের দেবতা 'বিশ্বকর্মা' ছিলেন 'হেফেস্তুস'। দেবীগণের মধ্যে 'আথেনাই প্রধান' দেবী। তাঁদের মধ্যে কেউ লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মতন। আমাদের সকল দেবতা দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন। কিন্তু গ্রীক দেবতাদের মধ্যে দু'একজন মানুষের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ন ছিলেন ও মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন। আমাদের ভগবান মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হন।

বাংলার ঘরে ঘরে এখনও সম্পদদেবী মা লক্ষ্মী প্যাঁচায় চড়ে পূজা গ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রীসের ধনদেবী আথেনা। তাঁরও বাহন প্যাঁচা। ৭ম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আথেন্সে প্রচলিত মুদ্রার এক পার্শ্বে দেবী আথেনা, অন্য পার্শ্বে তাঁর বাহন প্যাঁচার মূর্তি খোদিত ছিল। এই আথেনা দেবীই আবার সিংহবাহিনী দুর্গারূপে বর্শা হস্তে অসুরদলনী হয়েছেন। গ্রীসের পার্গামনে পাওয়া বেদীর গায়ে এমনই একটি মূর্তি উৎকীর্ণ আছে।

দু'দেশের সামাজিক রীতির মিল ঃ— সমাজের ক্ষুদ্রতম একক পরিবার। নারী পুরুষের পরিবারে একজন পুরুষ হন কর্তা। একটি সমাজকে নারীর অধিকারের দৃষ্টান্তেই তার গতিশীলতা বিচার করা যায়। এই বিচারে দুটি সমাজই যেন প্রায় একই জায়গায় বাঁধা পড়ে আছে। বাঙালি পরিবারে নারী কর্ত্রী হলেও তিনি একজন পুরুষেরই অধীন। তাঁকে (নারীকে) অনেক সামাজিক বাধানিষেধ মেনে চলতে হয়। একজন গ্রীক

নারীও এখনও তাই করেন। প্রাচীনকালে গ্রীক সমাজে তো অবশ্যই, আধুনিককালেও নারী সামাজিক বন্ধন মুক্ত হতে পারেননি। এখন থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগেও একজন নারী পথ চলতে একজন পুরুষের আগে যাওয়ার অধিকার ছিল না। শহরাঞ্চলে বাঁধন কিছুটা শিথিল হলেও গ্রামে এখনও যেন অনড়। বাহিরের জগতে তার অধিকার খুব কম। অন্দরমহলই একজন গ্রীক নারীর সাম্রাজ্য।

পূর্বে গ্রীক পরিবার একান্নবর্তী ছিল। গ্রীসের গ্রামে এখনও দাদু, ঠাকুমা, নাতনি, নাতি, নাতবৌ নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। শহরে গ্রীক নারী বলডান্স দেন কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের মতন ১৪ বা ১৫ বৎসর বয়সের পুত্র-কন্যার প্রতি দায়মুক্ত হতে পারেন না। ২৫/২৬ বৎসরের পুত্র বাবা-মার সংসারেই থাকে। শহরের গ্রীক মা, বাবা চান বিবাহের পরও পুত্র, পুত্রবধূ তাঁদের সঙ্গেই থাকুক।

বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েদের কান বিঁধানো হয় আজও। আর গ্রীকদেরও 'এটা গ্রীক ট্রাডিশন্যাল ফ্যাশান।' 'প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের মেয়েরা কান ফুটো ক'রে বড় বড় ইয়ার রিং প'রে আসছে।' বাঙালির মিঠাই প্রীতি সুবিদিত। গ্রীকরাও এ-ব্যাপারে বাঙালীর খুব কাছের লোক। তারাও মিষ্টি খায়। অতিথিকে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে। তা'আবার ছানার তৈরি মিষ্টি। আমাদের যেমন দানাদার মিষ্টি আছে, তেমনি আছে গ্রীকদেরও। পার্থক্য হল, আমাদের দানাদারে মোটা চিনির দানা লাগানো থাকে, ওদের থাকে মিহি চিনির গুঁড়ো। আমরা বাঙালিরা যেমন আবেগপ্রবণ, আমোদপ্রিয় তেমনি গ্রীকরাও। আমাদের মত ওরাও জমিয়ে আড্ডা দেয়। কোনও অনুষ্ঠানান্তে আমরা বিদায়ী স্বজনদের পোঁটলা করে মিষ্টি দিয়ে দিই। ওরা আজও তাই করে। ঐ রীতি ত্যাগ করতে পারেনি।

সামাজিক সংস্কারে দু'দেশের মিল ঃ— সংস্কার সম্পর্কে বলতে গেলে দু'দেশের মানসিক অবস্থান এক জায়গাতেই আছে। গ্রীকরা আজও হস্তরেখা বিচার, পাপপুণ্য মানে। প্রাচীন কালে গ্রীক আথেনীয়দের থেকে স্পার্টানরা বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীনকালে গ্রীকরা আমাদের (বাঙালিদের) মত অশ্লেষা, মঘা, শুভক্ষণ, অশুভক্ষণ মেনে চলত। পারসিকরা যখন প্রথমবার আথেন্স আক্রমণ করে, সেই সময় শুভদিন না থাকায় স্পার্টানরা যথা সময়ে সৈন্য সাহায্য পাঠাতে পারেনি। এখনও তারা শুভ অশুভ বিচার করে। বাঙালিরা যেমন তিনজন একসঙ্গে কোনও শুভকাজে বের হয় না (বিশেষ করে তিন ব্রাহ্মণের এক সঙ্গে যাওয়া)। গ্রীকদের মধ্যে গ্রমাঞ্চলে এ সংস্কার এখনও আছে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, কথার পৃষ্ঠে টিক্‌টিকি ডাকলে আমরা যেমন কোনও স্থানে তিনবার আওয়াজ করে মুখে 'ঠিক্ ঠিক্' বলি, গ্রীকরা অজও এমনই করে।

দু'দেশের ভাষাগত মিল ঃ— বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা হলেও, সংস্কৃত সহ বহু দেশী-বিদেশী আগন্তুক শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষাকে খুব প্রাচীন ভাষা বলা চলে না। তার উৎপত্তিকাল খ্রিস্টিয় দশম শতক ধরা যায়।

পালযুগে রচিত চর্যাপদই বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ। বাংলা ভাষায় বিদেশী আগন্তুক শব্দের উৎস হল গ্রীক, ফারসি, আরবী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরাজি ইত্যাদি ভাষা। সংস্কৃত ও গ্রীক উভয়ই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার শব্দভাণ্ডারের একই উৎস রয়েছে। অনেক গ্রীক শব্দ যা' সংস্কৃতেও রয়েছে, তারা পরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। সব থেকে আশ্চর্য হল, বাংলা কথ্যভাষার মধ্যে অনেক গ্রীক শব্দ সরাসরি পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতভাবে প্রবেশ করেছে।

ভাষা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যায় 'each word has its own history. This history tells us the enchanting story of the gradual change of the form and meaning of a word. The change takes place mainly due to two reasons. Firstly, it may be due to the impact of some socio-cultural factor. The other factor'....'is the inner urge in man to go on changing continiously' প্রাচীনকালে বাঙালির ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দভাণ্ডার অপূর্ণ ছিল। শূন্যভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য সেখান থেকে যেভাবে সম্ভব হয়েছে নিজের মত করে বিদেশী শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় গ্রীক শব্দের অনুপ্রবেশ প্রাথমিক ভাবে, সংস্কৃত মারফত এবং দ্বিতীয় স্তরে সরাসরি হয়েছে।

সংস্কৃত হয়ে গ্রীক শব্দ বাংলায় ঃ— গ্রীক শব্দ 'দন্তি' সংস্কৃতে 'দন্ত'। 'দন্ত' বাংলায় দন্ত বা 'দাঁত'। গ্রীক শব্দ 'পদি' সংস্কৃতে 'পদ'। ঐ শব্দই বাংলায় হয়েছে 'পদ' বা 'পা'। গ্রীক শব্দ 'ন্যার' বা 'নের' সংস্কৃতে 'নীর'। বাংলাও নীর হয়। একই অর্থে 'তরা' গ্রীক শব্দ সংস্কৃতে হয়েছে 'ত্বরা', বাংলাতেও 'ত্বরা'। এমনিভাবে বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। তা'ছাড়া কয়েকটি ক্রিয়াপদ আছে, যাদের গ্রীক ও সংস্কৃত রূপ প্রায় একরকম। সেইগুলিই আবার বাংলায় প্রবেশ করেছে। গ্রীক ক্রিয়াপদ 'দিনঅ' ও 'পিনঅ' সংস্কৃতে হয়েছে 'দান' ও 'পান' এবং বাংলাও একই হবে। আবার সংস্কৃতের 'পিতৃ' ও 'মাতৃ' শব্দ গ্রীকে হচ্ছে 'পিতেরাস' 'মিতেরা'। এইগুলিই বাংলায় 'পিতা' ও 'মাতা' হয়েছে। এমনিভাবে দেখানো যাবে বহু গ্রীক শব্দ ও সংস্কৃত শব্দ প্রায় এক এবং সেগুলি সংস্কৃতের মাধ্যমে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে।

গ্রীক শব্দ বাংলা কথ্যভাষায় ঃ— বাংলা কথ্য শব্দভাণ্ডারে অনেক গ্রীক শব্দ কিছু পরিবর্তিত হয়ে বা পরিবর্তিত আকারে প্রবেশ করেছে। গ্রীক মুদ্রার নাম দ্রাখ্‌মা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গ্রীক 'দ্রাখ্‌মা' শব্দ থেকেই বাংলা 'দাম' কথাটা এসেছে। গ্রীক 'পিছঅ' শব্দের অর্থ অপরিবর্তিত রেখেই বাংলায় 'পিছন', 'পিছে' শব্দ হয়েছে অনুরূপভাবে গ্রীক শব্দ 'ল্যাম্বঅ', 'গেরঅ', 'নিখি', 'সিরাঙ্গন', 'ভারিয়া' প্রভৃতি শব্দ বাংলা কথ্যভাষায় হয়েছে যথাক্রমে ল্যাম্প, ঘেরা, নখ, সুড়ঙ্গ, ভার বা ভারি প্রভৃতি শব্দ। যেমন পিতাকে বাংলায় কথ্যভাষায় আমরা বলি 'বাবা', গ্রীকরাও পিতেরাসকে কথ্যভাষায় বাব্বা বলে। তবে এই ব-এর উচ্চারণ ওঁরা ওয়া 'ব'-এর মত করে করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক গ্রীক শব্দের উল্লেখ করা যাবে, যারা বাংলা কথ্যভাষায় প্রবেশ করেছে।

গ্রীক ও বাংলায় শব্দ বা বাক্য গঠনে মিল :— গ্রীক ভাষায় শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত বা বাংলার সঙ্গে মিল দেখা যায়। বাংলায় বিপরীত অর্থবোধক শব্দ গঠন করার জন্য শব্দের প্রথমে একটি 'অ' ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে গ্রীক বিপরীত অর্থবোধক শব্দ গঠন করতে শব্দের প্রথমে একটি 'আ' ব্যবহার করা হয়। যেমন বাংলায় 'গভীর' শব্দ বিপরীতার্থে 'অগভীর' হয়, অনুরূপভাবে গ্রীক শব্দ 'ভাথিস' বিপরীত অর্থে হবে 'আভাথিস'। অর্থ গভীর ও অগভীর। যেমন, 'ভালতম' (আবৃত) - আভালতম (অনাবৃত); 'ভারিয়া' (ভারি) - আভারিজ (অভারা বা হালকা); 'ব্রোখিয়া' (বর্ষা) - 'আব্রোখিয়া' (অনাবৃষ্টি) ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে বাক্যে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কিছু মিল দেখা যায়। যেমন বাংলায় সম্বোধনসূচক বাক্যে অনেকটা অনাবশ্যকভাবে 'রে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তেমনি গ্রীক বাক্যেও সম্বোধনে 'রে' ব্যবহার করা হয়। যেমন বাংলায - আয় রে বাছা আয়; যারে বাছা যা। তেমনি গ্রীকে - পেদিমু এল্লারে (আয়রে বাছা আয়), পু পাস রে পেদি মু; (কোথা যাসরে বাছা?)। আবার সম্বোধনকালে নামের আগে 'ও' ব্যবহার করি। যেমন 'ও ভগীরথ'! গ্রীকরা তেমনি ব্যবহার করে 'অ'। যেমন 'অ জেনথেমি'; 'অ দিকাও পলি'; ইত্যাদি।

উভয় জাতির মধ্যে এই বিস্ময়কর মিলের পিছনে যে রহস্য আছে, তা অবশ্যই একদিন উন্মোচিত হবে। কেবল বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মেলামেশা থেকে এই প্রকারের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে বলে মনে হয় না। তা হলে কি একই উৎস থেকে আগত জনগোষ্ঠীর মানুষ দু'স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে বসতি স্থাপন করেছিল? আগামী দিনগুলিই এর উত্তর দেবে!

ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের আলোকে আর্য সমাজজীবনের রূপরেখা

চিরকিশোর ভাদুড়ি

আর্য সভ্যতার সুপ্রাচীন বনিয়াদ সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে পণ্ডিতেরা যদিও সহমত হয়েছেন, তবুও সেই নিখুঁতি লেখার আকার নিয়ে আমাদের চোখের সামনে তেমনিভাবে ধরা দেয়নি। সেই কারণেই বিশেষ করে, বৈদিক যুগে আমাদের পরিবার জীবন কী ধরনের ছিল, তা যদি জানতে হয়, তা হলে আমাদের বৈদিক সাহিত্য এবং ঐ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের প্রতিবেদন একই সঙ্গে আমাদেব হাতে তুলে নিতে হবে।

পণ্ডিতেরা নির্দ্বিধায় মনে করে থাকেন যে, বৈদিক যুগে ভারতীয় পরিবারজীবন পিতৃতান্ত্রিক ছিল। পিতা পরিবারেব কর্তা হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি সকলের সঙ্গে সুসম ব্যবহার করতেন। যখন তিনি বয়সের ভারে নুয়ে পডতেন, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।

এই প্রসঙ্গে ঋগবেদের[১] একটি শ্লোকের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ঐ শ্লোকে ঋজ্রশ্ব নামে একটি বালককে অন্ধ করে দেবার কথা বলা হয়েছে। ঐ বালকের পিতা তার অন্ধত্বের জন্যে মুখ্যত দায়ী ছিলেন। পণ্ডিতদের[১(ক)] একাংশের মতে, ঋজ্রশ্বর পিতা তাকে নিষ্ঠুরভাবে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং, বৈদিক যুগে পিতৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্ঠুর ছিল বলে তাঁরা মনে করে থাকেন। কিন্তু সায়নভাষ্য অনুসারে, ঋজ্রশ্ব একটি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। ঐ বালকটির পিতা ঐ অঞ্চলের রাজা হিসেবে তার বিচার করে অন্ধত্ব দণ্ড প্রদান করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বালকটির পিতা ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতার পূজারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। রাজদণ্ড সন্তান বাৎসল্যকে একেবারেই আমল দেয়নি। সেই কারণে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা যে শৃঙ্খলা এবং আদর্শর ধ্রুপদী প্রমাণ হিসেবে মূর্ত হয়ে রয়েছে, তার পরিষ্কার প্রমাণ হিসেবে এই ঘটনাটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। স্বাভাবিকভাবে বৈদিক সমাজে অভিভাবকত্ব যথেষ্ট স্নেহশীল এবং মধুর ব্যবহার অনুসারী ছিল বলেই সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। The Vedic Age[২] গ্রন্থের মাননীয় সম্পাদক এই যুক্তিকে সমর্থন করেছেন।

বৈদিক যুগে একই বাড়িতে একই পরিবারের নানা সূত্র অনুসারী লোকজনেরা, (যেমন বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী, ঝি, চাকর ইত্যাদি) মিলেমিশে বাস করতেন। ঋগবেদের বিভিন্ন অধ্যায়, বিশেষত বিবাহ[৩] এবং জুয়াড়ি[৪] সূক্ত পড়লে

আমাদের এই ধারণা সুদৃঢ় হয়। The Vedic Age[৫] গ্রন্থের মাননীয় সম্পাদক মনে করেন, ঋগবেদের বিবাহ সূক্তে পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা অবশ্য এই অভিমতটিকে যথেষ্ট প্রমাণ নির্ভর নয় বলে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।

বিভিন্ন ধর্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র পড়ে আমরা জানতে পারি যে, কোনও দ্বিজ ২৪ বছর বয়সে গুরুগৃহ থেকে বিদ্যাভাস (সহ বা ব্রহ্মচর্য) শেষ করে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতেন এবং তাব পরে তিনি বিবাহ করতেন। যাই হোক, যৌথ পরিবার শৃঙ্খলা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সেই কালের রূপরেখায় এক উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিবাহ[৬] সূক্তে নব পরিণীতা বধূকে শ্বশুর বাড়িতে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন লোকজনেরা এবং তাঁকে ঐ বাড়িতে বসবাসকারী সব মানুষের ওপরেই মধুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অনুবোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

তথ্য প্রমাণাদি থেকে যতদূর বুঝতে পারা যায়, বৈদিক ভাবতীয়রা একই পরিবার বন্ধনে বাঁধা থেকে বাস করে যেতে চাইতেন। সেই জন্যেই যে পণ্ডিতেরা[৭] মনে করে থাকেন যে, বৈদিক আর্যরা তিন পুরুষ ধরে একই বাড়িতে বাস করবার পরে আলাদা হয়ে যেতে চাইতেন, তাঁদের এই মতামতকে উপযুক্ত যুক্তি তথ্য নির্ভর নয় বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

জুয়া খেলা বৈদিক আর্যরা বিশেষভাবে অপছন্দ করতেন। আমরা ঋগবেদের জুয়াড়ি[৮] সূক্ত পড়ে জানতে পারি যে, জুয়াড়ি সবিশেষ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। কেননা, তার পরিজনেরা, এমনকি তার স্ত্রীও মন্দ স্বভাবের জন্যে তাকে পরিত্যাগ করেছে। তথ্য প্রমাণাদি থেকে আমাদের মনে হয়, জুয়া খেলা বৈদিক আর্যদের অন্যতম প্রমোদ উপকরণ ছিল। তবে, এই খেলার কুপ্রভাবের জন্যে একে তাঁরা খুবই অপছন্দ করতেন। বেদ পরবর্তী সাহিত্যে এবং অনুশাসনে এই জুয়াকে সাতটি পাপকর্মের অন্যতম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। (মহাভারত, মানব ধর্মশাস্ত্র দ্রষ্টব্য)

গুরুগৃহে বাস করবার সময় ব্রহ্মচারী তাঁর পরিবারের একজন হিসেবে বিবেচিত হতেন। ব্রহ্মচারী নিজে পরিবারের সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। গুরুর ছেলেমেয়ে, ভাইবোন— সকলেরই প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি। উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে বৈদিক ভারতে নগরায়ণ কিংবা বাড়িঘর সম্বন্ধে আমরা সঠিক ধারণা করতে পারি না। অবশ্য পণ্ডিতদের[৯] মতামত থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৈদিক আর্যদের বাড়ি সাধারণত কাঠের তৈরি হত এবং এক একটি বাড়িতে বসবার ঘর, অগ্নিহোত্রসহ কয়েকখানি করে ঘর থাকত। তথ্য প্রমাণাদি থেকে আরও জানা যায় যে, বৈদিক আর্যরা গ্রামেই বাস করতেন, যদিও বৈদিক সাহিত্যে নগর উল্লিখিত হয়েছে। বেদ পরবর্তী সাহিত্যে ইট দিয়ে তৈরি বাড়ি এবং ইটভাটারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে আমরা পোড়া ইট (ইষ্টক) শব্দটির উল্লেখ পাই। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ঐ সময়ে পাকাবাড়ি তৈরি হত।

ওপরের আলোচনা থেকে বৈদিক ভারতে আর্যরা যে সুশৃঙ্খল এবং উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তার একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পেলাম। অবশ্য আজকের দিনের বিজ্ঞান নির্ভর পরিবার জীবনের সঙ্গে তার তুলনা করা কখনই সমীচীন হবে না।

এইবারে আমরা মহাকাব্যের যুগে আর্যদের পরিবার জীবনের রূপরেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করব। তথ্যাদি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ মহাকাব্যের যুগে এসেও বদলের আদল ধরেনি। পিতা এখনও পরিবারের প্রধানই রয়ে গিয়েছেন। বার্ধক্যে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসছেন। আবার ছোটভাই কোনও সময় বড় ভাইকে বঞ্চিত করে বাড়তি কোনও সামাজিক মর্যাদা বা সম্মান আদায় করবার চেষ্টা করতেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সুখে দুঃখে সব সময় তাঁর পাশে পাশে থেকে সম অংশীদার হবার প্রয়াসে এগিয়ে যেতেন। রামায়ণ[১০] পড়ে আমরা জানতে পারি, অযোধ্যার রাজা দশরথের কোনও পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র স্বেচ্ছা বনবাস বরণ করে নিয়েছিলেন। রামের অনুজ ভরত[১১], রামচন্দ্রের স্বেচ্ছা বনবাস গ্রহণ করবার পরে, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাজকার্য নির্বাহ করতে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রকে ডিঙিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করতে চাননি। আবার মহাভারতে[১২] বলা হয়েছে, কৌরবদের সঙ্গে পাশার জুয়ায় হেরে গিয়ে পাণ্ডব প্রধান যুধিষ্ঠির যে বাজি ধরেছিলেন, (স্বেচ্ছা বনবাস এবং তার পরে অজ্ঞাতবাসে গমন করা এবং যৌথ পত্নী দ্রৌপদীকে কৌরবদের দাসী হিসেবে কাজ করতে দেওয়া) তার শর্ত পূরণ করতে অনুজ পাণ্ডবেরা পিছিয়ে আসেননি।

প্রজার সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছিল নিবিড় এবং মধুর। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে রাজা তাদের মতামত নিতেন। রামায়ণ[১৩] পড়ে আমরা জানতে পারি, রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে অযোধ্যার যুবরাজ ঘোষণা করবার আগে এক প্রজা সমাবেশ আহ্বান করে তাঁর ইচ্ছাকে অনুমোদিত করিয়ে নিয়েছিলেন। রামায়ণে[১৪] আরও বলা হয়েছে, অযোধ্যার ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ প্রজারা রামচন্দ্রকে সস্ত্রীক স্বেচ্ছা বসবাস থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। মহাভারতে[১৫] বলা হয়েছে, কৌরব প্রধান ধৃতরাষ্ট্র অন্তিম জীবনে বানপ্রস্থ গ্রহণ করবার আগে এক প্রজা সম্মেলন আহ্বান করে নিজ সংকল্পের অনুমোদন আদায় করেছিলেন। এই মহাকাব্য[১৬] পড়ে আমরা আরও জানতে পারি যে, ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ পাণ্ডুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সর্ববর্ণের প্রজাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে[১৭] বিজয়ী হয়ে যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন প্রজারা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। মহাভারতে[১৮] আরও বলা হয়েছে, পাশাজুয়ায় পরাজয়ের পর পাণ্ডবেরা স্বেচ্ছা বনবাস গমনে উদ্যত হলে, প্রজারা তাঁদের সঙ্গে বনবাস যাত্রায় অংশ নিতে সবিশেষে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিছু ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের সঙ্গ নিয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছা বনবাস ও তারপরে অজ্ঞাতবাস পর্যন্ত পাণ্ডবদের সঙ্গেই থেকে গিয়েছিলেন। মহাভারত[১৯] পড়ে আরও জানা

যায়, হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর মনে সুখ এবং শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর পুত্র ভীষ্ম চিরকুমার থেকে গিয়েছিলেন।

এবাবে আমরা পুরাণ এবং উপপুরাণে আর্য পবিবার জীবনের রূপরেখা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার অবতাবণা করে আমাদের প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে আসব। আগের দিনগুলির মতই, পুরাণের যুগেও পিতাই পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতেন। বয়সের ভাবে অশক্ত হয়ে পড়লে জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর কাছ থেকে সেই দায়িত্ব নিয়ে নিতেন। সংসার প্রতিপালন, অবিবাহিত ভগিনীর বিবাহের ব্যবস্থা করা, এই সবই পিতার মতই, জ্যেষ্ঠপুত্রেরও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হত। মা, সৎমা, ভাই, সৎভাই, বোন অথবা পরিবারের অন্য যে কোনও পরিজনেরই খাওয়ানো, পরানো কিংবা শিক্ষার দায়িত্ব জ্যেষ্ঠপুত্রের ওপরেই বর্তাতো। বাড়ির মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করবার সময় অবশ্যই পাত্রের সমৃদ্ধি এবং বর্ণসাম্য দেখে নেওয়া হত ভালভাবেই।

এবারে আলোচনায় আসা যেতে পারে। পদ্মপুরাণের[২০] পাতাল খণ্ডে বলা হয়েছে, অযোধ্যার যুবরাজ রামচন্দ্র স্বেচ্ছা বনবাস থেকে ফিরে এলে তাঁর অনুজ ভরত রাজ্যভার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের বনবাস পর্বে ভরত তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করেছিলেন, কিন্তু কখনই দাদাকে ডিঙিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে বসতে চাননি। অবশ্য এই ঘটনাটি রামায়ণে ইতিপূর্বেই সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, ছোট ভাইরা বড়ভাইকে মেনে চলতেন এবং কখনই বড়কে প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাইতেন না।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, যে কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র পিতারই থাকত। তবে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্টো নজিরও লক্ষ্য করা গিয়েছে। মৎস্যপুরাণ[২১] এবং বিষ্ণু পুরাণ[২১(ক)] পড়ে আমরা জানতে পারি, বাজা যযাতি, অসুর গুরু শুক্রর অভিশাপে অকালে জরা কবলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর প্রতি পুত্রকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর নিজের যৌবনের সঙ্গে তাঁর জরার সাময়িক বদল করে নেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ছাড়া আর কোনও পুত্রই পিতার এই প্রস্তাবে রাজি হননি। পরিণামে অবাধ্য সন্তানেরা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। আর পুরুকে যযাতি প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা করেছিলেন[২১(খ)]। বায়ু[২২] এবং লিঙ্গ পুরাণে[২৩] এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য মহাভারতে এই আলোচনা আমরা আগেই দেখতে পেয়েছি। রাজতন্ত্র কখনও অবাধ্য সন্তানকে ক্ষমা করত না। বায়ুপুরাণ[২৪] পড়ে আমরা জানতে পারি, অযোধ্যারাজ দশরথের পূর্বপুরুষ ইক্ষাকু, তাঁর পুত্র বিকুক্ষিকে দুশ্চরিত্রের জন্য রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন।

পরিশেষে, আরও দু-এক কথা বলা যেতে পারে। শিবপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, সেই যুগে মেয়েদের উঠতি বয়সে বিবাহ দেওয়া হত। নবপরিণীতা বধূ শ্বশুরালয়ে সমাদরে গৃহীতা হতেন। এমনকি বিয়ের পরেও, মেয়েরা আজকের দিনের মতই, পিত্রালয়ে স্বাভাবিক ভাবেই যাওয়া আসা করতে পারতেন এবং সমান যত্ন আদর পেতে কোনও বাধা থাকত না।

অবশ্য একটা কথা আমাদের এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মহাকাব্যে কিংবা পুরাণে সাধাবণ মানুষের সুখ, দুঃখ কিংবা আশা-নিরাশার কাহিনী প্রতিফলিত হয়নি। সেই জন্যে এই দুই যুগে সাধারণ মানুষের আর্তির হদিশ করা পণ্ডিতদের পক্ষে সবিশেষ কঠিন কাজ হয়ে পড়ে।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, বিশেষ করে, বেদ, মহাকাব্য এবং পুরাণে আর্যদের সমাজ জীবনের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানে করলাম। সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে দেখা গেল, পরিবার কাঠামোর বিন্যাস যুগে যুগে একই থেকে গিয়েছিল। বস্তুত, যৌথ পরিবার ভারতীয় আর্যদের সমাজ ব্যবস্থার এক অনন্য নজির হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। অবশ্য, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই এই বিন্যাস ভেঙে পড়তে থাকে এবং আজকের দিনে আমাদের দেশে এই পরিবার প্রকল্প আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতই আজগুবি লাগে আমাদের কাছে — এ কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চাষের জমির মালিকানার রূপবদল এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এই পরিবার কাঠামোর অবলুপ্তির কারণ হিসেবে আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করছেন। তবে, পশ্চিমী সমাজ কাঠামোর অনুসরণে আগ্রহ খুবই বেড়ে যাওয়া ও এই বিনাশী বেদনার অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করে থাকেন। শৃঙ্খলাবোধ এবং আদর্শ অনুসরণ করবার ব্যাপারে ভারতীয় আর্যরা যুগে যুগে যে নৈতিক আগ্রহ প্রদর্শন করে গিয়েছেন, তার অভাব আজকের দিনে আমরা বিশেষভাবে অনুভব করছি। রাজতন্ত্র কখনও অন্যায় কিংবা নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। আবার প্রজা সাধারণের সমর্থন ছাড়া নরপতি কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হতেন না। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে এ ধরনের অজস্র নজির আমরা দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যগুলি আজকের দিনে আমাদের অবশ্য অনুকরণীয় বলে মনে করা যায়।

সূত্র নির্দেশ

১। **ঋগবেদ-** ১.১১৬.১৬।

১। (ক) "The relation of child and parent was already as rule one of close affection for a father is regarded on the type of all that is good and kind. The chastisement of a gambler by his father may be deemd to be legitimate exercise of parental control. this can not said of the cruel act of his father by blinding Rjvasva at which the **Rgveda** hints."–
Rapson Rj. I (ed) - **The Cambridge History of India** Vol-1-P 80 (Delhi 1955).

২। –"The family discipline was strict as illustrated by the case of Rjvasva who was deprived of his right as a punishment by his father–"
Dr. R.C. Majumdar (ed) - **The Vedic Age** - Vol-I ch xxx P 384. (London 1952)

৩। **ঋগবেদ—** ১০.৮৫. ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৬ ইত্যাদি।

৪। **তদেব—** ১০.৩৬. ৩, ৪ ইত্যাদি।

৫। **The Vedic Age**– Vol-1. P 393.

৬। **ঋগবেদ**— ১০.৮৫. ৪৬।

৭। **The Cambridge History of India**– Vol-I P 8।

৮। **ঋগবেদ**— ১০.৩৪. ৩-৪, ১০ ইত্যাদি।

৯। H C. Roy Chaudhuri. N. K. Dutta & R.C. Majumder (ed) - **An Advanced History of India** - ch vii. p 31 (London 1953)

১০। **রামায়ণ**— (গৌড়ীয় সংস্করণ, কলকাতা)-অযোধ্যাকাণ্ড -১৬শ সর্গ।

১১। তদেব— ৮৬তম সর্গ থেকে আরম্ভ করে পরপর কয়েকটি সর্গ।

১২। **মহাভারত**— (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা) - সভাপর্ব - ৫৭তম, ৫৮তম, ৬২তম এবং ৬৩তম অধ্যায়।

১৩। **রামায়ণ** (গৌড়ীয়)— অযোধ্যাকাণ্ড-২য় সর্গ।

১৪। তদেব— অযোধ্যাকাণ্ড - ৪৩তম সর্গ।

১৫। **মহাভারত**— (হরিদাস) আশ্রমিক পর্ব - ১০ম থেকে ১২শ অধ্যায়।

১৬। তদেব— আদিপর্ব ১৮১তম অধ্যায়।

১৭। তদেব— শান্তিপর্ব— ৪০তম অধ্যায়।

১৮। তদেব— বনপর্ব—প্রথম অধ্যায়।

১৯। তদেব— আদিপর্ব— ৯৪তম অধ্যায়।

২০। **পদ্মপুরাণ** (পাতালখণ্ড)— (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ১৩১০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)।— একাদশ অধ্যায়।

২১। **মৎস্যপুরাণ** (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)— ৩৩.২৫-৩০।

২১। (ক) **বিষ্ণুপুরাণ** (বরোদা বসাক সম্পাদিত ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)— ৪.১. ৩-৬।

২১। (খ) **মৎস্যপুরাণ**— ৩৪তম অধ্যায়।

২২। **বায়ুপুরাণ** (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলকাতা) ১৩১৭ বঙ্গাব্দ— ৯তম অধ্যায়।

২৩। **লিঙ্গপুরাণ** (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১০ বঙ্গাব্দ কলকাতা)— প্রথম খণ্ড, ৬৭তম অধ্যায়।

২৪। **বায়ুপুরাণ**— ৮৮তম অধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক উদ্যোগে প্রাক্জ্যোতিষপুরের ভূমিকা

সুরজিৎ কুমার ধর

প্রাচীন ভাবতবর্ষে খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত বাণিজ্যসংক্রান্ত তথ্যাদি আরিকামেড়ুতে প্রাপ্ত ৫০ ফুট লম্বা অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত সময়কালে বাণিজ্য ক্ষেত্রে গতিশীলতার কথা সকল ইতিহাস পাঠক পাঠিকাদের জানা আছে। এই সময়েই মশলা ও অন্যান্য বিলাস দ্রব্যকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে রোমজগতের ব্যবসায়ীগণের আগমন এবং ভারতীয় বণিকদের মালয় ও দ· পূ· এশিয়ায় গমনাগমনের প্রমাণ Radha Kumud Mukherjee -র A History of Indian Shipping : A History of the Sea-Borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times (ch x) শীর্ষক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক উদ্যোগে প্রাক্জ্যোতিষপুরের ভূমিকা প্রসঙ্গে তার অবস্থান (ভৌগোলিক) পৌরাণিক তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ ঃ—

তথা প্রবঙ্গ - বাঙ্গোয়া ২ মলটা মন্নবর্ত্তকা
ব্রহ্মোত্তরা প্র (শ্রী?) বিজয়া মার্গবাঞ্জী-মত্তকাঃ।।
প্রাগজ্যোতিষ,শ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ।।[1]

নদী সংক্রান্ত বর্ণনায় লৌহিত্য, ব্রহ্মপুত্রের আর এক নাম যার তীরে প্রাক্জ্যোতিষপুরের অবস্থিতি; কারণ ঃ—

কৌশিকী চ তৃতীয়া তু২ মিশ্রযীরা গণ্ডকী তথা।
ইক্ষুর্লৌহিত্য২ ইত্যেতা ....।।

মল্লিনাথের ভাষ্যে[3] রঘুর সার্বভৌমত্ব বর্ণনায় প্রাক্জ্যোতিষপুরের নৃপতির ওপর তাঁর বিজয়লাভ[4] দারুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি খ্রি: পূ: ৫০০ - খ্রি: পূ: ৪০০ অব্দের মধ্যে লেখা রামায়ণে অমৃতরাজন কর্তৃক প্রাক্জ্যোতিষ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার[5] কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের নৃতত্ত্ব বিচারে[6] কিরাত (মোঙ্গলজাতি সম্ভূত)-রা এই প্রাক্জ্যোতিষপুরের বাসিন্দা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে[7] ।

বাণিজ্য পথের মধ্যে স্থলপথ এবং জলপথ দুই-ই ছিল। প্রধান প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল ঃ—

अलकस्य पनिट्ठानं पुरिम् माहिस्सतिं ता।
ज्ञीर्नि चापि गोनन्द वेदिसं वनसदृवयं।
कीसंविं[৮] चापि साकेतं सावन्यिं पुश्नम् ।।[৯]

এই বাণিজ্যই ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তিস্বরূপ। তাই জনপদের সুনাম মূলতঃ স্থলবাণিজ্য ও নৌবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাণিজ্যপত্রের নিরাপত্তা বিধানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে[10]। বাণিজ্যপথ সুরক্ষা, বিক্রির স্থান নির্ধারণ, পণ্যের দাম স্থিরকরণের জন্য শুল্কাধ্যক্ষের কাজে কর হিসেবে প্রতীকী অর্থ জমা দেওয়ার প্রমাণ অর্থশাস্ত্রে বিধৃত হয়েছে[11]।

CHANG KIEN এর বিবরণীতে[12] আসামের মধ্যে পূর্বাভিমুখী ভারত-চীন যাত্রাপথের বর্ণনা মেলে;[13] এই প্রসঙ্গেই ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ ইউনানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্রতা লক্ষণীয়[14] খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে চীনের বস্ত্র এই পথ ধরেই উত্তরাপথ[15] এর মধ্যে দিয়ে ব্যাক্ট্রিয়াতে পৌঁছাত বলে P.C. BAGCHI অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সেই সময় পাশ্চাত্য জগতেব সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্রতা বজায় রাখার জন্য চম্পা[16] চৈনিক পণ্যের সংগ্রহশালার[17] মর্যাদালাভ করেছিল। স্থলপথে চৈনিক সিল্ক সর্বপ্রথম ভৃগুকচ্ছে উপনীত হয়ে, তারপর যথাক্রমে SELUCIA, ALEXANDRIA[18] তে পৌঁছাত বলে W.W. TARN মতামত জ্ঞাপন করেছেন। এভাবেই বাণিজ্যিক যোগসূত্রতাকে[19] কেন্দ্র করে পাটলিপুত্র, যা চম্পা, কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং সর্বোপরি প্রাক্জ্যোতিষপুরে গিয়ে উপনীত হত। MAHAJANAKA JAT 539 থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব অঞ্চলের জনগণের ভূমিকার কথা জানা যায়। সিংহলী ইতিবৃত্তে নৃপতি বিজয়ের বাংলা থেকে সাত শত জন অনুগামী সহ সিংহল যাত্রার বর্ণনায় অনুগামীদের বৈশালী থেকে সুবর্ণভূমি ছাড়াও অন্যত্র বাণিজ্যের জন্য যাতায়াতের বিবরণ রয়েছে। VALAHASSA JATAKA এ বারাণসীর সঙ্গে তাম্রপনিদ্বীপের বাণিজ্যের প্রমাণ JAT II (p 127-129) কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে।

প্রাক্জ্যোতিষ থেকে ব্রহ্মগামী অন্যতম তিনটি বাণিজ্যপথ[20] ছিল যথাক্রমে ঃ—

১। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে পাতকোই এবং সেখান থেকে ব্রহ্ম, পর্যন্ত;
২। মণিপুর থেকে চিনউইন উপত্যকা পর্যন্ত;
৩। আরাকান থেকে ইরাবতী উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত পথ। ভামে থেকে পাহাড় পর্বত, নদী উপত্যকা অতিক্রম করে ইউনান ফু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত পথ, যা সাম্প্রতিককালের চীনের দক্ষিণাঞ্চলের কুনমিং নামে পরিচিত। এসময়ের প্রধান প্রধান বাণিজ্য পণ্যগুলির তালিকা নিম্নরূপ ঃ—

কাগজ ঃ- আসামের পূর্বাংশে অবস্থিত নেপাল, খাসি পাহাড়, বাংলা, ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল প্রভৃতি উষ্ণ অঞ্চল থেকে এসময় সাধারণতঃ কাগজ পাওয়া যেত[21] W.W.TARN

খ্রী: পূ: ৮৮ তে এথেনীয় স্বৈরশাসক ARISTION এর দরবারে কাগজের প্রাচুর্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন,[22] তা থেকে নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে, খ্রী: পূ: ১০০ এর অনেক আগেই ভারতীয় কাগজ প্রচুর পরিমাণে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা হ'ত।

সুগন্ধী মলম ঃ- ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে চিকিৎসার জন্য গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ থেকে মলম প্রস্তুতির জন্য আলপাইন হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের নাম উল্লেখ কবা হয়েছে[23] SCHOFF সিকিমের ১৭,০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে ঐ গুল্ম অঞ্চল থেকে ঐ গুল্ম সংগ্রহ করে, এমনকি SPIKENARD নামক অপর একটি উদ্ভিদ থেকে তৈল সংশ্লেষ করে, তার সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে মলম তৈরি করত বলে জানিয়েছেন[24]। PLINY বড় বড় মলমের উপযোগী গাছ থেকে প্রাপ্ত সুগন্ধীর দাম ৪০ ডিনার এবং ছোট ছোট মলমের উপযোগী গাছের পাতা থেকে প্রাপ্ত সুগন্ধীর দামের সর্বোচ্চ মাত্রা ৭৫ ডিনার ছিল বলে জানিয়েছেন। পেরিপ্লাসে SPIKENARD কে তিনটি ভাগে[25] ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ—

১। কাশ্মীর উপত্যকা জাত SPIKENARD (CASPAPY RENE)

২। হিন্দুকুশ জাত SPIKENARD (PAROPANISENE) এবং

৩। কাবুল উপত্যকা জাত SPIKENARD (COBOLITHIC); এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত এবং হিমালয় পর্বতমালা জাত[26] SPIKENARD কে রোমের বাণিজ্যিক জগতে রপ্তানিযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে[27]।

লিসিয়াম ঃ- প্লিনিরক্ষ্যেরচনা এবং Digest List[29] এ বাইরের জগতে ভারতীয় লিসিয়াম রপ্তানির প্রমাণ রয়েছে।

স্যাণ্ডাল উড ঃ- চরক মলম প্রস্তুতিতে স্যাণ্ডাল উডের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। মিলিন্দ পন্‌হোতে বেনারসের স্যাণ্ডাল উডের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলের স্যাণ্ডাল উডের মধ্যে কামরূপের স্যাণ্ডাল প্রশংসিত হয়েছে[30]। SINO-IRANICA[31] তে খ্রী: পূ: দ্বিতীয় শতকে SECWAN থেকে স্থলপথে যাত্রার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ ভূমিকা পালন করত এবং তা শেষপর্যন্ত ব্যাক্‌ট্রিয়াতে উপনীত হত। রোমের বাণিজ্যিক জগতে তা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

রেশম ঃ- শিলালেখ প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, চৈনিক রেশম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় শতকগুলিতে বাণিজ্যযাত্রা কীভাবে সচল রেখেছিল[32]।

গালা ঃ- গালা মূলতঃ ভারতবর্ষ, পেগু, সিয়াম, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যেত এবং ADULIS এর সমুদ্র অতিক্রম করে তা পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক জগতে পৌঁছাত[33]।

গণ্ডার ঃ- আসামের বিভিন্নাঞ্চল থেকে গণ্ডার সংগ্রহ্‌ করার পর রোম, আফ্রিকার দেশগুলিতে ঐ গণ্ডারগুলিকে রপ্তানি করা হ'ত। বাণিজ্য চলত মূলতঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুর্মা উপত্যকার দক্ষিণাংশ, এমনকি কামরূপের মধ্যে দিয়ে[34]।

রত্নপালের BARGAON COPPER PLATE (c. 1025 AD) এ ধান, মিলেট, লাউ, ইক্ষু চাষের প্রমাণ রয়েছে[১৫]। বালবর্মন,[১৬] ইন্দ্রপাল[১৭], রত্নপালের[১৮] তাম্রশাসনে আম, জম্বু (শ্রিফল), ডুমুর, শাখটক, বদরি (আমলা) চাষের প্রমাণ রয়েছে। এমনকি CAZIM হিউয়েন সাঙের মূল গ্রন্থ[১৯] পাঠ করে নারকেল, কাঁঠাল চাষে কামরূপের জনগণের দাবি স্বীকার করে নিয়েছেন। আবার ভাস্করবর্মন হর্ষকে স্যাণ্ডাল উড উপঢৌকন হিসেবে যেমন পাঠাতেন, তেমনি অর্থ শাস্ত্রে JONGAKA, GRAMERUKA, TAURUPA আসামের পণ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল[৪০]। বালবর্মনের দানপত্রে কৃষ্ণগুড়ি বৃক্ষ যে প্রচুর পরিমাণে প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে উৎপাদিত হত, তারও প্রবাদ রয়েছে[৪১]। ভাস্করবর্মন হর্ষকে উপঢৌকন হিসেবে "কৃষ্ণগুরু তৈল" প্রেরণ করতেন এই তথ্য COWELL জানিয়েছেন।

উপরিলিখিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এককথায় বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে বাণিজ্যকর্মে প্রাক্‌জ্যোতিষপুর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে ইসলামের বাধার সম্মুখীন হলেও, সেন্ট্রাল এশিয়ার সঙ্গে, এমনকি সেখান থেকে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষায় প্রাক্‌জ্যোতিষপুর সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বলে মনে হয়।

সূত্র নির্দেশঃ

1) STUDIES IN THE GEOGRAPHY OF ANCIENT AND MEDIEVAL INDIA (ED) D.C. SIRCAR (1960) P 28.37; KALIKA PURANA CH 79. V 74
2) IBID. P 42; SELECT INSCRIPTIONS. VOL I (ED) D.C. SIRCAR P 394;
3) RAGHUVAMSA IV. 85
4) BHANDARKAR'S LIST NO. 170
5) আসামের লোকসংস্কৃতি (অনুবাদক) যোগেশ দাস, প্রথম মুদ্রণ ১৯৭২, পুনঃমুদ্রণ ১৯৮৬ নিউ দিল্লী পৃ: ৩।
6) ANCIENT INDIA · (ED) R.C. MAJUMDER P 16.17
7) আসামের লোকসংস্কৃতি (অনুবাদক) যোগেশ দাস, পৃ: ৩।
8) M.V. VIII. I (P 123-127) : JAT I 124. 178. 181; JAT II. 31. 287. JAT V 259-260.
8a) MAHABHARATA, SABHAPARVAN XX. C.V. VII
9) M.V. VI P 13. P 6-8;
10) "INDUSTRY, TRADE AND CURRENCY IN THE WORK OF THE AGE OF THE NANDAS AND THE MAURYAS": (ED) U. N. GHOSAL (BANARAS 1952) CH VII : A HISTORY OF INDIAN PUBLIC LIFE : U. N. GHOSAL P 91.
11) ARTHASASTRA PART I. CH VI.
12) TRADE CENTRES AND ROUTES IN NORTH INDIA (C. 322 B.C.A.D 500) : (ED) R.S. AGARWAL P 82.
13) IBID : P 84
14) তদেব ঃ মানচিত্র সহ p 83

15) P.C. BAGCHI · INDIA AND CHINA (1ST EDITION. 1951. BOMBAY) P .5. 16: JAT IV 159. JAT VI 427
16) IBID . P 16. 17
17) INDIA AND CHINA . K M. PANNIKKAR (APRIL 1957. BOMBAY) P 11-14
18) W.W. TARN : GREEKS IN BACTRIA AND INDIA. P 364.
19) JAT IV 159. JAT VI 427.
20) P.C. BAGCHI (ED) · INDIA AND CHINA P 17-18
21) G. WATT (ED) . COMMERCIAL PRODUCTS OF INDIA. P 891.
22) W.W TARN (ED) · GREEKS IN BACTRIA AND INAIA P 370-371
23) G WATT : P 793.
24) SCHOFF (ED) · THE PERIPLUS SECT 48
25) IBID : SECT 48
26) IBID SECT 63
27) IBID . SECT 56
28) PLINY . NATURAL HISTORY XX P 30-31
29) DIGEST LIST (TR) H. ROCKHEM
30) ARTHASASTRA (ED) · R.P KANGLE P 53
31) SINO-IRANICA : BERTHOLD LAUFER P 535
32) ENCYCLOPEDIA-BRITANICA VOL 20 P 663
33) SUDHAKAR DVIVEDI (ED) BRHAT SAMHITA L XXVII 9 . PERIPLUS : SECT 6
34) IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA VOL VI P 20
35) HOERNLE . JASRB PART I 1898 : BLOCKMANN (ED) · ASIATIC RESEARCHES 11
36) HOERNLE . JASB VOL I 1897. K. S P 163 FN3
37) IBID . PART I 1897 JASB . K S P 109 FN2
38) IBID : JASRB PART I 1898
39) M. CAZIM (TR) FROM THE BUDDHIST RECORDS OF THE WESTERN WORLD PART II. P 195
40) ARTHASASTRA (TR) : SHAMASASTRY P 86-87
41) RAGHUVAMSA V.5

হরিকেল : আল মারভাজির বিবরণ অনুসারে

রীতা ঘোষ রায়

আদি মধ্যকালীন বাংলাব আর্থ-সামাজিক ইতিহাস জানার জন্য আরব বিবরণী একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র। আল মারভাজি তার গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে আদি মধ্যকালীন বাংলা (আ: ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও তার নিকটবর্তী কিছু এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন। হরিকেল সংক্রান্ত যে বর্ণনা তার গ্রন্থে পাওয়া যায় এটাই প্রবন্ধটির মুখ্য উপজীব্য।

শরফ আল জামান তাহার মাবভাজি সম্ভবত ইরাণের মারভাজ শহরের বাসিন্দা ছিলেন এবং পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক ও ভৌগোলিক। তাঁর রচনার সম্ভাব্য কাল ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ[১]। এই গ্রন্থটি ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হল যে, অন্যান্য আরব বিবরণীর তুলনায়, এই গ্রন্থটি একটি প্রচলিত তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় নি[২]।

এখন মারভাজি তাঁর গ্রন্থে যে তথ্য দিয়েছেন তার দিকে নজর দেওয়া যাক। আগেই বলা হয়েছে যে, আদি মধ্যকালীন বাংলার অন্যান্য এলাকার সঙ্গে তিনি হরিকেলের বর্ণনা দিয়েছেন। হরিকেলের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল মারভাজি ধৌম নামক এক রাজার উল্লেখ করেছেন যার স্থান সামরিক দিক থেকে গুর্জার প্রতিহারদের পরে। এই ধৌম রাজার অধীনে অনেক রাজ্য এবং এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হরকিড়া নামক একটি নগর যার বাণিজ্য কেন্দ্র ১ ফারসাক (আট মাইল) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। আবগার এর সাগরের উপকূলে অবস্থিত এই নগবটিতে প্রচুর পরিমাণে গণ্ডার ও গরু পাওয়া যেত। এই আবগারের সাগরটির প্রকৃতি কিন্তু অশান্ত এবং এর উপকূল ঘেঁষে অনেক বড় বড় নগরের অবস্থান। উল্লিখিত এলাকাটির বাণিজ্যিক লেনদেনের বিনিময় ছিল স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি[৩]।

উপরে উল্লিখিত মারভাজির রচনার সঙ্গে অন্যান্য রচনার তুলনামূলক আলোচনা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই তুলনামূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক, কারণ মারভাজি কখনো নিজে ভারতে আসেননি। মারভাজি তথা অন্যান্য আরব লেখকদের রচনায় উল্লিখিত রুহমি, ধৌমি, দাহুম, পাল রাজা ধর্মপালের (আ: ৭৭৫-৮১২ খ্রীষ্টাব্দ)[৪] সময়ে বাংলার পাল সাম্রাজ্যকে বোঝাত। অবশ্য মজার বিষয় হল যে মারভাজির রচনাকাল ১১২০, খ্রীষ্টাব্দ যার অনেক আগে পাল রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল শেষ হয়েছে। এখানে অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক নয় আল মারভাজি সম্ভবত প্রাচীন আরব লেখকদের বিশেষত: সুলেমান[৫], আল মাসুদি[৬]। তথা হুডুড আল আলমের অজ্ঞাত লেককের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মারভাজি উল্লিখিত হরকিড়া নগরটি হরকান্দ। হরকাল বা হরিকেলের অপভ্রংশ বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে হরিকেল বলতে চট্টগ্রাম এলাকাকেই বোঝাত। কিন্তু পরবর্তীকালে নবম ও দশক শতকে উপরিউক্ত এলাকাটির সঙ্গে কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট ও ত্রিপুরার কিছু অংশ এমন এক বিস্তৃত এলাকাকে বোঝাত। সিয়ান অভিলেখ[৮] থেকে আমরা জানতে পারি যে সমতট এলাকাটি (যা নোয়াখালি ও কুমিল্লার সঙ্গে অভিন্ন) পাল রাজাদের অধীনে ছিল। এর থেকে অনুমান করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে সমতটের সন্নিহিত হরিকেল এলাকাটিও পূর্ববর্তী পালরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। সমতট এলাকাটির উপর অধিকার যে পাল রাজারা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিল তার সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় গোপালের মণধূক অভিলেখ[৯] আর প্রথম মহীপালের বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর লেখমালা[১০] থেকে। হুডুদ আল আলমের মতে সামান্দারের (চট্টগ্রাম) শাসনের ভার দাহুম তথা ধর্মপালের উপর ন্যস্ত ছিল[১১]।

আগেই বলা হয়েছে যে, মারভাজি হরিকেলে প্রচুর গণ্ডারের উল্লেখ করেছেন। গণ্ডারেব সিং যে একটি প্রসিদ্ধ রপ্তানী বস্তু হিসেবে চিহ্নিত তার উল্লেখ সুলেমানের বিবরণী থেকে জানতে পাওয়া যায়। সুলেমান অনুসারে গণ্ডারের সিং দিয়ে তৈরি উৎকৃষ্ট বস্তু রহমা থেকে চীন দেশে রপ্তানী করা হত, যার মূল্য ২০০০ থেকে ৪০০০ দিনার। এই বস্তুটি সম্ভবত হরিকেলের মধ্যে দিয়ে বিদেশে বপ্তানী করা হত, যা মোটামুটি কোন না কোন সময় পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মারভাজির লেখনী অনুসারে ধর্মপালের রাজ্যের (যার মধ্যে হরিকেল অন্তর্ভুক্ত ছিল) অবস্থান ছিল আবগারের সাগরের সংলগ্ন একটি উপকূল অঞ্চলে। আবগার শব্দটির অর্থ creek বা strait এবং সাধারণভাবে তা শ্রীলঙ্কার কাছে অবস্থিত Palk strait কেই বোঝায়। তবে যেহেতু মারভাজি এর অবস্থান বলেছে হরিকেলের কাছে, তাই মনে হয় যে আবগারের সাগর বলতে এখানে বঙ্গোপসাগরকেই বোঝান হয়েছে। এটি বঙ্গোপসাগরের ক্ষেত্রে একটি নতুন নাম যা অন্যথায় অন্যান্য আরব বিবরণীতে বাহর হরকান্দ, বাহর হরকাল (বা হরিকেলের সাগর) বলে উল্লিখিত।

আল মারভাজি তার বিবরণীতে আবগারের সাগরের উপকূলে অবস্থিত অনেক নগরের উল্লেখ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবম দশক শতকের গোড়া থেকে আরব লেখনীতে উল্লিখিত সমন্দর নামক এক অতি সমৃদ্ধ বন্দর নগরের কথা বলা যাক। আরব বিবরণী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই বন্দর বর্তমান চট্টগ্রামের (বাংলাদেশ) কাছেই অবস্থিত। হুডুদ আল আলমের রচয়িতা (৯৮২ খ্রী:) ইবন খোরদাদরা (৯১৫ খ্রী:)[১৩] ও অল ইদ্রিসির (১১৬২ খ্রী:)[১৪] বিবরণে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অল ইদ্রিস বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন এই অঞ্চলে বাণিজ্যরত বণিকরা যথেষ্ট লাভ করতেন[১৫]। এই একই বন্দর ইবন বতুতার রচনায় সুদকাওয়ান (চট্টগ্রাম) নামে অভিহিত। [১৬] সুদকাওয়ান নামটি অনেক ঐতিহাসিক মধ্যযুগের সপ্তগ্রাম বন্দরের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। ইবন বতুতা সুদকাওয়ানকে স্পষ্টতই সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সপ্তগ্রামের থেকে বঙ্গোপসাগর

অনেক দূরে অবস্থিত। এই বন্দরের উত্থানের ফলে তাম্রলিপ্তির পতনের প্রতিকূল প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত হয়েছিল (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তি তার গুরুত্ব হারায়)। বাংলার ক্ষেত্রে সামান্দার বা সুদকাওয়ান আদি মধ্যযুগের প্রধান বন্দর তো বটেই, কামরূপের পণ্যও এই বন্দর দিয়েই রপ্তানী হত। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য অল ইদ্রিসি ও ইবন বতুতার রচনায় পাওয়া যাবে। আরব লেখকেরা সামান্দারের সঙ্গে উরানসিন (ওড়িষ্যা) ও কাঞ্জা (কাঞ্জীভরম) দেশের যোগাযোগের কথা জানিয়েছেন। সিলানদিব বা শ্রীলঙ্কা থেকেও সামান্দরে সমুদ্রপথে পৌঁছনোর কথা আরব বিবরণীতে আছে। তাম্রলিপ্ত বন্দর যখন তার সমৃদ্ধি ও গৌরবের শিখরে তখন দঃ পূঃ এশিয়া, সিংহল প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে তার বাণিজ্যিক যোগাযোগ অবশ্যই ছিল। কিন্তু আদি মধ্যযুগেই সামান্দার বা সুদকাওয়ানের উত্থান বাংলাকে পশ্চিম এশিয়া ও দঃ পূঃ এশিয়ার সঙ্গে যুগপৎ বাণিজ্যিক লেনদেনে যুক্ত করে দেয়।

একটা বড় এলাকা জুড়ে প্রতিনিয়ত ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম শুধুমাত্র বিনিময় প্রথার মাধ্যমে সীমায়িত থাকার অসুবিধা আছে। তাই বিনিময়ের অবশ্যই একটি মুদ্রা ছিল। আল মারভাজির বিবরণ অনুযায়ী কড়ি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বিনিময় মাধ্যম যদিও স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। কড়ির ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পাল ও সেন লেখমালাতে যেখানে পুরাণ কপর্দক বা কড়ি কথাটি প্রায়শই উল্লিখিত। রুহ্মি দেশে কড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে নিশ্চিত উল্লেখ সুলেমানের লেখনী দ্বারাও সমর্থিত। এই কড়ি বাংলায় আমদানী হত মালদ্বীপ থেকে তার বদলে বাংলা থেকে চাল মালদ্বীপে যেত। এই প্রসঙ্গে দঃ পূঃ বাংলাদেশের ময়নামতীতে উৎখননের দ্বারা আদি মধ্যযুগীয় পর্বের রৌপ্য মুদ্রাব ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে মুদ্রাগুলির গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গবেষণার দ্বারা নিঃসন্দেহে দেখানো যায় যে দঃ পূঃ বঙ্গে খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার ছিল। এই মুদ্রাগুলির গায়ে হরিকেল (নোয়াখালি, কুমিল্লা অঞ্চল, বাংলাদেশ)। পট্টিকের (পাইটকারা, বাংলাদেশ) প্রভৃতি স্থান নাম লিখিত আছে। এই মুদ্রাগুলির একদিকে উপবিষ্ট বৃষমূর্তি ও অপরদিকে ত্রিশূল জাতীয় বস্তুর প্রতিকৃতি আছে। এই পর্বের মুদ্রাগুলি সম্ভবত সন্নিহিত এলাকা আরাকানের মুদ্রাব আদলে ও প্রভাবে নির্মিত বলে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন। দশম শতকের পর থেকে মুদ্রা ব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজনীয় যে সপ্তম ও অষ্টম শতক নাগাদ মুদ্রাগুলির ব্যাস ২.৬ সেঃমিঃ থেকে ৩.০৭ সেঃমিঃ। এদের ওজন কখনোও .৫ গ্রাম থেকে ১.৮ গ্রাম আবার কোন ক্ষেত্রে ৫ গ্রাম থেকে ৭.৫ গ্রাম। দশম শতকের পর থেকে মুদ্রাগুলি আকারে বড় হয় (৪.৮ সেঃমিঃ থেকে ৫.২৫ সেঃমিঃ), তাদের মাত্র একদিকে নকশা আঁকা হয়, তাদের ওজনেরও পরিবর্তন ঘটে (২.৩৮০০ গ্রাম ও ৩.৩৬৬০ গ্রাম)। [১৭]

দশম শতকে মুদ্রাগুলির আকারে ও ওজনে বদল কেন ঘটল সে বিষয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা বিশেষ দাবি রাখে। এই সময়ে উত্তর ভারতে রৌপ্য মুদ্রা পুরাণ,

দ্রম্ম, কার্যাপণের ওজন ছিল ৩২ রতি বা ৫৭.৫ গ্রেণ। দশম শতকে হরিকেলীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বদল রৌপ্য মুদ্রাগুলিকে সম্ভবত উত্তর ভারতের দ্রম্ম, পুরাণ প্রভৃতি মুদ্রার সঙ্গে ওজনের দিক দিয়ে বিনিময়যোগ্য করে তোলে। আবার অপরদিকে পশ্চিম এশিযাব দিরহাম জাতীয় রৌপ্য মুদ্রার ওজনেও (৪৫-৪৮ গ্রেণ ও ৬০.৩ গ্রেণ) হবিকেলীয় মুদ্রার নতুন ওজনের সঙ্গে সমতা দেখা যায়। ফলে রৌপা মুদ্রাগুলির উত্তর ভাবতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। বিশেষত ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফা আবু আহমদ আবদুল্লা আল মুহতাগিন বিল্লা (১২৪২-১২৫৮ খ্রীঃ)র স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার হরিকেল অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পরিচয় দেয়।[১৮] মনে রাখা দরকার যে আরব লেখকদের দ্বারা প্রশংসিত সামান্দার বা সুদকাওয়ান বন্দর (চট্টগ্রাম) ছিল এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

মারভাজির রচনার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হরিকেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। মারভাজির বিবরণ থেকে একথা মেনে নেওয়া শক্ত যে মুদ্রার অনুপস্থিতি বা স্বল্পতর ব্যবহার এবং বিনিময় মাধ্যম হিসেব কড়ির ব্যবহার বাণিজ্যের অবক্ষয় — বিশেষ কবে দূরপাল্লার বাণিজ্যে ভারতের স্বল্পতর ভূমিকার ইঙ্গিতবাহী।[১৯] এই প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে কড়ি বাংলায় আমদানী হত মালদ্বীপ অঞ্চল থেকে। অর্থাৎ কড়ি সরাসরি দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যেরই সামগ্রী, তার উপস্থিতি কখনওই আবদ্ধ অর্থনীতির পরিচায়ক নয়, যে আবদ্ধ অর্থনীতিতে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা সাধারণত অল্পই থাকে।

আল মারভাজির রচনার এক গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে এই কারণে যে, তাঁর বিবরণী আদি মধ্যকালীন বাংলাব ইতিহাস সম্পর্কে এক বিশেষ আলোকপাত করে। আর এখানেই এই রচনার স্বার্থকতা।

সূত্র নির্দেশঃ

(১) **দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম**, ৬, লিডেন, ১৯৯১ পৃঃ ৬২৮

(২) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, **হিস্ট্রী অব এনশেন্ট বেঙ্গল**, কলকাতা, ১৯৭১
নীহার রঞ্জন রায়, **বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব**, কলকাতা, ১৩৫৭।
বি. এন. এস. যাদব, **সোসাইটি অ্যান্ড কালচার ইন নর্দান ইন্ডিয়া ইন দ্য টুয়েলফ্থ সেঞ্চুরী**, এলাহাবাদ, ১৯৭৩
আর. এস. শর্মা, **ইন্ডিয়ান ফিউডালইজম**, দিল্লী, ১৯৮০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
লালনজী গোপাল, **দ্য ইকোনমিক লাইফ অব নর্দান ইন্ডিয়া**, বারাণসী, ১৯৬৫।

(৩) ভি. মিনরস্কী দ্বারা ইংরাজীতে অনুবাদিত, **শারফ আল জামান তাহীর মারভাজী (আঃ ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দ)**, লন্ডন, ১৯৪২, পৃঃ ৪৭-৫০।

(৪) বাংলার পাল রাজাদের রাজত্বের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, দীনেশ চন্দ্র সরকার, **পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত**, কলকাতা, ১৯৮২।

(৫) এস. মকবুল আহমদ দ্বারা অনুবাদিত, **আখবার অল সিন ওয়াল হিন্দ, অ্যান অ্যাকাউন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না বাই সুলেমান অল তাজীর এট আল (আঃ ৮৫১ খ্রীঃ)। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভানসড্ স্টাডিজ সিমলা এবং খড়ি-ইন্ডিয়া, কলকাতা**, ১৯৮৯।

(৬) ইলিয়ট ও ডাওসম (সম্পাদিত) দ্য **হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টরিয়নস**, ১, লন্ডন, ১৮৬৭, 'আরলি আরব জিওগ্রফারস', আল মাসুদি (আঃ ৯১৫ খ্রীঃ)

(৭) ভি. মিনরস্কী দ্বারা অনুবাদিত, **হুড়ুড আল আলম, দ্য রিজিওনস' অব দ্য ওয়ার্লড, এ পাসিয়াম জিওগ্রাফী** (আঃ ৯৮২ খ্রীঃ), অকসফোর্ড, ১৯৩৭।

(৮) দীনেশ চন্দ্র সরকার, **শীলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ**, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১০৪।

(৯) দীনেশ চন্দ্র সরকাব 'দ্য মণধুক ইমেজ ইনস্ক্রিপসন অব গোপাল (দ্বিতীয়)' **ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টর্লি**, ২৮, পৃঃ ৫৫।

(১০) নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'দ্য বাঘাউড়া ইমেজ ইনস্ক্রিপসন অব মহীপাল (প্রথম), **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা**, ১৭, পৃঃ ১৫৫ দীনেশ চন্দ্র সরকার, দ্য নারায়ণ ইমেজ ইনস্ক্রিপসন অব মহীপাল (প্রথম), **শীলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ**, পৃঃ ৮১-৮৬।

(১১) **হুড়ুড আল আলম**, পৃঃ ৮৬-৮৮।

(১২) **সুলেমান**, পৃঃ ৪৩-৪৪।

(১৩) এস. মকবুল আহমদ দ্বারা অনুবাদিত, আল মাসালিক ওয়াল মামালিক, রোডস অ্যান্ড কিংডামস বাই ইবন খুরদাদবা (আঃ ৯১২ খ্রীঃ), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভানসড় স্টাডিজ সিমলা এবং ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৮৯।

(১৪) এস. মকবুল আহমদ দ্বারা অনুবাদিত, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য নেবারিং টেরিটরিজ ইন দ্য কিতাব নুজহাত অল মুশটাক .... অব আল শরিফ অল ইড্রিসি, লিডেন, ১৯৬০।

(১৫) অল ইড্রিসি, পৃঃ ৬৪।

(১৬) এইচ এ. আর গিব, ইবন বতুতা, ট্রাভেলস ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা (১৩২৫-১৩৫৪), লন্ডন, ১৯৩৯।

(১৭) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একসটার্নেল ট্রেড অব আর্লি নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃঃ ৭৪-৭৫।

(১৮) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'কমার্স অ্যান্ড মানি ইন দ্য ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড সেন্ট্রাল সেকটার্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (আঃ ৭৫০-১২০০ খ্রীঃ), ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন, ১৭, ১৯৮২, পৃঃ ৭২।

(১৯) আর. এস. শর্মা ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম (৩০০-১২০০ খ্রীঃ) দিল্লী, ১৯৮০, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১০২ এবং ২২১।

দামোদর কোশাম্বীর ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

সুপ্রতিম দাশ

বিগত কয়েক দশকে এ দেশের ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বদলে গেছে ইতিহাস দর্শনের প্রকবণগত দিকটি, ঐতিহাসিকেব মেজাজ গেছে পাল্টে। এক সময় ঐতিহাসিক লেখালেখি বলতে প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাসকেই বোঝাত যদিও বর্তমান শতকের বিশের দশক থেকে আর্থ-সামাজিক ইতিহাসেন উপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখা হয়েছিল। খুব উল্লেখযোগ্য কিছু বই বেরিয়েছিল ৪০ এর দশকে। যেমন, বি.এন. দত্তর 'স্টাডিজ ইন ইণ্ডিযান সেসাল পলিটি' (১৯৪৪), এ. এন. বসুর 'সোসাল এ্যাণ্ড রুবাল ইকনমি অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া' (১৯৪৫), কিম্বা এস এ ডাঙ্গের লেখা 'ইণ্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম্ টু স্লেভাবি' (১৯৪৯) ইত্যাদি। তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর লেখা 'এ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি' গ্রন্থটি প্রথম এক স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা।

ভাবতবর্ষের প্রথম সামগ্রিক ইতিহাস লেখেন জেম্‌স মিল উনিশ শতকেব প্রথমদিকে। মিলের মত ছিল, হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ— এই তিন সভ্যতা ভারত ইতিহাস তৈরি করেছে। মিল অবশ্য প্রথম দুটি সভ্যতাকে মনে করতেন পশ্চাৎপদ ও স্থবির। তাই মিলের দৃষ্টিতে ব্রিটিশেব ভারত জয় এক অসাধারণ ঘটনা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভিনসেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষের যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা বদলান। স্মিথ মিলের মত সভ্যতার গুণমান বা মূলবোধের উপর জোর না দিয়ে নির্ভর করেন কালানুক্রমিকতার উপর। তাঁর লিখিত ইতিহাসের প্রাণ হল রাজবংশগুলির উত্থানপতনের পৌনঃপুনিকতা। এর ফলে হিন্দু ভারত বা মুসলমান ভারত বনাম ব্রিটিশ ভারত — এই জাতীয় চড়া সুরের ঔপনিবেশিক মনোভাব খানিকটা নরম হয়ে আসে। মিলের অবস্থান থেকে খানিকটা সরে এসে স্মিথ জোর দেন ব্রিটিশ শাসনের উপর। পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা স্মিথকে অনুসরণ করে কালানুক্রমিক বংশাবলীর ইতিহাসকে প্যারাডাইম (paradigm) হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কোশাম্বী এই প্যারাডাইম থেকে সরে আসেন। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উৎপাদন সম্পর্ককে বুঝতে গিয়ে তিনি অগ্রগতির একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর। সমাজ বিশ্লেষণের মার্কসীয়

ঘরানার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও কোশাম্বী ভারত ইতিহাসের পর্যালোচনায় নিয়ে আসেন নতুন নতুন প্রেক্ষাপটে ও নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা ইতিহাস চর্চার বিষয় ও পদ্ধতিকে আমূল বদলে দেয়। ভারতীয় বহু ঐতিহাসিক যান্ত্রিক মার্কসবাদী মডেল অনুসরণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে আদিম কমিউনবাদ থেকে দাস নির্ভর উৎপাদন ব্যাবস্থা এবং সেখান থেকে সামন্ততন্ত্র হয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যাবস্থা — ভারতের ইতিহাস ইউরোপের মতই এই চক্র মেনে আবর্তিত হয়েছিল। কোশাম্বী এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আরোপিত ও কৃত্রিম মনে করতেন। তিনি তাঁর গবেষণায় এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে ভারতীয় সমাজের ধাঁচ পশ্চিমী ধাঁচ থেকে গুণগতভাবে আলাদা একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা আর তাই তাকে আবশ্যিকভাবে ধ্রুপদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে শ্রেণীবদ্ধ করাটা নিষ্প্রয়োজন। গ্রীকো-রোমান ধাঁচের দানপ্রথা ভারতে ছিল না, ভারতীয় সামন্তপ্রথাও ইউরোপীয় প্রবণতা থেকে একেবারেই আলাদা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের সত্যকে বুঝতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা সাম্প্রতিককালে দাস প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের ভারতীয়, ঈষৎ ভিন্ন, নমুনাগুলিকেই একটি ধারণাগত কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আর এখানেই কোশাম্বীর পরিচয় ভারতের নতুন ইতিহাসের এক পথিকৃৎ রূপে।

বংশাবলীর পরিবর্তনের উপর নির্ভর ক'রে ভারত ইতিহাসের কয়েকটি যুগকে চিহ্নিত করার গতানুগতিক প্রবণতা থেকে সরে এসে কোশাম্বী মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে। এই পরিবর্তনের ধারাটি ক্রমেই মন্থর হয়ে এলে শুরু হয় কোশাম্বীর ভাষায় — ভারত ইতিহাসের সামন্ততন্ত্রের যুগ। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোশাম্বীই প্রথম এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে কাজ করেছিল ধারাবাহিকতার উপাদান হিসাবে, যাকে শ্রীনিবাস বলেছেন সংস্কৃতায়ন। কোশাম্বী এক ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ভারত ইতিহাসের বিচার করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভারতীয় অতীতকে বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে কিভাবে উপজাতি থেকে জাতিতে নিরন্তর সঞ্চারণের (transition) প্রক্রিয়াটি ক্রীয়াশীল ছিল। জানতে হবে কিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে গড়ে উঠেছিল একটি সাধারণ সমাজ। এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের মূল কারণ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে লাঙলের দ্বারা চাষের প্রচলন যার ফলে উৎপাদন পদ্ধতি বদলায়, উপজাতি এবং গোষ্ঠীর কাঠামো ভেঙে যায় এবং জাতি বা caste হয়ে ওঠে সামাজিক সংগঠনের বিকল্প রূপ। প্রশ্ন হল কৃষিকাজে লাঙলের প্রচলন করল কোন্ ঐতিহাসিক শক্তি? কোশাম্বী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য বসতি স্থাপনের ব্যাপারটিব। আঞ্চলিক বা স্থানিক আচার অভ্যাসকে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য আত্মসাৎ ক'রে ফেলে। এরই নাম সংস্কৃতায়ন।

কোশাম্বীর মতে, ভারতবর্ষে প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যবাদ। মৌর্য-উত্তর আমলে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে যাকে কোশাম্বী বলেছেন 'উঁচুতলার সামন্ততন্ত্র' বা feudalism from above'। পাঞ্জাব থেকে মধ্যবঙ্গ এবং গুজরাট থেকে

আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই সামন্ততন্ত্র চোখে পড়ে। এই সামন্ততন্ত্রে পতন ঘটলে আসে 'নীচুতলার সামন্ততন্ত্র' বা 'feudalism from below'। কোশাম্বী উঁচুতলার সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হল এমন এক অবস্থা যেখানে একজন নৃপতি বা সম্রাট তাঁর অনুগত আঞ্চলিক শাসক বর্গের কাছ থেকে 'ট্রিবিউট' আদায় করেন এবং যতদিন এইসব করদ শাসক ঠিকমত কর দিয়ে যান ততদিন নিজ নিজ এলাকায় তাঁরা স্বকর্তৃত্ব ভোগ করেন। এই করদ শাসকদের মধ্যে উপজাতি নায়করাও থাকতে পারেন। এবং এদের সকলেরই বৈশিষ্ট্য হল, এরা সাধারণভাবে কোনো প্রভাবশালী ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি শাসনক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। নীচুতলার সামন্ততন্ত্র হল এর পরবর্তী পর্যায় যেখানে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝে উঠে এসেছিল এক শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণী। ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক মানুষের উপর এদের সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক পরিষেবা প্রদানের সুবাদে এদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যস্থতা ছাড়াই। ক্ষুদ্র মধ্যাধীকারীদের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ক'রে একটি অংশ সামন্তপ্রভুদের দিয়ে দেওয়া। উঁচুতলার সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে এই স্তরের তফাৎ স্পষ্টঃ এখানে রাজকর্মচারীরা সরাসরি খাজনা আদায় করত না। উভয় ক্ষেত্রেই পুরাতন ব্যবস্থাগুলির অবশেষ টিকে ছিল একেবারে আদিম খাদ্যসংগ্রাহকের পর্যায় পর্যন্ত। কোশাম্বী মনে করেন, এই দুই স্তরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এসেছিল বাণিজ্য এবং পণ্যোৎপাদনের ধীর লয়ে বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষে উঁচুতলার সামন্ততন্ত্রের উত্থান গুপ্তযুগে, সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকে। Prime Magadhan territory অর্থাৎ মূল মাগধী অঞ্চলের বাইরে উপজাতীয় ও অন্যান্য বিজিত শাসকবর্গকে সমুদ্র গুপ্ত তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন মূলত দক্ষিণাপথের শাসকবর্গ। আপাতদৃষ্টিতে এদের পদানত করার পর সমুদ্রগুপ্ত এদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্বশাসনের অধিকার দিয়েছিলেন। বিনিময়ে এইসব বিজিত রাজন্যবর্গকে নিয়মিত শুল্ক ও আনুগত্য প্রদান করতে হত। ক্রমে ক্রমে এদের নামকরণ হয় সামন্ত — যে শব্দটি আদিতে বোঝাত সীমান্ত বা প্রতিবেশী অঞ্চলের নৃপতি বা উচ্চবর্গের করদ শাসককে। প্রচলিত ভূদান সনদগুলিকে মাপকাঠি ধরলে বলতে হয় যে আমজনতার উপর রাষ্ট্রের এতকালের অধিকার হস্তান্তরিত হয় সনদগুলির প্রাপকদের হাতে। প্রসঙ্গত কোশাম্বী গুপ্তযুগকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাননি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেদের মত তিনি গুপ্তযুগকে হিন্দু পুনর্জাগরণের সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করতে অস্বীকার করেন। তিনি শ্লেষের সঙ্গে লেখেন যে গুপ্তরা মোটেই জাতীয়তাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেননি। বরং জাতীয়তাবাদই গুপ্তদের পুনরুজ্জীবিত করেছিল। গুপ্ত-উত্তরকালে জমিদানের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার সাথে বাড়ে উপজাতি থেকে জাতিতে রূপান্তরের হার। কোশাম্বী এর কতগুলি কারণ দেখিয়েছেন। যথা, লাঙলের ব্যবহার, বাণিজ্য ও পণ্যউৎপাদনে মন্দা, সেনাবাহিনীর বিকেন্দ্রীকরণ এবং আঞ্চলিক দরবারগুলিতে সম্পদের ব্যাপক পুঞ্জীভবন। এর সাথে

জড়িয়েছিল ভক্তিবাদী ভাবনা যা আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের উপর জোর দিয়ে সামন্ত সমাজের বাতাবরণ তৈরি করেছিল।

কোশাম্বী ভারত ইতিহাসের রাজপুত আমলটিকে বিশেষত দ্বাদশ শতাব্দীকে উভয় জাতীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যবর্তী শেষ স্বীকৃত পর্যায় হিসাবে দেখেছেন। এই সময়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রাদেশিক বাজারের আবির্ভাব ঘটে এবং আঞ্চলিক সাহিত্যেরও সূচনা হয়। এই পর্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যময় নতুন সাহিত্য হল রাজস্থানের 'রস সাহিত্য' যাকে অনায়াসেই মধ্যযুগের ইউরোপের বলিষ্ঠ সৌর্যমণ্ডিত গাথাগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোশাম্বীর বক্তব্য হল, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যাকে আমরা বলি 'নীচুতলার সামন্ততন্ত্র' তা সামন্তপ্রথার সেই ঘরানাটিকেই বোঝায় যা মধ্যযুগের ইউরোপে বিরাজ করত। ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে গিয়ে জন্ম নিয়েছিল আঞ্চলিকতাবাদ, কখনো বা বিচ্ছিন্নতাবাদ। এরই নাম হয় সামন্তপ্রথা। এইভাবে শার্লামেনের পর আসে মেরোভিজিয় সামন্ততন্ত্র। কিম্বা ইংল্যাণ্ডে, স্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদের পর নরমান সামন্ততন্ত্র।

উঁচুতলার সামন্ততন্ত্রের শেষ গৌরবের কালটি হল আলাউদ্দিন খলজির শাসনকাল (১২৯৬-১৩১৬)। সামন্ততান্ত্রিক যুগের রূপান্তর শেষ হয় সুলতান ফিরোজ তুঘলকের আমলে (১৩৫১-১৩৮৮)। তিনি নীচুতলার সামন্ততন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার করেন। কোশাম্বী দেখিয়েছেন, বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গ এবং নব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল ক্ষমতার লড়াই। অন্যভাবে বললে, দু জাতীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব যেখানে শেষেরটির জয় সূচিত হয়।

এটা তাহলে স্পষ্ট যে ভারত ইতিহাসের যুগ বিভাজন করতে গিয়ে কোশাম্বী সামাজিক পরিবর্তনকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মার্কসের প্রাথমিক পর্বের বক্তব্যের বিরোধিতা ক'রে তিনি বলেছেন যে ভারতীয় সমাজেরও আছে নিজস্ব ইতিহাস ও নিজস্ব পরিবর্তনের ধারা। তাঁর সমাজ বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত এবং পদ্ধতি অপ্রথাগত। ভারত ইতিহাসের চর্চায় প্রথম থেকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেছে। একটি এসেছে western discourse বা পশ্চিমী ব্যাখ্যার ছত্রচ্ছায়ায়। অন্য প্রবণতাটি হল নিছকই প্রত্নতথ্য, মুদ্রা এবং ধ্রুপদীভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তিতে ভারতের সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা। এই দুই প্রবণতাই চরম অবস্থানসূচক এবং কোনোটিই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। কোশাম্বীই প্রথম এই দুই প্রবণতা থেকে সরে এসে একটি মৌলিক অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল 'Combined Method in Indology' বা ভারতচর্চায় মিশ্র পদ্ধতি। তিনি মনে করতেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ভাষাতাত্ত্বিক চর্চা আরো অর্থবহ হবে যদি এই চর্চায় সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং একটি উপযুক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এর সঙ্গে প্রয়োজন নিপুণ ফিল্ডওয়ার্কের। তাঁর মতে এই সমস্ত পদ্ধতির কোনো একটির দ্বারা কোন যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়, মিশ্র পদ্ধতি অপরিহার্য। তাঁর আরো মত হল, যে সব জনগোষ্ঠী একসঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করে তাদের প্রবণতাই হল একই ধরনের আচরণ

করা বা একজাতীয় চিন্তা করা, বিশেষত তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারাগুলি যদি সমান্তরাল হয়।

অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে কোশাম্বীর তফাৎ এইখানে যে তাঁর মূল ভিত্তি হল একটি সামগ্রিক তাত্ত্বিক কাঠামো যার সাহায্যে তিনি ভারত ইতিহাসের সামগ্রিকতাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। কোশাম্বী ধ্রুপদী মার্কসবাদী। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য বা নিজস্বতা এইখানে যে তিনি ভারত ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত মার্কসবাদী মডেলের মধ্যে কৃত্রিমভাবে তথ্য সাজিয়ে যাননি ববং একটি সম্ভাব্য ও নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কসবাদী পদ্ধতিকে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি নিজেই বলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য মার্কসবাদকে প্রমাণ কবা বা ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করা নয়, বরং পেশাদার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। ইউরোপ এবং আমেরিকার লিবেরাল ঐতিহাসিকরা এবং এ দেশের মার্কসবাদী বহু বুদ্ধিজীবী কোশাম্বীর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও মস্কোর ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটে হিন্দুধর্মের ইতিহাসের উপর বলার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন।

কোশাম্বী মনে করতেন, শহর থেকে দূরে গ্রামীণ জীবনে ভারতীয় কৃষকরা তাদের জীবনচর্যার কারণে ভারতীয় পুরাণগুলির রচনাকালের সঙ্গে যতটা একাত্মবোধ করে, ব্রাহ্মণ পুরাণকারদের উত্তরসূরীরা ততটা করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই জাতীয় প্রভেদকে গুরুত্ব দেননি যা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। বহু বিদেশী পণ্ডিতও এই ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রবণতার শিকার হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী সূত্রগুলির উপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন, আর তাই কিংবদন্তী ও বাস্তবের মধ্যে তফাৎ ক'রে উঠতে পারেননি। কোশাম্বী এই আরামকেদারা পাণ্ডিত্যের এবং অনুমান নির্ভর লেখালেখির কঠিন সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত হল, আমাদের উচিত ইতিহাস দর্শনের অন্য কোন মাধ্যম খুঁজে নেওয়া যাতে বিশেষ কোন সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন সুনিশ্চিতভাবে তোলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তিনি ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনগুলির কালানুক্রমিক বিকাশ বলে। তাঁর দৃষ্টিতে অন্য যে কোন ধরনের ইতিহাসই আসলে নিছক সুপারস্ট্রাকচারের কারবারী, মৌলিক বিষয়গুলির নয়। এভাবে দেখতে পারলে যতটুকু তথ্যসংগ্রহ সম্ভব তার ভিত্তিতেই ভারতীয় ইতিহাসকে প্রামাণ্যতা দেওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে কোশাম্বী উপজাতি বা আদিবাসী সংস্কৃতিগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং বিশেষ ক'রে সেইসব পর্যায়গুলির উপর আলো ফেলেছেন যার মধ্যে দিয়ে উপজাতিকে ছাপিয়ে একটি সাধারণ ভারতীয় সমাজের উত্তরণ ঘটেছিল। এই উত্তরণের ইতিহাস প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পাঠ। আদিম উপজাতি অঞ্চলের বুকে গ্রাম পত্তন কিছুটা ঘটেছিল প্রত্যক্ষ বিজয়ের দ্বারা, অনেকটা নিঃশব্দ আত্তিকরণ দ্বারা এবং কিছুটা

ব্রাহ্মণ্যবাদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে উপজাতি নায়কদের সর্বাত্মক শাসক হয়ে ওঠার মাধ্যমে। এইভাবে প্রচলিত মডেল থেকে সরে এসে কোশাম্বী ভারত ইতিহাস সম্পর্কে এমন একটি বক্তব্য তুলে ধরেন যা কতগুলি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে — আজকের ভারত কীভাবে এবং কেন আজকের অবস্থায় পৌঁছাল সে বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছে। তিনি একটি নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো উপহার দিয়েছেন যা অন্যত্র প্রযুক্ত যান্ত্রিক মতাদর্শ থেকে ধার করা নয়। বিবিধ উপাদান ব্যবহারে তাঁর প্রশ্নাতীত দক্ষতা এবং তাঁর বৌদ্ধিক স্বকীয়তাই এর ভিত্তি। নতুন নতুন তথ্যের আলোয় কোশাম্বীর ব্যাখ্যার পরিবর্ধন বা সংশোধন হয়ত সম্ভব, কিন্তু তথাপি তাঁর তোলা প্রশ্নগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন ভারতের নবতর গবেষণার আলোয় পুনর্মূল্যায়ন করতে হলে তা করতে হবে কোশাম্বী প্রদর্শিত পথেই।

ঔপনিবেশিক আমলে একটি নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ইতিহাসের একটি বুর্জোয়া ব্যাখ্যার অভ্যুদয় ঘটে। এই ব্যাখ্যায় ইউরোপ থেকে ধার করা মাপকাঠি, যুক্তিবাদ ও বিচারবোধের নিরিখে প্রাচীন হিন্দু ভারতকে অসামান্য গৌরব দান করা হয়। অথচ ভারতের ইতিহাসের একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য এখানে অনুপস্থিত। তা হল জাত ও শ্রেণীর নামে ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান শোষণ। কোশাম্বী লিখেছেন, ইতিহাসের এই বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চারই নামান্তর এবং এর কোন যুক্তিগ্রাহ্যতা নেই।

সূত্র নির্দেশঃ

১) D D Kosambi An Introduction to the study of Indian History Bombay 1956

২) D D Kosambi The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline London 1965

৩) Romila Thapar Interpreting Early India Delhi. 1992

বাঙালির খাদ্যাভ্যাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রণব রায়

বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যায় খাদ্যাভ্যাস এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। খাদ্যাভ্যাসের বনিয়াদ ও বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলের মধ্যে। ভারতের অন্যান্য উপকূলবর্তী রাজ্যের মতো বাংলার অনেকটাই নদী-নালার পলিমাটি দিয়ে গড়া। কিছু কিছু পার্বত্য অঞ্চলকে বাদ দিয়ে এই রাজ্যের পলিমাটি-প্রধান অঞ্চলে ধান, ডাল ও নানা প্রকার শাক-সব্জির প্রাচুর্য বাঙালির খাদ্যব্যবস্থাকে প্রাচীনকাল থেকে লক্ষণীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে আসছে। নদী-নালায় ভরা বাংলায় মাছের উৎপাদনও বেশি। তাই স্বভাবতই বাঙালির মৎস্যপ্রীতি ও আমিষলোলুপতা খাদ্যাভ্যাসের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাঙালির খাদ্যব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় আমাদের প্রধান উৎস হ'ল প্রাচীন সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যেগুলির মধ্যে সেযুগের খাদ্যচিত্রের এক সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। এছাড়া প্রাচীন কোন কোন শিলালেখ এবং অন্তমধ্যযুগের 'টেরাকোটা'- ভাস্কর্যের মধ্যেও খাদ্যচিত্রের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। ভালো বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে ধান, যব, আখ প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। প্রাচীন শিলালেখে এই শস্যগুলির যে উল্লেখ আমরা পাই, তা থেকে এই অঞ্চলে খাদ্যচিত্র সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। বাংলায় সর্বপ্রাচীন যে শিলালেখটি মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত সেটি মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ। অশোকের শিলালেখের ব্রাহ্মী অক্ষরের সঙ্গে এর মিল আছে। এটি একটি রাজাদেশ। সম্ভবতঃ কোন মৌর্যসম্রাট ঐ আদেশটি পুন্দনগলের বা পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে দিয়েছিলেন। আদেশের মধ্যে একস্থানে বলা হয়েছে, রাজশস্যভাণ্ডার থেকে দৈবদুর্বিপাকের জন্যে কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় ছবগ্গীয় ভিক্ষুদের ধান দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই ধান ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়[১]। পরবর্তীকালের আরও বহু লিপিতে ধান্য শস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালি যে প্রধানতঃ ধান্যোপজীবী ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এর বহু পরবর্তীকালে লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর—এই চারটি তাম্রশাসনের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে[২]। ঐ শ্লোকে কামনা করা হয়েছে, মেঘ যেন 'তোমাদের শ্রেয় শস্যের অঙ্কুরোদ্‌গমের কারণ' হয়। ধানের মধ্যে শালিধান ছিল বিশেষ জনপ্রিয়। 'আনুলিয়া-শাসনে শালিধান্যের উল্লেখ আছে। এছাড়া 'ব্রীহি' নামে আর এক প্রকার ধানও প্রচুর জন্মাত। শালিধান

প্রধানতঃ হেমন্তের ফসল ছিল[১]। আম, মহুয়া, আখ, লবণ ও মাছ প্রাচীন বাংলায় প্রচুর উৎপন্ন হ'ত। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্র শাসন এবং নারায়ণ পালের বাগলপুর লিপিতে এগুলির উল্লেখ আছে[২]। 'লবণাকর', 'সহকার' বা আম এবং 'মধুক' বা মহুয়া শব্দগুলি ঐসব 'শাসন' ও 'লেখতে' পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় আখ ও আখ থেকে প্রস্তুত খণ্ড, চিনি, গুড় দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিল। ধানের পর শস্যদানার মধ্যে যবের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। এখনকার মতো গমের ব্যবহার তেমন ছিল না। কিন্তু গম অজানা ছিল না। কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী 'রক্তমৃত্তিকা' বিহারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাটি খুঁড়ে গম পাওয়া গেছে[৩]।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র একটি শ্লোকে (২/১৬৬/৫) বলা হয়েছে, গ্রামসীমান্তের ক্ষেতে যে প্রচুর যব হয়েছে তার শীষ নীলপদ্মের মতো স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ। শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে, গ্রামগুলি গুড়ের গন্ধে আমোদিত[৪]। খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যে লেখমালা পাওয়া গেছে সেগুলি এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ধান ও অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাংলার প্রধান ভূমিকৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য ছিল আম, মহুয়া, পনস বা কাঁঠাল, আখ, ডালিম, পর্কটি, খেজুর, বীজ, গুবাক বা সুপুরি, নারিকেল, পান, মাছ ও লবণ[৫]। সুয়ান সোয়াঙ্ (হিউয়েন সাঙ) বলেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে প্রচুর কাঁঠাল জন্মাত এবং সেখানে ঐ ফলের খুব আদর ছিল। লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর লেখতে ডালিম ক্ষেতের কথা জানা যায়। এর অবস্থান ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার বেতড় গ্রামের কাছে গঙ্গার ধারে। বীজফল ও খেজুরের উল্লেখ ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে পাওয়া যায়। কদলী বা কলার উল্লেখ লেখে তেমন না পেলেও বাংলাদেশের পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা প্রস্তরভাস্কর্যে ফলসমন্বিত বা ফলহীন কলাগাছের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির 'কীর্তিকৌমুদী' গ্রন্থে গৌড়দেশকে 'আজ্যসার গৌড়' বলে বিশেষিত করা হয়েছে। এর অর্থ হ'ল, গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল 'আজ্য' অর্থাৎ গলানো ঘি।

ওপরের আলোচনায় প্রাচীন লেখমালা থেকে বাংলায় বহুল ব্যবহৃত খাদ্যশস্য ও ফলাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া যায়। এগুলি থেকে সেকালের বাঙালির প্রিয় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। কিন্তু লেখ ছাড়া প্রাচীন সাহিত্যে সেকালের খাদ্যবস্তু সম্পর্কে আমরা আরও বেশি ধারণা করতে পারি। সংস্কৃতে রচিত চক্রপাণিদত্তের 'চিকিৎসা সংগ্রহ', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী', কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', অনিরুদ্ধভট্টের 'হারলতা', ভবদেবভট্টের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ', সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'কলাবিবেক', কৃত্যতত্ত্বার্ণব এবং শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' কাব্য থেকে প্রাচীন বাঙালির খাদ্যাভ্যাস-সম্পর্কে অনেক চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাই। এছাড়া অপভ্রংশে রচিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' গ্রন্থেও বাঙালির খাদ্যসম্পর্কে কিছু জানা যায়। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির প্রায় সব গ্রন্থকারই ছিলেন বাঙালি। তাই ঐ গ্রন্থগুলি থেকে প্রাচীন বাংলায় খাদ্যব্যবস্থা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে[৬]।

আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে আমরা সাধারণ গ্রামীণ বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যের কথা জানতে পারি। সেই খাদ্য তালিকায় আছে নতুন চালের ভাত বা টাটকা গরম ভাত ('নবৌদনি') কচি সরিষা শাক ('তরুণং সর্ষপশাকম্'), হড়হড়ে দই এবং সস্তায় বা অল্পখরচে মিষ্টি । এর আরও পরে আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা এক কবির অপভ্রংশে রচিত একটি শ্লোক থেকে জানা যায়, সাধারণ অল্পবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক ভোজনপর্ব হ'ত কলাপাতায় ঢালা 'ওগ্‌রা' বা ফেনফেনে গরম ভাত, তার সঙ্গে একটু গাওয়া ঘি ও দুধ, ময়না মাছ ও নালিতা শাকগুচ্ছ দিয়ে··। 'কলাবিবেক' ও 'কৃত্যতত্ত্বার্নব' গ্রন্থে চিপিটক বা চিঁড়ার সঙ্গে নারকেলের শাঁস ও মিষ্টান্ন সহযোগে খাওয়ার উল্লেখ আছে কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে।

প্রাচীন বাঙালির খাদ্যব্যবস্থায় নিরামিষ ও আমিষ দু'প্রকার খাদ্যই জনপ্রিয় ছিল। তবে ভবদেবভট্টের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ', সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' এবং বাংলার অপরাপর স্মৃতিকারদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গোঁড়া কিছু ব্রাহ্মণ, হিন্দু বিধবা, কিছু বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী এবং কিছু জৈন ও বৌদ্ধ গৃহী ছাড়া বেশিরভাগ বাঙালি আমিষভোজী ছিলেন। নিরামিষের মধ্যে সুসিদ্ধ অন্নের সঙ্গে বিভিন্ন শাক, সব্জী ও ডালের ব্যবহার ছিল। চক্রপাণিদত্ত (খ্রী: একাদশ শতক) রোগীদের শরীরের পক্ষে যে খাদ্যকে হিতকর বলেছেন তা হ'ল সুসিদ্ধ অন্নের সঙ্গে পলতা শাক এবং পায়রা বা হরিণের মাংসের ব্যঞ্জন। বেতের ডগার তরকারিও এক্ষেত্রে বিহিত ছিল। সব্জীর মধ্যে চলিত ছিল বার্তালু, পটোল বা কুলক, মূলক, কারবেল্লক, করেলা বা করলা, কর্কোটিক বা কাঁকুড়। বার্তালু বা বেগুন 'বাতিঙ্গন' ও 'শাকবিল্ব' নামেও পরিচিত ছিল। চক্রপাণিদত্ত তাঁর 'চিকিৎসাসংগ্রহে' কয়েকটি সব্জীর ব্যঞ্জন ও ডালকে শরীরের পক্ষে পথ্য বলে নির্দেশ করেছেন। এগুলো হ'ল, পটোল শাক বা পলতা, বার্তাকু, বালমূলক, করবেল্লক প্রভৃতি। মুদ্‌গ, মসুর, আঢ়ক, মাষক, চণক ও কুলত্থের ডাল রোগীর পক্ষে হিতকর ছিল। গোজিহ্বা এবং বাস্তুক শাকও সেসময় জনপ্রিয় ছিল। খাদ্যতালিকায় অন্যান্য শাক যেমন, সুনিষন্নক (শুসনি), চাঙ্গেরী (আমরুল শাক), কলম্বী (কল্‌মি), হেলঞ্চ বা হিলমোচিকা (হিংচে) পথ্য ছিল। চক্রপাণিদত্ত ডালের যে 'পঞ্চামৃত যূষে'র কথা বলেছেন, সেগুলি হ'ল কুলত্থ, মুদ্‌গ, আঢ়ক (অড়হর), মাষক (মাষ) ও নিষ্পাব (রাজশিম্বী)[১১]।

প্রাচীনকালে বাঙালির আমিষ খাদ্যের তালিকায় পাওয়া যায় প্রথমে নানা রকম মাছ, যেমন রোহিত (রুই), মদ্‌গুর (মাগুর), শাল, রাজীব, শকুল (শোল), শফরী (পুঁটি), নলমীন (সম্ভবতঃ গাংধাড়া) এবং শৃঙ্গী (শিঙি)। এর মধ্যে রোহিত মৎস্য ছিল আকার ও স্বাদের ক্ষেত্রে মাছের রাজা। ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্বে' ঐ মাছগুলির নাম পাওয়া যায়। সর্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় বাঙালি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কর্কটক বা কাঁকড়া, কচ্ছপ এবং বৃহৎ তিমি মৎস্যেরও উল্লেখ তিনি করেছেন[১২]। সর্বানন্দ তাঁর গ্রন্থে 'শ্রীবাস'[১৩] নামে একটি খাদ্যের কথাও বলেছেন। এটি এক ধরনের পরমান্ন বা

পায়সের নাম। সেসময় ঐ খাদ্য প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে বাংলায় 'সিন্দুকী' বা শুঁটকি মাছের একরকম ব্যঞ্জন চলিত ছিল। এটি বঙ্গালদেশ অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ বা পূর্ব বঙ্গের দক্ষিণাংশের অধিবাসীর প্রিয় ব্যঞ্জন ছিল[১]। মৈলি বা মৌরলা এবং মৈনি বা ময়না মাছের উল্লেখও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতকে নির্মিত বাংলাদেশের পাহাড়পুরের মন্দিরে (রাজশাহী জেলা) দুটি টেরাকোটা-ফলকের একটিতে মাছকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে রন্ধনের জন্য প্রস্তুত করার চিত্র এবং অপর একটি ফলকে বিক্রির জন্য কোন এক মৎস্য বিক্রেতার ঝুড়িভর্তি মাছ নিয়ে যাওয়ার একটি দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়[১]।

প্রাচীন বাংলার খাদ্যসম্পর্কে আরও কিছু ধারণা করা যায় ভবদেবভট্টের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' গ্রন্থ থেকে। সেসময় ভাত, মাছ, মাংস, ফলমূল, শাক-সব্জী এবং দুধ বাঙালির খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়, পঞ্চনখী প্রাণীর মধ্যে গোধা, কচ্ছপ, শজারুর মাংস ভক্ষ্য ছিল। প্রিয় মাংস ছিল ছাগল, ভেড়া, হরিণ, পায়রা, ও শশকের। জীমূতবাহনের 'কলাবিবেক' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সেযুগেও এখনকার মতো ইলিশমাছ ও তার তেল বাঙালির বেশ প্রিয় ছিল। শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' কাব্যে নলদময়ন্তীর বিবাহের ভোজে প্রচুর শাক-সব্জী, মাছের বিভিন্ন পদ; ছাগ, মেষ ও হরিণের মাংস, নানা প্রকারের পিঠা, সুগন্ধি পানীয়, তাম্বুল প্রভৃতি পরিবেশিত হয়েছিল। এখানে খাদ্যের যে অনেক পদের উল্লেখ আছে সেগুলি হ'ল ওদন, পলান্ন, শর্করোদন, অপূপ, বিচিত্রা (মাছের একটি সুন্দর পদ), তেমন (মৃগমাংসের একটি পদ), মৎসিকম্ (কতকটা দইমাছ), পুষ্পভঞ্জিকা (দই ও মসলাসহযোগে পুষ্পবিশেষের রান্না, সম্ভবতঃ এখনকার দই ফুলকপির মতো কোন পদ), আমিষম্ (একধরনের সবজিমিশ্রিত টকের ডাল-কতকটা দক্ষিণ ভারতীয় 'সম্বরম্' জাতীয়), সুক্তিকা (এখনকার সুক্তোর মতো পদ), পৌস্তিকম্ (শাক ও ছানামিশ্রিত এক ধরনের পদ, 'শাক পনিরে'র মতো কোন পদ)। মিষ্টান্নের মধ্যে ছিল 'দলোদর' (ভিতরে পুরযুক্ত ময়দার তৈরি ঘিয়েভাজা মিষ্টি), করম্ভ ('সশর্করগোধূমচূর্ণ-মণ্ডিত দধিপক্কাবিশেষ'), কোলকার, ক্ষীরবট (দুগ্ধপক্কমাষনিষ্পাদিত - বটকাখ্যপিষ্টক বিশেষ), লড্ডুক (বর্তুলাকৃতি মিষ্টান্নবিশেষপিণ্ডযুগ্ম), মণ্ডক, বর্ষোপল ইত্যাদি। নৈষধচরিতকাব্য রচয়িতা শ্রীহর্ষ ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙালি কবি। দময়ন্তীর বিবাহে পরিবেশিত ঐসব খাদ্য সেকালের ধনীগৃহের ভোজসভার কিছুটা পরিচয় দেয়[১৮]।

নিরামিষ ও আমিষের বহু পদ ছাড়া প্রাচীন বাংলায় মিষ্টান্ন কম ছিল না। তবে এখনকার মতো মিষ্টান্নের অজস্র পদ তখন ছিল না। যে মিষ্টান্নটি বেশি পরিচিত ছিল তার নাম খণ্ড বা খাঁড় (খণ্ড গুড় থেকে তৈরি মিছরি জাতীয় শক্ত মিষ্টান্ন)। এই মিষ্টান্নটি মধ্যযুগের বাংলায় প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হ'ত। এর পর অন্যান্য মিষ্টান্ন হ'ল, 'লড্ডুক' বা নাড়ু (একজাতীয় শক্ত মিষ্টান্ন), 'মোদক' (বাঁধানো নরম মিষ্টি), খাজা (মুড়মুড়ে মিষ্টি), ফেনি (বাতাসা), কদমা (কদমফুলের আকারের চিনিজাত মিষ্টান্ন), খিরিস (ক্ষীরের মিষ্টি), খণ্ডশালুক (নবাত বা তিলুয়া)। সর্বানন্দ বলেছেন, এটি ছিল আখের

গুড়ের টুকরো মিছবির বা পাটালির মতো মিষ্টান্ন। এর আর এক নাম ছিল 'মৎস্যণ্ডী'। তিনি আরও বলেছেন, বিশেষ এক রকম আখের রস থেকে এই জিনিস তৈরি হ'ত। ('ইক্ষুবিশেষস্য রসপাকে খণ্ডযোগে যা সা সারভূতা গুটিকাকারা জায়তে সা') পিঠা (সংস্কৃত পিষ্টক), দুধশাকর (দুগ্ধশর্করা বা চিনির পায়েস) সেযুগে প্রচলিত ছিল। মিষ্টান্ন, পিষ্টক ইত্যাদিকে সেসময় বলা হ'ত ছন্দ বা ছন্দক। যারা ছন্দ তৈরি করত সর্বানন্দের উল্লেখ অনুসারে তারা ছিল 'ছন্দবার'[১]। সেসময় আরও কয়েকটি খাদ্য প্রচলিত থাকার কথা জানা যায়, যেমন 'শিখরিণী' (ঘি, দই, গুড় ও আদা দিয়ে তৈরি একধরনের খাদ্য), দ্রগড় অর্থাৎ পাতলা দই, 'হাদুস ভাদুস' বা 'ওলভ' (অর্থাৎ যব বা ছোলার শিষ বা গাছকে ঝলসিয়ে যে খাদ্য প্রস্তুত হ'ত), 'ভড়িত' (শিককাবাব) এবং 'ওড়শিআ' (চাটনির মতো মুখরোচক ব্যঞ্জন)[১]। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লিখিত সেকালের বাঙালির আহারের ক্রম ছিল, প্রথমে ভাত ও ঘি এবং শাক-সব্জী ও পরে তরি-তরকারি। সবশেষে প্রিয়খাদ্য ছিল দুধ-ভাত। অবশ্য হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, প্রথমে মিষ্টান্ন দিয়ে আরম্ভ, পরে নোনতা ও টক স্বাদযুক্ত খাদ্য এবং সবশেষে ঝাল ও তিক্তস্বাদযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে[১]। রসায়ন অধিকারে ('চিকিৎসা সংগ্রহ') চক্রপাণি বলেছেন, প্রথমে দুধ পান করতে হবে, তার পরে ভালো ক'রে সিদ্ধ ঝরঝরে শালিধানের চালের ভাত, তাতে প্রচুর ঘি দিতে হবে আর পক্ষিমাংসের সহযোগে খেতে হবে। মাংস পাওয়া না গেলে বড় মাছ যেমন, রুই, মাগুর, শোল পুড়িয়ে খেতে হবে।

প্রাচীন বাংলায় উপরিউক্ত খাদ্যবস্তুর বিবরণী থেকে সেযুগের বাঙালির বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা গেলেও মধ্যযুগে খাদ্যের যে অজস্র পদ ও বিচিত্র রন্ধনপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তার পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। আরও লক্ষণীয়, স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য নানারকম মশলার ব্যবহার এই সময়ে হতে থাকে।

সুলতানী আমলের মাঝামাঝি সময় থেকে আঠার শতক পর্যন্ত বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঐ কালের সাহিত্যের মধ্যে তার প্রতিফলন সব চেয়ে বেশি পড়েছে। পাক-প্রণালীর মধ্যে বৈচিত্র্যও এসেছে বেশি ক'রে। ভোজ্যদ্রব্যের বিপুল সমারোহও লক্ষ্য করার মতো। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে সুয়ান সাঙ (হিউয়েন সাঙ্) বাংলার ভোজের সময় প্রচুর আয়োজনের কথা উল্লেখ করলেও সুলতানী আমলে গৌড়ের এক মুসলমান বাড়িতে নিমন্ত্রিত পর্যটক মানরিককে এত ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হয়েছিল যে সেগুলি খেতে তাঁর তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। কিন্তু মানরিক এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে গরিব লোকেরা সেসময় ভাত, লবণ, শাক ও অল্প কিছু তরকারির ঝোল খেত। কখনও কখনও দই ও সস্তা মিষ্টিও খেত। বাঙালির প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। মুসলমান-শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়ার দিকে ভাতের সঙ্গে প্রধান তরকারি ছিল ডাল। ভোজের সময় নানারকমের ডাল রান্না করা হ'ত। কিন্তু পরে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়[১]।

আদি-মধ্যযুগের বাংলায় প্রাচীনতম সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধিকার দ্বারা প্রস্তুত অম্বলব্যঞ্জনে 'বেশোআর' বা বাটা মশলা দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু তা অমনোযোগিতার জন্য আবার রাধিকা কৃষ্ণের বাঁশির আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে 'ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ। বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল'[১] ।। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রথমে মাণিক দত্তের (আ. ১৪৫০ খ্রী:-১৪৮০ খ্রী:) চণ্ডীমঙ্গলে কিছু নিরামিষ খাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, দই, দুধ, গুড়, চিড়া, উখ্ড়া, মণ্ডা, বাতাসা, মর্তমান কলা, পান, গুয়া। ঐ কাব্যের একস্থানে আছে, খুল্লনা রন্ধন ক'রে ধনপতিকে থালে অন্নব্যঞ্জন, অম্বল ও দধিদুগ্ধ পরিবেশন করেন। ব্যঞ্জনের মধ্যে নানা রকমের শাক পালঙ্ক (পালং), গিমা, হেলেঞ্চা বা হিংচা, কলম্ব (কল্মি), তিত পোরলা, শীতল গিমা, পুঁই, গান্ধারি খুরিয়ার শাক ও বথুয়ার নাম পাওয়া যায়। পনের শতকের একেবারে শেষ দিকে লেখা বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' আমিষ ও নিরামিষ দু'প্রকার খাদ্যেরই চিত্তাকর্ষক উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নিরামিষের মধ্যে লাউএর আগা, কুমারের ডগা, পুঁইশাক, সোনাকচু, পাণিকচু, তেলাকচু, গিমা, ওকরা, থানকুনি, খাসিয়া, পলতা প্রভৃতি শাকের তরিতরকারির উল্লেখ আছে। নারকেলকোরা দিয়ে মুগের সূপ তখন খুবই মুখরোচক ছিল। এছাড়া কলাইএর ডাল, ঝিঙা ও কাঁঠালবিচির তরকারি, নারকেলকোরা দিয়ে বটবটী, আদা ছেঁচা দিয়ে বাথুয়া শাক পাক, কটু তেলে (সরষের তেল) গিমাশাক পাক মুখরোচক ছিল। 'সাজা কটু তেলে' বহিল মাছের 'খই' বা ভাজা, চ্যাঙ্ মাছের মিঠে আমের বৌল, কলার মূল দিয়ে পিপলিয়া শৌল (শোল মাছ), কই মাছের সঙ্গে মরিচের ঝোল, জিরামরিচ বটনা দিয়ে চিতলের 'কোল' বা পেটি. উপল মৎস্যের কাঁটা বেছে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে সুস্বাদু ব্যঞ্জন তৈরি হ'ত। 'আদামাগুরী' রাঁধতে হলে মাগুর মাছ কেটে আদার রসে পাক করতে হ'ত। সেসময় দক্ষিণ সাগর কলা দিয়ে ফালা ফালা ক'রে কাটা ইলিশের ঝোল রান্না করা হ'ত[২]।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যযুগে বাঙালির খাদ্যাভাসের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এই কাব্যে উল্লিখিত বাঙালির রসনাতৃপ্তকর ব্যঞ্জনের পদগুলি হ'ল, নিম, শিম ও বেগুনের তিতো, কুমড়া ও বেগুনের শুক্তা। ভাজার মধ্যে সরষের তেলে বাথুয়া শাক, লাউডগা ও ছোলাশাক ভাজা, চোঁয়া চোঁয়া ক'রে পলতা ও কাঁকড়ি ভাজা, 'মীনচড়চড়ি', কুসুমবড়ি, সরলপুঁটি, শফরী ও চিংড়িমাছ ভাজা, সরষে শাকে বেসম মেখে ভাজা, ঘিয়ে কড়া ক'রে ফুলবড়ি ভাজা, নালিতার শাককে (পাটশাক) ঘিয়ে জবজব ক'রে ভাজা, সরষের তেলে চিতলের পেটি ভাজা প্রভৃতি বহু প্রকার ভাজার উল্লেখ আছে। ডালের মধ্যে ছোলা ও মুগের সঙ্গে 'খণ্ড' মিশিয়ে যে ডাল তৈরি হ'ত, তা ছিল উপাদেয়। আমড়ার সঙ্গে পালং, থোড়, উডুম্বর (ডুমুর) ও ইচলি মাছের (চিংড়ি মাছ) তরকারি, বোদালি মাছ (বোয়াল) ও হেলঞ্চ শাককে কাঠি দিয়ে পাক ক'রে তার সঙ্গে ঘন বাটনা মিশিয়ে তৈলে সন্তোলন, গোটা কাসুন্দীকে জামিরের (এক ধরনের টক বুনো লেবু) রসে পাক, মরিচের ঝালের সঙ্গে পুঁইশাক, মুখী কচু ও কিছু ফুলবড়ির তরকারি, মান ও বড়ির সঙ্গে মরিচ গুঁড়ো দিয়ে তরকারি প্রভৃতি আরও বহু নিরামিষ আহার্যের উল্লেখ আছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম সেকালে বাঙালি রমণীর সাধভক্ষণের সময় যেসব মুখরোচক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হ'ত, তারও উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে পান্তাভাত ও বাসী তরকারি, খরভাজা বাথুয়া শাক, লাউএর ডগা ও ছোলাশাক ভাজা, ফুলবড়ি দিয়ে ছোট মাছের চচ্চড়ি, সরল পুঁটি ও চিংড়িমাছ ভাজা, পাকা চাঁপা কলা; খই, চিনি ও মহিষা দই এর ফলার; শালিধানের অন্ন; আমড়া, পাকা চালতা, আম্‌সী, কাসুন্দী, কুল ও করঞ্জার টক; খোড়, ডুমুর ও ইচলি মাছের ব্যঞ্জন; ক্ষীর, নারিকেল ও তিলের পিঠা; দুধ, গুড় ও তিল মিশিয়ে লাউএর ব্যঞ্জন; দইএর সঙ্গে ক্ষুদসিদ্ধ, চাঁপাকলা ও দুধের সর দিয়ে চিঁড়া, 'পোড়ামাছে জামিরের রস', লবণ মিশ্রিত নকুল ও গোধিকাপোড়া, হাঁসের ডিমের বড়া, রাইখড়া ভাজা; মূলা, বেগুন, শিম ও নিমের সঙ্গে ডুমুরের তরকারি, ক্ষীর ও নারিকেল ছাঁই দিয়ে পিঠা, আম দিয়ে মুসুরির ডাল, পোড়া কাসুন্দীর সঙ্গে শকুল মাছের পোনার অম্বল ইত্যাদি[১১]। কবিকঙ্কণের কাব্যে আরও অনেক প্রকার ব্যঞ্জনের আকর্ষণীয় পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে পিঠাজাতীয় কয়েকটি খাদ্যের নাম—কলাবড়া, মুগশাউলি, ক্ষীরমোন্‌না, ক্ষীরপুলি উল্লেখযোগ্য।

মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গলে' (খ্রীঃ ১৮ শতক) খাসী মাংস ভাজা, শাক, শুক্তা, ক্ষীরখণ্ড, লাড়ু, লুচি, চাঁপাকলা ও চিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে' (খ্রীঃ ১৭ শতক) ধর্মের পূজায় কাঁদি কাঁদি চাঁপাকলা, পিষ্টক, পায়স, ক্ষীর, উত্তম মহিষা দধি, ক্ষীরখণ্ড, চিনি, শর্করা, সন্দেশ, মধু ও মর্তমান কলার উল্লেখ আছে। আমিষ খাদ্যের মধ্যে মাংসের ঝোল, মাংসভাজা, হাড়ের মাজা দিয়ে বড়া, আদারসে মাংসের পিঠা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে লেখা 'শেকশুভোদয়া'য় অমৃতান্ন ও পরমান্নের উল্লেখ আছে। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে নিরামিষ ও আমিষ ভোজ্যদ্রব্যের অজস্র পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিরামিষের মধ্যে আছে বেতের ডগা সিদ্ধ ক'রে শুক্তো, পাট শাকভাজা, ঘিয়ে ভাজা হেলঞ্চ শাক, মুগডাল, মুগের বড়ি, তিলবড়া, তিলকুমড়া, ঘিয়েভাজা সিঙ্গারি, মউয়া আলু, পোরলতার শাক ও আদা দিয়ে শুখত ও শুকতুনি এবং পাকা কলার অম্বল। আমিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে আছে বেসন দিয়ে চিতলের পেটি ভাজা, মাগুর মাছ দিয়ে মরিচের ঝোল, বড় বড় কইমাছে কাটার দাগ দিয়ে জিরা ও লবঙ্গের বাটনা বা গুঁড়ো মাখিয়ে ভাজা, মহাশোলের অম্বল, ইচা মাছের রসলাস, রুইমাছের মুড়ো দিয়ে মাষকলাইএর ডাল, আম দিয়ে কাতলা মাছের টক, পাবদা মাছ ও আদা দিয়ে শুকতুনি, আমচুর দিয়ে শোলমাছের পোনার টক, বোদালি (বোয়াল) মাছের তেঁতুল ও মরিচ দিয়ে ঝাটী, ইলিশ মাছ ভাজা; খাসী, হরিণ, মেষ, পায়রা, কেঠো, কচ্ছপ প্রভৃতি মাংসের ব্যঞ্জন ও অম্বলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যঞ্জন ছাড়া খিরিসা বা ক্ষীরের পিঠা, চন্দ্রপুলি, মনোহরা, নালবড়া, চন্দ্রকান্তি, পাতপিঠা সেসময় চলিত ছিল[১২]।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে লেখা রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যে পঞ্চাশব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন, ঘৃত, দধি, পিষ্টক, লড্ডুক, শুক্তা, সুপ, দশরকমের ভাজা, পিঠার

সঙ্গে সরস পায়স প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিষ্টান্নের মধ্যে ..ড়, মুড়কি, ক্ষীরখণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ আছে ।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে অন্নদার রন্ধনে বহু পদের কথা জানা যায়। তালিকা বেশ দীর্ঘ। তার মধ্যে শড়শড়ি, ঘণ্ট, অনেক রকমের শাকভাজা, খন ছোলা, অড়হর, মুগ, মাষ, বরবটী, বাটুল ও মটরের ডাল, বড়া, কলা, মূলা ও নারকেল ভাজা; দুধ ও থোড়ের ডালনা; শুক্তানি, চিনির রসে কাঁঠালের বীজ; তিল ও পিঠালি দিয়ে লাউ, বেগুন ও কুমড়ার তরকারি প্রভৃতি উল্লেখ্য। আমিষের মধ্যে কাতলা, ভেটকি, রুইএর ঝাল ও শিকপোড়া, চিতল, ফলুই, রুই ও মাগুরের ঝাল ও ঝোল; সোনখড়কীর ঝোল ও ভাজা, বাগদার ঝাল, রুই কাতলার কণ্ঠা ও মুড়োর ঝাল, পচামাছে তিতো দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে রান্না, শোলমাছে আম দিয়ে ঝোল ও চচ্চড়ি, আদারসে ফুলবড়ি দিয়ে আড়িমাছের ব্যঞ্জন, রুই-কাতলার তেলে তৈলশাক রন্ধন, মাছের ডিমের বড়া, বাচ্চামাছের ঝোল, খয়রা মাছ ভাজা, কাছিম ডিমের বড়া ও সেদ্ধ (এর নাম 'গঙ্গাফল'), কচি ছাগ ও মৃগমাংসের ঝাল, ঝোল ও রসা; কালিয়া, দোলমা, বাগা, সেকচী, সমসা, অন্নমাংস, শিকভাজা ও কাবাব। পাঁঠার মুড়োর ভেতরে মশলা পুরে রান্নারও উল্লেখ আছে। আচারের মধ্যে আম, আমসত্ত্ব, আমসি, চালিতা, তেঁতুল, কুল, আমড়া ও মন্দারের অম্বল তখন বেশ চলত। খেচরান্ন বা খিচুড়ি এবং ভাতের জন্য নানারকম চালের উল্লেখ পাই — যেমন, আগু, বোরো, আমন, দলকচু, ওড়কচু, ঘিকলা, কনকচুর, দাদুশাহি, বাঁশফুল কেলেজিরা, বিষ্ণুভোগ, বাঁশমতী ইত্যাদি।

অপ্রকাশিত কোন কোন মঙ্গলকাব্যের পুঁথিতেও সেকালের বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের চিত্রটি কম পরিস্ফুট হয়নি। এমন একটি মঙ্গলকাব্যের পুঁথি আমরা পেয়েছি মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম থেকে। 'কবীন্দ্র' অকিঞ্চন চক্রবর্তীর (আঠারো শতকের মধ্যভাগ) ঐ পুঁথিতে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি প্রধান। এছাড়া ঐ পুঁথিতে 'শীতলামঙ্গল' ও গঙ্গাবন্দনাও আছে। চণ্ডীমঙ্গলের সদাগর উপাখ্যানে খুল্লনার রন্ধন অংশে সেকালের খাদ্যচিত্রের এক আকর্ষণীয় পরিচয় পাওয়া যায়[১১]। কবীন্দ্র অকিঞ্চনের এই কাব্যে মোদক, মিষ্টান্ন, মুড়ি, চিড়া, লাড়ু, কলা প্রভৃতিরও উল্লেখ পাই। এধরনের প্রকাশিত অপ্রকাশিত আরও কিছু মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে নিরামিষ ভোজ্যের যে অসংখ্য পদ উল্লিখিত হয়েছে তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকেএগুলিতে বাঙালির রন্ধনশিল্পের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। প্রধানতঃ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও রসিকমঙ্গল — এই তিনটি কাব্যে নিরামিষ আহার্যের যে বহু পদের উল্লেখ পাই, অন্য কোথাও সেগুলি তেমন পাওয়া যায় না। অবশ্য, কবিকর্ণপুরের 'কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থেও নিরামিষ ভোজ্যের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। আমিষ ভোজ্যের তুলনায় নিরামিষ ভোজ্যগুলি কোন অংশে কম তো নয়ই, পরন্তু

সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হিসেবে সেগুলির জনপ্রিয়তা সেকালে খুবই বেশি ছিল। নিরামিষ ব্যঞ্জনের কতগুলি বিশেষ বিশেষ নাম (যেগুলি বৈষ্ণবসাহিত্যে বার বার উল্লিখিত হয়েছে) এখানে উল্লেখ করা গেল, যেমন, 'কড়ি' (দই ও বেসনযোগে তৈরি), লাফ্‌রা বা লাবড়া (লাউ, কচিকুমড়ো, গর্ভমোচা, থোড় প্রভৃতি সব্জীকে ভালো ক'রে তেলে ভেজে নিয়ে মশলা দিয়ে যে ব্যঞ্জন তৈরি করা হ'ত), 'বড়িঘোল' (ঘোলমিশ্রিত বড়ির ব্যঞ্জন), কৃশরা বা কৃসর অর্থাৎ খিচুড়ি, শুক্তা বা শুক্তানি (এখনকার তিতোর সঙ্গে বিভিন্ন সব্জীর মিশ্রিত ব্যঞ্জন নয়)। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' সেকালে শুক্তার রন্ধনপরিপাটি পরিষ্কার ক'রে বলা হয়েছে[১]।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' অবশ্য 'সুকুতা' বা 'সুক্তা' বলতে এক ধরনের তিক্ত শুষ্কপত্রকে বোঝানো হয়েছে। সেটি ছিল আমনাশক। সম্ভবত: সেটি শুকনো তিতো পাটপাতা বা শুকনো পলতা। রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে যেসব ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ঐ দ্রব্যটিও ছিল। আবার 'সুকতা' বলতে কোন কোন ক্ষেত্রে শুকনো শাকের ব্যঞ্জনকেও বোঝাত। শুক্তোর পর আর একটি নিরামিষ ভোজ্য 'মাষবটা'। অপর আর একটি ব্যঞ্জনের নাম 'দুগ্ধলক্‌লকি' (দুধলাউ)। মিষ্টান্নের মধ্যে 'অমৃতকেলি', এর অপর নাম 'নারিকেলক্ষীরী', ক্ষীরসা (ক্ষীরের পিঠা), খণ্ড, মণ্ড (ঘিয়েভাজা মিষ্টি 'গজা'), মণ্ডা, রসকরা, ফেনিকা (খাজা), মতিচুর, শিখরিণী, উখুড়া বা উখড়া (উৎকৃষ্ট মুড়কি), হুড়ুম (মুড়িজাতীয় খাদ্য), দুধশাকর, পালো (মুগডালবাটার পায়েস) প্রভৃতি। এছাড়া নানারকম ফলের নাম, যেমন, কোলি (কুল), জাম্বির বা জামির (একপ্রকার বুনো লেবু), নারঙ্গ বা নারাঙ্গি (ছোট কমলালেবু), ছোহরা বা ছোয়ারা (শুকনো খেজুর), পৈড় (ডাব), বদর বা বদরি (আমলকি), বীজতাল (তালশাঁস), বীজপুর (ডালিম), শতকরা (বাতাবিলেবু) প্রভৃতি ফলের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যে নামগুলি এযুগে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কতগুলি সব্জীর নাম যা এখন অপ্রচলিত, যেমন, পত্রফল (ঝিঙা), পলাকড়ি বা পলাকড়া (পটোল), কর্কোটিক (কাঁকরোল), নালিতা বা নালতে (পাটশাক), বার্তাকি বা বার্তাকু (বেগুন), মাজা (থোড়) প্রভৃতি। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যে ঐ নামগুলি বারে বারে এসেছে।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিরামিষ খাদ্যের যে উল্লেখ আছে, তার কয়েকটি হল — 'পীতঘৃতসিক্ত শালি অন্নের স্তূপ', মুদ্‌গসূপ, বাস্তুক শাকের তরকারি, পটোল, কুষ্মাণ্ড, বড়ি ও মানকচুর সঙ্গে চৈ ও মরিচ দিয়ে শুক্তা, বার্তাকি বা বেগুনের সঙ্গে নরম নিমপাতা ভাজা, ফুলবড়ি, কুষ্মাণ্ড ও মানচাকি ভাজা, মোচাঘন্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, মুগডালের বড়া, মাষবড়া, কলার বড়া, পাঁচ-ছয়প্রকারের অম্বল, মধুরান্ন, বড়া অম্ল — এইভাবে পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জন, নারকেলের শাঁস, চিনি ও ছানা, মাটির মালসায় সঘৃত পায়স, ঘন দুধ, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি, দুধ, চিঁড়া, কলা, দুগ্ধলক্‌লকি, চাঁপাকলা, দধি ও সন্দেশ।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপরিউক্ত খাদ্যের পদগুলি ছাড়া আরও অনেক ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নের উল্লেখ আছে, যেমন, সূপ বহু শাক ও

ফলমূলের বিবিধ ব্যঞ্জন, বড়া, বড়ি, কড়ি, রুটি, দই দুধ, মাঠা, শিখরিণী, পায়স, মথনিসর, বিড়ক (পানের খিলি)। এছাড়া আছে ক্ষীর, অমৃতকেলি, পিঠা, পানা, অমৃতগুটিকা, নিসকড়ি, ছেনা, লাড়ু, অমৃতগুটিকা, ক্ষীরসা, অমৃতমণ্ডা, ছেনাবড়া, কর্পূরকেলি, রসামৃত, সরভাজা, সরপুলি, হরিবল্লভ, সেবতি, কর্পূরমালতী, মরিচালাড়ু নবাত, অমৃতি, পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার, বিয়ড়ী, কদমা, তিলাখাজা, ফলফুলপত্রযুক্ত আম্রবৃক্ষের আকারে খণ্ডের বিকার, দধি, দুগ্ধ, তক্র (ঘোল), রসালা, আদাকুচিসহ সলবণ মুদ্গাঙ্কুর, লেবু, কোলি প্রভৃতির নানাপ্রকার আচার।"

গোপীজনবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গলকাব্যে (১৬৬০ খ্রীঃ) উত্তমশালী অন্ন, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, পঞ্চান্ন, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, নানা জাতির সুপক্ক কদলী, বিভিন্ন প্রকারের সুকোমল লাড়ু, উত্তম শালিয়া উখড়া, লুচি, পুরি, সর ইত্যাদির উল্লেখ আছে।'

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' গৌরচন্দ্রের জন্য লক্ষ্মীদেবী খাদ্যের যেসব পদ প্রস্তুত করেছিলেন সেগুলি হল, পঞ্চাশব্যঞ্জন অন্ন, ঘৃতান্ন, শাকের তরকারি মুগসুপ, ছেনা, বড়ি, লাফ্রা, পটোল ও বাস্তুকের ব্যঞ্জন, কাজিবড়া, বড়াম্বু, শর্করা নাড়ু, খিরি, অমৃতগুটিকা, খেবাড়া, নবাত, মনোহরপুলি, দুগ্ধ পুলি, নারিকেলপুলি, শাকের কাঁকরা, চন্দ্রকান্তি, পায়েস, পরমান্ন, মচ্চ্যা ছেনা, কোবা, মুণ্ডশর প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদ কবিকর্ণপুরের 'কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃতে' বেশ কিছু নিরামিষ পদের উল্লেখ পাওয়া যায় -- যেমন, মুলোর ডাল, মোচার বড়া, ছোলার ডালের বড়া, ছানার ডালনা, চালকুমড়ার শুক্তা, ঘিয়েভাজা আমচুরের সঙ্গে সরষের গুঁড়ো মিলিয়ে টক, দইবড়া প্রভৃতি ব্যঞ্জন এবং সরভাজা, দুধপুলি, মুগডালের কচুরি, জিলিপি, খাজা, গজা, লাড়ু, মতিচুর, খইচুর, সরগুটি, ছানার সরুচাকলি, দুধকেলি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওপরের আলোচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির যে খাদ্যপরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হল, তা থেকে কয়েকটি বিষয় ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে খাদ্যাভ্যাসের এক বিরাট ব্যবধান সেযুগেও ছিল। এই ব্যবধান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের ও শহরের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সে সময়ের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় ঐ ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। একালের মতো সেকালেও ধনীগৃহের বিলাসবহুল খাদ্যের প্রাচুর্য আমাদের বিস্ময়ান্বিত করে। সাধারণ মানুষ ও দরিদ্রশ্রেণীর কাছে সামান্য ফেনফেনে ভাত, সঙ্গে সস্তা শাকভাজা বা চুনোমাছের তরকারিই ছিল যথেষ্ট। আর গ্রামের মানুষের কাছে টাট্কা গরম ভাত, সরষে শাকভাজা বা সেদ্ধ, পাতলা দই আর কিছু সস্তার মিষ্টিই ছিল পরিতৃপ্তির বস্তু। কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধপত্নী ফুল্লরার সাধভক্ষণের খাদ্যতালিকা ও ধনপতি সদাগরগৃহিণী খুল্লনার সাধভক্ষণ তুলনা করলে ধনী-দরিদ্রের খাদ্যগ্রহণের এই বৈষম্য বোঝা যাবে। মুসলমান-শাসনাধিকারের আগে পর্যন্ত বাঙালির খাদ্যব্যবস্থায় ও রন্ধনপ্রণালীতে মশলা ও সুগন্ধিদ্রব্যের প্রাচুর্য খুব একটা ছিল না। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের সময়েও তরি-তরকারিতে 'ঝালের' ব্যবহার বলতে মরিচকেই বোঝাত। লঙ্কা, আলু, পেঁপে, টোম্যাটো,

কপি প্রভৃতি মশলা ও সবজি প্রাক্-মুসলিম যুগে বাঙালির কাছে অজ্ঞাত তো ছিলই, এমনকি মধ্যযুগের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত এদের ব্যবহার ছিল না। সেকালে আলু বলতে 'খামালু'কে বোঝাত। সে আলুর উৎপাদন ছিল সহজসাধ্য। এখন এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। রাঙা আলু, মিষ্টি সাদা আলু — এসবের ব্যবহার তখন ছিল। পর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশিদের সঙ্গে সংস্রবের ফলে আলু, লঙ্কা ইত্যাদি বিদেশী দ্রব্যের আমদানি ও উৎপাদন মুঘল আমল থেকে শুরু হয় এবং ক্রমে এগুলির ব্যবহারও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বাংলায় মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্ন ও ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধি মশলার ব্যবহার বাড়তে থাকে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহে ও বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত বিপুল ভোজ্যদ্রব্যের বর্ণনায় যার পরিচয় মিলছে। অন্ন ও ব্যঞ্জনকে সুস্বাদু করে তোলার জন্যে মশলার প্রচুর ব্যবহার ছাড়াও রন্ধনপ্রণালীর মধ্যেও আসে বৈচিত্র্য। প্রাচীন বাংলায় এত অধিক পরিমাণ মশলার ব্যবহার ও রন্ধনপ্রণালীর বৈচিত্র্য ছিল না। পূর্ব আলোচিত খাদ্যব্যবস্থা থেকে তা অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বেশিরভাগ খাদ্য বাঙালির নিজস্ব ঘরানায় প্রস্তুত হলেও এখানকার খাদ্যাভ্যাসের ওপর আশপাশের রাজ্যের কিছু প্রভাব যে পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমিষ খাদ্যের কথা বাদ দিয়ে নিরামিষের বহু পদ যেমন উখুড়া, কড়ি, বড়িঘোল, লাফ্‌রা, খাজা, গজা, জিলাপি প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ সর্বশ্রেণীর খাদ্যকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিভাষায় এ দুটি হল 'সংখুড়ি' ও 'নিস্‌কড়ি'। অর্থাৎ একশ্রেণীর খাদ্য যেগুলি জলে সিদ্ধ, যেমন, ভাত, ডাল, জলপক্ক পিঠা— এগুলি 'সংখুড়ি', চলতি বাংলায় যাকে বলে 'সক্‌ড়ি'। নিস্‌কড়ি হল ঘৃত বা তৈলপক্ক খাদ্য।`` মধ্যযুগে মিষ্টান্নের যে বিভিন্ন পদের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীনকালে সেগুলি অজ্ঞাত ছিল। চিনি ও মিছরি জাতীয় মিষ্টান্ন যেমন, খণ্ড, মণ্ড, নবাত, তিলুয়া, খণ্ডশালুক প্রভৃতি গুড় বা শর্করাজাত মিষ্টান্ন প্রাচীন বাংলায় অধিক প্রচলিত ছিল। দুধ বা ছানার ব্যবহার থাকলেও তা কম ছিল। তরি-তরকারিতে এগুলির ব্যবহার যতটা ছিল মিষ্টান্নের ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। মধ্যযুগে এই দুটি উপাদানের ব্যবহারের ফলে মিষ্টান্নের জগতে বহু পদ উদ্ভাবিত হয়।

রুচি অনুসারে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তন ঘটেছে নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। প্রাচীনকালের শাস্ত্রীয় অনুশাসন খাদ্যাভ্যাসকে তেমন নিয়ন্ত্রিত করেনি। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের মধ্যে একটা সীমারেখা ছিল নিশ্চয়ই, তবে তা প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে লঙ্ঘন করাও হত। বিশেষ করে, মৎস্য-মাংস ভক্ষণে স্মৃতির অনুশাসন যে উদার ছিল, সেকথা ভবদেবভট্টের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বাঙালির খাদ্যের এত বৈচিত্র্য সেকারণে সৃষ্ট হয়েছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়, যা আজও অব্যাহত।

সূত্র নির্দেশঃ

১। চক্রবর্তী তপোনাথ, ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক ইন এইনসেন্ট বেঙ্গল ১৯৫৯ পৃ ৭, রায় নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ ১৯৮০, পৃ. ১৬০। অশোকের স্তম্ভ-অনুশাসনের প্রাকৃতের মতো এই লেখও প্রাকৃতে রচিত। এতে ছয়টি সারি আছে। সারিগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হল
'নো স(ং) ব(ং) গীয় (।) নাম (গলদনস) দুমাদিন (মহা)
মাতে সুলখিতে পুডনগলতে এ (ত) ম
(নি) বহিপযিসতি স'ব (ম) গীগনম (ছদি) নো ৫ধা
(ধা) নিযম, নিবহিসতি দ (ম্) গ (।) তিয়া (ই) কেদ্ (এবা)
তিগ (যি) কসি, সু-অতিআযিক (সি) গংদ (কোহি)
(ধানি) যি কেহি এস কোঠাগালে কোযম (ভব) (নীয়ে)
২। রায় নীহাররঞ্জন প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০, শ্লোক – 'বিদ্যুদযত্র মণিদ্যুতি, ফণিপতে
র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্তিতাপভিদুর শম্ভোঃ কপর্দাম্বুধঃ।।
৩। অনিরুদ্ধভট্ট হারলতা — 'শরৎপক্কধান্যং ব্রীহি হৈমন্তিকং শালি'
৪। রায় নীহাররঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২, উদ্ধৃতি — 'স্বাসীমাতৃণযুতি - গোচরপর্যন্তসতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধুকরঃ সজলস্থল সমৎস্যঃ সতৃণ' '।
৫। সেন সুকুমার বঙ্গভূমিকা, ১৯৭৪ পৃঃ ২৮৯
৬। শ্রীধরদাস ঃ সদুক্তিকর্ণামৃত (২।১৩৬।৫)
'শালিচ্ছেদসমৃদ্ধহালিকগৃহা ঃ সংসৃষ্টনীলোৎপল —
স্নিগ্ধশ্যাম যব প্ররোহনিবিডব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্ত ধেনুনড়ুহচ্ছাগাঃ পলালৈ র্নবৈ
সংসক্ত ধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুডামোদিনঃ।।'
৭। রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬।
৮। রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।
৯। সেন সুকুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।
১০। কেদারভট্ট ঃ বৃত্তরত্নাকর, এতে উদ্ধৃত শ্লোকটি —
'তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনানি পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি।
১১। প্রাকৃতপৈঙ্গল ঃ শ্লোক —
'ওগরা ভত্তা রম্ভঅ-পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা।
মোইনি মচ্ছা নালিতগচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা।।'
১২। চক্রপাণিদত্তঃ চিকিৎসাসংগ্রহ, 'কুলিত্থমুদ্গাঢ়কমাষকাণাং নিষ্পাবযুক্তশ্চ কৃতো হি যূষ', চক্রবর্তী তপোনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।
১৩। চক্রবর্তী তপোনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।
১৪। তদেব, পৃঃ ৪১।
১৫। তদেব, পৃঃ ৪১।

১৬। নৈষধচরিত, ষোড়শ সর্গ
১৭। সেন সুকুমার : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, দশম পরিচ্ছেদ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৯৭২
রায় প্রণব : বাংলার খাবার, ১৯৮৭, পৃঃ ৬।
১৮। সেন সুকুমার : তদেব, পৃঃ ৬।
১৯। মজুমদার রমেশচন্দ্র : হিস্টরি অফ এইনসেন্ট বেঙ্গল ১৯৭১, পৃঃ ৪৬০।
২০। গোস্বামী কৃষ্ণপদ : আদিমধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১৩৬৯, পৃ ৮৫।
২১। রায় প্রণব : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭-৮।
২২। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৭০, পৃঃ ৩৫ (নিদয়ার সাধভোজন), পৃ ১৬৫-১৬৬ (খুল্লনার সাধ)
২৩। রায় প্রণব : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০-১১।
২৪। চক্রবর্তী পঞ্চানন সম্পাদিত, রামেশ্বর-রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১, পৃঃ ৩৯৫ ও ৩৯৭।
২৫। কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল পুঁথি (অপ্রকাশিত), মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার বেঙবাল গ্রাম থেকে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে যথাযথ উদ্ধার করা হল। পুঁথির বানান অবিকল এখানে দেওয়া হল।

'আজ্ঞা পায়্যা অপাঙ্গিনী আরম্ভে রন্ধন।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন।।
দেবী অম্বিকার বরে : খুল্লনা রন্ধন করে :
চিন্তিয়া চণ্ডীর পাদদ্বন্দ্ব।
অগ্নি জলে ত্রিনকুটে : আদি সন্তলনে উঠে :
মুহু মুহু অমৃতের গন্ধ।।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি : সিষু সাথে পুষ্পবড়ি :
নারিকেল ছলা আদা ঝালে।
ভাজিয়া খ্যাটার সাখ : করিল নিরয পাক :
ঢালে রামা কনকের থালে।।
মৃগ ময়ুরের যূপ : পাক করি দিব্য রূপঃ
অলস তেজিয়া দিই কাঠি।
আদারস ঝাল তাতে : সন্তলন করে ঘৃতে
আচ্ছাদনে জাল করে ভাটি।।
রোহিত মাচ্ছের মুড়া : মিসায়্যা মরিচগুঁড়া
জতন করিয়া রান্ধে ঝোল।
পাবতা তেঁতুলরসে : মৌরলা নিরস জুসে
ভাজে রামা চিথলের কোল।।
সফরি মৃগালখণ্ড : ভাজে কোই যুধামণ্ড :
কুষ্মাণ্ড কারলা কাঁচকলা।
আলু য়োলে দিয়া ঝাল : পুরিল বেসারি থাল :
বার্তাকি ভাজিল বড় মুলা।।
আম্রেতে সকুল মিনঃ রান্ধিল কন্টক হিন :
সর্করাতে আম্রের অম্বল।
পিষ্টক অমৃত ভাতি : পায়স রান্ধিল সতি :
য়োদনান্ত রান্ধিল সকল।।'

২৬। সেন সুকুমার সম্পাদিত কবিকঙ্কন মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গল সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৯২ পৃ. ১৬০ (খুল্লনার রন্ধন)

'বাগ্যান কুমুড়া কচা কাঁচকলা তাহে মোচা
বেসারি পিঠালি ঘন কাঠি
ঘৃতে সন্তলনা তবি দিআ হিঙ্গু জিরা মেথি
শুক্তার রন্ধনা পরিপাটি।

২৭। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৩৮৬ মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৭৭।

২৮। গোপীজনবল্লভ দাস, 'রসিকমঙ্গল' শ্রীপাটগোপীবল্লভপুর, ২য় সংস্করণ ১৯৪১ পশ্চিম বিভাগ প্রথম লহরী, পৃ° ৯৪, পশ্চিম বিভাগ, দ্বিতীয় লহরী পৃ ৯৬ পশ্চিম বিভাগ, ষোড়শ লহরী, পৃ ১৩২ ১৩৩।

২৯। ভট্টাচার্য বিজনবিহারী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি ১৯৮৫ পৃ ১১০

এই গ্রন্থে পূর্ণচন্দ্র ওড়িয়া ভাষাকোষ, ৭ম খণ্ড পৃ. ৭৯৯৪ থেকে যে উদ্ধৃতি আছে সেটি এখানে উপস্থিত করা হল।

সাধারণত জলরে সিদ্ধ খাদ্যর সংখুড়ি ও জলরে সিদ্ধ না হোই ঘৃতাদিরে পক্ব হোইথিবা খাদ্যকু নিস খুড়ি বোলা যাএ। উদাহরণস্বরূপ ভাত ডালি জলপক্ব পিঠা মণ্ডা এণ্ডুরি চকুলি চাউলখিরি আদি সংখুড়ি। এবং মিঠেই বাকরা আরিসা গহমখিরি চুড়া ভজা উখুড়া গহম তিয়ারি ঘৃতপক্ব পিঠা প্রভৃতি জলখিআ সামগ্রী নিসংখুড়ি।'

প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক (মৌর্যযুগ-গুপ্তযুগ)

দূর্ব্বা আইন

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় ঃ রাষ্ট্রকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে মুক্ত রাখা। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালক বা রাজা শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকতে পারেন না। তাঁকে বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আবার কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের সঙ্গে যেমন সর্বদা একই রকম সম্পর্ক বজায় রাখা যায় না তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। ক্ষেত্র, পরিস্থিতি এবং সময় বিশেষে নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলকেই কূটনীতি বলা যেতে পারে, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাসক পরস্পরের মধ্যে ও বৈদেশিক শাসকদের সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কূটনীতির যথার্থ প্রয়োগ দেখা যায় মৌর্য শাসনকাল থেকে (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী)। এই সময়ের কূটনীতি সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।[১] তবে ঋগ্বেদে যে 'দাশরাজ' [২] (দশ রাজার যুদ্ধ) ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে কূটনীতির প্রকাশ ঘটে বীজের আকারে। এছাড়া 'মণু সংহিতা'[৩], কামন্দকের 'নীতিসার'[৪] শুক্রাচার্যের 'নীতিসার'[৫] 'মহাভারত'[৬] প্রভৃতি সাহিত্যাশ্রয়ী উপাদানে কূটনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে সকল প্রবক্তা কম-বেশি যে বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল কূটনীতিতে রাজার ভূমিকা, 'নীতি'[৭] (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড), ষড়গুণ্য[৮] (সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সমশ্রয়, দ্বৈধীভাব), 'রাজ্যমণ্ডল'[৯] ইত্যাদি। তাঁরা দূত[১০] ও চরের[১১] ভূমিকার প্রতি এবং কখনও কখনও গণিকার[১২] ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এদের কর্তব্য ছিল বৈদেশিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ, উদ্দেশ্য, গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে নিজ রাজ্যকে অবহিত করা।

মৌর্যযুগ থেকেই কূটনীতি সর্বদা দুটি ধারায় পরিচালিত হয়েছিল। সম্প্রসারণের পর্যায় এবং সুদৃঢ়করণের পর্যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক শাসক সেলুকাসেকে পরাজিত করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রদেশগুলি জয় করেন।[১৩] কিছু কিছু ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য এবং প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে তিনি দমন করেন। একই ধারা অনুসরণ করে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করেন[১৪]। পরবর্তীকালে কণিষ্ক নিজ অধিকার স্থাপন করেন আফগানিস্তান

ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে (আলবিরুণীর মতানুসারে), পামীরের পূর্বাঞ্চলে (সুয়াং সাঙের মতানুসারে)[১৫], এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ [১৬] থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত অরণ্য শাসক (আটবিক) ও সীমান্তবর্তী শাসকদের (প্রত্যন্ত) পরাজিত করেছিলেন। এই লেখ থেকে আরও যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন দৈব পুত্রশাহী - শাহানুশাহী (কুষাণ বংশীয়)[১৭], মুরুন্দা (সম্ভবতঃ এঁরা ছিলেন ক্ষত্রপ বংশীয় শক শাসক)[১৮], দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ (সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপের বসবাসকারীগণ)[১৯]। সাতবাহন রাজাদের (প্রথম শ্রী সাতকর্ণী, দ্বিতীয় সাতকর্ণী) সঙ্গে প্রতিবেশী শুঙ্গ বংশীয় শাসক, কলিঙ্গ শাসক (খারবেল), শকক্ষত্রপ নহপান প্রমুখের বিরোধ ছিল। এই প্রসঙ্গে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি গুজরাট, কাথিয়াবাড়, উত্তর মহারাষ্ট্র, কোঙ্গণ এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্র জয় করেন। বিদর্ভ থেকে বেনারস পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায় (নাসিক প্রশস্তিতে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'তিসমুদ্রতোয় পীতবাহন)[২০]।

বিজিত অঞ্চলের সুদৃঢ়করণের জন্যও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গৃহীত হত। এই ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের কন্যার বিবাহ[২১]। সাতকর্ণীর সঙ্গে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে লিচ্ছবি গোষ্ঠীর রাজকন্যার বিবাহ[২২]। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নাগবংশীয় কুবের নাগের বিবাহ এবং তাঁদের কন্যার সঙ্গে বাকাটক বংশের দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ[২৩] ইত্যাদি।

বিভিন্ন সাহিত্যাশ্রয়ী উপাদান থেকে বিভিন্ন শাসকের সময় দূতের আদান-প্রদানের কথা জানা যায়। এই দৌত্য প্রচেষ্টা কখনও ছিল রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় সেলুকাসের দূতের আগমন), কখনও বা অর্থনৈতিক স্বার্থে (রোমক সম্রাট ও ভারতীয় শাসকদের মধ্যে দূতের আদান-প্রদান মূলতঃ ইন্দো-রোম বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়েছিল)। কখনও বা তা ছিল শুধুমাত্র সদিচ্ছা প্রণোদিত বা মহৎ আদর্শ প্রচারের লক্ষ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ (বিভিন্ন দেশে অশোক কর্তৃক দূত প্রেরণ) এরকম কয়েকটি দৌত্য প্রচেষ্টার উদাহরণ[২৪]। চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগত সিরিয়ার শাসক সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস ও ডেমোকোস, বিন্দুসারের সভায় মিশরের শাসক ফিলাডেলফাস-এর দূত ডাওনিসিয়াস, ইন্দো-পার্থীয় শাসক আজেস কর্তৃক রোমক সম্রাট অগাষ্টাসের রাজসভায় দূত প্রেরণ (খ্রীঃ পূঃ ২১-২০), জনৈক পাণ্ড্য শাসক (সম্ভবতঃ নেডুনজেলিয়ান) কর্তৃক রোমান সম্রাট ক্লডিয়াম -এর সভায় দূত প্রেরণ (৪১-৫৪ খ্রীঃ) কণিষ্ক কর্তৃক রোমান সম্রাট ক্যাড্রিয়ানের সভায় দূত প্রেরণ, সিংহলের শাসক মেঘবর্মণ কর্তৃক সমুদ্রগুপ্তের সভায় দূত প্রেরণ, জনৈক গুপ্ত রাজা কর্তৃক চৈনিক শাসকের কাছে অধীনতামূলক দূত প্রেরণ, বুদ্ধগুপ্ত কর্তৃক সদিচ্ছামূলক দূতপ্রেরণ ইত্যাদি।

ভারত তার কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য কখনও অসির ওপর ভরসা করেছে, কখনও বা মানসিক শক্তির ওপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তরবারির

সাহায্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার নীতিই প্রচলিত ছিল বিভিন্ন দেশে সেক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে অশোকের আমলে। তিনি মানবিক গুণাবলীর ভিত্তিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার নীতি নেন। তাঁর বিভিন্ন লেখ থেকে এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য জানা যায়।[illegible] যে পাঁচজন বৈদেশিক শাসকের সঙ্গে অশোকের যোগাযোগ ছিল তাঁরা হলেন সিরিয়ার শাসক অ্যান্টিয়োকাস, মিশরের শাসক টলেমী দ্বিতীয় ফিলাডেলফাস, ম্যাসিডোনিয়ার অ্যান্টিগোনাস উত্তর আফ্রিকার সিরিনের শাসক মগ, এপিরাসের আলেকজান্ডার[illegible] মহাবংশ থেকে জানা যায় তাঁর সঙ্গে সিংহলের শাসক দেবানাম পিয়তিস্য এর যোগাযোগ ছিল[illegible]। দক্ষিণ তাঞ্জোরের তিরুচিরাপল্লী অঞ্চলের চোল ও মাদুরাই-রামানাথপুরম তিরুনেলভেলির পাণ্ড্য শাসকের সঙ্গে সংযোগ ছিল[illegible]।

মৌর্য ও গুপ্ত শাসকের কূটনৈতিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য শাসকরা সেখানে 'রাজ্য', 'রাজন', 'দেবানাম'-'প্রিয়' ইত্যাদি উপাধিতে সন্তুষ্ট থাকতেন সেখানে গুপ্ত শাসকরা বিভিন্ন আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি 'একরাট'[illegible] বিরাট, পরম ভট্টারক[illegible], পরমেশ্বর ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁদের সম্প্রসারণের আদর্শ আরও প্রসারিত হয়েছিল। আবার পার্শ্ববর্তী শাসকদের যেখানে মৌর্যরা ধ্বংস করেছিলেন সেখানে গুপ্ত শাসকরা কর আদায়ের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা খর্ব করলেও একেবারে ধ্বংস করেননি। ফলে তাঁরা কেন্দ্রীয় শক্তির সহায়ক উপাদানে পরিণত হয়েছিলেন।

এখন, একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে আসে যে আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতের কূটনীতি সংক্রান্ত আলোচনার যৌক্তিকতা কোথায়? কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কূটনীতি প্রকৃতিগতভাবে আজও অপরিবর্তিত, যদিও আকারে পৃথক, তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় এখনও প্রতিটি রাষ্ট্র নিরাপত্তার প্রশ্নে কূটনীতির বিচার বিশ্লেষণ করছে। নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য চলেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মারণাস্ত্র প্রস্তুতির অদম্য প্রতিযোগিতা। প্রাচীন ভারতের দিকে চেয়ে আমরা বলতে পারি তৎকালীন পরিস্থিতিতে উন্নততর অস্ত্র 'রথমুষল' ও 'মহাশিলাকন্টক'-এর উদ্ভাবন ছিল মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। আবার অন্যদিক থেকে দেখা যায় অশান্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রাচীন ভারতের শান্তির আদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত বুদ্ধের বাণী দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তার গুরুত্ব আজও অপরিহার্য। তাই দেখা যায় ভারতের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের আদর্শ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। আধুনিক পৃথিবীতে শান্তির নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই কাজে সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদি) যার পূর্বাভাস অশোকের পরিচালিত কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের ধারা অনুসরণ করে আজও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দূতের গুরুত্ব স্বীকার করা হচ্ছে। তাই স্থায়ীভাবে প্রতি রাষ্ট্রে বিভিন্ন বৈদেশিক দূতের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুপ্তচর

ও গণিকাদের ভূমিকা আজও গুরুত্বপূর্ণ যদি নামে আকারে-কার্যপদ্ধতিতে পৃথক। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রাচীন ভারত তার উত্তরাধিকারীর অনুসরণযোগ্য একটা রূপরেখা যেন তৈরি করে দিয়েছিল যাকে আমরা আধুনিকরূপে দেখতে পাই।

সূত্র নির্দেশঃ

১। Kautilya's Arthasastra Trans Dr R Shamasastry 1915 1961 (Seventh Edition)

২। ভরত বংশীয় সুদাস রাজার সঙ্গে পুরু যদু, অনু প্রভৃতির দশটি উপজাতি রাজার যুদ্ধ - ঋগ্বেদে ১ ৪৭ ৬, ৩ ৩৩ ১, ৭ ১৮ ২৩, ৭ ৩৩ ৩, ৭ ৮৩ ১, ৭ ৮৩ ৭।

৩। তর্কবত্ন, মথুবানাথ, মনুসংহিতা (কুল্লুকভট্টকৃত টীকা বঙ্গানুবাদসহ) কলিকাতা ১৯৩১।

৪। Kamandakiya Nitisara Ed R L Mitra BI Cal 1884

৫। Sukranitisara Ed Jivananda Vidyasagara Cal 1890

৬। Mahabharata Calcutta Edn Ed N Siromani and others BI Calcutta 1834-9

৭। ক) মনুস্মৃতি, সপ্তম অধ্যায় ১০৮ ১০৯ ১৫৯ সূত্র

খ) শুক্রাচার্যের নীতিসার চতুর্থ অধ্যায় ২৫ ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ সূত্র

গ) 'মহাভারত', আদি, বিরাট উদ্যোগ, ভীষ্ম পর্ব

৮। ক) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সপ্তম প্রকরণ

খ) মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব শান্তিপর্ব।

গ) মনুস্মৃতি, সপ্তম অধ্যায়, ১৬০ সূত্র।

ঘ) শুক্রাচার্যের 'নীতিসার' চতুর্থ অধ্যায়, ১০৬৫-৬।

৯। ক) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সপ্তম প্রকরণ

খ) মনুস্মৃতি, সপ্তম অধ্যায়, ১৫৪ ১৫৮।

১০। ক) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দ্বাদশ প্রকরণ

খ) মনুস্মৃতি, সপ্তম অধ্যায়, ৬৩-৬৮।

গ) মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব।

১১। ক) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ত্রয়োদশ প্রকরণ

খ) মনুস্মৃতি, সপ্তম অধ্যায় ১৫৪।

গ) মহাভারত, শান্তি পর্ব।

১২। 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য', সুকুমারী ভট্টাচার্য, ১৯৮৭, ১৯৮৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৬২।

১৩। "Political History of Ancient India Dr H C Raychaudhury 1923, Re ed 1953 (VI ed Revised and Enlarged) Calcutta Chap IV Sec I p 273

১৪। Rock Edict XIII Shahbazgarhi Text "Inscriptions of Asoka" Dr D C Sirkar 1956, p 51

১৫। H C Raychaudhuri, ibid, Chap VIII, Sec III, p 474, S Beal "Si-yu-ki/trans the Chinese Account of the Western World, Vol -II).

১৬। Major Rock Edict (MRE) II Block op cit p 129

১৭। H C Raychaudhuri, ibid, chap X Sec III, p 534 537, 543

১৮। ibid, Chap X, Sec III p 547

১৯। ibid Chap X Sec III p 547

২০। ibid Chap X Sec III p 547

২১। ibid Chap IX Sec II p 492

২২। ibid Chap IV Sec I pp 546-7

২৩। ibid Chap X Sec II p 530

২৪। Naga-kuletpanna cf JASB 1924 p 58 and JRAS 1914 p 324

২৫। "India's Diplomatic Relations With the West" B A Seletore 1958 Chap III pp 106-136 and Chap V pp 212-266

২৬। Hultysch Corpus Inscriptionum Indicarum Vol I (Inscription of Asoka 1925) pp 3-4 28-29 101-102

২৭। Rock Edict XIII Shahbazgarhi Text Asoka's Inscription Dr D C Sirkar 1956 P-54 para I

২৮। JARS for 1905 p 985 and n (1)

২৯। Hultzsch Intr p xii

৩০। Raj Beli Prasad Indian Paleography 1957 (2nd ed) Part-II p 129

৩১। Ibid

হর্ষচরিতে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি

মলয়কুমার দাস

গুপ্ত যুগের অন্তিম পর্যায়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এক নতুন ধারণার প্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং এই পরিণতির সার্বিক বিকাশ ঘটেছে অষ্টম শতাব্দীতে। এব মধ্যবর্তী সময়ে বাণভট্টের হর্ষচরিত রচিত। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এর মূল্য কতখানি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলেও একথা স্বীকার্য যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাণভট্ট লিখিত হর্ষচরিতে সমকালীন, বিশেষত: উত্তর ভাবতের, আর্থ-সামাজিক পবিবর্তনের এক প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাকাল বা তারিখ নিয়ে যে সংশয় দেখা যায় হর্ষচরিত সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

বাণভট্টের হর্ষচরিতের আলোচনার পূর্বে আমাদের পূর্বকালীন তথা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ভঙ্গুর ভারতবর্ষের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। হুন আক্রমণে বিপর্যস্ত ভারত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে অপারগ হয়[১]। গুপ্তদের পতন ও সপ্তম শতাব্দীব প্রথমে হর্ষবর্ধনের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃংখল ছিল[২]। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিমলগ্নে তাদের অধীনস্থ শক্তিগুলি স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে এবং পারস্পরিক ক্ষমতা বিস্তারের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। এই ক্ষমতার লড়াই-এ ক্রমেই কনৌজের সাফল্য দেখা যায়[৩]। অনিশ্চিত ও বিশৃংখল পরিস্থিতির মধ্যে নতুন নতুন জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর আগমন সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন জায়গায় মানুষের স্থান বদল ঘটতে থাকে। শহর এবং সংঘ বা সংস্থাগুলির প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে[৪]। অগ্রহার[৫] ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ফলে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। সর্বভারতীয় শক্তির অস্তিত্বব স্থলে রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুশক্তির সহাবস্থান বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়[৬]। প্রদেশ, রাজ্যগুলির শাসনকার্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়। ভূমি-বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। জমি মালিকানা, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়, বেতন-দান পদ্ধতি, পেশা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে অধোগতি পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায়। তথাপি এই সময় ধ্রুপদী রীতির বিকাশে, নতুন

নতুন শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধিতে এবং আন্তঃবাণিজ্য ও শিল্পের অনুকূল পরিবেশ বজায় ছিল। যাহা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ[৭]।

এরূপ এক জটিল সময়ে রচিত হর্ষচরিতে বাণভট্ট থানেশ্বর ও কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৮ খ্রী:) জীবনী রচনা করেছেন। তবে বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' রচনাটি অর্ধ-সমাপ্ত রাখেন কেন সে নিয়ে মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এছাড়া চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ তার সি-ইউ কি গ্রন্থে সমকালীন ভারতের অবস্থা ও হর্ষবর্ধনের বিবরণ লিখেছেন। এমনকি চৈনিক সাহিত্যে এবং সমসাময়িক ভারতীয় লেখমালায় আলোচ্য শতকের বিবরণ পাওয়া যায়। বাণভট্টের হর্ষচরিতে অনেকে অতিশয়োক্তি লক্ষ করেছেন। তাদের কাছে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র বর্ণনায় কতখানি নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহের প্রশ্ন উঠেছে। তবুও একথা বলা যায় যে, সম্রাট হর্ষবর্ধনই কেবলমাত্র বাণের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে তা নয়, অসংখ্য সাধারণ মানুষের চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে হর্ষচরিতে । এই সকল চরিত্র তথা হর্ষচরিত বিশ্লেষণ করলে সমকালীন ভারতে বিশেষত উত্তর ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতার চিত্র দেখা যায়। যা সমসাময়িক রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক নয়। পেশার পরিবর্তন, সেনাবাহিনীর নিরন্তর গমনাগমনের বর্ণনা, যুদ্ধযাত্রায় রাজন্য তথা সামন্তদের সমাবেশ, যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন পেশার উল্লেখ, অরণ্য প্রান্তের জনজীবন, কৃষকদের অবস্থা, সামাজিক আচার আচরণের বর্ণনা, চাটুকার-রাজানুগ্রহজীবীর বর্ণনা[৯], দস্যু তস্করের উল্লেখ এবং দোকান-পাট লুঠপাঠের বিবরণ[১০], এমনকি দ্রাবিড়দেশের সন্ন্যাসীদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য[১১] প্রভৃতি ঘটনার বিবরণে এই অস্থিরতা পরিস্ফুট। বাণিজ্যিক উন্নতির কোন সুস্পষ্ট চিত্র নেই, যদিও গাধার পিঠে পণ্য সামগ্রী নিয়ে যাতায়াতের কথা আছে এবং কিছু কিছু শিল্প বিশেষত বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরি, প্রভৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অথচ ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের বিষ্ণুসেনের তাম্রশাসনে বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়[১২]। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক অবন্তি এই ব্যবস্থাগুলির অনুমোদন করেছিলেন। এই বিধিব্যবস্থার মধ্যে প্রায় ৭০টি আইনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় শুল্ক আদায়কারী কর্মচারীদের উৎপীড়ন থেকে বণিকদের রক্ষা করা এবং আন্তর্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো এর উদ্দেশ্য। অপরদিকে হর্ষচরিতের মধ্যে গাধার পিঠে মাল পরিবহনের উল্লেখ[১৩] থাকলেও বণিকদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান ও পরে হর্ষবর্ধনের সময়ে সেনাবাহিনীর নিরন্তর গমনাগমন ও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্রাটের নিয়মিত ভ্রমণের ফলে নির্মাণ শিল্প তথা রাস্তাঘাট তৈরি ও তার উন্নতি হয়েছিল[১৪] —একথা ধরে নিলে বলা যেতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, রাজ্যের প্রদেশগুলি এবং শহরগুলির গুরুত্ব ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। তথাপি হর্ষচরিতে বাণিজ্যের প্রসারকে যে উৎসাহিত করা হত তারও কোন ইঙ্গিত নেই। এমনকি রাজা যে বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। স্বার্থবাহ বা বণিকদের কার্যকলাপের স্বচ্ছ চিত্র না থাকায়

একথা মনে হতে পারে যে সপ্তম শতকে তথা আদি মধ্যযুগে সাময়িক কিছুকাল গুরুতর সামাজিক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল, যার ফলে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে গ্রামীণ উৎপাদনই প্রধান আকার নিয়েছে এবং বিক্রয়ার্থে পণ্য উৎপাদন কমছে। তৎকালীন মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতাও সঙ্কুচিত বাণিজ্যের ঝাপসা ইঙ্গিত বহন করে।

হর্ষচরিতে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তদেব আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় যে রাজবাড়ি ও নগরের লোকেদের পেশা এবং গ্রামাঞ্চলের লোকেদের পেশা— এই দুই ধরনের চিত্র লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনেব প্রাধান্য কমে আসায় সে রকম উল্লেখযোগ্য পেশার নাম আমবা দেখতে পাইনা, তবে যুবরাজ বা অভিজাতদের কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চ-পদাধিকারীদের মধ্যে 'দুঃসাধ্যসাধনিক', 'প্রমাচার', 'রাজস্থানীয', 'উর্পবিক', 'বিষয়পতি' প্রমুখ[১] এবং গ্রামভোজক বা গোপ (গ্রাম প্রধান), প্রকাশক, মন্ত্রী, বিচারক, সভাকবি - এদের প্রত্যেকের পরিচয় বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়[২]। উচ্চ-রাজকর্মচাবীদের বৃত্তিদানের জন্য রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ থাকলেও হর্ষবর্ধনের সময কখনই নগদমুদ্রায় বেতন দেওয়া হত না। বরং তাদের পুরোহিত এবং পণ্ডিতদের ন্যায় ভূমি ভোগেব অধিকার অর্পণ করা হত[৩]। তবে বাণভট্টের হর্ষচরিতে মূলত মধ্য-পদাধিকারী রাজকর্মচারী ও সাধারণ কর্মচারীদের উল্লেখই বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে

অক্ষপটলিক — দলিল-রক্ষক। অশ্ববারচক্র — ঘোড়সওয়ার মণ্ডলী। করণিক — মুহুরী। আযুক্তক — নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারী। পাটিপতি — সেনানিবাস-রক্ষক। চাট-সৈনিক — অনিয়মিতভাবে নিযুক্ত সৈনিক। ভাণ্ডাগারী — ভাণ্ডার রক্ষক। চারভট — যোদ্ধা। মহাসন্ধি বিগ্রহিক — যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি স্থাপনাদি বিষয়ে মহামন্ত্রী। মুখেক্ষণপর — ইশারায় কাজ হাসিল করা দূত। বণ্ঠ — অবিবাহিত তরুণ পদাতিক। কূটহারিকা — মেয়ে জলভারী। গৃহচিন্তক — সৈন্যদের শিবির সংস্থাদি তত্ত্বাবধানকারী ভৃত্য। বাণিনী — মেয়ে বার্তাহার। মহান সাধ্যক্ষ — প্রধান পাচক। আলেপক — যারা পলস্তারেব কাজ করে। আরভটী — কপটতা, বঞ্চনা, মিথ্যা, মায়া ভীতি প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করে। খেট-চটক — গ্রামভৃত্য। খেটন — সেবা, শুশ্রূষা করে। চেট — দাস। নাগবীথি পাল — হাতিধরা খেদার রক্ষক। নালি বাহিকা — হাতির সহিস। পল্লীপরিবৃঢ় — গ্রামের মোড়ল। পদাৎ — তকমা পরা ভৃত্য। প্রকাশ দাস — প্রসিদ্ধ ভৃত্য। পত্তি — ঐ। বস্ত্রকর্মান্তিক — রাজার পোশাক ঘরের প্রধান ভৃত্য। বাহিক — কাষ্ঠ-রক্ষক বা গো-রক্ষক। মহামাত্র — প্রবীণ মাহুত।
মেষ্ঠ — হাতীদের ঘুম ভাঙানো সহিস। যামচেটী - রাত্রিকালে স্ত্রীলোক পাহারাদার। যাযজূক — যারা প্রায়শঃই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। লম্বন — গাধা বা খচ্চরের চাকর। লাসক — নট। লেপ্যকার — লৌহদ্বারা মূর্তি নির্মাণকারী। লেশিক — হাতীর সোয়াবেরা। সৈরিক — লাঙ্গন-চালানো কৃষক।

.... ইত্যাদি বহু সাধারণ বা নিম্নমানের পেশার পরিচয় পাই। এছাড়া শ্রমিক, মহাভোগী, ভোগিক, ভোগপত্তিক, ভোগিক পালক, চিকিৎসক এবং বারাঙ্গনা বা

গণিকাবও উল্লেখ লক্ষণীয়[১৮]। এর থেকে একথা বলা যায় যে পূর্বের তুলনায় সপ্তম শতকের গোড়ায় তথা হর্ষবর্ধনেব বাজত্বকালে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার গৌরবজনক সুদিন ছিল না বলে হর্ষচরিতে সেবকম কোন উচ্চবৃত্তি অবলম্বনের কোনরূপ উল্লেখ পাওযা যায না। ডঃ আব. এস ত্রিপাঠি, ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদাব প্রমুখ তাঁদের আলোচনায় বলাব চেষ্টা করেছেন বাণভট্ট অকারণে গৌরবদান করে হর্ষবর্ধনকে যত বড দেখিয়েছেন, বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের চোখে হর্ষবর্ধন তত বড় নন। অবশ্য বাণ তাঁব অন্যান্য রচনায় এমনকি হর্ষচরিতে সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে এক কঢ় বাস্তবতার চিত্রই তুলে ধবেছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যে রকম বাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে হর্ষবর্ধনের পক্ষে পূর্বেব শাসকদেব ন্যায শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল। হর্যবর্ধন হয়ত চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। কোসাম্বীর মতে, হর্ষের সমকালীন ভারতে এক গুরুতব সামাজিক সঙ্কট দেখা গিয়েছিল বলে মনে হয়[২০]। ফলে বৃত্তি-গ্রহণের ক্ষেত্রে বদ বদল ঘটে। যাব থেকে মনে হয উক্ত সময়ে হয়ত জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল বা কর্ম সংস্থানেব সুযোগ কমে গিয়েছিল। মানুষের আয়ের কোন সঠিক পথ না থাকায় বাজ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। দস্যু-তস্কর, লুটপাঠ, অপরাধ প্রবণতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সামাজিক অবক্ষযেরও সূচনা হয়েছিল বলে মনে হয়।

আপান মণ্ডপ — সুবাপান গোষ্ঠী। ভূজিষ্যা — প্রভুর উচ্ছিষ্ট যারা খায়। কুম্ভদাসী — বারনাবী। কুলপুত্র — সৎ বা উচ্চকুলজাত সন্তান কিন্তু দরিদ্র। চাট — জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। জাল্ম — ইতর, পামর। পিণ্ডজীবী — অন্নপুষ্ট। বাচাট — বাচাল। বিট — যে যৌবনে নাগরক বৃত্তি অবলম্বন করে সব কিছু নষ্ট করে বেশ্যাগৃহে এবং গোষ্ঠীতে বহুমান লাভ করে তাদেরই বদান্য অন্নের উপর নির্ভর করে জীবন কাটিয়ে দেয়। ব্রহ্মরাক্ষস — অন্যের স্ত্রীকে হত্যা করে। রণ্ডাপুত্র — বেশ্যাপুত্র। গণিকাবৃত্তি ইত্যাদিই তার পবিচয় বহন করে[২১]। এছাড়া কুসংস্কার, সতীদাহ প্রথা, শ্মশানে শব সাধনা, নানাবিধ বীভৎস আচার ও অভিচারের প্রাধান্য, ধর্মীয় বিবাদ, জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণা[২২], মেয়েদের কুলটা বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করার প্রয়াস, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার তাগিদে অর্থাৎ উপর তলার প্রভুকে সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ আর্য সামন্তদের বারাঙ্গনাদের সাথে নৃত্য এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যে সামন্তপত্নীদের ভূমিকা, মানুষের অসহায়তা[২৩] প্রভৃতি ঘটনা সপ্তম শতাব্দীর ভারতকে অবক্ষয়ের মাঝে এনে দাঁড় করিয়েছিল। যে সমস্যা মধ্যযুগ এবং পরবর্তী যুগগুলিতে থেকেই গেছে। দস্যু-তস্করের উপদ্রব এবং দেকান-পাট লুঠপাটের বিবরণ থেকে একথা মনে করা যেতে পারে যে, আইন-শৃঙ্খলার অবনিত হয়েছিল। এমনকি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও দেখা দিয়েছিল যার ফলে সামন্তরা বিদ্রোহী হয়ে রাজার শাসন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে এবং এই অবস্থায় রাজারও কোন ক্ষমতা নেই অধীনস্থ সামন্তদের নিজের অধীনে রাখার। রাজা অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য স্থায়ী সৈন্য পুষতে পারছেনা। ফলে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং রাজার শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। হর্ষের অধীনেও বেশ কিছু

সামন্তরাজা ছিল। বাণ সামন্ত, মহাসামন্ত, আপ্তসামন্ত, প্রধান সামন্ত, শত্রু-মহা সামন্ত এবং প্রতি সামন্ত এত বকম সামন্তেব উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হর্ষ ছোট ছোট রাজ্যগোষ্ঠীর দুর্বলতা অনুধাবন করে সেই সকল প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে জয় করে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে নিজের অধিকাব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু কতটা সাফল্যমণ্ডিত হন তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কাবণ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে। এই অবস্থায় রাজা তাব হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অজানিতভাবে এক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। একদিকে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কঠোর দণ্ডবিধি প্রণয়নের দ্বারা, রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দৃঢ় করার অভিপ্রায় এবং জনসাধারণের মধ্যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবার, শান্তি ও নিবাপত্তার জন্য রাজার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া, অপরদিকে রাজাশাসনের প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহেব তাগিদ এবং নিজেব ক্ষমতা টিকিয়ে বাখবার জন্য এক শ্রেণীর অপবাধী তৈবি কবা। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর শাসনযন্ত্রে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যায়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যাব সাদৃশ্য লক্ষ কবা যায়। মধ্য ও আধুনিক যুগে জমিদাররা অঞ্চল শাসন করত এবং পোষা ডাকাতেব সাহায্যে ডাকাতি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হত।

হর্ষচরিতে আমরা বেশি যুদ্ধ-সজ্জার পরিচয় লক্ষ করি। হাতি, ঘোড়া, উট, বলদদের যুদ্ধের সরঞ্জাম দ্বাবা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধযাত্রায় অংশ নিয়েছে মাহুত, পাটিপতি, সহিস, অশ্বরক্ষক, ভাণ্ডাররক্ষী, চেটক, দাসরক, স্থানপাল, ঘাসিক প্রভৃতি নানা রকমের কর্মী। এছাড়া চাট সৈনিক (অনিয়মিতভাবে নিযুক্ত সৈনিক), চারভট (যোদ্ধা), বণ্ঠ (অবিবাহিত তরুণ পদাতিক), মার্গনব্যসনী (তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধপ্রিয়[১১]), সাধারণ সৈন্য, মহাসামন্তদের রন্ধনশালা ও পতাকাবাহিনী। এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে কিছু 'চুন্দী' (কিছু মহিলা, যাদেব কাজ মেয়েদেব কুলটা বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করা) —এদের কার্যকলাপ তদারকি করছে দরিদ্র অথচ অভিজাত বংশের সন্তান, যারা রাজকর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত সেই সব 'কুলপুত্রকরা'[১২]। সেই সঙ্গে তাবা নিজেদের বউদের বাহনে চাপিয়ে যুদ্ধ-যাত্রায় তাদের সঙ্গী করেছে। কিন্তু কুলপুত্রকদের বউদের নিস্তার নেই, কারণ অভিজাত রাজপুত্ররা কিছু বড়লোকদের যুদ্ধযাত্রায় পাঠিয়েছে, বউদের ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। সামন্ত প্রভুরা এবং রাজন্যরা গজবধূদের পিঠে চড়ে যুদ্ধ-যাত্রায় সামিল হয়েছে। তাছাড়া সৈন্য, শিবিরের অনুচর, কর্মচারীদের সাথে লুণ্ঠপাটকারী সাধারণ কিছু মানুষও সামিল[১৬]। সাধারণত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী হর্ষের স্থায়ী বাহিনী নয়। বরং যুদ্ধকালে সামন্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত ও একত্রিত বাহিনী মাত্র ছিল। সম্রাটকে সামরিক সাহায্যদান রাজা ও সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল[১৭]। দণ্ডযাত্রা: সৈন্যসমাবেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাব সমগ্র দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। বাণ তাঁর হর্ষচরিতে বিপর্যস্ত জনজীবনের একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। বেশীর ভাগ লোকই যুদ্ধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তখন সামাজিক অবক্ষয় আসতে বাধ্য।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। যদিও বাণভট্টের উদ্দেশ্য ছিল হর্ষবর্ধন এবং তৎসঙ্গে প্রভাকর বর্ধনের সামরিক কৃতিত্ব বর্ণনা করা, তবুও হর্ষচরিতে সমকালীন কৃষকদের এবং অবণ্য প্রান্তের জনজীবনের পবিচয় পাওয়া যায়। রামশরণ শর্মা এই সময় 'সামন্ততন্ত্র' বিকাশের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন[২৮]। জমির বিশেষ মালিকানার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্র বলে। ভারতের পটভূমিকায় তা আলোচনা করাই সমস্যাব ব্যাপার। তবুও রামশরণ শর্মার কথায় বলা যায়, যে ব্যবস্থায় জমির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত জমিচাষীরা প্রত্যক্ষভাবে জমি পায়না, পায় মধ্যবর্তী ভূস্বামী শ্রেণীর কাছ থেকে এবং তাদেরই নিজ উৎপাদিত ফসল এবং কায়িকশ্রম দিয়ে জমির খাজনা পরিশোধ করে। চাষীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কর আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোন মাথা ব্যথা না থাকায় রাজকর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। এমনকি সপ্তম শতাব্দীতে পূর্বের ন্যায় প্রতিটি পরিবারের লোকসংখ্যা, সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ এবং সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা লিপিবদ্ধ বা তালিকাভুক্ত করার প্রথাও উঠে গিয়েছিল। যেহেতু সামন্তপ্রভু বা সরকার ও চাষীর মধ্যবর্তী কেউ ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করার দায়িত্ব পেয়েছিল, সেহেতু সরকারী কোষাগাবে রাজস্ব ঠিকমত জমা পড়ত না। অথচ এই বাজস্বই ছিল রাজ্যের প্রধান আয়। ফলে আমরা আলোচ্য শতকে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র দেখতে পাই। এমনকি সরকারী নিয়ম পালনেরও কোন স্বচ্ছ ধারণা পাই না। সে ক্ষেত্রে সমগ্রদেশে কখনই উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে উপরিউক্ত লক্ষণগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ প্রেক্ষাপটে হর্ষচরিতে কৃষকদের যে চিত্র আমরা পাই তা হল, কঠোর শ্রমসাধ্য কৃষক ও কৃষিকর্মের উল্লেখ। এখানে আমরা সম্পূর্ণচাষী এবং সাধারণচাষী (প্রায় অরণ্যচারী) এই দু-ধরনের কৃষকের উল্লেখ পাই[২৯]। সর্বহারা কৃষকদের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য[৩০], যাদের কাছে কোদালই সম্বল। দরিদ্র কৃষকরা ছোট ছোট ধান জমি ও ধান মাড়াই করার জায়গা ভাগ করে নিয়েছে। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল, ধান, গম, শাক-সব্জি, তুলো, তৈলবীজ, আখ, বিভিন্নপ্রকার ফলমূল ও শস্যদানা। সর্বত্র চাষের জমির অবস্থা ভালো ছিল না। ফলে বনে গিয়ে মানুষ কাঠ, মোম, মধু, বনফল, শুকনো পাতা, পাখি ও পশু জোগাড় করে জীবিকা নির্বাহ করত। এদের মধ্যে মহাজনদের একটা প্রভাব লক্ষ করার বিষয়। অরণ্যপ্রান্তের মানুষদের কাছে বনপালদের রূঢ় আচরণ এবং চোরের উপদ্রব যথেষ্ট সমস্যার কারণ ছিল। তাছাড়া বর্গাদারদের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না[৩১]। এই সময় চাষীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ লক্ষ করা যায়। যাহা পরবর্তীকালে অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর লেখমালায় বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। লেখমালায় দুটি কথা পাই, - 'কর্ষক' আর 'ক্ষেত্রকর'[৩২]। মনে হয় দুটি কথা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সম্পূর্ণ পৃথক দুটি শ্রেণী। এছাড়া আমরা দেখতে পাই সম্রাট হর্ষবর্ধন গ্রাম পরিভ্রমণকালে কৃষক গৃহে রাত্রি যাপন করলে সেটা আর কুটীরক নয়, গৃহ হয়ে উঠেছে এবং দারিদ্র্য বা কষ্টের বদলে সেখানে প্রচুর উদার প্রাচুর্যের বর্ণনা

দেখা যায়[৬৫]। এর থেকে একথা মনে হতে পারে যে, রাজা যার গৃহে অবস্থান করেন তিনি কখনই দরিদ্র কৃষক নন। হয়ত কোন সম্পন্ন সাধারণ শ্রেণীর লোক বা মধ্যস্বত্বভোগী। কারণ গ্রাম এবং কৃষকদের উপর আর্টাবিক সামন্ত (অরণ্যবাসী সামন্তরাজ), অভ্যাগারিক (পরিজন পোষণে আগ্রহী), অভিজনতা (উচ্চবংশজাত কৌলিন্য), পল্লীপরিবৃঢ় (গ্রামের মোড়ল) প্রাগ্রহর (প্রধান) এবং মহত্তর (গ্রামের শ্রেষ্ঠমাতব্বর) প্রভৃতিদের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এছাড়া হর্ষচরিতে বিশেষ এক শ্রেণীর পরিচয় পাই। তারা হল জাল্ম (ইতর বা পামর বিশিষ্ট শ্রেণী) এবং আগ্রহারিক (যারা ফাঁকিবাজ, ব্রহ্মত্তর জমি ভোগ করে)। সেদিক দিয়ে লক্ষ করলে হর্ষচরিতে কঠোর শ্রমসাধ্য কৃষিকর্ম ও সাধারণ কৃষকের সাথে সাথে সুবিধাভোগী শ্রেণীর উল্লেখ সুস্পষ্ট। এমনকি যুদ্ধের সময় কৃষিজ সম্পদ লুঠপাটের কথা বলা আছে। যুদ্ধযাত্রাকালে গোলমালের ভয়ে বলদগুলি বণিকদের মালপত্র পিঠে নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে অথচ বণিকরা নিরুপায় হয়ে দেখছে — এ বর্ণনাও বর্ণিত। যুদ্ধ-ব্যতীত অন্যান্য সময় কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল কেড়ে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। জাল্ম (জালমোর), আগ্রহারিকরা অন্যের জমি বেনামে ঠকিয়ে অর্থাৎ জালজমি ভোগ করছে সেটাও হর্ষচরিতে উল্লিখিত[৬৬]। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে অবক্ষয়ও পরিস্ফুটন।

হর্ষচরিতে দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের চিত্র ফুটে উঠেছে[৬৭]। কারণ শোষিত কৃষকরা ছুটে এসে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তাদের ক্ষেতের পাকা শস্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ভয় পাচ্ছে না। এর থেকে সমকালীন সময়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের যে সঞ্চার হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যেতে পারে। বাণভট্ট হয়ত হর্ষবর্ধনের প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। কারণ তিনি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বিরাজ করে হর্ষচরিত রচনা করেছিলেন। তাই তার লক্ষ্য ছিল হর্ষ ও তার প্রশাসন যন্ত্রকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা। তবে অসমাপ্ত হর্ষচরিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রশাসনিক ব্যাপারে হর্ষবর্ধনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ পূর্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ চলার দিনগুলিতে কিন্তু নিকটবর্তী চাষের জমিতে কৃষিকর্ম অব্যাহত থাকত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদনকারী কৃষকদের অবস্থা সপ্তম শতকে মোটেই সুখকর ছিলনা। জোর-জবরদস্তি করে শস্য লুঠপাঠ, নানান ধরনের করের বোঝা (যেগুলো আমরা লেখমালায় পাই) তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হর্ষচরিত কৃষকের অভিযোগের মধ্যে যদিও প্রতিবাদী মনোভাব পরিস্ফুট তবুও কৃষক বিদ্রোহের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। সপ্তম এমনকি অষ্টম শতকে পাওয়া যায় না। ভারতীয় ইতিহাসে আদি মধ্যযুগে কৃষক বিদ্রোহের সেরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেকে কৃষক বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে থাকেন।

আর্থ-সামাজিক শূন্যতা ধরা পড়ে সাড়ম্বর যুদ্ধযাত্রায়। বাহিরের ঠাটকে দৃশ্যত বজায় রাখার জন্য ক্ষমতার ব্যাম্ব্রার্ড দিয়ে যেমন দুর্বল শক্তির প্রাণীর প্রকাশ দেখানোর মত। যুদ্ধ অপেক্ষা যুদ্ধের আড়ম্বরই অত্যধিক। মনে হয় এটা একটা উৎসবে পরিণত

হয়েছিল। ব্যাপক যুদ্ধেব কোন ইঙ্গিত দেখা যায না। তাছাড়া বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ কেউই শশাঙ্কব প্রকৃত শক্তিব সঠিক মূল্যাযন কবেন নি। মনে হয দু জনই হর্ষবর্ধনেব আনুকূল্য লাভ কবাব জন্য সমসামযিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাব প্রকৃত বর্ণনা থেকে খানিকটা পিছিযে এসেছিলেন। সামাজিক উচ্চস্তবেব মানুষকে তৃপ্ত বা খুশি কবে বাজ-ক্ষমতা বজায বাখাব চেষ্টা বাকিদেব শুধু বঞ্চিত কবেনি, অনুল্লেখেব অন্ধকাবেও তাদেব ঠেলে দিযেছে। পববর্তী শতাব্দীগুলি, এমনকি একবিংশ শতাব্দীব শেষপ্রান্তে এসেও যে সমস্যা সমাজে গভীব জটিলতাব সৃষ্টি কবেছে, সেই অপবাধী চক্রেব প্রাধান্য এবং শ্রম আব বঞ্চনাব একটা আভাস সপ্তম শতাব্দীব হর্ষচবিতে পাওযা যায় ।

যে কোন কাবণেই হোক, সমাজে যে একটা অস্থিবতা দেখা দিযেছিল সপ্তম এবং অষ্টম শতকেব বহু অভিলেখতেই তাব ইঙ্গিত পাওয়া যায। সংশ্লিষ্ট বাজাদেব সম্পর্কে বলা হযেছে যে তাবা বর্ণাশ্রম ধর্মপ্রতিষ্ঠাপন কবেছিলেন। হর্ষেব বাজত্বকালীন দুটি তাম্রশাসনেও হর্ষেব পিতা প্রভাকব বর্ধনকে 'বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপন প্রবৃত্ত চক্র' বিশেষণে ভূষিত কবা হযেছে । সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ ধর্মানুগত্য, যুদ্ধেব মহড়া প্রভৃতি জানিযে দেয বাজাব ক্ষমতা ছিল প্রধানত প্রথা নির্ভব, যাব চেনা পথে ক্ষমতা বজায বাখা যায। যেখানে বাস্তব অর্থনীতিব কোন পবিচয মেলে না।

সূত্র নির্দেশঃ

১। আব সি মজুমদাব — এ্যানসিযেন্ট ইণ্ডিযা দ্বিতীয অধ্যায পৃষ্ঠা ২৭৮ ২৫১। হেমচন্দ্র বায চৌধুবী পলিটিক্যাল হিস্ট্রী অফ এ্যানসিযেন্ট ইণ্ডিযা এ এল ব্যাশাম স্ট্যাডিজ ইন ইণ্ডিযান হিস্ট্রী এ্যাণ্ড কালচাব।

২। বোমিলা থাপাব ভাবতবর্ষেব ইতিহাস পৃষ্ঠা ১০৫।

৩। বণবীব চক্রবর্তী — প্রাচীন ভাবতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব সন্ধানে পৃষ্ঠা ১৫৪। বোমিলা থাপাব ভাবতবর্ষেব ইতিহাস পৃষ্ঠা ১০৫। আব সি মজুমদাব এ্যানসিযেন্ট ইণ্ডিযা দ্বিতীয অধ্যায পৃষ্ঠা ২৪৮ ২৫১। হেমচন্দ্র বায চৌধুবী পলিটিক্যাল হিস্ট্রী অফ্ এ্যানসিযেন্ট ইণ্ডিযা ক্ল্যাসিকাল এজ এবং এজ অফ ইম্পিবিযাল কনৌজ।

৪। বোমিলা থাপাব — ভাবতবর্ষেব ইতিহাস পৃষ্ঠা ১০৫ ১০৭।

৫। বণবীব চক্রবর্তী — প্রাচীন ভাবতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব সন্ধানে পৃষ্ঠা ১৫৪ ১৭৮।

৬। বণবীব চক্রবর্তী — প্রাচীন ভাবতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব সন্ধানে পৃষ্ঠা-১৭৯।

৭। বণবীব চক্রবর্তী — প্রাচীন ভাবতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব সন্ধানে পৃষ্ঠা ১৫৪ ১৬৫-১৭৯।
বোমিলা থাপাব — ভাবতবর্ষেব ইতিহাস পৃষ্ঠা ১০১-১২৩।
লাল্নজি গোপাল — ইকনমিক হিস্ট্রী অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া।

৮। জ্যোতি ভট্টাচার্য — পবিপ্রশ্ন, বাণভট্টেব হর্ষচবিত সমাজ চিত্র, পৃষ্ঠা-১৪।

৯। হর্ষচবিত — বাণভট্ট, অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুব, পৃষ্ঠা ৮২-৩৩৫।
হর্ষচবিত — বাণভট্ট, পি ভি কানে সম্পাদিত হর্ষচবিত, বোম্বাই ১৯১৩, দ্বিতীয় উচ্ছাস।
হর্ষচবিত — অনুবাদ-অধ্যাপক ই বি কাওয়েল্ এবং এফ্ ডব্লিউ মোস (১৮৯৭ পার্ট) সপ্তম উচ্ছাস।
আর কে মুখার্জী — হর্ষ, (লণ্ডন, ১৯২৬)।

জ্যোতি ভট্টাচায — পরিপ্রশ্ন বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পৃষ্ঠা ১৩ ৪০।

১০। হিউয়েন সাঙ — সি ডি কি ওয়াটারস সম্পাদিত অন হিউয়েন সাঙস ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া (লণ্ডন ১৯০৮ ৫ খ্রী) পৃষ্ঠ ১১ ১৫১।

এস বিল লাইফ অফ হিউয়েন ১ ৬ বাই দি শামন হুই লি (লণ্ডন ১৯১১ খ্রী)।

এস বিল সি ইউ যি বুদ্ধিস্ট রেকর্ডস অফ দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড

ডি ডি দেবহুতি হর্য এ পলিটিক্যাল স্ট্যাডি অক্সফোর্ড ১৯৭০।

১১। হর্ষচরিত পি ভি কানে সম্পাদিত হর্ষচরিত বোম্বাই ১৯১৩ পঞ্চম উচ্ছ্বাস পৃষ্ঠা ২১।

১২। এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা ১৬৩ ১৮১।

১৩। পি ভি কানে সম্পাদিত হর্ষচরিত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অনুবাদিত হর্ষচরিত বাণভট্ট। জ্যোতি ভট্টাচার্য বাণভট্ট হর্ষচরিত সমাজ চিত্র পৃষ্ঠা ২২ ৩১।

১৪। রোমিলা থাপার — ভারতবর্ষের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১১০ ১১১।

১৫। রামশরণ শর্মা — ভারতের সামন্ততন্ত্র পৃষ্ঠা ১০। হর্ষের শিলালিপি এপিগ্রাফিক ইণ্ডিক ॥ ন ২৯ পৃষ্ঠা ৯।

১৬। এস বিল — ট্রাভেলস অফ ফা হিয়েন এ্যাণ্ড সুঙ ইউন (অ লণ্ডন ১৩৫৮)। পৃষ্ঠ ৭৪।

ওয়াটারস — অন উয়ান চয়াঙস ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয় লণ্ডন । পৃষ্ঠা ১৭৮।

১৭। ওয়াটাস - অন উয়ান চুয়াঙস ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া লণ্ডন । পৃষ্ঠা ১৭৬।

এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা — । পৃষ্ঠা ৮৭।

১৮। হর্ষচরিত পি ভি কানে সম্পাদিত হর্ষচরিত।

হর্ষচরিত — বাণভট্ট অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ উচ্ছ্বাস এবং অবচূর্ণিকা পৃষ্ঠা ৩৫১ ৩৬১।

জ্যোতি ভট্টাচায - পরিপ্রশ্ন বাণভট্ট হর্ষচরিত সমাজচিত্র।

১৯। জ্যোতি ভট্টাচার্য — পরিপ্রশ্ন বাণভট্ট হর্ষচরিত সমাজচিত্র পৃষ্ঠা ৩০।

২০। ডি ডি কোশাম্বী — এ্যান ইনট্রোডাকসন টু দি স্ট্যাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী বোম্বাই ১৯৫৬ নবম অধ্যায়।

জ্যোতি ভট্টাচায — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পরিপ্রশ্ন পৃষ্ঠা ৩৯।

২১। হর্ষচরিত বাণভট্ট অনুবাদকঃ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অবচূর্ণিকা পৃষ্ঠা ৩৫১ ৩৬১ পি ভি কানে সম্পাদিত হর্ষচরিত।

২২। জ্যোতিভট্টাচায — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পরিপ্রশ্ন অধ্যায় নয় দশ পৃষ্ঠা ৩৬ ৪০।

২৩। হর্ষচরিত বাণভট্ট — অনুবাদকঃ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

২৪। হর্ষচরিত বাণভট্ট — অনুবাদকঃ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

২৫। হর্ষচরিত, বাণভট্ট — অনুবাদকঃ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

জ্যোতি ভট্টাচার্য — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র, পৃষ্ঠা ২৮ ৩৫।

২৬। জ্যোতি ভট্টাচার্য — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পৃষ্ঠা ২৮-৩৫।

পি ভি কানে সম্পাদিত হর্ষচরিত।

হর্ষচরিত বাণভট্ট অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

২৭। রামশরণ শর্মা ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃষ্ঠা- ২৪, ২৫। অগ্রওয়াল কৃত হর্ষচরিত, পৃষ্ঠা-৪৩। হর্ষচরিত, পৃষ্ঠা-২১৯।

এ এল ব্যাশাম — স্ট্যাডিজ ইন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী এ্যাণ্ড কালচার, কলিকাতা ১৯৬৪। আর কে চৌধুরি, ফিউড্যালিজম্ ইন্ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া।

২৮। রামশরণ শর্মা — ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম্।
রামশরণ শর্মা — ভারতের সামন্ততন্ত্র (বাংলা অনুবাদ) পৃষ্ঠা ১-৬২।
আর কে চৌধুরী ফিউড্যালিজম ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া।
ডি ডি কোশাম্বী — এ্যান ইনট্রোডাকসন টু দি স্ট্যাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী।
এ এল ব্যাশাম — স্ট্যাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কালচার।
সুকুমার সিং — ভারতের গ্রামে সামন্ততন্ত্র (প্রথম অংশ)।
লাল্লনজী গোপাল — ইকোনোমিক হিস্ট্রী অফ নর্দান ইণ্ডিয়া।
রণবীর চক্রবর্তী — প্রাচীন ভারতের আর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে।
২৯। জ্যোতি ভট্টাচার্য — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজ চিত্র পরিপ্রশ্ন পৃষ্ঠা ২২-৩১।
পি ভি কানে — হর্ষচরিত।
আর কে মুখার্জী -- হর্ষ।
এজ অফ ইম্পিরিয়াল কনৌজ ক্ল্যাসিকাল এজ।
ডি ডি দেবহুতি — হর্ষ এ পলিটিক্যাল স্ট্যাডি অক্সফোর্ড ১৯৭০।
৩০। ২৯-এর সমস্ত সূত্র সমূহ।
৩১। জ্যোতি ভট্টাচার্য — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পরিপ্রশ্ন পৃষ্ঠা ২২ ২৮।
৩২। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন লেখমালা -- অক্ষয় কুমার মৈত্র গৌড় লেখমালা পৃষ্ঠা ১৬।
৩৩। পি ভি কানে — হর্ষচরিত।
জ্যোতি ভট্টাচার্য — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পরিপ্রশ্ন পৃষ্ঠা ২২ ২৩।
৩৪। জ্যোতি ভট্টাচায বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পরিপ্রশ্ন পৃষ্ঠা ২২-২৩।
৩৫। জ্যোতি ভট্টাচায — বাণভট্টের হর্ষচরিত সমাজচিত্র পরিপ্রশ্ন. পৃষ্ঠা ২২-৩১।
হর্ষচরিত বাণভট্ট অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ষষ্ঠ ও সপ্তম উচ্ছাস পৃষ্ঠা ২১৯।
৩৬। সুকুমারী ভট্টাচায প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য পৃষ্ঠা ২২১।
৩৭। বাসখেরা এবং মধুবন তাম্রশাসন ডি সি সরকার — সিলেক্ট ইনস্ক্রিপসন, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২২১-২২৬।

ভারতীয় লেখমালায় নামসংখ্যার ব্যবহার

সত্যসৌরভ জানা

চারিত্রিক বিচারে প্রাচীন ভারতীয় লেখমালাকে (chronogram) প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন (ক) তারিখ সম্বলিত লেখমালা এবং (খ) তারিখ বিহীন লেখমালা। ভারতীয় তারিখ সম্বলিত লেখমালায় তারিখ দেওয়া হয়েছে তিন ভাবে। যথা (১) শব্দ (words) ব্যবহারের মাধ্যমে (২) সংখ্যা চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে এবং (৩) শব্দ ও সংখ্যাচিহ্ন উভয় ব্যবহারের মাধ্যমে। মৌর্য সম্রাট অশোকের বেশ কিছু অনুশাসনে কেবলমাত্র শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর রাজ্যবর্ষের উল্লেখ করা হয়েছে[১]। তবে আফগানিস্থানের লাঘমান বা লামঘান উপত্যকায় প্রাপ্ত অশোকের একটি আরামীয় অনুশাসনে ১৬শ তম রাজ্যবর্ষের উল্লেখ করা হয়েছে কেবলমাত্র সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে[২]। আবার স্কাইথো পার্থীয় রাজ পতিকর রাজত্বকালীন তক্ষশিলা লেখতে তারিখটি (৭৮তম বর্ষ = **'সংবতসরয়ে অধসততিময়ে** ২০ (+) ২০ (+) ২০ (+) ১০ (+) ৮ (+) ৮' দেওয়া হয়েছে শব্দ ও সংখ্যাচিহ্ন উভয় ব্যবহারের মাধ্যমে[৩]। আবার কোন কোন লেখমালায় একটি পুরো শ্লোকে তারিখের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি (**"পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে-ষটসু-পঞ্চ-শতাসু চ সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্"**।)[৪]

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও ভারতীয় লেখমালায় তারিখ প্রদানের ক্ষেত্রে অপর এক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হত। এই পদ্ধতিতে সংখ্যা চিহ্ন বা সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে কতগুলি প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করা হত। যেগুলিকে বলা হয় (chronogram) বা নামসংখ্যা। এই প্রতীকী শব্দগুলির মাণ নির্ণয় করতে পারলেই সংশ্লিষ্ট লেখর তারিখ নির্ণয় করা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বেত্তা থেকে শুরু করে অনেকেই এ ধরনের নাম সংখ্যার ব্যবহার করেছেন। গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝার[৫] মতে, শতপথ ব্রাহ্মণ[৬] গ্রন্থের সময় থেকেই ভারতে এ ধরনের নাম সংখ্যার প্রচলন ছিল। তাঁর মতে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৭], পিঙ্গলের ছন্দসূত্র[৮], ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত[৯], লল্লের শিষ্যধিবৃদ্ধি এবং বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তি[১০] প্রভৃতি গ্রন্থে নামসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীকালের ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থেও[১১] নামসংখ্যার উল্লেখ আছে। যবন জাতক গ্রন্থে গ্রন্থ প্রণয়নকাল যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল **"নারায়ণাংক - ইন্দু-মিতাব্দ দৃষ্টম্...."**[১২] অর্থাৎ ১৯১ বর্ষে[১৩] (=১৯১+৭৮=২৬৯ শকাব্দে) এবং **'বিষ্ণুগ্রহর্কে'**[১৪] অর্থাৎ ৭১তম

(-৭১+৭৮ ১৪৯ শকাব্দে) বর্ষে[১৫]। তবে গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপিতে নামসংখ্যার মাধ্যমেই তারিখ দেওয়া হয়েছিল কিনা তা বলা মুশকিল। আবার খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতকে নামসংখ্যার প্রচলন ছিল কিনা প্রমাণাভাবে তাও বলা অসম্ভব, কেননা এযুগের কোন লেখমালায় নামসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায় না।

আদি মধ্যযুগের বেশকিছু লেখমালায় নামসংখ্যা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাণ্ডুলিপিকররা পাণ্ডুলিপিতে তারিখ প্রদানের ক্ষেত্রেও নামসংখ্যার ব্যবহার করতেন। এই রীতিতে 'অংকানাং বামা গতি' অর্থাৎ বাম দিকে থেকে ডান দিকে গণনা করা হত। যদিও কোন কোন লেখমালায় তারিখ প্রদানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রীতি অনুসৃত হয়নি[১৭]।

নামসংখ্যায় তারিখ সম্বলিত আপাতজ্ঞাত সর্বপ্রাচীন লেখটি হল হৈহয়রাজ পৃথ্বীদেবের রাজত্বকালীন লফ ফলক।[১৮] এতে প্রদত্ত তারিখটি হল '৮০৬ (বিক্রম) সংবত' (=৭৪৯ অব্দ)। আলোচ্য ফলকে নামসংখ্যা এবং সংখ্যাচিহ্ন উভয়ের মাধ্যমেই তারিখ দেওয়া হয়েছে। যথা- **'সংবতসরে-রসাভ্রষ্টাতীতে-মাঘাসিত-অধিকে'** অর্থাৎ ৮০৬ অতীতবর্ষের ১লা মাঘ ৮০৬- **অষ্ট=৮, অভ্র=০, রস=৬)**। তবে উপরোক্ত লেখটি আসল না হওয়ায় এর ওপর নির্ভর করা যায় না।

সে ক্ষেত্রে প্রভুতবর্ষের কডফা লেখটিই[১৯] নামসংখ্যা ব্যবহারের আদিতম নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে। এতে তারিখটি পাওয়া যায় নিম্নলিখিত রূপে: **'শক-নৃপ-সংবতসরেষু-শর-শিখি-মুনিষু-ব্যতীতে'** অর্থাৎ শকরাজের ৭৩৫ তম অতীত বর্ষে (৮১৩ অব্দ)। তাহলে আমরা বলতে পারি যে খ্রিষ্টিয় নবক শতকের আদিপর্ব থেকেই প্রাচীন ভারতীয় লেখমালায় নামসংখ্যা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। যদিও পরবর্তীকালের লেখমালায় নামসংখ্যার পাশাপাশি সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়।

দ্বিতীয় সঙ্গমের বিএগুন্ট লেখতে[২০] তারিখটি পাওয়া যায় **'শকাব্দে নাগশৈলধ্যুমনি পরিমিতে ১২৭৮ দুর্মুখাব্দে তৃতীয়ে মাসি'** শকাব্দ ১২৭৮ (**নাগ = ৮, শৈল = ৭, ধ্যুমনি = ১২ : ১২৭৮**) দুর্মুখ অব্দের তৃতীয় মাসে[২১]। অনুরূপ নামসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায় বর্তমানে দিল্লি যাদুঘরে রক্ষিত মহম্মদ-বিন-তুঘলকের একটি লেখতে[২২]।

নানা গ্রন্থপরিক্রমায় দেখা যায় যে—ধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত[২৩] নামক গ্রন্থটির তারিখ দেওয়া হয়েছে **'শকেত্র সপ্তবিংশত্যধিক - সলোপেত দশশতে শারদম, শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য রসৈক বিংশোব্দে'** অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দে, লক্ষ্মণসেনের ২৭তম (**রস=৬, এক=১, বিংশ=২০, = ৬+১+২০=২৭**) রাজ্যবর্ষে। গ্রন্থটির তারিখ দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এক্ষেত্রে তারিখটি দেওয়া হয়েছে আংশিক নামসংখ্যা এবং আংশিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। তাছাড়া ২৭তম রাজ্যবর্ষটি পাওয়া যায় নামসংখ্যার মানগুলির মোট যোগফলের মাধ্যমে (৬+২০+১=২৭)।

ভারতীয় লেখমালায় তারিখ লিখনের ক্ষেত্রে অপর এক পদ্ধতিও অনুসৃত হত। এক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক বেশকিছু বর্ণ বা অক্ষরের সাহায্য নেওয়া হত। এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের মানের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট লেখর তারিখ নির্ণয় করা

যেত[১৭]। গণনার রীতিও ছিল ডানদিক থেকে বামদিকে। তবে দ্বিত্ব অক্ষরের শেষে উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণের মানই কেবল এক্ষেত্রে ধরা হত। এই পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের কোন মূল্য দেওয়া হত না। এর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ মেলে ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকার[১৮] ষড়্গুরুশিষ্য ভাষ্যে। এছাড়া ঋক্, যজু: ও সামবেদীয় নানা ভাষ্যেও এই ধরনের নামসংখ্যার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়[১৯]।

অনেক তম্মুসিদ্ধির একটি লেখতে[২০] তারিখ পাওয়া যায় **'সরযোগ্য শকাব্দে'** রূপে, 'সরযোগ্যে' শব্দটির মাণ নির্ণয় করলে ১১২৭ সংখ্যাটি **(স=৭, র=২, য়=১ = ১১২৭)** পাওয়া যায়। তাহলে আলোচ্য লেখটির তারিখ ১১২৭ শকাব্দে[২১]। এইভাবে অন্যান্য লেখমালায় 'বীবয়ী' (১১২৯)[২২], **'দেহব্যাপ্য'** (১১৮৮)[২৩], **'তুঙ্গশ্রিকা'** (=১২৩৬)[২৪], **'চোলপ্রিয়'** (১২৯৬)[২৫], **'দানশ্লাঘ্য'** (=১৩০৮)[২৬], **'রঙ্গলোক'** (=১৩৩২)[২৭], **'তত্ত্বলোক'** (=১৩৪৬)[২৮] এবং **'বীবলোক'** (১৩৪৯)[২৯] প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চদশ শতক ও তৎপরবর্তীকালের দক্ষিণভারতীয় লেখমালায় এই ধরনের নামসংখ্যা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

আবার ব্যাপকভাবে মালাবার অঞ্চলের এবং কখনো কখনো তেলুগু অঞ্চলের পাণ্ডুলিপির পত্রাংক নির্দেশের ক্ষেত্রেও এক ধরনের নামসংখ্যার ব্যবহার করা হত। এক্ষেত্রেও ব্যঞ্জনবর্ণের মান অনুসৃত হত, তবে তা গণনা করা হত দীর্ঘস্বরের সঙ্গে সংযুক্তির ভিত্তিতে। যেমন-'কা' – ৩৫। 'গা' - ৩৭ ইত্যাদি[৩০]।

এইভাবে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় লেখমালায় নামসংখ্যার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এই রীতি সহজবোধ্য না হওয়ায় ক্রমশ: ভারতীয় লেখমালায় এর সঙ্গে সংখ্যাচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ পঃবঙ্গের বীরভূম জেলায় প্রাপ্ত ১৫৬৫ শকাব্দের একটি লেখর উল্লেখ করা যায়[৩১]। এতে তারিখটি পাওয়া যায়- "...**গিরীশ-মুখ-সম্মুখানন-শর-এন্দু-সংখ্যান্বিতে** শকাব্দ-নিকরে...."[৩২] অর্থাৎ ১৫৬৫ শকাব্দ **(গিরীশ মুখ** -- ৫, সম্মুখানন = ৬, শর = ৫, ইন্দু - ১, অর্থাৎ ১৫৬৫ শকাব্দে ১৬৪৩ – খ্রিষ্টাব্দ**)** এবং **'১৫৬৫'** রূপে[৩৩]। তথাপি সংস্কৃত কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নামসংখ্যা ব্যবহারের ক্ষীণ অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

সূত্র নির্দেশঃ

১। ই. হুলৎসজ (সম্পাদিত) **কর্পাস ইনস্ক্রিপশনাম ইণ্ডিকেরাম**, খণ্ড-১, পৃ. ১৫৫, ৭৪ ও তৎপরবর্তী।
এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা - খণ্ড-৩১, পৃ: ১ ও তৎপরবর্তী।

২। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - **স্টাডিজ ইন দা অ্যারামাইক এডিক্টস অভ অশোক**, কলি., ১৯৮৪, পৃ: ১২-১৪।

৩। স্টেইন কোনো (সম্পা:) - ক. ই. ইণ্ডি., খণ্ড-২ (প্রথম ভাগ), পৃ: ২৮।

৪। **এপি. ইণ্ডি.** - খণ্ড-৬, পৃ: ৪ ও তৎপরবর্তী এবং পৃ: ৩৩-৩৪।

৫। জি. এইচ. ওঝা — **ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা** (হিন্দি) তৃতীয় সংস্করণ, নিউদিল্লি, ১৯৭১, পৃ: ১২১।
ডি. সি. সরকার — **ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফি**, নিউদিল্লি, ১৯৬৫, পৃ: ২২৮-২৩০।

৬। **দ্য শতপথ ব্রাহ্মণ** — দিল্লি ১৯৯০ ১৩ ২ ২ ১ পৃ ২৮৭৪ ২৮৭৫।
৭। এ মহাদেবশাস্ত্রী (সম্পা) — **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ**, খণ্ড ১ অষ্টক ১ ১৫ ১১ ২ দিল্লি ১৯৮৫ পৃ ২১১-২১৫।
৮। ভরতচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং
মহেন্দ্রনাথ পাঠীতীর্থ (সম্পাদিত) — **পিঙ্গলছন্দসূত্রম** কলি ১৮৩৫ ঊনবিংশ খণ্ড অধ্যায় ৭০ প ১৩৫।
৯ মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী (সম্পাদিত) — ব্রহ্মগুপ্তের **ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত এবং ধ্যানগ্রহোপদেশধ্যায়**। বেনারস ১৯০২ পৃ ৬।
১০। জি থিবোট (সম্পাদিত)) **বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা** লাহোর ১৯৩০ পৃ ৩১।
১১। শ্রীমদ গঙ্গাদাস – **ছন্দমঞ্জরী** কলি ১৩৯০ (বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় স্তবক দ্বিতীয় বৃত্তি পৃ ৭৫।
১২। ডি পিঙ্গরী (সম্পাদিত) **দ্য যবনজাতক অভ স্ফুজিধ্বজ** প্রথম খণ্ড ৭৯তম অধ্যায় ৬২তম শ্লোক লণ্ডন ১৯৭৮ পৃ ৫০৬।
১৩। পূর্বোক্ত – দ্বিতীয় খণ্ড ৭৯তম অধ্যায় ৬২তম শ্লোক। পৃ ১৯১।
১৪। পূর্বোক্ত — প্রথম খণ্ড ৭৯তম অধ্যায় ৩০তম শ্লোক পৃ ৫০৫।
১৫। পূর্বোক্ত — দ্বিতীয় খণ্ড ৭৯তম অধ্যায় ৬০তম শ্লোক পৃ ৪১৫।
১৬। **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা** ১১তম খণ্ড নং ১৬/পৃ ২১০ ২৩১ দিল্লি ১৯১১ ১২।
১৭। **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা** ১৯ খণ্ড পৃ ৩৩২।
১৮। পূর্বোক্ত — ১৯তম খণ্ড পৃ ২৯৩ ২৯৬।
১৯। পূর্বোক্ত – চতুর্থ খণ্ড পৃ ৩৩২ ৩৪৯।
২০। পূর্বোক্ত — তৃতীয় খণ্ড পৃ ২১ ৩৫।
২১। পূর্বোক্ত।
২২। পূর্বোক্ত — প্রথম খণ্ড। প ৯৩ ৯৫।
২৩। সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী (সম্পাদিত) — **সদুক্তিকর্ণামৃত অভ শ্রীধরদাস**, কলি ১৯৬৫ পৃ ৬৪১।
২৪। এ সি বার্ণেল — **এলিমেন্টস অভ সাউথ ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি**, ভারত ১৯৬৮ পৃ ৭৯ ৮০।
২৫। পূর্বোক্ত – পাদটীকা ৪ পৃ ৭৯।
২৬। পূর্বোক্ত — পৃ ৮০।
২৭। **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা** – সপ্তম খণ্ড, ন -২১ পৃ ১৫২ ১৫৫।
২৮। পূর্বোক্ত।
২৯। **এপি ইণ্ডি**, সপ্তম খণ্ড, নং-১৭ পৃ ১১৯-১২৮।
৩০। **এপি ইণ্ডি**, চতুর্থ খণ্ড নং-১৭ পৃ ১৪৭ ১৪৮।
৩১। **এপি ইণ্ডি**, তৃতীয় খণ্ড নং-১২এ/পৃ ৭০-৭১।
৩২। **এপি ইণ্ডি**, চতুর্থ খণ্ড ন, ২৭ পৃ ২০৩।
৩৩। **এপি ইণ্ডি**, অষ্টম খণ্ড নং-৩১ পৃ ২৯৮ ৩০৬।
৩৪। **এপি ইণ্ডি**, চতুর্দশ খণ্ড নং-২ পৃ ৬৮-৮৩।
৩৫। **এপি ইণ্ডি**, অষ্টম খণ্ড নং-৩২, পৃ ৩০৬-৩২১।
৩৬। **এপি ইণ্ডি**, ১৭তম খণ্ড নং-৮ পৃ ১১০ ১১৭।
৩৭। এ সি বার্ণেল — **এলিমেন্টস্ অভ্ সাউথ ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি**, ভারত ১৯৬৮, পৃ ৮০।
৩৮। এ কে ভট্টাচার্য — **এ কর্পাস অভ ডেডিকেটারি ইনস্ক্রিপশনস্ ফ্রম টেম্পলস্ অভ্ ওয়েস্ট বেঙ্গল**, কলি ১৯৮২, পৃ ৭১।
৩৯। পূর্বোক্ত।
৪০। পূর্বোক্ত।

প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের সামন্ত

রঞ্জুশ্রী ঘোষ

প্রাচীন বাংলায় গুপ্তরাজত্বের শেষ দিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির কথা জানা যায় তাদের প্রচারিত ভূমিদানপত্রের মাধ্যমে। উত্তরবাংলায় গুপ্তশাসনের প্রায় একশত দশ বৎসরের এক ধারাবাহিক ইতিহাসের সাক্ষ্য আমরা লেখমালা থেকে পাই। এই শাসনব্যবস্থা অবশ্যই গুপ্তযুগের প্রদেশ শাসনবিভাগের সাথে যুক্ত। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের একটি ভুক্তি বা প্রদেশ। কিন্তু গুপ্তযুগের শেষের দিকে যেসব রাজবংশের উদ্ভব ঘটতে থাকে সেগুলি বাংলার ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকায় এবং কখনও কখনও একই সময়ে একাধিক রাজবংশের পাশাপাশি অবস্থান থাকায় বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের সূত্রপাত দেখা যায়। কিন্তু এইসাথে শাসনযন্ত্রে নূতন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা গুপ্ত ও গুপ্তপরবর্তী যুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তনমুখী গতির ফলাফল। এই পরিবর্তনে প্রশাসনিক নীতি ও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের প্রভাব অবশ্যই ছিল। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক কাজকর্মকে আবার প্রচলিত সামাজিক রীতিও প্রভাবিত করে থাকতে পারে। দীর্ঘকালীন প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় রীতিনীতিতে লঙ্ঘন করা কোন বিচক্ষণ শাসকেরই সম্ভব হয় নি। এর প্রমাণ ইতিহাসে অনেক আছে এবং গুপ্তশাসনগুলি থেকেও এর প্রমাণ নেওয়া যায়।

উত্তরবাংলায় গুপ্তশাসন অব্যাহত থাকাকালীন কুমিল্লা অঞ্চলে বৈন্যগুপ্ত শাসন করছিলেন। বৈন্যগুপ্ত গুপ্তবংশীয় কিনা তা নিশ্চিত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে বৈন্যগুপ্তের যে শাসনযন্ত্রের পরিচয় গুণাইঘর লেখয় পাওয়া যায় তা মহান গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন যন্ত্রের অনুরূপ নয়। এই লেখয় বলা হয়েছে যে উত্তরমণ্ডলের অন্তর্গত কান্তেড়দক গ্রামের অধিবাসী মহারাজ বৈন্যগুপ্তের পাদদাস মহারাজ রুদ্র দত্তের অনুরোধে ক্রীপুরে অবস্থিত জয়স্কন্ধাবার থেকে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত একাদশ পাটক অকর্ষিত ভূমি অগ্রহার হিসাবে দান করেছেন। রাজার এই আদেশ কুমারমাত্য রেবজ্জস্বামীকে জানিয়েছেন **মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেন। ইনি শুধু মহারাজ শ্রীমহাসামন্তই নন। তাঁকে বলা হয়েছে দূতক, মহাপ্রতীহার, মহাপিলুপতি, পঞ্চাধিকরণোপরিক, পাট্যুপরিক এবং পুরপালোপরিক। পাট্যুপরিক পদের অর্থ স্পষ্ট নয়। দূতক পদটি নূতন শুধু নয় ভূমি হস্তান্তরের জন্য ক্রেতার আবেদন সরাসরি স্থানীয় প্রশাসনবিভাগে করবার যে পদ্ধতি পুণ্ড্রবর্ধনে প্রচলিত এখানে এইপ্রথম ভিন্ন এক পদক্ষেপের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যা**

পরবর্তীকালে পালযুগের শাসনকাঠামোয় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নেয়। গুণাইঘর লেখয় অবশ্য আবেদনটি বিজয় সেনই বহন করে নিয়ে গেছেন কিনা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। আবেদন মঞ্জুরের ব্যাপারটি কুমারমাত্যদের অবগত করিয়েছেন তিনি তা বলা হয়েছে। পরবর্তীযুগের ভূমিদানপত্রে **দূতক** হিসাবে অনেকক্ষেত্রেই উচ্চপদাসীন রাজকর্মচারী এবং এমনকি যুবরাজকেও দেখা গেছে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমিদান সংক্রান্ত অনেক ক্ষুদ্র কাজ করছেন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং তা ব্যক্তও হচ্ছে শাসনাবলীতে এর প্রমাণ প্রায়শই পাওয়া যায়। সম্ভবত ধর্মীয় দান হিসাবে যে কোন কাজেই পূণ্যলাভ সম্ভব এরকম বিশ্বাস এর পেছনে কাজ করতে পারে।

গুণাইঘর লেখটি বহুকারণে উল্লেখযোগ্য। গুপ্তপরবর্তীযুগে বাংলার প্রশাসনে যে ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায় তার প্রথম সাক্ষাৎ এখানেই পাওয়া যায়। ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রাধান্য বলার কারণ এই যে স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে বিষয়াধিকরণে নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ইত্যাদি বাণিজ্যিক ও কারিগরী বৃত্তির লোকেদের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এমনকি, শাসনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের পরিকাঠামো ও সামান্য হলেও কার্যাবলীর যে পরিচয় গুপ্ত দানপত্রে পাওয়া যায় তাও ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যায়। এই গুণগত পরিবর্তনের প্রথম সূত্রপাত এই লেখতেই পাওয়া যায়। এই শতকেরই গোপচন্দ্রের (৫৪০ খ্রীঃ - ৫৮০ খ্রীঃ) মল্লসারুল লেখয়[১১] দেখা যায় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বক্কটক বীথি অধিকরণের সাথে যুক্ত স্থানীয় প্রতিনিধিদের অধিকাংশই **অগ্রহারিণ** বলে অভিহিত। তাঁদের অধিকাংশই আবার মহত্তর। ভূমি কর্মচারী তালিকায় একজন অগ্রহারিক-র[১২] কথাও আছে। অগ্রহার[১৩] ভোগীরাই **অগ্রহারিণ** আখ্যা পেয়েছেন। অর্থাৎ লেখটি প্রচারিত হওয়ার পূর্ব থেকেই তাঁরা **অগ্রহার** ভোগ করে আসছিলেন এবং লেখটি যখন উৎকীর্ণ হয় তখন তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মত সম্পদ ও সেই সূত্রে সম্মান অর্জন করে বীথি অধিকরণে প্রতিনিধিত্ব করার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। গোপচন্দ্রেরই জয়রামপুর শাসনে এক **মহাগ্রহারের** কথা বলা হয়েছে। হয়ত অগ্রহারভুক্ত ভূমির বিশালতা **মহাগ্রহার** আখ্যার জন্য দায়ী। বিষয়াধিকরণে **অগ্রহারিণের** উপস্থিতি এই প্রথম। গুপ্ত শাসনকাঠামো থেকে গুণগত পার্থক্যের পরিচয় এখানেও আছে। যদিও পার্থক্যের বীজ বপন করা হয়েছে গুপ্ত যুগে বা তারও আগে যার লিখিত প্রমাণ নেই। কিন্তু ফলাফল থেকে পূর্ববর্তী কাজের চরিত্র অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। রাজা অগ্রহার হিসাবে ভূমিদান করেছেন ব্রাহ্মণদের। এই অগ্রহার ভোগী ব্রাহ্মণেরাই অধিকরণ মহত্তর হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন ষষ্ঠ শতকে। দেখা যাচ্ছে অগ্রহারিগণের উত্থান মহান গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন অঞ্চলের বাইরে বা তাঁদের পরাক্রম যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে বাংলায় সেই সময়ে। গুণাইঘর লেখটি অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এতেই প্রথম সামন্ত অভিধাটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে কয়েকশতক ধরে তাম্রশাসনগুলিতে সামন্তরা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত থেকেছেন। এই সামন্তদেরই বিভিন্ন পণ্ডিত ফিউডাল লর্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সামন্তরা কে ছিলেন, শাসনযন্ত্রে তাঁদের ক্ষমতা ও অবস্থান কেমন ছিল তা জানার জন্য আমাদের সাহিত্যিক সূত্র ও লেখমালার সাহায্য নিতে হবে। বাংলায় সামন্তদের কথা ষষ্ঠ শতকে প্রথম উল্লিখিত হলেও সাহিত্যে কিন্তু উল্লেখ ঘটেছে অনেক আগে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে। লাললজি গোপাল তাঁর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-র টীকায় **সামন্ত** বলতে প্রতিবেশী গ্রামবাসীকে বোঝানো হয়েছে। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে** বশিষ্ঠের ধর্মসূত্রে ও বিভিন্ন স্মৃতিতে সীমা-সংক্রান্ত বিবাদ সম্পর্কে আইনগুলিতে তা প্রথমে মীমাংসার দায়িত্ব সামন্তকে দেওয়া হয়েছে। কুল্লুক এবং বিজ্ঞনেশ্বর সামন্ত অর্থে গ্রামের চতুঃসীমায় বসবাসকারী গ্রামবাসীকে বুঝিয়েছেন[১২]। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে প্রাচীনকালে গ্রামাঞ্চলে সামন্তরা ছিলেন। একটি গ্রামের সীমা বরাবর উল্লেখযোগ্য যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরাই হয়ত সামন্ত হিসাবে অভিহিত হতেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় ভূমি লেনদেন সংক্রান্ত যে চিত্র গুপ্তযুগীয় দলিলে পাওয়া যায় তাতে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর[১৩] সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও সামন্ত অনুল্লিখিত। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে **সামন্ত** আখ্যাধারী ব্যক্তির প্রকৃত ভূমিকা কি ছিল তার জন্য লেখ থেকেই সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এরজন্য আমাদের আরও একটু পিছনের সাক্ষ্য প্রমাণাদি অনুসন্ধানের প্রয়োজন। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালীন দুটি দামোদরপুর লেখয়[১৪] পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসক শুধু **উপরিক** অভিধায় অভিহিত। কিন্তু একই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত একই উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ বুধগুপ্তের রাজত্বকালীন দুখানি দামোদরপুর লেখর[১৫] পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসককে বলা হয়েছে **উপরিক মহারাজ**। এখানে মহারাজ বিশেষণটি পরবর্তীকালের অতিরিক্ত সংযোগ। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রদেশকর্তার সম্মান বেড়েছে, অন্যদিকে বুধগুপ্ত ঠিক প্রথম কুমারগুপ্তের মতো অবিসংবাদী ক্ষমতা হয়ত ভোগ করছেন না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যেটি তা হল **মহারাজ** অভিধাটিকে একটি শাসন বিভাগের শাসকের বিশেষণ হিসাবে পাওয়া গেল। সুতরাং **মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত** বিজয়সেন একজন শাসক ছিলেন এটা বোঝা গেল। **মহাপ্রতীহার**[১৭] এবং **মহাপিলুপতি**[১৮] অভিধাগুলিতে তাঁকে উচ্চপদে আসীন রাজকর্মচারী বলে চিনতে ভুল হয় না, তেমনি পঞ্চাধি **করণোপরিক** হিসাবে তিনি যে পাঁচটি অধিকরণের শাসক তাও পরিষ্কার। অন্য একটি উদাহরণ থেকেও **মহারাজ মহাসামন্ত** অভিধার সাথে শাসকপদের সম্পর্ক খোঁজা যেতে পারে। গুণাইঘর লেখর প্রায় শত বৎসর পর উৎকীর্ণ হওয়া দুখানি লেখ পাওয়া গেছে বালেশ্বর জেলার সোরো[১৯] গ্রামে। এটি আম্রতক্ষক জয়স্কন্ধাবার থেকে **পরমভট্টারক পাদানুধ্যাত** অর্থাৎ রাজার চরণের অনুগৃহীত গোপচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম বর্ষে উৎকীর্ণ বর্তমান বালেশ্বর জেলার জয়রামপুরে প্রাপ্ত এক লেখয়[২০] দেখা যায় মেদিনীপুর বালেশ্বর অঞ্চলে একটি গ্রাম ক্রয়ের আবেদন জানিয়েছেন **মহাসামন্ত মহারাজ** অচ্যুত। অচ্যুত-র ঊর্ধ্বতন শাসক হলেন **কার্তাকৃতিক কুমারমাত্য রাজানক** বিজয়বর্মা। ইনি সম্ভবত দণ্ডভুক্তির প্রদেশকর্তা ছিলেন। এখানে মহাসামন্তের অধীন অঞ্চলটির উল্লেখ নেই।

লেখব সাক্ষ্যেব ভিত্তিতে দেখা গেল গুপ্তযুগেব অন্তিমলগ্নে প্রাচীন বাংলাব দুইপ্রান্তে কুমিল্লা ও মেদিনীপুব বালেশ্বব অঞ্চলে সামন্ত ছিলেন আঞ্চলিক কোনও শাসনবিভাগেব শাসক। সীমান্তস্থিত কোনও অঞ্চলেব শাসক হিসাবে **সামন্ত** আখ্যাটি প্রযুক্ত হতে পাবে। কাবণ **সামন্ত** কথাটিব আভিধানিক অর্থ সীমান্তস্থিত। আবাব সামন্তবা বাজ্যপ্রান্তে অবস্থিত বৃহৎ ভূস্বামীও হতে পাবেন যাঁদেবকে স্থানীয় প্রতিপত্তিব কাবণে বাজশাসন কাঠামোব অন্তর্গত কোনও বিভাগীয় স্তবে শাসকপদ দেওয়া হত এবং তাঁদেব অধীন অঞ্চল **মণ্ডল** আখ্যা দিয়ে চিহ্নিত কবা হত। বাংলাব প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে গুপ্ত প্রভাব ক্ষীণ সেখানে কিছু বা দু/একজন সামন্ত নিজেব অঞ্চল প্রায় স্বাধীনভাবে পবিচালনা করতেন। ফবিদপুব লেখব বাবকমণ্ডল বিষয়টিব ক্ষেত্রে মনে হয় এটি সামন্তাধীন একটি মণ্ডল ছিল এবং পবে ধর্মাদিত্যেব অধীনে বাজশাসনকাঠামোব বিষয় হিসাবে শাসনবিভাগীয় এককে পবিণত হয়।

সামন্তদেব উত্থান তাই আঞ্চলিক বাজশক্তিব তুলনামূলক ক্ষুদ্রপবিসবে যেখানে বৃহৎ কৃষিভূমিব মালিকদেব প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবে অপ্রতিবোধ্য ছিল। কিন্তু সামন্তবা বিগত শতকেব ভূমিদানেব প্রথাব ফলে উদ্ভূত এক গোষ্ঠী এবকম যোগসূত্র নেই। সামন্তদেব উত্থানেব পব ববধ্ব ভূমিদানপুষ্ট অগ্রহাবিণ গোষ্ঠী ক্রমশ বিলীয়মান হয়ে গেছে। **মহাবলাধিকৃত অন্তরঙ্গ মহাসান্ধিবিগ্রহিক** সোমদত্ত প্রচাব কবেছেন। এই সময় সাবেক আহাব বিষয়টি শাসন কবছিলেন এক **মহাসামন্ত মহাবাজ**। এই লেখটি শশাঙ্কেব বাজত্বেব পঞ্চদশ বর্ষে প্রচাবিত বলে ডি সি সবকাব উল্লেখ কবেছেন। শশাঙ্কেব বাজত্বেব উনবিংশতিতম বর্ষেব মেদিনীপুব তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে এই সোমদত্ত যখন উৎকলদেশ ও দণ্ডভুক্তিব শাসকপদে আসীন তখন তাঁব অভিধা সামন্ত মহাবাজ। শশাঙ্কেব বাজত্বকালীন এই শাসনগুলি সপ্তম শতকেব প্রথম পাদেব অন্তর্গত। শতবৎসব পূর্বেব অবস্থাটি আবাব বিবেচনা কবা যাক। সেই সময় সামন্তশাসিত অঞ্চলটিব স্বরূপ কি ছিল তাব হদিশ খুব স্পষ্টভাবে নেই। গুণাইঘব লেখব মহাবাজ বুদ্রদত্তব গ্রামটি উত্তব মণ্ডলে অবস্থিত। ফবিদপুবে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যেব শাসনে[১১] দান কবা ভূমি ভবিষ্যতে যথাযথভাবে বক্ষাব জন্য সামন্ত বাজাদেব প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এই শাসন ও ফবিদপুবেই প্রাপ্ত আবও তিনখানি তাম্রশাসনে বাবক মণ্ডল বিষয়টিব কথা জানা যায়। পূর্বোল্লিখিত মেদিনীপুব তাম্রশাসনেই দেখা যাচ্ছে সামন্ত সোমদত্ত যে গ্রামটি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে দান কবলেন তা মণ্ডলেব অন্যান্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র কবে দান কবা হল, অর্থাৎ মণ্ডলভুক্ত অন্যান্য অংশের উপব প্রযুক্ত কব দান কবা গ্রামটিব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটা বোঝানো হল। এখানেও **মণ্ডল** আখ্যাটি মনে হয় সোমদত্তেব শাসনাধীন অঞ্চলকে বুঝিয়েছে। পববর্তীকালে পালযুগে মণ্ডল আখ্যায় শাসন বিভাগেব উল্লেখ প্রচুর পাওয়া যায়। সেযুগে সামন্তরাও ছেদহীনভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে বাংলার মূল অংশে সামন্তাধীন অঞ্চলকে মণ্ডলের সাথে বোধহয় যুক্ত কব্য যায়।

ষষ্ঠ শতকেব আরও একটি লেখয় সামন্তব উল্লেখ আছে।

সূত্র নির্দেশঃ

১। [illegible] [illegible] ভুখণ্ড।

২ [illegible] সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রাগজ্যোতিষ [illegible] [illegible] বর্তমান বাংলাদেশের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল

৩ [illegible] ৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবন্ধে [illegible] নলিনীকান্ত ভট্টশালী [illegible] [illegible] ১১৩ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা [illegible] [illegible] (১৯২৩-২৪) প ৩৪৭-৪৮ এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিস্ট্রি [illegible] [illegible] (১৯১৯ ১৯২০) প ১১৩-১৪৫।

৪ [illegible] ভূমিদান [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] পঞ্চমহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাৎ **নীবীধর্মাক্ষয়েণ লভ্যাতে তদর্থ সমাদ্যানেনৈব ক্রমেণ দাতুম।** [illegible]

৫ [illegible] [illegible] [illegible] ১ [illegible] ৩২০ [illegible]

৬ [illegible] [illegible] মহাদেবের ভক্ত বলে বর্ণিত।

৭। সামরিক রক্ষা শিবির।

৮। [illegible] পর্যন্ত [illegible]

৯। পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের ভূমি [illegible] [illegible] এদের সাক্ষ্য [illegible]।

১০ [illegible] বিজয়সেন [illegible] ১৫৫ ৬১।

১১ [illegible] প্রতিনিধিরূপে

১২ [illegible] [illegible] ইতিহাসের সন্ধানে কলকাতা ১৯৯৮ প ১০৪ ৭৮।

১৩। [illegible] গোপাল সামন্ত [illegible] জার্নাল **অব রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি** [illegible] ৩।

১৪। গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত থেকে [illegible] দুটি সামাজিক গোষ্ঠী মহত্তর ও কটুম্বী নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উপস্থিত [illegible] ভূমিকা ছিল দলিলগুলি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৫। সূত্র নির্দেশ ৩।

১৬। সূত্র নির্দেশ ৩।

১৭। প্রাসাদের প্রধান দ্বাররক্ষক।

১৮। হস্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক।

১৯। ননীগোপাল মজুমদার ফোর কপার-প্লেটস ফ্রম সোমে [illegible] এ ই ২৩ (১৯৩৫-৩৬) প ১৯৭ ২০৩।

২০। দীনেশ চন্দ্র সরকার পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত কলকাতা ১৩৯২ পৃ ১১৭।

২১। দীনেশ চন্দ্র সরকার সি ই দিল্লী ১৯৮৩ পৃ ২৬ ২৭।

২২। এফ ই পার্জিটার থ্রী কপার প্লেট গ্রান্টস ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল দ্য ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি ৩৯ (১৯১০) পৃ ১৯৩-২১৬।

২৩ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ট্রেড ক্রাফটস এণ্ড রুরাল সেটলমেন্টস অ্যাণ্ড রুরাল সোসাইটি ইন আর্লি মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া কলকাতা ১৯৯০ পৃ ৫০।

২৪। এস আর বাতিগুরু জয়রামপুর কপার প্লেট ইনসক্রিপশনস অব দ্য টাইম অব গোপচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ জার্নাল ১১ ১৯৬২ পৃ ২০৬ ২২৪।

উল্কি — ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে

সঙ্গীতা চৌধুরী

উল্কি এই কথাটির সঙ্গে আমরা মোটামুটি সকলেই বেশ পরিচিত। প্রাচীন বিশ্বের বহু দেশে উল্কি আঁকার প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষেও উল্কির জয়যাত্রা সেই সময়েই শুরু। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ভারত তথা সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, উপজাতির লোকেদের মধ্যে দেহের বিভিন্ন জায়গায় উল্কি আঁকার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, উল্কি কি? খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে 'উল্কি' হল এমন এক চিহ্ন বা চিত্র যা দেহের যে অংশে খোদাই করা হয় সেখানে সেটি স্থায়ীরূপে রয়ে যায়।

সমগ্র বিশ্বে উল্কির জন্মকাল বা উদ্ভব ও বিস্তার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত পাওয়া যায়। হার্বার্ট স্পেনসারের মতে মৃত আত্মাদের প্রতি রক্ত উৎসর্গের প্রথার মাধ্যমেই এই উল্কির প্রচলন। রক্তদানের পর যে চিহ্ন থেকে যেত সেগুলিকে ঐ ব্যক্তি তার মৃত পূর্বপুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় রাখার চিহ্ন বা স্মারক হিসাবে বহন করত। জেভনও এই একই মত পোষণ করেন। জেভন ও স্পেনসারের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে, মধ্য ভারতের সোনার-বা।( ) এরা ভগবানের উদ্দেশে৷ রক্তদান করে এবং তারপর তাদের হাত, পায়ের ঐ চিহ্নগুলোকে উল্কি হিসাবে স্থায়ীভাবে রেখে দেয়। এলিয়ট্ স্মিথের মতে, উল্কির প্রচলন উপকূলবর্তী স্থান থেকে শুরু হয়েছে, সেজন্যই বোধহয় সারা বিশ্বে সামোঁয়া সমেত অনেক উপকূলবর্তী জাতি, উপজাতির মধ্যে উল্কি আঁকার বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

সারা বিশ্বে উল্কির প্রচলন যেমন প্রাচীনকালে ছিল তেমন আজও রয়েছে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস কিন্তু আমার এই প্রবন্ধে আমি উল্কিকে শুধুমাত্র ভারতীয় পটভূমিতে ও পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীনকালে উল্কি আঁকা হত বিভিন্ন গাছের কাঁটা ও বকুল গাছের কাঁটা দিয়ে। এছাড়াও সজারুর কাঁটা দিয়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে আঁকা হত। তারপর ঐ ক্ষতের উপর মানুষের দুধ ও একপ্রকার গাছের আঁঠা মিশিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হত। বর্তমানে অনেক জায়গায় নীল রঙের ছবি এঁকে তার উপর সুচ ফুটিয়ে ছিদ্র করে দেওয়া হয়। পরের দিন ঘা-এর জায়গাগুলি ফুলে ওঠে কিন্তু পরে শুকিয়ে যায়। তবে আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন তথা আধুনিক ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই উল্কি বয়ঃসন্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্কতার সঙ্গে যুক্ত। বয়ঃসন্ধিকালীন অনুষ্ঠান ভারতে নতুন নয়। বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের এক নবজন্ম ঘটে। এই সময়েই মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রকৃত নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। উল্কি আঁকা তার মধ্যে একটি। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কতার চিহ্ন হিসাবেই উল্কি আঁকা হয় না। এছাড়াও উল্কি আঁকার পিছনে রয়েছে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস রোগমুক্তি ও বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিশ্বাস।

বয়ঃসন্ধিকালে যে সমস্ত জাতি ও উপজাতির লোকেরা উল্কি আঁকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে মনে আসে সাওঁতাদের[১১] কথা। এরা ভারতের উপকূলবর্তী একটি উপজাতি। এদের ছেলেরা প্রাচীনকাল থেকে বয়ঃসন্ধিকালেই উল্কি আঁকে না হলে এদের বিয়ে হয় না এবং গরীব ও নীচু ঘরে জন্ম বলে উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে ও সমাজে গুরুত্ব হারায়।

আর একটি উপজাতি হল ভারিয়া রা। এদের বসবাস মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর অঞ্চলে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার সাথে সাথেই এরা উল্কি আঁকে। এরা মুরগী, মুকুট বা ধন্দো নামক ছয়টি বিন্দু সম্বলিত চিত্র আঁকে।

মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের আর এক উপজাতি হল বিজ্ঞওয়ার রা। এদের মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে উল্কি আঁকে, হয় বিয়ের আগে বা বিয়ের পরে। তবে এই উল্কি আঁকার খরচ সম্পূর্ণ মেয়ের বাবার। এরা সাধারণতঃ বুকে, হাতে, কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত, প থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফুল পাতা ও বিভিন্ন লাইন আঁকে। এদের মেয়েদের উল্কি অবশ্যই আঁকতে হবে, না হলে কো. পুরুষ এদের হাতে জল খায় না।

বিলাসপুর ও ছোটনাগপুর এলাকার ধানওয়ার মেয়েরা বিয়ের ঠিক আগে বা পরে বাপের বাড়িতে উল্কি আঁকে। এদের মধ্যেও পুরুষেরা যে মেয়ের উল্কি আঁকা নেই তার হাতের জল খায় না। এদের মনেও বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পরে এই উল্কিই হবে তাদের চেনার একমাত্র উপায়।

মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের রায়পুর, বস্তার জেলার বসবাসকারী হলবা জাতের মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে উল্কি আঁকে তবে যায়। এরা পায়ের গোড়ালির উপরে চার জোড়া লাইন এঁকে থাকে। হলবা জাতের মেয়েরা প্রথম উল্কি আঁকে তাদের চার পাঁচ বছর বয়স হলে। তখন তারা নাকের বাঁদিকে বিন্দু ও থুতনির মাঝখানে ও ডান কাঁধে উল্কি এঁকে থাকে। তারা সাধারণতঃ অদ্ভুত ত্রিভুজাকৃতি চিহ্ন, বিন্দু ও লাইন হাতে এঁকে থাকে। বা হাতে তারা আঁকে সিকরি বা শিকল জাতীয় চিহ্ন। তেলি ও গাওর উপজাতির মেয়েরাও সিকরি এঁকে থাকে। সাধারণতঃ দেওর জাতির মেয়েরাই এই উল্কি এঁকে দেয়। বিনিময়ে তারা খাদ্যশস্য ও উল্কি আঁকার সময়ে মেয়েটার পরনে যে শাড়ি থাকে সেই শাড়িটা পারিশ্রমিক হিসাবে নেয়। এদের জাতের কোন বাচ্চা যদি দেরিতে হাঁটতে শেখে, তাহলে ঐ বাচ্চার উরুর উপরে উল্কি এঁকে দেয়। তাদের বিশ্বাস, এতে বাচ্চাটি তাড়াতাড়ি হাঁটতে শিখবে। এদের মেয়েরা শরীরের বিভিন্ন অংশে উল্কি

আঁকে। এরা বেশিরভাগ গয়নার ছবি আঁকে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এই গয়না যেমন এদের সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনই মৃত্যুর পর একমাত্র এরাই তাদের সাথী হয়ে থাকবে।[১১]

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর বা তার আশপাশের কোমার উপজাতির মহিলারা বড় হয়ে বা বিয়ের আগে উল্কি আঁকে। তারা কাঁধে ময়ূরের, পিঠে কাঁকড়া বিছার ছবি ও কিছু বিন্দুর ছবি আঁকে আঙুলে। হাতে এবং পায়ে তারা বিন্দু দিয়ে গহনার চিত্র আঁকে। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরবর্তী দুনিয়াতে তারা এই গয়নাগুলি বিক্রি করতে পারবে। কোমার মহিলারা হাঁটুর চারপাশে বিন্দু দিয়ে লাইন আঁকে। তাদের বিশ্বাস, এই হাঁটুর উল্কি তাদেরকে স্বর্গারোহণে সাহায্য করবে।

ছোটনাগপুরের ওরাঁও ছেলেরা বাঁ হাতের নীচের দিকে উল্কি আঁকে। এই উল্কি এঁকে দেয় তাদের জাতের বড় ছেলেরা। এই উল্কিটি অবশ্যই একটি বালকের বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষত্বে পদার্পণের প্রতীক হিসাবেই এঁকে দেওয়া হয়। যে পুরুষের হাতে উল্কি নেই সে ধূমকুড়িয়ার সমাজে ঠাঁই পায় না। এদের মেয়েরা কপালে তিনটি লম্বাকার দাগ দিয়ে উল্কি আঁকে। এছাড়াও হাতে, বুকে, হাঁটুতে এবং গোড়ালিতে এরা উল্কি এঁকে থাকে। এদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্তমান যে, হাঁটুর উল্কি তাদের স্বর্গে যাবার পথ সুগম করে। ওরাঁওদের মধ্যে যদি কোন বাচ্চা বেশি কাঁদে তবে তার চিবুকে ও নাকে উল্কি এঁকে দেওয়া হয়। এতে নাকি বাচ্চাটির কান্না কমে যায়।

বিহারে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির, উপজাতির ও আদিবাসী লোকেরা, বিশেষ করে মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে, বিয়ের আগে তো উল্কি আঁকেই, বিয়ের পরেও এদের উল্কি আঁকতে হয়। তা না হলে কেউ এদের হাতে অর্থাৎ যে মেয়েটি উল্কি আঁকেনি তার হাতে জল খাবে না। তাছাড়া তাদের বিশ্বাস যে, বিয়ের আগে আঁকা উল্কি মৃত্যুর পরে তাদের পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের সাথে মিলতে সাহায্য করবে। এছাড়াও তাদের মতে এটিই একটিমাত্র জিনিস, যা তাদের সঙ্গে আজীবন সঙ্গী হয়ে থাকবে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পূর্বাঞ্চলের মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্কতার লক্ষণ দেখা দিলেই উল্কি আঁকতে হয় না হলে তাদেরকে রান্না করতে দেওয়া হয় না। এরা যে ছবিটি আঁকে তার এক অদ্ভুত নাম আছে। সেটি হল 'সীতা কি রসোই' বা 'সীতার রান্না ঘর'।

বাংলায় বসবাসকারী বেশকিছু জাত আছে যাদের মেয়েরা দুই ভ্রূ র মাঝে তারা চিহ্নের উল্কি না আঁকলে তাদের হাতে কেউ জল খায় না।[১২]

চমার নামে আরও একটি জাতির লোকেরা বিশ্বাস করে যে, যেসব মহিলারা উল্কি আঁকে না, তারা স্বর্গে গিয়ে তাদের মা বাবার দেখা পায় না। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, যেসব মেয়েরা উল্কি আঁকবে না, পর জন্মে তারা ভূতনী হয়ে জন্মাবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আবর উপজাতির ছেলেরা উল্কি না আঁকলে বিয়ে করার যোগ্যতা হারায়।

শুধুমাত্র বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পূর্ণতা লাভ করলেই যে মানুষ উল্কি আঁকে তা নয়। বিভিন্ন রকম বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েও মানুষ উল্কি আঁকে। যেমন হো উপজাতি

মেয়েরা উল্কি দিয়ে তীব আঁকে, যেটা এরা এদের জাতীয় চিহ্ন বলে মনে করে। এছাড়াও জুয়ারে, বীবহোড়, খেরিয়া প্রভৃতি উপজাতির মেয়েরা তিনটি দাগ দিয়ে কপালে, তাছাড়া নাকে, হাতে পায়ের গোড়ালিতে ও বুকে উল্কি আঁকে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাসকারী দ্রাবিড়ীয় বংশোদ্ভূত কোরওয়া উপজাতির মেয়েরা উল্কি আঁকে। এদের এবং এই অঞ্চল বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতির মেয়েদেব উল্কি এঁকে দেয় বাডি জেলার মেয়েরা। তাবা এদের বুকে ও হাতে উল্কি এঁকে দেয়। তাদের মধ্যে উল্কি আঁকার কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হয় না। এদের উচ্চবংশের সম্ভ্রান্ত মহিলারাও উল্কি আঁকে। তবে উল্কি বিনা কাউকে অচ্ছুত বলে মনে কবা হত না, বা হয় না।

ঘাসিয়া জাতের মেয়েরা বুকে, হাতে, উরুতে, পায়ের পাতায় উল্কি আঁকে। তাদের বিশ্বাস উল্কি না আঁকলে, মৃত্যুর পর ভগবান স্বর্গে বিমুখ হন। এমনকি তাদেব তাড়িয়েও দেন। কখনও বা ভগবান রুষ্ট হয়ে তাদের গায়ে বকুল কাঁটা দিয়ে কেটে দাগ করে দেন।

মহারাষ্ট্রে উল্কির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় গল্প। যেমন — এরকম একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণু যখন বাড়ির বাইরে যেতেন ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে, তখন দেবী লক্ষ্মী একা থাকেন বলে ভয় পান। বিভিন্ন অশরীরী আত্মার হাত থেকে দেবীকে রক্ষা করার জন্য বাইরে বেরোনোর সময় বিষ্ণু তাঁর অস্ত্র দিয়ে দেবীর গায়ে উল্কি এঁকে দিতেন। মহারাষ্ট্রের মেয়েরা ফুল, ধনুক এবং ডিস্কাস আঁকে।

মহারাষ্ট্রের গোয়ারি জাতির ছেলে ও মেয়েরা সোজা লাইন আঁকে কপালে। ময়ূর, হরিণ বা ঘোড়া প্রভৃতির ছবি তারা ডান কাঁধে আঁকে। হাতের কনুইতে তারা সীতার হাত নামে উল্কি আঁকে। তারা তাদের কপালের কোণে এবং কপালে বিন্দু ও সমান্তরাল লাইন দিয়ে উল্কি আঁকে।

উত্তর ভারতের পুরুষ ও বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার, গাছ ও ফুলের ছবি দিয়ে উল্কি আঁকে। যারা উল্কি আঁকতে আসে তারাই বিভিন্ন ডিজাইন রাখে। যাকে আঁকতে আসে, সে পছন্দ করে দিলে সেই চিত্রটি এঁকে দেয়।

দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতির মেয়েরা সন্তানসম্ভবা হলে হাতে ও স্তনে উল্কি আঁকে।

বাংলার কোন কোন গ্রামের মেয়েবা বাতের উপশমের জন্য উল্কি আঁকে। এরা দুই ভ্রূর মাঝখানে, চিবুকে ও নাকে উল্কি আঁকে। সন্তানসম্ভবা মেয়েরা মাছের ছবি আঁকে। তারা তাদের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য সীতার চিহ্ন বলে এক প্রকারের উল্কি আঁকে। কপালে উল্কিকে তারা সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে মনে করে। হাতে তারা ময়ূরের ছবি আঁকে বা যে কোন নারী বা পুরুষের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হিসাবে পরিচিত। বাংলার ওরাওঁ ও সাঁওতাল উপজাতির মেয়েরা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য উল্কি আঁকে। মুণ্ডা উপজাতি, যাদের বসবাসও বাংলায়, তাদের ছেলেরা-মেয়েরা হাতে, পায়ে ও বুকে উল্কি আঁকে।

দ্রাবীড়ীয় বংশোদ্ভূত আর একটি উপজাতি হল গোণ্ডরা। এদের বসবাস মধ্যভারত ও তার আশপাশের অঞ্চলে। এদের মধ্যে ছেলেমেয়ে উভয়েই উল্কি আঁকে এবং এদের এই প্রথা আজও বর্তমান। এদের জাদুকররা বুকে এবং ডান হাতে বিভিন্ন দেবতার ছবি আঁকে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, এই উল্কির ভগবান সঙ্গে থেকে এদেরকে শত্রুর হাত থেকে বক্ষা করবে। এদেব মেয়েদের বাপের বাড়িতেই বিয়ের আগে বা পরে উল্কি আঁকতে হয়। বিয়ের পর আঁকলেও এর খবচ মেয়ের বাপের বাড়িকেই বহন করতে হয়। তাদের বিশ্বাস এই উল্কি কোন অলৌকিক ক্ষমতার বলে তাদের দেহকে রক্ষা করবে এবং যে কোন বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। গোণ্ডরা পায়ের পাতায় উপরে পাঁচটি বিন্দু এবং পিছনের গোড়ালি থেকে সামনের গোড়ালি পর্যন্ত একটা লাইন দিয়ে যে উল্কি আঁকে, তার নাম গজকরণ দেও। এই গজকরণ দেও হলেন একজন হাতি দেবতা, যিনি সাধারণতঃ কবর স্থানে থাকেন এবং তাঁর চিহ্ন আঁকলে গোণ্ডাদের বিশ্বাস যে, তারা ভার বহন করতে পারবে।

পায়েব পিছনে তারা আঁকে বৈগ পুবোহিত ও পুরোহিতের স্ত্রী-র ছবি। তাদের বিশ্বাস এই ছবি তাদের কঠোর পরিশ্রমেব শক্তি যোগাবে। পায়ের উপরদিকে সামনে এরা আঁকে কোডা দেওর ছবি। এটি একটি ঘোড়ার ছবি। পায়ের পিছনে হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত আঁকে জিনের ছবি। গোণ্ডদের বিশ্বাস, এই কোডা দেও তাদের উরুকে আরও শক্তিশালী করবে। তাই যদি তাদের শরীরে কোন দুর্বলতা বা ব্যথা দেখা দেয় তবে তারা কোডা দেও-র পূজা করে। হাতের উপরদিকে তারা উল্কি দিয়ে হনুমানের ছবি আঁকে। তিনি নাকি তাদের হাতকে ভার বহনের শক্তি যোগাবেন ও সক্ষম করে তুলবেন। দেহের পিছন দিকে গোণ্ডরা ভীমসেনের ছবি আঁকে। তিনি তাদের খাবার হজমে সাহায্য করবেন। গোণ্ড মেয়েরা গর্ভবতী হলে, ঠিক গর্ভের যেখানে শিশু থাকে সেখানে দু'পাশে ঝুলান দেবীর ও স্তনে বুড়া-দেও-র ছবি আঁকে। তাদের বিশ্বাস, এই উল্কি তাদেব গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করবে। গলায় মেয়েরা আঁকে কণ্ঠশ্বর মাতার চিহ্ন। তিনি হার বা মালা-র দেবী। বিয়ের পর গোণ্ড মেয়েদের কপালের মাঝখানে বৈগ পুরোহিতরা উল্কি এঁকে দেয়। তখন থেকেই তারা সিঁতে কেটে চুল আঁচড়াতে পারে। বিয়ের আগে নয়। এই চিহ্ন বাঙালি মেয়েদের সিঁদুরের মত তাদের স্বামীকে রক্ষা করে বলেই তাদের বিশ্বাস। গোণ্ডরা চিবুকে কোবরা নামক বিষাক্ত সাপের ছবি উল্কি দিয়ে আঁকে। তাদের বিশ্বাস যে, এটি কোন বিষাক্ত খাবার খেলে তার ভয়ঙ্কর প্রকোপ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে।

মাওড়ি উপজাতির লোকেরা উল্কি দিয়ে ভয়ঙ্কর সব ছবি আঁকে মুখে, তাদের শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য।

ব্রাহ্মণরা ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ জাত হিসাবে সম্মানিত এবং পুরোহিত হবার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু আদিবাসীদের মতো এদের মধ্যেও উল্কির প্রচলন আছে। অনেক ব্রাহ্মণ মহিলারা প্রাচীনকাল থেকে মুখে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উল্কি এঁকে আসছেন। আঙুলে, পায়ের গোড়ালিতে ও গোছাতে তারা ময়ূর, মাছ, কোকিল, কাঁকড়াবিছা, পুতুল, চান্দুনি জাতীয় চিহ্ন, সীতার রান্না ঘর এবং বিভিন্ন

গয়নার ডিজাইন উল্কি দিয়ে আঁকে। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ মেয়েদের বিয়ের পর উল্কি আঁকতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বোধহয় খুবই স্পষ্ট যে, বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষে বিশ্বাসের বৈচিত্র্যও কম নয়। প্রাচীনযুগে মানুষ ততটা শিক্ষিত ছিল না তাই অনেকক্ষেত্রে তারা উল্কিকে বিভিন্ন রোগের উপশম ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেছে। আজ শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের মধ্য থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস অনেকটা মুছে গেছে। তাই অনেকক্ষেত্রে উল্কি শুধুমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপচার হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অনেক জায়গায় গোপন দলের গোপন পরিচায়ক হিসাবে বিশেষ চিহ্নের উল্কি আঁকা হয়ে থাকে। কিছু কিছু অপরাধী শাখাও বিশেষ একধরনের উল্কি আঁকে। এটি তাদের ক্ষেত্রে পরিচায়ক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু ভারত ও বাংলার বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষ উল্কি আঁকে বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে। এদের এই বিশ্বাসের মধ্যেই বেঁচে আছে, উল্কি।

সূত্র নির্দেশঃ

(১) Tribes and Castes of the Central Provinces of India R V Russel & Hiralal Delhi 1915 P-529 30

(২) Indian Puberty Rites N N Bhattacharyya Calcutta 1968 P-26

(৩) Tribes and Castes of the Central Provinces of India R V Russel & Hiralal Delhi 1915 P 200-201

(৪) [illegible] – [illegible] P- ৬৬৪ ৬৫।

প্রসঙ্গ 'পার্থব'

অমর্ত্য ঘোষ

সঙ্গম সাহিত্যে তামিলভূমিকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভাগ করে। তাদের একটি 'নেইদাল' বা উপকূল। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠী 'পরথবর'। সঙ্গম সাহিত্যে তাদের নাম মোট ৪৬ বার স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে ৪৪ বারই 'পরথবর' (শেষের 'র'টি বহুবচনে ব্যবহৃত) নামে, অর্থাৎ নামটি এসেছে 'পরথব' থেকে।

পরথবদের বৃত্তি মাছধরা[১]। এছাড়া সমুদ্রজাত অন্যান্য দ্রব্য (মুক্তা, শঙ্খ ইত্যাদি) সংগ্রহ করে বিক্রয় করাটাও তাদের পেশা[২]। সমুদ্রের জল শুকিয়ে নুন তৈরি করাও, যা তারা বিক্রি করত 'উমনর' নামধারী ব্যবসায়ীদের কাছে[৩] সর্বোপরি, পরথবরা (কিংবা তাদের নগরবাসী একাংশ) সমুদ্র পথে ঘোড়া আমদানির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল[৪]। এ প্রসঙ্গে ভাবতে পারি যে প্রারম্ভিক খৃষ্টীয় শতকে পূর্বভারতে খরোষ্ঠী-লিপি ব্যবহারকারী যে জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে[৫], ঘোড়ার ব্যবসায়ে তারা ছিল পরথবদের অংশীদার।

পরথবদের বৃত্তি ব্যবসায়। কিন্তু তাদের শৌর্য সমীহ করার মত[৬]। তাদের শরক্ষেপণের কুশলতা প্রশংসার যোগ্য[৭]। পাণ্ড্যরাজ নেডুঞ্জে লিয়ন বহু প্রয়াসের ফলে তাদের জয় করতে সক্ষম হন[৮]।

পরথবদের আরাধ্য দেব-দেবীদের মধ্যে আছেন বরুণ, কার্তিকেয় এবং শিব[৯]। তাদের মধ্যে flood-legend-এর প্রচলনও রয়েছে[১০], যা থেকে মনে হয় যে তারা হয়ত সমুদ্রপথে তামিলভূমিতে এসেছিল। তাহলে পরথবরা কি বিদেশী কোন জনগোষ্ঠী? তাদের নাম (পরথব) তবে কোন বিদেশী শব্দের দেশজ রূপ। সে নামটি সম্ভবত 'পার্থিব', যা প্রাচীন ইরানের এক জনগোষ্ঠীরও নাম[১১]।

'পার্থব নামটি তামিল 'পরথব' তে রূপান্তরের স্তরগুলি সম্ভবত এই ঃ তামিলে 'রেফ' এবং 'আকার' না থাকায় (তামিলে 'অ'-র বদলে আছে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ 'আ') 'পার্থব' রূপান্তরিত হয় 'পরথব' তে। আধুনিক তামিলে 'হসন্ত' জাতীয় একটি চিহ্ন আছে ('পুললি')। কিন্তু তামিল লিপির প্রচলনের পূর্বে তামিলভূমিতে যে লিপির ব্যবহার ছিল (তামিল-ব্রাহ্মী) তাতে 'পুললি'র প্রয়োগ না থাকার দরুন রেফটি 'স্বরায়িতর' তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ 'পরথব' শব্দটির উৎপত্তি 'পার্থব' থেকে, ক্লারেন্স ম্যালোনি-র বক্তব্য[১২] অনুযায়ী 'ভরত' থেকে নয়।

সূত্র নির্দেশঃ

১। পাট্টিনপ্পালাই ১১২।

২। মাদুরাইক্কাঞ্চি ৩১৩-৩২৬।

৩। অহনানুর ১৪০।

৪। পেরুম্পানাট্রুপ্পড়াই। ৩১৯-৩৪৪, পট্টিনপ্পালাই, ১৮৪-১৯২।

৫। এ প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণের জন্য - ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'হরোষ্টী অ্যান্ড সতীষ্টী - ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপসন্স ইন্ ওয়েস্টবেঙ্গল (ইন্ডিয়া), ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন' ২৫ (১৯৯০), কলকাতা।

৬। মাদুরাইক্কাঞ্চি, ১৩৯-১৪৪।

৭। অহনানুর ২২৬।

৮। মাদুরাইক্কাঞ্চি, ১৪৪।

৯। এড্গার থার্স্টন (সম্পাদিত) — কাস্টমস্ অ্যান্ড ট্রাইবস অভ সাদার্ন ইন্ডিয়া ১ ম্যাড্রাস ১৯০৯ ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৪০-১৫৫ দেখুন। এছাড়া জি সুব্বাইয়া 'আ স্টাডি অভ নেইদাল রিলিজিয়ন্ ইন্ আর্লি তামিল লিটারেচার (পি যশ সম্পাদিত) 'রিলিজিয়ন্ অ্যান্ড সোসাইটি ইন্ অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া কলকাতা ১৯৮৪ পৃঃ ৪৪৭-৪৫৬।

১০। থার্স্টন পূর্বোক্ত।

১১। যার একটি রূপান্তর 'পল্লব।

১২। 'দা পরবর ঃ টু থাউজ্যান্ড্ ইয়ারস অভ কালচার্ ডাইনামিকস্ অভ্ আ তামিল কাস্ট্ ম্যান ইন্ ইন্ডিয়া ৪৯, ১৯৬৯ পৃঃ ২২৪-২৪০।

প্রাচীন বঙ্গে সূর্যোপাসনা

শম্ভুনাথ কুণ্ডু

ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা হলেন সূর্য। সবিতা, আদিত্য, বিষ্ণু, বরুণ, পূষা, অর্যমা, ভগ, মিত্র, ত্বষ্টা প্রভৃতি অজস্র নামে তিনি পরিচিত। গুণ-কর্ম-অবস্থাভেদে একই সূর্য বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও সূর্য অভিন্ন। কিন্তু পৌরাণিক দেবভাবনায় বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে একটি পৃথক সাম্প্রদায়িক ধর্ম গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তার স্বর্ণশিখরে অধিষ্ঠিত হন তিনি। অপরদিকে, যে সূর্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীমন্ত্রে নিত্যস্তুত হতেন তিনি ক্রমশঃ একটি মূর্তি হিসাবে পূজিত হতে লাগলেন। শকদ্বীপাগত মগদ্বিজরা এই মূর্ত্তিপূজার বিধি প্রবর্তন করেন। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত বলেই সূর্য বিষ্ণুর মত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হলেন না। পঞ্চোপাসনার অন্যতম দেবতা হিসাবে পূজিত হলেও কিংবা নবগ্রহের প্রধান দেবতারূপে স্তুত হলেও পৌরাণিক দেবভাবনায় তিনি গৌণ দেবতারূপেই স্বীকৃতি পেলেন।

ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈদিক দেবতার মত পৌরাণিক ধর্মভাবনায় সূর্যের মহিমা হ্রাস পেলেও লেখমালায় তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ তাঁকে স্বমহিমায় মহীয়ান করেছে। উল্লেখ কোথাও প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ মন্দির নির্মাণ ও পূজার্চনার প্রসঙ্গে আবার কোথাও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে তুলনাদানকালে উপমান হিসাবে দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত পরোক্ষ উল্লেখটিও তাঁর জনচিত্তজয়ী প্রভাব ও মহিমারই দ্যোতনবাহী। শুধু তাই নয়, বঙ্গদেশে প্রাপ্ত সূর্যের অজস্র মূর্ত্তিও তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক বলেই অনুমিত হয়।

বঙ্গদেশে সূর্যপূজা অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত রাজসাহী জেলার জগদীশপুর তাম্রশাসন থেকে তা জানা যায়। প্রথম কুমার গুপ্তের আমলে (গুপ্ত সংবৎ ১২৮ অর্থাৎ ৪৪৭ খ্রীঃ) গুল্মগন্ধিকায় ভগবান সহস্ররশ্মির (সূর্যের) মন্দির নির্মাণ ও বলি - চরু - সত্রের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য এবং খণ্ড-ফুট-প্রতি-সংস্কার ও গন্ধধূপতৈলাদি যোগানের জন্য এক কুল্যবাপ ভূমি দান করেছিলেন ক্ষেমার্ক, ভোয়িল ও মহীদাস নামে তিন গৃহস্থ — "গুল্মগন্ধিকে ভগবতঃ সহস্ররশ্মে কারিতক-দেবকুলে চ বলি - চরু - সত্র - প্রবর্ত্তনায় খণ্ড - ফুট- প্রতিসংস্কার- করণায় গন্ধ-ধূপ-তৈলোপযোগায় শশ্বৎকালোপভোগ্যাক্ষয়নীব্যা অপ্রতিকর - খিলক্ষেত্রস্য কুল্যবাপমেকং ক্রীত্বা দাতুম্ ..." (পংক্তি ১০-১২)[১]। ভগবান সহস্ররশ্মির দেবকুল (মন্দির) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত গুল্মগন্ধিকা গ্রামে জৈনবিহারসংলগ্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুতঃ

পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্ব হতেই যে মন্দিরাভ্যন্তরে সূর্য পূজা প্রচলিত ছিল তা এই শাসন থেকেই জানা যায়।

বিজয়সেনের (আ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ) বর্ধমান ভুক্তির মল্লসারুল তাম্রশাসনের প্রথমেই লোকনাথ ধর্মের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদিত হয়েছে ঃ

জয়তি শ্রীলোকনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃৎ- কর্মফলহেতুঃ।
সত্য তপোময়মূর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যদ্বয় সাধনো ধর্মঃ।।

এই লোকনাথ ধর্ম সূর্য ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নন বলেই আমাদের বিশ্বাস। যদিও কোনো কোনো গবেষক তাম্রশাসনে সংযুক্ত সীলে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিটিকে বুদ্ধমূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বন্দনা শ্লোকে বর্ণিত রূপের সঙ্গে সূর্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মূর্ত্তি উদীচ্যবেশী সূর্যমূর্ত্তি। ডঃ সুকুমার সেন এঁকে সূর্যরূপেই প্রতিপন্ন করেছেন। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে সূর্যের এই মূর্ত্তিই সমধিক প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া রাজসাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুটি সূর্যমূর্ত্তি কুষাণযুগীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য বহন করে। বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য, ২৪ পরগণার কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্ত্তি, ঢাকা চিত্রশালার ধাতব সূর্যমূর্ত্তি এই আমলের বলেই ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের ধারণা এবং সূর্যকেন্দ্রিক একটি সম্প্রদায়ও যে গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।[১]

মল্লসারুল তাম্রশাসনের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকে।[২] এখানেও ধর্মরূপী সূর্যই বন্দিত হয়েছেন। শাসনের অন্যত্র ভাস্করবর্মা ভাস্করের সঙ্গে (ভাস্করমিব তেজসাং নিলয়ম্) উপমিত হয়েছেন এবং ভাস্করবর্মার অভ্যুদয় ভুবনপতির উদয়ের সঙ্গে তুলিত হয়েছে (ভুবনপতিরিবোদয়ানু-রক্তমণ্ডলো যথাযথমুচিতকরনিকরবিতরণাকুলিতকলিতিমির-সঞ্চয়তয়া প্রকাশিতার্যধর্মালোকঃ, পং ৩৫-৩৭)। তমসাবিদারী সূর্যের আবির্ভাবের ন্যায় ভাস্করবর্মাও কলিযুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিনাশ করে আর্যধর্মের শাশ্বত আলোক প্রকাশিত করেছিলেন।

প্রথম মহীপালের (আ ৯৭৭-১০২৭ খ্রীঃ) বাণগড় তাম্রশাসনের অষ্টম শ্লোকে রাজ্যপাল ও ভাগ্যদেবীর পুত্র গোপালদেব পূর্বাচলোৎপন্ন সূর্যরূপে কল্পিত হয়েছেন (তস্মাৎ পূর্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব)। এই সূর্যদেব হতে যেমন কিরণ কোটিবর্ষী চন্দ্র উৎপন্ন হয়েছিলেন সূর্যসম গোপালদেব হতে তেমন বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন (তস্মাদ্বভূব সবিতুর্বসু কোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ, শ্লো ১০)।[৩] নয়পালের আমলে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির লেখে শূদ্রকপুত্র বিশ্বাদিত্য সমুন্নত শৈল শিখরারূঢ় প্রখর কিরণসম্পন্ন রবির মত দ্যুতিমান ছিলেন।[৪] সমকালীন মূর্ত্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তিতে মূর্ত্তিশিবের উচ্চ মন্দিরের উপর শোভিত সূর্য স্বর্ণকলসরূপে বর্ণিত।[৫]

প্রায় সমসাময়িককালের সিয়ান শিলালেখের প্রথম শ্লোকের (খণ্ডিত) সূর্য বিষ্ণুর দক্ষিণ নয়নরূপে বর্ণিত হয়েছেন (প্রবোধনিদ্রে জগতাং যস্যো-মীলন-মীলনে)।[৬] স্মর্তব্য যে, বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকে অনুরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে

সূর্যকে মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গম সকলের আত্মাস্বরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু লেখে সূর্য বিষ্ণুর দক্ষিণ চক্ষুস্বরূপ, যদিও বৈদিক ঋষিকল্পনায় সূর্য ও বিষ্ণু অভিন্ন। সিয়ান শিলালেখের সপ্তদশ শ্লোকটি নৃপতি কর্তৃক কোন সূর্যমন্দিরে রথপ্রদানের ইঙ্গিত বহন করে। অন্য একটি শ্লোকে (শ্লোক নং ৪৬) বৃহৎ সূর্যমন্দিরের পরোক্ষ উল্লেখ আছে যে, মন্দিরটিকে সূর্যের পুরীরূপে এবং স্বর্গপথত্যাগ করে ভগবান সূর্য এই পুরীতেই অবস্থান করবেন বলে কল্পনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই লেখে "চণ্ডাংশুর" মূর্ত্তি এবং রজতনির্মিত সূর্যমূর্ত্তি ও নবগ্রহের জন্য স্বর্ণপদ্মের উল্লেখ আছে (শ্লোক ৫৪, ৫৫)। সুতরাং রাঢ় অঞ্চলে সূর্যোপাসনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করে এই লেখ দুটি।

নয়পালের আমলেই প্রতিষ্ঠিত গয়া গদাধর মন্দিরলেখটি "ওঁ নমো মার্ত্তণ্ডায়" বলে আরম্ভ হয়েছে এবং প্রথম শ্লোকটিও সূর্যবন্দনায় নিবেদিত। মন্দির প্রতিষ্ঠাতা যে সূর্যোপাসক ছিলেন তা পাঁচটি পংক্তি সম্বলিত এই ভগ্নলেখটি থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ ১০৪৩ ৭০ খ্রীঃ) ৫ম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ অথবা বিশ্বাদিত্যের গয়া অক্ষয় বটমন্দিরলেখের সপ্তদশ শ্লোকথেকে জানা যায় যে, প্রপিতামহেশ্বর মন্দিরে অন্যান্য অনেক দেবতাসহ 'শুক্রভানু'র (সূর্যের) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গোবিন্দপালের (আ ১১৬১ ৬৫ খ্রীঃ) আমলে যক্ষপালের গয়া শীতলামন্দির লেখটিও ' ওঁ নমঃ সূর্যায়" এই সূর্যবন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং প্রথম শ্লোকটি সূর্যের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়েছে। সূর্যপ্রণাম এবং মঙ্গলাচরণে সূর্যবন্দনা থাকলেও বিভিন্ন দেবতার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠারও সংবাদ পাওয়া যায়। মন্দিরে মৌনাদিত্য, সহস্রলিঙ্গ, কমলার্ধাঙ্গী - নারায়ণ, দুইটি সোমেশ্বর মূর্ত্তি, ফল্গুনাথ, বিজয়াদিত্য এবং কেদারেশ্বরের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলেই লেখসাক্ষ্য থেকে জানা যায়।[৩] প্রতিষ্ঠিত দেবগণের মধ্যে 'মৌনাদিত্য এবং 'বিজয়াদিত্য' সূর্যের নামান্তর বলে অনুমিত হয়। গয়ার ব্রাহ্মণ সামন্তনরপতিদের সূর্যোপাসনার প্রতি অনুরক্তির প্রাবাল্যহেতু তাদের 'সৌর' বলে চিহ্নিত করা অসঙ্গত হবে না।

সমকালীন চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনের পঞ্চদশশ্লোকে প্রচণ্ডরশ্মি সূর্যসম ভাস্বররূপে চিত্রিত হয়েছেন গোবিন্দচন্দ্র (প্রচণ্ডরশ্মেরিব চণ্ডমোজঃ)।`[৪] ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্লোকে বালঘোষ, ধবলঘোষ এবং মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ প্রত্যেকেই সূর্যতুল্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন।[১৫] প্রতীতি হয় যে, এই বংশটি সূর্যবংশীয়রূপে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে তৎপর হয়েছিলেন। ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তির পঞ্চম শ্লোকে বংশের আদিপুরুষ ভবদেব "তাপনপ্রতিম" রূপে বর্ণিত হয়েছেন।[১৬] বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনের শুধুমাত্র হরির দক্ষিণনয়নরূপে সূর্য বন্দিত হন নি, শাসনের নানাস্থানে সূর্যদেব বিভিন্ন নামে উপমানরূপে ব্যবহৃত হয়েছেন। কোথাও তিনি 'ভানু', কোথাও 'অর্কদেব', কোথাও 'মার্ত্তণ্ড' আবার কোথাও বা 'দিনপতি'।

সেন আমলেও সূর্যোপাসনার অজস্র উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের অষ্টম শ্লোকে বিজয়সেন কনকগিরিস্থিত সূর্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন। পঞ্চম শ্লোকে হেমন্তসেনও রবির মত মাননীয় হয়েছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনেও হেমন্তসেন সূর্যসঙ্কাশ (শ্লোক. ৪) এবং সূর্যগ্রহণোপলক্ষ্যে বল্লালজননী বিলাসদেবী হেমাশ্বমহাদান যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। (পংক্তি ৫২-৫৪)। বল্লালসেনের নবম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত সনোখার অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, সনোখা গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সূর্যমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত একটি লেখসম্বলিত তাম্রখোল প্রদান করেছিলেন।[১] সেনবংশীয় রাজা বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের মদনপাড়া, সাহিত্যপরিষদ ও ইদিলপুর তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকটি সূর্যবন্দনায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে। এই বন্দনাশ্লোকে তিনি কমলবনের সখা, তিমিরকারাবদ্ধ ত্রিভুবনের মুক্তিদাতা এবং ঊর্ধ্বাকাশে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত শুভ্র ও কৃষ্ণপক্ষযুক্ত বেদবৃক্ষের আশ্চর্য পক্ষীরূপে অর্চিত। উল্লেখ্য যে, বিশ্বরূপ সেন তাঁর শাসনদ্বয়ে নিজেকে 'পরমসৌর' বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মদনপাড়া শাসনে লক্ষণসেনকেও 'পরমসৌর' বলা হয়েছে। এটা নিছক স্বীয়ধর্মানুগতি পূর্বপুরুষে আরোপিত করার প্রবণতা, কারণ লক্ষ্মণসেন ছিলেন 'পরমবৈষ্ণব', 'পরমনারসিংহ'। লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র কেশবসেনও নিজেকে 'পরমসৌর' বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১৮] তাঁরা উভয়েই 'সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর' রূপে অভিহিত হয়েছেন।

বঙ্গীয় লেখমালায় সূর্যের বিচিত্র নামের পরিচয় পাওয়া। নিঃসন্দেহে এই নামাবলী সূর্যের জনপ্রিয়তার দ্যোতক। সহস্ররশ্মি, অর্ক, লোকনাথধর্ম, ভাস্কর, ভুবনপতি, সবিতা, রবি, ভাস্বৎ, ভানু, চণ্ডাংশু, মার্তণ্ড, প্রচণ্ডরশ্মি, দিবাকর, তাপন, মিহির, দিবস্পতি, দিনপতি, মৌনাদিত্য, বিজয়াদিত্য প্রভৃতি অজস্র নামে তিনি অভিহিত।

শুধু গুপ্ত-গুপ্তোত্তর কালে নয় পাল - সেন - বর্মণ আমলেও অসংখ্য সূর্যমূর্ত্তি (উদীচ্যবেশী) এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্ত-গুপ্তোত্তর কালীন সূর্যের জনপ্রিয়তা পরবর্তীকালে কিছুটা হ্রাস পেলেও অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তধর্মগুলির মত ব্যাপকতা না থাকলেও জনগণমনে একটি বিশেষ কারণে শ্রদ্ধাভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই কারণটি হল সূর্যের রোগবিনাশীরূপী ভূমিকাটি। দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্টা গ্রামে প্রাপ্ত উপবিষ্ট সূর্য প্রতিমার পাদপীঠে "সমস্ত রোগাণাং হর্ত্তা" এই উৎকীর্ণ লিপিটি সেই সত্যকেই সমর্থন।[১৯] ভবিষ্য, শাম্ব, বরাহ, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে সূর্যকর্তৃক কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগমুক্তির পৌরাণিক কাহিনী এর মূলে সক্রিয় ছিল বলেই মনে হয়।[২০] বরাহপুরাণে বর্ণিত (১৭৭ অধ্যায়) শাম্ব কর্তৃক মথুরায় প্রতিষ্ঠিত সূর্যবিগ্রহটির নামও শাম্বাদিত্য। প্রসিদ্ধি আছে, কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য কবি ময়ূরভট্ট 'সূর্যশতক' রচনা করেছিলেন। সূর্যের এই রোগারোগ্যকারী (বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগ) গুণটির জন্য তিনি জনগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত কোণারকের সূর্যমন্দিরটিও সেই ট্রাডিশনেরই স্মৃতিবাহী। বঙ্গভাষায় রচিত পুরাণ বলে পরিচিত ধর্মপুরাণে (ধর্মমঙ্গল) ধর্মঠাকুরের মধ্যেও সূর্যের এই গুণ-কর্মটি আরোপিত

হয়েছিল। মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে সূর্যের বিগ্রহপূজা হ্রাস পাওয়ার মূলে ধর্মঠাকুরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বহুলাংশে দায়ী ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তাছাড়া, আর একটি কারণকে অস্বীকার করার উপায় নেই বলেই অনুমিত হয়। কোন একক দেবতা কখনই বাঙালির মনের নাগাল পায়নি। শক্তিসহ দেবতাই এদেশের জনচিত্তের আসনখানি দখল করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, উমা-মহেশ্বর, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাদেরই প্রাধান্য এদেশে। তাই ত্রিমূর্তিভাবনার অন্যতম প্রধান দেবতা ব্রহ্মা এখানে গৌণদেবতারূপে স্বীকৃত। বিবাহের কুশণ্ডিকামন্ত্রে অগ্নিতে আহুতিদানকালেই তিনি কেবল অভিষিক্ত হন এবং পরবর্তীকালে অগ্নির সঙ্গে তিনি প্রায় মিশে গেছেন। গণপতিও একই কারণে জনগণমনে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারলেন না। কেবলমাত্র বণিকসমাজে তিনি সিদ্ধিদাতারূপে সমাদৃত হতে লাগলেন আর স্মার্ত গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠানে তার পূজা সর্বাগ্রে বিহিত হল — "গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ"। তাই ভগবান সূর্য পঞ্চোপাসনার অন্যতম প্রধান দেবতার সম্মান লাভ করেও তেমনভাবে পূজার্চনা আদায় করতে সক্ষম হলেন না। সূর্যের স্বতন্ত্রমূর্তিপূজার পরিবর্তে নবগ্রহের অন্যতম প্রধান দেবতারূপে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি নৈমিত্তিক কর্মে পূজিত হতে লাগলেন। তবে নারীসমাজে তিনি নানা নামে অর্চিত হয়ে চলেছেন অদ্যাবধি। ইতুপূজা, ভাদু, তুসু ইত্যাদি নারীসমাজে প্রচলিত ব্রত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা পেয়ে চলেছেন।

সূর্যের জনপ্রিয়তা হ্রাসের একটি কারণ অবশ্যই গবেষণার বিষয়বস্তু হবার যোগ্য। সূর্যপূজার প্রচলন করেছিলেন শাকদ্বীপী মগদ্বিজরা। বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত সূর্যপূজা, সূর্যমূর্তিনির্মাণ এ দেশের আচারনিষ্ঠ গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা কতখানি সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা ভাবনার বিষয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। তত্ত্বানুসন্ধানী গবেষকদের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়।

সূত্র নির্দেশঃ

(১) Sircar, D. C., Epigraphic Discoveries in East Pakistan, Cal., 1973 P 61
(২) Sircar, D. C., Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization Vol I Cal. 1965, P 359
(৩) Kundu, S. N., 'Lokanatha-Dharma in the Mallasarul Inscription' Summary Papers, All India Oriental Conference, Ahmedabad, 1984-85, PP 254-55
(৪) রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, কলি, ১৯৮০। পৃঃ ৬৩৬।
(৫) ভট্টাচার্য পদ্মনাভ, কামরূপ শাসনাবলী, রংপুর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১-১৭।
(৬) মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার, গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯১-৯৯।
(৭) তদেব, পৃঃ ১১০-১১৫।
(৮) সরকার দীনেশচন্দ্র, শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলি, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮৫-১০১।
(৯) তদেব, পৃঃ ১০২-১২২।
(১০) ঋগ্বেদ, ১।১১৫।১

(১১) Epigraphia Indica Vol XXXVI P 84 ff

(১২) Ibid P 89 ff

(১৩) Ibid P 92 ff

(১৪) Sircar D C Epigraphic Discoveries in East Pakistan Cal 1973 P 40

(১৫) Majumdar N G Inscriptions of Bengal Cal 1967 P 149-157

(১৬) Ibid P 25-35

(১৭) সরকার দীনেশচন্দ্র তদেব পৃঃ ১৫৪ ১৫৭।

(১৮) Majumdar N G Op cit P 118-31

(১৯) Banerjea J N The Development of Hindu Iconography Cal 1956 P 440

(২০) Ibid P 430

নারী ঃ চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎ-শিল্পে

গৌবীশঙ্কব দে

বিশ্বেব অর্ধেক অংশ আকাশেব মত অধিকাব কবে আছে নাবী। জীবন ও জীবিকা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত — সর্বত্র এই অধিকাব বিস্তৃত। চন্দ্রেব মত নাবী জগতেবও অর্ধেক বুঝি চিবছাযাবৃত। পশ্চিমবঙ্গেব প্রসিদ্ধ প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মৃন্ময়ী নাবীমূর্তিগুলি প্রাচীন যুগেব শিল্পীব ৰূপতৃষ্ণা, মুগ্ধতা ও বিস্ময়েব অভিজ্ঞান।

চন্দ্রকেতুগড়েব মৃৎ শিল্পী ছিলেন নাবী সৌন্দর্য ৰূপাযণে ক্লান্তিহীন। নানা ৰূপে নানা ভঙ্গিতে শিল্পী যেন নিঃশেষিত কবতে চেয়েছিলেন বমণীলোকেব সব লাবণ্য, সব বহস্য। জননী, প্রণযিনী, বাণী, পবিচাবিকা, দেবী, মানবী, পূজাবিণী, নর্তকী, যক্ষী, বাক্ষসী, বিচিত্র ভূমিকায চন্দ্রকেতুগড়েব মৃৎশিল্পে ৰূপাযিত হয়েছে নাবী। কখনো সে উপবিষ্ট, কখনো দণ্ডাযমান, কখনো অবনত, কখনো স্থিব, কখনো চলমান। নাগবিক, দেহ সচেতন, ভোগপ্রবণ, লাস্য-লালিত্যে হিল্লোলিত, ঠমকে যমকে ছন্দিত — চন্দ্রকেতুগড়েব পবমাগণ যেন বেনেসাঁস যুগেব ইউবোপেব দা ভিঞ্চি, বাফায়েল বা টিশিযানেব কল্পলোকেব কন্যা, কেবল তাদেব আত্মপ্রকাশেব মাধ্যম ভিন্নতব।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত নাবীমূর্তিগুলিকে চবিত্রেব দিক থেকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যায— কল্পলোক - বাসিনী ও মর্ত্য-মানবী। কমলবনবিহাবিণী লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, ধান্যদেবী, গঙ্গাদেবী, নাগদেবী, বনদেবী বা বৃক্ষদেবী, বসুধাবা, পঞ্চচূড়া ও দশচূড়া অপ্সবা, যক্ষিণী, বাক্ষসী, অশ্বমুখী যক্ষিণী, কুবেবাণী, বামাযণেব সীতা, উদযন কাহিনীব নাযিকা বাসবদত্তা প্রমুখ প্রথম শ্রেণীব অন্তর্গত।

নগবেব অভিজাত নাবী, বিলাসিনী, প্রাসাদ-ললনা, বাজনটী, নর্তকী, কলসী-কাঁখে গ্রাম্য বমণী, পশুচাবণবত বালিকা, ফুল বা ফলওযালী, প্রোষিতভর্তৃকা, প্রেমিকা, গণিকা প্রভৃতি দ্বিতীয শ্রেণীব অন্তর্গত।

মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত — এই প্রধান চার যুগেব মৃন্ময়ী নাবী মূর্তি চন্দ্রকেতুগড় চাব যুগের মৃন্ময়ী নাবী মূর্তি চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি ত্রিপরিসব অথবা ফলকে উৎকীর্ণ। প্রাচীন যুগের ভাবতীয় ও অ-ভাবতীয নারীদেব পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, আহার্য, জীবিকা, অবসর বিনোদন, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ে মূল্যবান সংবাদ আলোচ্য-মূর্তিগুলি থেকে পাওয়া যায। তেমনি এই নিদর্শনগুলি আলোকিত করে অতীতের সমাজ, ধর্ম-বিশ্বাস ও শিল্প-সাধনায় বহু অপরিচিত দিক। হার, কর্ণকুণ্ডল, কেয়ূর ও রত্নবলয়ে যে সব নক্সা দেখা যায়, সম্ভবত তার মাঙ্গলিক ও প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে সংগৃহীত হয়েছে বেশকিছু সংখ্যক মাতৃকা-মূর্তি। মূর্তিগুলি হাতে-গড়া বা আঙুল দিয়ে টিপে তৈরি করা। স্টেলা ক্রামরিশ কৃত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এই মূর্তিগুলি ageless শ্রেণীভুক্ত। মাতৃমূর্তিগুলি উর্বরতা শক্তির প্রতীক। time-bound শ্রেণীর মাতৃকা মূর্তি ও উক্ত প্রত্ন-স্থল থেকে পাওয়া গেছে। এই সব নারীমূর্তির কোলে স্তনপানরত শিশু। শিল্প-রীতি থেকে সুস্পষ্ট, ছাঁচে তৈরি ও অগভীরভাবে উৎকীর্ণ এই মূর্তিগুলি শুঙ্গযুগে নির্মিত। সংখ্যা থেকে মনে হয় 'মা ও শিশু' শ্রেণীর মূর্তি প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ে জনপ্রিয় ছিল।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে মৌর্যকালীন আঙ্গিকবিশিষ্ট কয়েকটি অপূর্ব মৃন্ময় মূর্তি আহরিত হয়েছে। মূর্তিগুলির মাথার দু'দিকে পূর্ণচন্দ্রের মতো দুটি রমণীয় খোঁপা বা বলয়। হরপ্পা থেকে আবিষ্কৃত ও দিল্লীর জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত মৃন্ময়ী নারীমূর্তিগুলির বলয় সদৃশ শিরসজ্জা পাটলিপুত্র ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত নারীমূর্তিতেও পরিলক্ষিত হয়। এই সজ্জা-শৈলী প্রাগৈতিহাসিককালে সূচিত হয়ে মৌর্য যুগ পর্যন্ত এবং পূর্ব ভারতেও যে প্রবাহিত হয়েছিল উপরোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে তা সুস্পষ্ট।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একাধিক মৃন্ময় মূর্তি ও ফলকে মৌর্যকালীন শিল্পরীতির পরিপূর্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে পোড়ামাটির দুটি নারীমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিদুটির ত্রিপরিসর গঠনপদ্ধতি, কমনীয় অথচ দৃপ্ত মনোভাব, গোলাকৃতি পদ্মপত্রের মতো খোঁপার অলঙ্কার এবং চতুষ্কোণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যখণ্ডযুক্ত ফিতাগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের বিলাসিনী অভিজাত কন্যা অথবা রূপসী রাজনটীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাটলিপুত্র, বুলন্দিবাগ, হস্তিনাপুর, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এই ধরনের নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত শুঙ্গ-কুষাণ যুগের মূর্তিগুলির মধ্যে প্রধান নানা আকৃতির যক্ষিণী। এরাও ছিল উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেবী ও এই কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ছাঁচে তৈরী অপরূপ যক্ষিণী মূর্তিগুলি খাজুরাহো এবং ভুবনেশ্বরের দেউল-গাত্রের সুর-সুন্দরীদের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য এরা মৃত্তিকা নির্মিত ও আকারে ক্ষুদ্র। যক্ষিণীদের কবরীর একদিকে কিংবা দুই দিকেই বিদ্ধ পাঁচটি আয়ুধাকৃতি রত্নময় কাঁটা (খড়্গ, ত্রিশূল, কুঠার, ভিন্দিপাল এবং অঙ্কুশ), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণিসূত্র শোভিত কুণ্ডলদ্বয়, স্তনগাত্রে লুণ্ঠিত রত্নহার, বিচিত্র আকৃতির কেয়ূর বিস্তৃত কটিমণ্ডলে ভারী মেখলা এবং চরণে নূপুর।

গত শতকের শেষভাগে কবি মধুসূদন দত্তের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু গৌরদাস বসাক তাম্রলিপ্তে রূপনারায়ণ নদের তীর থেকে পোড়ামাটির প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি মূর্তি আবিষ্কার করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিকে এই মূর্তিটি দান করেছিলেন। কিন্তু মূর্তিটি কোনো এক সময়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। বর্তমানে মূর্তিটি ব্রিটেনের অক্সফোর্ড চিত্রশালায় সংরক্ষিত। স্টেলা ক্রামরিশের মতে মূর্তিটি অপ্সরা পঞ্চচূড়ার। কিন্তু পণ্ডিত জনস্টন মনে করেন যে এই মূর্তি প্রাচীন রোমক-প্রভাবিত মিশরের "অক্সিরিনকাস পেপাইরাস" বর্ণিত গঙ্গা উপত্যকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মাইয়া" অথবা "মায়া"র প্রতিরূপ। পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত মূর্তির অনুরূপ পঞ্চচূড়া

শোভিত অপরূপ নারীমূর্তি চন্দ্রকেতুগড় থেকে বেশ কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের ধারণা চন্দ্রকেতুগড়ই টলেমী ও পেরিপ্লাস বর্ণিত গঙ্গে যা ছিল গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী। যদি এই ধারণা সঠিক হয় তবে এই ধরনের মূর্তি সম্ভবত জনস্টন চিহ্নিত গঙ্গা উপত্যকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মায়া'র। সেই ক্ষেত্রে দেবীর পঞ্চচূড়া বা দশচূড়া হতেও বাধা নেই। প্রাচীনকালে বহু নগরের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকতেন। যেমন এথেন্সে দেবী এথেনী। প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়েও এই ধরনের দেবী থাকা বিচিত্র নয়।

নাট্যশাস্ত্রের একবিংশ অধ্যায়ে ভরত অলঙ্কারকে চারভাগে ভাগ করেছেন - অবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য। কুণ্ডলাদি আবেধ্য, শ্রোণী সূত্র ও অঙ্গদাদি বন্ধনীয়, নূপুর ও বস্ত্রাভরণ ক্ষেপ্য এবং স্বর্ণসূত্র ও নানাপ্রকার হার আরোপ্য। চন্দ্রকেতুগড়ের নারীমূর্তিগুলি, বিশেষত যক্ষিণী মূর্তিগুলিতে এই চার শ্রেণীর অলঙ্কারই উপস্থিত। এছাড়াও রয়েছে আরো নানা বৈচিত্র্য যা অনেকসময়ই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। কণ্ঠহার, কেশালঙ্কার, মেখলা সব রকম অলঙ্কারেই বৈচিত্র্য। এত সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারকাজ মনে হয় তা দক্ষ মণিকার বা স্বর্ণকারের রচনা। তারা নারীর অলঙ্কার প্রিয়তারও অভিজ্ঞান।

চন্দ্রকেতুগড় সুন্দরীরা ছিল নায়িকা প্রেমিকা, নর্তকী, রাজকন্যা গৃহবধূ বা কৃষক কন্যা। স্বাভাবিকভাবেই সাজসজ্জা ও অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়। সবার উপরে আছে মূর্তিগুলির সঙ্গে সমকালীন সর্বভারতীয় শিল্প-ধারার প্রাণবন্ত সংযোগ। মনে হয় এদেরই দেখেছি ভারহুত, সাঁচী আর অমরাবতীর নায়িকা ও বিলাসিনীদের মধ্যে। তাদের মতো চন্দ্রকেতুগড় রূপসীদেরও প্রায় স্বচ্ছ কটিবাস, রত্নশোভিত অলঙ্কার, বিচিত্র কবরী, অনুপম দেহশ্রী ও অপার্থিব সৌন্দর্য।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি মৃৎ ফলকে এক দেব কন্যাকে হাতল বিশিষ্ট গোলাকৃতি দর্পণ হাতে প্রসাধনরত অবস্থায় দেখা যায়। ব্রাহ্মণাবাদে প্রাপ্ত গজদন্ত ফলকে এই ধরনের মূর্তি দেখা যায়।[৩]

হাসানলু গ্রামের নিকটবর্তী একস্থানে খনন করে পুরাতাত্ত্বিক রবার্ট ডাইসন্ এক প্রাগৈতিহাসিক সুবর্ণঘট আবিষ্কার করেছেন যার গায়ে অসুর-দলনী ও সিংহবাহিনী মাতৃদেবীর হাতে গোলাকৃতি মুকুর। মনে হয় ইরানের এই মাতৃদেবী নিজ দর্পণে ত্রিকাল অবলোকন করেছেন। দেবী এখানে ত্রিকালেশ্বরী।[৪]

মহেন-জো-দড়ো থেকে শুরু করে সাঁচী ও অমরাবতীর স্তূপ ও অজন্তার গুহাচিত্রে দর্পণ হস্তে নারী মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। ইতালির পম্পি নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকেও গজদন্ত নির্মিত দর্পণধারিণী কন্যার প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে একটি মৃৎ-ফলক সংগ্রহ করেছেন। এই ফলকে স্নানরতা এক নগ্ন নারী মূর্তি উৎকীর্ণ। মূর্তির দক্ষিণ হস্তে মুকুর। আধুনিক যুগের চিত্রশিল্পী হেমেন মজুমদার যে সিক্তবসনা সুন্দরীদের ছবি এঁকেছেন তারা নিছকই শরীরময়, যৌনতার আধার। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের স্নানরতা রূপসী নার্সিসাস অনুভবে আত্মমগ্না।

'নারী ও বিহঙ্গ' ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রিয় বিষয়। বাণগড়, পুষ্করণা, চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত মৌর্য ও শুঙ্গকালীন মৃৎ-ফলকে সারিকা বা শুক পাখি হস্তে নারী মূর্তি দেখা যায়।[৬] রামপাল (বর্তমান বাংলাদেশে) থেকে প্রাপ্ত দারুস্তম্ভে এই ধরনের মূর্তি চোখে পড়ে।[৭] ভারত-শিল্পের আদি পর্যায়ে নারী ও বিহঙ্গ মূর্তির আবির্ভাব, মাঝখানে কয়েক শতাব্দীর জন্য তিরোহিত, ত্রয়োদশ শতকে এই মূর্তির পুনরাবির্ভাব।

শুক বা সারিকা প্রেমভাবের দ্যোতক। চন্দ্রকেতুগড়ের বিরহিণী নায়িকা হয়ত শুক পাখির কাছ থেকে প্রিয়জনের কথা জানতে উৎসুক। মনে হয় নিঃসঙ্গ প্রেমিকাও এখনি কথা বলে উঠবে।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এক শ্রেণীর নারীমূর্তির ডানহাতে ঝুলানো অবস্থায় জোড়া মাছ দেখা যায়। মথুরা অঞ্চল থেকেও একই ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে।[৮] মাছ হাতে ফলকমূর্তিকা 'বসুধা' বা 'বসুধারা' নামক পৃথিবীর প্রাচুর্য ও উর্বরতার প্রতীক দেবীরূপে বর্ণিত হয়েছে।[৯] জোড়া মাছ অবশ্য মাঙ্গলিক চিহ্ন রূপেও পরিচিত।

বাংলার প্রাচীনতম ধান্য দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির শীলমোহরে। দেবীর দক্ষিণ হস্তে ধানের ছড়া বা শস্য মঞ্জরী।[১০]

বিভিন্ন নারী মূর্তির হাতে বিভিন্ন বস্তুর ফুল, চামর, দর্পণ, আরো কত কিছু। কারো পায়ের কাছে চিতাবাঘ, মার্জার বা সারসপাখি। একক এবং যূথবদ্ধ নারীজগৎ টেরাকোটা ফলকে প্রতিফলিত হয়েছে। টেবিলের মতো একটি আসবাবে আহার্য, সম্ভবত ফল। এই আসবাব ঘিরে কয়েকজন নারী ভোজনরত।[১১] একটি ফলকে এক সঙ্গে নৃত্যরত নারী ও পুরুষ। গুচ্ছ ধান, হস্তীসহ বাদ্যযন্ত্র শিল্পী ও পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও শোভাযাত্রায় সামিল হতে দেখা যায়।[১২] এক ধরনের দুঃসাহসিক মৃৎ-ফলকে দেখা যায় সম্ভবত কোনো প্রোষিতভর্তৃকার আত্মরতি।[১৩] নাগরিকাদের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে কলসী কাঁখে গ্রাম্য নারীর মূর্তি।[১৪] এ যেন আবহমান কালের নদী-মাতৃক বাংলার অপরূপ আলেখ্য।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে-ভাজে ভূমধ্য সাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে।"[১৫] চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কিছু দেবী ও মানবী মূর্তির দেহে রেখায়িত এই ধরনের পরিচ্ছদ চোখে পড়ে। হেলেনীয় 'কিটোন' পরিহিতা দেবী বা নারী মূর্তি দেখা যায় শীলমোহরে। বিশেষ ধরনের মুখশ্রী, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি থেকে সন্দেহ থাকে না এই সব দেবী বা মানবী— বিদেশিনী। এদের উপরে আছে গান্ধার বা হেলেনীয় শিল্পের প্রভাব।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রাচীন বঙ্গ-নারীর ভূমিকা কিছুসংখ্যক পোড়ামাটির ফলক থেকে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ফলকে দেখা যায় ফুল ও ফল বিক্রেতা নারীমূর্তি। এরা নিশ্চয়ই ঘুরে-ঘুরে ফুল বা ফল বিক্রি করত।

প্রাচীন গ্রীসে একমাত্র স্পার্টাতে নারী স্বাধীনতা ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র এথেন্সে পর্যন্ত নারীর ভূমিকা ছিল অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট নারী স্বাধীনতা ছিল। অবগুণ্ঠন বা পরদা প্রথা ছিল না। উৎসব, মেলা, অনুষ্ঠান বা

জনসমাগমে নাবীদেব উপস্থিতি থেকে এব আভাস পাওযা যায। মেযেবা ঘোড়া ও হাতিব পিঠে চড়ত। এক মহিলা একজন পুরুষকে পদাঘাত কবছে ও ভীত পুরুষটি হাত জোড় কবে ক্ষমা প্রার্থনা ও পলাযন কবছে এই দৃশ্য এক শ্রেণীব ফলকে দেখা যাচ্ছে।

চন্দ্রকেতুগড়েব শিল্পধাবা ধর্মেব অলকানন্দা থেকে প্রবাহিত হলেও লোকাযত জনপদবাসীব প্রত্যহেব স্পর্শ ও অবগাহনেব আন্দোলনে তবঙ্গিত। নামহীন পবিচযহীন শিল্পীব যাদুস্পর্শে মৃত্তিকাব বুকে চিবন্তন হযে আছে অতীত ভাবতেব নাবী-জগৎ। দেশ ও কালেব সীমা অতিক্রম কবে মৃৎ ফলকেব নাবীমূর্তিগুলি উদ্ভাসিত হযে আছে বিশ্বজনীন ও চিবন্তন মহিমায।

সূত্র নির্দেশঃ

১। কল্যাণকুমাব গঙ্গোপাধ্যাযেব **বাংলাব ভাস্কর্য** কলকাতা ১৯৮৬ পৃ ১১ ১৩ ৪৪ ২৭ ৯৫ ৯২ ১০৫ ১০৬ ১১৪ ১১৫ ১৮৩ ১৮৪।

২। এস এস বিশ্বাস ° **টেবাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল** দিল্লী ১৯৮১ পৃ ৭১ ৭৩ ৭৫ ৮০ ৮২ ৮৭।

৩। অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ। **প্রাচীন ভাবতেব সংস্কৃতি ও সাহিত্য** কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ পৃ° ৯৭।

৪। ভি পি দ্বিভেদীঃ **ইন্ডিযান আইভবিস**, দিল্লী ১৯৭৬ পৃ° ১০৯ ১১০ ছবি নং ৮৯।

৫। পবেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ° **প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়েব মৃন্ময শিল্প** প্রবাসী কার্তিক ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৫৫।

৬। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী ঃ **প্রত্নতীর্থ পবিক্রমা**, কলকাতা ১৯৮৪ পৃ° ১১৩।

৭। কল্যাণকুমাব দাশগুপ্ত ঃ **উড কার্ভিংস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিযা**, কলকাতা ১৯৯০ ছবি ১৬ নং।

৮। আশা বিষ্ণু ঃ **মেটেবিয়েল লাইফ অফ নর্দার্ন ইন্ডিযা** নিউ দিল্লী ১৯৯৩ পৃ ১৯৫।

৯। সন্তোযকুমাব বসু ঃ **ভাবতশিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ** কলকাতা ১৯৯০ পৃ ১০৩।

১০। সংগ্রহ ঃ জি এস দে।

১১। সংগ্রহ ঃ জি এস দে।

১২। ঐ।

১৩। ঐ।

১৪। ঐ।

১৫। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব ঃ **বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী**, কলকাতা ১৪০২ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৬৫।

মহানাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও নাথতন্ত্র

সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহানাদ প্রাচীন বাঢ়ভূমিব একটি ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকা। বর্তমানে ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত। বর্তমানে ইহার প্রাচীন ঐতিহ্যলুপ্ত। ১৮৩৫-এর পববর্তী দশকে কু-খ্যাত বর্ধমান জ্বর, আশ্বিনের ঝড়, এবং মহামারীতে এই এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ করিযা বাখিযা গিয়াছে। দেশ বিভক্ত হবাব এবং স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) হইতে উদ্বাস্তু মানুষ দলে দলে পশ্চিম বাংলায় আগমন কবিলে বর্তমানে এই এলাকা একটি গঞ্জে পরিণত হইয়াছে।

অশোকের রাজত্বকালে বাংলাদেশে জৈন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসাব ঘটে। মহানাদ একটি তীর্থক্ষেত্র এবং সাধনাব উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচিত হইত। ইহা তৎকালে জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রও ছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ-ববাহমিহির, খনা প্রভৃতির দেশ ছিল মহানাদ। দামোদর নদীব বিভিন্ন ধারা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবহমান ছিল। গঙ্গা. যমুনা, সরস্বতী ছিল নিকটবর্তী প্রবহমানা। বর্তমানে দামোদরের ধারাগুলি শুষ্ক। যমুনা লুপ্ত। সরস্বতী নদী প্রায় শুষ্ক। এইসব শুষ্ক ধারার বুকে বর্তমানে গ্রামের প্রাচীন মানুয কোথাও কোথাও পণ্যবাহী জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছেন। এবং কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল পাইয়াছেন। কোরাল প্রস্তর পাইয়াছেন।

১৯৩৩-৩৪ সালে মহানাদের নগরপাড়া নামক স্থানে খনন কার্য ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে খনন কার্য কয়েক দিনের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। এই খনন কার্যের ফলাফল শ্রী এন. সি. মজুমদারের লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়।

এখানে একটি গুপ্তযুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করা রাজ প্রাসাদের ভিত্ আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকে গুপ্তযুগ, কুষাণ যুগের কিছু কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বেশ কিছু শিল্প দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে পালযুগের প্রচলিত মুদ্রা কড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন যুগের ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি এবং ষষ্ঠীর প্রাচীর শিলা প্রতীক সংগ্রহ করা হয়েছে। এই এলাকায় ব্যাপকভাবে শিবলিঙ্গ গৌরী পাট দেখা যায়। এই সমস্ত আবিষ্কার ধর্মতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, শৈবতন্ত্র, নাথতন্ত্রের মধ্যে প্রাচীন যুগে নৈকট্যের ইঙ্গিত দেয়। নাথতন্ত্র নিজেকে অনাদি বলিয়া দাবি করে। অর্থাৎ ইহা সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব যুগের বলে দাবি করে। ইহা বিশ্বব্যাপী ছিল বলা হয়।

গোরক্ষনাথ পূর্ববাংলার কুমিল্লার অধিবাসী ছিলেন। তিনি রানী ময়নামতীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে ময়নামতীর গান খুব জনপ্রিয়। মহানাদে গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের পর এখানকার আশ্রমটির নাম হইয়াছে 'নাথমঠ'। ইহা দক্ষিণ ভারতের রেখ দেউল স্থাপত্যে নির্মিত। গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় 'কা-ফাটা' সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। 'নাথমঠটি' জটেশ্বর মন্দির বলিয়াও পরিচিত। মন্দিরের এক অংশে নাথ যোগীদের সমাধি স্থান আছে। একটি জীবন্ত সমাধি বলিয়া সমাধি আছে। একটি মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি, গোরক্ষনাথের মূর্তি আছে। গুপ্তযুগের কিছু দর্শনীয় বস্তুও আছে। এখানে শিবরাত্রি তিথিতে একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলা একমাস কাল স্থায়ী হয়। এই সময় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মোহান্তকে গদিতে বসানো হয়। মেলাটিকে মহানাদের জাট বলা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী তান্ত্রিক সাধক শঙ্কর ভারত হইতে নাস্তিকতার অভিযোগে বৌদ্ধ ধর্ম উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ নেপাল হইতে উৎখাত করিয়া শৈব সাধনা প্রতিষ্ঠিত করেন।

নাথ সমিতির সম্পাদক লিখিত রাজগুরু যোগীবংশ ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে, গোরক্ষনাথ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার করিয়া উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ হিন্দু শঙ্করের মতই বিশিষ্ট প্রতিভাবান ছিলেন। কিন্তু অধিক উন্নত পর্যায়ে। আমাদের বিচারে পার্থক্য দেখা যায় - শঙ্কর ছিলেন মায়বাদী, গোরক্ষনাথ ছিলেন কায়াবাদী। নাথতন্ত্র জটেশ্বর চান না, কিছু প্রার্থনা করেন না। তাহারা চান নির্বাণ। নিম্ন জাতি সমূহের মর্যাদা লাভের সংগ্রামে গোরক্ষনাথের প্রচেষ্টা ছিল বলিয়া মনে করা হয়। অসঙ্গত মনে করা যায় না।

বৌদ্ধবাদী সম্প্রদায়গুলিকে বল্লালী অত্যাচারে হীন জাতীয় অবস্থা গ্রহণে বাধ্য করা হয়। তাহাদের একটি অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মর্যাদা রক্ষা করেন। কিছু অংশ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া নমঃশুদ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এই অবস্থার কোন প্রতিকার উচ্চবিত্ত নাথ নেতাদের নাই। তাহারা হতাশাগ্রস্ত।

নাথ ধর্মের অবক্ষয় বল্লালী অত্যাচারের ফল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যাচারের ফল - একথা অংশত সত্য। কিন্তু মূল সত্য হইতেছে, তাহাদের নিপীড়িত জাতি হইতে বিপরীতমুখী হওয়া। ইতিহাসে দেখা যায় নাথ ধর্মের অগ্রগতির যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায়, বাংলা ভাষা গঠনের আদিম কাল। সাহিত্য, কাব্য, স্থাপত্যের বিশেষ অবদান রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচেতনা ঃ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র

কোরক চৌধুরী

বেনেসাঁ-পববর্তী যুগে ইউবোপেব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাব প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা মানবমানসে যে বিপুল পবিবর্তন ঘটে, ইতিহাস অনুশীলনও তাব অমোঘ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। এই সময থেকেই যুক্তিবাদী মনেব নানা প্রশ্ন ইতিহাস বচনা, তাব দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষযে যে ধাবাবাহিক বিতর্ক সৃষ্টি কবতে থাকে, তাব ফলেই বিভিন্ন বিবর্তন অতিক্রম কবে আজ সেই ইতিহাস চেতনা এত জটিল ও পবিণত রূপ লাভ কবেছে। আধুনিক ভাবতবর্ষও এই অগ্রগামী ইতিহাস চিন্তাব সমান শবিক।

কিন্তু প্রাচীন ভাবতে এই ইতিহাস বোধ কতটা প্রখব ছিল অর্থাৎ যে অর্থে বর্তমানে ইতিহাস কিংবা History শব্দটিকে গ্রহণ কবা হয, সেই মানদণ্ডে প্রাচীন ভাবতীযগণেব ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তাদেব নিজস্ব ইতিহাস চিন্তাব স্বরূপই বা কি তা নিয়ে গবেষক মহলে যথেষ্ট সঙ্গত কৌতূহল আছে। এই পবিপ্রেক্ষিতে লক্ষণীয় যে, অলবিরুণী (৯৭৩ ১০৪৮)-ব মতো আদি- মধ্যযুগীয কোন কোন বিদেশী লেখক এবকম মতপ্রকাশ কবেছেন, প্রাচীন ভাবতীযদেব ইতিহাস বোধ বা কালানুক্রম সম্পর্কে কোন ধাবণা ছিল না এবং তাদেব বচনাগুলিতেও বিশ্লেষণী শক্তিব অভাব দেখা যায। আধুনিককালেও অনেক লেখক মনে কবে থাকেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে কাশ্মীবী ঐতিহাসিক কল্হণ্ তাঁব বিখ্যাত আঞ্চলিক ইতিহাস বাজতবঙ্গিণী বচনা কবাব পূর্বে ভাবতে কোন সার্থক ইতিহাসগ্রন্থ সৃষ্টি হযনি এবং ভাবতবর্ষ হেবোডোটাস, থুকিডিডেস, লিভি বা ট্যাসিটাসেব মতো কোন উঁচু মানেব ঐতিহাসিকেব জন্মও এই সমযে দিতে পাবেনি, যাব ফলে পববর্তী প্রজন্মেব জন্য প্রকৃত ইতিহাস বেখে যাওযা সম্ভব হযনি।[১] এই সমস্ত মতামত তীব্র বিতর্কের সঞ্চাব কবতে বাধ্য যেহেতু ভাবতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত শিক্ষিত, প্রাগ্রসব ও বহির্জগতেব সঙ্গে নানা সূত্রে ঘনিষ্ঠ যোগযোগসম্পন্ন এক দীর্ঘস্থাযী সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। স্বভাবতঃই সংশ্লিষ্ট বিষযে অনুসন্ধানেব অবকাশ বয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কিছু মূল্যবান ও মৌলিক তথ্যসূত্রেব সাহায্যে এই প্রশ্নেব সম্ভাব্য উত্তর খোঁজার চেষ্টা কবা হয়েছে।

ভারতের অতীতকথন শাস্ত্রের প্রাচীনতম নাম ছিল 'ইতিহাস' যার প্রথম উল্লেখ রয়েছে অথর্ববেদের পঞ্চদশ খণ্ডে।[২] এই শব্দের সঠিক অর্থ জানতে গিয়ে ব্যুৎপত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় - ইতি-হ-আস, অর্থাৎ — এইরূপ নিশ্চযই ছিল।[৩] এর তাৎপর্য হল, অতীতে যা কিছু বিদ্যমান ছিল বা যত ঘটনা

প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল (বা ঘটেছিল বলে এখন মনে করা যায়) তা সমস্তই নির্বিচারে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।। এই বিচার তাৎক্ষণিকভাবেই ইতিহাসকে মানবজাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখার জনক বা আধার হিসাবে উপস্থাপিত করে। কারণ সব শাস্ত্রেরই অতীত ইতিহাস আছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি ইতিহাসের বৃহত্তম সংজ্ঞা হলেও ঐতিহাসিকগণ আলোচনা বা উপলব্ধির সুবিধার জন্য অনেক সীমিত অর্থে এই শাস্ত্রকে গ্রহণ করে থাকেন। ভারত ইতিহাসের আদিপর্বেও ইতিহাসকে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয়গণের ইতিহাস চেতনার প্রকৃতি কী ছিল তা সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক এমন কিছু তথ্যসূত্রের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যেখানে ইতিহাস শব্দটির উল্লেখ আছে বা উক্ত সূত্রগুলি ইতিহাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমস্যা হল, এই উপাদানগুলির সাক্ষ্য অনেকক্ষেত্রেই স্ববিরোধী, পরস্পর বিরোধী ও অস্বচ্ছ। অনুমান করা যায় এর মূল কারণ হল যে রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের নির্দিষ্ট চরিত্র থেকে এই গ্রন্থগুলি উদ্ভূত, সেই চরিত্রের সঙ্গে সাহিত্য কর্মগুলি এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সহস্র সহস্র বছর পরে আজ আর উক্ত শ্রেণী দুটির উৎপত্তি ও বিকাশকে পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা যায় না বা তৎকালীন সময় প্রবাহের যথার্থ বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, যদিও বোধহয় এর মধ্যেই সমস্ত অস্পষ্টতার বীজ নিহিত।' মনে রাখা দরকার সাধারণভাবে বিশ্বের ইতিহাসে সৃষ্ট অধিকাংশ প্রাচীন (বিশেষতঃ তারিখবিহীন) ঐতিহ্য নির্ভর সাহিত্যের আধুনিক অনুশীলনের ও ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় গবেষককে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাক্ষ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব যুক্তিগ্রাহ্য অনুমানে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় থাকে না। বৌদ্ধিক জটিলতার এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই আলোচ্য সমস্যাটিকে বিবেচনা করতে হবে।

অথর্ববেদে 'ইতিহাস' ও তার অনুষঙ্গে 'পুরাণ' কথাটির অবস্থিতির ক্রম হল, ঋক্, সামন্, যজুঃ ও ব্রহ্মণ এরপরে এবং গাথা ও নারাশংসী (অর্থাৎ যজ্ঞের সময়ে গীত বীর বন্দনা)-র পূর্বে। এই বৈদিক শ্লোক থেকে উক্ত শব্দগুলির ব্যঞ্জনা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা না গেলেও শুধুমাত্র তাদের ক্রম থেকেই অনুমান করা যায় যে, বৈদিক আর্যদের দৃষ্টিতে ইতিহাস - পুরাণের (বা এই নামের সাহিত্যের) মর্যাদা ছিল গাথা — নারাশংসীর চেয়ে উচ্চে। তাছাড়া, অতীতের বিভিন্ন ঘটনারূপ মৌলিক উপাদানসমূহ ইতিহাস-পুরাণের উপজীব্য বা অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

অথর্ব বৈদিক সাহিত্য থেকে উদ্ভূত এই আপাত অস্পষ্টতা আধুনিক গবেষকদের বিব্রত করলেও প্রাচীন ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজের কাছে 'ইতিহাস' শব্দটি যে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করত, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঋষি শৌনকের প্রতি আরোপিত 'বৃহদ্দেবতা' থেকে যা আনুমানিক ৫০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত। শৌনকের প্রতি আরোপিত এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত দৈব কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্তসার। এই গ্রন্থে ঋষি শাকটায়ন ঋগ্বেদের একটি সম্পূর্ণ সুক্তকে " ইতিহাস - সূক্ত" বলে অভিহিত করেছেন।

বেদ-পরবর্তীযুগে ইতিহাস পুরাণ শব্দটি সম্বন্ধে তৎকালীন মানুষের অনুভবের স্বরূপ কিছুটা বোধগম্য হয় ভারতের সর্বপ্রাচীন অভিধান-রচয়িতা যাস্কের নিরুক্ত থেকে, যেটি আনুমানিক ৮০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই অভিধানে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে নিহিত ঋক্, গাথা ও ইতিহাসের উল্লেখ প্রসঙ্গে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে সত্য ঘটনা নির্ভর বিবরণী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'পুরাণ'কে প্রাচীন অর্থে গণ্য করে 'ইতিহাস'-এর বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং মনে হয়, যাস্কের মতে ইতিহাস-পুরাণের সম্মিলিত অর্থ ছিল, যে কোন প্রাচীন বহু প্রচলিত সত্য কাহিনীর বর্ণনা।

কিন্তু কৌতূহলের বিষয় হল, যাস্ক এমন অনেক কাহিনীকে 'ইতিহাস' (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা মতে সত্য ঘটনা) আখ্যা দিয়েছেন, যেগুলিকে বিনা দ্বিধায় কাল্পনিক বলে বর্জন করা চলে। যেমন, কুরুবংশের রাজা প্রতীপের প্রথম দুই পুত্র দেবাপি ও শান্তনুর ঘটনা, ভুবনের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সর্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে আত্মবলিদান, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নদী সমূহের কথোপকথন ইত্যাদি। এরকম দৃষ্টান্ত বৃহদ্দেবতাতেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ইতিহাসকে পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন (ও আপাতদৃষ্টিতে সত্য) কাহিনীর বিবরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও এর উদাহরণ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে ভাগুরি, যাস্ক, শৌনক, শাকটায়ন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদের অসংখ্য কাল্পনিক উপাখ্যানকে ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত বলে অভিহিত করেছেন। সামান্য ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে যাস্ক এই কাহিনীগুলিকে 'সংবাদ' নাম দিয়েছেন, কিন্তু শৌনকের মতে, এগুলি 'ইতিহাস'।[৮] এরকম কয়েকটি কাহিনী হল, দেবগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক স্বীয় কন্যা রোমশাকে রাজা ভাবযব্যের হস্তে প্রদান দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক কুষ্ঠরোগাক্রান্তা অত্রিকন্যা অপালার রোগমুক্তির ও পুনরায় সৌন্দর্য লাভের প্রার্থনা পূর্ণ করা, বৃত্রের ভয়ে ভীত সোম বা চন্দ্র কর্তৃক দেবতাদের মধ্যে থেকে পলায়ন ইত্যাদি।

উপরের এই অধ্যয়ন থেকে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, প্রাথমিকভাবে ইতিহাস বলতে পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন ও সম্ভবতঃ সত্য ঘটনার বিবরণ বোঝালেও বিভিন্ন কাল্পনিক পরম্পরাগত অথচ জনপ্রিয় কাহিনীগুলিকেও প্রায়শঃ ইতিহাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই বৈপরীত্যের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, যেহেতু প্রাচীন ভারতীয়গণের গরিষ্ঠাংশের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার অধিবাসীদের মতই সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা ছিল, সে কারণে এই বহুপ্রচলিত উপকথাসমূহের উপর তারা বিনা দ্বিধায় আস্থা স্থাপন করেছিল। এভাবেই এই কাল্পনিক কাহিনীগুলির সত্যতা নির্ণয়ের দিকটি উপেক্ষিত হয় এবং এগুলি বিনা বাধায় ইতিহাস হিসাবে গণ্য হতে থাকে।

এই ব্যাখ্যা থেকে সিদ্ধান্ত হতে পারে যে, প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল না এবং সেজন্যই তারা সত্য ও অসত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেনি। কিন্তু এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে শতপথ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা, যেখানে বলা হয়েছে যে, দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকালীন

সংগ্রামের বিবরণগুলির কিছু কিছু অংশ ইতিহাসে এবং অবশিষ্টাংশ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে — এই চিরায়ত কাহিনীসমূহেব সবগুলিই মিথ্যা।[২০] প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত মরিস হিন্টারনিৎসেব ভাষায়, শতপথ ব্রাহ্মণেব এই মতামত ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বর্ণিত সমস্ত কাহিনীগুলিকেই প্রায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সমতুল।[২১] তাছাড়া, এই প্রসঙ্গে মনে বাখাব মত যে, জুলিযাস এগ্‌লিং বিতর্কিত ইতিহাস-পুরাণ শব্দটিকে 'চিরায়ত বা বহুপ্রচলিত কিংবদন্তী' অর্থেই অনুবাদ কবেছেন।[২২] যাই হোক, ভাবতীয় ইতিহাসে সূচনা পর্বে ইতিহাস চেতনা বিকাশের বিবর্তনের প্রশ্নে শতপথ ব্রাহ্মণেব এই সাক্ষ্যেব গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এ থেকে অন্তত দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ প্রাচীন ভারতীয় মানুষের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা তথা ঐতিহাসিক বিচাববোধ যথেষ্ট প্রখব ছিল। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু তারা ইতিহাসকে কেবল সত্য ঘটনার আকর বলে মনে কবত না, সে কারণে দেবাসুরের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিববণেব সত্যতা সম্পর্কে বিচাব ও বিরূপ মন্তব্য কবাব সুযোগ ছিল। পাশাপাশি, এই সম্ভাবনাকেও অস্বীকাব করা যায় না যে, প্রাথমিক পর্বের ইতিহাসকে কেবল সত্য ঘটনা সংবলিত বলে গ্রহণ করা হলেও (ব্যুৎপত্তিগত অর্থও যার ইঙ্গিত দেয়) ক্রমে ক্রমে (বিশেষতঃ পুরাণ, আখ্যান, ইতিবৃত্ত, গাথা-নারাশংসী প্রভৃতি প্রায় সমার্থক শব্দাবলী যে সময়ে ইতিহাসের বিকল্পে বা বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে সেই সময়ে) ইতিহাসেব অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে এবং কাল্পনিক অথচ ঐতিহ্য অনুমোদিত বহু জনপ্রিয় উপকথা বা নীতিমূলক কাহিনীও ইতিহাসে প্রবেশ লাভ করে। এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায় মহাভারতের মত একটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের মহাকাব্য থেকেও, যেখানে অনেকগুলি নীতিগল্প বা অবাস্তব রূপকথাকেও ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[২৩]

এরপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্র সাহিত্যের যুগের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলিতে ইতিহাস শব্দের নানা ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করলে এই সাহিত্যের মর্যাদা, পবিত্র চরিত্র ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যায। এই উল্লেখগুলি ছড়িয়ে আছে শতপথ ব্রাহ্মণ[২৪], গোপথ ব্রাহ্মণ[২৫], তৈত্তিরীয় আরণ্যক[২৬], জৈমিনীয় উপনিষদ[২৭], বৃহদারণ্যক উপনিষদ[২৮], ছান্দোগ্য উপনিষদ[২৯], আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র[৩০], শাংখায়ন গৃহ্যসূত্র[৩১], শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র[৩২], (কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত) মৈত্রায়নী সংহিতা[৩৩] প্রমুখ মৌলিক সাহিত্যে। সম্মিলিতভাবে এদের সাক্ষ্য বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ এখানে, বিশেষতঃ শতপথ ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে, ইতিহাসকে ইতিহাসবেদ বা পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত করে বেদের সীমাহীন পবিত্রতার ও মর্যাদার স্তরে উন্নীত করা হয়েছে (বাক্যে বাক্যোতিহাসপুরাণঃ পঞ্চম বেদানাং বেদঃ।।)[৩৪]। দ্বিতীয়তঃ নানা উপলক্ষে, উৎসব-অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের মানুষের দ্বারা এর ব্যবহারের অনিবার্য সুফলের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন, অশ্বমেধযজ্ঞ চলাকালীন ইতিহাসবেদ আবৃত্তি ছিল অবশ্যম্ভাবী[৩৫] এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী রাজাও পূর্বের উদাহরণগুলি শ্রবণ করে উপকৃত হতে পারতেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে, গৃহস্থ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, পূজাঅর্চনা, বিবাহাদির সময়ে অথবা প্রত্যহ ইতিহাস পাঠের ফলাফল

ছিল আধিব্যাধি আকস্মিক মৃত্যু, দৈবদুর্বিপাকে প্রভৃতি বিপদেব নিবাকবণ, ধর্মীয পুণ্য অর্জন, দেবতাদেব সন্তুষ্টি বিধান এবং পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ । কোন বর্ষীযান মান্য ব্যক্তিব মৃত্যুব অব্যবহিত পবে পবিবাবেব জীবিত সদস্যগণ কর্তৃক প্রাচীন গার্হস্থ্য অগ্নি নির্বাপিত কবে নতুন অগ্নি প্রজ্বলন এবং একত্র উপবেশন কবে সমস্ববে ইতিহাস-পুবাণ পাঠেব বা পাঠ শ্রবণেব নির্দেশ দেওযা হযেছে। আবো বলা হযেছে যে, দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পূর্ণিমায স্বামী স্ত্রীব ইতিহাস আলোচনা কবে বাত্রি অতিবাহিত কবা উচিত । আপাতবিচ্ছিন্ন এই উল্লেখগুলিব সামগ্রিক তাৎপর্য অনুধাবন কবলে শুধু যে ইতিহাসকে প্রাচীন ভাবতীয জনগণ কত গভীব শ্রদ্ধাব সঙ্গে গ্রহণ কবেছিলেন তা বোঝা যায তাই নয, জাতীয জীবনে ইতিহাসেব যে অসামান্য সদর্থক ভূমিকা ছিল, তাও অস্পষ্ট থাকে না।

প্রাচীন ভাবতীয ইতিহাস চেতনা বিবর্তনেব প্রশ্নে খ্রীষ্টেব জন্মেব কযেক শতাব্দীব পূর্বেই যে বিস্ময়কব অগ্রগতি ঘটেছিল, তাব নিদর্শন হল কৌটিল্য বচিত অর্থশাস্ত্র। এই গ্রন্থেব যে শ্লোকে ইতিহাসকে বেদ হিসাবে গণ্য কবে এবং চতুর্বেদেব সঙ্গে সংযুক্ত কবে অলঙঘনীয মহিমা দেওযা হযেছে তাতে বলা হযেছে যে, "সামবেদ, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ মিলিতভাবে ত্রয়ী নামে কথিত। এদেব সঙ্গে অথর্ববেদ ও ইতিহাসবেদও বেদ হিসাবে পবিচিত" (সামর্গযজুর্বেদা স্ত্রযস্ত্রযী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ) । এ থেকে অনুমিত হয, ইতিহাস বা ইতিহাস পুবাণ কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল না, ববং ঋক্, সাম ও যজুর্বেদেব মত ছিল এক বিশাল সাহিত্য, যাতে নানা শ্রেণীব অসংখ্য প্রাচীন কাহিনী আশ্রয পেযেছিল। এই গ্রন্থেব অপব একটি শ্লোকে বাজাকে দিনেব অন্ত্যভাগে মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ বাজকর্মচাবী সমভিব্যাহাবে ইতিহাস পাঠ ও শ্রবণেব নির্দেশ দেওযা হযেছে । কিন্তু এ বিষযে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, ইতিহাসেব সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কবতে গিযে কৌটিল্য এব অন্তর্গত ছযটি মৌলিক উপাদানেব কথা বলেছেন, যা নিযে ইতিহাস গঠিত -- যেমন, পুবাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যাযিকা, উদাহবণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র । এদেব মধ্যে প্রত্যেকটি শাখাব বিষযবস্তু অনেকটাই স্বতন্ত্র এবং তাদেব উদ্ভব ও বিকাশ বিস্তৃত আলোচনাব দাবি বাখে। যেমন, বিশাল পুবাণ সাহিত্য সাধাবণভাবে পঞ্চলক্ষণযুক্ত[৪২] সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তব ও বংশানুচবিত, যাব মধ্যে একমাত্র শেষোক্ত অধ্যাযেই প্রাচীন বাজবংশগুলিব বংশতালিকা দেওযা আছে, যাতে যথার্থভাবে বাজনৈতিক ইতিহাসেব মৌলিক উপাদান লক্ষ্য কবা যায[৪৩]। কাজেই এ ডি পুসলকাবেব এই অনুমান বোধহয যুক্তিসঙ্গত যে, কৌটিল্যেব সমযে ইতিহাস গুরুত্বেব দিক থেকে পুবাণকেও অতিক্রম কবেছিল এবং ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রকেও নিজ পরিধির মধ্যে গ্রাস কবেছিল[৪৪], যদিও পববর্তীকালে শেষোক্ত দুটি বিষয স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া অর্থশাস্ত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করা হয়েছে যে, বাজকীয় লেখ্যাগাবে নানা দেশের গ্রামের ও পরিবারের প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান, পেশা, বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃত চুক্তি, করপ্রদান, করগ্রহণ, অনুশাসন প্রচাবকাবী বাজাব নাম ও বংশপরিচয় উপাধি ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ রাখতে হবে[৪৫]।

এ থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে, মৌর্যযুগে রাজপৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলিকে সংঘবদ্ধ করে গ্রন্থাগারে রাখা হত, যার ফলে দরবারী ইতিহাসচর্চার ধারা গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৌটিল্যই সর্বপ্রথম অত্যন্ত ব্যাপক ইতিহাস চেতনার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মতে, সমস্ত শ্রেণীর অগণিত প্রাচীন কাহিনী ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে কাহিনীগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বহন করত। এই পর্যায়ে শুধুমাত্র দেবতা-রাজা-ঋষি প্রভৃতি বিষয়কেন্দ্রিক প্রাচীন কাহিনী অর্থাৎ পুরাবৃত্তের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে ইতিহাস বৃহত্তর সংজ্ঞা লাভ করেছিল, যাতে অন্তত মৌর্যযুগ তথা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে প্রচলিত সমস্ত অতীতের বিবরণগুলিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু করা হয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে, ভারতের বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতের ইতিহাসকে পুরাণ এবং বেদ নাম দেওয়া হয়েছে[৬], ও বলা হয়েছে যে, এই ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যেই বেদের মর্মার্থ উপলব্ধি সম্ভব[১১]। মহাভারতে ইতিহাস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে দেবর্ষিচরিতাশ্রয় অভিধা[১৮], যার অর্থ ইতিহাস মূলতঃ দেবতা ও ঋষিদের জীবনী নির্ভর। এছাড়া ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এর শিক্ষামূলক তথা নীতিমূলক দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ইতিহাস বলতে বোঝায় নানা মনোজ্ঞ কাহিনীর ব্যাখ্যা সহযোগে অতীত কালের ঘটনাবলীর বর্ণনা, যে কাহিনীগুলি মানবজীবনের চতুর্বর্গ ধর্ম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ের উপদেশে সমৃদ্ধ (ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ উপদেশসমন্বিতম্, পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তম্ ইতিহাসম্ প্রচক্ষতে।।)[১৯]। সুতরাং মহাভারতের মতে, ঐতিহাসিক শুধুমাত্র প্রাচীন ঘটনাবলী বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হবেন না, একই সঙ্গে সেগুলি থেকে মানবজীবনের সার্থকতা প্রসঙ্গে নৈতিক উপদেশও সংগ্রহ করবেন, যা জনগণের কাছে শিক্ষাপ্রদ হবে। আধুনিককালে ইতিহাসচর্চার শিক্ষামূলক আবেদন যে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে, তার সঙ্গে প্রাচীন মহাভারতের দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভুত সাযুজ্য লক্ষণীয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্মীয় গুরুত্বের সঙ্গে তার রাজনৈতিক তথা ইতিহাসচেতনাগত তাৎপর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলেও এই উপাদানগুলিকে স্পষ্টভাবে পৃথকীকরণ অত্যন্ত কঠিন। তৎসত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যগুলিকে একত্র করলে মনে হয়, বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত গাথা ও নারাশংসী নামক রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ সম্বলিত কবিতাগুলি প্রথমে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে এক চলমান বিশাল কিংবদন্তীর ভাণ্ডারের আকারে বিদ্যমান ছিল, যার মূল উপাদান ছিল অতীতের বিভিন্ন প্রকার সত্য ঘটনা ও কল্পনাশ্রয়ী লোককাহিনী, যা পরবর্তীকালে নৈতিক ও ধর্মীয় আবেদনের জন্য জনগণের বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল। এই সাহিত্য সূত, মাগধ, বীণাগাথিন্, পৌরাণিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর চারণ কবিদের দ্বারা গীতবন্দনা সঙ্গীতগুলির মধ্যে নিহিত ছিল এবং তাদের দ্বারা স্থান থেকে স্থানান্তরে সম্প্রচারিত হত[২০]। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে হোতৃ পুরোহিত ও সূত্র-মাগধদের সহযোগিতায় এই উপাখ্যানগুলি পারিপ্লব আখ্যান

হিসাবে সঙ্গীতের আকারে যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মের অংশ হিসাবে পরিবেশিত হত এবং এইভাবে এই কাহিনীগুলি প্রথম সংহত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। রাজচন্দ্র হাজরার মতে, পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ সাহিত্য ও মহাভারত অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত এই পারিপ্লব আখ্যানগুলি থেকেই জন্মলাভ করেছিল। প্রথমে ধর্মীয় বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে এই আখ্যানগুলি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ধীরে ধীরে পরবর্তী বৈদিক যুগে ধর্মীয় পরিমণ্ডল বা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এগুলি স্বতন্ত্র সত্তা ও অস্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, আদি পর্বের ঐতিহাসিক হিসাবে সূত-মাগধ শ্রেণীর ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বীজ হিসাবে গাথা নারাশংসী, পারিপ্লব আখ্যান প্রভৃতি নামধেয় কাহিনী সমূহের মূল্যবান ভূমিকা ছিল।

ভারতে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে যে সার্থক ইতিহাস লেখা হয়নি একথা অনেকাংশে সত্য এবং বিভিন্ন রাজবৃত্তগুলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য। কিন্তু সার্থক ইতিহাস না থাকা এবং যথার্থ ইতিহাস বোধ না থাকা সমার্থক নয়। প্রাচীন ভারতীয়দের প্রখর ইতিহাসবোধ ও ইতিহাস রচনার চেষ্টা উপরের আলোচনায় প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে তীব্র ইতিহাসচেতনা ও বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যথার্থ ঐতিহাসিকসুলভ মনন বা দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিতে আধুনিক অর্থে ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। এর পশ্চাতে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়।

(ক) প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাস বলতে সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন নৈতিক আবেদনের জন্য, যদিও তাদের সত্যাসত্যবোধ শতপথ ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত।

(খ) চতুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত ও বেদের সমান মর্যাদাপ্রাপ্ত ইতিহাস প্রাচীন ভারতীয়দের কাছ থেকে এত বেশি শ্রদ্ধা পেয়েছিল যে, এর অভ্যন্তরের সত্য ঘটনাগুলিকে আরো ধর্মীয় চরিত্র দেওয়ার জন্য নানা কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা এদের আবৃত করা হয়েছিল।

(গ) সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির পর ভারতে বহু শতাব্দী ধরে লিখন অপ্রচলিত থাকায় মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই সমস্ত অতীতের কাহিনী সংরক্ষিত ছিল। এ কারণে বেদ ও ধর্মশাস্ত্র যথাক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি নামে পরিচিত। কিন্তু এর ফলেই পরবর্তীকালে লিখন শুরু হওয়ার সময় অনেক ভ্রান্তি ও বিকৃতি অনুপ্রবেশ করে যথার্থ ইতিহাস রচনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

(ঘ) খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই ভারতের জাতীয় জীবনে ধর্মের অতিরিক্ত প্রভাব এত প্রকটিত হয়েছিল যে, এর ফলে ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টি হলেও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সাহিত্য ব্যাহত হয়েছিল।

(ঙ) মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রাচীন ভারতীয়দের কল্পনাপ্রিয়তা, অতিরঞ্জনের প্রতি আগ্রহ ও কাব্যচর্চা বাস্তবসম্মত ইতিহাস সৃষ্টিতে বাধা দিয়েছিল।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিশেষে বলা যায়, 'ইতিহাস' শব্দটির সৃষ্টিই প্রাচীন ভারতীয়দের উন্নত ইতিহাস বোধের সর্বোত্তম নিদর্শন[৫১], কারণ এই শব্দটির মধ্যে একাধারে রয়েছে অতীত চেতনা এবং তথ্যের সততার বা যাথার্থ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, যে দুটি

মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এমনকি আধুনিককালেব পবিণত বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বচনাশৈলীতেও প্রধান স্থান অধিকাব করে আছে।

সূত্র নির্দেশঃ

১। ই সি সাচাউ (সম্পাদিত) **আলবিরুনী'জ ইন্ডিয়া** দ্বিতীয় খণ্ড লন্ডন ১৯১০ পৃঃ ১০ ১১।

২। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী **পলিটিক্যাল হিষ্ট্রি অফ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া** সপ্তম সংস্করণ কলকাতা ১৯৭২ পৃঃ ১।

৩। অথর্ববেদ ১৫ ৬ ৪।

৪। এম মনিয়ার উইলিয়ামস এ **স্যানসক্রিট-ইংলিশ ডিকসনারী** প্রথম সংস্করণ অক্সফোর্ড ১৮৯৯ পুনর্মুদ্রণ দিল্লী ১৯৭৬ পৃ ১৬৫। এই অর্থের প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালের কয়েকটি রচনাতেও পাওয়া যায়। যেমন সপ্তম শতকে ভট্টিবান রচিত অমরসিংহের অমরকোষে ইতিহাসের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পুরাবৃত্ত (অর্থাৎ পুরাকালের ঘটনা বা ঘটনাবলী) যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইতিহ পুরাবৃত্তং আস্তে অস্মিন অর্থাৎ যাতে প্রাচীন ঘটনাসমূহের বিবরণ আছে। অমরকোষ শব্দাদিবর্গ ১ ৬ ১।

৫। ভি এস পাঠক **এনশিয়েন্ট হিষ্টোরিয়ানস অফ ইন্ডিয়া** ১৯৬৩ পৃ ১৩৯ ১৪০

৬। অথর্ববেদ ১৫ ৬ ১।

৭। উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল **স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রী এন্ড কালচার** ১৯৫৭ পৃ ১৫

৮। ঋগ্বেদ ১০ ১০২।

৯। **বৃহদ্দেবতা** (এ এ ম্যাকডোনেল সম্পাদিত) ১৯০৪ ৮ ১১।

১০। নিরুক্ত ৪ ৬।

১১। তদেব ২ ১০ ৯ ১৪।

১২। তদেব ১২ ১০।

১৩। তদেব ২ ১০।

১৪। তদেব ১০ ২৬।

১৫। তদেব ২ ২৪ ৯ ২৩ ১০ ২৬।

১৬। **বৃহদ্দেবতা** ৪ ৪৬।

১৭। তদেব ৩ ১৫৬ ৬ ১০৭ ১০৯।

১৮। তদেব ৭ ১৫৩।

১৯। ১৭ নং টীকাব অনুরূপ।

২০। **শতপথ ব্রাহ্মণ** ১১ ১ ৬৯।

২১। মরিস হ্বিন্টারনিৎস **হিষ্ট্রী অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার**, প্রথম খণ্ড ১৯৭২ পৃঃ ২২৪ পাদটীকা ১।

২২। ম্যাক্সমূলার (সম্পাদিত) **সেক্রেড্ বুকস্ অফ দি ইষ্ট গ্রন্থমালা** খণ্ড সংখ্যা ৪৪ শতপথ ব্রাহ্মণ (অনুবাদ জুলিয়াস এগলিং) ১১ ৫ ৬ ৮, পৃঃ ৯৮।

২৩। মহাভারত, ১৩, ১৩ ঃ মরিস হ্বিন্টারনিৎস্, পৃঃ ৪০৪-৪০৭।

২৪। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১ ১৬ ৯, ১১ ৫ ৬ ৮, ১১ ৫ ৭ ৯, ১৩ ৪ ৩, ১২, ১৩, ১৩ ৪ ৬ ১২।

২৫। **গোপথ ব্রাহ্মণ**, ১ ১০, ১ ২১।

২৬। **তৈত্তিরীয় আরণ্যক** ২ ৯ ১১।

২৭। **জৈমিনীয় উপনিষদ**, ১ ৫৩।

২৮। **বৃহদারণ্যক উপনিষদ** ২ ৪ ১০ ২ ৪ ১৬ ৪ ১১ ৫ ১১।
২৯। **ছান্দোগ্য উপনিষদ** ৩ ৩ ৪ ৩ ৫ ১২ ৭ ১ ২ ১ ৭ ১ ২ ৪ ৭ ১ ৭ ১ ৭ ২ ১ ৭ ৭ ১ ৭ ১১ ৪ ৮ ১ ৭।
৩০। **আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র,** ১ ১৬ ৬ ৩ ৩ ১ ৩ ৪ ৬ ৬।
৩১ **শাংখায়ন গৃহ্যসূত্র** ১ ২২ ১১।
৩২ **শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র** ১৬ ২ ২১ ২৭।
৩৩। **মৈত্রায়ণী সংহিতা** ৩ ৭ ৩।
৩৪। **ছান্দোগ্য উপনিষদ্** ৭ ১ ২ ১ ৭ ২ ১ ৭ ৭ ১ ৭ ১১ ৪ ৮ ১ ৭ ইত্যাদি।
শতপথ ব্রাহ্মণ ৪ ৬ ১২।
৩৫। **শতপথ ব্রাহ্মণ** ১৩ ৪ ৬ ১২। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বিশেষ অংশ (৩ ৪ ১ ২) সম্পর্কে নিজের ভাষ্য প্রকাশ করতে গিয়ে শংকরাচার্য বলেছিলেন যে পারিপ্লব রাত্রিগুলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ হিসেবে ইতিহাস পুরাণ পাঠ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুমোদনের মাধ্যমে বিদ্যমান ছিল। শঙ্করকে অনুসরণ করে অপর ভাষ্যকার আনন্দগিরিও ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন (রাজচন্দ্র হাজরা **অ্যানালস অফ ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট** ৩৬ ৩৬ ১৯৫৫ পৃ ১৯০ ২০৩।
৩৬। **শতপথ ব্রাহ্মণ,** ১১ ৫ ৬ ৮ ১১ ৫ ৭ ৯।
আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্র, ৩ ৩ ১ ৩।
৩৭। তদেব ৪ ৬ ৬।
৩৮। **গোভিল গৃহ্যসূত্র** ১ ৬ ৬।
৩৯। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,** (আর পি কাংলে সম্পাদিত ১৯৭০ প্রথম খণ্ড) ১ ৩ ১ ২।
৪০। তদেব ১ ৫ ১৩ ৫ ৬ ৪৭।
৪১। তদেব ১ ৫ ১৪।
৪২। **ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ** ১ ১ ৩৭ ৩৮ **বায়ুপুরাণ** ৪ ১০ ১১
মৎস্যপুরাণ ৫৩ ৫৩ ৬৫ **কূর্মপুরাণ** ১ ১ ১২ **বরাহপুরাণ** ১ ৪
শিবপুরাণ ৫ ১ ৩৭ **গরুড়পুরাণ** ১ ২১৫ ১৪ **ভবিষ্যপুরাণ** ১ ২ ৭ ৫।
৪৩। মনিয়ার উইলিয়ামস **ইণ্ডিয়ান উইজডম** ১৯৬৩ পৃঃ ৪৯১। রাজচন্দ্র হাজরার মতে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে সঙ্গীতকারে পরিবেশিত পারিপ্লব আখ্যানগুলি থেকেই পুরাণসমূহের উৎপত্তি ঘটেছিল। এ বি ও আর আই খণ্ড ৩৬ ১৯৫৫, পৃঃ ১৯০ ২০৩। এই প্রসঙ্গে এফ ই পার্জিটার **ডাইন্যাস্টিস অফ দি কলি এজ** লন্ডন ১৯১৩ এবং ঐ লেখকের **অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল ট্র্যাডিশন** লন্ডন ১৯২২ দ্রষ্টব্য।
৪৪। এ ডি পুসলকার, **আওয়ার হেরিটেজ,** খণ্ড ১২ পার্ট ২, ১৯৬৪ পৃঃ ৪০।
৪৫। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** ২ ২৫ (আর শামশাস্ত্রী বাঙ্গালোর, ১৯১৫)।
৪৬। মহাভারত ৩ ১০২৯ ৭ ১৪৯৮, ১২ ১৬৬০।
৪৭। তদেব ১ ১।
৪৮। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় **ইতিহাস একটি প্রাচীন ভারতীয় চেতনা,** কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ১।
৪৯। ভি এস আপ্তে, **স্যান্সক্রিট-ইংলিশ ডিকসনারী,** (ইতিহাস), পৃঃ ৩৮২।
৫০। সি এইচ ফিলিপস্ (সম্পাদিত), **হিস্টোরিয়ান্স্ অফ ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড সিলোন,** ১৯৬১, পৃঃ ১৫।
৫১। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩।

মুঘল মহিলা-মহল

অর্ধেন্দুশেখব দাশগুপ্ত

প্রাচীনকাল থেকেই ভাবতীয় সম্রাটদেব বাজসভায় নাবীকর্মীদেব উপস্থিতিব বিববণ লিপিবদ্ধ আছে। নাবীবা বাজছত্র ধবতেন, চামব ব্যজন কবতেন এবং গীত-নৃত্যাদি পবিবেশন কবতেন। এমনও বিববণ আছে যে, সম্রাট যখন 'অন্তঃপুব' বা 'অন্তঃবাসবে' অবস্থান কবতেন, তখন তাঁদেব প্রতিবক্ষাব জন্য কিছু শস্ত্রধাবী নাবীও নিযুক্ত থাকতেন। 'কঞ্চুকী' (ব্যক্তিগত ভৃত্য) ও 'প্রতিহাবী' (দ্বাব-বক্ষী) ব্যতীত অন্য কোন পুরুষেব অন্তঃপুবে প্রবেশ ছিল দণ্ডনীয় অপবাধ। সেই যুগে সমাজেব উচ্চবিত্ত ও তথাকথিত সম্ভ্রান্ত মানুষদেব নানা ভোগ-বিলাসেব মধ্যে ক্রমশ নাবীলোলুপতাব প্রতি এক ধবনেব অস্বাস্থ্যকব দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। একদিকে এবা নাবীব সতীত্বেব ওপব বিশেষ জোব দিতেন, — কিন্তু অন্যদিকে পুরুষেব বহুগামিতাকে নিন্দনীয মনে কবতেন না। বিবাহিত পুরুষেব একাধিক উপপত্নী থাকাটা স্বাভাবিক বলেই গণ্য হতো।

এক সময, প্রাচ্যেব মুসলমান সম্রাটদেব মধ্যে উপপত্নীব সংখ্যাগবিষ্ঠতা একটি বিশেষ মর্যাদা বলে স্বীকৃত হতো। এবা একই সঙ্গে চাবজন বমণীকে বিয়ে কবতে পাবতেন — যাতে ধর্মীয বা সামাজিক কোন বাধা ছিল না। তাছাড়া, স্বেচ্ছাচাবী ও সুবিধাভোগী হিসেবে, এবা যখন চাইতেন, তখনই বিয়ে কবতে পাবতেন এবং যে কোন সময তাদেব বিবাহিতাদেব পবিত্যাগও কবতে পাবতেন। প্রথম দিকে, বহিবাগত মুসলমান আক্রমণকাবীবা যখন ভাবতে আসতেন স্বল্প সমযেব জন্য প্রধানতঃ লুণ্ঠনকাবী হিসেবে, তখন নাবীদেব প্রতি কম-বেশী এমনি একটা মানসিকতা পোষণ কবতেন।

'হাবেম' কথাটি বাংলায প্রচলিত একটি 'বিশেষ্য' হলেও আসলে, এটি একটি আববী শব্দ মূলত যাব অর্থ 'পবিত্র'। এ কথাটিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবা সাধাবণতঃ 'সেবালিও' (Seraglio) বলে থাকেন, যাতে বোঝায- 'পুবাকালেব কনস্টান্টিনোপলেব সুলতানেব আবাসগৃহ, — যার বেষ্টনীব মধ্যে ছিল — বিভিন্ন মসজিদ, বিবিধ উদ্যান, এবং বৃহৎ হর্ম্যমালা, - যাব একাংশেব নামকরণ হলো 'হাবেম'- যেখানে মহিলাদের স্থান হতো বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ উপভোগের জন্য।

কালক্রমে - 'হাবেম' কথাটিব অর্থের তারতম্য ঘটে এবং পরে সাধাবণভাবে প্রাচ্যেব মুসলমান সম্রাটদের 'মহিলা-মহল' হিসেবে পরিচিত হয়। ভাবতবর্ষে, 'সুলতান'দের শাসনকাল অবধি 'হারেমের' বিধি-ব্যবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট বাপেব

বিববণ পাওয়া যায়না। তখনকার 'হারেম' ছিল, 'সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে নারীদের থাকবাব জায়গা'। বিলাসভোগী সুলতানরা 'হারেম'কে 'প্রমোদ-ভবন' এবং যৌন লালসার উচ্ছৃংখল লীলাক্ষেত্র হিসেবেই গণ্য করতেন এবং বহু সময় হারেমে অতিবাহিত করতেন।

মুঘল যুগে, মহামতি আকবরের শাসনকালে, 'হারেম' সম্পর্কে বিশেষ বিধি-নির্দেশ প্রবর্তিত হয়- সম্রাটের পরিবারের মহিলাদের জন্য। ঐতিহাসিক ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের মতে,- প্রাসাদের যে অংশ 'হারেম' হিসাবে নির্দিষ্ট, তা প্রাথমিকভাবে অবশ্যই হোত সম্রাটের সহজগম্য স্থান। সাম্রাজ্ঞী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ দাসী পর্যন্ত, সকলের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী, অনুকূল পরিবেশ ও স্থান নির্ধারিণ করা হোত 'হাবেমের' বিভিন্ন ও বিশেষ বিশেষ 'মহলের' জন্য। আবুল ফজল 'মহলের' নামকরণ করেছিলেন- 'শাবিস্তান-ই-খাস'। 'হারেমে'র কাজে নিয়োগ করার ব্যাপারে- স্বয়ং সম্রাট বিশেষ গুণাবলীর বিচার করতেন। দরবারের লিপিকাররা এ ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আকবর সাধারণ রমণীদের কাজের উৎকর্ষতায় খুশী হয়ে তাদের পুরস্কৃত করে উচ্চতর পদে বহাল করেছেন। পর্দানশীন 'হারেম' বাসিনীদের জন্য সর্বোপরি অভিজাত বংশের একজন 'হাকিমা' নিযুক্ত থাকতেন। তার দায়িত্ব ছিল 'হারেমের' অভ্যন্তরে থেকে খোজা (নপুংসক) প্রহরীদের সহায়তায়- 'হারেম'কে বিশেষ সম্মানের সংগে পরিচালনা করা। বিভিন্ন কাজের জন্য সাধারণতঃ দুই ধরনের কর্মী নিয়োজিত হতেন। প্রথমত, মহিলা ও খোজা এবং দ্বিতীয়ত, পুরুষ কর্মী, যারা 'খান-সামানের' অধীনে নিযুক্ত। নারী কর্মীরা সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত ছিলেন, সর্বোপরি 'মাহিন-বানু', তারপর তাঁরই অধীনে মধ্যস্তর এবং নিম্নস্তরের। প্রথম দুই স্তরের কর্মীরা তৃতীয় স্তরের কর্মীদের কাজের তদারকি করতেন। 'হাকিমা' অবশ্যই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা, সুশিক্ষিতা, সাহসিক ও অন্যান্য গুণের অধিকারিণী হতে'ন। মধ্যস্তর বা দ্বিতীয় স্তরের কর্মীরা যারা বিশেষ বিশেষ মহলের দায়িত্বে নিযুক্ত, — তাঁরাও ছিলেন বিশেষ বুদ্ধিমতী, বয়স্কা এবং অবশ্যই বিবাহিতা মহিলা। এরা রাজকীয় ঘোষণাদি 'হারেমে' পাঠ করে শোনাতেন। স্বয়ং সম্রাটের সংগে এদের ব্যক্তিগতভাবে সংযোগরক্ষার পদ্ধতি ছিল স্বীকৃত। এরা সম্রাটের কাছে সংবাদ-লেখকদের ('ওয়াকিয়া-নবিশ') নানা সংবাদ পেশ করতেন; এমনকি গুপ্তচরদের ('খুফিয়া-নবিশ') আহরিত সংবাদও বাদ পরত না। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন বলে, সম্রাট-কন্যাদের পড়াশোনার ব্যাপারেও দেখাশোনা করতেন। নিম্নস্তরের কর্মীদের দুই ভাগে ভাগ করা হোত, - প্রথমত: কৃতদাসী (যারা খোলা বাজার থেকে অর্থমূল্যে কেনা) ও দ্বিতীয়ত, বিজিত দেশ থেকে 'উপহার' স্বরূপ পাওয়া। এদের চেহারার উৎকর্ষতা, হাঁটা-চলার ভঙ্গী ও কথা বলার ধরন ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের জন্য নতুন নামকরণ হত। 'হারেমের' অভ্যন্তরে, শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষতঃ তীর-ধনুক ব্যবহারে অভ্যস্ত মহিলাদের নিয়োগেব বিবরণ আছে। 'হারেমে'র প্রবেশ পথে বিশ্বস্ত নপুংসক খোজা প্রহরীরা মোতায়েন থাকত। সূর্যাস্তের পরেই একমাত্র প্রধান প্রবেশ-পথ ছাড়া, অন্য সমস্ত দরজা

বন্ধ করে সীল-মোহর লাগিয়ে দেওয়া হোত এবং কোন দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ করার অনুমতি ছিলনা। প্রধান প্রবেশ পথের মুখে সশস্ত্র সেনানী পাহারায় থাকত। আকবর রাজপুতদের বীরত্ব এবং নারী জাতির প্রতি তাদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ওপর বিশেষভাবে আস্থাবান ছিলেন, আর সেজনাই, 'হারেমের' বাইরের দেওয়ালে সর্বদা রাজপুত সেনাদের নিয়োগ করা হোত। রাজপুতরা, তাদের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, মুঘল মহিলাদের সম্মান রক্ষা করে নিরাপদে রাখতেন। সম্রাট সব সময়ে রাজধানীতে থাকতে পারতেন না,- কখনো সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য, কখনো কখনো আত্মীয়-স্বজন দর্শনে, যুদ্ধ-যাত্রায় বা কখনো শিকার অভিযানে বাইরে যেতেন। সেই সময় 'হারেম'ও তাঁর অনুসরণ করতো, সমস্ত শৃংখলা ও নিয়ম-কানুন বজায় রেখে। অবশ্যই এসব যাত্রার রীতি-নীতি, বাধা-নিষেধ ও পথ-পরিক্রমা পূর্ব পরিকল্পিত থাকত। কথিত আছে যে, ঔরংজেবের আমলে একবার জাহান বানি বেগমের শিবিরে হঠাৎ মারাঠারা অতর্কিতে আক্রমণ করলে, অনুরোধ সিংএর নেতৃত্বে রাজপুত সেনারা তা প্রতিহত করেন। এই সাহসিকতা এবং বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে, বেগম নিজের গলার মুক্তোর মালা রাজপুত বীরকে পরিয়ে দেন নিজের হাতে। তখনকার যুগে, এধরনের অসামান্য সম্মান লাভ,- একজন সাধারণ রাজ-কর্মচারীর পক্ষে ছিল নিতান্তই অভাবনীয়।

সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট কন্যাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, 'হারেমে' বহু ধরনের নারীদের নিয়োগ করা হত। এমনকি ভবিষ্যৎ গণনার জন্য 'রেমাল' বা মহিলা কুষ্ঠী বিচারকও থাকতেন। জাহাংগীর ও শাহজাহানের স্মৃতি কথায় 'হারেমে'র সুন্দর ও খণ্ড খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। আশ্চর্য বোধ হয় যে, আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে একটা 'বাঙ্গালি-মহলের' কিছু উল্লেখ আছে। সেখানে অবশ্য অন্যান্য বিদেশী মহিলারাও থাকতেন।

আকবর-ই প্রথম রাজপুত রাজন্যের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর থেকে, অনেক ভারতীয় রমণীর মুঘল 'হারেমে' প্রবেশ ঘটে। এদের মধ্যে বেশ কিছু নারী তাঁদের পূর্বতন ধর্মের পরিবর্তন করেন নি। তাঁদের প্রাতঃকালীন নদীতে স্নান করার সুবিধার জন্য, 'হারেম' থেকে বিশেষ সুড়ঙ্গ পথের নির্মাণ ও ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোধাবাই মহলের আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও নির্মাণশৈলী সম্পূর্ণ ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন—অনেকটা মন্দিরের মত।

'হারেমে'র মহিলারা খুরাশান বা পারস্যের অনুকরণে শুধুই আলস্য ও বিলাসের জীবন যাপন করতেন না। আদর্শ মাতা-স্ত্রী-কন্যা ও ভগ্নীর ভূমিকা তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেছেন। নূর-জাহান বিভিন্ন ফুলের নির্যাস থেকে 'আতর' তৈরীর প্রাথমিক রূপ দেন। নানা নক্‌শা-কাটা 'জাফরীর' ব্যবহারের পরিকল্পনাও তাঁরই আনুকূল্যে ভারতীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাপারে, তাঁর পিতার সমাধিস্থল আগ্রার 'ইতমদ্দৌল্লা' একটি অপূর্ব নিদর্শন। জাহনারা বৃদ্ধ পিতার বন্দী-দশায় শুধু সেবা করে এবং সঙ্গ দিয়েই দায়িত্ব পালন করেন নি, বিফল হলেও, তেজস্বিনী মহিলা হিসাবে তখনকার রাজনৈতিক রঙ্গ-মঞ্চের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেপথ্য নায়িকা।

দিল্লী দুর্গের অভ্যন্তরে—'ইমতিয়াজ-মহল', রঙ্-মহল' এবং ফতেপুর-সিক্রির 'যোধাবাই-মহল' শুধু মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, আজকের যুগেও এগুলি বিস্ময়কর মনে হয়। 'রঙ্-মহলের' সৌন্দর্যে বিমোহিত.'বিগত কালের কবি-লেখকের উক্তি—'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গের সুষমা থাকে,- তাহলে তা এইখানেই এবং এইখানেই' আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে স্মরণ করেন।

হিন্দু মুসলমান নারীদের নৈকট্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতির আদান-প্রদানের বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য,- 'মুঘল আমলের মহিলা মহল' আজও শুধু ঐতিহাসিকদেরই নয়,- সাধারণ মানুষেরও বিশেষ সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুঘল ইতিহাসে কয়েকটি নারী

মৃদুচ্ছন্দা পালিত

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যখন নারী সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা মুখরিত তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের নারীদের কথাও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। ভারতের মধ্যযুগের বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল বংশের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত গৌরবজনক। কোরানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত হলেও মধ্যযুগে নারীদের সমাজে কোন স্থান ছিল না। সাধারণভাবে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বুদ্ধিতে ও শক্তিতে নিকৃষ্ট জীব বলেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কার্যত মুঘলবংশের কন্যা, বধূ এবং মাতারা অনেক সময়ই মুঘল শাসনের চালিকাশক্তি রূপে কাজ করেছেন। তাঁরা অনেকেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন, শিল্প সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন অর্থাৎ বহুভাবে মুঘলযুগকে সমৃদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন মুঘল বংশের বাদশাহ ও শাহাজাদীরা অনেকেই আত্মজীবনী অথবা জীবনী রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাবর কন্যা গুলবদন বেগম ও শাহজাহান কন্যা জাহানারার নাম সর্বজনবিদিত। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালের মূল পরিচালিকা হিসাবে নুরজাহান বেগমের অবদান স্বীকৃত। মুঘল হারেমের মহিলারা বস্ত্র এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করতেন বলেও জানা যায়। শিল্পচর্চার মাধ্যমে জীবনযাপনের ধারাকে সুষমামণ্ডিত করেছিলেন এই রমণীরা। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য কিন্তু উল্লিখিত এই মহিলারা নন, মুঘলযুগের প্রথম পর্বের কয়েকজন মহিলা যাঁরা মুঘল ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন, তাঁদের কথাই আমরা এখানে আলোচনা করব।

মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জাহিরউদ্দিন বাবরের পিতা ওমর শেখ মীর্জা ছিলেন সমরখন্দের বিখ্যাত চাঘতাই তুর্কবীর তৈমুরের পঞ্চম বংশধর ও মাতা কুতলুঘ নিগার খানুম ছিলেন কারাকোরামের মোঙ্গল বংশীয় বিখ্যাততর দুর্ধর্ষ বীর চেঙ্গিস খানের ত্রয়োদশ অধস্তন বংশধরের কন্যা[১]। মাত্র এগারো বছর বয়সে ১৪৯৪ সালে তিনি পিতৃহারা হয়ে ফরঘনার অধিপতি হন। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে পিতৃগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দুঃসময়ে বাবরকে তাঁর বিশ্বস্ত আমীরবর্গ ও মাতৃকুল, বিশেষত মাতামহী আইসান দৌলত বেগম সাহায্য করেছিলেন[২]। তাঁর মাতামহ ইউনুস খান ১৪৭০ সালে মুঘলিস্থানের সুলতান হন। বাবরের প্রথমা পত্নী আয়েষা সুলতান বেগম ছিলেন ইউনুস খানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান আহমেদ খানের কন্যা। এই বিবাহ বাবরের মাতামহীর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়েছিল।

আইসান দৌলত বেগমের কথা আমরা বাবরনামা থেকে জানতে পারি। গভীর শ্রদ্ধায় তিনি মাতামহী সম্বন্ধে লিখেছিলেন "..... তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও দূরদর্শী এবং আমার বেশির ভাগ কার্যকলাপেই তাঁর উপদেশে পরিচালিত হত'।" তাঁর সাহস ও নীতিবোধের জন্য মুঘল ইতিহাসে তিনি উচ্চস্থানের অধিকারিণী হয়ে আছেন। বাবরনামাতে এই মহিলার জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। শেখ জামালউদ্দিন খান নামে এক শত্রুর দ্বারা একবার পরাজিত ও বন্দী হন ইউনুস খান ও তাঁর বেগম। মধ্যযুগীয় প্রথায় লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে বিজয়ী জামালউদ্দিন বিজিত আইসান দৌলত বেগমকে তাঁর এক অধস্তন কর্মচারীকে দান করেন। এই ব্যক্তিটি রাত্রে বেগমের কাছে আসতে চাইলে তিনি প্রথমে সম্মতি জানালেও যখন তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তখন অতি দ্রুত আইসান দৌলত বেগম ও তাঁর সহচরীরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহটি রাস্তায় নিক্ষেপ করেন। জামালের প্রতিনিধি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী আইসান দৌলত বেগমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলে 'আমি ইউনুস খানের পত্নী এবং একমাত্র তাঁরই। শেখ জামাল আমাকে এক অন্য ব্যক্তির কাছে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই জানেন তাঁর এই ব্যবহার ধর্ম ও আইন সঙ্গত কি না। আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। এখন শেখ জামাল ইচ্ছা করলে আমাকে হত্যা করতে পারেন। শেখ জামাল এই নারীর সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্ত করে সম্মানের সঙ্গে তাঁকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দেন । এই কাহিনীটি আইসান দৌলত বেগমের একাধারে সাহসিকতা এবং ধর্ম ও আইন সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দেয়।

নাবালক বাবর এই মাতামহীর মূল্যবান সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁর দুঃসময়ের পরামর্শদাত্রী ছিলেন এই নারী। স্বামীর মৃত্যুর (১৪৮৭) বহুকাল পরে ১৫০৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যদিও তিনি তাঁর আদরের দৌহিত্র বাবরকে হিন্দুস্থানের বাদশাহরূপে দেখে যেতে পারেন নি, তবু তিনিই বাবরের মনে সাহসিকতা ও উচ্চাশার বীজ বপন করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। আইসান দৌলত বেগমের ব্যক্তিত্বের অবদান এইভাবেই মুঘল রাজবংশের সূচনাপর্বে দেখা গিয়েছিল।

গুলবদন রচিত "হুমায়ুননামা" থেকে আমরা জানতে পারি যে শুধু মাতামহী নয় মাতা কুতলুঘ নিগার খানুম এবং বড়দিদি খানজাদা বেগমও বাবরের দুঃসময়ের পরামর্শদাত্রী ছিলেন। ভারতবিজয়ের পর বাবরের আমন্ত্রণে কাবুল থেকে আগত মুঘল পরিবারের ছিয়ানব্বই জন মহিলা বাসস্থান, ভূমি ও মূল্যবান উপহার পেয়েছিলেন'। প্রসঙ্গত, এই মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার তীব্রতা কম ছিল। তাঁরা সহজেই তাঁদের পুরুষ বন্ধুদের এবং অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, পুরুষের বেশে পোলো খেলতেন এবং সঙ্গীতচর্চা করতেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাঁরা বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতেন। কোন কোন মহিলা একাধিক বিবাহও ক.রেছিলেন। বাবরের প্রথমা পত্নী আয়েষা সুলতান বেগম বিবাহের তিন বছরের মধ্যে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন*। নিজামউদ্দিন খলিফার কন্যা গুলবর্গ বেগমের প্রথম বিবাহ

হয়েছিল ১৫২৪ সালে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি ১৫৩৯ সালে বাদশাহ হুমায়ুনকে বিবাহ করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর এই স্বাধীনচেতা মহিলারা আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত করে।

বাবরের তৃতীয় বেগম মাহাম ছিলেন খোরাসানের এক অভিজাত শিয়া বংশের কন্যা — তাঁদেরই পুত্র হুমায়ুন। মাহাম বেগম ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও উদারহৃদয়া। "মুঘল অন্তঃপুরের তিনি ছিলে প্রধানা। সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিকারিণী এই মহিলা অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের পরিচালনা করতেন"। মাত্র বারো বছর বয়সে যখন হুমায়ুন বাদাকসান অঞ্চল শাসনের ভারপ্রাপ্ত হন তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে মাতার অভিভাবকত্বে ছিলেন। রুচিবান হুমায়ুন তাঁর মাতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মুঘল ইতিহাসে হামিদা বানু ওরফে মিরিয়ম মকানি আকবরের মাতা এই পরিচয়ে বিখ্যাত হয়ে আছেন। শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত হুমায়ুন ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় থাট্টা অঞ্চলে সুলতান হুসেনের সাময়িক আতিথ্য গ্রহণ কালে সেহাযন প্রদেশের পাট শহরে হুমায়ুনের কনিষ্ঠ পুত্র হিন্দালের গুরু শিয়া মৌলবী মীর বাবা দোস্ত ওরফে আলি আকবর জানির কন্যা চোদ্দ বছরের কিশোরী হামিদা বানুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হামিদা বানু হুমায়ুনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং কারণ হিসাবে বলেছিলেন "আমি বিবাহ করতে চাই এমন একজন মানুষকে যাঁকে আমি স্পর্শ করতে পারবো, এমন কাউকে নয়, যাঁর জামার প্রান্ত আমি স্পর্শ করতে পারবো না"। এই উক্তির দ্বারা এই কথাই বোঝা যায় যে তখন অভিজাত বংশের কন্যাদের বিবাহে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার ছিল। চল্লিশ দিনের অনুনয় বিনয়ের পর হুমায়ুনের ঐকান্তিকতায় বিশ্বাস করে হামিদা বানু তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হন। ১৫৪১ সালে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তাঁর নতুন নামকরণ হয় মিরিয়ম মকানি (গৃহলক্ষ্মী)। হিন্দাল মাতা দিলদার বেগম এই বিবাহে মধ্যস্থতা করলেও হিন্দাল বিরক্ত হন। বিবাহের পর রাজদম্পতি ভাক্কর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন এবং ক্ষুব্ধ হিন্দাল তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কান্দাহারের দিকে চলে যান। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি তুচ্ছ মনে হলেও এই বিবাহের ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত হুমায়ুন ও হিন্দালের বিচ্ছেদ ঘটে এবং পরের বছরই ১৫৪২ সালে মিরিয়ম মকানি তাঁর বিখ্যাত পুত্র আকবরের জননী হন।

হুমায়ুনের পিতা বাবরের ধমনীতে ছিল তুর্ক ও মোঙ্গল রক্তের সংমিশ্রণ। মিরিয়ম মকানির সন্তান আকবরের রক্তে পারসিক সংমিশ্রন মুঘল রাজবংশে এক অন্য গুরুত্ব এনে দিয়েছিল। ১৪৫৫ সালে শূর বংশের কাছ থেকে হুমায়ুন মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এই চোদ্দ বছর হুমায়ুনের দুঃসময়ে হামিদা বানু তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি এবং তাঁর প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। সিন্ধু থেকে কান্দাহারের পথে আসকারি তাঁদের পশ্চাতধাবন করলে মিরিময় মকানি শিশু

আকবরকে পরিত্যাগ কবলেও স্বামীকে ত্যাগ করেন নি[৯]। ১৫৫৬ সালে হুমায়ুনের মৃত্যুকালে এই বেগমের বয়স তিরিশও পূর্ণ হয় নি।

চোদ্দ বছরের কিশোর বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালের প্রারম্ভে মাতা মিরিয়ম মকানিব ভূমিকা লক্ষণীয়। ১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ সাল এই চার বছব নামে আকবর মুঘল বাদশাহ হলেও কার্যত প্রকৃত শাসক ছিলেন তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান। ক্রমে তিনি স্বৈরাচাবী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। বিরক্ত ও শঙ্কিত মাতা মিরিযম মকানি পুত্র আকববকে এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৫৬০ সালে বৈরাম খান আকবরের অন্যতম শিক্ষক বিশ্বস্ত মীর মহম্মদকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করে মক্কা যাওয়ার আদেশ দেন তখন আকবর নিজের হাতে শাসনভার নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন[১১]। আকবর ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য যে চক্রের দ্বাবা পরিচালিত হয়েছিলেন তার প্রধান ছিলেন স্বয়ং মাতা মিরিয়ম মকানি। অপর সদস্যরা ছিলেন পালিকা মাতা মাহাম অনাগা, তার পুত্র ও জামাতা আধম খান ও শিহাবউদ্দিন আহম্মদ খান আটকা এবং হুমায়ুনের অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর মুদিম খান। এই চক্রেব সকল সদস্যই ছিলেন মিরিয়ম মকানির প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন — সেই কাবণেই আকবব এই ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভর করেছিলেন। বৈরাম খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময মিরিযম মকানি দিল্লীতেই ছিলেন এবং তাঁর অনুমোদনেই ষড়যন্ত্র কার্যকরী হয়েছিল।

মুঘল হারেম পরিচালনায এই গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পুত্র তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একবার মিরিয়ম মকানি যখন লাহোর থেকে আগ্রায় আসছিলেন তখন স্বয়ং আকবর তাঁর পাল্কি বাহক হয়েছিলেন এবং শুধু নিজে নন তাঁর আমীরদেরও সেই পাল্কি বহন করতে হয়েছিল[১২]। যখনই মাতা বাইরে থেকে আসতেন তখনই আকবর বাদশাহ সপারিষদ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নগরের বাইরে অপেক্ষা করতেন। বাদশাহের জীবনের শেষ প্রান্তেও তাঁর কাছে তাঁর মাতাব স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেলিম যখন তাঁর পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন সেলিমা বেগমের সঙ্গে মিরিয়ম মকানি সেলিমকে সুপথে আনাব চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল পুত্রের মৃত্যুর মাত্র দুবছর আগে ১৬০৩ সালে।

শিয়া মতাবলম্বী মাতার প্রভাব যে আকবরের জীবনে বিদ্যমান ছিল একথা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মানো এই নারী ছিলেন স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারিণী। বিবাহের পরে ভাগ্য বিড়ম্বিত সিংহাসনচ্যুত মুঘল বাদশাহের সহচরীরূপে কষ্টকর জীবনযাপন করেছেন এবং তাঁকে সিংহাসন উদ্ধারে প্রেরণা দিয়েছেন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে নাবালক পুত্র তৃতীয় মুঘল বাদশাহ আকবরকে ক্ষমতালাভে সাহায্য করেছেন। সারাজীবন এই রমণী অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন।

আকবরের জীবনের প্রথম পর্বে অপর এক রমণীর ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন আকবরের অন্যতমা পালিকা মাতা মাহাম অনাগা[১৩]। ভাগ্যবিড়ম্বিত হুমায়ুন ভ্রাতা আসকারির সসৈন্য অতর্কিত আগমনে শঙ্কিত হয়ে কান্দাহারের প্রান্তে

মাস্তাঙ্‌ অঞ্চলে তাঁর শিবিরে শিশুপুত্র আকবরকে পরিত্যাগ করে বেগম মিরিয়ম মকানিকে নিয়ে পারস্যের দিকে যাত্রা করেন (১৫৪২)। তখন আসকারি শিশুটিকে কান্দাহারে বন্দী রাখেন। সৌভাগ্যক্রমে আসকারির পত্নী স্নেহবশত শিশু আকবরকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। "মাহাম অনাগা জিজি অনাগ" এবং আটকা খান আকবরের সেবা করায় সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন"[১১] একথা আমরা আবুল ফজলের লেখা থেকে জানতে পারি। পারস্যের অধিপতির সাহায্যে হুমায়ুন ১৫৪৫ সালে কান্দাহার আক্রমণ করলে কামরান আকবরকে বন্দী হিসাবে কাবুলে স্থানান্তরিত করেন। কাবুল অধিকার করে হুমায়ুন আকবরের সঙ্গে মিলিত হন মাত্র কয়েক দিনের জন্য। কাবুল পুনরায় অধিকার করে কামরান আকবরকে বন্দী করেন। ১৫৪৭ সালে হুমায়ুন দ্বিতীয় বার কাবুল আক্রমণ করলে আকবরের নিষ্ঠুর খুল্লতাত তাঁকে দুর্গের প্রাকারে বসিয়েছিলেন যাতে হুমায়ুনের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে তিনি নিহত হন। সেই সময় মাহাম অনাগা তাঁকে পক্ষীমাতা যেমন আপন পক্ষপুটে তাঁর সন্তানকে রক্ষা করে তেমন করে ওই প্রাকারে আকবরকে রক্ষা করেছিলেন"। এইভাবে শিশু আকবরের জীবন রক্ষা করে মাহাম অনাগা মুঘল রাজপরিবারের বিশেষ উপকার করেছিলেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক আকবর এক ষড়যন্ত্রের দ্বারা তাঁর অভিভাবক বৈরাম খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এই ষড়যন্ত্র আকবর মাতা মিরিয়ম মকানি কর্তৃক অনুমোদিত হলেও এর মূল পরিচালিকা ছিলেন মাহাম অনাগা। বৈরাম খান বিরোধী ক্ষুব্ধ আমীররা এই অন্তঃপুরিকার পরিচালনায় একত্রিত হয়েছিলেন কারণ তিনি ছিলেন "তার বুদ্ধি উদ্ভাবনী দক্ষতা ও আনুগত্যের জন্য এক বিস্ময়"[১২]। মাহাম অনাগা তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করেছিলেন তাঁর পুত্র আধম খান তাঁর জামাতা ও দিল্লীর শাসনকর্তা শিহাবউদ্দিন আহমেদ খান আটকা, লাহোরের শাসনকর্তা ও জিজি অনাগার স্বামী শামশউদ্দিন খান আটকা এবং কাবুলের শাসনকর্তা ও হুমায়ুনের বিশ্বাসভাজন মুনিম খানের মাধ্যমে। ১৫৬০ সালের ১৯ শে মার্চ আকবর আগ্রা থেকে যমুনা পার হয়ে আলিগড়ের দিকে শিকার যাত্রার নামে সিকান্দ্রায় মাহাম অনাগা ও তাঁর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে তিনি অসুস্থ মাতা মিরিয়ম মকানিকে দেখতে যাচ্ছেন এই সংবাদ বৈরাম খানকে প্রেরণ করেন। ২৭ শে মার্চ শিহাবউদ্দিন ও অন্যান্য আমীররা শাহেন শা আকবরকে সম্বর্ধনা জানান এবং বৈরাম খানের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে বন্দী করেন। দিল্লীর দুর্গ সৈন্য পরিবৃত করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সৈন্যাধিপতিদের কাছে আকবর বাদশাহের নিজের ক্ষমতা গ্রহণের বার্তা পাঠান হলে" নতুন এবং পুরাতন আমীররা দলে দলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনুগত্য জানাতে আকবরের দরবারে এলেন এবং তাঁরা বিভিন্ন উচ্চরাজপদ, খেতাব ও জায়গির লাভ করলেন"[১৩]। এই সমস্তই ঘটেছিল মাহামের পরিকল্পনায় ও নির্দেশে।

আকবর নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করার পর বৈরাম খানকে মক্কাযাত্রার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর পূর্বতন কার্যের জন্য তাঁর অভিভাবকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় ১৫৬১ সালের জানুয়ারি মাসে মক্কা যাওয়ার পথে গুজরাটে বৈরাম খান এক আফগান যুবক কর্তৃক নিহত হন[১৮]। এইভাবে মাহাম অনাগা বৈরাম খানের অপসারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তাঁর এই দক্ষতা' তাঁকে রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিল"[১৯]। বৈরাম খানের অপসারণের পর রাজ দরবারে আকবরের প্রধান পরামর্শদাতা রূপে মাহাম অনাগা পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন "আকবর বৈরাম খানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কিছু 'বিবেকবর্জিত মহিলা'র এক অশুভ চক্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েন"[২০]। পরবর্তী দুই বছরের (১৫৬০-১৫৬২) আকবরের শাসনকাল ইতিহাসে 'অন্তঃপুরিকার শাসন' নামে অভিহিত হয়ে আছে। মাহাম অনাগার আত্মীয় ও প্রিয়পাত্ররা উচ্চ রাজপদ ও সম্পত্তি লাভ করেছিল। দুই বছরে চারজনকে আকবর তাঁর উজীর পদে নিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম মাহাম অনাগা ও তাঁর জামাতা শিহাবউদ্দিন খান আটকা যুগ্মভাবে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। 'ওকালত' নামা অর্থাৎ বাদশাহের প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা ছিল কিন্তু মাহাম অনাগার কাছে। এই ব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল দুটি --- ১) উজীরপদে যুগ্মদায়িত্বের ব্যবস্থা ও ২) মহিলার প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ। প্রধানমন্ত্রির ক্ষমতা মূলত মাহাম অনাগাই ভোগ করতেন ও শিহাবউদ্দিন তাঁর অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হতেন। অচিরে দুই মন্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙন ধরেছিল। ইতিমধ্যে তুর্কী আমীর গোষ্ঠীর নেতা বাহাদুর খান উজবেগ শিহাবউদ্দিনের কুশাসনের বিরুদ্ধে আকবর বাদশাহের কাছে অভিযোগ করেন। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আকবরের শাসনকে দুর্বল করা এই কথা মাহাম অনাগা বুঝতে পারেন এবং তারই পরামর্শে বাদশাহ শিহাবউদ্দিনকে অপসারণ করে বাহাদুর খানকে উজীরপদের যুগ্মদায়িত্বের ভার দেন। এইভাবে তুর্কী গোষ্ঠী ছত্রভঙ্গ হয়েছিল এবং মাহাম অনাগার ক্ষমতাও অক্ষুন্ন ছিল, কারণ বাহাদুর খান ছিলেন অপদার্থ।" ..... সেই সময় বাহাদুর খান ছিলেন নামে মাত্র ভকীল, আসলে সকল কার্য পরিচালনা করতেন মাহাম অনাগা ..... কারণ তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও সাহসী"[২১]।

মাহামা অনাগা অবশ্য বেশি দিন এই পদে থাকতে পারেন নি। কারণ তরুণ বাদশাহ শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন যে উজীর মাহাম অনাগাও ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন[২২]। তাছাড়া মুঘলেরা কোন মহিলার প্রধানমন্ত্রিত্বে অভ্যস্ত ছিল না। ১৫৬০ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর আকবর মুনিম খানকে 'ওকালত নামা' অর্পণ করতে মাহাম অনাগাকে অনুরোধ করেন। আকবরের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী 'অন্তঃপুরিকা চক্রে'র অন্যতম সদস্য মুনিম খানের উপরেও মাহাম অনাগার প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আকবর ১৫৬১ সালে মালব জয়ের জন্য যে অভিযান করেন সেখানেও সেনাপতি নির্বাচনে মাহামের প্রভাব ছিল[২৩]। তাঁর পুত্র আধম খান এবং বিশ্বাসভাজন পীর মহম্মদ সেই অভিযানে মুঘল সৈন্য পরিচালনা করেন। মালবের অধিপতি বজ

বাহাদুর পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে রাজ অন্তঃপুরের নারী, বহু সম্পদ ও হস্তী তাদের হস্তগত হয়। কিন্তু রানী রূপমতী নিজের সম্মান রক্ষার জন্য বিষপানে আত্মহনন করেন। রূপমতী লাভে নিরাশ আধম খান এবং পীর মহম্মদ শেখ, সৈয়দ মোল্লা, নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দুর্গের অধিবাসীদের হত্যা করেন। এই অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ইতিহাসকার বদাউনি। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী লুণ্ঠিত দ্রব্যও তারা মুঘল দরবারে পাঠাননি। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ ও অত্যাচারের কাহিনী আকবরের কর্ণগোচর হলে তিনি নিজে দ্রুত মালবে উপস্থিত হন। মাহামও আকবরকে অনুসরণ করেন ও তাঁর মধ্যস্থতায় আকবর আধম খানকে ক্ষমা করেন। ইতিমধ্যে আধম খানের অত্যাচারের কাহিনী আকবরের কাছে প্রকাশ করতে পারে এই আশঙ্কায় মালবের অন্তঃপুরের দুই নিরাপরাধ তরুণীকে মাহাম হত্যা করিয়েছিলেন । তিনি ছিলেন পুত্রস্নেহে অন্ধ ও ক্ষমতালোভে ব্যাকুল। আকবর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে অনতিকালের মধ্যে আধম খানকে মালব থেকে চলে আসার আদেশ দেন।

১৫৬১ সালের নভেম্বর মাসে বিরক্ত আকবর মুনিম খানের পরিবর্তে কাবুলের শাসনকর্তা শামসউদ্দিন আটকা খানকে উজীরপদে নিয়োগ করেন। শুধু মুনিম খান নয় এই নিয়োগে এবং মালব থেকে পুত্রের প্রত্যাবর্তনে মাহামও ক্ষুব্ধ হন। ফলে মাহাম অনাগা ও শামসউদ্দিনের অধীনে 'অন্তঃপুরিকা চক্র' দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই আধম খান এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কর্মরত উজীর শামসউদ্দিনকে আধম খান অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করেন। অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্ন আকবর জাগরিত হয়ে পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে মুষ্ট্যাঘাতে আধম খানকে ভূপতিত করেন। বাদশাহের আদেশে প্রাসাদের দ্বিতল থেকে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা হয়। আকবর স্বয়ং অসুস্থ মাহাম অনাগাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ ও পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলে তিনি শান্তভাবে উচ্চারণ করেন "শাহেন শা ভালোই করেছেন" । চল্লিশদিন পরে শোকাহত মাতা প্রাণত্যাগ করলে মাতা-পুত্রের মৃতদেহ আকবর কুতুবমিনারের অদূরে যুগ্ম সমাধি নির্মাণ করে সেখানে সমাধিস্থ করেন।

জাহাঙ্গীর পত্নী নুরজাহান বেগম ব্যতীত আর কোন নারীই মুঘল রাজনীতিতে এইরকম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি। শিশু আকবরের শুধুমাত্র পালিকামাতা অথবা রক্ষয়িত্রীরূপে নয় আকবরকে শাহেন শা পদে বৃত হতেও মাহাম অনাগার অবদান ছিল প্রভূত। হারেম পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধানার। তিনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। খইরুল-মনজিল মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। উচ্চাকাঙ্খী ও দক্ষ মহিলাটির এইভাবে জীবনাবসান অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আকবর বাদশাহের অন্যতমা বেগম সুলতানা সলিমা ছিলেন বাবরের দৌহিত্রী। দিলদার বেগমের কন্যা গুলরুখ বেগম ছিলেন তাঁর মাতা[২১]। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে রূপ ও গুণের জন্য খ্যাত এই মহিলা 'মাখ্‌ফি' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। গুলবদন বেগমও তাঁকে একজন আকর্ষণীয়া মার্জিত রুচিসম্পন্না

সুন্দরী রমণী বলে তাঁর 'হুমায়ুননামা'য় উল্লেখ করেছেন। তাঁর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার জন্য তিনি সেযুগের 'খাদিজা' নামে অভিহিতা ছিলেন।

১৫৫৫ সালে হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারে এবং আকবরের ১৫৫৬ সালে সিংহাসন আরোহণে বৈরাম খানের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাবুলের সিংহাসন দখল করার পর পাঁচ বছরের আকবরের শিক্ষকরূপে হুমায়ুন বৈরাম খানকে নিযুক্ত করেন। বাদশাহ্ আকবর অভিভাবক বৈরাম খানের সহায়তায় ১৫৫৬ সালে দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আফগান শূর বংশকে পরাজিত এবং ১৫৫৭ সালে সিকান্দার শূরকে জায়গীর দানের মাধ্যমে শান্তিস্থাপন করেন। কৃতজ্ঞ আকবর তাঁর সঙ্গে পিতৃস্বসা কন্যা সলিমা সুলতানার বিবাহ সম্পন্ন করান। এইভাবে বৈরাম খান মুঘল বংশের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র চার বছর। বৈরাম খানের মৃত্যু হয় ১৫৬১ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ সাল পর্যন্ত আকবর নামত বাদশাহ হলেও শাসকের পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন বৈরাম খান। সলিমা বেগমও সেই ক্ষমতার অংশীদার ছিলেন কি না, না জানলেও বৈরামের পত্নী হিসাবে নিশ্চিত সম্মানিতা ছিলেন একথা আমাদের মনে হয়।

ক্ষমতাচ্যুত হয়ে মক্কা যাওয়ার পথে গুজরাট অঞ্চলে যখন বৈরাম খান নিহত হন তখন সলিমা বেগম সপুত্র তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদে দুঃখিত আকবর অনতিবিলম্বে সলিমা বেগম ও তার পুত্র আবদুর রহিমকে মুঘল দরবারে আনয়ন করেন এবং মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন ও আবদুর রহিমকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। উত্তরকালে আবদুর রহিম একজন বিদ্বান ব্যক্তি ও সমরবিশারদ বলে খ্যাত হন। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন আবদুর রহিম ১৫৮৪ সালে খান-ই-খানান উপাধি লাভ করেন। সালিমা বেগম শুধু আকবরের অন্যতমা বেগমরূপে নয় যোগ্যপুত্রের মাতারূপে পরিচিতা হয়ে আছেন।

আকবর বাদশাহের জীবনের শেষ প্রান্তের দুঃসময়ে সলিমা বেগম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এক মাতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। আকবর পুত্র সেলিম ১৫৯৯ সাল থেকে পিতার বিরুদ্ধাচারণ করতে আরম্ভ করেন এবং ১৬০১ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আকবর তাঁর বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা আবুল ফজলকে দক্ষিণ ভারত থেকে ডেকে পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে সেলিমের নির্দেশে তিনি নিহত হন (১৬০২)। আবুল ফজলের মৃত্যু আকবরকে দিয়েছিল তীব্র আঘাত। তিনি এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে সেলিমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন ভেবেছিলেন। এই সময় ক্ষুব্ধ পিতা ও দোষী পুত্রের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিলেন সলিমা বেগম। তিনি স্বয়ং এলাহাবাদ গিয়ে সেলিমকে পিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী করতে সম্মত করেন। সেলিমা বেগমের প্রচেষ্টাতেই সেই সময় আকবর সেলিমকে গ্রহণ করেন। ১৬০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রায় পিতা-পুত্রের এই সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

সলিমা বেগমের এই প্রচেষ্টা মুঘল ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সেলিম ও মানবাই-এর পুত্র বুদ্ধিমান. সুদর্শন খসরু ছিলেন আকবরের অত্যন্ত প্রিয় পৌত্র। সেলিমের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ মুঘল দরবারের কিছু আমীর সেই সময় সেলিমকে বঞ্চিত করে খসরুকে আকবরের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন[৬১]। এই ষড়যন্ত্রে মূল হোতা ছিলেন খসরুর মাতুল মানসিংহ ও শ্বশুর মির্জা আজিজ কোকা। বাদশাহ আকবর অবশ্য এই ষড়যন্ত্রের বিপক্ষেই ছিলেন। সেই সময় সলিমা বেগম যদি আকবরের সঙ্গে সেলিমের মিলন না ঘটাতে পারতেন তাহলে পিতা-পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। অত্যন্ত দুঃসময়ে এই মহিলা মুঘল বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু একথা মুঘল ইতিহাসে আলোচিত নয়।

আকবরের মৃত্যুর পর পুত্র জাহাঙ্গীর ১৬০৫ সালে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দু বছব পরে সমস্যাকুল বঙ্গদেশের বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগান নিহত হতে তাঁর বিধবা পত্নী মেহেরউন্নিসা ও কন্যা লাডলি বেগমকে দিল্লীতে নিযে আসা হয়। আমীর ইতমাদ্দৌলাব কন্যা মেহেরউন্নিসা মুঘল হারেমে সলিমা বেগমের সহচরী রূপে স্থান লাভ করেন[৬২]। চাব বছর পরে ১৬১১ সালেব মার্চ মাসে জাহাঙ্গীর মেহেবউন্নিসাকে বিবাহ করেন। তাঁর নাম হয় নুরজাহান। জাহাঙ্গীর-নুরজাহানের কাহিনী ভারতইতিহাসের এক রোমাণ্টিক কাহিনী যার মধ্যে সত্যমিথ্যা জড়িয়ে আছে। সে কথা এখানে আলোচ্য নয়। আমাদের প্রতিপাদ্য জাহাঙ্গীর ও নুরজাহানের বিবাহই সম্পন্ন হতো না যদি মাতা সলিমা বেগম মধ্যস্থতা না করতেন। কারও কারও মতে স্বামীহন্তাকে বিবাহ করতে মেহেরউন্নিসা অস্বীকার করেন — যদিও ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ একথা স্বীকার করেন না। মেহের ও সেলিমের প্রেমকাহিনীও সুবিদিত। কেন চার বছর পরে এই বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্বন্ধেও নানা মত আছে।

যে উপাখ্যানই সত্য হোক না কেন একথা সত্য যে এই বিবাহের পূর্ববর্তী চার বছর মেহেরউন্নিসা সুলতানা সলিমা বেগমের কাছে ছিলেন এবং তাঁরই দাক্ষিণ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। সলিমা বেগম তাঁর মৃত্যুকাল ১৬১৩ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল হারেমের পাদশাহী বেগমপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন[৬৩]। আমরা সকলেই বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবনে নুরজাহানের ভূমিকার কথা জানি। কিন্তু অপর এক নারী মাতা সুলতানা বেগমও তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সে কথাও আলোচিত হওয়া উচিত। প্রথমত তিনি হস্তক্ষেপ না করলে আকবরের পরে সেলিমের বাদশাহ হওয়ার পথ সুগম হত না, হয়ত তাঁকে সিংহাসনের জন্য রক্তক্ষরণের পথে যেতে হত। দ্বিতীয়ত তাঁর নুরজাহানের সঙ্গে বিবাহ যা কিনা মধ্যবয়সে তাঁর জীবনধারাকে পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল তাও সম্ভব হত না। সুলতানা সলিমা বেগম মুঘল ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

এইভাবেই মুঘল যুগের প্রথম পর্বের রাজনীতিতে বাবরের মাতামহী, হুমায়ুনের পত্নী ও আকবরের মাতা মিরিয়ম মকানি, আকবরের পালিকা মাতা মাহম অনাগা ও বাবরের দৌহিত্রী এবং বৈরাম খান ও পরবর্তীকালে আকবরের বেগম সুলতানা সলিমা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা কেউ সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন না, কিন্তু

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ও রাজনীতি পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও পরিচালনশক্তি মুঘল শাসনের এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বলে আমাদের মনে হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। এ এস বেভারিজ, বাবরনামা, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লি, ১৯৭০ পৃঃ ১২-২৪।
২। তদেব, পৃ ৪৩
৩। তদেব, পৃ ২৩
৪। স্ট্যানলি লেনপুল, বাবর, অক্সফোর্ড, ১৮৯৯, পৃঃ ২৩
৫। গুলবদন বেগম, হুমায়ুন নামা, এ. এস. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লি, ১৯৭২, পৃঃ ২০৩-২৯৭।
৬। বেভারিজ, বাবরনামা, পৃঃ ৩৫-৩৬
৭। তদেব, পৃঃ ৮-৯
৮। গুলবদন বেগম, হুমায়ুননামা, পৃঃ ১৫১
৯। আবুল ফজল, আকবর নামা, প্রথম খণ্ড, এইচ বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৯, নয়াদিল্লি, পৃঃ ৩১
১০। জৌহর, বাদশাহ হুমায়ুনের ব্যক্তিগত জীবনী, মেজর চার্লস স্টুয়ার্ট কর্তৃক অনূদিত, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী ১৯৭২, পৃঃ ৩১
১১। আবুল ফজল, আকবরনামা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১
১২। কোরিয়েত, আর্লি ট্রাভেলস, পৃঃ ২৭৮
১৩। আবুল ফজল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪
১৪। তদেব, পৃঃ ৩৯৫
১৫। তবকত-ই-আকবরি, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১১২
১৬। আবুল ফজল, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৪১
১৭। তদেব, পৃঃ ১৪৩-১৪৪
১৮। তদেব, পৃঃ ২০১ ২০২
১৯। তদেব, পৃঃ ২০৪
২০। ভিনসেন্ট স্মিথ, আকবর দি গ্রেট মুঘল, পৃঃ ৩৫
২১। আবুল ফজল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫১
২২। জার্নাল অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৭-৩৪৪
২৩। হিস্ট্রি এণ্ড কালচার অব ইণ্ডিয়ান পিপল, সপ্তম, খণ্ড, মুঘল সাম্রাজ্য, আর, সি , মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, বম্বে, ১৯৮৪, পৃঃ ১০৮-১০৯
২৪। ভিনসেন্ট স্মিথ, পৃঃ ৩৭
২৫। আবুল ফজল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯ - ৭০
২৬। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯
২৭। জে. এল. মেহেতা, এ্যাডভান্সড স্টাডি ইন দি মিডিয়াভাল ইণ্ডিয়া, দি মুঘল এম্পায়ার, (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫২৬-১৭০৭), নিউদিল্লি, ১৯৭০, পৃঃ ১৯৮
২৮। ভিনসেন্ট স্মিথ, পৃঃ ৩০, ৩৪
২৯। তদেব, পৃঃ ২১৯
৩০। তদেব, পৃঃ ২২৪-২২৫
৩১। তদেব, পৃঃ ২৩১
৩২। ইকবাল নামা, এডওয়ার্ড এবং গ্যারেট কর্তৃক অনূদিত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৬
৩৩। আর. পি. ত্রিপাঠি, রাইজ এণ্ড ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার, পৃঃ ৪২১।

প্রাপ্ত মূর্তির আলোকে মল্লভূমের শিব

প্রভাত কুমার সাহা

প্রাচীন মল্লভূমের, ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটি জায়গায় যেখানে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভাবত এবং গাঙ্গেয় বঙ্গেব সাংস্কৃতিক ঢেউ বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ বা তীর্থ যাত্রী এবং পর্যটক ও ব্যবসায়ীদেব মাধ্যমে এসে পডেছে। সাংস্কৃতিক ঢেউ এদের মাধ্যমে যত না এসেছে তাব চেয়ে বেশি এসেছে ধর্মপ্রচারক, কাবিগর, শিল্পী এবং আত্মীয়তাব সূত্রে যাতাযাতেব মাধ্যমে। ফলে মল্লভূমে উত্তব ভারত ও দক্ষিণ ভাবতের প্রভাব স্থাপত্য সংস্কৃতিতে এবং শিল্পে সহজেই চোখে পড়ে। এখানে যেমন উত্তব ভারতেব নাগরশৈলীব মন্দিব দেখা যায় তেমনি উড়িষ্যার দেউলরীতিব মন্দির মূলত নাগর শৈলীব অন্তর্ভুক্ত তথাপি উড়িষ্যাব একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যাকে উড়িষ্যার ঘরাণা বলা যেতে পারে। আবার বাংলাদেশেব প্রান্তিক অংশ হিসাবে চালামন্দির ও রত্নমন্দিরের ছড়াছড়ি এখানে। চালামন্দিরের এবং রত্নমন্দিরের বিভিন্ন ক্রম বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে। আদিতে দো-চালা ছিল পরে চাব চালা, আট চালা এবং বারো চালা হয়েছে। তেমনই এক রত্ন থেকে পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ইত্যাদি আকার ধাবণ করেছে। স্থানান্তরের কালে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মূর্তি বা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে নিজস্ব স্বকীয়তায় কিছু যেমন বিসর্জন দিতে হয়েছে তেমনি নূতন জায়গার কিছু উপকরণ গ্রহণ করতে হয়েছে ফলে শাস্ত্রানুমোদিত রূপকল্পনা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে কিন্তু স্থান, কাল, পাত্রের সঙ্গে সংগতি বিধান ঘটেছে, শিব দেবতাও অন্যত্র থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মল্লভূমিতে বসতি স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই শিবঠাকুর পূজিত হ'ন —কোথাও লিঙ্গরূপে আবার কোথও বা বিভিন্ন মূর্তিতে। বাংলাদেশে শিবঠাকুরের মত এত পূজা অন্য কোন দেবতার হয় কিনা সন্দেহ আছে। শিব চতুর্দশীতে এবং চৈত্রের শিবের গাজনে মানুষের ঢল দেখলে শিবকে বাংলাদেশের গণদেবতা না বলে উপায় নাই। এই গণদেবতার লিঙ্গরূপ ছাড়াও বিভিন্ন মূর্তি মল্লভূমে তথা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়েছে। মল্লভূমে বিভিন্ন

মল্লভূম বলতে আধুনিক বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের কতকাংশ, বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল, সাঁওতাল পরগনার পূর্বাংশ এবং পুরুলিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। তবে সাধারণভাবে এখন বাঁকুড়া জেলাকে বোঝায়। বর্তমান প্রবন্ধে বাঁকুড়া জেলাকেই ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়েছে।

দেবতার এত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যে মল্লভূমকে প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর বললেও হয়ত অত্যুক্তি হয় না। এখানে যেমন বিষ্ণু, সূর্য, অম্বিকা, বুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তেমনি পাওয়া গিয়েছে শিবমূর্তিও। অধিকাংশ মূর্তিই ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিবলিঙ্গ ব্যতীত যে সমস্ত শিবমূর্তি মল্লভূমে পাওয়া গিয়েছে তার কয়েকটির প্রতিনিধি স্থানীয়ের তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল ঃ—

	মূর্তির নাম	প্রাপ্তিস্থান	বর্তমান অবস্থান
১।	মহাকাল	শলদা	বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ
২।	ভৈরব	মোলকারী (বিষ্ণুপুর)	ঐ
৩।	বটুক ভৈরব	পাঁচমুড়া-জয়পুর	ঐ
৪।	লকুলীশ	শলদা	X
৫।	লকুলীশ	X	ঐ
৬।	লকুলীশ	জয়পুর (বিষ্ণুপুর)	X
৭।	লকুলীশ	বেগুনিয়া	X
৮।	উমা-মহেশ্বর (৩টি)	শলদা	ঐ
৯।	নটরাজ	কান্তোর	X
১০।	নটরাজ (ষড়ভুজ)	শলদা	X
১১।	নটরাজ	দেউলভিড়্যা (ছাতনা)	ঐ
১২।	বৃষবাহন		X
১৩।	বৃষবাহন (দশভুজ)		X
১৪।	নটরাজ	জয়কৃষ্ণপুর	X

(সূত্র ঃ ফিল্ড ওয়ার্ক)

মল্লভূমে বা আধুনিক বাঁকুড়া জেলায় যে সমস্ত শিব মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাদের প্রকৃতি তাদেরকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় — একটি হ'ল উগ্র বা ঘোর মূর্তি, অপরটি হ'ল সৌম্য মূর্তি। শিবের ঘোর বা উগ্রমূর্তির মধ্যে পড়ে — ভৈরব, অঘোর, লকুলীশ, বটুক ভৈরব, মহাকাল, বীরুপাক্ষ, কঁকাল ইত্যাদি। আর সৌম্য বা শান্ত পর্যায়ের মূর্তির মধ্যে পড়ে উমা-মহেশ্বর, বৃষবাহন, নটরাজ উমা-চন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার প্রাপ্ত মূর্তিগুলিকে অবশ্য দুভাগে ভাগ করেছেন — নান্দনিক ও বর্বর বা আধুনিক পর্যায়ের[১]। তাঁর মতে আধুনিক পর্যায়ের মূর্তিগুলির মধ্যে পূর্বের লাবণ্য বা শ্রী খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই হোক মূর্তিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হ'ল ঃ—

মহাকাল ঃ- শলদা থেকে প্রাপ্ত মহাকাল মূর্তিটি বর্তমানে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনে' সংরক্ষিত। মূর্তিটি অষ্টভুজ এবং বিভিন্ন মারাত্মক আয়ুধযুক্ত। দক্ষিণের হস্তগুলিতে যথাক্রমে নরকপাল বা খর্পর, নরমুণ্ড, ধনুক আর ঢাল। বামের হস্তগুলিতে যথাক্রমে ত্রিশূল, তীর এবং অসি। কণ্ঠে

আজানুলম্বিত নরমুণ্ডমালা, উর্ধ্বোত্থিত অগ্নিশিখার মত কেশপাশ, কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় মুকুট, মুখে গোঁফ এবং দাড়ি ও গোলাকার বিঘূর্ণিত লোচন। তবে মূর্তিটির দুটি পায়ের সম্মুখ ভাগ ভগ্ন। মূর্তিটি নবম দশম শতাব্দীর বলে অনুমান করা যায়।

গোপীনাথ রাও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **Elements of Hindu Iconography**-তে মহাকালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে এই মূর্তিটির প্রভেদ অনেক। গোপীনাথ রাও লিখেছেন মহাকাল মহাকালীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ সিংহাসনে উপবিষ্ট। শলদা থেকে প্রাপ্ত মহাকালের সঙ্গে এই বর্ণনা মেলে না।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু রাহুলনাথ মহাকাল পূজার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। তিনি সময় স্তোত্রে মহাকালের যে ধ্যানমন্ত্রটি রচনা করেছিলেন তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ— "কালাগ্নির মধ্যে মহাকাল অবস্থান করেন তাঁহার প্রকৃতি অপরিবর্তনশীল বলিয়া তাঁহাব বর্ণ কৃষ্ণনীল। জ্ঞানবৃদ্ধির প্রদর্শনের জন্য তিনি উর্ধ্বকেশ এবং তাঁহার কেশরাশি হইতে তেজরশ্মি বিনির্গত হইতেছে। ইহার মস্তকে আভোক্ষ মুদ্রা রহিয়াছে। ডাকিনীদের শাসন কবিবার জন্য ইহার কপাল সিন্দুর লিপ্ত। ইনি ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া ত্রিনেত্র। সর্বক্লেশের মূল ছেদন করেন বলিয়া ইহার দক্ষিণ হস্তে শাণিত তরবারী। সর্বপ্রাণীকে স্বর্গে লইয়া যান বলিয়া ইহার গলদেশে নরমুণ্ডমালা বিদ্যমান। সর্ব জীবের ভয় দূর করিয়া অভয় দান করেন বলিয়া ইনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন। দুর্জন লোকদের নাশ করিবার জন্য ইহার পদতলে অবস্থিত। শ্রীমহাকাল, তোমাকে নমস্কার। পূর্বকালে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর। মাংস ও রক্তের বলি আহার কর। যোগী সাধক তোমাকে যে কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা তুমি সিদ্ধ কর'।" গুরু রাহুল মহাকালের যে ধ্যানমন্ত্র রচনা করেছেন প্রাপ্ত মহাকালের সঙ্গে বহুল সাদৃশ্য আছে কিন্তু সম্পূর্ণ মিলে না। সুতরাং এই মহাকালকে বৌদ্ধ দেবতা বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়। দ্বিতীয়তঃ মল্লভূমে তন্ত্রের প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধ মূর্তি তিনটি বা চারটির বেশি পাওয়া যায়নি। তৃতীয়তঃ তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব কোনোভাবেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রসার নির্দেশ করেনা। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে না থেকেও গুরু-শিষ্য মন্ত্র তন্ত্র গ্রহণ করতে পারেন। চতুর্থতঃ সমগ্র মল্লভূমে কোন বৌদ্ধ সংঘের কোন ভগ্নাবশেষ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পঞ্চমতঃ যে তিনটি-চারটি অনুমিত বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সঙ্গে শলদায় প্রাপ্ত মহাকালকে একীভূত করা যায়না। ষষ্ঠতঃ বাঁকুড়াতে হিন্দু জৈন ধর্মের সংঘাত এবং হিন্দু ধর্ম কর্তৃক জৈন ধর্ম গ্রাস করার নমুনা পাওয়া যায়। যেমন ধরাপাট, বাহুলাড়া ইত্যাদি স্থানে। কিন্তু জৈন-বৌদ্ধ বা হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সপ্তমতঃ বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারের লেখকের অভিমত হ'ল **"It is, however doubtful if the Palas exercised any concrete influence in the regions south of the Ajoy river in Bengal which, in effect, meant that Buddhism, professed and patronised by the ruling family, had no opportunity to replace Jainism in the Bankura area."**[৩] তবে যে কথাটি বলা যায় তা হ'ল, মল্লভূমের উপর দিয়ে

হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও আদিবাসী ধর্মবিশ্বাসের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বহু ধর্মের দেবদেবী রূপান্তরের মাধ্যমে লৌকিক ধর্মে স্থান নিয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দেবদেবী এই প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। তাই সূত্রধরে কোন দেবতা যে কীরূপে এসেছেন মূর্তি শিল্পে, তার রূপ বা রূপান্তর পরিকল্পনায় কার প্রভাব যে কতখানি তা বলা দুঃসাধ্য।

ভৈরব ঃ— মোলকারী থেকে সংগৃহীত ভৈরবমূর্তিটি বর্তমানে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে আছে। মূর্তিটির নিম্নাংশ ভগ্ন। উপবাধর্ব থেকে দেখা যায় মূর্তিটির বাম হাতে ত্রিশূল, ডান হাতে ডমরু, মস্তক ঘিরে আছে লেলিহান অগ্নিশিখা, চক্ষু গোলাকার, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু গুম্ফ, কণ্ঠে, বাহুতে, মণিবন্ধে রুচিসম্মত অলঙ্কার, কর্ণে কুন্তল ও মাথায় মুকুট আছে। মূর্তির প্রস্তর পর্বের উপরের দক্ষিণ দিকে আছে জলপূর্ণ ঘটসহ দুই পক্ষ বিশিষ্ট মকর বাহনা এক নারী মূর্তি--হয়ত গঙ্গা কিন্তু গঠনে বৈচিত্র্য আছে। মূর্তিটি আপাতদৃষ্টিতে ভযঙ্কর ঠেকলেও সার্বিকভাবে এক প্রগাঢ় প্রশান্তি দৃষ্টি এড়ায় না। মূর্তিটির দুটি হাত ভাঙা। লাল পাথরে গঠিত এই ভৈরব মূর্তিটি পাল-সেন যুগের হওয়া স্বাভাবিক। এই মূর্তির সঙ্গে উড়িষ্যার শিল্পীর সমমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

বটুক ভৈরব ঃ— মূর্তিটি সাহিত্য পরিষদ শাখায় সংরক্ষিত আছে। মূর্তিটির অঙ্গ অবয়ব এমনভাবে ক্ষয়ে গিয়েছে যে মূর্তিটিকে ভাল করে চেনা যায় না। মূর্তিটির অনুসরণকারী কুকুর মূর্তিটি দেখে অনুমান করে যায় যে এটি বটুক ভৈরব মূর্তি। মূর্তিটির খোদাই সাবলীল নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিটির রিলিফ এবং গঠনশৈলী দেখে অনুমান হয় এটি পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর।

লকুলীশ ঃ— বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে শলদা গ্রাম থেকে সংগৃহীত খিলানে, বেগুনিয়া গ্রামে একটি শিখরের মাঝখানে এবং একটি জয়পুর গ্রামে লকুলীশ শিবমূর্তি আছে। মূর্তিত্ব অনুযায়ী লকুলীশ শিবের লক্ষণ হ'ল, "Siva standing straight whose penis is strong and erect and holds a wood in his hand."[1] উক্ত তিনটি স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মূর্তিতত্ত্বের বর্ণনা অনুযায়ী মিল দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বেগুনিয়ার মূর্তিটি যোগাসনে উপবিষ্ট কিন্তু উর্ধ্বলিঙ্গ ও লঙ্গুড়ধারী। প্রথম দুটি মূর্তি পালযুগের বলে মনে হয় কিন্তু জয়পুরের মূর্তিটিকে ঐতিহাসিক রাখালদাস ১৬০০ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ মধ্যে নির্মিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সৌম্য মূর্তি শিব ঃ

উমা-মহেশ্বর ঃ— উমা-মহেশ্বরের তিনটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিগুলি শলদা অঞ্চল হতে সংগ্রহ করে সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে। মূর্তিগুলি প্রায় ভগ্ন। মূর্তিগুলি থেকে দেখা যায় যে মহেশ্বরের ক্রোড়োপবিষ্টা আলিঙ্গনাবদ্ধ উমা। শিব সঙ্গেই সর্বদা শিবানীর অধিষ্ঠান। তিনি সর্বদাই মহেশ্বরের দেহলগ্না। এই মূর্তি শিবশক্তির একাত্মতার দ্যোতক। মূর্তিগুলি নবম-দশম শতাব্দীর বলেই ধারণা। উমা

মহেশ্বরমূর্তি সাধারণত যে অঞ্চলে শক্তি পূজার আধিক্য ছিল সেই সমস্ত অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। জে. এন. ব্যানার্জি লিখেছেন, "....The greater frequency of such sculpture in Eastern India is undoubtedly associated with the prevalence of Sakti cult in this region."[১] অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "Ardhanarisvara and Hari-Hara motifs emphasise in their own way the attempts to harmonise different cult deities such as Siva, Sakti and Vishnu."[১]

নটরাজ ঃ— আধুনিক বাঁকুড়া জেলায় একাধিক গ্রামে নটরাজ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কাস্তোর, দেউলভিড়্যা এবং শলদা গ্রামের নটরাজ মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তির বৈশিষ্ট্য হ'ল নৃত্যরত শিব এবং তার চারটি হাত। কিন্তু মল্লভূমের কাস্তোর এবং দেউলভিড়্যা গ্রামের নটরাজ মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল আটটি হাত বা অষ্টভুজ। শলদা গ্রামের নটরাজ ষড়ভুজ। অন্যত্র দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তির অবয়বে নটরাজ মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। মল্লভূমের শলদা গ্রামের মূর্তির অপর বৈশিষ্ট্য হ'ল— (১) নটরাজের পায়ের তলায় দক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় অপস্মার পুরুষ যা এই অঞ্চলেব অন্য মূর্তিগুলিতে নাই তবে এই মূর্তি শাস্ত্র বর্ণিত অপস্মার মূর্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (২) মল্লভূমের কাস্তোর এবং দেউলভিড়্যার মূর্তিটি চক্রমধ্যে রিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত। শলদার নটরাজ মূর্তিটি চক্রমধ্যস্থ নয়—একটি সুডৌল সুন্দর মূর্তি।

নটরাজমূর্তি ভারতীয় **শিল্পীর** এক অভিনব সৃষ্টি। ".....a sublime creation in the domain of art."[১] বস্তুত ভারত শিল্পে মূর্তি শুধু বস্তু সুষমাই প্রকাশ করেনা। এ এক অনির্বচনীয়ের দ্যোতনা বহন করে। নটরাজের নৃত্য মূর্তিতে বিশ্বস্রষ্টার **ছন্দোময়** ক্রিয়া বিধৃত। কুমারস্বামী নটরাজ শিবের তিনটি নৃত্যের বিবরণ তাঁর **Dance of Siva** গ্রন্থে দিয়েছেন — প্রথমটি হ'ল শিবের **প্রদোষকালীন নৃত্য**। এই নৃত্যে শিব দ্বিভুজ। **দ্বিতীয়** নৃত্য হ'ল **তাণ্ডব নৃত্য**। এই নৃত্যে শিব **দশভুজ**। তৃতীয় নৃত্য হ'ল **নদন্ত** নৃত্য। এই নৃত্যে শিব **চতুর্ভুজ**[১]। ষড়ভুজ নটরাজের মূর্তির বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। মনে হয় শিল্পী তাঁর কল্পনার আবেশে এই মূর্তি গড়ে তুলেছেন।

বৃষবাহন ঃ— বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে একটি ভগ্ন মূর্তি আছে। স্বর্গীয় মানিকলাল সিংহ মহাশয়ের মতে এটি বৃষবাহন শিবের মূর্তি। বৃষটি এবং তার দুপাশে নানা বাদ্যযন্ত্র সহ গণদের মূর্তি কেবল বোঝা যায়।

মল্লভূমের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল হর-পার্বতী এবং হরিহর ও সদাশিব মূর্তির অনুপস্থিতি।

মল্লভূমে বা আধুনিক বাঁকুড়া জেলায় সচরাচর শিবের যে মূর্তিটি দেখা যায় তা লিঙ্গরূপী শিব। লিঙ্গরূপী শিবই জনহৃদয়ে প্রোথিত। এ অঞ্চলে যে বড় বড় উৎসব হয় যেমন গাজন ইত্যাদি তা লিঙ্গরূপী শিবকে কেন্দ্র করেই। মল্লভূমে যে সমস্ত মন্দির প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে যেমন ডিহর, তক্তেশ্বর, ধরাপাট, সোনাতোপল প্রভৃতি তা লিঙ্গরূপী শিবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। অনার্য দেবতা শিব বর্তমানে ব্রাত্য এবং সংস্কৃতজনের দেবতায় রূপান্তরিত। নান্দনিক বা দার্শনিক শিব জনগনের নিকট

উপস্থিত হয়েছে বটে একাত্ম হতে পারেনি। কিন্তু সংখ্যায় স্বল্প হলেও হাজির তো হয়েছে। তাই প্রশ্ন হ'ল **নান্দনিক শিবের অনুপ্রবেশ ঘটল কীভাবে?**

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে উড়িষ্যা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় এখানে পুষ্টিলাভ করে এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল এক এক সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র রূপে গুরুত্ব অর্জন করে। **বৈষ্ণব শ্রীক্ষেত্র বা পুরী, শৈব একাম্রক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বর, শক্তি বিরজা ক্ষেত্র বা যাজপুর** এবং **সৌর অর্কক্ষেত্র** বা কোণারক ও **গাণপত্য ক্ষেত্র মহাবিনায়ক পর্বত** — সমস্তই উড়িষ্যায় অবস্থিত। সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালকে উড়িষ্যার ইতিহাসে "Golden Age of Temple Building" বলা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মন্দির ভাস্কর্য আপেক্ষাকৃত অনগ্রসর কৃষ্টি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে স্মরণীয় যে নবাবী যুগের পূর্ব পর্যন্ত মেদিনীপুরের বৃহৎ অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার বৃহৎ বঙ্গ বলতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলকেও বোঝাত। সুতরাং উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ঢেউ সীমান্ত অতিক্রম করে মল্লভূমে এসে লাগবে এ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এর পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়। মল্লভূমে উড়িষ্যা রীতির বহু মন্দির এখনও তার ধ্রুপদী সাক্ষ্য বহন করছে। আবার মল্লভূমির প্রাচীন মন্দিরগুলি নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল। এগুলি পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা থেকে এলেও স্থান, কাল এবং পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে, **স্থানীয় স্বকীয়তা অর্জন করেছে কিন্তু মূল আদলটিকে বিসর্জন না দিয়ে অক্ষুন্ন রেখেছে।** দেব দেবী এবং মূর্তির ক্ষেত্রেও বোধ করি তাই ঘটেছে। উড়িষ্যা থেকে যেমন শিব মূর্তি এসেছে তেমনি এসেছে সূর্য প্রভৃতি মূর্তি। উড়িষ্যার ঘরানায় যত মন্দির বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় তুলনামূলক বিচারে মূর্তির সংখ্যা কম। হয়ত মুসলিম অভিযানের ফলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। **মল্লভূমে বহু ভগ্ন মন্দির ও মূর্তি পাওয়া যায়। উত্তরে দামোদর নদের তীব্রতা ও অরণ্য উত্তর এবং গাঙ্গেয় সভ্যতার অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে দ্বারকেশ্বর এবং কাঁসাই-এর কূল বেয়ে দক্ষিণী সভ্যতা ও সংস্কৃতি মল্লভূমকে গ্রাস করেছে। তার স্মৃতি মহাদেবের বিভিন্ন রূপকল্পনার মূর্তি ও নিরাভরণ মন্দিরগুলি।**

সবশেষে যে প্রশ্নটি আলোচনা না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হ'ল লিঙ্গরূপী শিব ব্রাত্য এবং সংস্কৃতজনের মধ্যে স্থান লাভ করে নিতে পারলেও উমা-মহেশ্বর, নটরাজ যা লিঙ্গরূপী দেবতারই অন্যরূপ তা জনমানস থেকে হারিয়ে গেল কেন? এগুলি এখন যাদুঘরের শোভাবর্ধনকারীতে পরিণত হ'ল কেন? লিঙ্গরূপী শিব বা ভোলামহেশ্বরের প্রকৃতিতেই এর উত্তর নিহিত আছে। লিঙ্গরূপী শিব অনার্য দেবতা। **১) মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় সাধারণ মানুষের সুপ্ত মনের আকর্ষণ থেকেই** গিয়েছে। বৈদিক রুদ্রের মাধ্যমে শিব আর্যলোকে প্রবেশ করলেও এই প্রবণতায় সেখানে কাজ করেছে। শিব উৎপাদনের দেবতা। সন্তান-সন্ততি, উচ্চ-নীচ সকলেরই

কাম্য। তাই শিবের ভক্তের সংখ্যা সর্বাধিক। হিন্দু সমাজে সাধারণভাবে একটি প্রবাদ আছে "মেয়েরা ভাল বর পাওয়ার আশায় শিবের পূজো করে।" এই প্রবচনটিও শিবের উৎপাদন শক্তির সঙ্গে জড়িত। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিকভাবে শিব জনসাধারণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক যুগও এর ব্যতিক্রম নয়। ২) তাছাড়া শিবের ভোলাভালা রূপ, গাঁজা-ভাঙ খাওয়া রূপ সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর লোক যারা এ সমস্ত জিনিসে আসক্ত ছিল তারা শিবকে নিজেদের একজন ভেবেছিল। আবার শিবের চাষীরূপ যার চিহ্ন লোক বিশ্বাসে বিহারী নাথ পাহাড়ের নিকট আছে শিবকে চাষীদের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অপরদিকে সংস্কৃত দেবতারা সমস্ত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এদের মার্গীয় পূজাপদ্ধতি, আচার আচরণ ইত্যাদি। এই সমস্ত সংস্কৃত রূপের দেবতার জন্য সম্ভবত প্রয়োজন হ'ত মন্দিরের [এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সমস্ত দেবতাদের পূজার জন্য কী ধরনের মন্দিরের প্রয়োজন হ'ত তা জানা যায় না। কারণ বাংলাদেশে এই সমস্ত দেবতার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। যে সমস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তা প্রধানত পুকুর খননের সময় মাটির তল থেকে। অথবা গাছের তলায়। তাই প্রশ্ন জাগে এত দেবতার মন্দির ধ্বংস হলই বা কীভাবে এবং কে বা কখন এগুলি ধ্বংস হ'ল। প্রকৃতি কি এতই নির্মম যে এতগুলি মন্দিরকে প্রায় একই সঙ্গে ধ্বংস করে দিল।] ব্রাত্যজনের পক্ষে বা আদি-অধিবাসীদের পক্ষে মন্দির নির্মাণ সাধ্যের অতীত ছিল। আদি অধিবাসীদের যেমন শারীরিক গঠন সুঠাম, পেশীবহুল ও শক্তিশালী তেমনি তাবা ঘোররূপের দেবতাদেরই পছন্দ করত বেশি। তাই নিম্নবর্গীয় এবং আদি-অধিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যেক গ্রামে ভৈরব স্থান (চলতি কথায় থান) দেখা যায়। তাদের শিল্পোন্নত মূর্তিকল্পনার সময় এবং সুযোগ কম ছিল। যখন শিল্পোন্নত মূর্তি তাদের কাছে এল তখন এগুলি তাদের কাছে বিদেশী বলেই ঠেকল। ফলে তাদের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত হলনা। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল। আদি-অধিবাসীদের মধ্যে আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ কাজ করেছে। তারা তাদের নিজেদের দেব-দেবীকে সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক উন্নত সমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। শিব, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু উন্নত সমাজের দেবদেবীকে তারা তাদের জীবনচর্যার পরিকাঠামোয় সহজে স্থান দেয়নি। উন্নত সমাজের দেবদেবীকে তাদের সমাজে আসতে হয়েছে তাদের আচার আচরণ অনেকাংশে মেনে নিয়ে। এটিও ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের আগে সম্ভব হয়নি। বৈষ্ণব দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে তাই দেখি কোথাও বা শোল মাছ (কাস্তোর); পোড়াভাত (সাব্রাকোন) আবার কোথাও বা অম্বরীতামাক খাচ্ছে। (লালজী বিষ্ণুপুর)। বৈষ্ণব সাধকও জনঅরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার জন্য অবচেতন মনে প্রচার করছে ঃ—

ভর যুবতীর কোল
মাগুর মাছের ঝোল
বোল হরি বোল। ইত্যাদি।

মল্লভূমের মূর্তিগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাই মনে হয় ইতিহাস এখানে বিপরীত স্রোতে বইছে। আমরা সাধারণভাবে 'downward infiltration theory'র ছড়াছড়ি দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু শিবের ক্ষেত্রে স্রোত বিপরীতগামী। আবার সংস্কৃত দেবতাদের ক্ষেত্রে দেখি সমন্বয়ের ধারা। মল্লভূমে শিবের ইতিহাস যদি হয় 'upward penetration' তবে সংস্কৃত দেবতাদের ইতিহাস হ'ল 'harmonisation'এর ইতিহাস।

সূত্র নির্দেশ

১। এই প্রবন্ধের মূল ভিত্তি হ'ল ব্যক্তিগতভাবে গ্রাম পর্যটন। লেখক দীর্ঘকাল বাঁকুড়া জেলার গ্রাম পর্যটন করেছেন। তার অভিজ্ঞতার অন্যতম ফসল এই প্রবন্ধটি।

২। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প' ঃ **প্রবাসী** ১৩৩৬ মাঘ।

৩। মানিকলাল সিংহ ঃ রাঢ়ের মন্ত্রযান, (বিষ্ণুপুর), পৃষ্ঠা-১৩।

৪। A K Banerjee (ed) **West Bengal District Gazetteers : Bankura;** (Calcutta - 1968) P 70

৫। Haridas Mitra **Sadasiva Worship in Early Bengal;** Journal and Proceedings Asiatic Society of Bengal Vol XXIX 1933 No I

৬। J N Banerjee Development of Hindu Iconography, quoted in the classical Age. P 440

৭। Ibid

৮। A K Coomaraswamy **Dance of Siva** See aslo Gopinath Rao **Elements of Hindu Iconography.**

৯। Ibid

মল্লভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম : প্রবেশ ও প্রয়োগ

শেখর ভৌমিক

আফগান শক্তির কাছে ওড়িশা পরাজিত হবার পর, পঞ্চদশ শতকের শেষ এবং ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা সীমান্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা 'ভূম' নামধারী (মানভূম, তুঙ্গভূম ইত্যাদি) রাজ্যগুলি আরও সুসংগঠিত হয়[১]। কিন্তু খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তির দিক থেকে এদের সকলকে যে রাজ্য বা ভূখণ্ডটা অতিক্রম করে তার নাম মল্লভূম, রাজধানী বিষ্ণুপুর। টেরাকোটা সমৃদ্ধ অসংখ্য মন্দির, ধ্রুপদ সঙ্গীত, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য চর্চা, সামরিক শক্তি — এ সমস্ত কিছু নিয়ে মল্লভূম পরিণত হয় এক কিংবদন্তীতে।

বিষ্ণুপুর রাজাদের উচ্চতর মর্যাদার আসনে বা বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থায় পৌঁছতে যে বিষয়গুলো সাহায্য করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা 'নব বৈষ্ণব ধর্ম'-কে তাদের অন্যতম প্রধান বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

মল্লভূম বাঁকুড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম মোটেই অপরিচিত ছিল না। শুশুনিয়ায়, চন্দ্রবর্মনের লেখায় (আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ) বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ দেখা যায়[২]। অনেকে বলেন, শ্রী নিবাসের আগেই, পরমেশ্বর মল্লিক নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম[৩]। শোনা যায় শ্রীনিবাস যখন প্রথম আসেন, রাজসভায় তখন পাঠ হচ্ছিল 'রাস পঞ্চধ্যায়ী'[৪]।

এ সবই হয়ত ঠিক। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের কাছে মল্লরাজ বীর হাম্বিরের দীক্ষা গ্রহণ মল্লরাজ্যে নিয়ে এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। শ্রীনিবাসের এই 'মল্লরাজ সভা বিজয়' বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা। সাহিত্যে যত না হোক, সঙ্গীতে ও কারুশিল্পে বাঙালীর সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনা এখানে এক নতুন পথে বিকশিত হয়েছিল[৫]।

প্রশ্ন হল, কেবল শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণই কি বিষ্ণুপুর রাজাদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এত গভীরভাবে যুক্ত করল, যার চিহ্ন পদরচনা থেকে দশাবতার তাস, আর মন্দির নির্মাণ থেকে ধ্রুপদচর্চায় সুস্পষ্ট?

প্রথমেই এর উত্তরে যেটা বলা যায়, তা হল, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় গ্রাম বা অরণ্য ভিত্তিক উপজাতীয় প্রশাসন থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণের যে প্রবণতা দেখা যায় বা জাতি, বর্ণ কাঠামো ও সমাজের উচ্চস্তরে যাওয়ার যে প্রবণতা, তা থেকে বিষ্ণুপুরের রাজাদের বৈষ্ণব ভাবাবেগকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়।

কয়েকজন ঔপন্যাসিক ছাড়া মল্লভূম সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই মনে করেন যে, মল্লরাজাদের উত্থান হয়েছিল বাগদী জাতীয় এক আধা আদিবাসী সম্প্রদায় হতে। যোদ্ধা সম্প্রদায় ও স্বাধীন শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরই তাঁরা 'ক্ষত্রিয়' রূপে নিজেদের পরিচয় দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। কারণ সমকালীন স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাগদীর মত জাতির দেশ শাসনের বৈধ অধিকার থাকে না। তাই ক্ষত্রিয় পরিচয় দিয়ে নিজেদের শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ভীষণভাবে তৎপর হলেন। মুঘল মিত্রতা[৮] সমৃদ্ধি দিলেও বৈধতা লাভের সমস্যাটা সেভাবে মেটেনি।

অন্যদিকে যে আধা-উপজাতীয় আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে তাঁবা উঠে আসেন সেখান থেকে একটা 'চ্যালেঞ্জ' আসবার আশঙ্কাও তাঁদের ছিল। ফলে যে ভাবেই হোক এই শক্তি ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীগুলো সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়—দু'দিক থেকেই একটা স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটেই মল্লভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনকে বুঝতে হবে। মনের আকুতি ছাড়াও এই ধর্মে তাঁরা তাঁদের সমস্যা সমাধানের একটা সম্ভাবনাও হয়ত ধীরে ধীরে দেখতে পান। এই ধর্মের রীতিনীতি, তত্ত্ব—এসবের সঙ্গে আদিবাসী জীবনাচারের ছিল সুস্পষ্ট বিরোধ[৯]। এই 'Sophisticated' ধর্মেই মল্লরাজারা রাজকৌলীন্যে উত্তরণের একটা সম্ভাবনা পেলেন।

তাছাড়া আরও একটা সম্ভাবনার কথাও কিন্তু বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার নতুন নয়। অশোক বা শার্লম্যানরাও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করেন। সাম্রাজ্যে সংহতির অভাব দূর করতে ওড়িশার রাজারাও ত্রয়োদশ শতকে ধর্মীয় আচ্ছাদন ব্যবহার করেন[১]। মনে হয় মল্লরাজারাও আদিবাসী সমাজের হিংস্রতা, অসন্তোষ প্রশমিত করার একটা হাতিয়ার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে দেখেছিলেন। এই অর্থে এই বৈষ্ণব ধর্ম রাজা-অভিজাতকুল, প্রশাসন এবং নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে একটা 'সেফটি ভালব্' এর কাজ করে।

সুতরাং একদিকে যে স্থানীয় কৌমগোষ্ঠী থেকে নিজেদের উদ্ভব[১০] তাদের থেকে একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন ও দূরত্ব সৃষ্টি করে জাতি বা সমাজের উচ্চস্তরে যাবার প্রবণতা (Upward Mobility), নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয়দান, সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের স্বপ্ন, অন্যদিকে শক্তি উপাসক উপজাতীয় সমাজের বা সম্প্রদায়ের হিংস্রতা প্রশমন—এ দুইই — মল্লরাজাদের এত গভীর ও ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

মল্লভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারা যায় যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ' থেকে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যকে যে এই ধর্ম উৎসাহিত করেছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই[১১]। বিষ্ণুপুরে এই ধর্ম এক সমাজ বিপ্লবেরও সূচনা করে[১২]। সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষা চর্চা, মন্দির নির্মাণ ও সঙ্গীত-ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন- মূলতঃ এই তিনটি ধারায় বৈষ্ণব ধর্মের স্রোতটা প্রবাহিত হয়।

বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামী ও অন্যান্য সাধক ভক্তদের লেখা পুঁথিগুলোর পুনর্লিখন, অনুবাদ করা হয়। ব্যাকরণ, ন্যায়স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ, জ্যোতিষ সংক্রান্ত বহু পুঁথি এই জেলায় পাওয়া গিয়েছে। দুর্জন সিংহের সময় জনৈক বামচরণ চক্রবর্তী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করেন[১৩]। প্রায় ৪৫০ বছরের পুরনো এক বিষ্ণুপুরাণের অনুলিপিও পাওয়া গেছে[১৪]। বহু জায়গায় গড়ে ওঠে টোল। রাণীরাও রচনা করেন পদ। হাম্বীর লিখলেন-'এ বীর হাম্বির চিত, শ্রীনিবাস অনুগত

মজি গেলা কালাচাঁদের পায়[১৫]।

ভাবের আতিশয্য প্রদর্শনে গোপাল সিংহ, চৈতন্য সিংহরাও পিছিয়ে থাকেনি। নদী, খাল, পুষ্করিণী, গ্রামের নামকরণে বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্ট - শ্যামকুণ্ড, কৃষ্ণসায়র, কালিন্দী বাঁধ, যমুনাবাঁধ, মথুরা, দ্বারকা ইত্যাদি। তৈরী হয় নাটমন্দির, দোলতলা। মন্দির নির্মাণ এক প্রবাদে পরিণত হয়। খোদ বিষ্ণুপুরেই তৈরি হয় একাধিক মন্দির কালাচাঁদ, শ্যামরায়, মদনমোহন, লালজী, রাধামাধব, রাধাশ্যাম—অসংখ্য। "কৃষ্ণ রাধিকার নব নব মন্দিরের দেওয়াল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ভাস্কর্যে আচ্ছাদিত হতে লাগল।"[১৬]

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব রাজ পরিবারের সম্বোধনে পর্যন্ত পড়ল। বাবাকে— বাবা গোঁসাই, মাকে— মা গোঁসাই ইত্যাদি ডাকার রীতি চালু হয়[১৭]। নৃশংসভাবে কোন গরুর মৃত্যু হলে রাজ্যে তিনদিন শোক পালিত হত বলে হলওয়েল লিখে গিয়েছেন[১৮]।

ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষদের নিষ্কর জমি দান পরিণত হয় প্রবাদে। বহু মানুষ এসে বসতি স্থাপন করে। যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ'য় এর উল্লেখ আছে,—

'নানা দেশ হৈতে আসি কত কত জন।
প্রভুর চরণে আসি লইল শরণ'[১৯]।

চৈতন্য সিংহের সময় যে ব্রাহ্মণের নিষ্কর জমি ছিলনা, তার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে সংশয় থাকত[২০]। মল্লরাজাদের অনুকরণে ছাত্না সহ অন্যান্য ভূম নামধারী 'ভূখণ্ড'গুলোও নিষ্কর জমি দিতে থাকে[২১]। পাশাপাশি দেওয়া হয় 'বৈষ্ণবোত্তর', 'মহত্তরাণ' ও। বাঁকুড়া মহাফেজখানায় 'তায়দাদ পেপার্স' থেকে প্রায় ৭০ টা 'বৈষ্ণবোত্তর' ও ৯৯ টা 'মহত্তরাণ' দানের উল্লেখ পেয়েছি।

ধীরে ধীরে রাজগৃহীত এই ধর্মে প্রবেশ করে আতিশয্য। এর প্রামাণ পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল রচয়িতার রচনায়,—

'রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী'[২২]।

যাক, পুঁথি, ন্যায়, ব্যাকরণ, স্মৃতি, টোল ইত্যাদির মাধ্যমে মল্লরাজারা পেলেন তত্ত্বগতভাবে সমৃদ্ধ এক ধর্ম। সেই ধর্মকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে রাজারা ক্রমশঃ উৎসাহ দিতে থাকেন। এই ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনাদর্শের সঙ্গে অন্ত্যজ-আদিবাসীদের দূরত্ব অনেক। তার রীতি, প্রকরণ—সবই পরিশীলিত, ভাবগম্ভীর, কৌম সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই। মল্লরাজারা বুঝেছিলেন যে, মল্লভূমে নেহাতই আগন্তুক এই ধর্ম

সংস্কৃতি চর্চাই তাঁদের 'ক্ষত্রিয়' রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। এটাকে উন্নত বা উচ্চবর্ণের চর্চা করে জাতি বা সমাজের উচ্চস্তরে যাবার প্রবণতাই বলা চলে।

এভাবে সাংস্কৃতিক গোত্রান্তর ঘটল মল্লরাজাদের। তাঁরা অর্জন করলেন বৈধতা, কৌলীন্য। "বস্তুত ষোড়শ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সুদূরপ্রসারী প্লাবনে জঙ্গলমহলের এই নবক্ষত্রিয় রাজাদের বৈধতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়"[২৪]। এভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যবহৃত হল রাজকৌলীন্যে উত্তরণের এক হাতিয়ার রূপে।

একটা অংশ থেকে তো রাজারা দূরে সরলেন। কিন্তু প্রত্যেক শাসনেরই একটা 'শ্রেণীভিত্তি' বা 'class basis' থাকে বলে কোশাম্বী লিখেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সে সমস্যারও সমাধান করে, এই ধর্মও তাকে কেন্দ্র করে ব্যাপকহারে মন্দির নির্মাণ, ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন মল্লভূমে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। যার অন্তর্ভুক্ত বিশেষ গোষ্ঠীই মল্লশাসনের শ্রেণীভিত্তি রচনা করেছিল সন্দেহ নেই। প্রশাসনে স্থাপিত হয় ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য। এরাই মল্লদের দরবারী সংস্কৃতি, দরবারী বৈষ্ণব সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সেই ধর্মকে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর নিম্ন বৃত্তে সীমাবদ্ধ রাখে। ওন্দা থানার চাবড়া গ্রামের কায়স্থ সরকার, দামুদরবাটির গুহ বা বিষ্ণুপুরের মিত্রদের[২৫] মত মল্লভূমের অসংখ্য পরিবার বৈষ্ণব পুঁথি নকল করেন। মল্লরাজাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে এঁরা ভোলেননি। এঁদের রচনায় পৃষ্ঠপোষক রাজার প্রশস্তি স্পষ্ট, স্পষ্ট ভূমিদান গ্রহণের স্বীকারোক্তিও।

জনৈক রামচরণ চক্রবর্তী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের ভণিতায় লিখেছেন,—

শ্রীযুক্ত দুর্জন সিংহ নামে নৃপবর।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবৃন্দে উন্মত্ত ভ্রমর।।
মল্লকুল সলিলেতে উৎপত্তি উৎপল।
মহাবলবান অস্ত্রশাস্ত্রেতে কুশল[২৬]।

রামায়ণ পাঁচালির ভণিতায় দ্বিজ কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তী লিখেছেন,—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পান্থয়ায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি[২৭]।।

আবার গোপাল সিংহের সময়, এই কবিই তাঁর ভারত পাঁচালির ভণিতায় লিখেছেন, —

'শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ,
যাঁর কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ।।
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সবাকার মান্য।
পরম দেবতা জ্ঞানে মানেন শ্রীচৈতন্য।।
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ"[২৭ক]।।

১৭৯৩ খ্রীঃ বিষ্ণুপুর নিবাসী জনৈক উত্তম দাসও 'শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরতন'-এর বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় গোপাল সিংহের প্রশস্তি করেছেন। এছাড়া প্রশস্তি কর্তাদের তালিকায় আরও যাঁরা আছেন, তাঁদেব মধ্যে রামচন্দ্র ব্যানার্জী, প্রভুরাম, দ্বিজসীতা সুত, সাফল্যরাম, ধনঞ্জয় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের মনোহরদাস কবি জয়দেবের অনুকরণে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় 'গীতপুষ্পাঞ্জলি' লিখেছেন চৈতন্য সিংহের সময়ে। সেখানেও উপস্থিত এই প্রশস্তি বন্দনা, —

মল্লাবনি পরিপালক চৈতন্য নরেশং।
সুখয়তু মনোহর কবি ভণিতং হরিদাসং।

তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল প্রসারটা ঘটেছিল কিন্তু মূলতঃ মন্দির তৈরির মাধ্যমে। এখানেও মন্দির নির্মাণ সহায়ক হয় উল্লম্ব চলমানতায় (Upward Mobility)। মন্দির নির্মাণ চিরাচরিত সমাজে সমাজসেবার একাংশ, অন্যদিকে আবার তা প্রতিষ্ঠাতার সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতার প্রকাশক এবং জনমানসে তাঁর প্রভাব বিস্তার ও দৃঢ় করার মাধ্যমও বটে। মন্দির গণসংযোগের মাধ্যম। এর মাধ্যমে মানুষ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধ র্মের প্রতি রাজার অনুরাগ ও ভক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়।

বস্তুতঃ অন্ত্যজ আদিবাসীদের সমাজে নিজেদের সাংস্কৃতিক গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশাল, কারুকার্যময় বৈষ্ণব মন্দিরগুলো ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এক মাধ্যম। মন্দিরের ঈশ্বর আর রাজশক্তি এক হয়ে যান। রাজাদের নামের শেষে যুক্ত হতে থাকে 'দেব' অভিধা,— রঘুনাথ সিংহ দেব, চৈতন্য সিংহ দেব। সাহিত্যে এই 'Deification' টা আরও স্পষ্ট।

তাছাড়া রাজারা ক্রমশঃ উচ্চবর্ণের মানুষ ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করায় মল্লভূমের নীচুতলায় হয়তো একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। সাধারণ মানুষের মনটা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে অসন্তোষ প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন রাজারা। এ কাজে সহায়ক হল মন্দির নির্মাণ কর্মসূচি, এর দ্বারা রাজার গৃহীত ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়। সাধারণ মানুষের মনে রাজার ঔদার্য, মহিমাকে চিরস্থায়ী করতে, রাজার গৃহীত এই বৈষ্ণব ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রত্যন্ত গ্রামেও মন্দির তৈরি হতে থাকে।

মল্লরাজাদের বিষ্ণুভক্তি প্রশ্নাতীত। কিন্তু নিছক এই ভক্তিই মন্দির নির্মাণের অনুপ্রেরণা ছিল বলে মনে হয় না। নিষ্ঠুরতার জন্য, ভ্রাতৃহত্যার জন্য খ্যাত বীর সিংহই তৈরি করেন লালজী মন্দির। এ কী করে হয়? বিষ্ণুভক্তি, আর ভ্রাতৃহত্যা - দুটো তো ঠিক মেলানো যায় না। সুতরাং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাকে অবশ্যই মনে রাখা দরকার। যা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মল্লভূমে নিয়ে এসেছিল কীর্তন গানের জোয়ার। এই কীর্তনে ছিল ধ্রুপদের ছোঁয়া। বৈষ্ণব গোস্বামীদের ধ্রুপদচর্চা, ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন বিষ্ণুপুর ঘরানার পটভূমি তৈরি করে। বিষ্ণুপুর ভিন্ন বাংলায় দ্বিতীয় কোন ঘরানার পত্তন হয়নি।

এই ধ্রুপদ সঙ্গীত যে দরবারী সংস্কৃতির অঙ্গ সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। অরণ্য অঞ্চলে এই গান একেবারেই 'বিদেশী'। আর সেই সঙ্গীতচর্চা সবটাই মনের শান্তি বা ভালো লাগার জন্য—তা মেনে নেওয়া মুস্কিল। এখানেও তাই উল্লম্ব চলমানতাই প্রধান (তবে একমাত্র বলা হচ্ছে না)। এই ধ্রুপদ চর্চাও সাধারণ মানুষের থেকে মল্লরাজাদের দূরত্ব সৃষ্টি করে। যাঁরা এর চর্চা করতেন, তাঁরাও ছিলেন মূলতঃ রাজানুকূল্য প্রাপ্ত সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মানুষ। নিষ্কর জমি ভোক্তা সাহিত্যিকদের মত এঁরাও করেছেন বাজার প্রশস্তি। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্ততঃ দু'টো গানের উল্লেখ করা যেতে পারে[৩৬]।

ক) **সাহানা (চৌতাল, মধ্যগতি)**

সবগুন নিধান মহারাজ রঘুনাথ,
তুঅ দরবার সায়ত শোহাওএ।
অনেক গুণীগন চঁহুচক সে আয়ে,
আওর সব অযাজক পদ পাওএ।
তুঁহিদাতা বীঁর সবকো কর বেপীর,
বিক্রমসে দুরজন সব দূর যাও এ।
তুঅ সম রাজ জগমেঁ নহীঁ দুজো,
ইস্ লিয়ে বাহাদুর নিশ দিন গুন গাও এ।।

খ) **বাগীশ্বরী (চৌতাল, মধ্যগতি)**

সুজন নরেশ গোপাল সিংহদেব,
বিখন পুরাধিপ হোয় সবকো পালন করত।
ধনেশ সম বিশান, দাতা করণ সমান,
ঔর তুঁহি মদন মোহনকে পরধান ভকত।
সকল বিদ্যা পরচার লগী নানা দেশকে গুণীজন লায়ে,
ঔর তুঁহিতে বঙ্গমে সঙ্গীত উজর রহত।
জব লগ রহে জগত-অমর হো যশকীরত,
নিত অনন্ত তুঅ গন রটত।।

কিছু সাধারণ মানুষ এই ঘরানার চর্চা করলেও[৩৭] এই সঙ্গীতকে 'popular culture" - এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা। যাঁরা এর চর্চা করতেন মোটামুটি তাঁদের সিংহভাগই ছিলেন 'ক্ষমতা' বা power - এর কাছাকাছি। সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, কুচিয়াকোল, ছাত্না, মালিয়াড়া[৩৮] — সব রাজপরিবারেই ছিল এই ধ্রুপদ সঙ্গীত, ঘরানার প্রচলন।

সব শেষে 'দশাবতার তাস'। এই তাসও আভিজাত্যে উত্তরণের প্রেক্ষাপটেই বিচার করা দরকার। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বিষ্ণুপুরের তাসেও চিত্রিত হয় দশাবতার[৩৯]। দশাবতার তাস খেলায় 'ভাল তাস' বা অভিজাত হল রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ

ও কল্কি। অন্ত্যজ হল মীন, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন। অনেকে বলেন, এই শ্রেণী-বিভাগের কারণ 'অন্ত্যজ তাস'গুলো মনুষ্যেতর বা তার কাছাকাছি[১০]। কিন্তু আসলেই কি তাই? মনে হয় না। ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদিরা উপজাতীয় সমাজের প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়ে 'অন্ত্যজ' স্তরভুক্ত হয় 'নববৈষ্ণব ধর্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 'চ্যাম্পিয়ন'দের কাছে। তাসেও তাই দেখতে পাওয়া গেল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব তাসের মাধ্যমেও রাজধর্ম বিস্তৃত হোক — এই বোধহয় ছিল রাজাদের উদ্দেশ্য[১১]।

উত্তর ভারতের ধ্রুপদ সঙ্গীতের মত মুঘল অভিজাতদের রীতিনীতি, অভ্যাস বা আদর্শ(Norms)গুলো অষ্টাদশ শতকের কলকাতার নব্যধনীদের কাছেও ছিল অনুকরণের বিষয়[১২]। আর মুঘলের মিত্র বিষ্ণুপুরের রাজারাও যে সেই 'মডেল'টাই ধরবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-পুঁথি, সাহিত্যচর্চা, কীর্তন, ধ্রুপদ গান, মন্দির নির্মাণ ও দশাবতার তাস — এই সংস্কৃতিচর্চা মল্লরাজাদের মর্যাদা বাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। উপজাতীয় সমাজে, অরণ্য অঞ্চলে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব, নিয়ন্ত্রণ। দৃঢ় হল তাঁদের সামাজিক কর্তৃত্ব। মানুষ রাজার 'মহত্ব', রুচি সম্পর্কে সন্মোহিত হলেন, আকৃষ্ট হলেন। হলেন শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধাই মল্লরাজাদের করল স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের 'বাগ্দীত্ব' নিয়ে ভয়, অস্বস্তি কমল, কমল অরণ্য সমাজ থেকে চ্যালেঞ্জ আসবার সম্ভাবনাও। বিশালায়তন মন্দিরগুলোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে। রাজাবা আর রইলেন না 'স্থানীয় বাগ্দী রাজা'। তাঁরা ক্রমশঃ চলে গেলেন বৃহত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। মল্লরাজারা সক্ষম হলেন অভীষ্টলাভে।

যতদিন বাইরে থেকে কোন চাপ আসেনি ততদিন রাজভক্ত, আনুকূল্য ভোগী সম্প্রদায়ই ছিল মল্লশাসনের প্রধান সমর্থক। তবে সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে রাজারা এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন যে, পরবর্তী কালে রাজ্য যখন নীলামে উঠল, তখন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদই গড়ে ওঠেনি।

রাজারা যখন আঞ্চলিকতা অতিক্রম করলেন, তখন স্থানীয় নেতৃত্ব— উচ্চবর্ণ, নবশাখ, তিলি, সদ্‌গোপ, মাহিষ্যরাও উপরে উঠবার এই 'মডেল'টাই ধরলেন। গ্রামাঞ্চলে এঁরা মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করলেন। ম্যাক্‌কাচ্চন মন্দিরের একটা তালিকা দিয়েছেন[১৩]। যদিও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে তিনি উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহের বিবরণ দিয়েছেন। যাই হোক মন্দির নির্মাণ, বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা অন্ত্যজ-আদিবাসীদের কৌম সমাজে গ্রামীণ নেতৃত্বের কাছে যথাইই ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। এঁরাও ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর দিতে শুরু করেন, নাটমন্দির তৈরি করলেন, আয়োজন করলেন কথকতার, সুখজোড়ার মণ্ডলদের মত কেউ কেউ কৃষ্ণ যাত্রাও লিখলেন[১৪]। অর্থাৎ এঁরাও ব্রাহ্মণ্য অভিজাত সংস্কৃতির অনুসরণ, অনুকরণ করলেন। বেশি আলোচনার সুযোগ নেই। মোদ্দা কথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তাই অনেক মাত্রাসহ এক 'নব ব্রহ্মণ্য

মতবাদ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হল [৮]। একেও একপ্রকার শ্রীনিবাস বা মিলটন সিংগারদের ভাষায় 'Sanskritization' ই বলা যেতে পারে[৯]।

বৈষ্ণব ধর্মের এই তথাকথিত প্লাবন মল্লভূমের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করলেও নির্মূল করতে পারেনি তাঁদের নিজস্ব দেবদেবী—ধর্মরাজ, মনসা, বা কালুবুড়ী, খাঁদারাণী, বলদ্যাবুড়ির মত মনুনিষিদ্ধ গ্রামদেবতাদের। এঁরা যে বৈষ্ণধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হল সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম। সে কৃষ্ণ হল কানু, ননীচোর, 'গোপিকা প্রাণধন — গোকুল রঞ্জন।' এঁরা তত্ত্বকথা বা ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন বোঝেন নি। এঁরা বেছে নেন রাধা কৃষ্ণের সহজ সরল প্রেমমূলক গান-ঝুমুর, কীর্তন। বিংশ শতকের সরকারি কাগজপত্রেও হরি সংকীর্তনকে এঁদের আমোদ প্রমোদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে[১০]।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তাই মল্লভূমবাসীর প্রাণের ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। 'নরোত্তম বিলাস' -এ বলা হয়েছে,—

'কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়গ করে করয় নর্তন মত্ত হৈয়া'[১১]।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 'দেশাবলিবিবৃতি' নামে এক পুরনো পুঁথির অনুবাদ করেন[১২]। সেখানেও বলা হচ্ছে, 'দারিকেশী নদী পর্যন্ত মল ভূমি ধম্মবর্জিত, জঙ্গল আবৃত বিষ্ণুপুর রাজারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে সতীদাহর মত প্রথাও এখানে ব্যাহত হয়নি। ১৮১৫ খ্রীঃ ৩৪ থেকে ১৮১৮ খ্রীঃ সতীদাহের ঘটনা ৬২ তে পৌঁছেছে। ম্যাজিস্ট্রেটরা নিম্নবর্ণের মহিলাদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ্য করেছেন[১৩]। মল্লভূমের সাধারণ মানুষের মন থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গাজনের মত অনুষ্ঠান, ঝাঁপান, ধর্মরাজ, মনসা বা গ্রামদেবতাদের আজও দূর করতে পারেনি। তবে পাশাপাশি এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, 'কালো বিয়ে কৃষ্ণ মোর যায়গো গড়াগড়ি' — এই জাতীয় গানে অন্ত্যজ-আদিবাসীরা কৃষ্ণকে বিদ্রূপ করলেও মল্লভূমে কৃষ্ণ-মনসার দ্বন্দ্ব কিন্তু অনুপস্থিত। দু'জন চলেছেন সমান্তরালভাবে।

সূত্র নির্দেশ

১। আবদুল ওয়াহাব মামুদ, (সম্পা) ইতিহাস অনুসন্ধান ১০, কলি-১৯৯৫, শেখর ভৌমিক **মুঘল রাজশক্তি ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মিত্রতা . প্রেক্ষাপট ও ফলাফল**, পৃঃ ২৬৭

২। রমাকান্ত চক্রবর্তী, **বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম**, কলি, ১৯৯৬, পৃঃ ৯

৩। মানিকলাল সিংহ, **পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি**, বিষ্ণুপুর ১৩৮৪ সন, পৃঃ ৩১৪

৪। ফকির কর্মকার, **বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী**,কলি, ১৩৭৪ সন, পৃঃ ৩২-৩৫

৫। সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, প্রথম খণ্ড, কলি, ১৯৯১, পৃঃ ৩২৫

৬। শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত **প্রবন্ধ**, পৃঃ ২৬৭-৭৪

৭। সনৎ মিত্র, **পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা**, কলি, ১৩৮২ সন, পৃঃ ১৫৪

৮। **Journal of History, V-XII. 1992-93. Jadavpur University** ডঃ অমিত ভট্টাচার্য,' Contradictions and Social change in Ancient India. পৃঃ ১৭ এবং R Winston. **Charlesmagne** লণ্ডন, ১৯৫৬, পৃঃ ১০৪

৯। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, **The History of Gajapati Kings of Orissa and their Successors**, কলি, ১৯৫৩, পৃ ১৩০ ৩৭
১০। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, **'রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা'**, Occasional paper No 32 Centre for studies in Social Sciences কলি, ১৯৮০, পৃ. ১৪, ২৮ ইত্যাদি
১১। সুরজিৎ সিনহা (সম্পা) **Tribal Polities and State systems in Pre-colonial Eastern and North Eastern India**, কলি, ১৯৮৭ হিতেশ সান্যাল **'Mallabhum'** পৃঃ ১১৫
১২। রজত কান্ত রায় **পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ**, কলি, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৯
১৩। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় - **West Bengal District Gazetteer : Bankura** কলি, ১৯৬৮ পৃঃ ৪৩০-৩৩
১৪। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় - **দেখা হয় নাই**, কলি, ১৩৮০ পৃঃ ১৭৩
১৫। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় **Bankura** পৃ. ৪৩০-৩৩
১৬। অনুকূলচন্দ্র সেন, **বাঁকুড়া পরিক্রমা**, কলি, ১৩৭৬ সন, পৃঃ ১৪০
১৭। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, — **বাঁকুড়ার মন্দির**, কলি ১৩৭১ সন, পৃ ১২৫
১৮। মানিকলাল সিংহ, **পূর্বোক্ত**, পৃ ১৬১
১৯। অভয়পদ মল্লিক- **History of Bishnupur Raj** কলি, ১৯২১, পৃঃ ১৩৬
২০। মানিক সিংহ, **পূর্বোক্ত**, পৃ ৩০৬
২১। F W Robertson **Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Bankura, 1917-24**, কলি, ১৯২৬, পৃঃ ৩৮
২২। অনুকূল সেন, **পূর্বোক্ত**, পৃঃ ১৪০-৪১
২৩। ঐ পৃঃ ১৪৫
২৪। Binod S Das **Changing Profile of Frontier Bengal (1751-1833)** দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ. ৭-৮
২৫। মানিক সিংহ, **পূর্বোক্ত**, পৃ ১৭৫ ৭৬
২৬। ঐ পৃঃ ৩৩৩
২৭। ঐ পৃঃ ৩৩৫
২৭। ক। **তদেব**
২৮। ঐ পৃঃ ৩৩৯
২৯। ঐ পৃঃ ৩৪১ ৪২
৩০। ঐ পৃঃ ৩৪১-৪৫
৩১। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, **Social Mobility in Bengal** কলি, ১৯৮১, পৃঃ ৬৭
৩২। হিতেশ সান্যাল, **'Mallabhum'** পৃ. ১১৬
৩৩। রমাকান্ত চক্রবর্তী, **Baishnabism in Bengal (1486-1900)** কলি, ১৯৮৫, পৃ. ২২৪
৩৪। অভয়পদ মল্লিক, **পূর্বোক্ত**, পৃঃ ৪৩-৪৪
৩৫। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, **বিষ্ণুপুর ঘরানা**, কলি, ১৯৬৩, পৃঃ ৩০
৩৬। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **সঙ্গীত মঞ্জরী**, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলি, ১৯৩৫, পৃঃ ৪৬৯ ও ৪১৮
৩৭। ফকির নারায়ণ কর্মকার **সঙ্গীত তীর্থ বিষ্ণুপুর**, বিষ্ণুপুর, ১৩৯১ সন, পৃঃ ৮০-৮১
৩৮। তরুণদেব ভট্টাচার্য, **বাঁকুড়া**, কলি ১৯৮২ পৃঃ ৩২৫

৩৯। রমাকান্ত চক্রবর্তী **Baishnabism in Bengal,** পৃ ১১৮
৪০। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি**, কলি, ১৩৮৬, পৃ ৩০
৪১। ধ্রুব প্রসাদ সরকার, **মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব**, বিষ্ণুপুর, ১৯৮০, পৃ ৭৮
৪২। সুমন্ত ব্যানার্জী — **The Parlour and the Streets : Elite and Popular Culture in 19th Century Calcutta.** কলি, ১৯৮৯, পৃ: ১৪৭
৪৩। David Mccutchion **The Temples of Bankura District,** Appendix-A কলি, ১৯৭২
৪৪। **সাক্ষাৎকার**, শ্রী মদনমোহন মণ্ডল, তারা বৃটির, প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া, ২০ ৪ ৯৫
৪৫। রমাকান্ত চক্রবর্তী, **বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম**, পৃ ১৩২-৩৩
৪৬। মিলটন সিংগার, **Introduction to the Civilization in India, Changing Dimensions of Indian Society and Culture.** শিকাগো ১৯৫৭, পৃঃ ৩৬৪-৩৮০
৪৭। রবার্টসন **পূর্বোক্ত**, পৃ ২১
৪৮। বিনয় ঘোষ, **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি** কলি, ১৯৫৭, পৃঃ ৮৩
৪৯। **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা**, ৫৫শ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড কলি, ১৩৫৫ সাল
৫০। সুকুমার সিনহা ও হিমাদ্রি ব্যানার্জী (সম্পা), **West Bengal District Records, New Series, Bankura, District : Letters Issued : 1802 - 69.** কলি, ১৯৮৯, পত্র নং ১৬৩ পৃ ১০৭

সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলায় ফরাসী কোম্পানী ও দুটি ফার্মান

অনিরুদ্ধ রায়

১৬৬৪ সালে নতুন ফরাসী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই বাংলায় বাণিজ্য করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ১৬৬৬[১] সালে সুরাট থেকে শুজ নৌবাহিনীর সাহায্যে জায়গা দখল করার কথা বললেও, বাংলায় বাণিজ্য করা নিয়ে কিছু বলেননি। ১৬৬৮ সালে বার্ণিয়ার[২] একটি প্রতিবেদনে কাশিমবাজারে ফরাসী কুঠি স্থাপন করার কথা বলেছিলেন। দ্রষ্টব্য যে তিনি হুগলীতে কোন কুঠি চাননি। ঐ সময়ের ফরাসী কোম্পানীর অধিকর্তা ক্যারন[৩] দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বাণিজ্যর কথা বলেছেন। বাংলা সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। বার্ণিয়ার-এর বক্তব্য ফরাসী কোম্পানী কাজে লাগানোর চেষ্টা করেনি এবং কোম্পানীর প্রথম দিকে বাংলা ফরাসী কোম্পানীর বাণিজ্যিক কাজকর্মের বাইরে ছিল। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলাতে ফরাসী কোম্পানীব প্রবেশ ঘটল।

১৬৭৩ সালে ঝড়ে ফরাসী কোম্পানীর একটি জাহাজ বালাসোর বন্দরে আসতে বাধ্য হয়। ওলন্দাজরা জাহাজটি দখল করে হুগলীতে নিয়ে আসে। কোম্পানীর কর্মচারী দুপ্লেসিস ঐ জাহাজে ছিলেন। তিনি বালাসোর-এর ফৌজদার ও স্থানীয় বণিকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে ও সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে বাংলার সুবাদার-এর সঙ্গে দেখা করেন। জাহাজটি ছেড়ে দেওয়া হয়[৪]। দুপ্লেসিস-এর চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি ঢাকা, হুগলী, কাশিমবাজার ও বালাসোর-এ কুঠি বানানোর অনুমতি পেয়েছিলেন। দুপ্লেসিস-এর চিঠি পাওয়া যায়নি তবে সমকালীন বাকি মার্তাঁর ডায়েরীতে এটির উল্লেখ আছে[৫]। এ ধরনের কোন পরওয়ানা বা মোগল ফার্মানও পাওয়া যায়নি। কোম্পানী কুঠি স্থাপনের কোন চেষ্টাও করেনি। তবে ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই — কারণ পরবর্তীকালে মার্তাঁ এই সুযোগ কাজে না লাগানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন[৬]। কাজে না লাগানোর হয়তো বড় একটা কারণ ছিল। ফরাসী কোম্পানীর বাণিজ্য তখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে প্রধানতঃ করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে।

১৬৮০ সালের পর শায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয়বার সুবাদার হয়ে বাংলায় আসেন। ঐ সময়ে আবার একটি ফরাসী কোম্পানীর আর একটা জাহাজ বাংলাতে আসতে বাধ্য

হয়। কোম্পানীর বণিক বার্ণার্ডি বাংলা থেকে প্রচুর মাল কিনে পণ্ডিচেরী পৌঁছান। ওখানে বাংলার মাল প্রচুর দামে বিক্রি হয়। পণ্ডিচেরীর অধিকর্তা মার্তাঁ এত লাভ দেখে বার্ণার্ডি ও অন্যান্যদের টাকাকড়ি দিয়ে বাংলায় পাঠান। ১৬৮৬ সালে বার্ণার্ডি প্রচুর সোরা পণ্ডিচেরীতে পাঠান ও বাংলা সম্পর্কে এক উজ্জ্বল প্রতিবেদনও পাঠান।

ইতিমধ্যে মার্তাঁ বাংলার বাণিজ্যের অনুমতি চেয়ে প্যারিসে চিঠি লিখেছেন। বাংলাতে তখন ফরাসী কোম্পানীর সুযোগ বেড়ে গিয়েছে। ইঙ্গ-মোগল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজরা বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে ও বাংলার বাণিজ্যতে প্রবেশের সুযোগ ফরাসীদের হাতের মুঠোয়। মার্তাঁ সুযোগ বুঝে তাঁর জামাই আন্দ্রে বুরো দেল্যান্দকে বাংলাতে পাঠান। ইনিই বাংলায় ফরাসী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলা সম্পর্কে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার পিছনে কোম্পানীর আর একটি কারণ ছিল, সুরাট কুঠির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। সুতরাং ফরাসীরা পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য সরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু বাংলাতেও ফরাসীরা সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। তাঁতের কাপড় ফরাসী দেশে আমদানী করা বারণ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ফরাসীরা রেশম ও সোরা রপ্তানীর উপর জোর দিচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সম্রাটের ফার্মান না থাকায় শুল্কবিভাগের আমলারা কম শুল্কে মাল যাতায়াত করতে দিতে রাজী নয়। ফলে তাদের সঙ্গে গোলমাল লেগেই থাকছে এবং প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিতে হচ্ছে ঐ সব আমলাদের খুশী রাখার জন্য। কোম্পানীর লাভ কমে যাওয়া ছাড়াও মাল যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটছে এছাড়াও সমস্যা ছিল। ফরাসীরা ব্যান্ডেলে পর্তুগীজদের সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু পর্তুগীজ অগাস্টিয়ান পাদরীদের সঙ্গে ফরাসীদের গোলমাল লেগেই ছিল। ফরাসীরা চাইছিল নিজেদের একটা জায়গা করে সেখানে সরে যেতে। এসবের জনাই ফার্মান দরকার এবং দেল্যান্দ এবার বাংলার দেওয়ান কাফায়েৎ খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ফার্মান-এর জন্য।

এরপরেই আমরা পাই বাংলার সুবাদার নবাব ইব্রাহিম খানের একটি পরওয়ানা ২৯শে মে ১৬৯০ সালের। ততদিনে ফরাসীরা পাদরীদের সঙ্গে ঝগড়া করে মোল্লা আবদুল হাদীর বাসায় থাকছে। পরওয়ানাতে ফার্মানের উল্লেখ নেই এবং সে ফার্মান এখনো পাওয়া যায় নি। পরওয়ানাতে ফরাসীরা যে বোরেগাইছাপুর জমি কিনেছিল সেটার সমর্থন করছে। এই জায়গাই পরে চন্দননগর নামে পরিচিত হয়। কিন্তু পরওয়ানার ভাষা থেকে মনে হয় যেন ফরাসীরা সবেমাত্র হাদীর বাড়ীতে গিয়েছে আর জমিও সবেমাত্র কেনা হয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি সমস্যা আছে। বড় প্রশ্ন যেটি সেটা হলো যে ১৬৭৩ সালে দুপ্লেসিস কি জমি কিনেছিল? ইংরেজ বণিক মাস্টারস ১৬৭৩ সালে নৌকা করে গঙ্গা দিয়ে যাবার সময় ফরাসী জমির উল্লেখ করেছেন যেটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উনি আরো বলেছেন যে ওলন্দাজরা এখন ঐ জমি দখল করে আছে। এর থেকে দুপ্লেসিস-এর জমির হদিস পাওয়া গেলেও, সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে। তখন জমি পেলে, ফরাসীরা পরে আবার জমি কিনতে গেল কেন? এমন হতে পারে যে দুটি জমি এক জায়গায়

নয়। কিন্তু মাস্টারস এর বর্ণনা থেকে মনে হয় যে দুটি জমিই এক জায়গায়। হরিহর শেঠ ও ইন্দ্রানী রায় দুপ্লেসিস-এর জমি কেনা মেনে নিয়েছেন[১১]। কিন্তু আগেই উল্লিখিত যে ঐ জমি কেনার কোন দলিল পাওয়া যায়নি এবং মার্তাঁর উল্লেখে জমি কেনার কথা বলা নেই। অবশ্য এমন হতে পারে যে দুপ্লেসিস জমি কেনা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি — আরম্ভ করেছিলেন। আমরা জানি যে দুপ্লেসিস-এর হাতে টাকাপয়সা বিশেষ ছিল না এবং তিনি বেশীদিন বাংলাতে ছিলেন না[১২]। সুতরাং ফার্মান সংগ্রহ করার জন্য যে সময় বা টাকা প্রয়োজন তা তাঁর কাছে ছিল না। ফলে ঢাকার নবাব যদি তাকে অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা ছিল ফার্মান সাপেক্ষে—যেটা আনানোর জন্য ফরাসীরা কোনও চেষ্টা তখন করেনি। তাছাড়া ঐ ধরনের অনুমতি থাকলে ওলন্দাজরাও জায়গা দখল করতে পারত না বা শুল্কবিভাগের আমলাদের সঙ্গে ঝামেলা হত না।

ফরাসীরা কুঠি বানাতে শুরু করলে পর, ওলন্দাজরা ফৌজদার-এর কাছে অভিযোগ করে ও ফৌজদার কুঠি বানানো বন্ধ করে দেন। ফরাসীরা আবার সুবাদারের কাছে অভিযোগ করলে, সুবাদার পাট্টা প্রভৃতি দলিল পরীক্ষা করে কুঠি বানানোর নির্দেশ দেন। ইব্রাহিম খান এর পরওয়ানাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ফরাসীরা চন্দননগর, কাশিমবাজার ও বালাসোর-এ কুঠি বানাতে শুরু করে[১৩]। উল্লেখযোগ্য যে দুপ্লেসিস-এর কাছে ফার্মান বা পরওয়ানা থাকলে ওলন্দাজরা জায়গা দখল করতে পারত না।

দুই

ফার্মান পাবার জন্য দেল্যান্দ বণিক গ্রেগয়ার বুতেকে মুখসুদাবাদ-এ পাঠান[১৪]। তখনই কথা হয়ে গিয়েছে যে এই ফার্মানের জন্য নগদ চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে কিস্তিবন্দীতে কয়েক বছর ধরে। ১৬৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে দেল্যান্দ বাংলা থেকে লিখছেন যে তিনি ফার্মান পেয়ে গিয়েছেন। মার্তা ভেবেছিলেন যে চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে। কিন্তু ফার্মান-এর মধ্যেই এই চল্লিশ হাজার টাকা দেবার উল্লেখ আছে— এমন কি কোন কোন সময়ে কত টাকা দিতে হবে তারও উল্লেখ আছে। সুতরাং মার্তাঁ ভেবেছিলেন এটা সহজেই বলা যায়[১৫]।

ফার্মানটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ৩৬তম বছরে ২৬ জুমাইদওয়াল-এ দেওয়া হয়। ওলন্দাজদের মত ফরাসীরা শতকরা সাড়ে তিনভাগ শুল্ক দেবে কিন্তু অন্যান্য কর-এর বদলে তাদের দিতে হবে চল্লিশ হাজার টাকা[১৭] এটির পরেই ও এর ফলেই আসে মুখসুদাবাদ থেকে নবাব ইব্রাহীম খানের পরওয়ানা যার তারিখ হচ্ছে ৩৭তম বছরের তিন রবিওস সাওয়াল[১৮]। এ প্রসঙ্গে ইংরাজ ভ্রমণকারীদের উপর ভিত্তি করে অঞ্জলি চ্যাটার্জী যা লিখেছেন সেটা গ্রহণ করা যায় না[১৯]।

ফার্মানটিতেও সমস্যা কমে না। প্রথমতঃ ফার্মানটির তারিখ ইংরাজীতে হবে ১৬৯৪ ও পরওয়ানার তারিখ হবে ১৬৯৫ সাল। কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যে, ১৬৯৩ সালে দেল্যান্দ জানাচ্ছেন যে তিনি ফার্মানটা পেয়েছেন। অর্থাৎ ফার্মানের তারিখের দু'বছর আগেই তিনি ফার্মান পাচ্ছেন। এছাড়াও সমস্যা হল যে বাংলার

রাজধানী তখনো পর্যন্ত ঢাকাতেই রয়েছে। সুতরাং বণিক বুতে মুখসুদাবাদে গেলেন কেন ও মুখসুদাবাদ থেকেই বা ঐ ফার্মান বেরোল কেন সেটা জানা দরকার।

প্রথম সমস্যার উত্তরে বলা যায় ১৬৯০ সালের আগেই সম্রাট ফরাসীদের একটি ফার্মান দেন যার ফলে নবাব ১৬৯০ সালে পরোয়ানা দেন। আমরা আগে এটির আলোচনা করেছি। অতএব মনে হয় যে, দেল্যান্দ যে ফার্মানটি পাওয়ার কথা বলছেন সেটি এই ফার্মান যেটি ১৬৯০ সালের আগেই দেওয়া হয়েছিল। তারপরও অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায় যে ফার্মানটি হাতে পেতে কি তিন বছর লাগতে পারে?

দ্বিতীয় সমস্যাটা আরো কঠিন। আবদুল করীম ও যদুনাথ সরকার[৩০] লিখছেন যে মুর্শিদকুলী খান মুখসুদাবাদে দপ্তর সরিয়ে নিয়ে ঐ জায়গাকে মুর্শিদাবাদ বলা হতে থাকে। কিন্তু আমরা দেখছি যে নবাব ও দেওয়ান মুখসুদাবাদে আছেন মুর্শিদকুলীর বাংলায় আসার প্রায় দশ বছর আগে। অতএব মুর্শিদকুলী ঝগড়া করে হঠাৎ মুখসুদাবাদে চলে এলেন এটা নিতান্তই কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হয়। মোঘল যুগে নবাব ও দেওয়ান যেখানে থাকবেন সেটাই সবার কেন্দ্রস্থল এবং কিছুদিনের মধ্যে ঐ জায়গার বিকাশ ঘটতে থাকে কারণ অভিজাত ও বণিকরা এসে ভীড় জমায়। সুতরাং বলা যায় যে মুর্শিদকুলীর আগেই মুখসুদাবাদ অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্য সুবার কেন্দ্র হয়েছিল।

আমরা দেখেছি যে, দুপ্লেসিস জমি কেনা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ঐ সময়ে সম্রাট কোন ফার্মান দেননি। বোধহয় নবাব শায়েস্তা খান নিজের দায়িত্বে পরোয়ানা দিয়েছিলেন যার ফলে ফরাসীরা জমি পায় ও সেটি পরে হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৬৯০ সালের আগে সম্রাট ফরাসীদের ফার্মান দেন (এটিও পাওয়া যায় নি) যার ফলে নবাব ইব্রাহীম খান পরোয়ানা দেন। এরই সুযোগে ফরাসীরা সম্ভবত ঐ পুরনো জায়গা কিনে নেয়। জমি কেনা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই কারণ কাজীর সীলমোহর করে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ পরোয়ানায় আছে। ১৬৭৩-৭৪ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে (১৬৯৪-৯৫) ফরাসীরা অন্তত দুটো ফার্মান ও তিনটে পরোয়ানা পেয়েছিল যার উল্লেখ ফরাসী চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং এ প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র রায়, হরিহর শেঠ, অঞ্জলি চ্যাটার্জী ও ইন্দ্রাণী রায়-এর মতামত পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা আছে[৩১]।

সূত্র নির্দেশ

(১) সুরাট থেকে চিঠি, পয়লা এপ্রিল ১৬৬৬, বুলোইয়া ল্য গুজ এর লেখা (**ফরাসী মহাফেজখানা**, কলোনী সি (২) ৬৪, পৃঃ ৪-৬) (এখানে শুধু **মহাফেজখানা** বলা হবে।)

(২) সুরাট থেকে লেখা ১০ই মার্চ ১৬৬৮, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার-এর লেখা (আমার ইংরাজী অনুবাদঃ মেময়ার্স দ্য ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ, কলিকাতা, ১৯৯০। পৃঃ ৫৪৬-৫৬৬।

(৩) ১৬৬৫ সালে লেখা (ইংরাজী অনুবাদ, দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৫৩৯-৫৪৩)।

(৪) ফরাসী জাহাজ 'ফ্লামান্ড' (ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ : **মেময়ার্স**। প্যারিস, তিনখণ্ড, ১৯৩১-৩৪, প্রথম খণ্ড, ৫৩৯-৪১ (ফরাসী), সি ফসেট (সম্পা) : **ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন ইন্ডিয়া**। অক্সফোর্ড, ১৯৫২, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬৩, ইংরাজরাও টাকা ধার দেয়। এখানে মেময়ার্সকে সংক্ষেপে মার্তাঁ বলা হবে।

(৫) ঐ দ্যপ্লেসিসের চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি জমি দখল করেছিলেন (মার্তাঁ দ্বিতীয় ৫ ৬)।

(৬) মার্তাঁ প্রথম ৫৪১ (১৬৮৪ সালে লেখা)।

(৭) ঐ দ্বিতীয় ৩৬৫ ৬৭ ৩৭১ ৭৯ ৩১৫।

(৮) ঐ ৭২২। বর্নাড ও দাগুইনে বা লায় ৩০।

(৯) ঐ।

(১০) মহাফেজখানা বেঙ্গল থেকে বর্নাড এর চিঠি ৭ই এপ্রিল ১৬৮৭ পৃ ৫১ ৫২।

(১১) ঐ। মার্তাঁর চিঠি সুরাট থেকে ২৬ এপ্রিল ১৬৮৩। পৃ ৬৬ ৬৬খ। মার্তাঁর **মেময়াস** থেকে জানা যায় যে প্যারিস বাংলায় বাণিজ্য অনুমোদন করেছিল (দ্বিতীয় ৫৮১)।

(১২) যদুনাথ সরকার (সম্পা) **হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল** ঢাকা ১৯৭২ দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩ ৮৬। **মার্তাঁ** দ্বিতীয় ৪৬৪ ৬৫।

(১৩) মার্তাঁ দ্বিতীয় ৫৬১।

(১৪) **মার্তাঁ** ৫৬১ এছাড়া সুরাট থেকে লেখা চিঠি ২৮শে এপ্রিল ১৬৮৮ (**মহাফেজখানা**, কলোনী সি (২) ৬৩ পৃ ১২৪খ ১২৩)।

(১৫) পল কেপল্যান ° **লো কোম্পানী দেস অ্যান্দ ওরিয়েন্তাল** প্যারিস ১৯০৮ ১৯৯ ২০৬।

(১৬) **মার্তাঁ** দ্বিতীয় ৬০।

(১৭) **বিবলিওতেক নাশিওনাল** প্যারিস (এখন থেকে **বি এন**) মেময়াস ১৭২০ (ফন্দ ফ্রাঁসেজ ৬২৩১) পৃঃ ১৮।

(১৮) **বি এন**। নভেল একি ফ্রান্সেজ ৯৩৬৭ মেময়াস পৃ ১২ ১৩ ফরাসী অনুবাদের জন্য দেখুন দাবাক এর লেখা মেময়াস দ্য এশি (**মহাফেজখানা** কলোনী সি (২) ১১৫ পৃ. ১৪)

(১৯) **বি এন** ৯৩৬৭ পৃঃ ১০

(২০) ঐ

(২১) এস মাস্টার ডায়েরিস (টেম্পল সম্পাদিত) প্রথম খণ্ড ৩২৫ ২৯ এছাড়া সি ফসেট (সম্পা) **ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ইন ইন্ডিয়া** উল্লিখিত দ্বিতীয় ৩৮০।

(২২) হরিহর শেঠ **সংক্ষিপ্ত চন্দননগরের পরিচয়** চন্দননগর ১৯৬৩ ইন্দ্রাণী রায় এর প্রবন্ধ চন্দননগরের আদিপর্ব (**জিজ্ঞাসা**, ১৩৮৮ দ্বিতীয় বর্ষ দুই নম্বর ১১ ১২)।

(২৩) ১৫ই নভেম্বর ১৬৭৪ এর মধ্যে দ্যপ্লেসিস বাংলা ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন।

(২৪) **বি এন** ৯৩৬৭ পৃঃ ১৩ ১৪

(২৫) **মার্তাঁ**, দ্বিতীয় ৯৩ ৯৪

(২৬) দেল্যান্দ-এর চিঠি হুগলী থেকে লেখা ২০ জানুয়ারী ১৬৯৩ (**মহাফেজখানা** কলোনী সি (২) ৬৪ পৃ° ১০২ ৪) **মার্তাঁ**, তৃতীয় ২০১ ও ২৭১)।

(২৭) **বি এন** ৯৩৬৭ পৃঃ ১৬ ১৭।

(২৮) দ্যাবাক উল্লিখিত পৃ ১৬ ১৭ ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যাবে **ভারতের জাতীয় মহাফেজখানাতে** রক্ষিত ফরেন এ্যান্ড পলিটিকাল ২১ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৭৭৭ নং ১০ পৃঃ ৫২ ৬৮।

(২৯) অঞ্জলি চ্যাটার্জী টমাস বাউরী ও উইলিয়াম হেজেসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে লিখেছেন (**বেঙ্গল ইন দ্য রেইন অফ আওরঙ্গজেব** কলিকাতা ১৯৬৭ ১৯৭)।

(৩০) আবদুল করীম **মুর্শিদকুলী খান এ্যান্ড হিস টাইমস** ঢাকা, ১৯৬৩, ২১-২২, যদুনাথ সরকার (সম্পা), **উল্লিখিত**, ৪০৮।

(৩১) চারুচন্দ্র রায়-এর প্রবন্ধ 'নোটস অন দ্য হেডকোয়ার্টারস অফ দ্য ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এটহুগলী (**বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট**, ১৯১১, নং ৭)। অন্যান্যদের লেখা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সরস্বতীর ধারায় বাংলার জীবনভাষ্য

জিয়াউল হক্ ও সুলেখা মুখার্জী

প্রাচীন বাংলা এবং বাঙালীর জীবন কৃষ্টির উৎসরণে সরস্বতী নদীর অবদান—এক কথায় অপরিমেয়। প্রাচীনকাল থেকে এই নদীর প্রবাহপথ সম্বন্ধে আমরা দেশী এবং বিদেশী সাহিত্যিক উপাদান থেকে অবগত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, সাহিত্যিক ও অন্যান্য উপাদান থেকে যে সকল জনপদের হদিস আমরা পাই—তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগের আদিপর্ব থেকে (দ্বাদশ ত্রয়োদশ) সরস্বতী নদীকে কেন্দ্র করে যে কোলাহলপূর্ণ জনসমাগম হয়েছিল—তা কয়েক শতক ধরে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক অথবা যে কারণেই হোক নদীটি গতি পরিবর্তন করলে এই জনপদগুলির ক্ষয় শুরু হয়।

সরস্বতীর ধারাপথে যুগ যুগ ধরে জনজীবনের যে প্রবাহ তার সাথে আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসের সঠিক মেলবন্ধন অনেকক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এই নদী অববাহিকায় প্রবাহিত জনজীবন আমাদের সংরক্ষিত হিসাবের সময় তালিকার ক্ষেত্রে অনেকাংশে ব্যতিক্রম, এমনকি অজানিতও বটে। সে কারণেই প্রত্নবিজ্ঞানের নিরিখে ইতিহাসচর্চা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্যিক উপাদান থেকে আমরা সর্বদা নির্ভুল তথ্য পাই না, সঠিক ইতিহাসচর্চায় এই উপাদান অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে প্রত্নবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরপেক্ষ ও সঠিক তথ্য প্রদান করে যা নির্ভুল ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে সম্পূর্ণভাবে আমাদের প্রত্নবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়।

বর্তমান ভাষ্যের মুল ভূমিকায় সরস্বতী নদী। প্রত্নবিজ্ঞান বা ইতিহাস গবেষণার সময়কাল নির্ণয় একান্তভাবে প্রয়োজন। কোন্ নদীর উৎপত্তির সময়কাল নির্ণয় কীভাবে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ভূতত্ত্ববিজ্ঞান দিতে পারে।

বর্তমান মগরা থানার অন্তর্গত ত্রিবেণীর কাছে উক্ত নদীর উৎসমুখ, অর্থাৎ গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গার সমান্তরালে বিভিন্ন বাঁক সৃষ্টি করে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। স্বাভাবিক প্রশ্ন ত্রিবেণীর পর থেকে গঙ্গার ধারা হাওড়ার বেতোড় (বেত) পর্যন্ত এবং ত্রিবেণী থেকে সরস্বতীর ধারা বেতোড় পর্যন্ত—কোনটি প্রাচীন ধারাপথ? গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহ পথে আমরা প্রাচীন বন্দরের কোন পরিচয় এখনও পর্যন্ত পাইনি।

অথচ সরস্বতীর ধারাপথে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও প্রাচীন নদীবন্দর হিসাবে সুপরিচিত। লে কর্ণেল ক্রফোর্ড এ সম্বন্ধে লিখেছেন - Satgaon (Seven villages) was one of the oldest cities of India and the ancient royal port of Bengal. তাহলে গঙ্গা-ভাগীরথী অপেক্ষা সরস্বতীর এই ধারাটিই কি বেশী প্রাচীন? বা গঙ্গা-ভাগীরথীর মূল স্রোতটি কি সরস্বতীর এই ধারায় বিলীন? সঠিক উত্তর অবশ্যই ভূবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আলোচিত হবে। এই নদীর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসের অনবদ্য অধ্যায় রচনার এক অপরূপ রূপকার।

ষোড়শ শতকে ডি. বারোসের নক্সায় এই নদীর অবস্থান এবং তৎকালে গঙ্গার ন্যায় গভীর ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর ভাগীরথীর গতি পরিবর্তন আরম্ভ হলে সরস্বতীর জলপ্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করে এবং তার ফলস্বরূপ এই নদী ক্রমশ শুষ্ক হতে আরম্ভ করে। জনবহুল সমৃদ্ধশালী সরস্বতীকেন্দ্রিক জনপদগুলির ধ্বংস হয়।

সরস্বতী অববাহিকায় অবস্থিত সপ্তগ্রাম বন্দবেব প্রকৃত অবস্থান, বিভিন্ন জনপদগুলির বিস্তার, ক্রমাবনতিব কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদেব ধারণা সীমিত। কারণ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অতীতের বর্ধিষ্ণু জনপদ ও বন্দরের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আজ পুরোপুরি অবলুপ্ত। তবুও ১৯৯১ সালে স্থাপিত 'হুগলী জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রে'র উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রত্নস্থল থেকে পর্যাপ্ত প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের ফলে সরস্বতী নদীকেন্দ্রিক জনপদ ও বসবাসকারীদের সম্বন্ধেও বহু নতুন তথ্য উদ্ভাসিত হয়েছে। নিম্নে আলোচ্য অংশে এই প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তুর বর্ণনা করা হল।

'সপ্তগ্রাম' বা 'সাতগাঁও' ছিল নদী তীরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। সেন বংশের রাজত্বকালে (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ) এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় বণিকেরা এই নদীটিকে 'সাতগাঁও রিভার' বলে বর্ণনা করেছেন। সপ্তগ্রাম সংবলিত জনপদটিই 'সপ্তগ্রাম'। উল্লিখিত সাতটি গ্রাম হল - বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর, খামারপাড়া (নিত্যানন্দপুর), কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর (সাম্বাচোরা), ত্রিশবিঘা (বলদঘাটি)। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীরা বঙ্গদেশে হানা দেয় এবং রুকনুদ্দীন কৈকায়ুমের রাজত্বকালে জাফর খাঁ গাজী (খ্রীঃ ১২৯১-১৩০১) সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী অধিকার করেন। এর পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনে সম্পন্ন হয়। ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সরস্বতী ক্রমশঃ শীর্ণকায়া হতে থাকে।

সরস্বতী অববাহিকায় 'ত্রিশবিঘা' হল হাওড়া-বর্ধমান (মেইন) রেলশাখার 'আদিসপ্তগ্রাম' নামক স্টেশন থেকে প্রায় ১ কি. মি. উত্তর, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের বামপার্শ্বেই অবস্থিত। এখানে একটি ছাদহীন ভাঙ্গা মসজিদ রয়েছে, এর ভিত্তি প্রস্তর ফলকে আরবী হরফে উৎকীর্ণ লেখনী থেকে জানা যায় যে, ৯৩৬ হিজিরায় (১৫৫৮ খ্রীঃ) রমজান মাসে আবু সৈয়দ ফারুকদ্দীন কর্তৃক নির্মিত। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁর বেগমের এবং খোজার সমাধি বর্তমান। এখানকার পোড়ামাটির অলঙ্করণ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

'ডিঙ্গলহাট' সরস্বতী অববাহিকায় অন্যতম প্রত্নস্থল যা সপ্তগ্রাম ইতিহাসে সমানভাবে সমৃদ্ধ। ব্যান্ডেল-বর্ধমান শাখার (মেইন) - রেলস্টেশন 'আদিসপ্তগ্রাম' থেকে প্রায় ৩

কি মি উত্তরে অবস্থিত। এই অঞ্চলটিতে গোপাল মণ্ডলের ইটভাটার মাটি কাটবার সময়ে বহু প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। লেখকগণ শ্রী শুভেন্দু মুখার্জী এবং আরও অন্যান্য সহযোগীদের প্রচেষ্টায় সেই সকল প্রত্নবস্তুগুলি সংগ্রহ করেন যা 'হুগলী জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রে'র সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, ত্রিশবিঘা ও ডিঙ্গলহাট একই প্রত্নসীমার অন্তর্গত। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিশবিঘা অঞ্চল থেকে এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি প্রস্তর সরস্বতী মূর্তি আবিষ্কার করেন, যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া হুগলী জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে উক্ত উভয় প্রত্নস্থল থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বা রঙের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, পোড়ামাটির অলঙ্করণ, পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত হাতল, গোলক, মাতৃমূর্তি, মিশ্রধাতুর প্রাচীন আরবী হরফে উৎকীর্ণ মুদ্রা (৩ সে.মি ডায়া), প্রস্তর মূর্তির ভগ্নাংশ, প্রস্তর খিলানের উপর খোদিত পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গীতে প্রাপ্ত মূর্তি, নৃত্যরত মূর্তি, প্রস্তর স্তম্ভ দৈর্ঘ্য - (১১'-৪"), বিষ্ণুমূর্তি অসংখ্য শঙ্খ, চীনা ও প্রটোবেঙ্গলী হরফে উৎকীর্ণ চীনামাটির পাত্র ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চীনামাটির পাত্রে উৎকীর্ণ 'প্রটোবেঙ্গলী'র উপর গবেষণালব্ধ মতামত ব্যাখ্যা করেছেন। চীনা অক্ষর উৎকীর্ণ পাত্রগুলি বৈদেশিক যোগাযোগ বা বাণিজ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় তেমনি প্রটোবেঙ্গলী উৎকীর্ণ পাত্রগুলি দেশীয় শিল্পের অবদানকে স্বীকার করে। তাছাড়া চীনামাটির তুলনায় মৃৎপাত্রের আধিক্য সমাজের ধনবৈষম্য ও জীবনযাত্রার মানের ইঙ্গিত দেয়। এই সকল উপাদান সমাজের সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের উন্নত রুচিশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়াও কাঁচের ভগ্নাংশ এবং প্রাপ্ত প্রস্তর স্তম্ভ ও খণ্ডগুলি সুদূর থেকে এই সরস্বতী পথে বাহিত হয়ে জনপদগুলিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল—তা সহজেই অনুমেয়।

সপ্তগ্রামের অপর একটি প্রত্নস্থল 'কৃষ্ণপুর'। হাওড়া-বর্ধমান (মেইন) রেলশাখার অন্তর্গত 'আদিসপ্তগ্রাম' স্টেশন থেকে প্রায় ২ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে উদ্ধারণ দত্তের একটি শ্রীপাট রয়েছে। স্থানীয় প্রত্নবস্তু সংগ্রাহক শ্রী প্রভাস চন্দ্র পাল এখানকার একটি প্রাচীন কূপ থেকে বেশ কিছু প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেছেন। "........ অনুশীলনকেন্দ্র" —এই স্থান থেকে পোড়ামাটির বিভিন্ন অলঙ্করণ, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, পোড়ামাটির গোলক, পোড়ামাটির মূর্তি এবং মূর্তির ছাঁচ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেছেন।

'সুদর্শন' প্রত্নস্থলটি পোলবা থানার অন্তর্গত। হাওড়া-বর্ধমান (মেইন) রেল শাখার অন্তর্গত 'পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে (পোলবা-পাণ্ডুয়ার) সড়ক পথে ৮ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানটি থেকে মায়াদেবীর প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভারতীয় যাদুঘরে (কলিকাতা) সংরক্ষিত রয়েছে। ..... অনুশীলন কেন্দ্রের অনুসন্ধান কার্যের সময় হর-পার্বতীর মূর্তির ভগ্নাংশ, বৃক্ষের কোটরাগত পাথরের বিষ্ণুচক্র (অনুমেয়), মেঘবরণ দীঘির পাড়ে প্রচুর মন্দির স্থাপত্যের প্রস্তরখণ্ড লক্ষ্য করে।

'মহানাদ' প্রত্নস্থলটি পোলবা থানাব অন্তর্গত। পূর্বোক্ত পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে ৬ কি.মি দক্ষিণে পোলবা-পাণ্ডুয়া সড়কপথে অবস্থিত। বহু প্রাচীনকাল থেকে মহানাদের জনবসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কুষাণ ও গুপ্তযুগ থেকে (খ্রীঃ দ্বিতীয় শতক থেকে মধ্যযুগের ১১।১২ শতক পর্যন্ত) এক জনবহুল জনপদ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় প্রত্নসংরক্ষণের পূর্বশাখার তৎকালীন অধ্যক্ষ এন. জি. মজুমদারের নেতৃত্বে ১৯৩৩ সালে খননকার্য পরিচালিত হয়। বর্তমানে এখানে অবস্থিত জটেশ্বরের মন্দির (অষ্টাদশ শতক অনুমেয়), যদিও সংরক্ষণের অভাবে প্রাচীন স্থাপত্য রীতির চিহ্ন লুপ্ত। মন্দিরের সামনে একপদ ভৈরবী দণ্ডায়মান মূর্তির চারপাশে ছড়িয়ে আছে মন্দির স্থাপত্যের অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড। জটেশ্বরনাথের নিকটেই ঝাপতলায় অনেকগুলি ছোটখাট মন্দির আছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্নপূর্ণার মন্দিরের অভ্যন্তরে দুটি শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি। এখানে ব্রহ্মময়ীর মন্দিরটি ১২৩৬ সনে কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কর পরিবারে সংগৃহীত রয়েছে পাথরের মনসামূর্তির ভগ্নমাথা ও শ্লেটপাথরের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির ভগ্নাংশ। এখান থেকেও প্রাক্ মধ্যযুগের কিছু প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে।

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত 'দ্বাববাসিনী' প্রত্নস্থলটি পাণ্ডুয়া থেকে ১০ কি.মি. দূরে কেদারমতী নদীর বামতীরে অবস্থিত। এখানে প্রস্তরের যোগাসনে বসা মূর্তির নিম্নাংশ, আসনের নিচে খোদিত যুক্তহস্তে ভক্তের মূর্তি, সিংহের মূর্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

পৃথিবীর যে কোন সভ্যতাই গড়ে ওঠার ইতিহাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, নদীকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে উক্ত জনপদগুলি সরস্বতী নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল—তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই জনপদগুলির ইতিহাস সাধারণ পাঠক ও ইতিহাস গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য 'হুগলী জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রে'র প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ কার্য সত্যই প্রশংসাব দাবি রাখে। গতানুগতিক ইতিহাসের চিন্তাধারার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে .... অনুশীলন কেন্দ্রের নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন ও কৃষ্টির ইতিহাসের ভাষ্য একদা সমৃদ্ধশালী সরস্বতীর দুই কুল ধরে উচ্চারিত হয়েছিল, তা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়, সেদিনের সেই মুখর ভাষ্য— আজ যা মৌনতায় স্তব্ধ—তাকেই ধ্বনিত করতে চাই।

সূত্র নির্দেশ

১। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড) — সুধীর কুমার মিত্র. ১৯৬৩
২। সপ্তগ্রামের ইতিকথা — নিতাই ঘোষ. ১৯৯৫
৩। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি — নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য. ১৯৯৩
৪। প্রত্নসমীক্ষা (ভল্যুম ২ ও ৩), রাজ্য প্রত্নবিভাগ, পঃ বঙ্গ ১৯৯৫।
৫। 'গণশক্তি' (১৪ই মে '৯৫) জিয়াউল হক্ ও সুলেখা মুখার্জী।
৬। BLAKISTON J. F. (Ed) ANNUAL REPORT OF THE A.S.I. 1934-35. DELHI-1937.
৭। BENGAL PAST AND PRESENT (1909)
৮। HOOGHLY DISTRICT GAZETTEERS.

মেদিনীপুরের লোকধর্মাচরণে মূর্তি ও প্রতীক

রাজর্ষি মহাপাত্র

মেদিনীপুরের লোকধর্মাচরণে মূর্তি ও প্রতীক আলোচনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। সেই সূত্রে মেদিনীপুরের লোকধর্মাচরণে মূর্তি ও প্রতীকের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান বহুকাল থেকে যে প্রবহমান তা লোকধর্ম অনুসন্ধানকারীদের অজানা নয়। বর্তমান আলোচনাকে দুটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করা হল।

প্রথম পর্ব

শাস্ত্রীয় ধর্মের আবির্ভাবের শুরু থেকে সাধারণের দ্বারা পালিত ধর্মই লৌকিক প্রভাবে আজও লোকধর্মের পরিচয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত। সাধারণের দ্বারা সাধারণভাবে এটি প্রচলিত হয়। এ ধর্মে দেব-মাহাত্ম্যের প্রভাব থাকলেও সামাজিক প্রয়োজনে এ ধর্মের উৎপত্তি। নৃ-বিজ্ঞানী টাইলর বলতে চেয়েছেন, Systems of beliefs, emotional attitudes and practices, by means which a group of people attempt to scope with the ultimate problem of human life.[২]

লৌকিক ধর্মে যেসব দেবদেবীর পুজো হয় তাঁরা বেশীরভাগই সর্বজনীন। আবার অনেক দেবদেবীর পুজো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এখন আমরা কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে আলোচনা করছি যাদের লোকধর্মাচরণে সামাজিক মূল্য যথেষ্ট রয়েছে।

ভাদুঃ ভাদুর আকৃতি অতি সুশ্রী। বর্ণ ঘন হরিদ্রা। মূর্তি সাধারণত দু'ফুটের বেশী উচ্চ হয় না। সর্বদা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট। টানা টানা দুটি চোখ, কপালে লাল টিপ, মাথায় শোলা বা রাংতায় তৈরি বেশ বড় মুকুট। রঙিন শাড়ি বা ঘাগবা, ফুলকাটা বক্ষ-বন্ধনীপরা। দুটি হাত, একহাতে মন্ডা বা সন্দেশ, অন্য হাতে ধানের শিষ কিংবা একটি পান। ভাদুপুজো বলতে নৃত্যগীতের উৎসব। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন ঐ উৎসব আরম্ভ হয়, সমাপ্তি ঘটে সংক্রান্তির দিন। ভাদু উৎসবে কুমারীদের প্রাধান্য দেখা যায়। সীমান্ত বাঙলার আদিবাসীদের ও বারাঙ্গনাদের মধ্যে ভাদুগানের অধিক প্রসার দেখে কোন কোন মত হল 'ভাদু উৎসব' আদিতে মদনোৎসব বা ঐ জাতীয় কোন নর-নারীর অবাধ মেলামেশার পার্বণ। বাউরী, বাগ্দীরাই এঁর বিশেষ ভক্ত। মেদিনীপুর জেলার শিলদা, বিনপুর, বেলপাহাড়ী, চিচড়া ও ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে ভাদু পূজোর প্রচলন লক্ষণীয়।[৩]

টুসুঃ মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশে টুসু পার্বণের বেশ ঘটা হয়। টুসুর মূর্তি অনেকটা দেবীলক্ষ্মীর মত। রঙ হলদে মাথায় রাংতার মুকুট। দুই হাতে দুটি পদ্মফুল, সারা অঙ্গে নানারকম গয়না। মাথার পেছনে প্রভামণ্ডল। টুসুদেবীকে দণ্ডায়মানই দেখা যায়, উচ্চতায় একফুট। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি রাত থেকে এঁর পূজো ও উৎসব আরম্ভ হয়। সারা পৌষ মাস চলে - ঐ মাসের সংক্রান্তির দিন তার সমাপ্তি হয়। গ্রামগত ভাবে পূজিত হন। বারোয়ারী তলার বেদী বা মণ্ডপের উপর ছোট চৌকি বা কাঁসার থালার উপর টুসুর মূর্তি স্থাপন করা হয়। সন্ধের পর কুমারী মেয়েরা টুসু পুজো করতে বারোয়ারী তলায় সমবেত হয়। গানও করে। কোন বাড়িতে এককভাবেও টুসু পুজো হচ্ছে এও দেখা যায়।"

সিনিঃ মেদিনীপুর জেলায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু ও আদিবাসী প্রধান অঞ্চলে সিনি দেবতার পুজো প্রায় সকল গৃহস্থই করে থাকেন। ভক্তদের বিশ্বাস ইনি গ্রাম রক্ষয়িত্রী, শস্যদাত্রী, দয়াবতী বৃদ্ধা। বেলপাহাড়ী ও গড়বেতা অঞ্চলে সিনির যেরূপ ব্যাপক খ্যাতি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিনিদেবীর মূর্তি নেই। মন্দির বা কোন চালাঘরেও বড় একটা থাকেন না। এঁর প্রতীক হিসেবে পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতিই প্রায় সর্বত্র পূজিত হয়। ইনি প্রায় সর্বত্রই বৃক্ষতলে অধিষ্ঠান করেন। মাত্র দু'একটি ক্ষেত্রে এঁর প্রস্তর প্রতীকও দেখা যায়। একটি অমসৃণ প্রস্তর খণ্ডের উপর পুজোর সময় হাতি, ঘোড়াতে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়। পুজো হয় গ্রামগতভাবে এবং পুজো আরম্ভ হয় বেলা দ্বিপ্রহরে। সিনি পুজোর বিশেষ কোন মন্ত্র আছে বলে মনে হয় না। সর্বাপেক্ষা সমারোহ এবং বহু ভক্তজনের সমাগম হয় মেদিনীপুর জেলার বিনপুর ঘাগরা গ্রামের (বেলপাহাড়ীর নিকট তারা-ফেণী নদীতীরস্থ) পুজোয়। উল্লেখ্য, কোন কোন জায়গায় সিনিকে 'সুনি'ও বলা হয়।"

ধর্মঠাকুরঃ এ জেলায় ভাদ্রমাসে ধর্মপুজোর উৎসব ও মেলা হয়। ধর্মরাজের সেবাইতরা সাধারণত ডোম সম্প্রদায়ের লোক। অনেক সময় ব্রাহ্মণরাও পুজো করেন। এ জেলার ঘাটাল মহকুমায় বা সদর মহকুমায় ব্যাপক ধর্মপুজোর প্রচলন দেখা যায়। সাধারণত ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি বা প্রতিমা নেই। একখণ্ড প্রস্তরই এঁর প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়। এ ঠাকুরের প্রতীক প্রস্তরখণ্ডগুলি গ্রামের নির্জন গাছের তলায় অবহেলিত অবস্থায় থাকে। অবশ্য ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দিরও আছে অনেক। খরা বা মড়ক দেখা দিলে গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে পুজো করতে শুরু করেন। কখনও কখনও স্থায়ী মন্দিরে অবস্থিত ধর্মঠাকুরের প্রতীক শিলাখণ্ডগুলি এনে দুপুরের রোদে কিছু সময় রাখা হয়। উদ্দেশ্য এভাবে দেবতাকে মন্দিরের বাইরে এনে বোঝানোর চেষ্টা করানো হয় যে অনাবৃষ্টির জ্বালা কত প্রখর তা দেবতা নিজে উপলব্ধি করুন।

মেদিনীপুর জেলায় ধর্মঠাকুর তিনভাবে পূজিত হন— গৃহদেবতারূপে, গ্রামের দেবতা হিসেবে, বাৎসরিক পূজা হিসেবে।[৬]

রঙ্কিনীঃ জামবনির চিলকি গড়ে বিখ্যাত রঙ্কিনী দেবী আছেন। চন্দ্রকোণায় মৌলা গ্রামে এই দেবীর থান আছে। কোন দেবালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন। রঙ্কিনী দেবীর মূর্তি কিছু নেই। মাটির হাতি ঘোড়া ইত্যাদি সিঁদুর লেপা রয়েছে। কালীর ধ্যানে তিনি পূজিত হন। গড়বেতা, শিলদাতেও রঙ্কিনী দেবীর অস্তিত্ব লক্ষণীয়, এছাড়া কর্ণগড়েও এর পুজোর প্রচলন আছে, নন্দীগ্রাম থানায়ও একটি মৌলা গ্রাম আছে সেখানেও রঙ্কিনী দেবী আছেন।[৭]

কালুবীরঃ বিখ্যাত গ্রাম দেবতা। তিনি ধর্মঠাকুর অনেকে মনে করেন। মেদিনীপুরের জাড়াগ্রামে এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কালুবীরের মূর্তি অনেকটা মানুষের মাথার মত। কোনো কোনটির বুক, পেটও স্পষ্ট। 'পাথারা' গ্রামে কালুবীরের মুণ্ডমূর্তি ডোমদের দ্বারা পূজিত হয়। এছাড়া অনেক জায়গায় শিলাতে খোদিত আকারে রয়েছে হাঁটুমুড়ে বাঁহাতে ঢাল ডান হাতে খোলা তলোয়ার। কালো পাথরের ওপর এই মূর্তি খোদিত। কালুবীরের পুজোবিধি সর্বত্র সমান নয়। নিত্যপুজোর চল নেই সর্বত্র। পাথরায় পুজো হয় তিনদিন। শেওড়া ফুলে কালুবীরের পুজো হয়। শেওড়ার একটি করে ডাল অনেকে গুঁজে দেন বাড়ির ঈশান কোণে। তাঁদের বিশ্বাস বজ্রপাত হবে না এ ডাল রাখলে, ঘরের চাল উড়বে না কালবৈশাখীতে। জাড়াগ্রামে একসময় জমাটি উৎসব হত। এখন আর পুজোয় তেমন লোকও আসে না। কেউ কেউ দূর থেকে আসে শুধু চর্মরোগের ওষুধ নিতে।[৮]

পুটুবুড়াঃ শালবনী থানার গোদা-মৌলি গ্রামের গ্রামদেবতা পুটুবুড়া। গ্রামের এক বাঁশবাগানের মাঝে পুটুবুড়ার থান। কোনো মূর্তি নেই। তাঁর প্রতীক কয়েক হাজার নতুন-পুরনো আস্ত ভাঙা হাতি-ঘোড়া। পশ্চিম দিকে মুখ করে তিনি বর্তমান। পুজো পান না প্রতিদিন। পুজো পান সারা বছরে একদিন — ৭ই মাঘ এইদিন গোদা-মৌলিতে মেলাও বসে। পুজোর কোনো মন্ত্র নেই। পুজো চলেছে ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরে। পুজো করেন মূলত সাঁওতালরাই, তবে অন্যান্যদের মধ্যে মাহাতো, মাঝি, বৈষ্ণব এবং অন্যান্য সব জাতির লোক। গ্রামবাসীদের ধারণা তিনি গরু-বাছুরের রোগ সারান সবরকমের।. পূজারী দাবী করেন পুটুবুড়া তাঁদের পূর্বপুরুষ[৯]।

ভানসিংঃ এঁর একটি উল্লেখযোগ্য থান হল কেশপুর থানার নতুন বাজার। এই ঠাকুরের মূর্তি কোথাও নেই। তাঁর প্রতীক পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া। এঁর নিত্যপূজা হয় না। প্রত্যেক ভক্তই ঠাকুরকে পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া উপহার দেয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ ভিন্ন প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই এঁর পুজো দেয়। তবে প্রধান উপাসক ভূমিজ, মাল, মালপাহাড়ী, ভুঁইয়া, কুর্মী, মুণ্ডা,

সাঁওতাল, কেড়ো, খয়রা প্রভৃতি জাতির লোকেরা। ভানসিং গ্রামদেবতা। সাধারণতঃ বন্ধ্যাত্ব, মড়ক, মহামারী ও গরু ভেড়ার রোগ নিবারণার্থে তাঁর পুজো। তবে মানুষের কুষ্ঠাদি কঠিন রোগ নিরাময়েও তাঁর যথেষ্ট সুনাম।[১]

গরামঠাকুরঃ মেদিনীপুরের বিনপুর, বাঁশপাহাড়ী, ঝাড়গ্রামে এঁর থান দেখা যায়। ইনি অনুন্নত সম্প্রদায়ের গ্রামদেবতা। মূর্তি বলতে হাতি, ঘোড়া পোড়ামাটির এবং গাছকেও অনেক সময় প্রতীক হিসেবে পূজিত হতে দেখা যায়। শিলাখণ্ড, মাটির ঢিপিও পূজিত হয় কোন কোন সময়। এঁর নিত্য পুজো হয় না, তাঁর পুজোর সুনির্দিষ্ট দিন মাত্র একটি—১লা মাঘ। সাঁওতাল ছাড়াও কিছু উপজাতি এঁর পুজো করে। নান্দারিয়া, বাঁশপাহাড়ী, বিনপুরে মেলাও বসে। ভক্তরা বলেন গরামঠাকুর বিশ্বস্রষ্টা ও গ্রামরক্ষক[১১]।

কুদরাঃ এ জেলার ঝাড়গ্রাম, নবকোলা (গড়বেতা থানা), গড়বেতা, শিলদা (বিনপুর থানা), রামগড়, লালগড়, গোয়ালতোড় ইত্যাদি জায়গায় কুদরা দেবতার থান দেখা যায়। কুদ্রা হলেন প্রভাবশালী গ্রামদেবতা। কোথাও কুদরার মূর্তি বা মন্দির নেই। কুদরার উপাসনা করে সাধারণত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ—উপজাতি বা তপশিলী সম্প্রদায়ের লোক। এবং কিছু বর্ণহিন্দু। কুদরার পূজারী অধিকাংশ স্থানেই অব্রাহ্মণ বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ।[১২]

পঞ্চানন্দঃ মেদিনীপুর শহর, খড়্গপুর, চন্দ্রকোণা, শ্রীরামপুর, পিঙ্গলা, কেশপুর, ঘাটাল, দাঁতন, নারায়ণগড়, খেজুরী, পাঁশকুড়া, তমলুক প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন গ্রামে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের থান দেখতে পাওয়া যায়। এই সব অঞ্চলে পঞ্চানন্দের তিন রকমের মূর্তি বা প্রতীক দেখা যায় (১) হাতি-ঘোড়া ও কোথাও কোথাও হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে একখণ্ড কালোপাথর, (২) মুণ্ডমূর্তি ও (৩) অশ্বারূঢ় পুরুষমূর্তি। পঞ্চানন্দের বাহন ঘোড়া। এঁর পুজো দেয় ব্রাহ্মণ থেকে বাগ্দী-সকল জাতির লোক। সাধারণের ধারণা পঞ্চানন্দ সন্তানদাতা ও সন্তানরক্ষক দেবতা।[১৩]

বড়ামঃ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার অসংখ্য জায়গায় বড়ামদেবী সাড়ম্বরে পূজিত হন। বড়াম গ্রাম দেবী, লৌকিক দেবী। এঁর মন্দির নেই। তিনি তিন অবয়বে সাধারণের কাছে পূজিত হন—(১) ছোট বড় পাথরের খণ্ড, (২) পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, (৩) সাম্প্রতিককালে বড়াম দেবীর মৃন্ময়ী পূর্ণাবয়ব নারী মূর্তি তৈরি হচ্ছে। বড়ামের উপাসক আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়। আদিবাসীদের বড়াম পুজোয় কোন মন্ত্র নেই। অনেক উপাসকে বিশ্বাস বড়াম পশুদেবতা, তিনি বন্যজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। সম্প্রতি ব্রাহ্মণরা এঁর পুজোতে পৌরোহিত্য করেন।[১৪]

কালষণ্ডাঃ এ জেলার শালবনী থানার দেউলী গ্রামের এক গ্রামদেবতা। গ্রামের বটবৃক্ষতলে এই ঠাকুরের নির্দিষ্ট থান আছে। গ্রামে প্রতি বছর মাঘ মাসে 'কালষণ্ডার পর্ব' অনুষ্ঠিত হয়। কালষণ্ডার কোন মূর্তি নেই। এই ঠাকুরের মেলা মাঘ মাসে একদিন বসে।[৭]

ফুলমণিঃ মেদিনীপুর থানার এল্লাবনী গ্রামে ফুলমণি দেবীর থান। গ্রামে বটগাছের নীচে ফুলমণিদেবীর শিলামূর্তি আছে। ইনি বনদেবীরূপে পূজিতা। প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ গ্রাম্যদেবী ফুলমণি দেবীর বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মেলাও বসে।[৮]

চন্দ্রগোলঃ কাঁথির খেজুরী থানায় মৌহাটি গ্রামে এই দেবতার থান আছে। এঁর মূর্তি নেই। পুজোর সময় ঘট পাতা হয়। সন্ধ্যার আঁধারে এঁর পুজো হয়। পুজো হয় শনি, মঙ্গল ও অমাবস্যায়। পূজারী বলতে নির্দিষ্ট কেউ নেই। দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুরের এক বৃহৎ অঞ্চলে চন্দ্রগোল পরম শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসে পূজিত হন। সাধারণের মনে চন্দ্রগোলের পূজার্চনায় আছে এক শ্রেণীর যাদুবিশ্বাস।

বীরঝাপটঃ কেশপুর থানার আনন্দপুরে ও নূতনবাজার গ্রামে দেবীর শিলামূর্তি একটি বাঁধানো বেদিতে স্থাপিত। গ্রামের হাড়ী সম্প্রদায়ের মানুষরা এঁর উপাসক ও পূজারী। তার নিত্যপুজো হয় না। দেবীর বার্ষিকী পুজো হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। তিনি গ্রামের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করেন। রাত্রে গ্রাম পাহারাও দেন।

গুপ্তমণিঃ ঝাড়গ্রাম থানার এক ক্ষুদ্রগ্রামের গ্রামদেবী। দেবীর নামেই গ্রামের নাম। এখানে গুপ্তমণির পাথরের মূর্তি আছে প্রায় দেড় ফুট উঁচু এক কালো পাথর। এতে আঁকা আছে দশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তিটি ছাড়া থানে আছে অসংখ্য পোড়ামাটির ছোট-বড় হাতি-ঘোড়া। দেবীর প্রস্তর মূর্তিটি যে পরবর্তীকালের সংযোজন তাতে কারো সন্দেহ নেই। দেবীর নিত্য পুজো। পুজো করেন গ্রামস্থ 'লোধা' পদবীর তপশিলী জাতির লোকেরা। এছাড়া অন্যান্য সব জাতির লোকই দেবীর পুজো দেয়। গ্রামের লোকের বিশ্বাস এঁর পুজো দিলে পথ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। দেবী গ্রামের রক্ষাকারিণীও।[১১]

চমকাইমাঃ কাদড়ার গ্রামদেবী। থানা গড়বেতা। এঁর কোন মূর্তি নেই। প্রতীক একটি সুপ্রাচীন শিলা। সমগ্র শিলা সিন্দুরে রঞ্জিত। পুজো দেয় প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষেরাই। দেবীর নিত্য পুজো হয়। স্ত্রীঅঙ্গের উপাসিত, যা তাঁকে উর্বরতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। আত্মরক্ষার প্রথম যে দুই শর্ত, খাদ্য লাভ ও সন্তান লাভ, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী তিনি তা পূরণ করেন।[১০]

বলদবাহিনীঃ গোয়ালতোড় থানার বুলানপুরের গ্রামদেবী ইনি। মন্দিরের ভেতরে বলদবাহিনীর নানা প্রতীক। অষ্টধাতুর তৈরি একটা গোলাকৃতি মানুষের মাথা, একটি ক্রুদ্ধ বলদ, একটি ঘোড়া ও একটি হাতি। আর এগুলির আশেপাশে আছে ৪০টি বড় বড় হাতি, ঘোড়া। কিন্তু কোনটি বলদবাহিনীর যথার্থ প্রতীক তা কেউ বলতে পারেনি। মন্দিরের নীচে একটি গাছতলায় হাঁটিকাঠ পোঁতা। তার পাশেই 'রক্তপাথর'। এই পাথরেই বলির রক্ত দিতে হয় প্রথম। বলদবাহিনীর নিত্যপূজো। পুজোর নানান কঠিন নিয়মকানুন রয়েছে।[১০]

সনকাঃ গোয়ালতোড় থানার গ্রামদেবী। পাথরের মন্দির। মূর্তি চতুর্ভুজা। নারীমূর্তি-কালো কষ্টিপাথরে খদিত। বাম দুই হাতে গদা ও পদ্ম, ডানের উপর হাতে চক্র ও নীচের হাতে বরাভয় মুদ্রায় প্রকাশিত। দেবীর পদতলে দুই দাসদাসী। তাঁর ডান হাতের নীচে এক গদাধারী পুরুষ ও বাঁহাতের নীচে এক কমণ্ডলুধারিণী নারী। একমাত্র পুজো করেন গ্রামস্থ মাঝি 'লোহার' পদবীধারী এক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। গ্রামদেবী সনকা সন্তানদাত্রী। বন্ধ্যা নারীদের তিনি একমাত্র আশ্রয়স্থল। সনকা তাই মানুষের প্রজননের দেবী।[১১]

মাই-গোঁসাইঃ চন্দ্রকোণা থানার সেববাজ-গোবিন্দপুরের গ্রামদেবী ইনি। মন্দিরের ভেতর প্রথমেই পূর্ব দিকে একটি সাদা ঘোড়া প্রায় দু'হাত উঁচু, পশ্চিম মুখে ছোটার ভঙ্গিতে বর্তমান। তার পেটের নীচে আরো দুটো ছোটো সাদা ঘোড়া। পাশে পোঁতা একটি ত্রিশূল। তার পরেই প্রায় আড়াই হাত উঁচু একটি কালো মাতৃমূর্তি- -যাঁর চোখ দুটি রুপোর। মাথার চুল কুণ্ডলী বাঁধা। এঁর দুই হাত, বাঁহাতে ত্রিশূল। দেবী যেন বেদীতে বসে আছেন। সর্বাঙ্গে লাল শাড়ি। দেবীর নিত্যপুজো হয়। তবে বিশেষ পুজো হয় অমাবস্যায় এবং মহানবমীতে। এছাড়া বার্ষিকী পুজো হয় শ্যামাপুজোর দিনে। মাঁই-গোঁসাই গ্রামদেবী, আঞ্চলিক দেবী। লোকের গভীর বিশ্বাস যে, তিনি বংশরক্ষার ঠাকুর। ইনি কালীর ধ্যানে পূজিতা। এই এলাকায় পুজো করেন 'পাণ্ডিত' পদবীর ব্যক্তিরা।[১২]

জাঠেল বা মাথেল উৎসব ঃ কৃষিকাজের প্রারম্ভে লোধারা কৃষি ফসল ভালো হওয়ার জন্য ভিক্ষা করে এই উৎসব পালন করে। লোধারা তসরগুটিকে কৃষির প্রতিরূপ বলে কার্তিক মাসেও ধুমধামের সঙ্গে পালন করে এই উৎসব।[১৩]

ইন্দ্রাণীদেবী ও চরকপূজা ঃ মধ্যযুগের কোন এক সময়ে প্রায় প্রত্যেক গৃহে চরকা ছিল এবং স্ত্রীলোকেরাই তা চালাতেন। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিনে বাংলার অন্যান্য জেলার মত এই জেলাতেও সেখানে চরকার পুজো হত। এর নাম ছিল ইন্দ্রাণী পুজো। এছাড়া এ জেলায় মুসলিম তীর্থস্থান বা তীর্থক্ষেত্র রয়েছে যা প্রতীক হিসেবে তাঁদের লোকধর্ম পালনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

মুসলিম তীর্থস্থান ঃ মুসলিম তীর্থস্থান হিসেবে মেদিনীপুর উল্লেখযোগ্য। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে আছে বহু মসজিদ ও মাজার। এর মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য, তাদের উল্লেখ করা হল। জেলাতে সাধু-ফকিরের কবরের মধ্যে কয়েকটি (১) খেজুরী হিজলীঃ হজরত তাজ খাঁর সমাধি পীর মসনদী আলীবাবা। বাৎসরিক জলসা হয়। জলসার জন্মদাতা হজরত মৌলানা সৈয়দ আহমুল্লা সাহেব। এখানে তিন লক্ষ লোকের সমাগম হয়। হিন্দু মুসলমান জাতিভেদ ভুলে সবাই এখানে পুজো দেয়। চৈত্রমাসের প্রথম সপ্তাহে হয় ওরস উৎসব এবং মেলা। (২) এগরা শরীফ (কাঁথি এগরা)ঃ হজরত হাফেজ আবদুর রহমান-নক্সবন্দীর সমাধি। বৈশাখ মাসে জলসা ও মেলা হয়। বহুলোক এখানে মানত করেও উপকার পায়। (৩) বোগা থেকে সোজা সমুদ্রতীরে মসনদ-ই-আলা গ্রামে মুসলমান ও হিন্দুরাও মানত করে। তারকেশ্বরের শিবস্থানের মত এখানেও বহুলোক ধর্না দিয়ে পড়ে আছে। (৪) পটাশপুর (অমর্ষি)ঃ হজরত শা মহদুন সমাধি। ইনি ছিলেন হিজলীর তাজ খাঁর গুরুদেব-পীরবাবা। এখানে মেলা ও বাৎসরিক উৎসব হয়। (৫) ঘোড়ামারাগ্রাম (পিংলা)ঃ এখানে আছে শা আলা ও সাল বালা দুই ভাইয়ের পাশাপাশি সমাধি। (৬) পিয়ারডাঙ্গা শরিফঃ চন্দ্রকোণা থানার অধীনের পিয়ারডাঙ্গা শরিফে আছে ৫ ৮ জনের সমাধি। ১২ই ফাল্গুন এখানে বাৎসরিক উৎসব হয়। (৭) এলাহিগঞ্জ (মেদিনীপুর থানা)ঃ মেদিনীপুর থেকে তিন মাইল দূরে মেদিনীপুর কেশপুর রাস্তার উপর অবস্থিত, ১৩ ফাল্গুন বাৎসরিক উৎসব হয়। এখানকার উরস্ উৎসব বিখ্যাত। এছাড়া, মদিনীবাদসা আলমগীর পীরের সমাধি, হজরতবালা শহীদের ফকির কুয়া, মেদিনীপুর শহরে চন্দনবাবা, গহুরবাবা, সেতারবাবা, কিংবা খড়্গপুরে পীরলোহানীর কবরে পীরবাবা, হবিবপুরে বড় আস্তানা, কোলাঘাটে সুপ্রাচীন সত্যপীরের থান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।''

এই পর্বের আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে - প্রথমত, এইসব লোকপরম্পরাগত দেবদেবীর পুজোর শুরু ঠিক কবে হয়েছিল তা নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ। তবে অধিকাংশ দেবদেবী যে মধ্যযুগে পূজিত হতেন তা অনুমান করা বোধকরি অসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়ত, এইসব দেবদেবীর পুজো সাধারণত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বহুলভাবে থাকলেও সমাজের উন্নত সম্প্রদায়ের কাছেও এই সব দেবদেবী পুজো পেয়ে থাকেন।

তৃতীয়ত, শাস্ত্রীয় তথা ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে পূজিত দেবদেবীর পাশাপাশি এগুলির পুজো পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না।

চতুর্থত, এই সমস্ত দেবদেবীগুলির ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন সামাজিক সমন্বয় বিধানের ইঙ্গিত দেয়।

পঞ্চমত, ধর্ম যে গ্রাম-বাংলার সমাজে আজও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে চলেছে তা লোক পরম্পরাগত দেবদেবীগুলির পুজো পদ্ধতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পর্ব

এই পর্বে লোক ধর্মাচারে প্রতীকের ব্যবহারের কথাই আলোচিত হবে যা মেদিনীপুর জেলায় মধ্যযুগে পরম্পরাগতভাবে ও ঐতিহ্যগতভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল এবং যার চল এখনো কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে।

মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে প্রসূতির জন্মশৌচ থেকে মুক্তির দিন পুকুর ঘাটে 'ঘাটষষ্ঠীর' পুজোর আয়োজন করা হয়। কুমারী ও এয়োতীরা এই পুজোয় অংশ নেয়। শিল, নড়া ও কাঁচামাটির একটি গোলাকার পিণ্ড দেবীষষ্ঠীর ও সন্তানকোলে জননীর প্রতীকরূপে গৃহীত হয়ে পূজিত হন। এই পুজোয় অংশগ্রহণকারী কুমারী ও এয়োতীরা প্রতীকী বস্তুগুলিকে হলুদ জলে স্নান করিয়ে ওগুলির গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। জাতকের জন্মকৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠীদেবীর এরূপ পুজোকে কোলষষ্ঠীরূপেও চিহ্নিত করা হয়।[২৬]

আবার শিশুকে জলের ফাঁড়া থেকে রক্ষা করার জন্য শিশুর জন্মতিথিতে তার বারো বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বছর সন্তানজননীরা মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে জলষষ্ঠীর ব্রত পালন করেন। শিল নড়া প্রতীকে সামান্য নৈবেদ্য দিয়ে এই ব্রত পালিত হয়।[২৭]

প্রতীকের মাধ্যমে ষষ্ঠীদেবীর আর এক ধরনের পুজোর প্রচলন জেলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে দেখা যায়। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজো 'সরদেশী ষষ্ঠীপুজো' নামে কথিত। সন্তানের মঙ্গল কামনায় পুকুরের পাড়ে বেল বা মনসা গাছের তলায় সাময়িক বেদী তৈরি করে কাঁচামাটির উপবিষ্টা এক নারীমূর্তি ও অনেকগুলি মাটির পিণ্ড গড়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। উপবিষ্টা নারীমূর্তির পায়ের কাছে মাটির পিণ্ডগুলিকে রাখা হয়। এবং এগুলিকে শিশুপ্রতীক কল্পনা করা হয়। এইভাবে সন্তানজননীরা নিজেদের সন্তানদের দেবীর পায়ের কাছে স্থাপন করে দেবীর কৃপাধন্য আকাঙ্খায় দেবীর প্রতীক পুজোর ব্যবস্থা করে থাকেন।[২৮]

অবশ্য বটবৃক্ষ প্রতীকে দেবীর পুজোর কথা মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের লেখা থেকে জানা যায়।[২৯] সূতিকা ষষ্ঠীপুজায় বটের ডাল প্রতীকে অথবা ফল সুশোভিত বটগাছের চিত্র দেওয়ালে পিটুলি দিয়ে এঁকে ষষ্ঠীদেবীর প্রতীক জ্ঞানে পুজো করার রীতিও জেলার বহুস্থানে সুপ্রচলিত।[৩০]

জেলার পশ্চিমের বনাঞ্চলে ও তার নিকটবর্তী থানাগুলিতে যেমন গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, শাঁকরাইল, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী ও দাঁতনে বহুনামে পূজিতা সিনিদেবী দুটি গোলাকার প্রস্তর খণ্ড প্রতীকে পূজিত হন। গাছের তলায় বা পথের ধারে এই দেবীর থান অবস্থিত।[৩১]

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গ্রামদেবী চণ্ডীর মাকড় পাথর প্রতীকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পুজোর প্রচলন আরও কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রাম নামেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয় যেমন বেতারুচণ্ডী, ডহরচণ্ডী, ভোগরাইচণ্ডী প্রভৃতি। নারায়ণগড়

থানার রাইপুরের চণ্ডীর অবস্থান বেনাঘাসের ঝোপে রাণীসরাইর চণ্ডী রয়েছেন শ্যাওড়াগাছের তলায়।[১৮]

বৃক্ষপ্রতীকে নানা দেব-দেবীর পুজো বাংলা তথা ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকে আজও প্রবহমান।[১৯] মেদিনীপুরের অধিবাসীরা 'বৃক্ষপ্রতীকে' কিছু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেন। তবে এসব ক্ষেত্রে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা বিশেষ করে প্রৌঢ়রা সমগ্র বৈশাখ মাসব্যাপী অশ্বত্থগাছে ঘটিতে জল নিয়ে গিয়ে জল ঢালে। পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে তা করে থাকেন।[২০]

অশ্বত্থ গাছের মতন বটগাছও বিভিন্ন দেবীর বা দেবতার সঙ্গে যুক্ত থাকায়[২১] একেও গ্রামবাসীরা বিশেষ করে মহিলারা পুজো করে থাকেন। এয়োতী মেয়েরা স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনার পুজো করেন।[২২] আবার গৃহস্থের বাড়ির সংলগ্ন তুলসীতলায় অবস্থিত নারায়ণের প্রতীক তুলসীগাছে প্রত্যহ জল ঢালার প্রথা সুবিদিত। পুণ্যিপুকুর, কুলকুলতী ও বসুন্ধরা ব্রতে তুলসী গাছের প্রাধান্য চোখে পড়ে। এ ব্রতগুলি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে তুলসী গাছ প্রতীকে দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রতিনীরা শ্রদ্ধা জানায়। এমনই বেলগাছ ও সিজগাছ প্রতীকে যথাক্রমে শিব ও মনসা দেবীর পুজোপ্রথা জেলায় বহুল প্রচলিত। অনুসন্ধান করলে বৃক্ষ প্রতীকে আরও কিছু কিছু দেব-দেবীর লোক ধর্মাচরণের খবর পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন ব্রত উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রেও প্রতীকের প্রয়োগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্মীব্রত, দশপুতুলব্রত, ভাদুলীব্রত, তুষ-তুষলীব্রত ইত্যাদির কথা বলা চলে। এই সব ব্রতগুলি উদ্‌যাপনের সময় আলপনার মধ্য দিয়ে ব্রতিনীর কামনার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসের প্রতি বৃহস্পতিবার এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনে লক্ষ্মীব্রত উদ্‌যাপনের সময় মেয়েরা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের ছড়া কোথাও পেঁচা আলপনার মাধ্যমে এঁকে মা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হওয়ার চেষ্টা করতেন।

পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল এঁকে দশটি বিশেষ ছড়া উচ্চারণ করে ফুল-দূর্বা দিয়ে দশপুতুল ব্রত উদ্‌যাপন করে। দেবতার কাছে তারা প্রার্থনা জানায় যাতে করে ইতিহাস খ্যাত ১০টি মহত মহিলা চরিত্রেরগুণের অধিকারী হতে পারে[২৩]।

তুষ-তুষালী ব্রত পালনের ক্ষেত্রেও গোবরের সঙ্গে আলোচালের তুষ মিশিয়ে মেখে ১৪৪টা নাড়ু পাকাতে হয়। অঞ্চল ভেদে নাড়ুর সংখ্যার পার্থক্য চোখে পড়ে। নাড়ুর মাথায় সিন্দুরের ফোঁটা দিয়ে এবং দূর্বা গুঁজে নাড়ু হাতে এই ব্রত কুমারী মেয়েরা পালন করেন। শস্য কামনা ও মঙ্গল কামনা এই ব্রতের লক্ষ্য।

বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ যাত্রী আত্মীয়-পরিজনদের নৌযাত্রা থেকে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কামনায় জলদেবী ভাদুলী ব্রত উদ্‌যাপন নদীমাতৃক বাংলার জনপ্রিয় ব্রতানুষ্ঠান ছিল। এই ব্রত অনুষ্ঠানের সময় অথবা উদ্‌যাপনের সময় যে আলপনা দেওয়া হত তাতে থাকত নদ-নদী, বনজঙ্গল, হিংস্র পশু পাখী ইত্যাদি। অর্থাৎ বাণিজ্য যাত্রাপথে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হত তারই বাস্তব প্রতিফলন আলপনার মধ্যে ফুটে উঠত। বাংলার মেয়ে ও বাংলার বধূ তাই এই ব্রত উদ্‌যাপন করে বাপ, ভাই, শ্বশুর-স্বামীর

নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনায় নদ-নদী, হিংস্র পশু ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ছড়া আবৃত্তি করত এবং আলপনায় তাদের স্থান দিত[২৪]।

সুতরাং এই ব্রতানুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে প্রতীকের যে এক বিশেষ স্থান রয়েছে তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়না।

মেদিনীপুর কেবল একটি জেলা নয়, ভৌগোলিক অঞ্চলও নয়, একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি কেন্দ্র, যার ইতিহাস কালের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বহমান মানব সভ্যতার নিদর্শন পথের নিশানাফলকের মধ্যে মেদিনীপুরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রোথিত রয়েছে। মূর্তি ও প্রতীক নিয়ে লোক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এই আলোচনায় সেই ঐতিহ্য ও ধারা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

সূত্র নির্দেশ

১। ডঃ ত্রিপুরা বসু, ধর্মীয় বিবর্তনের বৃত্তে মেদিনীপুর (প্রবন্ধ) **এই শতাব্দীর প্রবাহ**

২। প্রবোধ ভৌমিক (প্রবন্ধ) **পূর্বাদ্রি-লোকধর্ম সংকলন** সম্পাদনা ইন্দুভূষণ অধিকারী

৩। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু **বাংলার লৌকিক দেবতা**

৪। **তদেব**

৫। **তদেব**

৬। সুধীন দে মধ্যযুগের লোকধর্ম (প্রবন্ধ) পূর্বাদ্রি পত্রিকা-লোকধর্ম ১ম খণ্ড সম্পাদনা ইন্দুভূষণ অধিকারী

৭। বিনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ২য় ও ৪র্থ খণ্ড

৮। ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যাঃ রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা

৯। **তদেব**

১০। ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা ? **আঞ্চলিক দেবতা**

১১। **তদেব**

১২। **তদেব**

১৩। **তদেব**

১৪। **তদেব**

১৫। অশোক মিত্র সম্পাদিত) ঃ **পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা**, ৩য় খণ্ড

১৬। **তদেব**

১৭। ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা ঃ **রাঢ়ের গ্রামদেবতা**

১৮। **তদেব**

১৯। **তদেব**

২০। **তদেব**

২১। **তদেব**

২২। **তদেব**

২৩। **তদেব**

২৪। প্রদ্যোত কুমার মাইতি, **বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি**

২৫। হরিসাধন দাস মেদিনীপুর দর্পণ
২৬। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি **দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি**
২৭। **তদেব**
২৮। **তদেব**
২৯। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী **কবিকঙ্কন চণ্ডী** বসুমতী সংস্করণ
৩০। প্রদ্যোত কুমার মাইতি **বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি**
৩১। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি **দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি**
৩২। তদেব
৩৩। শঙ্কর সেনগুপ্ত (সম্পাদনায়) **ট্রি সিমবল ওয়ারশিপ ইন ইণ্ডিয়া** পুস্তক দ্রষ্টব্য
৩৪। প্রদ্যোত কুমার মাইতি **বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি**
৩৫। **তদেব**
৩৬। **তদেব**
৩৭। বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) **মেয়েদের ব্রতকথা**
৩৮। **তদেব**

উনিশ শতকে ভট্টপল্লীর সংস্কৃতি চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শমিতা সিংহ

আমি বছর কয়েক আগে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ[১] এবং তাঁর পুত্র শ্রী লক্ষ্মীজীবন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার নিই। বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত ঐ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। এ বিষয়ে বিনয় ঘোষ মশাই তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে[২] আলোচনা করেছেন। ঐ আলোচনায় আমি বেশী যাব না। সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ভাটপাড়া ভাগীরথী নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন ভাটপাড়াই মৌলিক নাম। পরে পণ্ডিতরা বসবাস শুরু করলে ঐ অঞ্চলের নাম হয় ভট্টপল্লী। মনসামঙ্গলেও ভাটপাড়া নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেহুলা যে স্থান দিয়ে লক্ষিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ভাটপাড়া নাম পাওয়া যায়। ভট্টপল্লী নামের কোন উল্লেখ সেখানে নেই। আবার ভাট বলে এক শ্রেণীর বাস ছিল বলেও ভাটপাড়া নামে হয়ে থাকতে পারে। কারও কারও মতে ঐ অঞ্চলে খুব ভাটফুল হত তার থেকেই নাম হয়েছিল ভাটপাড়া। আরেকটি মত হল যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভক্তি-ভাজন সিদ্ধপুরুষ অল্লাল ভট্ট প্রাচীন যশোহরের কাছে ধুলিয়াপুর থেকে এসে অন্তিমকালে কাঁকিনাড়ার গঙ্গাতীরে বাস করেছিলেন বলে প্রতাপাদিত্য তাঁর পার্শ্বস্থ অরণ্যভূমিতে ভট্টপল্লী গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামটি ৫০০ বছরের পুরনো। কোটালিপাড়া, ধুলিয়াপুর, দাশুিরহাট প্রমুখ স্থান থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এসে ভাটপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। এঁদের বসবাস ৩০০ বছরের আগেও নয় পরেও নয়।

নবদ্বীপ, কুমারহট্ট, ধুলিয়াপুর, ত্রিবেণী এবং কোটালিপাড়ার অনেক পরে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী। ১৬৬০-৭৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ধুলিয়াপুর যশোহর থেকে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা ভাটপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। এঁরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। সেই সময় থেকেই সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ভাটপাড়ার পরিচিতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মিথস্ক্রিয়ায় একধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব আন্দোলনের পর নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবক্ষয় দেখা দেয়। আদর্শ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকর্ষণ ও তার মূল্য ক্রমশ কমে যেতে থাকে। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। এই পণ্ডিত সমাজ সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যে সমস্ত পরিবর্তনকে অস্বীকার করে সনাতনী জীবনধারা নিয়ন্ত্রক বিধান

দিয়েছিলেন। কঠোর রক্ষণশীল নীতিতে তাঁরা নিজেদের জীবন ও সমাজকে বেঁধেছিলেন।[৮] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজের নিষ্ঠা এক্ষেত্রে নবদ্বীপের পরিপূরক হিসেবে কাজ করত।

অন্যান্য সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রের মত ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরাও বিভিন্ন সময়ে তর্কে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করে ভাটপাড়ার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ সে সময়ে তর্কে জয়পরাজয়ের উপর পণ্ডিত সমাজের যশ বা অপযশ অনেকটাই নির্ভর করত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আহূত এক বিচার সভায় ভাটপাড়ার পণ্ডিত বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজকে ন্যায়শাস্ত্রের তর্কে পরাজিত করে ভাটপাড়ার গৌরবের সূচনা করেন। পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যারত্ন দাক্ষিণাত্য থেকে আসা কোন এক দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতকে পরাভূত করেন। আধুনিক যুগের সমস্ত নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের গুরু পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম তর্ক পছন্দ করতেন না। একবার এক দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত ভাটপাড়ায় এসে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে চাইলে তিনি লিখে দেন যে তিনি পরাজিত। শিবচন্দ্রের শিষ্য পঞ্চানন তর্কবত্ন তখন তর্কে দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করেন। এরপর কাগজে সেই পণ্ডিতকে লিখে দিতে হয় যে, শিবচন্দ্রের ছাত্র পঞ্চানন তর্করত্নের কাছে তিনি পরাজিত।[৮] আরও এই ধরনের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে দেখা গেছে যে, ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা তর্কে বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন এবং সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র হিসেবে ভাটপাড়ার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছেন। **সুরধুনী** কাব্যে অন্যান্য সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রের সঙ্গে ভাটপাড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ভদ্রজন বা সস্থান গরিফা নৈহাটী
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী
পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।[৮]

পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি (১১৯৭-১২৫৮), রাখালদাস ন্যায়রত্ন (১২৩৬-১৩২১ বঙ্গাব্দে), প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪ খ্রীঃ) এবং পঞ্চানন তর্করত্নের (১৮৬৬-১৯৪০ খ্রীঃ) পাণ্ডিত্যগুণে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র হিসাবে ভাটপাড়া ক্রমশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বশিষ্ঠবংশীয় রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ ছিলেন প্রথম নৈয়ায়িক। তারপর ঐ বংশে আরও ৩০ জন নৈয়ায়িক খ্যাতিলাভ করেন। হলধর তর্কচূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন পণ্ডিত জনার্দন বিদ্যাবাচস্পতির টোলে। কায়স্থ কৌস্তভের তৃতীয় সংখ্যায় ৩৯ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর সংবলিত বিধান আছে। সেখানে হলধর চূড়ামণির পরিচয়ে বলা হয়েছে ঃ

"ইঁহ মহামহাপাধ্যায় ব্রহ্মঠাকুর মহাশয়
গৌরদেশের গুরু কল্পতরু প্রভু বিদ্যাময়"।

শুধু যে বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাই নয় গ্রামের বিভিন্ন বিবাদেরও তিনি মীমাংসা করতেন। সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে ভাটপাড়ার প্রতিষ্ঠা মূলতঃ হলধর চূড়ামণিকে দিয়েই শুরু হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ন্যায়শাস্ত্রের টীকা "হলধরী টিপ্পনী"।

সুরধুনী কাব্যে হলধর চূড়ামণি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"হলধর চূড়ামণি ন্যায়-শাস্ত্রবিদ্
ন্যায়ের টিপ্পনী সাধু যাহার রচিত'।"

বলা হয় যে তিনিই তাঁর ছাত্রতুল্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মাতৃবন্দনা লেখায় উৎসাহিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরে বন্দেমাতরম সঙ্গীত, 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন হলধরও যদুরামের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সহোদর ও ছাত্র তারাচরণ তর্করত্ন (১২৪২-১২৮৮ বঙ্গাব্দ) কাশীরাজের সভাপণ্ডিত হন। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। একজন সুকবি ছিলেন এবং তর্কে পারদর্শী ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম (১২৫৪-১৩২৬ বঙ্গাব্দ) রাখালদাস ন্যায়রত্নের ছাত্র ছিলেন। টোলে তাঁর অধ্যয়ন শেষ হলে তিনি সার্বভৌম উপাধি পান। নিজের বাড়িতে টোল খুলে তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়াতেন। ছাত্রদের নিজের বাড়িতে রাখতেন ও তাদের খাওয়া পরার দায়িত্ব নেন। এ সম্পর্কে পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশাই আমাকে একটি গল্প বলেন। একবার শিবচন্দ্র সার্বভৌম তাঁর সহধর্মিনীর কাছে জানতে পারেন যে তাঁর ঘরে চাল বাড়ন্ত। কি করে চাল কিনবেন এই চিন্তা করছেন সার্বভৌম মশাই। কারণ তাঁর হাতে টাকা নেই। অথচ ছাত্রদের তো তিনি অভুক্ত রাখতে পারেন না। তখন পায়ের কাছে তিনি একটি পিতলের গামলা দেখতে পান। পা দিয়ে সেই বাসন তিনি নর্দমায় ফেলে দেন। তিনি জানতেন যে নর্দমায় যে বাসন পড়ে গিয়েছে সেই বাসন তাঁর বাড়িতে ব্যবহার হবে না। পিতলের ঐ গামলা বিক্রি করে তিনি চাল কিনে আনেন। ছাত্রদের প্রতি এই আন্তরিক ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ সেই সময় শিক্ষাগুরুদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যেত। সার্বভৌম মশাই মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আজীবন সেখানে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক ছাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ন্যায়চর্চা করে গেছেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-১৯৪০ খ্রীঃ) মাত্র ১৯ বৎসর বয়সেই বেদ বেদান্ত ও সাংখ্য এবং অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে গিয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে পুরস্কৃত হন।"

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন বেতন নেওয়ার বিরোধী ছিলেন, যখন বঙ্গবাসী কলেজে সংস্কৃত পড়ানো শুরু হয় তখন পঞ্চানন তর্করত্ন মশাই ঐ কলেজ এফ. এ. ক্লাসের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যের কারণে ঐ কাজ পরে তিনি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর নিজের বাড়িতে টোল খুলে ন্যায়শাস্ত্র পড়ানো শুরু করেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ফলে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর টোলে ভর্তি হয়। ভাটপাড়ায় তিনি একটি সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র খুলে দর্শন, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়াতেন। এই টোলে বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ এবং হৃষীকেশ শাস্ত্রী স্মৃতিশাস্ত্র পড়াতেন। পঞ্চানন তর্করত্ন পড়াতেন দর্শন, ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু পরে সারদা আইনের বিরোধিতা করে ঐ

উপাধি ত্যাগ করেন।[১] বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের সঙ্গে পঞ্চানন যুক্ত ছিলেন।

প্রমথনাথ তর্কভূষণের জন্ম ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। তিনি সুপদ্ম ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। বারাণসীর দ্বারভাঙ্গা পাঠশালায় তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সঙ্গে বারাণসীতে মীমাংসা এবং বেদান্ত অধ্যয়ন করতেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রমথনাথ সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হয় তখন তিনি এই বিভাগে যুক্ত হন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিভাগের অধিকর্তার পদ পান।

ভারত সরকার তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট ডিগ্রি পান। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সম্মেলনের নবম অধিবেশনের সভাপতি হন প্রমথনাথ। ১৩৩১-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিরুপতির সর্বভারতীয় প্রাচ্য-বিদ্যা সংঘের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে তিনি হিন্দুসভার সভাপতি হন। এই সভা ময়মনসিংহের হিন্দু মহাসভার পক্ষে ডাকা হয় এবং এখানে তিনি হিন্দু সামাজিক প্রথার এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মদনমোহন মালব্যর সঙ্গে তিনি একসাথে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। পঞ্চানন তর্করত্নের সঙ্গে তাঁর যেমন যোগাযোগ ছিল তেমনি প্রমথনাথ তর্কভূষণের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর সম্বন্ধে মদনমোহন মালব্যজী বলতেন তর্কভূষণ জি মেরা বন্ধু হ্যায়।[২]

ভাটপাড়ার আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন। তাঁর জন্ম ২৫শে নভেম্বর ১৮৮৯-এ ভাটপাড়াতেই। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী এই পণ্ডিত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার জ্যোতিষী মনোনীত হন। জ্যোতিষী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গের বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদকের কাজ করেন। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে তিনি নিজের বাড়িতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ নামে একটি টোল খোলেন। বহু ছাত্র সেখানে অধ্যয়ন করত।

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁর "রিপোর্টে" বলেছেন যে উত্তর চব্বিশ পরগনায় সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে ভাটপাড়া তার সুনাম বজায় রেখেছিল যদিও সেখানকার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র এবং পণ্ডিতের সংখ্যা অন্যান্য অনেক জায়গায় চতুষ্পাঠীর মতই কমতে থাকে। তিনি বলেছেন যে এসব চতুষ্পাঠীতে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা করতেন যেমন মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসুদন স্মৃতিতীর্থ এবং রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে কাব্যচর্চার ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত পরিবারগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির কাছে দান গ্রহণ করতেন না এবং কখনও পশুর মাংস ভক্ষণ করতেন না; এই দুই দিক দিয়েই তাঁদের বাংলাদেশের অন্যান্য

অঞ্চলেব পণ্ডিত বংশগুলির সঙ্গে পার্থক্য ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতবা বাংলাদেশেব বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁদেব ভাটপাড়ার ঠাকুব বলা হত।[১]

ভট্টপল্লীব পণ্ডিতেরা বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে রাখালদাস ন্যায়রত্নের খ্যাতি ছিল। তাঁব তত্ত্বসার, অদ্বৈতবাদখণ্ডন দীর্বিতি কৃণ্নতাবাদ গদাধরবাদবাদ এবং শক্তিবাদ রহস্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।[১০]

মাত্র ১৬ বছর বয়সে পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম সংস্কৃত নাটক **পাণ্ডব চরিতম্** লেখেন। এই গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যায কুসুমাঞ্জলির ওপব তিনি নতুন টীকা রচনা কবেন। বিদ্যোদয় নামে একটি মাসিক পত্রিকাতে এর কিছু অংশ মুদ্রিত হয়।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তত্ত্বকৌমুদীর ওপব টীকা লেখেন। শোক নামে একটি কাব্য বচনা করেন। এছাড়াও তাঁর অনেক সংস্কৃত কাব্য প্রকাশিত হয়নি। সংস্কৃত মাসিক বিদ্যোদয় পত্রিকায় বহু গদ্য এবং প্রবন্ধ বচনা করেন। উপাষনা নামে একটি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অমরমঙ্গলেম্ নাটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপাধি পবীক্ষার পাঠ্যপুস্তক ছিল।[১১]

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণেব সংস্কৃত গ্রন্থেব মধ্যে বিজয় প্রকাশ, রসরোদয (১৮৯১ খ্রীঃ), বিশুদ্ধানন্দ চবিতম্, কোকিলদূতম্, ব্যাপ্তিপঞ্চক মাথুরী বহস্য বিবৃতি, পূর্বমীমাংসার্থ সংগ্রহ (১৮৯৯ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য দর্শন, যাঁদেব একমাত্র আলোচনার ক্ষেত্র, বাংলা ভাষার চর্চা এবং সংস্কৃত বিদ্যাকে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে চর্চা যাদের কাছে নরক গমনের পথ মাত্র তাঁরাও দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন ছড়া, নাটক, কবিতা কিংবা সংস্কৃত থেকে অনুবাদগ্রন্থ তাঁরা রচনা কবেন। রাখালদাস ন্যায়রত্নের মত গোড়া সংস্কৃত পণ্ডিতও মনে করতেন যে, হিন্দুধর্মের চিন্তাভাবনা বাঙালীব কাছে সহজ বাংলাতেই প্রকাশ করা উচিত যাতে তারা সহজেই দার্শনিক ও ধর্মীয় চেতনা উপলব্ধি করতে পারে।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন 'আগমনী' নামে পাঁচালী লেখেন ও সঙ্গীতের গ্রন্থ রচনা করেন। রাখালদাসের পিতা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ বাংলায় শ্লোক লিখতেন। আনন্দ শিরোমণির যুগল মিলন, উদ্ভব সন্দেশ, হরকুমার শাস্ত্রীর শঙ্করাচার্য, রামানুজ বিদ্যার্ণবের কাব্যগ্রন্থ কণ্ঠহার প্রভৃতি সংস্কৃত পণ্ডিতদেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উদাহরণ বলা যায়।

মাত্র ২১ বছর বয়সে পঞ্চানন তর্করত্ন রামায়ণ অনুবাদ করেন। অত্রি সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, শ্রীমদভাগবৎ গীতা, বত্নাবলী এবং মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন পঞ্চানন তর্করত্ন। সংস্কৃত নাটক মালতি মাধব অবলম্বনে তিনি ঐ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ, কাশীখণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবৎ এবং মনুসংহিতা দশকুমারচরিতম্, যোগবশিষ্ঠ, হরিবংশ, ষোড়শ সংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, শিব, কূর্ম মার্কণ্ডেয়, বৃহন্নারদীয় সৌর, বৃহৎধর্ম দেবী পুরাণম এবং বাল্মীকি

রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি সাংখ্য দর্শনও বাংলায় অনুবাদ করেন ও এর ওপর একটি টীকাও রচনা করেন। বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম, প্রায়শ্চিত্যবিধি ও গ্রহণ কৃত্য ব্যবস্থাও তাঁর রচিত গ্রন্থ। জন্মভূমি পত্রিকার প্রকাশের প্রথম চার বছর তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকার শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন পঞ্চানন তর্করত্ন। তাঁর লেখা গল্পগুলির মধ্যে হিন্দু রমণী উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ বঙ্গবাসী, নবজীবন, বেদব্যাস এবং প্রতিমা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর অনূদিত ঊনবিংশতি সংহিতা ১৯২৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। তাঁর সপ্তসতি এবং বেদান্ত সূত্রের অভিভাষ্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর দশকুমার চরিতের অনুবাদ, রত্নাবলীর অনুবাদ এবং বিদ্যাপতির মাথুর অংশ প্রকাশিত হয়।[১৩]

প্রমথনাথ তর্কভূষণ বহু মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের সম্পাদনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবৎগীতার অনুবাদ ও টীকা, অদ্বৈত সিদ্ধি এবং সিদ্ধান্তলেশ শঙ্করের টীকা সমেত ব্রহ্মসূত্র ভামতি রত্নপ্রভা, মনুসংহিতা, তার মেধাতিথি টীকা শ্রী শ্রী চণ্ডী, কাশীখণ্ড ও বিবরণম্‌ প্রমেয় সংগ্রহ (১ম খণ্ড, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কর্মযোগ বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর একটি মৌলিক গ্রন্থ। গীতার কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। সাংখ্য এবং বেদান্তর ওপর তাঁর তিনটি বক্তৃতার সংকলন মায়াবাদ। এটি তাঁর আরেকটি মৌলিক রচনা। বাংলা ১৩৫০ সালে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়। সনাতন হিন্দু, হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের ওপর এটি তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন গ্রন্থ।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ রচিত 'শাক্যসিংহ' গৌতম বুদ্ধের জীবনী। এটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে রচিত। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মনুভদ্র' ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। সাধারণের জন্য খুব সহজ করে এ বই তিনি লিখেছিলেন।[১৪]

পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। এগুলির মধ্যে পুরাতন পঞ্জিকা সংগ্রহ, পঞ্জিকা সংস্কার প্রদীপ, পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরের প্রভাহরণ, স্তব কবচমালার ঔদ্মিক সমাপন এবং সুখের সন্ধান উল্লেখযোগ্য।[১৫]

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেই শুধুমাত্র ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা প্রসিদ্ধ হননি। অন্য কারণেও তাঁদের পরিচিতি ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান ছিলেন। শাস্ত্রের অনুশাসন তাঁরা মেনে চলার চেষ্টা করতেন এবং সেইমত জীবনযাপন করতেন। এজন্যেও তাঁরা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল মানুষের শ্রদ্ধা ভাজন হন। অন্যান্য সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থানগুলি যখন তাদের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছিল, ভাটপাড়া সেই ঐতিহ্য অনেকদিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। তাই অনেকদিন পর্যন্ত ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা বাঙালী হিন্দুদের ধর্মগুরু ছিলেন।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজ খুব গোড়া ছিল এবং যে-কোন রকম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী ছিল। কিন্তু অন্য চিত্রও দেখি। গরিফা

থেকে মহেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বিদেশে যান। ফিরে এলে অনেকই তাঁকে সমাজচ্যুত করতে চান কিন্তু ভাটপাড়াব রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি প্রায়শ্চিত্য করে ঐ ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। ভাটপাড়ার সাধারণ মানুষ এতে বাধা দেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্থির করেন যে, তাঁর বিধবা মেয়েব বিয়ে দেবেন। শিবচন্দ্র সার্বভৌমের মত তিনি পেয়েছিলেন। শিবচন্দ্র বলেছিলেন বিধবা বিবাহ আকাশ কুসুমের মত অলীক পদার্থ নয়।[২৬]

ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান মহিমচন্দ্রের (দেববর্মন) পুত্র সৌমেন্দ্রনাথ ইংলন্ড থেকে ফিরে এলে মহিমচন্দ্র তাঁর বিবাহ স্থির করেন। স্থানীয় হিন্দু বয়োজ্যেষ্ঠগণ এই বিবাহে বাধা দেন। কারণ সৌমেন্দ্র বিলাত প্রত্যাগত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহিমচন্দ্রের পক্ষে ভাটপাড়া পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভাটপাড়াব পণ্ডিতেরা বিবাহের পক্ষে তাঁদের মত দেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন বলতেন স্ত্রীলোকদের কখনও শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা উচিত নয়। তিনি চাইতেন স্ত্রীলোকেরা সুন্দর কাপড় এবং গহনা পরবে। যেখানে স্ত্রীজাতি সম্মান পায় সেই স্থান ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে। সেখানে দেবতাও প্রীত। নার্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা স্ত্রীলোকের এখানে ওখানে একা চলাফেরা করা উচিত নয়। তারা সব সময়ে ভদ্র পোশাক পরবে। এসব ক্ষেত্রে পঞ্চানন তর্করত্ন গোঁড়া ছিলেন ঠিকই তবে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সমর্থক ছিলেন। অনুরূপা দেবীর মত স্বনামধন্য লেখিকার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হত।

বাংলার নবজাগরণে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেব মধ্যে অনেকেই ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত গোবিন্দ বিদ্যাবাগীশের নামোল্লেখ করা যায়। তিনিও ভাটপাড়ার একজন পণ্ডিত ছিলেন।[২৭]

টোলের পণ্ডিতদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর যোগাযোগ রাখতেন। পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্যে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁর টোলের ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার নেন। শোনা যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাবা বলতেন।

ভাটপাড়ার পণ্ডিত সম্প্রদায় ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা বিলিতি জিনিস ব্যবহার অপছন্দ করতেন ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিলিতি জিনিস বর্জন করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা যে আন্দোলন করেন তাতে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন বিভিন্ন পণ্ডিতদের সাহায্য পান যার মধ্যে ইঙ্গ-সংস্কৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত নৃত্যগোপাল বিদ্যারত্নের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বি. এ. ডিগ্রিও পেয়েছিলেন। একটি পুরনো বাড়িতে তাঁত বসানো হয়। যেখানে কাপড় বোনা হত। হরিদাস মোদক চিনির কারবার করতেন।

আখের চিনি প্রস্তুত করা হত। বাইরে থেকে লবণ আমদানি বন্ধ করে খনিজ লবণ দেশে উৎপাদন করা হত। গান্ধীজির বিদেশী জিনিস বর্জনের অনেক আগেই ভট্টপল্লীর পণ্ডিতসমাজ বিদেশী বর্জন নীতি নেন। এ সম্পর্কে যে সচেতনতা তাঁরা দেখিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে গান্ধীবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। শুধু বিদেশী জিনিস বর্জনই তাঁরা করেননি, স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা নানাভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক্ষুদিরামের বোমা বানানোর পদ্ধতি (formula) ক্ষুদিরাম ভাটপাড়ার পণ্ডিতের কাছে পান বলে ভাটপাড়ার পণ্ডিতকূল দাবি করেন। পঞ্চানন তর্করত্ন ১৯০৮-এ অরবিন্দর সঙ্গে জেলে যান। অনুশীলন সমিতির সহসভাপতি ছিলেন তিনি। গান্ধীজির সঙ্গে অবশ্য তাঁর একসময় মতবিরোধ হয়। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ ব্যাপারে এই বিরোধ হয়। গান্ধীজি চেয়েছিলেন হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক। পঞ্চানন তর্করত্ন এতে আপত্তি জানান। তিনি বলেন আগে এককাট্টা হয়ে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হতে হবে পরে এইসব ত্রুটির সমাধান করা যাবে। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও পঞ্চানন তর্করত্নের যোগাযোগ ছিল। পরে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থও অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন। পুলিন দাসের শিষ্যর কাছে তিনি লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদি শিখতেন।

ভাটপাড়ার সংস্কৃত চর্চার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সেখানকার পরীক্ষা ব্যবস্থা। কোন একটি টোলের অধ্যাপক পরীক্ষা নিতে হলে অন্য টোলের অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদের সামনে টোলের অধ্যাপক ছাত্রদের প্রশ্ন করতেন। সবাই সন্তুষ্ট হলে তবে ছাত্ররা উপাধি পেতেন। সর্বত্র এই পদ্ধতি ছিল। পরের দিকে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। ভাটপাড়ার পরীক্ষা সমাজ তখন পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করে। মহেশ ন্যায়রত্ন তাঁর 'রিপোর্টে' ভাটপাড়ার এই পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন যে, পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্যে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এই পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভাটপাড়ার সমস্ত পণ্ডিতই এর সদস্য ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন এই পরীক্ষা সমাজের সভাপতি এবং পঞ্চানন তর্করত্ন এই কেন্দ্রের সচিব নিযুক্ত হন। মহেশ ন্যায়রত্ন হন অধীক্ষক। দুই শ্রেণীর প্রতিটিতে একবার করে পরীক্ষা হত এবং ন্যায়শাস্ত্র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতেও পরীক্ষা নেওয়া হত। এ সবই উপাধি পরীক্ষার চেয়ে নিম্ন মানের ছিল। পরীক্ষা হত সাংখ্য, বেদান্ত, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাহিত্য এবং ব্যাকরণের ওপর। মহেশ ন্যায়রত্ন যখন ভাটপাড়া যান তিনি দেখেন যে, ভাটপাড়া পরীক্ষা সমাজ একটিমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তখনও পরীক্ষার্থী এসে পরীক্ষা দিত। ভাটপাড়া পরীক্ষা সমাজের নির্দিষ্ট কোন আয় ছিল না।

কোন পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম বিভাগে, দ্বিতীয় বিভাগে এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করতে হলে একজন পরীক্ষার্থীকে মোট নম্বরের শতকরা অন্ততত ৫০, ৪০ এবং ৩০ নম্বর পেতে হত। তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হত। পরীক্ষার্থীর যাওয়া আসার খরচ ভাটপাড়া পরীক্ষা সমাজ বহন করত।

এইভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ভাটপাড়া পরীক্ষা সমাজ ঐ অঞ্চলের সংস্কৃত শিক্ষার মান উন্নত করে।[১১]

ক্রমশ অন্যান্য স্থানের মত ভাটপাড়া সমাজেও একধরনের পরিবর্তন আসে। শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরেও এর প্রভাব পড়ে। ভারতবর্ষে ইংরাজদের পাশ্চাত্য ব্যবস্থার আদলে টোলের শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ পড়েছেন বেনারসে। প্রধানতঃ ন্যায়শাস্ত্রের লোক। প্রায় সব শাখাতেই সমান পারদর্শী। গোপীনাথ কবিরাজের স্নেহধন্য। অধ্যাপনা করতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শেষ জীবনে honorary D Litt পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। সেলাই করা কাপড় পরতেন না। ধুতি এবং চাদর পরতেন।

আমি শ্রীজীব ন্যায়রত্ন সম্পর্কে কোন আলোচনা এখানে করিনি কারণ আমার কাজ মূলত উনিশ শতকের সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র নিয়ে।

২। বিনয় ঘোষ, **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি**, কলকাতা ১৯৫৭ পৃঃ - ৬৪২-৬৪৬

৩।ক) শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

খ) শিলাদিত্য (পত্রিকা) নব পর্যায় বর্ষ-২ সংখ্যা - ৫, নভেম্বর ১৯৮২, সম্পাদক বিমল কর।

৪। বাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (ব্যারাকপুর) সংস্কৃত-এর অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের পুত্র লক্ষ্মীজীবন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৫। দীনবন্ধু মিত্র **সুরধুনী** কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৫১, পৃঃ ১২৩

৬। ঐ পৃষ্ঠা - ১২৩

৭। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, **বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংগ্রহ পণ্ডিত সমাজ**, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২১।

৮। সারদা আইন - বাল্য-বিবাহ রোধের আইন

৯। অধ্যাপক লক্ষ্মীজীবন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১০। Mahamahopadhyay Mahesh Chandra Nayaratna 'Report' **on the Toles of Bengal, Bihar and Orissa**. p 21

১১। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, **বাঙালীর সারস্বত অবদান, বঙ্গে নব্য ন্যায় চর্চা**, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫৫।

১২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, **বঙ্গভাষার লেখক**, প্রথম খণ্ড, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ৯০৪-৯০৫।

১৩। সাক্ষাৎকার-লক্ষ্মীজীবন ভট্টাচার্য

১৪। **উত্তরা** (বাংলা পত্রিকা) কার্তিক ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

১৫। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য **বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী** ১ম খণ্ড কলকাতা শ্রাবণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ৩৫৯।

১৬। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৭। শিবনাথ শাস্ত্রী **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ** তৃতীয় সংস্করণ পৃ. ১৭৮

১৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন **বিদ্যাসাগর জীবন চরিত** কলকাতা ১২৯৮ বঙ্গাব্দ পৃঃ ১৬১ ১৬৩

১৯। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন **রিপোর্ট অন দি টোলস অব বেঙ্গল, বিহার ওড়িষ্যা** ক্যালকাটা ১৮৯১ পৃঃ ২৩ এবং ২৩।

বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৪০-এর একটি সমীক্ষা

ইরা মিত্র

অসংগঠিত সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'বঙ্গীয় দোকান' ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইন (Bengal Shops and Establishment Act), ১৯৪০-এর পটভূমি পর্যালোচনা করতে হলে সমসাময়িক সময়ের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রতিটি বাজনৈতিক দলের মধ্যেই প্রাদেশিক রাজনীতিতে নিজেদের প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল স্তরকে ব্যবহার করার প্রবনতা দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের জনকল্যাণমূলক আইন পাশ করতে গেলে দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলির মতানৈক্য অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই কারণে বঙ্গীয় আইন সভায় বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের, যাদের আইন সভায় দুই কক্ষ মিলে মোট সংখ্যা ছিল ৩০, সাহায্য আইনটিকে পাশ করার ব্যাপারে অপরিহার্য ছিল। আর এই সাহায্য পাওয়ার জন্য আইনের খসড়া থেকে শ্রমিক কল্যাণ মূলক প্রস্তাবিত ধারা উপধারা গুলি ছেঁটে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। এর ফলে এমন একটি জনকল্যাণমূলক আইন পাশ করা সত্ত্বেও মধ্যপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। বরং নূতন নূতন এলাকাতে বামপন্থীদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ হয়েছিল।

১৯২৩ সালে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন হয়। ঐ সংশোধিত আইনে তিন বছরের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনে মুসলমানদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময় থেকেই কলকাতা ও হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অবস্থিত ছোট বড় খুচরা ও পাইকারী মুসলমান দোকানের মালিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ শুরু হয়। হাসান সৈয়দ সুরাবর্দী কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হবার পর এই কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়। তবে এই পর্যায়ে মুসলমান দোকানদারদের নিজস্ব কোন সংগঠন গড়ে উঠছিল না। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হককে প্রধান মন্ত্রী করে বাংলায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। সুরাবর্দী ঐ মন্ত্রী সভার শ্রম বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে সুরাবর্দী শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রভাব বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব লেবার নামে সাদা ফ্ল্যাগধারী ইউনিয়নগুলির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। নূতন নূতন এলাকাতেও এই সময় বহু ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল। এদের মধ্যে বেঙ্গল সপ

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাসোসিয়েশন ছিল অন্যতম। শিল্প কারখানাগুলির মত অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক অতটা স্পষ্ট না হওয়ায় মালিকদের স্বার্থে গঠিত ইউনিয়নে কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা খুব অসুবিধা ছিলনা এবং বিশেষ করে মুসলিম লীগ সরকারে থাকায় ঐ সব ইউনিয়নগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়াও সহজ হয়েছিল। বড়বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের নিজেদের আলাদা সংগঠন ছিল। সিন্ধী ব্যবসায়ীদেরও আলাদা সংগঠন ছিল। আলাদা সংগঠন ছিল না শুধুমাত্র বাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ীদের। এই কারণে তারাও নবগঠিত 'বেঙ্গল সপ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাসোশিয়েশনে' যোগদান করেন। নবগঠিত ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন খান সাহেব আবদুল রউফ, সহ সভাপতি জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী, অবনীশ চন্দ্র দাস, এইচ. এম. এ. আরিফ। সভাপতি— শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; কোষাধ্যক্ষ-সারদাপ্রসাদ দত্ত; হিসাব রক্ষক-মাখনলাল সাহা; এবং সদস্য-আর সিয়দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব লেবারের অন্যান্য ইউনিটেও অনেক হিন্দু সদস্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে অবহেলিত শ্রেণীর আলাদা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। বাংলায় এই ধরনের কোন সংগঠন ছিল না। এই কারণেই বোধ হয় কিছু অবহেলিত শ্রেণীর শ্রমিকদের একটা অংশ সাদা ফ্ল্যাগধারী ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল। এই কারণে ক্রমে ক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের চরিত্র সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের চরিত্রের মধ্যে কিছুটা তফাৎ অনুভূত হয়।

অন্যদিকে ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইন সভায় কংগ্রেস বিরোধী পক্ষে যোগদান করে। এরপর থেকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সংযোগ বাড়িয়ে মুসলীম লীগকে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়াস নিতে শুরু করেছিলেন। ১৯২৪ সালে পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস কলকাতার বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত ওড়িয়া শ্রমিকদের একটি সংগঠন গঠন করেন। ঐ শ্রমিকদের মধ্যে বড় বাজারের মাড়োয়ারীদের দোকানের সঙ্গে যুক্ত অনেক ওড়িয়া মুটে মজুরও ছিল। হরিশা পার্কে ঐ সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সুভাষচন্দ্র বসু ঐ সমাবেশে বক্তৃতা দেন এবং সম্ভবত তিনি নুতন সংগঠনটির সভাপতিও মনোনীত হন। এর বাইরে কি কংগ্রেসের কি বাম ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের দোকান কর্মচারীদের সংগঠিত করার কোন প্রয়াস ছিল বলে জানা যায় না।

১৯৩৭ সালে ফজলু হক মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর পরই, অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৯৩৮ সালের জুন মাসে, কংগ্রেস সদস্য মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় দোকান নিয়ন্ত্রণ বিল (Bengal Shop Controlling Bill)' বঙ্গীয় আইন সভায় উত্থাপনের চেষ্টা করেন। আইন সভার বাইরেও বি.পি.টি.ইউ.সি.-র তরফ থেকে বড়বাজার এলাকাতে দোকানের কর্মচারীদের একাধিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শ্রম মন্ত্রীরা বিরোধিতার জন্যে দু দুবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিলটিকে আইনসভায় উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বড়বাজারের কর্মচারীদের সমাবেশের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ এবং এমনকি কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায়। তাতে সমাবেশে যোগদানকারী কিছু লোক আহত হয়।

১৯৩৯ সালের ১লা ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হুমায়ুন কবির 'বঙ্গীয় দোকানের সময় এবং কর্মচারী বিল (Bengal Shop Hours and Assistant Bill)' উত্থাপন করার চেষ্টা করেন। বিরোধী দলের এই প্রয়াসকে প্রতিহত করার জন্যে ১১ই ডিসেম্বর শ্রমমন্ত্রী নিজে 'বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিল (Bengal Shops & Assistant Bill)' আনয়ন করেন। বেসরকারী বিলগুলিতে শুধুমাত্র দেশীয় মালিকানাভুক্ত খুচরা ও পাইকারী দোকানেব কর্মচারীদের জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু সরকারী বিলের এলাকা আরও অনেক প্রসারিত ছিল। এই বিলে দেশী মালিকানাভুক্ত দোকানের কর্মচারীরা ছাড়াও বিদেশী মালিকানাভুক্ত ডালহৌসী পাড়ার সব সওদাগরী অফিস, কলিকাতা বন্দরস্থিত ডকগুলি, হোটেল, রেস্তরাঁ, মদের দোকান সবই ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যই বিলের ক্ষেত্র এতটা প্রসারিত করা হয়েছিল।

বিলে শ্রমিক কর্মচীদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দানের প্রস্তাব করা হয়েছিল তাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে কাজের সময় এবং মজুরী সংক্রান্ত বিষয়। বাৎসবিক কযেকটি নির্দিষ্ট ছুটি বাদ দিয়ে মাসে ২০৪ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়। রাত ৮টার পর কোন প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে না। অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী দিতে হবে এবং মাস পহেলায় মাইনে দিতে হবে।

দ্বিতীয বিভাগে ছুটি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রস্তাব, একটানা ১১ মাস বা তার বেশি কাজ করলে অসুস্থতার জন্য অর্ধেক বেতন সহ একমাস প্রিভিলেজ লিভ এবং একটানা ৯ মাস কাজ করলে ১৫ দিন ক্যাজুয়াল লিভ প্রদানের প্রস্তাব ছিল।

চাকুরীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু। প্রতিটি সংস্থাকে হাজিরা খাতা এবং চাকুরী সংক্রোন্ত নথিপত্র বাখা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছিল এবং নিয়োগের ব্যাপারে জনগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেবার ব্যাপারটিও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছিল।

সর্বশেব ভাগে শাস্তিমূলক কিছু প্রস্তাব ছিল। বিলে বর্ণিত সুযোগ সুবিধাগুলি মালিকরা ঠিকমত না মানলে তাদের জরিমানা এমন কি জেলে আটক করার পর্যন্ত প্রস্তাব ছিল।

অতি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একটি বইয়ে 'বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইনটি' যে ভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মনে হয় কোন রকম সংশোধন ছাড়াই বিলটি পাশ হয়ে গিয়েছিল এবং বিলটি পাশের পর লীগ প্রজা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা খুব বেড়েছিল বলেও লেখকের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু বিলটি পাশ করা সংক্রান্ত যে সমস্ত নথিপত্র আমাদের হাতে এসেছে তাতে অবস্থা একেবারে অন্য রকম ছিল বলে মনে হয়।

সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের জনকল্যাণ মূলক বিল আইন সভায় উত্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সিন্ধি ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফ থেকে সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে

বিলটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করার জন্যে দাবী জানান হয়। তাদের দাবী না মানলে তারা এই প্রদেশ থেকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে বলেও সরকারকে ভয় দেখানো হয়। বিদেশী পুঁজিপতিদের মনোভাব অতটা কঠোর ছিল না। তারা নিজেরা অত্যন্ত সংগঠিত ছিল। বিদেশী ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'বেঙ্গল ট্রেডার্স অ্যাশোসিয়েশন' এ ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগযোগ করে। বেঙ্গল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের আইন সভার প্রতিনিধি মিঃ জে.বি. রোজ বিলটিকে সমর্থন করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংশোধনী দাবী করেন। যেমন বিদেশী মালিকানাধীন সওদাগরী অফিস এবং কলিকাতা বন্দরের অন্তর্ভুক্ত ডকগুলিকে বিলের আওতা থেকে বাদ দিতে হবে। এবাদে অসুস্থতা জনিত স-বেতন ছুটি, অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী, অন্যান্য অতিরিক্ত ছুটি এবং বিশেষ করে বিলের প্রস্তাবিত সুযোগ সুবিধা কর্মচারীদের না দিলে শাস্তির প্রস্তাব ছিল,সেগুলির উপরও ইউরোপীয়ান সদস্য সংশোধন চেয়েছিলেন।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দাবী অনুযায়ী বিলটিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। বিলটির উপর সমস্ত আলোচনা শ্রম মন্ত্রী নিজে পরিচালনা করেছিলেন। প্রাথমিক আলোচনার পর বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়। তৎকালীন বাংলার গভর্নর ভাইসরয়কে লিখেছিলেন 'The European group started manoeuvring the members of the Committee, presumably to get exemptions desired by them.' তবে ঐ তোষামোদে কাজ হয়নি। ১৯৪০ সালের আগস্টমাসে যখন বিলটি সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল তখনও বিদেশীদের মালিকানাভুক্ত সংস্থাগুলি বিলের আওতায় ছিল।

বিলের উপর আলোচনা শুরু হবার পরে মিঃ রোজ সওদাগরী অফিস ও ডক বিলের আওতা থেকে বাদ দিতে চাইলে আইন সভায় খুব হৈ চৈ শুরু হয়। বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে কৃষক প্রজা দলের অধিকাংশ সদস্য এবং এমনকি মুসলিম লীগের আইন সভার একটি অংশ মিলিত ভাবে উপরন্তু সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন সময়ে বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত সওদাগরী অফিস এবং কলিকাতা বন্দর ছিল শিক্ষিত উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদের প্রধান কর্মস্থল। ১৯৩১ সালে লণ্ডনে যে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ভারতে ব্যবসায়-রত বিদেশী পুঁজিপতিরা প্রস্তাবিত ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের স্বায়ত্তশাসন আইনে ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবী করেছিল। ঐ দাবী অন্যান্যদের মধ্যে যাতে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিরা সমর্থন করে তার জন্যে বিদেশী পুঁজিপতিদের তরফ থেকে নানারকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কলকাতার ডালহৌসী পাড়ায় অবস্থিত সওদাগরী অফিসে এবং কলিকাতা বন্দরে অনেক মুসলমান যুবককে চাকুরী দেওয়া ঐ প্রস্তুতির অঙ্গ বিশেষ।

আইনসভার বাইরেও বিষয়টি নিয়ে দারুণ হৈ চৈ হয়। কলিকাতা বন্দরের করণিকদের ইউনিয়ন 'ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃপক্ষকে ধর্মঘট করার হুমকি দেয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে পোর্ট

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মিঃ এলডারটন সংস্থা ভিত্তিকভাবে কর্মচারীদের দাবী দাওয়া মেটানোর আশ্বাস দিয়ে ইউনিয়নকে ধর্মঘট শুরু করা থেকে বিরত করেন। ১৯৪০ সালে কম্যুনিস্ট যুবকরা কলকাতাতে যে ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট গঠন করেছিল, তাদের তরফ থেকে সওদাগরী অফিসের করণিকরা কিভাবে শোষিত হয় তাকে বিষয়বস্তু করে 'কেরানী' নাটকের অভিনয় করা হয়েছিল।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে দেশীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থে আইন সভায় যে সমস্ত সংশোধনীগুলি চাওয়া হবে তারা তা সমর্থন করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশী পুঁজিপতিদের সদস্যরা আইন সভার বাইরে কিছু সংখ্যক দেশীয় আইনসভার সদস্যদের মধ্যে চুক্তি করেন। এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত সংশোধনটি পাশ করতে গিয়ে সুরাবর্দীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে অচিরেই কমার্শিয়াল হাউসগুলির কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা দানের জন্য আর একটি নতুন বিল আনা হবে।

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী এবং বর্ধমানের মহারাজা বি.পি. সিংহ রায় কর্তৃক আণীত আরও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব, যেমন প্রিভিলেজ লিভ পেতে গেলে ১১ মাসের পরিবর্তে টানা এক বছর কাজ করতে হবে, ১৪ দিনের পরিবর্তে ১০ দিন ক্যাজুয়্যাল লিভ এবং শাস্তি দানের প্রস্তাবেব যে ধারাটি ছিল তার থেকে জেলে আটক রাখার অধিকার বাদ দেওয়া পাশ হয়।

ঐ সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সমর্থন করতে গিয়ে জে.বি রোজ আইন সভায় বলেছিলেন : "... ... The Calcutta Traders Association, the largest association of the employers of the shop assistants in Bengal, have declared themselves in full sympathy with the object of measure and to be strongly in favour of finding a place in the statute Book of the province". এরপর বিলটি আইনসভার নিম্নকক্ষ থেকে পাশ হয়ে উচ্চ কক্ষে গেলে বিদেশী প্রতিনিধি মিঃ লেডলস আরও কিছু সংশোধনী প্রস্তাব আনেন এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলিও পাশ হয়ে যায়। ঐ সংশোধনীগুলি ছিল, যথাক্রমে হোটেল ও মদের দোকান অর্থাৎ আনন্দ ফূর্তি করার প্রতিষ্ঠান-বিলে প্রস্তাবিত কাজের ঘণ্টার উপর যে নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করা হয়েছে তা প্রযোজ্য হবেনা। নিয়োগ, হাজিরা খাতা, চাকুরী সংক্রান্ত নথিপত্র এবং নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রস্তাবও ঐ সমস্ত জায়গাতে প্রযোজ্য হবে না।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে, তখন বিলটি পাশ হয় এবং ১৯৪১ সাল থেকে কলকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকযুক্ত অঞ্চলে বলবৎ করা হয়। ক্রমে ক্রমে আইনটি সারা বাংলায় প্রযোজ্য হবার ব্যবস্থাও আইনে ছিল।

উপসংহার : অসংগঠিত ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত করার ব্যাপারে 'বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৪০' নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে

ডালহৌসি পাড়ার সওদাগরী অফিসগুলিতে ২/১ টি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐগুলি বেশীদিন টিকে ছিল না। কমিউনিস্টরা যেহেতু ছোটলোক শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিযন আন্দোলন করতেন, তার জন্যে ভদ্রলোকের ঘর থেকে আসা শিক্ষিত করণিকেবা তাদের সঙ্গে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলতেন। কলকারখানাতেও একই অবস্থা ছিল। মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসার পর সাদা ফ্ল্যাগধারী ইউনিয়নগুলিতে যোগ দিলে বেশী করে আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে বলে কলকারখানায় নিযুক্ত করণিকদের একটা অংশ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব লেবারের বিভিন্ন ইউনিটে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৪০' থেকে সওদাগরী অফিসগুলি বাদ যাওয়ায় কেরানীকুল এবার বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছিলেন যুদ্ধের সময় থেকেই। অর্থাৎ যখন থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক শ্রমিক সংঘ, যেটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংঘের প্রাদেশিক শাখা ছিল, সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হত, তাতে দলে দলে সওদাগর অফিসের করণিকরা যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলাব কলকারখানায় যে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটগুলি হয়েছিল তাতে ঐ সব কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত করণিকরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

করণিকদের মতন অতটা প্রভাব বিস্তার না করতে পারলেও নতুন আইনটি দোকানের কর্মচারী, হোটেল রেস্তরাঁর খানসামা ও বাবুর্চিব মধ্যেও দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। শ্রমমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব এবং বিশেষ করে সাদা ফ্ল্যাগধারী ইউনিয়নের সংগঠক, যখন প্রথম বিলটি এনেছিলেন তখন সকলের মনে দারুণ আশার সঞ্চার হয়েছিল। এই বিলটি আসার অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত দুটি আসনেই কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব লেবার-এর প্রতিনিধিরা হারিয়ে দেয়। কিন্তু সংশোধিত বিলটি পাশ হবার পরে এবং আইনটি ঠিকমত বলবৎ না হওয়ার জন্যে তারা খুব আশাহত হয়। এখন তাদের কাছে শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কটা খুব স্পষ্ট হয়েছিল। কর্মচারীরা 'বেঙ্গল সপ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাসোসিয়েশন' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বি.এম.সি. এলে-র অন্যান্য ইউনিটের উপরও এই আইনের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল। শ্রমিকরা ইউনিয়ন ত্যাগ করায় সব ইউনিটই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৬ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় বি.এন.সি.এল. চারটি শ্রমিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তাদের একজন প্রতিনিধি ছাড়া সকলেই সামান্য সংখ্যক ভোট পেয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগে পর্যন্ত, মৌলবাদীরাও শ্রমিক শ্রেণীর উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

সর্বোপরি তৃণমূল স্তরের সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় নানা রকম দুর্যোগের মধ্যেও মৌলবাদীরা প্রাদেশিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এই অবস্থাটা সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে না থাকায় বাংলাকেও শেষ পর্যন্ত মৌলবাদের শিকার হতে হয়েছিল।

আজকের বিবেকানন্দ

স্বরূপ কুমার দাস

বাংলা তথা ভারতের মনন জগতে উনবিংশ শতাব্দী আশা-নিরাশা, ভাবনা-দুর্ভাবনার দোলায় দোদুল্যমান। চাওয়া না পাওয়ার বেদনা নিয়ে উনিশ শতকের মানুষদের (তাদের কার্যধারা) মুছে ফেলার জন্য ঘটে গেছে মূর্তিভাঙার আন্দোলন। আবার শ্রেয় ও প্রেয়র আশায় উদ্দীপ্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন উনিশ শতক থেকেই অব্যাহত যা এখনো গতিশীল।

উনিশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের শিল্প সাহিত্যের জগত মধ্যবিত্তের প্রভাবাধীন। হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যাপক প্রভাব হেতু তিনি ভারতের রাজনীতি ও সমাজনীতির সামনে বার বার উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমান রাষ্ট্রশক্তি (কংগ্রেস সরকার) বিবেকানন্দকে যুবসমাজের কাছে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর জন্মদিনে 'জাতীয় যুবদিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে।

বিবেকানন্দ ঘরানার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল রামকৃষ্ণ মিশন ঘরানী। এই ঘরানার মূল কথা হল - প্রথম থেকেই স্বামীজী একজন 'চিহ্নিত' ব্যক্তি। তাঁর গুরুর লীলা সহচর, লোকশিক্ষার জন্য তাঁর জন্ম, নরঋষি, অখণ্ডের ঘর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে মর্তে আগমন।[১] .... স্বামী বিবেকানন্দের মহিমা ও মাহাত্ম্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের মহিমাকে বুঝিবার .... বাধা হইতেছে তাঁহার কালীবচ্ছিন্ন রূপ[২]। এই অনৈতিহাসিক ঘরানাটি বিবেকানন্দ আন্দোলনে সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই ধরনের চিন্তাধারা মানুষকে ইতিহাস বিমুখ করে তোলে। পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে বিষয়ের আলোচনা অযথা প্রাধান্য পায়। ইতিহাস বিযুক্ত আলোচনা জনমানসে যে কোন বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ গড়ে তোলে। .... মিথ আদপেই ইতিহাসকে বরদাস্ত করতে রাজি নয়। মিথের মারফৎ নানা বিসংগত উপাদান দানা বেঁধে ওঠে, তৈরী হয় জমাটবদ্ধ, সুসঙ্গত এক আদল। মিথিক বাচন প্রাপকের কাছে উসৃত হয় নিরপেক্ষতার মুখোশে; যেন তার বিস্তারের কোন সীমা নেই, সার্বজনীন ও সর্বকালীন তার প্রসার ও প্রতিপত্তি[৩]।

জনমানসে বিবেকানন্দকে নিয়ে এই ধরনের মিথ গড়ে উঠেছে। তিনি জনমানসে মহাপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে অন্যধরনের মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা দেয় ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া। শ্রী নিরঞ্জন ধরের 'বিবেকানন্দ অন্যচোখে' প্রকাশিত হবার পর বিবেকানন্দ অনুরাগীদের কিছু চিঠি লেখকের কাছে যায়। উক্ত গ্রন্থের লেখকের ভাষায় দু-চারটি চিঠিতে আমার নগন্য প্রচেষ্টা প্রশংসিত হলেও অন্য সকল

চিঠিতে অমায় ধিক্কার জানানো হয়েছে। নানা কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে[৪]।এক্ষেত্রে লক্ষনীয় হল যে নিরঞ্জন ধরের বক্তব্যের বিরোধিতার ভিত্তি অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিবহির্ভূত আবেগ। উদাহরণ স্বরূপ লেখক (নিরঞ্জন ধর) স্বামীজির চরিত্রের হিমালয় সদৃশ দিকটি বুঝে উঠতে না পেরে (তিনি) একটি বিচ্যুতির অনুসন্ধান কেবল করেছেন। যদিও এর দ্বারা স্বামীজি ক্ষুদ্র হবেন না। ক্ষুদ্র হবো আমরাই ..... [৫]। শ্রী ধরের মতে বিবেকানন্দ অভাব থেকেই সন্ন্যাস জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন।[৬]। ইনি ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা[৭]।

অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর মতে বিবেকানন্দ পুনরভ্যুত্থানবাদী নন[৮]। বিবেকানন্দ নিরন্তর, চিন্তাশীল দেশব্রতী ধর্মভাবাপন্ন মানুষ[৯]।

বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন যেমন মিথের শিকার, বিবেকানন্দ নিজেও মিথের জগতে বিচরণকারী। মিথ এক দ্বিতীয় ভাষা, এক ধরনের অধিভাষা (যেটা ল্যাঙ্গয়েজ) .. .. .. ঔপনিবেশিক আমলে যেমন 'কালো মানুষ শুধু কালোমানুষ থাকে না। হয়ে ওঠে যাবতীয় অশিক্ষা ও বর্বরতার জ্ঞাপক[১০]।অনুরূপভাবে বিবেকানন্দ ভারতের জনবিন্যাস শিকেয় তুলে রেখে ভারতকে হিন্দু জাতির দেশে পরিণত করেছেন। তাঁর কাছে হিন্দু অর্থ একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় দর্শন, আচরন তার উত্তরাধিকার, এককথায় একটা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতির মানুষ। তাঁর কাছে গীতা গঙ্গা,হিন্দুর হিন্দুয়ানি[১১]। আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিযে ফেলেছে।সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট........ আবার তাদের উঠবার যে শক্তি তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে-গোঁড়া হিন্দুদেরই একাজ করতে হবে[১২]।

তাই ১৯৯২ এর ৬ই ডিসেম্বরের মত জাতীয় বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দকে ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করার আগে বিবেকানন্দের ভারতবর্ষকে বিচার করে নেওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘকালীন পদ্ধতিতে বিবেকানন্দ ভারতের রাজনীতিতে দক্ষিণ পন্থা হিন্দুত্ববাদকেই শক্তিশালী করবে। প্রভা দীক্ষিতের মতে বিবেকানন্দ অচেতন ভাবে ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের আদর্শ তৈরী করেছেন[১৩]। বিবেকানন্দের চিন্তাপদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে দুর্বলতা। তাঁর নিজের কথায়, আমি লিখতেও পারিনা বক্তৃতা করতে পারিনা। কিন্তু আমি গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারি। আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই তখন বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি[১৪]।

তথ্য বিপ্লব ও পাশাপাশি তথ্য সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি হয়ে তৃতীয় বিশ্বের যে কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের (identity) জন্য প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণ। যার মধ্যে বিবেকানন্দ নিজেও প্রবেশ করতে রাজি নন। তাঁর নিজের ভাষায়-আমি স্বভাবতই কল্পনা প্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদী হয়েই আমি জন্মেছি এবং স্বপ্নরাজ্যেই আমি বাস করতে পারি[১৫]। এই রোমান্টিকতা তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে বিপথের সহযাত্রী।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাঃ),চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃ ৭৩, কলকাতা।
২। ঐ, পৃ ১।
৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস, পৃ ১১, কলকাতা।
৪। নিবঞ্জন ধব বিবেকানন্দ অন্যচোখে, পৃ ৯৩ কলকাতা।
৫। ঐ পৃ ৯২।
৬। ঐ, পৃ ২।
৭। ঐ, পৃ ৬০।
৮। তপন বায়চৌধুবী,ইউবোপ পুনর্দর্শন, কলকাতা, ১২ পৃষ্ঠা।
৯। ঐ, ২৫৪ পৃষ্ঠা।
১০। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস, পৃ ৬, কলকাতা।
১১। স্বামী বিবেকানন্দ; বাণী ও বচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, পৃ ৬২।
১২। ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪১৩।
১৩। Prava Dixit The Political and Social Dimension of Vivekananda's Ideology
১৪। স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও বচনা, ষষ্ঠ খণ্ড কলকাতা, পৃ ৪০৪।
১৫। ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃ ৮৯।

ঐতিহাসিক তথ্যের ভ্রম সংশোধন

বসন্ত কুমার সামন্ত

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অসত্য সংবাদ, এমন কি জনশ্রুতি দীর্ঘ দিনের অবকাশে প্রতিষ্ঠিত তথ্য হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এ জাতীয় ঐতিহাসিক তথ্য-ভ্রান্তি গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালিয়ে সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংশোধিত তথ্য দীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত-থাকা ইতিহাসের সেই ভ্রান্তিকে সরিয়ে সহজে স্থান লাভ করতে পারে কি? ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবিষয়ে একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি।

শহীদ কানাইলাল দত্তের ছটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থে, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অন্য বিপ্লবীদের লেখা স্মৃতি চারণে এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের উপর লেখা কিছু প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের নির্দেশে কানাইলালের প্রাপ্য বি.এ. ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মতিলাল রায় প্রণীত জীবনীতে আছে,"পরীক্ষায় কানাই উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথের হত্যাপরাধ প্রমাণ হইলে গভর্নমেন্ট তাহার ডিগ্রী কাড়িয়া লয় ...."[১]। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থে লিখেছিলেন,'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলালের বি.এ. ডিগ্রি কেড়ে নেয়"[২]। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় মন্তব্য করেছিলেন "কানাই দত্তের ডিগ্রি কেড়ে নেওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়েনি, যেমন মান বাড়েনি ইংলিশ বার্-এর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও বিনায়ক সাভারকারের ব্যারিস্টারের সনদ ছিনিয়ে নেবার নীচতায়"[৩]।

Institute of Historical Studies, Calcutta থেকে প্রকাশিত Dictionary of National Biography-তে কানাইলাল সম্পর্কে আছে,"But as he was then under death sentence, the British authorities ordered withholding of his degree."[৪] সংসদ চরিতাভিধান, ভারতকোষ প্রভৃতি গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য বর্তমান।

কানাইলাল হুগলী কলেজ (বর্তমান নাম হুগলী মহসিন কলেজ) থেকে ১৯০৮ সালে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন জাস্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। যাঁর মানসিকতা বিদেশী শাসকের নির্বিচার আনুগত্যের পরিচায়ক ছিল না।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের আমলে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা সম্পর্কে আনীত বিলের আলোচনা কালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে আশুতোষ বলেছিলেন,"I willingly concede that high education is one of the

paramount duties of the state and that it must be nurtured and developed under the fostering care of a beneficent Government. But I deny most emphatically that it is necessary or desirable to have any provisions in the law which may possibly convert the Universities into mere departments of the State; it is quite possible to stunt the growth of a beautiful tree by constant prunning and too affectionate care."[১]

বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি আইন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই আইন চালু হওয়ার পর ১৯০৬-এর ৩১ শে মার্চ তারিখে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি "বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং কর্তৃত্বের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা চাই, ইহা রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য লইবে কিন্তু দাস মনোভাবে দুষ্ট হইবে না এই ছিল তাঁর আদর্শ"[৬]। পরবর্তীকালে পূর্ব বঙ্গের ছোটলাট ফুলারের অনুরোধ সত্বেও উপাচার্য আশুতোষ সেখানকার দুটি বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করেন নি। তাঁর এ জাতীয় কাজের আরও নজীর আছে।

কানাইলালের জন্ম শতবর্ষে যখন তাঁর সম্বন্ধে নূতন করে আলোচনা শুরু হয়েছিল তখন বর্তমান প্রবন্ধকার হুগলী মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ। শহীদ কানাইলালের ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করার প্রচলিত ইতিহাসকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বয়ং কর্তৃত্বের মনোভাবের নিরিখে বিচার করে মনে হয়েছিল যে এই ইতিহাসের মধ্যে ভ্রান্তি থাকতে পারে। তখন ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৮ ধারায় আছে —

Cancellation of degrees and the like :– "When evidence is laid before the Syndicate showing that any person on whom a degree, diploma, licence, title or mark of honour conferred or granted by the Senate has been convicted of what is, in their opinion, serious offence, the Syndicate may propose to the Senate that the degree, diploma, licence, title or mark of honour be cancelled, and if the proposal is accepted by not less than two-thirds of the Fellows present at a meeting of the Senate and is confirmed by the Chancellor, the degree, diploma, licence, title or mark of honour shall be cancelled accordingly".

কাজেই তেমন অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করার আইন থাকলেও সে ব্যবস্থা কার্যকর করতে সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব, সেনেটের সেই প্রস্তাব অনুমোদন ও আচার্যের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু সেনেট সিণ্ডিকেটের এমন কোন সভা বিবরণীর কথা জানা যায় নি। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কানাইলালের ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে ডিগ্রি প্রাপকদের তালিকায় অন্য সফল পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কানাইলাল দত্তের নাম থাকবে এই ধারণা নিয়ে ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার-এর পাতা উল্টে দেখা গেল যে ১৯০৮ সালের

স্নাতকদের মধ্যে হুগলী কলেজের ছাত্র হিসাবে তাঁর নাম মুদ্রিত আছে (যেমন, ১৯০৯-এর ক্যালেণ্ডার এ ৪৩০ পৃষ্ঠায়, ১৯১২-এর ক্যালেণ্ডার-এ ২৭৬ পৃষ্ঠায়, ১৯১৩ এর ক্যালেণ্ডার-এ ২৭৪ পৃষ্টায়)। অবশ্যই এ কোন আবিষ্কার নয়, শুধু অনুসন্ধান। তবু একটু অবাক হতে হল। কারণ, এত বৎসরে কানাইলাল প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডার দেখা হল না কেন!

তা ছাড়া, স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিপ্লবী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কানাইলালের 'প্রথম' স্মৃতি সভায় একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল-"কানাইলাল দত্তের এই স্মৃতি সভা দাবী জানাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক দিন সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে পড়িয়া তথাকথিত দুর্নীতির জন্য কানাইলাল দত্তের বি.এ. ডিগ্রি খারিজ করিয়া যে কলঙ্ক অর্জন করিয়াছেন, বর্তমান ভারতে সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য তাহা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকে (calendar) নথিভুক্ত করা হউক, কারণ জাতি কানাইলালের কার্যকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন"। এ প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছিলেন পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী এবং সমর্থন ও অনুমোদন করেছিলেন সুধীর কুমার মিত্র ও গণপতি সরকার।

প্রস্তাবটি নেওয়ার আগে স্পষ্টতই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডার দেখা হয়নি। দুঃখের ব্যাপার এই, এমন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কেউ পুরাতন ক্যালেণ্ডার খুলে দেখলেন না। প্রস্তাবের কপি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা। অন্তত ১১ নভেম্বরের খবরের কাগজ দেখে বিশেষ করে ১৯০৯ সালের ক্যালেণ্ডার (১৯০৮-এর পরীক্ষার ফলের সঙ্গে সারাংশ ১৯০৯-এ মুদ্রিত হত) দেখলেই প্রস্তাবের বয়ান অনুসারে 'বিশ্ববিদ্যালয় যে কলঙ্ক অর্জন করিয়াছিলেন' তা থেকে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে মুক্তি ঘটত। সে সময়ে কেন তা হয়নি তা বোধগম্য নয়। সহজ ব্যাখ্যায় মনে হয়, এর কারণ, উদাসীনতা।

এর ৪১ বৎসর পরে শহীদ কানাইলালের জন্মশতবর্ষে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ সেনেটের এক বিশেষ সভায় একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল,-"The Senate accepted the proposal of Dr. Abirlal Mukherjee seconded by Sri Anil Biswas, for awarding the B.A. Degree posthumously to Sahid Kanailal Datta, the great revolutionary, whose B.A. Degree was kept witheld and not awarded to him under orders of the then British Government."[৭]

ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করা হয়ে থাকলে সেনেটে গৃহীত এই প্রস্তাব ছিল সাধু ও সময়োচিত। এ প্রস্তাবকে কানাইলালের জ্ঞানমাতৃকা হুগলী মহসিন কলেজের ছাত্র সংসদ ৭.৮.৮৮ তারিখে অভিনন্দিত করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধকার তখন পদাধিকার বলে ছাত্র সংসদের সভাপতি।

সেনেটের এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রায় চার মাস পরে ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার থেকে জানা গিয়েছিল যে কানাইলালের ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত হয়নি। তবে ১৯০৯-এর ১৩ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন সভায় কানাইলালের হাতে তাঁর প্রাপ্য অভিজ্ঞান পত্র তুলে

দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ তার আগেই ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

কিন্তু ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত না করেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কি ভাবে এমন মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেন? অনুসন্ধান করে তার একটি সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া গেল। Report on Native papers in Bengal,এ সে যুগের বিখ্যাত 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ১৯০৮-এর ২২ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্ক আছে,"Kanai passed the B.A. examination with Honours. The result was published when he was in *hajat*. We hear that the authorities of the *Golamkhana* (slave house) have not sent his diploma".[৮] এ থেকে মনে হয়, 'সন্ধ্যা'র এই "we hear" অর্থাৎ জনশ্রুতি মূলক সংবাদটি বঙ্গদেশের তখনকার স্বদেশী আবহাওয়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল এবং ক্রমে ঐতিহাসিক তথ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে শাসক ইংরেজ সে সময়ে কানাইলালের ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করার কথা ভেবে থাকলেও কালীঘাট শ্মশানে শহীদ কানাইলালের শব-শোভাযাত্রা ও সমারোহ দেখে এবং তাঁর জনপ্রিয়তা বুঝে সে বিষয়ে আর অগ্রসর হন নি।

এগুলি বর্তমান প্রবন্ধকারের নিজস্ব অনুমান। যেহেতু প্রবন্ধকার এক জন গণিতের ছাত্র, ইতিহাস গবেষক বা বিশেষজ্ঞ নয়, তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার অধিকার তার নেই। প্রসঙ্গত জানাই 'সন্ধ্যা'র পূর্বোক্ত সংবাদে, **Dictionary of National Biography**-তে এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থে (এক গ্রন্থকার লিখেছেন, 'কানাইলাল ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন') একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কানাইলাল (Roll Hug No. 25) অনার্স ছেড়ে পাশ কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মার্কস রেজিস্টারে-এ তাঁর প্রাপ্ত নম্বর,ইংরাজিতে ৩৪+৫, দর্শনে ৭৬, ইতিহাসে ৭৮, মোট ২৩৩।

কানাইলালের ডিগ্রি যখন বাজেয়াপ্ত হয়নি, সমাবর্তনে তাঁর মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতির জন্য তাঁকে অভিজ্ঞান-পত্র যখন দেওয়া যায়নি, তখন অবিতরিত ডিগ্রি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরে সেটি কলেজে পাঠাতে পারেন। এমন ধারণার ভিত্তিতে হুগলী কলেজের পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে সন্ধান করতে গিয়ে অবশেষে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষ দিকে একটি খামের মধ্যে ১৭টি অবিতরিত ডিগ্রি-সার্টিফিকেটের সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলি ১৮৮৫ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে পাশ করা ছাত্রদের; ১০টি বি.এল. পরীক্ষায় ও ৭টি বি.এ. পরীক্ষার-যেগুলির মধ্যে একটি ছিল উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত কানাইলাল দত্তের বি.এ. ডিগ্রি।

প্রবন্ধের উপসংহারে কয়েকটি কথা জানাবার আছে। হুগলী মহসিন কলেজে খুঁজে পাওয়া কানাইলালের আসল ডিগ্রি অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার পর সেটি রাজ্যপালের সচিবের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছিল। কানাইলালের ডিগ্রি-অভিজ্ঞান ও রাজ্যপালের সচিবের চিঠির কপি সঙ্গে দেওয়া হল। কানাইলালের জন্মক্ষেত্র চন্দননগরে ১৯৮৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে শহীদ কানাইলালের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চে তদানীন্তন

অভিজ্ঞান পত্র নিবেদিত হয়েছিল। ডিগ্রি খুঁজে পাওয়ার পরে কানাইলালের ডিগ্রি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়নি তা নিশ্চিতভাবে জানা গেল। কিন্তু নতুন এই তথ্য ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠল না। এখনও কিছু লেখার মধ্যে ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভুল সংবাদই পরিবেশিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে কৃত্তিবাস ওঝা লিখিত 'সংশপ্তক ক্ষুদিরাম' গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া, ১৯৮৮ সালের ২৬ মার্চ তারিখে গৃহীত সেনেটের প্রস্তাব, যার শেষাংশে ছিল "Kanailal Datta, the great revolutionary, whose B.A. Degree was kept witheld and not awarded to him under orders of the then British Government" আজও প্রত্যাহৃত হয়নি। ফলে ডিগ্রি খুঁজে পাওয়ার ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে ঐ প্রস্তাবের বলে ভবিষ্যতে একথাও ভাবা হতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন একটি ডিগ্রি অভিজ্ঞান তৈরী করে বিশেষ সমাবর্তনে কানাইলালের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ডিগ্রি অবিতরিত ডিগ্রি হিসাবে হুগলী মহসিন কলেজে খুঁজে পাওয়ার কথা উহ্য হয়ে থাকবে এবং উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে শহীদ কানাইলালের ডিগ্রি বাজেয়াপ্ত করার মতো কলঙ্কজনক কাজের নায়ক হয়ে থাকবেন।

বর্তমান প্রবন্ধকার একটি গ্রন্থের (শহীদ কানাইলাল : নূতন তথ্যের আলোকে - ডঃ বসন্ত কুমার সামন্ত, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৯০, 'সাহিত্যলোক', ৩২/৭ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬) মাধ্যমে কানাই-জীবন সম্পর্ক সংশোধিত তথ্য পাঠকদের জানাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মূল ডিগ্রি-অভিজ্ঞান যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটি বিশেষ সমাবর্তনে ব্যবহৃত হয়েছিল তা অনেকেই জানেন না, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বড় অংশ এ-খবর রাখেন না। কাজেই প্রশ্ন থেকে যায়- ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া পুরাতন ভ্রান্ত তথ্যের সংশোধন কিভাবে হবে? ঐতিহাসিক তথ্যের ভ্রম সংশোধন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার কার্যকর পন্থা কী?

সূত্রনির্দেশ

১। **বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল**,মতিলাল রায় (তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭), পৃঃ ৩৯।

২। **বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি**,যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৩৬৩), পৃঃ ২৮১।

৩। **ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব**,ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় (প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৭, পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৩৮০) পৃঃ ৯৪।

৪। **Dictionary of National Biography** Vol I (1972 Institute of Historical Studies, Calcutta), P 390

৫। **Proceedings of the Council of the Governor General of India**, Vol X L III - 1904, P 277

৬। **ভারতকোষ**, প্রথম খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), প্রিয়রঞ্জন সেন লিখিত 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়', পৃঃ ৩৯০।

৭। 'গণশক্তি', তাং ৩০ আগষ্ট ১৯৮৮।

৮। **Report on Native Papers in Bengal** for the week ending the 26th September 1908, para 56. P 1698

পরিশিষ্ট

CHANCELLOR'S SECRETARIAT

From	:	The Secretary to the Chancellor
To	:	The Principal, Hooghly Mohsin College Chinsurah Hooghly
No	:	277-Edn.(U) Dated Calcutta, the 10th April, 1989

Sir,

I am directed by order of the Chancellor to state that it has been decided that the B.A. degree awarded to late Kanai Lal Dutta by Calcutta University which is lying in the custody of the Principal, Hooghly Mohsin College, may be handed over to Sri K.R. Saha, authorised respresentative of the Secretary, Education Department, Government of West Bengal, who in turn shall hand it over to the Vice-Chancellor, Calcutta University. With the approval of the Chancellor it has also been decided that in the Special Convocation which has been scheduled to be held on 13th April, 1989 at Chandernagore by the Calcutta University, the Vice-Chancellor, Calcutta University shall hand over the document to the Vice-Chancellor, Burdwan University who will keep it in his custody.

Yours, faithfully,
Sd/- Illegible
Secretary to the Chancellor

স্বাদেশিকতা ও ধূর্জটিপ্রসাদ

অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা

'স্বাদেশিকতা'র সাধারণ অর্থ হল নিজের দেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন, ভাবনা চিন্তা করা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের আন্দোলনে সামিল হওয়া। ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনকাল ১৮৯৪ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনগুলি আত্মপ্রকাশ করে তার সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদেব পরিচয় ছিল। স্বাধীনতার পরও ১৫ বছর ধূর্জটিপ্রসাদ বেঁচে ছিলেন, অর্থাৎ নব ভারত গঠনেব পরিকল্পনাব যুগে ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমরা লক্ষ করি।

১

ধূর্জটিপ্রসাদের স্বদেশ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার পটভূমি ও প্রভাবকারী উপাদানগুলি আমাদের জানা দরকার। প্রথমতঃ পারিবারিক পরিবেশ ছিল স্বদেশ ভাবনার সহায়ক ও অনুকূল। ইতিহাস সচেতনতা ও জাতীয়তার উন্মেষ কিশোর ধূর্জটির মধ্যে গড়ে ওঠে যখন বাবা ভূপতিনাথকে সারাদিন ওকালতী পেশাগত ক্লান্তির পর সন্ধ্যায় মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস, গ্ল্যাডষ্টোনের জীবনী পড়ে শোনাতে হত। বাবা কিশোর ধূর্জটিকে ব্যাখ্যা করে শোনাতেন মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন-এর ডিস্‌রেলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণগুলি, সেই সঙ্গে ইংরেজী পার্লামেণ্ট আর কনস্টিটিউশান[১]।

বাড়ীর বৈঠকখানায় গুরুজনদের সান্ধ্যকালীন বৈঠকগুলিও কিশোর ধূর্জটির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর কথায় "আমাদের ছেলেবয়সে বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে, গুরুজনেরাই রাজনীতির চর্চা করতেন। সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় বসে হোইটহলের আদ্যশ্রাদ্ধ হত। সে শ্রাদ্ধসভায় গভর্নমেণ্টের legislative excutive এবং judicial functions-এর পৃথকীকরণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণোচিত কূটতর্ক উঠতো। সে তর্কে বিলেতী শ্রুতিস্মৃতির বিচার চলত এবং সে বিচারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বিদায়ের ঝামেলা সহ্য করতে হতো অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের। আমার বিশ্বাস, সেই থেকেই ভারত ললনা 'সাধের ঘুমঘোর' থেকে প্রথম জেগে উঠলেন"[২]।

এই শতাব্দীর গোড়ায় লাল-বাল-পাল, অরবিন্দ যে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলেন তাতে ধূর্জটির মতো ছেলে ছোকরারা মেতে ওঠে। প্রধান কাজ হল 'ভলাণ্টিয়ারি করা, ভোরবেলা লাঠিখেলা, দুপুরবেলা স্কুল পালিয়ে গানের মহলা দেওয়া, বিকেলবেলা দেশী

কাপড় ফিরি করা, রাত দশটায় বাড়ি ফেরা। তখন আমাদের আকাশে বাতাসে মাদকতা, প্রাণে আশা, মনে আলো। স্বদেশী বস্ত্রালয়, স্বদেশী ফ্যাক্টরি, স্বদেশী স্কুল, স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী গান, স্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বদেশী মন, স্বদেশী যুগ''[২]।

দ্বিতীয়তঃ, স্কুল-কলেজের সহপাঠী ও শিক্ষকদের প্রভাব ছাত্রজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধূর্জটির কাছে এর প্রভাব ছিল আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ কারণ অনেকগুলি স্কুল-কলেজে তিনি পড়েছিলেন। আর সেই সুবাদে বিশিষ্ট শিক্ষকদের প্রভাব তাঁর জীবনে লক্ষ করা যায়। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। সতীশ চট্টোপাধ্যায় স্বদেশীযুগে বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। এঁর কাছে ধূর্জটি প্রসাদ বাড়ীতে গণিত ও বিজ্ঞান শিখেছেন বটে কিন্তু একই সঙ্গে দেশী-বিদেশী বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা ধরনের বই পড়ার প্রেরণা পান। ধূর্জটিপ্রসাদের কথায় ''তাঁর (সতীশ চট্টোপাধ্যায়) আদর্শবাদ আমাকে উদ্ধার করলে। আমার জীবনে আমার পিতার ও সতীশবাবুর আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। পরে অনেক অশান্তি এসেছে তাঁদের প্রভাবে, কিন্তু আমাব পরিশ্রম করার শক্তিও তাঁদের কৃপায়।''

ইতিহাস পঠন ছিল ধূর্জটির নেশা ও প্রিয় বিষয়। ইতিহাসে এম.এ. পাশও করেন। এই পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সূক্ষ্ম প্রভাব অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে ব্রজেন শীলর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জীর সঙ্গে পরিচয়, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির সান্নিধ্য, গান্ধী, জওহরলাল, মতিলাল, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ধূর্জটিপ্রসাদের মনোজগতকে স্বদেশীয় ভাবনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উজ্জীবিত করেছিল সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নির্মোহ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সমাজজীবনের বিশ্লেষণকে আরও অর্থবহ করে তুলে[৭]।

২

এই অংশে ধূর্জটিপ্রসাদের স্বদেশচিন্তার তাত্ত্বিক দিকটি আমরা আলোচনা করব।

প্রথমতঃ ধূর্জটিপ্রসাদ ক্ষুদ্রতা, 'ছোট আমি' কে পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিন্তা করলে এবং সেই চিন্তার ফলে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলে, 'ছোট আমি' অবাস্তবিত হবে। পরে যেটি ফুটে উঠবে, তার রূপ অতি মনোহর, তার প্রকৃতি শান্ত, তার আলো উজ্জ্বল, স্থির-নিবাত প্রদীপবৎ। তাতে রেড়ির তেলের গন্ধ, কেরোসিন তেলের ধোঁয়া পর্যন্ত থাকে না''। ধূর্জটিপ্রসাদের এই অপূর্ব বাচনভঙ্গী ও আহ্বান যেন 'কথামৃত'র বাঙ্ময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথারই প্রতিধ্বনি[৮]।

দ্বিতীয়তঃ ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তির 'Personality' যাতে কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় সেবিষয়ে জোরের সঙ্গে বলেছেন। তাঁর কথায়, ''দেশের স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হলেও স্বাধীনতার প্রেরণা, প্রকাশ ও পরিণতি প্রত্যেক ব্যক্তির Personality তে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাইরের ঘটনা ও অবস্থা আমাদের মুক্তির সব উপায়কেই, পরিণতির

সব অবস্থাকেই বেঁধে দিয়েছে''।[৬] ধূর্জটিপ্রসাদ এই বক্তব্য ১৯৩১ এ 'আমরা ও তাঁহারা' গ্রন্থে যা বলেছিলেন তা পরবর্তীকালে সমাজ মনস্ক ধ্যানধারণায় আরও জোরদার হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ তথা দেশের উন্নতি একে অপরের পরিপূরক, আদৌ পরিপন্থী নয়।

তৃতীয়তঃ ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তাধারায় জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বিদেশী বলতে সংকীর্ণ অর্থে যা স্বদেশ জাত নয় তাকে বোঝান হয়। সেই দিক থেকে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান প্রভৃতিরা বিদেশী। আবার বৈজ্ঞানিক দিক থেকে ভারতবর্ষের পূর্বপুরুষেরা যেহেতু বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষ তাঁদের জন্মস্থান নয়, তাহলে তারাও বিদেশী। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন কোল, ভীল, ব্রাহুই জাতির আদিপুরুষ শোনা যায় সুমেরু-আক্কাড দেশ থেকে এসেছিল। ''অতএব কে কোথা থেকে আসছে, কে কোন জাতি তার ওপর বিদেশী কথার অর্থ নির্ভর করছে না। জাতিতত্ত্বে জাতের গোঁড়ামি আর নেই। বাংলা দেশের নিম্নশ্রেণীর জাতিরাই বাংলার খাঁটি স্বদেশী[৭]''।

ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যাঁরা ভারতবর্ষে বসবাস করছেন ও ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভাবতকে স্বদেশ হিসাবে গণ্য করেছেন তাঁদেব স্বদেশীয় বলেই গণ্য করা উচিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতিগত যে বৈষম্য ও হিংসা দেখা দেয় ধূর্জটিপ্রসাদ তার সমালোচনা করেছেন। ত্রিশের দশকের এই বক্তব্য আজ শতাব্দীর শেষ দশকেও সমান সমস্যা।

চতুর্থতঃ বণিকের মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ডের অধিকারী বৃটিশ শক্তির সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ও মুসলিম লীগের আচরণ ধূর্জটিপ্রসাদ যেমন নিন্দা করেছেন তেমনি ইংরেজ ও মুসলমানদের ভাল দিকটির উল্লেখও করেছেন। তাঁদের (ইংরেজদের) ব্যারাক-স্থাপত্য, গোরাব বাদ্যির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যের, ইতিহাসের ঋণ ভুলি কী করে? যদি সে সাহিত্য, সে ইতিহাস আমাদের চিন্তাধারা ও কার্যাবলীকে কিছুমাত্র পরিবর্তিত করতে পেরে থাকে, তাহলে আজ না হয় দু'দিন পরে সেই ইংরেজকে মনের স্বদেশবাসী বলে গ্রহণ করতেই হবে''। অনুরূপভাবে তাজমহল, ফতেপুর-সিক্রী, মিঞাকি মল্লারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য।

ধূর্জটিপ্রসাদ হিন্দু-মুসলমানকে একটি নিখিল ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত অংশ বলে গণ্য করার পক্ষপাতী। ''গ্রাম্য ও গোষ্ঠী জীবনের দায়িত্ব, জাতি ও শ্রেণীবিচার, বিধবা-বিবাহ বর্জনের দোষ-গুণ এবং অপার্থিব শক্তির প্রতি আস্থা দুটি ভিন্ন সমাজ ধর্মকে অনেকটা একত্রিত করেছে''[৮]।

পঞ্চমতঃ ভারতীয় সমাজ জীবনের যথার্থ উন্নতির জন্যে নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্যবাধকতার নীতিকে স্বীকার করলেও যা অন্যায়, কুসংস্কার তাকে প্রতিহত করে নূতন ভারসাম্য গঠনের কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন। ''জীবনের ভেতরে বাইরের নব নব শক্তির কাজ চলে। তাই ভারসাম্য সামলাতে সামলাতে, হার্মনি সৃষ্টি করতে করতে চলার নামই উন্নতি''। ইংরেজরা দেশ শুষছে তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন দরকার যাতে নতুন হারমনি সৃষ্টি হয়[৯]।

ষষ্ঠতঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত আন্দোলনের কার্য-বিভাগগুলি ধূর্জটিপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে প্রথমে সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য ভাবাবেগের দরকার। তারপর দ্বিতীয়টিতে কূটবুদ্ধির সাহায্যে দাবার চালে মাৎ করা আর তৃতীয়টিকে কল্পনা, মার্জিতবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে দেশ শাসন। ধূর্জটিপ্রসাদ এই পদ্ধতির সারবত্তাকে চুলচেরাভাবে ভাগ করতে চাননা। তাঁর মতে দেশকে জাগাতে হলেও বুদ্ধির আবশ্যক। তাঁর কথায়, "দেশ জাগান ছেড়ে দিলে, পলিটিক্সের দাবির অংশটুকুতে শয়তানি বুদ্ধিরই দরকার। সেখানে 'জয়, অমুকের জয়'-এর স্থান নেই, আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই, আছে সেখানে মার প্যাঁচ, দরকষাকষি, আপোষ করার ক্ষমতা, অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধির প্রয়োজন"[১০]।

সপ্তমতঃ ধূর্জটিপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন স্বদেশিকতার অধিকার অর্জন করতে হয়। যে ব্যক্তি বর্তমান যুগে জন্ম গ্রহণ করেও অতীতের যুগে বিচরণ করে, সুবর্ণযুগের কল্পবাসী সে স্বদেশবাসী নয়। সেই জন্যে যারা বৈদিকযুগে প্রত্যাবর্তন করতে উপদেশ দেন তাঁদের ধূর্জটিপ্রসাদ বিদেশী ভাবেন[১১]।

অষ্টমতঃ ধূর্জটিপ্রসাদ জাত্যাভিমানের বিরোধিতা করেছেন। "বড় বড় অধ্যাপকরা যখন রিসার্চ করেন, তখন তার মধ্যে জাতীয়তার ও দেশাত্মবোধের ছাপ না থাকলে, তাঁদেরকে আমরা দেশদ্রোহী ভেবে থাকি'। "আমাদের চাষ-বাস, শিক্ষাপদ্ধতি সব কিছুই অন্যদেশের তুলনায় কত ভাল এসব শুধু লালা লাজপৎ রায় কিংবা রঙ্গ আয়ার লেখেন না, এসব কথা আমাদের পণ্ডিতবর্গকেও লিখতে হয়, নচেৎ রক্ষা নেই"। ছবি ও গানে পলিটিকসের ছায়াপাতও ধূর্জটি প্রসাদের দৃষ্টি এড়ায় নি[১২]।

আলোচ্য অংশে ধূর্জটিপ্রসাদ স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশ্লেষণী বক্তব্য রেখেছেন তা উল্লেখ করছি।

ধর্ম, রাজনীতি, সমাজসেবার পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাবের দিকটি ধূর্জটিপ্রসাদ পর্যবেক্ষণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, রাজা রামমোহন প্রমুখের ধর্মচিন্তা সমাজসেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন, রাজনীতির সঙ্গে এঁদের চিন্তার যোগ ছিল না। কিন্তু ১৯০৫-১৯০৬ সালের পর ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা দেয়। গীতাকে অবলম্বন করে প্রধানতঃ বিপ্লবী গোষ্ঠী রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হয়। এরই দেখা দেখি চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বৈষ্ণবরা কীর্তন, নাচন-কাঁদন, গড়াগড়ি, বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠে মগ্ন হয়[১৩]।

ধূর্জটিপ্রসাদের মতে ধর্ম হলো ব্যক্তিগত বিষয়, তাকে রাজনীতিতে টেনে আনার ফলে হিন্দুধর্মের মধ্যেই যেমন রেষারেষি দেখা দেয়, তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকট হয়। হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বীজ এইভাবেই উপ্ত হয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ছোটবেলাতে জাতীয় আন্দোলনে বয়স্কদের প্রাধান্যকে লক্ষ করেছেন। বাড়ীর বৈঠকখানাতে এই বয়স্কদের আলোচনায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা হত। বৎসর শেষে, বড়দিনের ছুটিতে কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে

কর্তারা দেশভ্রমণে বেরুতেন। বৎসরান্তের পর একমাস পর্যন্ত ফিরোজ শা মেটা. সুরেন্দ্রনাথ, দিনসা ওয়াচা ও মালব্যজীর ইংরেজী বক্তৃতার তুলনামূলক বিচার চলত। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতেন, বাঙালীর কাছে কেউ লাগে না, কী বুদ্ধি, বিদ্যায় অর্থাৎ ইংরাজী বক্তৃতায়।

এরপর স্বদেশী যুগের উল্লেখ করে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, 'লাল বাল-পাল' তখন দেশের দেবতা, অরবিন্দ শুধু দার্শনিক'। যুবার দল সামনে এলেন, প্রৌঢ়েরা পিছিয়ে পড়লেন। "সকলের মুখে বন্দেমাতরম, হাতে আনন্দমঠ, পরণে জোলার ধুতি, পকেটে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, যেথায় সেথায় সভাসমিতি, সকালে বিকালে স্বদেশীগান ও মিছিল, রঙ্গমঞ্চে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, মুখের ও কলমের ভাষা তেজোময়, ডেপুটি মশায়দের গৃহবিচ্ছেদ, উকিলদের জয়জয়কার[১৭]।

কিশোর ধূর্জটিপ্রসাদ ও ছেলে ছোকরাদের প্রধান কাজ ছিল ভলাণ্টিয়ারি করা, ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন স্বদেশী কাজে এই কিশোর ও তরুণরা ছিল ব্যস্ত। লাঠি খেলা, স্কুল পালিয়ে গানের মহলা, বিকেলে দেশী কাপড় ফিরি করা এবং রাতে বাড়ি ফেরা। সবক্ষেত্রে এই স্বদেশী নামের ব্যবহার[১১]।

এরপর ধূমকেতুর মতো বিপ্লবপন্থীদের আবির্ভাব। রিজলী সার্কুলারের দোহাই দিয়ে স্কুলের মাস্টার ও বাড়ির কর্তারা ছেলেদের সঙ্গী বিচার শুরু করলেন। জাতীয় বিদ্যালয় তৈরী হলো, জনকয়েক ভাল ছেলে সেখানকার অধ্যাপক হলেন। ওঁরাই হলেন যুবকদের আদর্শ[১৬]।

এর পরের যুগ হলো গান্ধীর যুগ। দক্ষিণ অফ্রিকা থেকে গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধের বাজারে দেশ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করল। বাংলা দেশের প্রাদেশিক কৃষ্টির অভিমান ভাঙ্গতে আরম্ভ করল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তখন জেগে উঠেছে। নিখিল ভারতীয়তার হাল্কা হাওয়ায় তারা নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। ধূর্জটিপ্রসাদ বাঙলার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অবাঞ্ছিত আত্মম্ভরিতার সমালোচনাও করেছেন।

এই সময় জালিওয়ানওয়ালাবাগের দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড ঘটে। তারপর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলো। ধূর্জটিপ্রসাদ এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে স্বদেশী যুগের ত্যাগধর্ম, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন, ধর্মপ্রাণতার প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতায় অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, মোহ না কাটাতে পেরে, প্রাণ খুলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেনি। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন বুঝেসুঝেই গান্ধীজী তাঁদের সাহায্য চান নি। "বেকারের দল বড়ই মুস্কিলে পড়লেন, আন্দোলনে যোগ না দিলে দেশদ্রোহী হতে হয়, তাই যোগ দিতে হলো, আধখানা প্রাণ ও সিকিখানা মন নিয়ে"।

এই অবস্থায় যখন অসহযোগ আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে নি এবং চৌরীচৌরা ঘটনার পর আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয় তখন চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের নেতৃত্বে নতুন একটি দল 'স্বরাজ দল' আত্মপ্রকাশ করে। ধূর্জটি প্রসাদ বলেছেন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং তাঁর

মতো মনোভাব সম্পন্ন মানুষরা স্বরাজিস্ট হলেন। গান্ধীজী কিছুটা আত্মনির্বাসনে মগ্ন হলেন[১]।

চিত্তরঞ্জন মারা যাওয়ার পর মতিলাল পুত্র জওহরলালের কাছে আত্মসমর্পন, কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফৎ আন্দোলন বন্ধ করা, পুরানো কর্তাদের অনেকেই গত এই অবস্থায় গান্ধীজী আত্মনির্বাসন দণ্ড তুলে নেন। এই সময়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করে ধূর্জটি প্রসাদ বলেছেন, গান্ধীজীর পুনরাভিষেক হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন না। তবুও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহতই রইল। এর পর ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স, বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়াব জন্য বাঙালীর বাগ ও অভিমান, এলাহাবাদ পণ্ডিতবর্গের নেতৃত্ব, বম্বে, আমেদাবাদ, কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের কবলে মহাত্মাজী ও মদনমোহনের আত্মসমর্পন, গোল টেবিল বৈঠক, মহাত্মাজীর বিলেত যাত্রা, সেখানকার নিষ্ফলতা, রাজা-রাজড়াদের আকস্কি দেশপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক গৃহবিবাদ, খাজনা না দেওযার হুকুম-জারির জন্য কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা প্রভৃতি[১]।

জওহরলালের সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান বক্তব্যগুলি ধূর্জটিপ্রসাদ অনবদ্য বলেছেন। কিন্তু দুটো সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কেন ব্যর্থ হলো তার বিশ্লেষণ সম্ভবতঃ ভদ্রতা ও ব্যক্তিগত লয়ালটির জন্য জওহরলাল করেননি। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে এই ব্যর্থতার কারণ হল কংগ্রেস স্বদেশী ধনিকতন্ত্রের হাতে আত্মদান করেছিল এবং এই জন্যই সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স অসার্থক হয়। করাচী কংগ্রেস থেকে প্রত্যাগত বামমার্গী ও আধুনিক যুবকদের সঙ্গে আলোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন[১]।

১৯১৯-১৯৩৪ এই ১৫ বছর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় সংগ্রামের পাশাপাশি চলে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন দুটির মধ্যে এই সম্পর্ক থাকলেও কিছুকাল পরে দেখা গেল যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন বাংলায় কংগ্রেস কিষাণ মজুরদের কাছ থেকে জোর পায়নি[২০]।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। "কমিউনিস্টরা ১৯৪২ সালে ভুল করেছিলেন। তাঁরা দেশপ্রেমের জোর কত বুঝতে পারেননি; মানসিক বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করবার, শক্তি পরিমাপ করবার ক্ষমতা তাঁদের কম। হতে বাধ্য; তাঁরা বুদ্ধিতে বিশ্বাসী, একটু বেশি রকমের।" আমরা জানি সাম্প্রতিক কালে কমিউনিস্টরা তাঁদের অতীত ভুল স্বীকার করেছেন এবং সুভাষচন্দ্রের জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকায় তাঁদের সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গী যে যথার্থ ছিল না তা বলা হয়েছে[২১]।

৪

এই অংশে স্বাধীনতার পর নবভারত গঠনে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবনা চিন্তাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথমতঃ ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন প্ল্যানিং-এ একান্ত বিশ্বাসী, যার মূল ধর্ম হলো যুক্তিবত্তা

আর প্রধান যন্ত্র জাতীয় হিসাবকরণ। এই পরিকল্পনায় সমবায়কে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ এর বক্তব্যগুলি হলো ঃ—

ক) ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে যে নতুন সমাজ গড়ে তোলা হবে তার রূপরেখা স্থির করা দরকার, পরিবর্তনের গুণগত দিকটি প্রথমে বিচার করতে হবে। মার্ক্স বলেছেন মানবজাতি সর্বদাই সেই সমস্ত সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে যেগুলি সে সমাধান করতে পারে।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন মানুষ গঠনের প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দেখা গিয়েছে। এই ব্যক্তিদের মধ্যে চারিত্রিক উন্নত শ্রেণীর যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তেমনি মেকী চরিত্রের পরিচয় ও পাওয়া যায়। গান্ধীটুপির ত্যাগ ও ঐতিহ্যের যে আদর্শ ছিল তা কালক্রমে কালোবাজারের চিহ্ন রূপে সমালোচিত হয়।

খ) সমবায় প্রতিষ্ঠান ও সমবায় আদর্শ সমন্বিত মানুষের দরকার এবং পরিকল্পনার সঙ্গে সমবায়কে সংশ্লিষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন। ন্যাশনাল এক্সটেনসন সার্ভিস, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, লোকাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, ছাত্রদের যোগদান, স্ত্রীলোকদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ভাবে যোগদান, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর ধূর্জটিপ্রসাদ জোর দিয়েছেন[২২]।

সমবায় অর্থনীতি যা এতদিন ক্রেডিট সমবায় বলেই পরিচালিত হতো তার পরিবর্তনের কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন। সমবায়কে সর্বোতমুখী করা দরকার, সঞ্চয়, উৎপাদন, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই সমবায়ের প্রসার দরকার। ঋণদানের ক্ষেত্রেও মাতব্বরদের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে, এখানেও সমতা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ নব ভারত গঠনে শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রেও ধূর্জটিপ্রসাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। "শিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়ার আমি বিপক্ষে, বিশেষত শৈশবাবস্থায় এবং পাবলিক স্কুলে"। জগদীশবাবু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রমন, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, বীরবল সাহানি, প্রশান্ত মহলানবিশ, ভাটনগর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ আগে দেশের ডিগ্রী গ্রহণ করেছেন, তারপর বিদেশী ডিগ্রী। সমরফেল্ট সাহেব একজন ভারতীয় ছাত্রকে বলেছিলেন, "ভোঁস অর্থাৎ সত্যেন বোস থাকতে এই বিষয় শেখবার জন্য জার্মানিতে আসার অর্থ হয় না"[২৩]।

তৃতীয়তঃ শিক্ষিত বেকার সমস্যা ধূর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাবলিক ও প্রাইভেট সেকটরে কাজের যে সুরাহা হবে তা প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। কুটির শিল্প, কো-অপারেটিভ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ হবে তাতে কিছু সমাধান হবে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন যে সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বেকারের সংখ্যা ও কাজের সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে তাতে তাঁর আস্থা নেই- কারণ অভিজ্ঞ লোকের অভাব।

এই অবস্থায় ধূর্জটিপ্রসাদ সমবায়ের উল্লেখ করে বলেছেন যে সমবায়গুলিকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে ছাত্ররা গ্রামে বা ছোট শহরে গিয়ে কো-অপারেটিভ খুলবে এটা আশা করা যায় না। অর্থাৎ গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং শিক্ষাকে

গ্রামমুখী, সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ করতে হবে যাতে গ্রাম ও খণ্ডগ্রামের ছেলেরা শহরে চাকরির দিকে ঝুঁকবে না[২৪]।

চতুর্থতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে অসাম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন সম্পত্তির কথা এখানে বলা হয় নি। তাঁর মতে অসাম্য দূর করতে হলে সম্পত্তির মালিকানার দিকে নজর দিতে হবে এবং সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করা দরকার।

বর্তমানে সম্পদ ও আয়ের ক্ষেত্রে অসাম্যতো আগের চেয়ে বেড়েছে আর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও অসাম্য রয়েই গেছে।

৫

ধূর্জটিপ্রসাদের স্বদেশচিন্তার আলোচনা তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল। তাঁর কথায় "আমাদের অবনতির কারণ আমাদের বিশ্বাস নেই। ধর্মে নয়, নিজের উপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি, অর্থাৎ আমাদের দাম্ভিকতা নেই। দাম্ভিকতা লোকের বেলায় পাপ, কিন্তু জাতের বেলায় তাকে বলে স্বদেশ প্রেম, কেননা তখন আর তাকে দাম্ভিকতা বলতে কেউ সাহস করে না"[২৫]।

ধূর্জটিপ্রসাদের স্বাদেশিকতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় ঘটেছে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সমাজের কল্যাণ সাধনের মধ্যে নিহিত হলে ব্যক্তি তথা দলগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব দূর হবে।

পরাধীন ভারতের মত স্বাধীন ভারতেও মানুষকে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত হতে হবে। "মনের ধর্ম এগিয়ে চলা, আর সিনিসিজম হলো মনকেই উড়িয়ে দেওয়া। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিনিক হয়ে পড়েছেন দেখেছি। আমারও মধ্যে মধ্যে ও-রকম অবস্থা হয় কিন্তু জানি এটা সর্বনাশের পথ। বিপ্লবের জন্ম আশায়, নিরাশায় নয়, নয় নয়"[২৬]। অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ একই সঙ্গে দরকার।

সূত্রনির্দেশ

১। অলোক রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, পৃঃ ১০, বাগর্থ (১৯৭০)

২। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা, পৃঃ ৭৬) দে'জ সংস্করণ-২য় খণ্ড (১৯৮৭)।

৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা, পৃঃ ৭৭) দে'জ সংস্করণ - ২য় খণ্ড (১৯৮৭)।

৪। অলোক রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, ১৯৭০।

৫। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা (দেশের কথা, পৃঃ-৬৫,) দে'জ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৭)।

৬। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা, পৃঃ ৬৫

৭। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা, পৃঃ ৬৬

৮। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা, পৃঃ ৬৭
৯। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা, পৃঃ ৭১
১০। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৮৩
১১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা (দেশের কথা), পৃঃ ৬৬
১২। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৮১
১৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৮৬
১৪। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৭৬
১৫। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৭৭
১৬। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৭৭
১৭। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৭৮
১৮। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্তয়সি (দেশের কথা), পৃঃ ৭৮
১৯। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বক্তব্য (নতুন ও পুরাতন) ২য় খণ্ড দে'জ পৃঃ ৮৪
২০। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বক্তব্য (নতুন ও পুরাতন) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৮৩
২১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমরা ও তাঁহারা (বিপ্লবের কথা) পৃঃ ১১২
২২। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, Diversities (People's Publishing House Pvt Ltd - New Delhi) 1958 Pages 47-49
২৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,মনে এলো (দে'জ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১
২৪। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,মনে এলো (দে'জ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫-১৩৬
২৫। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,অগ্রন্থিত প্রবন্ধ (২য় খণ্ড), পৃঃ ২০৪
২৬। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,আমরা ও তাঁহারা (বিপ্লবের কথা), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১

উত্তাল চল্লিশ ও আর সি পি আই

অমিতাভ চন্দ্র

মুখবন্ধ ও সূত্রপাত

বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের লেখা ''আর সি পি আই এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন'' নামে একটি প্রবন্ধ 'ইতিহাস অনুসন্ধান'-এর দশম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে[১]। উক্ত প্রবন্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কিত সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠন রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইন্ডিয়ার (সংক্ষেপে আর সি পি আই) দৃষ্টি ভঙ্গি ও বিশ্লেষণ এবং ঐ আন্দোলনে আর সি পি আই-এর ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং ঐ আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ঐ আন্দোলনকালীন তাদের ভূমিকা সম্পর্কিত আর সি পি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের আলোচনা এবং বিশ্লেষণও উক্ত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'উত্তাল চল্লিশ ও আর সি পি আই' শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধে উত্তাল চল্লিশ দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর থেকে এই দশকের শেষভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে আর সি পি আই-এর রাজনীতি, ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু। অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রবন্ধের যেখানে শেষ, বর্তমান প্রবন্ধের সেখান থেকেই শুরু।

উত্তাল চল্লিশ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

উত্তাল চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ে আর সি পি আই-এর ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত মূল আলোচনাটিতে যাওয়ার আগে এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই) ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপকে অতি সংক্ষেপে আমাদের আলোচনার পরিধিভুক্ত করা যেতে পারে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত অমলেন্দু সেনগুপ্তের একটি বইয়ের নাম 'উত্তাল চল্লিশ: অসমাপ্ত বিপ্লব'।[২] ১৯৪১-১৯৫১- এই দশ বছরের কমিউনিস্ট রাজনীতির অর্থাৎ সি পি আই-এর রাজনীতির এক প্রামাণিক দলিল অমলেন্দু সেনগুপ্তের এই বইটি। বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামে 'উত্তাল চল্লিশ' কথাটি এই বইটির নাম থেকেই নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বহুবিধ ঘটনার সাক্ষী এই উত্তাল চল্লিশের দশক আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে বার বার বদলাতে হয়েছে লাইন, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বার বার হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে সঠিক পথ।

দীর্ঘ ছ' বছর চলার পর ফ্যাসিবাদের সার্বিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আবার এক গুণগত পরিবর্তন ঘটাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন শত্রু ফ্যাসিবাদ পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চোখে প্রধানতম শত্রু হিসাবে পরিগণিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আবার তার লাইন পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেল। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ সি পি আই তার 'জনযুদ্ধ'-এর যুগের সাধারণভাবে 'জনযুদ্ধ'-এর লাইন বলে পরিচিত 'ধর্মঘটবিমুখতা'র ও 'সংগ্রামবিমুখতা'র লাইন পবিবর্তন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করল। সি পি আই সোৎসাহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ করা শুরু করল। প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব -জড়তা কাটিয়ে উঠে সি পি আই আবার নেমে এল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ময়দানে। ক্রমশ সি পি আই-এর মধ্যে দেখা দিল সংগ্রামী উদ্দীপনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সি পি আই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুগের বিভিন্ন শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম মুখ্যত সংগঠিত করার ও এই শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল সি পি আই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক গণ আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্টরা ক্রমশ চলে এসেছিলেন যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ সংগ্রামের পিছনের সারি থেকে সামনের সারিতে।

'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহরু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জানিয়ে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রারম্ভ হল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও লাইন দুটোই পাল্টাল এই কংগ্রেসে। লাইন পরিবর্তনের ব্যাপারটি আদৌ আকস্মিক ছিল না। ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাস থেকে ১৯৪৭ সালর ডিসেম্বর মাস অবধি প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন দলিলে লাইন পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির দুটি দলিলে রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এর পরেই এল দ্বিতীয় কংগ্রেসে পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহরু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জ্ঞাপনের 'সংস্কারবাদী' অবস্থান সম্পূর্ণ বর্জিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। পরিবর্তে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত 'Political Thesis'[*]-এ 'জাতীয় আত্মসমর্পণের সরকার, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও তার সঙ্গে আপসকামীদের সরকার নেহরু সরকারের' সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের আহ্বান জানানো হল। পার্টি কংগ্রেসের শেষে ময়দানের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হল— 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'।

দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় ২৬ মার্চ ১৯৪৮ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যে কমিউনিস্ট

পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করল। দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির লাইন হল দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। পরবর্তী দুই বছরের ইতিহাস একদিকে নেহরু-বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকারের কমিউনিস্ট দলন-দমনের ইতিহাস, আর অপর দিকে পার্টি নেতৃত্বের চরম 'আমলাতান্ত্রিকতা'র ও পার্টি লাইনের 'বাম-সংকীর্ণতা'র ইতিহাস। যোশী নেতৃত্বের চরম 'সংস্কারবাদ' উল্টো ধাক্কায় পরিণত হল রণদিভে নেতৃত্বের গোঁড়া 'সংকীর্ণতাবাদে'। কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ও নেহরু স্তুতির উল্টোরথের যাত্রায় এল প্রস্তুতিবিহীন দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যামে ক্ষমতা দখলের আহ্বান। এর মধ্যেই শুরু হল পার্টি পলিট-ব্যুরোর সঙ্গে অন্ধ্র পার্টি নেতৃত্বের ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও তার আনুষঙ্গিক রণনীতি-রণকৌশল সংক্রান্ত মতবিরোধ। সেটা চল্লিশের দশকের শেষ বছর।

মাও-নেতৃত্বাধীন সফল চীন বিপ্লবের ও 'কমিনফর্ম'-এর মুখপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় তীব্র অন্তঃ-পার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের দশকের সূত্রপাত। পঞ্চাশের দশকের প্রথম বছরের মাঝামাঝি পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে আবার পরিবর্তন। রণদিভের জায়গায় রাজেশ্বর রাও পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন। অন্ধ্র লাইন জয়যুক্ত হল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বলা হল- চীনের পথ ধরেই ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে যাবে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দিয়ে ১৯৫১ সালের শুরু। নেহরু সরকার ঘোষিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৫১ সালের মে মাসে আবার পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে পরিবর্তন ঘটল। সি রাজেশ্বর রাও -এর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে এলেন অজয় কুমার ঘোষ। সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি আবার সাংবিধানিক পথে ফিরে এল। আবার শুরু হল 'সাংবিধানিক কমিউনিজমের'[৪]।

উত্তাল চল্লিশের সেই পর্যায়ে আর সি পি আই -এর ভূমিকা, ক্রিয়াকলাপ ও রাজনীতির সঙ্গে তুলনার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই যুগে সি পি আই -এর রাজনীতি, ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে এই আলোচনাটি করা হল।

উত্তাল চল্লিশ ও আর সি পি আই

আর সি পি আই -এর নিজস্ব বক্তব্য ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই দল একটি সঠিক বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং অসংগঠিত বিপ্লবী জনতাকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছিল, যদিও সাংগঠনিক শক্তির অভাবে তার সেই চেষ্টা সফল হয় নি। আর সি পি আই -এর দাবি প্রকৃতই কতটা যথার্থ ছিল, বা আর সি পি আই বৈপ্লবিক সচেতনতা ও সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এই আন্দোলনকে বৈপ্লবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সত্যই কতটা সচেষ্ট হয়েছিল, বা তার ব্যর্থতার কারণটি শুধুমাত্র

সাংগঠনিক শক্তির অভাব, না কি তার সঙ্গে আরও বহুবিধ কারণও যুক্ত ছিল, তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই তার ব্যর্থতার কারণগুলি নিহিত ছিল কি না, সেই সব প্রশ্নের উত্তর আলোচনার ক্ষেত্র বর্তমান প্রবন্ধটি নয়, কারণ পূর্ববর্তী প্রবন্ধেই এই প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এ কথা পরিষ্কার যে, আর সি পি আই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে দেখেছিল ভারতে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম ধাপ বা স্তর বা পর্যায় হিসাবে, তাই তার ডাক ছিল এই আন্দোলনকেই বিপ্লবের স্তরে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু সেই কাজ যেহেতু সমাধা হয়নি, তাই আর সি পি আই যুদ্ধ পরবর্তী গণ আন্দোলনগুলিকে দেখেছিল এক বৈপ্লবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াব উদ্দেশ্যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেরই এক ধারাবাহিকতা হিসাবে, তার থেকে কোন বিচ্ছেদ বা বিযুক্তি হিসাবে নয়। ফলে সি পি আই -এর মত যুদ্ধ পরবর্তী যুগে লাইন পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই আর সি পি আই -এর সামনে কোনও অবস্থাতেই আসে নি, যুদ্ধকালীন যুগে সংগ্রামের লাইনই আর সি পি আই যুদ্ধ পরবর্তী যুগেও ধারাবাহিক ভাবেই অনুসরণ করে চলেছিল। আর সেই ধারাবাহিকতা থেকেই আর সি পি আই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ সংগ্রামগুলিতে সক্রিয়ভাবে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করেই অংশগ্রহণ করেছিল, সীমিত শক্তি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা তার উৎসাহী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এই পর্যায়ের শ্রমিক আন্দোলনগুলিতেও আর সি পি আই -এর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল[৫]।

শ্রমিক আন্দোলনে আর সি পি আই -এর প্রভাব আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক) ইণ্ডিয়ান স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন -এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ১ অগস্ট থেকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ৪৬ দিন ব্যাপী এক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জঙ্গী মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে এই ধর্মঘট এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে আছে[৬]। এ ছাড়াও এই যুগে আর সি পি আই বোম্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকতে সমর্থ হয়েছিল এবং সেখানে দু-একটি ধর্মঘট নিজ শক্তিতে চালাতে সমর্থ হয়েছিল। ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা খাদেও আর সি পি আই বেশ বিস্তৃত ভাবেই ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। বার্নপুর ও কুলটির লৌহ শিল্পেও সংগঠন করতে আর সি পি আই অনেকটাই এগোতে পেরেছিল। টাটা শ্রমিকদের মধ্যেও আর সি পি আই কিছুটা প্রভাব স্থাপন করতে পেরেছিল। তাছাড়াও আসাম ও বাংলার পল্লী অঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে কিছুটা বিস্তৃত গণ সংযোগ করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল[৭]। অবশ্য ঘোষিত বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর সি পি আই -এর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই প্রভাব, শক্তি ও সংগঠন ছিল অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর শক্তির ভিত্তিতেই আর সি পি আই -এর একটি জঙ্গী অংশ, যার নেতৃত্বে ছিলেন বিপ্লবী পান্নালাল দাসগুপ্ত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভূমিকা হিসাবে এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পরবর্তী ভারতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার কথা চিন্তাভাবনা করা শুরু করেছিল[৮]।

১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে'র দিন থেকে যে বিধ্বংসী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সূত্রপাত এবং যে দাঙ্গা চলেছিল পরবর্তী এক বছরেরও উপর, সেই দাঙ্গার বিরোধিতায় আর সি পি আই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং দাঙ্গা প্রতিরোধে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। দাঙ্গা প্রতিরোধ অবশ্যই ছিল আর সি পি আই -এর সাধ্যের একেবারেই বাইরে, কিন্তু আর সি পি আই -এর প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক[৯]।

যুদ্ধ পরবর্তী এই যুগে, যখন ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ ক্রমশ বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠতে যাচ্ছে এবং প্রবাহিত গণ আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কলুষিত করে চলেছে সারা দেশকে এবং জনজীবনকে, যখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ মেতে উঠেছে আশু ক্ষমতা লাভের রাজনীতিতে, এবং সব কিছুই মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মনোমত হয়ে চলেছে, তখন আর সি পি আই দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করেছিল এই ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকে। আর সি পি আই তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেএবং কংগ্রেসের সুবিধাবাদী আত্মসমর্পণকে। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা এবং 'ভুয়া' স্বাধীনতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করে অস্বীকার করা হয়েছিল, আক্রমণ ও সমালোচনা করা হয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারকে, গ্রহণ করা হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ রাজকে অস্বীকার করার সঙ্কল্প, আহ্বান জানানো হয়েছিল গণ সংবিধান পরিষদ গঠনের, তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল কংগ্রেসের উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন এ আই টি ইউ সি ভেঙ্গে আই এন টি ইউ সি (৩-৪ মে ১৯৪৭) গঠনের রাজনীতিকে, আহ্বান জানানো হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ রাজকে বৈপ্লবিক উপায়ে উচ্ছেদ করে মজুর-চাষী রাজ কায়েম করার জন্য ও তার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্পূর্ণ চালু রাখার জন্য, এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়েছিল আগামী বিপ্লবের হাতিয়ার ও পাল্টা সরকারের সংস্থা হিসাবে সোভিয়েতের আদর্শে সর্বত্র মজদুর-কিসান-পঞ্চায়েতি-রাজ গঠনের[১০]। সেই যুগে প্রকাশিত আর সি পি আই -এর দলিলসমূহ, যার প্রায় সব কটিরই লেখক ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপরে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গিরই সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে[১১]।

কিন্তু ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উদয়রামপুরে (কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছে উদয়নারায়ণপুর[১২]) অনুষ্ঠিত আর সি পি আই -এর চতুর্থ অধিবেশনেই[১৩] পার্টির মধ্যে দুই লাইনের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল[১৪]। ঐ অধিবেশনে গৃহীত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'Post - War World and India' শীর্ষক আর সি পি আই -এর থিসিস। পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন পার্টির জঙ্গী অংশকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এই অংশের সমালোচনা ছিল, তৎকালীন দ্বিখণ্ডিত ভারতের রক্তাক্ত কলেবরের উপর, দাঙ্গাবিধ্বস্ত শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্ভর করে, কি ধরনের ক্ষমতা দখলের লড়াই, কি পরিবেশের উপর, কোন্ কোন্ শক্তির আশ্রয়ে সত্যই চালু করা যায় সে সম্বন্ধে ঐ প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র আলোচনা করা হয় নি। ঐ জঙ্গী অংশের মতে লড়াইয়ের প্রস্তাব রেখেও লড়াইয়ের কায়দা পরিষ্কার না করার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গলদ রয়ে গেছে। ফলে বৈপ্লবিক প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা

হলেও এই প্রস্তাবগুলি কেবলমাত্র কাগজে-কলমেই থেকে যাবে, বাস্তবায়িত আর করা হয়ে উঠবে না[১৭]। আর সি পি আই -এর জঙ্গী অংশের এই আশঙ্কা ছিল সম্পূর্ণ যথার্থ।

আর সি পি আই -তে ভাঙ্গন কিন্তু তখনই ধরেনি। কিন্তু পার্টিতে ভাঙ্গনের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হয়ে উঠছিল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও সেই পদ্ধতিতে পার্টি পরিচালনাও পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন জঙ্গী অংশকে বিশেষভাবেই অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। অপরদিকে পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন অংশের জঙ্গী মনোভাবও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর নিজস্ব অনুগামীদের একান্তভাবেই অপছন্দ ছিল। ফলে পার্টি ভাঙ্গনের পটভূমিকাটি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে প্রথম সরকারি আঘাত নামল আর সি পি আই -এর উপর। ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বব সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও ২৫ জন আর সি পি আই নেতা ও কর্মী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে ১৯৪৬' সালের বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের ১৮ নং সেকশন বলে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হল। সরকারি সন্ত্রাসের শিকার হল আর সি পি আই[১৬]। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর সি পি আই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করছেন, যা রাজ্যের তথা সারা দেশের নিরাপত্তা ব্যাহত করতে চলেছে। অভিযোগ অস্বীকার কবলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আব এখান থেকেই হল পার্টি ভাঙ্গনের সূত্রপাত। শেষপর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন বন্দী মুক্তি পান[১৭]।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে যে সমস্ত বিবৃতি দেন, তা পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন দলের জঙ্গী অংশের আদৌ মনঃপূত ছিল না। তাঁরা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে 'সংস্কারপন্থী' মনোভাবের এবং 'বিপ্লব থেকে বিচ্যুতি'র অভিযোগ আনলেন। অপরদিকে পান্নালাল দাসগুপ্ত ও তাঁর জঙ্গী অনুগামীদের বিরুদ্ধে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর নেতৃত্বাধীন অংশ 'অতিবামপন্থা'র ও হঠকারিতার অভিযোগ আনলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর আর সি পি আই দ্বিখণ্ডিত হল। এক অংশের নেতা থাকলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর অপর অংশের নেতা হলেন পান্নালাল দাসগুপ্ত। উভয় অংশই নিজেদের আর সি পি আই বলেই অভিহিত করত।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বীরভূম জেলার অন্তর্গত জোগাইতে অনুষ্ঠিত হল পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই -এর পঞ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন। সেই সম্মেলনে আর সি পি আই তরফে সশস্ত্র বিপ্লবের লাইন গৃহীত হয় এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সি পি আই -এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন, এবং মাও সে-তুং -এর নেতৃত্বে চীনে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইনস্, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, কোরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম নিঃসন্দেহে পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই-কে জোগাই সম্মেলনে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন গ্রহণ করতে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও

অনুপ্রাণিত করেছিল। মাও সে তুং -এর নেতৃত্বাধীন চীনের বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বারা আর সি পি আই নেতৃত্ব যে বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত ছিলেন, তার স্বীকৃতি মেলে প্রধান নেতা স্বয়ং পান্নালাল দাসগুপ্তের লেখায়[১১]। মাও-নেতৃত্বাধীন চীন বিপ্লবকে সি পি আই -এর আগেই স্বীকৃতি জানিয়েছিল পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই পাল্টা পঞ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করল ১৯৪৮ সালের মে মাসে বর্ধমান শহরের টাউন হলে[১২]। এই সম্মেলন পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই -এর রাজনৈতিক লাইনকে 'অতিবামপন্থী' ও 'হঠকারী' আখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে 'খোকামি রোগে' ('Infantile Disorder') আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ আনলেন। 'খোকামি রোগ' নামে এই সময়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পুস্তিকাও লিখেছিলেন। তাতে তিনি পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই-এর সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইনকে 'বৈপ্লবিক নীতিবিবর্জিত অ্যাডভেঞ্চারিজ্‌ম্' হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় থেকেই সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই রাজনৈতিক ভাবে প্রায় গুরুত্বহীন এবং অনেকাংশেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অহংসর্বস্ব এবং যান্ত্রিক মার্কসবাদভিত্তিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাজনীতির এটাই ছিল অনিবার্য পরিণতি।

অপরদিক ভারতের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সরাসরি ও মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে গেল পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই। পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই সি পি আই -এর কাছে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সি পি আই আগ্রহী ছিল না, কারণ সি পি আই নেতৃত্ব মনে করতেন আর সি পি আই -এর থেকে তাঁদের লাইন আলাদা[১৩]।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য পান্নালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই সময় নিল এক বছর। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দিন শেষ পর্যন্ত ধার্য হল ১৯৪৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। যেভাবে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর, ঠিক সেভাবেই ভারতে আর সি পি আই -এর নেতৃত্বে বিপ্লবের দিন ধার্য হল ১৯৪৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হবে দমদম-বসিরহাটকে কেন্দ্র করে এবং দমদম-বসিরহাট অভ্যুত্থানই সারা ভারতে বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সূত্রপাত করবে। এই ছিল আর সি পি আই -এর পরিকল্পনা। দমদমের জেসপ্ কারখানার চার হাজার শ্রমিক এবং বসিরহাট মহকুমার কৃষকদের এই সংঘাতে আসল অংশগ্রহণকারী হিসাবে ধরা হয়েছিল। তাদের উপর ভিত্তি করেই আর সি পি আই এই সংঘাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। পৃথিবীতে আর কোথাও এত সীমিত শক্তি ও জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে এত বড় একটি দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই।

১৯৪৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নির্দিষ্ট দিনে ১১ টা ১৫ মিনিটের সময় শুরু হয়েছিল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। নির্দিষ্ট সময়ে যুগপৎ সমস্ত লক্ষ্যবস্তু আক্রমণের হুকুম গিয়েছিল। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। আক্রান্ত হয়েছিল দমদম বিমানবন্দর। কেড়ে নেওযা হয়েছিল সাতটি রাইফেল। একটি বেসরকারী বিমানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দমদম থেকে যশোর রোড ধরে অভ্যুত্থানকারীরা এগিয়ে গিয়েছিলেন বসিরহাটের দিকে। পথে আক্রান্ত হয়েছিল বিভিন্ন পুলিস থানা, জেল, ট্রেজারি ইত্যাদি-সরকারি শাসন-শোষণ-নির্যাতনের প্রতীক সমূহ। দমদমের জেসপ কারখানায় ঘটে গিয়েছিল শ্রমিক অভ্যুত্থান, কারখানা দখল করে নিয়েছিলেন শ্রমিক অভ্যুত্থানকারীরা। এই অভ্যুত্থান ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান অধিকার করে আছে দমদম-বসিরহাট অভ্যুত্থান নামে[১১]।

প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর শুরু হল সরকারি প্রতিরোধ। আর সরকারি দমন-নিপীড়ন-নির্যাতন-সন্ত্রাসের সামনে ব্যর্থ-ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দমদর্ম-বসিরহাট অভ্যুত্থান, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আর সি পি আই -এর সংগঠন। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল দমদম-বসিরহাট অভ্যুত্থান, ক্ষমতা দখলের লড়াই সাবা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া আর হয়ে উঠল না। এই ধরনের প্রস্তুতিবিহীন, জনসমর্থনবিহীন হঠকারী অভ্যুত্থানের এটাই ছিল অনিবার্য পরিণতি।

ব্যর্থতার আসল কারণ হিসাবে বিপ্লবী পান্নালাল দাসগুপ্ত জানিয়েছেন, গণ সংঘাতের অভাব ('বিপ্লবী পান্নালাল দাসগুপ্তের অপ্রকাশিত পত্রাবলী', পঞ্চম চিঠি, পৃঃ ২৫)। কিন্তু আসল কারণটা গণ সংঘাতের অভাব নয়, গণ সংযোগের অভাব। এই অভ্যুত্থানের পেছনে গণ সমর্থন কোথায় ছিল? গণ সমর্থন বিচ্ছিন্ন ভাবে সম্পূর্ণ বামপন্থী হঠকারী উপায়ে দমদমের জেসপ্ কারখানার চার হাজার শ্রমিক আর বসিরহাট সাবডিভিসনের কৃষকদের উপর ভিত্তি করে সারা ভারতে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করতে গেলে ব্যর্থতাই হবে তার অনিবার্য পরিণতি।

আর অনিবার্যভাবেই আর সি পি আই -এর দমদম-বসিরহাট অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা আসবে ১৯৪৮-৫০-এর সি পি আই -এর অভ্যুত্থানের এবং ১৯৬৭-৭১ ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলনের। ১৯৪৮-৫০-এর সময়ে সি পি আই-এর সঙ্গে তাও ছিল তেভাগা-তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপ-বড়া কমলাপুর-ডুবিরভেড়ি; ১৯৬৭-৭১ ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাও ছিল নকশালবাড়ি-শ্রীকাকুলাম-ডেবরা-গোপীবল্লভপুর-মুসাহারি-লখিমপুর। কিন্তু আর সি পি আই -এর হাতে তখন শুধু জেসপ্ কারখানার চার হাজার শ্রমিক আর বসিরহাট সাবডিভিসনের কৃষক। ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ -এর সি পি আই বা ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলনের থেকে আরও অনেক বেশি গণসমর্থনবিহীন হঠকারী আর সি পি আই -এর নেতৃত্বাধীন দমদম-বসিরহাট অভ্যুত্থানের ব্যর্থতাই ছিল অনিবার্য পরিণতি। অবশ্য তার দ্বারা তাঁদের বিপ্লবী আত্মত্যাগী মানসিকতার কোনও অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে না।

৭

সূত্র নির্দেশ

১। অমিতাভ চন্দ্র, "আর সি পি আই এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন" 'ইতিহাস অনুসন্ধান', দশম খণ্ড, সম্পাদনাঃ আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০৭-৫১৮।

২। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব', পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ এক-দশ + ১ - ৪৬১।

৩। 'Political Thesis of the Communist Party of India'. Adopted at the Second Congress, February 28 - March 6, 1948, Calcutta, Published by the Communist Party of India Bombay, July, 1948, PP i-v, 1-118

৪। Gene D Overstreet and Marshall Windmiller, **Communism in India,** The Perennial Press, Bombay, 1960, P 309 Overstreet and Windmiller এই পর্যায়কে আখ্যা দিয়েছেন,—'The Return to Constitutional Communism'

৫। **Against the Stream : An Anthology of Writings of Saumyendranath Tagore.** Volume II, edited with an introduction by Sudarshan Chattopadhyaya, published by Sarojini Hutheesing on behalf of the Saumyendranath Memorial Committee. Shahibag, Ahmedabad, August, 1984. 'Introduction', PP xvii-xviii, Saumyendranath Tagore, **The Soviet State– Its Character**, edited with an introduction by Binayak Halder, Ganabani Publishing House, Calcutta, October, 1991, 'Introduction', PP xx-xxv, Buddhadeva Bhattacharyya, 'Revolutionary Communist Party of India on Gandhi and Gandhism', **Society and Change**, Calcutta, Vol x, No 3, October to December, 1995, PP 25-33, নারায়ণ গুপ্ত (পান্নালাল দাসগুপ্ত), **ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা (কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি)**, ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (RCPI) কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৫ জুন, ১৯৫০, পৃঃ ৫৫-৭৬।

৬। **Against the Stream**, Volume II, 'Introduction', P xviii, Tagore, **The Soviet State- Its Character**, 'Introduction', P xxi; Buddhadeva Bhattacharyya, op cit., P 25, নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬২।

৭। নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৭৫-৭৬।

৮। তদেব, পৃঃ ৭৬।

৯। **Against the Stream**, Volume II, 'Introduction', pp xix-xxi, Tagore, **The Soviet State - Its Character**, 'Introduction', pp. xxii - xxiii, Buddhadeva Bhattacharyya, op. cit., pp. 28-29; নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬৭-৬৮।

১০। **Against the Stream**, Volume II, 'Introduction', pp xx - xxiii; Tagore, op cit., 'Introduction', pp. xxii -xxv; Buddhadeva Bhattacharyya, op.cit., pp. 25, 29-30, নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৭১-৭২।

১১। **Against the Stream**, Volume II : 'Resurgence of Tribal Savagery in Calcutta', pp 170-175; 'Post-War World and India', pp 176-99; 'Leftism and Leftist Unity', pp. 200-206; 'Fight the Post-War Counter-Revolution', pp. 207-212; 'INTUC - One

More Counter- Revolutionary Feather in the Cap of Bourgeoisie', pp. 213-216; 'Betrayal All Along the Line', pp. 217-219; 'The Counter - Revolutionary Canard', pp 220-21, 'Political Fatalism', pp 222-24. 'The Hour Has Struck', pp. 225-27; 'The Anti-War Day'. pp. 228-32

১২। Buddhadeva Bhattacharyya, op.cit., p. 29.

১৩। নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৭১; **Against the Stream**, Volume II, 'Introduction', f. xx

১৪। নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বল্লিখিত, পৃঃ ৭১-৭২।

১৫। তদেব, পৃঃ ৭২।

১৬। Tagore, **The Soviet State,—Its Character,** 'Introduction', pp. xxv - xxvi, নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৭৬-৭৭; জ্যোতি বসু, **জনগণের সঙ্গে,** (প্রথম খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৬, পৃঃ ৭৩-৭৪।

১৭। Tagore, op cit., 'Introduction', p. xxvi.

১৮। নারায়ণ গুপ্ত (পান্নালাল দাসগুপ্ত), পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১-৩০০, passim.

১৯। Moni Dwibedi, More on "RCPI Insurrection", **Frontier**, Calcutta, Vol. 25, No. 51, July 31, 1993, p. 11.

২০। নারায়ণ গুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১১৩-৫৩।

২১। বিস্তারিত বিবরণের ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: নারায়ণ গুপ্ত (পান্নালাল দাসগুপ্ত), **ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা**, ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (RCPI) কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৫ জুন, ১৯৫০, পৃঃ ১-৩০০; নরেন জানা (পান্নালাল দাসগুপ্ত), **চেতনা প্রেরণা ও সংঘাত**, প্রকাশকঃ অশোক দত্ত, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৪৮, পৃঃ ১-৬৯; **বিপ্লবী পান্নালাল দাসগুপ্তের অপ্রকাশিত পত্রাবলী**, প্রকাশক: সুধাংশু ভট্টাচার্য, কলকাতা, জুন, ১৯৫৪, পৃঃ ১-৬৫; Asoke Kumar Biswas, 'RCPI Insurection'. **Frontier,** Calcutta, Vol. 25. No. 41, May 22. 1993, pp 7-9; Moni Dwibedi, 'More on "RCPI Insurrection"', **Frontier**, Calcutta, Vol. 25, No. 51, July 31, 1993 pp. 10-11; Asoke Kumar Biswas, 'RCPI Insurrection . Searching for the Roots'. **Frontier,** Calcutta, Vol. 26, No. 9, October 9, 1993. pp. 9-10; Asoke Kumar Biswas, '1949: The February Insurrection', **Frontier**, Calcutta, Vol 26, No. 35, April 9. 1994, pp. 13-15.

চৈতন্যপুরের সংগ্রাম, কৃষক আন্দোলনের একটি নতুন পর্যায়

মহঃ ইনামুর রহমান

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা যে বিশেষ রূপ পেয়েছিল তার পরিনামে বর্ধমান জেলায় একদিকে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি সামন্ত শ্রেণী যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি বড় জোতদার তথা সামগ্রিক অর্থে জোতদার শ্রেণী বিশেষ চেহারা নিয়ে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিকজীবনে একটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।এই জোতদারগণ তথাকথিত ভূমিরাজস্বের দলিলে কৃষক বলে অভিহিত হলেও আসলে এরা মেহনতি কৃষক সমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের— এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং ভূমিকে কেন্দ্র করে উৎপাদন প্রক্রিয়া সবকিছুই প্রমাণ করে যে তারা তৎকালীন ক্ষুদে জমিদারদেরই সমতুল্য ছিল। জমিদারদের মতই প্রাসাদোপম গৃহাঙ্গন এবং সর্ব সময়ের ভাড়াটে লাঠিয়ালে তাদের আচরণকে জমির উৎপাদন থেকে দূরে অবস্থিত অভিজাত ও জমিদারের মতই করে তুলেছিল। কার্যত জমির উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত লক্ষ লক্ষ মেহনতি কৃষকগণের জীবন চর্চা থেকে তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অতিবাহিত হতো। বিংশ শতকের ২য় অর্ধে বাংলার গ্রামীণ জীবনে এই বৃহৎ জোতদারগণ এবং মেহনতি কৃষকগণ সুনিশ্চিতভাবে ২টি পৃথক শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। এই জোতদারগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে জমির পরিমানও কম ছিল না। ৫ হাজার বা ১০ হাজার বিঘা জমির মালিক বৃহৎ জোতদারের সংখ্যা বাংলায় অপ্রতুল ছিল না। এদের জমিতে মেহনতি কৃষককূল অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়ে বিনিময়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সংস্থানটি অর্জন করতে পারতো। বিকাশের উপযোগী পর্যাপ্ত রসদ থেকে তাদের বঞ্চনা একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। যেটা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করত না।

১৯৫২ সালে জমিদারী বিলুপ্তির আইন প্রবর্তিত হলেও এই সমস্ত বড় বড় জোতদারগণকে ঠিক প্রত্যক্ষভাবে এই আইনের আয়ত্বাধীনে আনা সম্ভব হয়নি। এহেন 'কৃষকের' কিছু কিছু জমিকে খাস বলে ঘোষণা করা হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পূর্ব অর্জিত জমিকে চতুর জোতদারগণ বেনামী করে সংরক্ষণের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে ফেলেছে। যার নামে বেনামী করা হয়েছে হয়তো তার মানব অস্তিত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যেত।

পশ্চিবাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠনজাত অনুকূল পরিস্থিতিতে জমির জন্য 'মেহনতি' কৃষকের সংগ্রাম একটি নতুন পর্যায়ে উত্থিত হয়। ১৯৬৯ সালে সারাভারত কৃষক সভার বরগুল সম্মেলন এবং কাটোয়া থানার সুদপুরে অনুষ্ঠিত বর্ধমান জেলা

সম্মেলনে উদ্বৃত্ত জমির উপর কৃষকের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের মৌলিক অধিকাবকে চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সকলেই জানেন যে জমিদার ও জোতদারগণ সিলিং আইন ফাঁকি দিয়ে, খাস হওয়া উচিত ছিল এমন লক্ষ লক্ষ একব জমি নিজেদের কবজায় রেখে দিয়েছিল। তাছাড়াও তারা নানা কায়দায় এমনকি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেও তাদের বাড়তি জমির একটি বড় অংশই নিজেদের দখলে রেখেছিল[১]। এই বাড়তি জমির পরিমাণের বিশালত্ব অনুমান করা যাবে যদি আমরা লক্ষ করি যে শুধু প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়েই জোতদারদের কবল হতে অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৯০ হাজর একর বাড়তি খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছিল। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাংলার কৃষক সমাজের সামনে একটি বৃহৎ আন্দোলনের কর্মসূচী এসে পড়ে। যেটি হল মূলতঃ বাড়তি খাস ও বেনামী জমি উদ্ধার ও বিলি ব্যবস্থা করা।

বিংশ শতকের ছয়ের দশকের ২য় পর্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) ও সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষক যে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে তা পশ্চিম বাংলায় প্রত্যেকটি জেলার বেশীর ভাগ অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও দার্জিলিং কেবল এই কয়টি জেলাতে আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়নি, বাকি সব জেলাতেই তা দুর্বার বেগে এগিয়ে যায়[২]। এই আন্দোলনের একটি নতুন মাত্রা ছিল। সর্বহারাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এই নতুন মাত্রার উৎসমূল অনুসন্ধান করলে সমাজবিজ্ঞানীগণের দৃষ্টি বর্ধমান জেলার মঙ্গকোট থানার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়, যেখানে ১৯৬৯ সালের জুন মাসে এক রক্তক্ষয়ী শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলার সর্বহারা মানুষ নতুন দিনের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল।

চৈতন্যপুর বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার একটি অখ্যাত গ্রাম। এর অবস্থান অজয় তীরবর্তী গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর সমতল ভূমিতে। কৃষি এখানকার মূল অর্থনৈতিক বনিয়াদ। এখানকার রায় চৌধুরীগণ একটি সম্পন্ন জোতদার পরিবারের অন্তর্গত। এদের অধিকার ছিল প্রায় ৫ হাজার বিঘা জমি। এই জমি দুরমুট, কৈচর, চৈতন্যপুর, শিমুলিয়া, মাথরুন, ভাতার, করুই প্রভৃতি প্রায় ৫২ টি মৌজায় অবস্থিত ছিল। জমিগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি জোতে ভাগ করে চাষ করা হতো। এই তিনটি জোতে, যথাঃ- চৈতন্যপুর, কৈচর ও শিমুলিয়াতে তিনটি চাষবাড়ী ছিল এবং এই তিনটি স্থানে মোট ৬০টি হাল ছিল। শতাধিক কৃষক এক একটি জোতের সাথে যুক্ত হয়ে উৎপাদন কর্ম সম্পন্ন করত[৩]।

১৯৫২ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ আইন প্রবর্তিত হলেও এই রায়চৌধুরীদের জমি হাতছাড়া হয়নি। কারণ, বেনামে জমি দখলে রাখা হয়েছিল। রায় চৌধুরীগণ নিজেদের আর জমিদার পরিচয় না দিয়ে কৃষক হিসাবে পরিচয় দিত। সমস্ত জমির উপর তাদের কায়েমী স্বার্থ অটুট রাখতে তারা সক্ষম হয়েছিল।

কৃষক নেতা সমর বাওড়ার সাথে সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারা যায়[৪] যে সুদপুরে বর্ধমান জেলার কৃষক সম্মেলনের পর বর্ধমান জেলার গ্রামগঞ্জে নানা সভা, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে খাস জমি দখল করা এবং দখল রেখে চাষ করার শ্লোগান জনপ্রিয় করে

তোলা হয়। মঙ্গলকোট কৃষক সভায় স্থির হয় খাস জমি দখল করে কৃষকদের দেখানো যে জমি দখল করা যায়। এরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা সে সময় ছিল। কারণ কৃষকদের সাধারণ ধারনা ছিল যে অন্য কারো জমি দখল করা সম্ভব নয়, "পরের বাপকে বাপ বলা যায় না"। সুতরাং খাস জমি দখলের আন্দোলন কৃষকদের লড়াকু মনোবলকে পুরুষ্টু রাখার প্রয়োজনেই।

মঙ্গলকোট থানা কৃষক সভা স্থির করে মাথরুন মৌজায় কাশিম বাজারের মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর যে ৫ একর জমি খাস ঘোষিত হয়েছে, তাকে দখলে আনা[১]। কাজটি সহজ সাধ্য ছিল, কারণ মাথরুন থেকে কাশিমবাজার বহুদূরে অবস্থিত ও মহারাজার পরিবার থেকে প্রতিরোধের সম্ভাবনাও কম ছিল। মালিক পক্ষের প্রতিরোধের বিষয়টি বিবেচনায় স্থান পায়। কারণ সে সময়ে মঙ্গলকোটের কিছু জোতদার চাষী সংঘ নামে একটি সংঘ গড়ে তুলে জমি দখলের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংগঠন করতে উদ্যোগী হয়[২]।

১৯৬৯ সালের ২২ শে জুন নন্দীদের জমি দখলই মূল লক্ষ্য ছিল। তিন হাজার কৃষকের বিশাল মিছিল চৈতন্যপুর গ্রামের দিঘির পশ্চিম পাশ দিয়ে মাথরুনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই মাথরুন যাবার পথে চৈতন্যপুরের রায় পরিবারের নেতৃত্বে এক বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী মিছিলকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই লাঠিয়াল ধারীদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রধারী গুণ্ডারাও অংশগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে চৈতন্যপুরের দিঘির সীমান্তে মিছিলকারী মেহনতি কৃষকগণের উপর যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেটা সমকালের বহু জোতদার জমিদারের সমর্থন পুষ্ট ছিল। বর্ধমান জেলার উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের নাম করা জোতদার জমিদার পরিবার যথা,পুটশুড়ির গুঁই, সাঁওতার কোঁয়ার, বাজার বনকাপাশীর মল্লিক প্রভৃতি সকলেই চৈতন্যপুরের রায়-চৌধুরীদের সাথে সম্মিলিত হয়ে মেহনতি কৃষকের জমি দখলের প্রথম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে লাঠিয়াল ও বন্দুক বাহিনী নিযুক্ত করে।

ঘটনাটি মাথরুনের ৫ একর জমি দখলকে কেন্দ্র করে ঘটলেও জমিদার জোতদারদের নিকট এটি ছিল একটি শ্রেণী অভ্যুত্থানের বিষয়। সুতরাং তাকে প্রতিহত করতে সন্ত্রাস বাহিনী গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। যাই হোক প্রায় ১৫০র অধিক লাঠিয়ালের প্রথম আঘাতে কৃষকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কেউ ছুটে চলে যেতে উদ্যত হয়। আবার কেউ তীব্র প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়। সংঘর্ষ চলাকালীনই নিকটবর্তী গ্রাম থেকে আরো সংগ্রামী কৃষক ঘটনাস্থলে যোগ দেয়। ২০-২২ টি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোঁড়া হয়, দলের অন্যতম কৃষক নেতা সমর বাওড়া গুলিবিদ্ধ ও আহত হয়। তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে খুদরুন গ্রামের সাহসী কৃষক কর্মী বনমালী কুশমেটে এগিয়ে গেলে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মাঝিগ্রামের পাঁচকড়ি মাঝি নামে অপর এক কৃষক কর্মী টাঙ্গির কোপে নিহত হন। প্রায় শতাধিক কৃষক কর্মী আহত হন[৩]।

জোতদারদের এই নগ্ন হিংস্র আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে পরিশেষে মিছিলকারী কৃষকগণ নিকটবর্তী রায়চৌধুরীদের খামার বাড়ির উপর চড়াও হয় এবং ৫টি খড়ের গাদায় আগুন

লাগায়। মাথরুনের ৫ একর জমি দখলের জন্য যে কৃষক মিছিল গঠিত হয়েছিল এখন তার সমস্ত রোষ চৈতন্যপুরের জোতদার রায়চৌধুরী পরিবারের উপর নিক্ষিপ্ত হল। পরোক্ষে বলা চলে রায়চৌধুরী পরিবার কৃষকদের উত্তেজিত করে নিজেদের উপর আক্রমণকে আহ্বান করেন। আদতে মিছিলকারীদের কাছে রায়চৌধুরেদের জমি দখল করার কর্মসূচী ছিল না, তারা অগ্রসর হচ্ছিল মাথরুনে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর ৫ একর জমি দখল করতে।

২২ শে জুনের ঘটনা সমকালীন মঙ্গলকোট থানার কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে জোতদারদের হীন চক্রান্তকে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকটিত করে। বনমালী কুশমেটের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটিকে যখন গ্রামে-গঞ্জে শোক মিছিলের মাধ্যমে পরিক্রমা করানো হচ্ছিল, তখন প্রত্যেকটি কৃষক সর্বহারাই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেন সকলের অজান্তেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনকে তীব্রতর করার। যুগের পর যুগ এই জোতদাররা তাদের উদ্বৃত্ত জমি আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির নামে নথিভূক্ত করিয়ে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে গেছে। ফসল কাটার পরে ফসলের উপর কৃষকের ন্যায্য অধিকারকেও তারা অস্বীকার করেছে। সেদিন সকলের মনে এক অনুচ্চারিত শপথ যেন গৃহিত হয়েছিল এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার।

এই ঘটনার সূত্র ধরে উভয় পক্ষের অনেকগুলি পুলিশী কেস নথিভুক্ত হয়। রায়-চৌধুরী পরিবারের ১৪-১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের কাছে দরবার, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি মামুলি ঘটনা ঘটে। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতিনিধি পরের দিনই গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে সরেজমিনে অবস্থা পর্যালোচনা করেন। কিন্তু এসবের অন্তরালে যেটি প্রধান সূত্র সেদিন প্রকাশিত হল, তা হচ্ছে শুধু চৈতন্যপুর নয়, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্তরে জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি দখল করতে হবে এবং তা হবে সংগঠিত কৃষকদের লড়াকু ভূমিকা দিয়েই।

চৈতন্যপুরের রক্তক্ষয়ী ঘটনার নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের নাম অত্যন্ত গৌরবের আলেখ্যে বিধৃত। তাঁরা হলেন সুবোধ চৌধুরী, সমর বাওড়া, নিখিলানন্দ শর, মনোজ পাল, মহাদেব মাঝি (নিগন), ভৈরব মাঝি, শামসুল হুদা (শিমুলিয়া), শান্তি সরকার (পালিশগ্রাম) প্রমুখ[৮]। এই ঘটনার পর কৈচরে এক বিশাল কৃষক নেতৃবৃন্দই কৃষকগণকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আহ্বান জানান এবং বর্ধমান জেলা ও তার বাইরে অবস্থিত চৈতন্যপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের উদ্বৃত্ত জমি দখল করার জন্য জোট বদ্ধ হওয়ার অনুরোধ জানান। বিষয়টি তৎকালীন বিধান সভার আলোচনাতেও এসে পড়ে এবং যুক্তফ্রণ্টের প্রতিনিধি বৃন্দ জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি দখলের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে সরকারকে অনুরোধ জানায়[৯]।

চৈতন্যপুরের ঘটনা বাংলার মেহনতি কৃষকের জমির উপর অধিকার অর্জনের সংগ্রামী আলেখ্যের প্রথম ধাপ বলা চলে। অতীতে অনেক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত

হয়েছে। সেগুলির পটভূমি কোথাও ছিল রাজস্ব বা ঋণ কেন্দ্রিক অথবা ফসলের অংশ বা ভাগ বা ন্যায্য অধিকার অর্জনের বিষয়কে অবলম্বন করে, কিন্তু যে জমিতে কৃষকগণ ফসল ফলায়, শ্রম বিনিয়োগ করে তাকে প্রত্যক্ষভাবে নিজের দখলে আনার বাস্তব কর্মসূচী চৈতন্যপুরের ঘটনার আগে তেমন জোরালো ভাবে কোথাও প্রকটিত হয়নি। চৈতন্যপুর, মাথরুন প্রভৃতি এলাকার উদ্বৃত্ত জমি নিজেদের দখলে নিয়ে এসে কৃষকদের মৌলিক অধিকারকেই অগ্রাধিকার প্রদান করার ইতিহাসের সূচনা হল ১৯৬৯ সালের ২২ শে জুনের কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে।

সূত্রনির্দেশ

১। কোঙাব হরেকৃষ্ণ, নির্বাচিত রচনা সংকলন, পৃঃ ৬৯।
২। তদেব, পৃঃ ৭০।
৩। সাক্ষাৎকাব, রমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।
৪। সাক্ষাৎকাব, সমব বাওড়া।
৫। তদেব।
৬। তদেব।
৭। সাক্ষাৎকার, নিখিলানন্দ সর।
৮। তদেব।
৯। তদেব।

লবণ আন্দোলনে চব্বিশ পরগনার কালিকাপুর ও নীল

পুষ্পরঞ্জন সরকার

চল্লিশের দশকের রাজনীতিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। আবার অপরদিকে স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত বলি হল সাম্প্রদায়িকতার বিষে। বাংলার রাজনীতিতে নিজামুদ্দিন, সুরাবর্দি, আবুলহাসেম প্রভৃতি লীগপন্থী নেতারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন। আবার শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের সাথে সুরাবর্দির স্বাধীন বাংলা গঠনের চেষ্টা ইত্যাদিতে যে সকল বিষময় রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাও ক্ষমার যোগ্য নয় সেই সব মানুষের কাছে, যাঁরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে বৃটিশ বিরোধিতায় এগিয়ে এসেছিলেন গান্ধীকর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে।

গ্রামাঞ্চলে গোড়ার দিকে নিয়মতান্ত্রিক ধাঁচের গান্ধীপন্থী অসহযোগের প্রারম্ভিক বিন্দুও সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল, স্বাভাবিকভাবেই সেই সব অঞ্চলে যেখানে আঞ্চলিক আশ্রমগুলির মাধ্যমে আগেই খানিকটা গান্ধীপন্থী গ্রামীণ গঠনমূলক কাজ করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত বাংলায় বাঁকুড়া, আরামবাগ ও সোদপুর।[১]

প্রাথমিক প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল লবণ। কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেআইনী লবণ উৎপাদন কঠিন হয়ে পড়ে।

গান্ধী সংসার ত্যাগ করে বনবাসে যেতে বলেন নি। সংসারের সংঘাতের মধ্যেই সত্যের পরীক্ষা রাজনৈতিক ক্ষেত্র, তার বাইরে নয়।[২]

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু হল। ডাণ্ডি অভিযান আবার দেখাল গান্ধীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভারত কীভাবে উত্তাল হয়ে ওঠে— আর নিরস্ত্র জনসাধারণ কী অসাধারণ সহ্যশক্তি দ্বারা হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করে। এরই একটি উদাহরণ দেওয়া যায় চব্বিশ পরগনার দুই অখ্যাত অঞ্চল কালিকাপুর (ক্যানিং লাইন) এবং নীল (ডায়মন্ডহারবারের নিকটবর্তী) নাম উল্লেখ করে। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা সক্রিয় সহযোগিতা করেন গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য লবণ তৈরীর সুযোগ থাকায় চব্বিশ পরগনার কংগ্রেস কমিটি দ্বারা এই স্থান দুটি তথাকথিত বেআইনী লবণ তৈরির কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন চব্বিশ পরগনা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জী ছিলেন চব্বিশ পরগনা সত্যাগ্রহ কমিটির সভাপতি। এই সত্যাগ্রহ কমিটিতে নয় জন সদস্য ছাড়াও তিন জন সদস্য Co-opt করা হয়।

এই তিরিশের দশকে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ্য।

১। চিত্তরঞ্জনের জনপ্রিয়তাকে ম্লান করে গান্ধীর জনপ্রিয়তা।

২। কংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

৩। বিপ্লবী আন্দোলনে পুরানো সন্ত্রাসবাদ।

৪। সাম্যবাদী প্রভাব।

৫। সাম্প্রদায়িকতা।
এই উদ্দেশ্যে মোহাম্মদী ও মোসলেম হিতৈষী পত্রিকার প্রচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৬। ১৯২৯-৩৩ খ্রীস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী মন্দা।

চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরুর অন্য এক প্রতিবন্ধক ছিলেন গান্ধী। জেল থেকে বেরোবার পর দীর্ঘদিন তিনি স্বরাজী কর্মপন্থার সরব সমালোচনা করেন। প্রথমে এ ব্যাপারে পুনায় গান্ধী, মতিলাল ও লাজপত রায়ের মধ্যে কথা হয়। পরে জুহুতে দাশ ও নেহেরুর সঙ্গে। গান্ধী বলেন, তাঁর সঙ্গে স্বারাজীদের মতানৈক্য সামান্য নয়।[৩]

দাশ সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে বোমা ছুঁড়লেন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রশংসামূলক প্রস্তাব পাশ করিয়ে। গান্ধী এর মধ্যে অহিংসা নীতির ওপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ লক্ষ্য করবেন, এতে আশ্চর্য কি![৪]

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুর কনফারেন্সে দাশ দলের লোকের সামনে কোন বাস্তব প্রস্তাব পেশ করতে পারেন নি। অথচ হিংসামূলক কাজ বন্ধ করতে বলেছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বৃটেনকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস (স্বরাজ নয়) দিতে অনুরোধ জানান। এতে বিপ্লবীরা তীব্র আপত্তি তোলেন।

মৃত্যুহীন প্রাণদান করে কিন্তু অপূর্ণ আশা নিয়ে তিনি চলে গেলেন। লিটন ভারতসচিবকে সাবধান করে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে, দাশ এমন লোক নন যার সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। লিটন একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা বলেছিলেন, 'Politically speaking, C R Das died at Faridpur'[৫]

বাইরে থেকে বাংলার স্বরাজ দলের কর্মসমিতি গুণিজনের সমাহার হলেও তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বই দুর্বলতার অন্যতম কারণ। তাঁর মৃত্যুর পর কর্পোরেশন ও দলের কর্তৃত্ব নিয়ে লজ্জাজনক কলহ তার প্রমাণ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলার স্বরাজ্য দল দাশের মৃত্যুর পর ভেঙে যেতে বসল। ...... তাঁরই বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহস গান্ধীর মত প্রতিপক্ষকে নির্বীর্য করেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস, সেই গান্ধীর স্মরণ নিতে হল দাশের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে।[৬]

সেনগুপ্ত, শাসমল ও তুলসী গোস্বামীর দলাদলি শুরু হল। বিপ্লবী দলের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এবং এক একটা গোষ্ঠী এক এক পক্ষ নিল।

কলকাতা কংগ্রেসের (১৯২৮) সময় একটা সাময়িক নিষ্পত্তি হয়। সেনগুপ্ত হন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বিধান রায় তার সচিব ও সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবী দলের সর্বাধিনায়ক।

তিরিশের দশকে বাংলার বিপ্লবী কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, লোম্যান হত্যা (ঢাকা), রাইটার্স অভিযান।

আইন অমান্য থেকে শ্রমিকরা সম্পূর্ণ সরে ছিল রুশ নির্দেশে। রবীন্দ্রনাথ বৃহৎশিল্প সম্বন্ধে একই রকম সন্দীহান ছিলেন। তার প্রমাণ মুক্তধারা, রক্তকরবী। তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি বাংলার তথা ভারতে ইতিমধ্যে কলেবর বৃদ্ধি করেছে। AITUC প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা তথা ভারতে রেল, সূতাকলে শিল্প ধর্মঘট হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনে ধাঙর ধর্মঘট ও গাড়োয়ান ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছেন বামপন্থীরা।

আইন অমান্য চলাকালীন বাংলায় আবার সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে জিন্না আগেই (১৯৩০-এর জানুয়ারী) বলেছিলেন, তার চৌদ্দদফা দাবী মানতে হবে এবং মহম্মদ আলি তার সাথে এক মত হন।

এই সময়ে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব যে বাংলা তথা ভারতে পড়ে তা নিম্নোক্ত সারণী দেখে বোঝা যায়।

বছর	দ্রব্যের মোট রপ্তানী মূল্য (হাজার টাকায়)	দ্রব্যের মোট আমদানী মূল্য (হাজার টাকায়)
১৯২৪-২৫	৩,৯৪,৬৬,৫৩	২,৪৬,৬২,৫৪
১৯২৮-২৯	৩,৩০,১২,৭৯	২,৫৩,৩০,৬০
১৯২৯-৩০	৩,১০,৮০,৫৫	২,৪০,৭৯,৬৯
১৯৩০-৩১	২,২০,৪৯,২৬	১,৬৪,৭৯,৩৭

[illegible]

টেবল নং ২০৪]

চব্বিশ পরগনার সত্যাগ্রহ কমিটি লবণ সত্যাগ্রহের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই জেলার মহিষবাথান (বর্তমান সল্টলেক অঞ্চলে), কালিকাপুর (ক্যানিং) ও নীল (ডায়মন্ডহারবার)—এ চারটি দলে লবণ সত্যাগ্রহ করার জন্য নির্বাচিত করেন।

এই দলের মধ্যে তৃতীয় দল ও চতুর্থ দল নীল ও কালিকাপুরে বেআইনী লবণ তৈরি করে সত্যাগ্রহ করবে।

কালিকাপুর

৬ই এপ্রিল, ১৯৩০-এ কালিকাপুরে লবণ আইন ভঙ্গ করা হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হরিকুমার চক্রবর্তী এবং প্রফেসর অতুল সেনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সিভিল সত্যাগ্রহ কমিটির পক্ষ থেকে। "হরিকুমার চক্রবর্তীর ২৪ পরগুনা দলটি একটি বিপ্লবী দল তৈরি হয়েছিল।"[১] স্থানীয়ভাবে

অনুসন্ধানের পর তারা কালিকাপুর (ক্যানিং রেললাইনের পাশে) এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করেন। এটা ঠিক হয় যে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সময় লবণ আইন ভঙ্গ করা হবে। চারদিকে এই উপলক্ষে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়।

৯ই এপ্রিল কালিকাপুরে বিরাট মাত্রায় লবণ তৈরি করা হয়। গৌরীমোহন মণ্ডল এই লবণ কলকাতায় নিয়ে আসেন। খিদিরপুরে এক সমাবেশে পাঁচ সেরেরও বেশি লবণ বিক্রয় হয়। আশা করা যায় যে, ঐ দিন আরো এক মণের বেশী লবণ তৈরি হবে এবং এখন থেকেই এই লবণ তৈরির মাত্রা প্রতিদিনই বৃদ্ধি করা হবে। কালিকাপুরকে দেখে মনে হয় ডাণ্ডির পরে দ্বিতীয় স্থান হিসেবে এটি লবণ তৈরির কেন্দ্র বলে গুরুত্ব পাবে।

এই দিন সকালে প্রফেসর অতুল সেনের সাথে নারী অংশগ্রহণকারী হিসেবে মোহিনী দেবী কালিকাপুরে রওনা হন।

কালিকাপুরে কংগ্রেস কমিটি আবিষ্কার করেন যে, এখানে লবণ তৈরির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কালিকাপুরে খালের দু'পাড়েই যে লবণের ভাণ্ডার আছে, তা জল ফুটিয়ে এবং পরিশোধন করে যে লবণ পাওয়া গেল তা লিভারপুল ব্রান্ডের সমগোত্রীয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি জেলা কমিটি প্রস্তাব দেয় যে, এই বিরাট এলাকায় বিশাল রকম লবণ প্রাপ্তির সুযোগকে আরও সুচারুভাবে আরো বেশী আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত এবং আশেপাশে লবণ উৎপাদনের আরও কেন্দ্র চালু করা হোক।[৮]

১০ই এপ্রিল এখানে বিরাট রকম লবণ তৈরি হয়। নেতৃত্ব করেন প্রফেসর অতুল সেন ও সুশীল মুখার্জী। লবণ তৈরির জন্য পুলিশের হাতে কর্মীরা লাঞ্ছিত হন। আহত কর্মীদের কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১১ই এপ্রিল এখানে সত্যাগ্রহীদের সমাবেশে পুলিশ লাঠি চালনা করে। অনেককে পুলিশ তাড়া করে খালের জলে ফেলে দেয়। এক্সাইজ অফিসার ও পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করে।

কালিকাপুর শিয়ালদহ-ক্যানিং লাইনের একটি নির্জন স্টেশন। ডাউন প্ল্যাটফর্মের অনতিদূরে খালের পাশে লবণ তৈরির জায়গা সত্যাগ্রহ কমিটি থেকে ঠিক করা হয়।

১২ই এপ্রিল সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশের অত্যাচার এখানে আশেপাশের গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করে। হাজারে হাজারে গ্রামবাসীগণ সত্যাগ্রহীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। মহিলারাও সত্যাগ্রহ স্থলে উপস্থিত হন। তরুণদের ওপর অত্যাচারে তাদের অনেকে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। যদিও তাদের এই প্রচেষ্টাকে সত্যাগ্রহীরা তাদের সাধুবাদ জানিয়ে তাদের বিরত করেন। কলকাতা থেকে বিরাট সংখ্যক দর্শক সত্যাগ্রহ পরিদর্শনে আসেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, ডাঃ কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ অনিল চক্রবর্তী এখানকার বিরাট অঞ্চল পরিদর্শন করেন।[৯] তাঁরা কালিকাপুরের সত্যাগ্রহীদের জন্য একটি মেডিকেল ইউনিট খুলতে সমর্থ হন। ডাঃ রায় ও তাঁর সহকর্মীরা সত্যাগ্রহীদের নানারকমভাবে পরিচালনা করেন। তাঁরা কালিকাপুর খালের দু'পাশে

লবণ তৈরির জায়গাকে আরও বিস্তৃত করেন। বিধান রায় প্রমুখ সম্বন্ধে আলাদা করে বলা যায় যে, এঁরা ছিলেন গান্ধীপন্থী ধাঁচের গণআন্দোলনের ব্যাপারে অনুৎসাহী আর পৌরসভা বা আইনসভার রাজনীতি চর্চার জগতেই অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ। ১৯৩০-এর দশকে এঁদের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি হলো — এইটুকুই নতুন।[১০]

এইদিন কালিকাপুরের পাশে আরও একটি কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। অন্য কয়েকটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চালু হবে। সংলগ্ন গ্রামগুলোর ওপর সত্যাগ্রহের বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা খোলাখুলিভাবেই লবণ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

সোনারপুর অঞ্চলে এই বিরাট সত্যাগ্রহ দমনের জন্য বিরাট সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মজুত রাখা হয়। গ্রামবাসীগণ পুলিশ বয়কট করেন।

৯ই এপ্রিল বিজয়কুমার দত্ত এবং বসন্তকুমার মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে আসা হয়। পরদিন শহরে পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

১৪ই এপ্রিল এখানে লবণ তৈরির সময়ে অনেক সত্যাগ্রহী পুলিশী তাণ্ডবে আহত হন। বঙ্গীয় মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের ডাঃ নীলরতন সরকার মেডিকেল বিভাগকে সত্যাগ্রহীদের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।[১১]

১৯শে এপ্রিলেও কালিকাপুরে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তারের অনেক খবর আসে।

নীল

৬ই এপ্রিল বিজয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে পঁচিশ জন সত্যাগ্রহী নীল-এ লবণ আইন ভঙ্গ করেন। চিংড়িপোতার মধ্য দিয়ে যাবার সময় অন্য এক দল সত্যাগ্রহী তাঁদের দেখে উল্লসিত হন। আগামীকাল সম্ভবত তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন।

৬ই এপ্রিল চিংড়িপোতার দল চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবারের নীল-এ বিজয় কুমার দত্তের নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। আরও দুটো লবণ আইন ভঙ্গ কেন্দ্র খোলা হয়। শ্রী দত্ত বলেন যে, শুধু লবণ আইন ভঙ্গই নয়, অন্যান্য সরকারি নিয়মভঙ্গেরও প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে ইন্টালীর একজন ভারতীয় খ্রীস্টান অমরনাথ বিশ্বাস এই লবণ আইন ভঙ্গে সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ করেন।[১২]

৯ই এপ্রিল এখানে সত্যাগ্রহী শিবিরে গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা দেন। মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে ফুল ছড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের সংবর্ধনা জানান। ক্যাপ্টেন বিজয় সামন্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

১০ই এপ্রিল এখানে বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহে লবণ তৈরি হয়।

১৮ই এপ্রিল এখানে জনসাধারণ SDO কে বয়কট করেন। চম্পাহাটি, সর্দারিতি, চিংড়িপোতায় আইন অমান্য হয়।

১৯শে এপ্রিল এখানে অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

২০শে এপ্রিল ডায়মন্ডহারবারের ফুলেশ্বরে Contraband লবণের Sample তৈরি হয়।[১৩]

২৪শে এপ্রিল পুলিশের গুলি বর্ষণে একজন সত্যাগ্রহী নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হন।

প্রায় দু'হাজার গ্রামবাসী এই দিন নীল-এ জমায়েত হন বেআইনী লবণ তৈরি করতে। পুলিশ একে বেআইনী জমায়েত বলে ঘোষণা করে সত্যাগ্রহীদের ঐ স্থান ত্যাগ করতে বলেন। জনতা পুলিশের কথা অমান্য করে তাদের ইষ্টক বর্ষণ করতে থাকে। এর ফলে একজন আবগারী সাব-ইনসপেক্টর-সহ ষোলজন পুলিশ কর্মচারী আহত হন। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ দু'রাউন্ড গুলি চালায়। এর ফলে তিন জন মারাত্মক রকম জখম হন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একজন ঘটনাস্থলে মারা যান।[১৪]

স্থানীয় মানুষ কলকাতা থেকে আগত লবণ আন্দোলনের সত্যাগ্রহীদের সাথে একাত্ম হন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা ছিলেন নিতান্ত দর্শক। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের কর্মযজ্ঞ তাঁদের আন্তরিকভাবে প্রভাবিত করে। পুলিশী অত্যাচারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লবণ তৈরির মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে সার্বিক একাত্মতা দেখা যায়। সমগ্র দেশে বিশেষতঃ বাংলার বহিরঙ্গে দলাদলি, হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলন বা জাতীয়তাবোধের জাগরণে এটি একটি সহজতর মাধ্যম তৈরি হয়।

লবণকে হাতিয়ার করে গান্ধীজি যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, যাতে সমগ্র দেশবাসীকে একাত্ম করতে চেয়েছিলেন, তাতে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলও যে সাড়া জাগিয়েছিল কালিকাপুর ও নীল তার সাক্ষ্যবহন করে।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের অনেকে নিজ নিজ প্রাধান্য নিয়ে অহমিকাবোধ করেন, সমাজের অনেক উঁচুতলার লোক নেতৃত্ব করে স্বার্থপরতার আবর্তে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কলুষিত করেন কিন্তু এই সব সাধারণ লোকের এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় কোন খাদ ছিল না। রাজনৈতিক গুরুত্বে এই সকল স্থান হয়ত বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে পারে নি, তাহলেও এই সকল স্থানের কার্যকলাপ, স্থানীয় অধিবাসীদের অবদান সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন।

সূত্র নির্দেশ

১। সুমিত সরকার, **আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭**, কলিকাতা, কে. পি. বাগচী, ১৯৯৩, পৃঃ ২৯৮

২। অমলেশ ত্রিপাঠী, গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা, **দেশ**, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃঃ ২৭।

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)**, কলিকাতা, আনন্দ, ১৩৯৮, পৃঃ ১২৬

৪। ঐ পৃঃ ১২৭

৫। ঐ পৃঃ ১৩০

৬। ঐ পৃঃ ১৩১

৭। ঐ পৃঃ ৭৭

৮। **The Liberty**. Calcutta-9 April. 1930. p 7

৯। ঐ 12 April. 1930

১০। সুমিত সরকার. **আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭**, কলিকাতা. কে. পি. বাগচী, ১৯৯৩. পৃঃ ৩৫২

১১। **The Pioneer,** Allahabad. 14 April. 1930. p 3.

১২। **The Liberty**. 6 April. 1930

১৩। ঐ 19 April. 1930

১৪। **The Pioneer,** 27 April. 1930

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার 'পথের আলো' বুলেটিন, ১৯৩১-১৯৩৩

বিমলকুমার শীট

১৯৩০ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলনের বিস্তার ও সফলতার ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলা অন্যান্য সমস্ত আইন অমান্য কেন্দ্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় 'বুলেটিন' গুলির ভূমিকা ছিল অনন্য। বুলেটিন গুলোর স্থান আজও রাজ্য লেখ্যাগারে হয়নি। ব্যক্তিগত সংগ্রহে যা আছে তা আজ প্রায় নষ্ট হওয়ার মুখে। কাঁথি মহকুমা থেকে প্রকাশিত 'পথের আলো' বুলেটিনের ভূমিকা কী ছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে তার উপর বড়লাট লর্ড আরউইন দমননীতি প্রয়োগ করেন। ভারতে প্রায় সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়, ১৯৩০ খ্রীঃ ১০ই অক্টোবর বেআইনি সমিতি অধ্যাদেশের বলে কংগ্রেসের সম্পত্তি ঘরবাড়ির দখল চলে। এমনকি অনুমোদিত সার্কুলার মারফত খবরের কাগজ ও কংগ্রেসী প্রচারের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল।

১৯৩২ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীদের সঙ্গে যোগ ছিল এরূপ সংগঠনকে মেদিনীপুর জেলায় সর্বত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[২] জেলার প্রথমসারির নেতা মন্মথনাথ দাস, উমেশচন্দ্র বেরা, শৈলজাপদ সেন, রামসুন্দর সিং, জহরলাল অধিকারী, মহেন্দ্রনাথ মাইতি, প্রমথনাথ ব্যানার্জী এবং অন্যান্য সক্রিয় কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইরূপ অবস্থায় আন্দোলনকে চালিয়ে যেতে হলে বুলেটিনের[৩] (bulletin) প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তাই মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য মহকুমার মতো কাঁথি মহকুমার সুধীর দাসের সম্পাদনায় কাঁথি থানা রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল 'পথের আলো' বুলেটিন। সম্পূর্ণ গোপনে বুলেটিন প্রকাশ করতে হতো। সাইক্লোস্টাইল মেসিন লুকিয়ে রাখতে হত এবং প্রকাশিত বুলেটিন অতি সংগোপনে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিতে হত। কারণ বুলেটিন ধরা পড়লে বহনকারী, প্রকাশক সবাইকে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হত। এই সমস্ত বুলেটিনের আয়ু ছিল স্বল্প। প্রয়োজনে বুলেটিন আত্মপ্রকাশ করে আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তার প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়।

'পথের আলো' বুলেটিনের প্রকাশিত সংবাদ পড়লে এবং ছবিগুলো দেখলে আইন অমান্য আন্দোলনে তার প্রভাব বোঝা যায়। বুলেটিনের ষষ্ঠ সংখ্যায় ছবিতে দেখা যায় রাস্তা কাদা হওয়ার জন্য ৭নং ইউনিয়নে নোটিশ জারি করার সময় দারোগাবাবু দফাদারের কাঁধে চেপে যাচ্ছেন। আর সিপাহীর জুতা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন চৌকিদারবাবু।

ছবির ডানদিকে লিখা হয়—
পায় জুতা পথ কাদা বেজায় বিপদ
রক্ষিতে দারোগা শেষে আপন শ্রীপদ।
দফাদারের কাঁধে উঠিলেন চাপি
ভাবে মনে বেচারা সে দারোগার সাঁথি।
চৌকিদারের মরণ ভালো জুতো বয় ও সেই
শেষটা কিনা বইতে হইতে পুলিশরূপী সু।
ধান বইনু, বইনু যত লুঠের মাল বাসন কোসন
শেষটা কিন্তু চাপল কাঁধে জলজ্যান্ত দারোগা পা।[৮]

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরীরত দেশীয় লোকেদের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়েছিল তা উপবিলিখিত লেখাখানি পড়ে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

'চিনির ধাঁধা' শিবোনামায় বুলেটিনে লেখা হয় —

'দেশবাসী অনেকের মনে এই ধারণা জন্মাইয়াছে যে, কংগ্রেস চিনি বর্জনের জন্য তেমন আর প্রচার করে না এবং দেশী চিনি উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া দেশী চিনি ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভারতব্যাপী এখনও বিলাতী চিনি বর্জ্জনের প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। দেশী যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহা পরিমাণে এতই অল্প যে সমগ্র দেশে তাহা সববরাহ হইতে পারে না এইরূপ আমাদের দেশী চিনি খরিদ বা বিক্রয় করা মানে বিলাতী চিনিকে দেশী চিনির নামে বিক্রয় হইতে দেওয়া। সুতরাং কংগ্রেস এখন এই বিষয়ে স্থির উপনীত হইয়াছেন যে — যে কোনপ্রকার চিনি খাওয়া এখন বন্ধ করিতে হইবে। গুড় চিনি অপেক্ষা দামে সস্তা। সুতরাং ব্যবহার পূর্ণভাবেই চালাইতে হইবে।[৫]

১৯৩০-১৯৩২ সালের গভর্নমেন্ট রিপোর্টে প্রকাশিত '১ লক্ষ ২৭ হাজার টন চিনির স্থলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন চিনি আসিয়াছে, অর্থাৎ ১ কোটি ৫৮ লক্ষ্য টাকার স্থলে ১ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। বিদেশী গুড় ৩১ লক্ষ টাকার স্থলে ১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছাইয়াছে। কাঁথি বাজারের দোকানদারগণ চিনি আমদানী বন্ধ করিবার জন্য পুনরায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা দৃঢ়তার সহিত রক্ষিত হইবে আমরা ইহা আশা করি। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কাঁথির অধিবাসীরই পরিচয়ই দিতেছে'।[৬] উপরিউক্ত সংবাদ দেশবাসীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। বুলেটিন ছাড়া অন্য কোন কিছু মানুষকে প্রভাবিত করার মত ছিল না। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে জোর করে ট্যাক্স আদায় করার সংবাদ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল। ট্যাক্স

আদায়ে পুলিশ অভিযান - শিরোনামায় লিখা হয় ঃ গত ১১ই আগস্ট ১৯৩২ তে বিকাল ছ'টার সময় সাত মাইল হইতে ভাউলিয়াযোগে মীরগদা যাওয়ার মুখে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, স্যার্কল অফিসার, অফিসারসহ ৩ জন সিপাহী ৯নং ইউনিয়নের বাদলপুর গ্রামে পৌঁছায়। তথায় পূর্ব ব্যবস্থামত আদায়কারী, দফাদার ও সমস্ত চৌকিদার উপস্থিত ছিল। চৌকিদার প্রাণকৃষ্ণ দাস ও কৃত্তিবাস পণ্ডাকে তাহাদের সম্মুখে হাজির করায়, স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ইহাদিগকে ট্যাক্স দিতে বলিলে তাঁহারা বাড়ি হইতে টাকা আনিয়া দিবেন বলিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। পরে আদায়কারী ব্রজমোহন পাল চৌধুরী চৌকিদার বাহিনী ও ২ জন সিপাহীকে লইয়া গ্রামে ট্যাক্স আদায়ের জন্য প্রবেশ করে। ট্যাক্স অনাদায়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিম্নলিখিত রূপ মালক্রোক করে এবং দফাদার কায়ম খাঁ ও চৌকিদার রাখাল জানা বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দেয়[৮]।

ট্যাক্সদাতার নাম	ট্যাক্সের পরিমাণ	ক্রোকীমাল	আন্দাজ মূল্য
প্রাণকৃষ্ণ দাস	৭ টাকা	দোয়ালগাভী ২টি ও বকনা ১টি	২৬ টাকা
কৃত্তিবাস পণ্ডা	সাড়ে ১২ টাকা	দোয়াল গাভী ২টি	৩০ টাকা
পাহাড়ী	১২ আনা	পিতল হাঁড়ী ১, ঘটী ১ থালা ২, বাটি১, গ্লাস ১	১৬ টাকা
ধর	১২ আনা	মাদী ছাগল ২টি	৩ টাকা
দাস	১টাকা	পিতল কলসী ১টি ঘটি ৩, থালা ৪ বাটি১, জালা ২টি[৮]	২০ টাকা

'পথের আলোর' ৭ম সংখ্যায় লিখা হয় ঃ

পথের আলো চিনিয়ে দেবে মুক্তি পথের আসল দিশা
মনের মাঝে মশাল জ্বেলে যাগতে হবে আঁধার নিশা।[৯]

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উপরিউক্ত মন্তব্য পথের আলোর প্রতি ছিল যথার্থ। পথের আলো বুলেটিনের ছবিতে আরো দেখা যায় ঃ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মহিলারা পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সরকারী পুলিশ মহিলাদের গতি রোধ করে তাঁদের হাত থেকে পতাকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

বন্দী দিবসে জাতীয় পতাকা
লইয়া চলেছে মায়ের জাতি।
আনন্দ দীপ্ত বীর গরিমায়
হৃদয়ে উছলে স্বদেশ প্রীতি।

পুলিশ ধাইছে কাড়িয়া লইতে
জাতীয় পতাকা জাতির মানে,
মা ভগিনীগণ রক্ষিছে তারে
তুচ্ছ করিয়া নিজের প্রাণ।[১০]

এই সংবাদ জনসাধারণকে প্রভাবিত না করে পারে না।

আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তখন জনসাধারণকে বাগে আনার জন্য সরকার থেকে কাঁথিতে বায়স্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ছাত্র উকীল সম্প্রদায় এমন কি বহু পুর মহিলাগণ পর্যন্ত বায়স্কোপ দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। বুলেটিনে এ সম্পর্কে লিখা হয ঃ এমন অচিন্ত্যনীয় অভূতপূর্ব ব্যাপার দেশবাসীকে না জানাইয়া হঠাৎ এই আয়োজন কেন? . ভূতের মুখে রাম নামের ন্যায় ভূমিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশযের নাম করিয়া দেশের বয়স্কো সকলকে যোগ দিতে আহ্বান করিয়া যথা সময়ে বায়স্কোপ আরম্ভ হইল। পঞ্চম জর্জ ও রাণীর চিত্র তারপর ইংরাজ রাজত্বের প্রাবম্ভের এদেশে কেমন করে ডাকাতি হত এবং ইংরাজ পুলিশ তা কেমন করে দমন করে দস্যুদের অত্যাচারের হাত হইতে বক্ষা করিত তাহার এক কাল্পনিক চিত্র দেখানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য হইতেছে যে ইংরাজ রাজ এমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছে তাহার প্রতি প্রত্যেক ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় দর্শকগণ ইহাতে মোটেই ইংরাজ রাজত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারিবেন না। .... তখন যে সব ডাকাতি ও নারী ধর্ষণ হইত তাহার অধিকাংশই মূর্খ ও অভাবগ্রস্ত লোকের দ্বারা সংঘটিত হইত। আর এখন সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে যাহা হইতেছে তাহা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত পদস্থ ইংরাজ পুলিশের পরিকাঠামোয় ও সরকারের নির্দেশ মতে। যাহারা স্পষ্ট দিবালোকে কাঁথির প্রশস্ত রাজপথে নারীর শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালনা করিতে পারে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীদিগের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতে পারে, যাহারা 'চারপালিয়া, প্রতাপদিঘি, খিরাই, বালিসাই, মাশুরিয়ায় গুলি করিয়া মানুষ মারিতে পারে, এমনকি যাহারা সতী নারীর সতীত্ব হরণ করিতে পারে তাহারা আবার কোন মুখে সেই পাপ ইংরাজ রাজত্বের সুশাসনের কথা প্রচার করিতে সাহস করে তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তা অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া কি হইতে পারে।[১১] উপরিউক্ত সংবাদ ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত রূপটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বুলেটিন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সংবাদ পরিবেশন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। থানা সংবাদে ট্যাক্স বন্ধে মুসলমান মহিলার বীরত্ব শিরোনামায় লিখা হয় ঃ গত ১৯শে আগস্ট ১৯৩২। ১৩ নং ইউনিয়নে আদায়কারীর পুত্র শ্রীনাথ প্রধান ট্যাক্স আদায়ের জন্য ৭/৮ জন চৌকিদারসহ রানিয়া গ্রামে উপস্থিত হয়। ঐ দিবস স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহার বাড়িতে গার্ড দিলেও সে অত্যন্ত জঘন্য গোপন পথে লুকাইয়া আদায় করিবার জন্য বাহির হইয়া যায়। রানিয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া পুরুষ মানুষের অবর্তমানে নিম্নলিখিত গৃহস্থগণের বাড়িতে স্ত্রীলোকদিগের নিকট ট্যাক্স চায়, তাঁহারা

দৃঢ়তা দেখাইলে ধমক দিয়া বিনা রসিদে নিম্নলিখিত রূপ মাল ক্রোক করিয়াছে। উক্তগ্রামের মুসলমান মহিলাগণ ট্যাক্স না দিয়া খুবই সাহস দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী শেখ সের আলির ভূমিকা প্রশংসনীয়।[১২]

ট্যাক্স অনাদায়ে লুণ্ঠিত গৃহস্থগণের নাম ও লুঠের বিবরণ ঃ

ট্যাক্স ২ টাকা, ক্রোকী মাল - বড় করাত ১টি, আনুমানিক মূল্য ১৫।

বাইন মাইতি ১১ আনা বস্তা ৭টি, পাট ১ সের।[১৩]

ট্যাক্স বন্ধে মালক্রোক কিভাবে হচ্ছিল তা বুলেটিনে প্রকাশিত তালিকা দেখলে এর ব্যাপকতা বুঝতে পারা যায়। পুলিশ সম্পর্কে ছড়া কাটা হয় —

দুষ্টু লোকে বলছে শুনি পুলিশ চোরে মাসতুতো ভাই
চোর ডাকাতে করলে শত রাহাজানি, দৃষ্টি নাইকো তাই।[১৪]

ট্যাক্স বন্ধে মাল ক্রোক — গত ২১/১০/৩২ ও ২৪/১০/৩২ তারিখে ১৮ নং ইউনিয়নের আদায়কারী রেওয়াজউদ্দীন ট্যাক্স অনাদায়ে মালক্রোক করেছে।[১৫]

সাধারণ দরিদ্র লোকেরা সরকারের অত্যাচাব থেকে রক্ষা পায় না। তাদের একমাত্র সম্বল সরকার ক্রোক করে নিয়েছে। বুলেটিনে কেবলমাত্র রাজনৈতিক খবরাখবর প্রকাশিত হত তা নয়। রাজনৈতিক খবরাখবরের পাশাপাশি অন্যান্য খবরাখবরও ছাপা হত। যা এই প্রবন্ধে বিস্তারিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চরকা কাটা যে হত তা বুলেটিন থেকে আমরা জানতে পারি। চরকা ও তকলী প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীর নাম ও পুরস্কারের কথা প্রকাশ করা হয়।[১৬] কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি গঠনমূলক কাজ যে সমানভাবে চলছিল চরকা ও তকলী প্রতিযোগিতা তারই প্রমাণ। অস্পৃশ্যতা বর্জনের ক্ষেত্রে বুলেটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুলেটিনে দেখা যায় উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের লোকেরা একই সঙ্গে পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। ব্রাহ্মণ তাদেরকে খাওয়ার পরিবেশন করছে।[১৭] অস্পৃশ্যতা বর্জন — সার্ব্বজনীন ভারতেশ্বরী পূজা ঃ শিরোনামায় লিখা হয় "৯নং ইউনিয়নের রাণীবসান গ্রামে গ্রাম্যদেবতার স্থানে ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত সার্বজনীন ভারতেশ্বরী পূজা হয়। ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছে এবং ২০০ শত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের লোক এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছেন।"[১৮]

বুলেটিন আরো যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় তা উল্লেখ করলে 'পথের আলো' বুলেটিনের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামাগুলি হল — 'কাঁথি থানার বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ দাস ও রজনীকান্ত দাস গ্রেপ্তার'— 'মহকুমা অফিস স্থানান্তরিত' ২৬ শে পতাকা অভিবাদন[১৯] 'পুরাতন কাঁথি থানা অফিসে পুলিশের হানা'[২০]। 'পটাশপুরের পুলিশের বর্ব্বরতা' — শিরোনামায় সংবাদ প্রকাশ করা হয় — '১৭-৮-৩২ তারিখে দহিতলা হাটে পিকেটিঙ্কারী কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে ২/৩ জন সিপাহী ও হাবিলদার ধরিয়া থানায় লইয়া যায়, এবং উহাদিগকে বেদম প্রহার করে। থানায় ছোটদারোগা জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের পাছার কাপড় তুলিতে বলে। তাহা না করায় দারোগাবাবু নিজে কাপড় তুলিয়া উহার গুহ্যদেশে বেতের খোঁচা দিতে থাকে

এবং এমন সব অশ্লীল প্রশ্ন করিতে থাকে যাহা ঐ জাতীয় ইতর পুলিশের কর্মচারীগণের মুখে সম্ভব।[২১] যে সমস্ত সংবাদ বুলেটিনে প্রকাশিত হয় তা হল — 'গরু ক্রোকে চিন্তা নাই', 'আবার আবগারী দোকানে পিকেটিং', 'ট্যাক্স অনাদায়ে গরু ক্রোক', 'বি. ও. সি. কেরোসিন ও চিনিবাহী নৌকায় সত্যাগ্রহ'[২২] 'জমিদার শ্রীযুক্ত কাঙ্গাল চাঁদ জানা মহাশয়ের বাড়ি ঘেরাও'[২৩] 'সাইক্লোস্টাইল মেসিনের অনুসন্ধান - পুলিশের হানা'[২৪], 'কাঁথি থানা কর্মী সম্মেলন', 'দারোগার পণ্ডত্ব',[২৫] 'ভয় ত ভয় হারামজাদাকে ভয়' প্রভৃতি।[২৬]

১৯৩২ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর ইংলন্ডীয় ভারতবান্ধব সমিতির সদস্য ও সদস্যা মিঃ ম্যাটার্ন ও মিস হোয়েটালী কাঁথিতে পৌঁছায়। তাঁরা জনসাধারণের উপর পুলিশের অত্যাচার, খাজনার হার, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট খোঁজখবর নেন।[২৭] এ সম্পর্কে বুলেটিনে ছবি আঁকা হয়েছে এইভাবে — সত্যাগ্রহীরা পতাকা হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন, ইন্ডিয়া লিগের সদস্য ও সদস্যা দাঁড়িয়ে দেখছেন, — পুলিশ মাথায় টিকি রেখেছে, গায়ে নামাবলি, হাতে কমন্ডলু ও ঘন্টি এবং সঙ্গীরা বাঁশি বাজাচ্ছে।

বুলেটিনে এ সম্পর্কে লেখা হয় —

ক্ষান্ত হও বীরগণ, হাঁকি কহে ধর্মাদাস
হের অঙ্গে ধরিয়াছি সাধু বৈরাগীর বাস।
শুনি নাকি আসিতেছে বিলাতী সাহেব দল
পরখ করিতে শুধু পুলিশ কুকীর্ত্তি ফল,
এ সময় কাজ নেই 'মারধর' করে আর—
সাধু সেজে দেখাইব — আমরা কি চমৎকার![২৮]

স্বাধীনতা সংগ্রাম সমাজ সংস্কার, আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমা বুলেটিন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নেতাদের কারান্তরালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বুলেটিনকে দমন করা সহজ হয় নি। বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। 'লবণ সত্যাগ্রহ, ট্যাক্স বর্জন আন্দোলনে বুলেটিনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল' একথা প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীপতিচরণ পণ্ডা স্বীকার করেছেন[২৯]। মোট কথা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নিয়মিত সংবাদ পরিবেশন করার বৈধ পথ যেখানে ছিল না সেখানে বুলেটিনের গোপনে প্রকাশ ও বিতরণ আন্দোলনের প্রাণসঞ্চার করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। অমলেশ ত্রিপাঠী — **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)**, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১০ই বৈশাখ, ১৩৯৭।

২। নরেন্দ্রনাথ দাস — History of Midnapore. Part two. Midnapore Samskriti Parishad. First Edition 1962. P-184.

৩। নরেন্দ্রনাথ দাস — Ibid P. 184

৪। 'পথের আলো'— অর্ধ সাপ্তাহিক, কাঁথি থানা বাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ষষ্ঠ সংখ্যা. ১৭ই আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ, বুধবার ১লা ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

৫। 'পথের আলো'— ১৭ই আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

৬। 'পথেব আলো'— ১৭ই আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

৭। 'পথের আলো'— ১৭ই আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

৮। 'পথেব আলো'— ১৭ই আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

৯। 'পথের আলো'— ৭ম সংখ্যা, ২১শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ ৫ই ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার।

১০। 'পথের আলো'— ২১শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

১১। 'পথের আলো'— ২১শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

১২। 'পথের আলো'— ৪র্থ সংখ্যা, ৪ই ভাদ্র (৮) ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ. বুধবাব, ২৪শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

১৩। 'পথের আলো'— ২৪শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

১৪। 'পথের আলো'— ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রীঃ

১৫। 'পথের আলো'— ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রীঃ

১৬। 'পথের আলো'— ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রীঃ

১৭। 'পথের আলো'— ২১ সংখ্যা. ২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

১৮। 'পথের আলো'— ২২ সংখ্যা, ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ২২শে অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রীঃ শনিবার।

১৯। 'পথের আলো'— ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রীঃ

২০। 'পথের আলো'— ১০ সংখ্যা, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৩১শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

২১। 'পথের আলো'— ৩১শে আগস্ট, ১৯৩২ খ্রীঃ

২২। 'পথের আলো'— ১৪ সংখ্যা, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ. ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

২৩। 'পথের আলো'— ১১ সংখ্যা, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ শনিবার।

২৪। 'পথের আলো'— ১৪ সংখ্যা, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

২৫। 'পথের আলো'— ১৩ সংখ্যা, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ শনিবার।

২৬। 'পথের আলো'— ১২ সংখ্যা, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

২৭। 'পথের আলো'— ১৫ সংখ্যা, ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ. ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

২৮। 'পথের আলো'— ১২ সংখ্যা, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ বুধবার।

২৯। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী শ্রীপতিচরণ পণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১২/২/৯৫ কাঁথি, মেদিনীপুর।

মিউনিসিপ্যালিটি ও মিল : বরানগর
উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ

সৌমিত্র শ্রীমানী

কলকাতার উপকণ্ঠের উত্তর শহরতলী হল বরানগর। বরানগর জনপদ হিসাবে নেহাতই অর্বাচীন নয়। অষ্টাদশ শতকের বেশ বড় অংশ জুড়ে বরানগর ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ছিল। গঙ্গার পূর্বতীরে বরানগরকে কেন্দ্র করে ওলন্দাজদের বাণিজ্য খুব একটা খারাপ ছিল না। কিন্তু ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব বেশীদিন বজায় রাখা যায়নি। বরানগর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলে চলে এল। সেই থেকে বরানগরে ইংরেজদের শাসন কায়েম হয়। ইংরেজদের আইন-কানুন, আদালত, কাছারী প্রভৃতি বাংলার বৃহদংশের সঙ্গে বরানগরকে যুক্ত করে দিল। কলকাতার কাছাকাছি থাকায় তার সেই পূর্বেকার বাণিজ্যিক ঐতিহ্য কিন্তু ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে বরানগরের চেহারা হয়ে উঠল গ্রামীণ। পান এবং তিসি ছিল প্রধান কৃষিপণ্য। বরানগরের কিছু কিছু এলাকার বর্তমান কালের নাম (যেমন বারুইপাড়া) থেকেও তার কৃষিজ চরিত্র প্রতীয়মান হয়। তবে কলকাতা শহর ও বরানগরের মধ্যবর্তী কাশীপুরে কোম্পানীর আমল থেকে যে অস্ত্র কারখানা গড়ে উঠেছিল— তার দৌলতে বরানগরে যন্ত্রের প্রবেশ ঘটল। এই কারখানার পরিধি ছিল বিরাট এবং এখানে কর্মসংস্থান হয়েছিল বিপুল পরিমাণ মানুষের। একইভাবে শহুরে জীবনযাত্রার কিয়ৎ ছোঁয়া বরানগর লাভ করেছিল যখন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, যা গত শতকের গোড়ার দিকে খুলে দেওয়া হয় — তার মাধ্যমে লাটসাহেব সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে কলকাতা থেকে এই পথ ধরেই যেতেন ব্যারাকপুরে। আবার ব্যারাকপুর ছিল কোম্পানীর সেনাদের এক বিরাট ছাউনি। রাজধানী কলকাতার সঙ্গে তার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ। ফলতঃ এই রাজপথকে কেন্দ্র করে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে জনবসতির ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান হল এবং জীবনযাত্রাও হয়ে উঠল বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর থেকে সামরিক কারণে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে সুসংহত রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার নজর দিলে বরানগরও তার ছিটেফোঁটা প্রসাদ পেল। লোকবসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জমির দাম বেড়ে যেতে লাগল। একই সময়ে বরানগর ও তার আশপাশের এলাকাগুলিতে এক নতুন উপসর্গ যুক্ত হয়। কলকাতার ধনীরা গঙ্গার তীর ধরে তাদের বিনোদনের জন্য বাগানবাড়ি নতুবা ঠাকুরবাড়ি তৈরি করতে থাকে। ঐসব ধনী পরিবারগুলির মধ্যে

জোড়াসাঁকোর ঠাকুররাও ছিলেন। এমনইভাবে বরানগরের জনবিন্যাস ও জীবনধারায় পরিবর্তন আসতে থাকে[১]। যদিও সেইসব পরিবর্তনের প্রভাব খুব একটা সোচ্চারভাবে বলার মত ছিল না তথাপি উনিশ শতকের শেষ বছরগুলিতে তাদের অস্বীকার করাও গেল না।

বরানগর ছিল এক কৃষিভিত্তিক অঞ্চল, যদিও ওলন্দাজদের আগমন ও তাদের বাণিজ্য কুঠি এখানকার মানুষের জীবিকাকে কিয়দংশে পরিবর্তিত করে। ওলন্দাজরা এখানে একটি শূকর পালন খামার তৈরি করে শূকরের মাংস ইউরোপে চালান দিত বলে বহুল প্রচলিত ধারণা আছে। এই ধারণা থেকেই বরাহনগর নামের উৎপত্তি বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। কিন্তু এমনটি কখনোই ঘটেনি। বরানগর থেকে শূকর চালানের কোন তথ্য সরকারীভাবে পেশ করা সম্ভব হয়নি[২]। বরং ওলন্দাজরা যে এখানে উৎপন্ন বস্ত্র সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করত — এমনটি মেনে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্ত্র বয়নের সঙ্গে বরানগরের যোগ বেশ প্রাচীন। আজও কিছু এলাকা তার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন, নৈনান মুসলমান পাড়া যা বর্তমানে নৈনানপাড়া। কলকাতা যখন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকল তখন থেকে বরানগরের জীবনেও এল পরিবর্তন। ওলন্দাজদের হাত থেকে সেই বস্ত্র-রপ্তানীর ব্যবসা চলে গেল ইংরেজদের হাতে এবং কিছু পরিমাণে ফরাসীদের হাতে[৩]। ক্রমে ক্রমে বরানগরের ইংরেজ দখলদারী প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলটি সরাসরি কলকাতার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হতে থাকল।

বরানগরের জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হল ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরে আলমবাজার এলাকায় 'বরানগর জুট মিলের' প্রতিষ্ঠা হয়। যন্ত্রচালিত প্রথম এক কারখানা যা ইউরোপীয় কায়দায় গঠিত। বলা যেতে পারে গঙ্গানদীর পূর্বতীরে যন্ত্রচালিত বস্ত্র বা ঐ জাতীয় কারখানার আগমন ঘটল আলমবাজারের মাধ্যমে। মোট তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫১৬ এবং সেগুলি চালাতে লাগত ৩৬০ অশ্বশক্তি। মোট শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। মূলত চটের থলি তৈরির জন্যই এই কারখানা গড়ে ওঠে কিন্তু ১৮৬৪ পর্যন্ত মিলটি সম্পূর্ণভাবে চালু করা যায় নি[(৪)]। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই মিলের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে এবং মোট তিনটি ঐ জাতীয় কারখানা গড়ে ওঠে। সেগুলি হল নর্থ এবং সাউথ বরানগর জুট মিল এবং কামারহাটি জুট মিল। ১৮৭৮-এ নর্থ বরানগর মিলে কর্মীর সংখ্যা ছিল ৪৬০৪, সাউথ বরানগরে ২৮৭৩ এবং কামারহাটি মিলে সে সংখ্যা ছিল ৩৫০০[৫]। অর্থাৎ তিনটি কারখানার মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১০৯৭৭ জন যেখানে ঐ বছর বরানগরে ও কামারহাটিতে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৪২৭৮ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৩০%-এরও অধিককে ঐ তিনটি মিল চাকুরি দিয়ে রেখেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে মিলগুলির ভূমিকার কথাই আমাদের অধিক পরিমাণে আলোচনা করতে হবে।

১৮৬৪ সালে জারি করা 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপাল ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট' অনুসারে ১লা এপ্রিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে বরানগর তার প্রথম পৌরশাসন লাভ করেছিল। প্রথম অবস্থায় তার নাম ছিল নর্থ সুবার্বন মিউনিসিপালিটি যার আয়তন ছিল মোটামুটিভাবে সোয়া ছয় বর্গমাইল। ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড পুরো এলাকাটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছিল। পশ্চিমাংশ যা কিনা হুগলী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেখানকার জনবসতির ঘনত্ব পূর্বাংশ হতে বেশি ছিল[৬]। নিঃসন্দেহে পৌরসভা গঠনের মাধ্যমে বরানগর একটি নাগরিক প্রশাসন লাভ করল। ইতিমধ্যে পাটকলগুলির অবস্থিতি, শ্রমিক বস্তির পত্তন এবং ইংরেজ ম্যানেজার তথা শিক্ষিত কেরানীকুলের আবির্ভাব ঘটে গেছে। এসবের সংমিশ্রণ বরানগরকে গ্রামীণ জীবন থেকে শহুরে জীবনে নিয়ে এল।

তবে দীর্ঘকাল 'নর্থ সুবার্বন' কথাটা ভাল লাগল না কারণ এর থেকে কলকাতার এক শহরতলী হিসেবে বরানগরের পরিচিতি বেড়ে উঠছিল। এর নিজস্বতা যেন কিছু নেই। তাই ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮২-তে মিউনিসিপালিটির কমিশনাররা এর নাম বদলের প্রস্তাব নেন। ঐ বছরেই ১৪ই মার্চ সরকারীভাবে নামকরণ হল 'বরানগর মিউনিসিপালিটি।' কিন্তু বরানগরের সমস্ত এলাকাই একই উপায়ে শহরে রূপান্তরিত হল না। হুগলী নদীর তীর বরাবর অর্থাৎ চটকল দুটি যেদিকে অবস্থিত— সেই অঞ্চল এবং কামারহাটি যা তৎকালে বরানগর পৌরসভার অধীনে ছিল— হল কিছুটা শহুরে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পূর্বাংশ গ্রামই থেকে গেল।

বরানগরের এই পরিবেশ থেকেই শুরু হল সমস্যার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে বরানগর পৌর এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ — এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। চটকলগুলির অবস্থিতির উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। তবে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি কোনভাবেই শহুরে জীবন পেল না[৮] যেহেতু ঐ এলাকাগুলির জনবসতির ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের থেকে যথেষ্ট কম ছিল সেইহেতু সেখানে পৌর উন্নয়নের মাত্রাও ছিল কম। ১৮৬৩ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন চালুর পর থেকেই এই সমস্যা দেখা দেয়। ১৮৬৯ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের তৎকালীন কমিশনার এইচ. এ. ককারেল রেল লাইন ও ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড সংযোগকারী কয়েকটি রাস্তা তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল — ঐ সব রাস্তা এলাকাগুলির উন্নয়নে সাহায্য করবে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তারা তাঁকে সমর্থন করেন নি।[৯] ঔপনিবেশিক শাসনের মূল সুরটি এক্ষেত্রেও প্রকট। সরকারের তরফে ঔদাসীন্যের মূল কারণ ছিল যে, বরানগর রাজস্ব উৎপাদনে তেমনভাবে সমর্থ নয়। কিন্তু কলকাতার অতি সন্নিকটে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠতে চলেছিল তার প্রয়োজনে সেখানে পরিকাঠামো গড়ে তোলাও ছিল বিশেষ জরুরী। এমনকি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরাবরাহ করাও যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, এ সত্যটাও সরকারী কর্তারা মানতে চাইতেন না। ১৮৭১-এ প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনে পানীয় জল

সরবরাহের উদ্দেশ্যে কিছু পুকুর কেনার প্রস্তাব করেও আর্থিক অনুদান না পাওয়ায় পিছিয়ে আসেন[১০]। একই সময়ে কলকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যানও পলতা থেকে কলকাতা শহরে যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে বরানগরকে যুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু একই কারণে সেটাও কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি[১১]। একইভাবে বরানগরের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও সরকারী মহলে তেমন কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। কল-কারখানা গড়ে উঠার পাশাপাশি এখানকার সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে থাকে নানাভাবে। চুরি ডাকাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এমনকি শহর কলকাতা থেকে দুষ্কৃতীরা ডাকাতি ইত্যাদি করে বরানগরে এসে লুকিয়ে থাকত[১২]। সরকার এ ব্যাপারেও ছিল উদাসীন।

কিন্তু পৌরসভার যেসব প্রধান কাজ ছিল যেমন, জলসরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, রাস্তাঘাট সংস্কার করা— এসবের কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি কিছুমাত্র ঘটেনি। চটকলগুলির বিদেশী কর্মচারীরা এ অঞ্চলে এসে বসবাস করতে থাকায় পৌর পরিষেবা নিয়ে তাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার প্রকাশও ঘটতে থাকে। জনস্বাস্থ্য বজায় রাখা নিয়ে ইওরোপীয় ধারণার সঙ্গে ভারতীয়দের চিন্তা-ভাবনার ফারাকও ছিল যথেষ্ট। একেই তো বরানগর একটি প্রাচীন পল্লী, তার সঙ্গে চটকলের শ্রমিক বস্তি মিলে এখানকার পরিবেশ ক্রমান্বয়ে জটিলতর হতে থাকে। ব্রিটিশ মানদণ্ড অনুসারে এখানকার অধিবাসীদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ছিল যথেষ্ট খারাপ। প্রায়ই মড়ক লাগত এবং তার অধিকাংশই ছিল ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির মতো রোগ। যেহেতু বরানগরের পশ্চিমে হুগলী নদী সেইহেতু নিকাশী নালাকে পূর্বদিকে বাহিত করতে হয়। দাঁতিয়া খাল দিয়ে নিকাশীর কাজ চলত যা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিক দিয়ে বাহিত হয়ে হুগলী নদীতেই এসে মিশে গিয়েছিল। এমনটি হওয়ার জন্য একটা কারণও ছিল। দাঁতিয়া খাল পূর্বে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব দিক দিয়ে বাহিত হয়ে লবণ হ্রদে গিয়ে মিশেছিল। কিন্তু সেই নালাব জল পরিবহনের ক্ষমতা কালে কালে কমতে থাকে। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে স্থানীয় জমিদাররা এই খাল নিয়মিত সংস্কার করাত। কিন্তু তাদের দিন গত হল এবং মিউনিসিপালিটি গঠিত হওয়ায় সমস্ত কাজেব দায়িত্ব এসে পড়ল মিউনিসিপালিটির ওপর। এক্ষেত্রেও কাজ গেল থেমে এবং কারণ সেই একই — অর্থাভাব[১৩]। চটকলগুলির ম্যানেজাররা বহু সময়ে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের পদেও বসেছে। সব ম্যানেজারই যে পুরোদস্তুর ঔপনিবেশিক বা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত — তা নয়। বরানগর জুট মিলের ম্যানেজার উইলিয়ম মেয়ার বরানগরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। কিন্তু সমস্যা ছিল দৃষ্টিভঙ্গির। আমাদের আলোচ্য সময়কালে বাংলা সরকার সর্বত্র খাটা পায়খানা চালু করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বিশেষ করে মফস্বল শহরগুলিতে খাটা পায়খানা ব্যাপকভাবে চালু হয়। বরানগরও বাদ গেল না। মিউনিসিপালিটি একশ্রেণীর সাফাইকর্মী নিয়োগ করল, যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মল মাথায় করে তুলে আনত।

ভারতীয়রা মাঠে-ঘাটে মলত্যাগে অভ্যস্ত। ইউরোপীয়দের কাছে জনস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এই ধবনের বদ অভ্যাস ছিল ভীষণভাবে ক্ষতিকারক। এই প্রক্রিয়া চালু করার পাশাপাশি বাড়ির মালিককে একপ্রকার কর দিতেও বাধ্য করা হল[১৪]।

কালে কালে মিউনিসিপালিটির কাজের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকল এবং একই সঙ্গে এখানে প্রবেশ করল রাজনীতি। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ইউরোপীয় চটকল ম্যানেজাররা হল সেই রাজনীতির পুরোধামণ্ডলী। ১৮৮৪ সালে 'বেঙ্গল মিউনিসিপাল এ্যাক্ট' পাশ হওয়ার পর বরানগর হল এক দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি। চালু হল করদাতাদের ভোটাধিকার এবং সেই নির্বাচনই ডেকে আনল নানারকমের সমস্যা। ১৮৮১ সালে কিছু নাগরিক মিলে তৈরি করল বরানগর করদাতা সমিতি। এই সমিতি ছিল বিশেষ কর্মতৎপর এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী। মিউনিসিপালিটির সামান্যতম কাজের ত্রুটিকেও এই সমিতি সমালোচনা করতে ছাড়ত না। ১৮৮৪ সালের পর বরানগরে সম্পত্তির উপর পৌরকর বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করেই চলেছিল নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ[১৫]। যদিও চটকলগুলি মোটা পরিমাণ কর দিত তথাপি তাদের প্রতিনিধিদের কখনো এই সমিতিতে অংশ নিতে দেখা যায় না। স্থানীয় করদাতাদের বড় অংশের একটি ধারণা বদ্ধমূলভাবে মনে গেঁথে ছিল যে, বরানগরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরে উন্নীত করার পশ্চাতে মিল ম্যানেজারদের পরোক্ষ অবদান আছে। ১৮৮৪ সালের সংশোধিত আইন জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়া মাত্র 'বরানগরের জনগণ'—এই নামে একদল মানুষ ১৮৮৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর একটি প্রতিবাদ সভা ডেকে বাংলার ল্যাফটানন্ট গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি পাঠায়। গভর্নর এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বরানগরের পৌর প্রশাসন ও পরিষেবা মোটেই সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে না। তিনি ২৪ পরগণার তৎকালীন জেলাশাসককে ঐ মিউনিসিপালিটির কাজকর্মের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে এবং কোনও রকম বেনিয়ম দেখলে নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা খাটাতে নির্দেশ দেন[১৬]। সরকারী সিদ্ধান্ত 'দ্য ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ামাত্র মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে এরপরই বরানগরে সম্পত্তি কর ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। এরপর থেকে বরানগরে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা গেল যে পৌরএলাকার দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ মূল বরানগর উত্তর অংশ অর্থাৎ কামারহাটি, বাসুদেবপুর, নওদাপাড়া, আড়িয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বর অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে উন্নত। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা ১৮৮৪ সালের আইনের ধারাগুলি হতে রেহাই পাওয়ার জন্য দাবী তুলতে থাকে। কারণ তাদের অনুন্নত এলাকার জন্য তারা অতিরিক্ত কর দেবে না[১৭], বলা যেতে পারে যে এইসময় থেকে বরানগরের পৌর জীবনে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। উত্তর ও দক্ষিণ — এই দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেল। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের রাস্তাঘাটের অভাব, পানীয় জলের অভাব, এবং সাধারণ জনস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবের কথা নিয়ে সোচ্চার হল।

১৮৮৪ সালের পৌর আইনে যেভাবে পৌরসভাগুলিকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় এবং করদাতাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় সেইভাবে কিন্তু নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় না। সরকার সুচতুরভাবে পৌর এলাকার উন্নয়নের আর্থিক দায় সেই এলাকার করদাতাদের ওপর চালিয়ে দেয়। যে পরিমাণ রাজস্ব একটি মিউনিসিপালিটি সংগ্রহ করতে পারবে তারই ভিত্তিতে তার প্রশাসনিক মর্যাদা নির্ধারিত হল। এভাবেই বরানগর হয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি। স্থানীয় অধিবাসীরা সবই মেনে নিয়েছিল কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি নয়।

ইতিমধ্যে চটকলগুলির বাড় বাড়ন্ত ঘটেছে। তারা শ্রমিক বস্তিও বানাতে শুরু করেছে। একই পদ্ধতিতে চটকলগুলির ওপরও বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। চটকলগুলির ম্যানেজাররা মিউনিসিপালিটি কর্তৃক রাস্তা চওড়া করা, খাটা পায়খানা চালু করা প্রভৃতি কাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। এমন কি তারা মিউনিসিপালিটি দ্বারা চালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরও সমর্থক ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, নিজেদের শ্রমিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য বজায় রাখা ও তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য চটকলগুলির সাহেব ম্যানেজাররা বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ভারতীয় নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এদের থেকে ছিল পৃথক। মিউনিসিপালিটি ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যালয় ভবনগুলির সংস্কারের জন্য ২৩০০ টাকা এবং বিদ্যালয়গুলিকে বার্ষিক অনুদান স্বরূপ ১৭০০ টাকা বরাদ্দ করলে বরানগর করদাতা সমিতি তার তীব্র প্রতিবাদ করে। সমিতির বক্তব্য ছিল যে, নিকাশী ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরোপুরি নজর দেওয়ার পরই কেবল শিক্ষাখাতে অনুদানের কথা চিন্তা করা যেতে পারে[১৮]। অবশ্য ব্রাহ্মনেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিরা শিক্ষা বিস্তারে বহু সময়ে সাহেব ম্যানেজারদের ব্যক্তিগত সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা যে মিউনিসিপালিটির ওপর বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন না তা বলাইবাহুল্য। ধীরে ধীরে একটা সত্য প্রকট হতে থাকল যে চটকলগুলির কর্তৃপক্ষ বহু ক্ষেত্রেই মিউনিসিপালিটির কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করছে। চটকলগুলি তাদের শ্রমিক বস্তিগুলিকে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন করার জন্য তৎপর ছিল। কারণটা সহজেই অনুমেয়। তারা যেহেতু মোটা রাজস্ব জোগাত সেইহেতু তাদের বক্তব্যের জোরও ছিল যথেষ্ট। জনস্বাস্থ্য বজায় রাখার অন্যতম উপায় হিসাবে সাহেব ম্যানেজাররা বুঝত ব্যাপকহারে খাটা পায়খানার নির্মাণ। ১৮৯৬-৯৭ সালে বরানগরের দুটি চটকল যেখানে সম্পত্তি কর বাবদে ২০০০ টাকা রাজস্ব জমা দিত সেখানে খাটা পায়খানার জন্য দেয় 'ল্যাট্রিন ট্যাক্স' (Latrine Tax) বাবদে দিত ৩২৭০ টাকা। একই নিয়মে কামারহাটির মিল সম্পত্তিকর দিত ১৪৬৫ টাকা এবং 'ল্যাট্রিন ট্যাক্স' ২৬৯১ টাকা[১৯]। সম্ভবত চটকলগুলির চাপে পড়েই বরানগর মিউনিসিপালিটি তার মোট বার্ষিক বরাদ্দের ৪০ শতাংশই ব্যয় করত খাটা পায়খানাগুলি সাফ করার কাজে[২০]।

শুধুমাত্র একাজেই নয়, অন্যান্য পূর্তকাজের ক্ষেত্রেই চটকলগুলির প্রভাব ছিল প্রকট। ১৮৯৮ সালে মিউনিসিপালিটি তার এলাকায় রাস্তাঘাট সংরক্ষণের জন্য

বিস্তারিত আইন তৈরি করেছিল। পাথর, ইট এমনকি বাঁশ পরিবহন করতে হলে সেইসব আইন মানতে হত। কিন্তু চট বা পাট পরিবহনের জন্য কোনও আইন ছিল না[২১]। লক্ষণীয় বিষয় যে পাট পরিবহনের পরিমাণই ছিল সব থেকে বেশী। অবশ্য চটকলগুলির আদায়ীকৃত সুযোগ-সুবিধার এইসব নমুনা নেহাতই মামুলী।

১৮৮৪ সালের আইন চালু হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার সুযোগই নিতে চাইল চটকলগুলি, তিনটি চটকল মিলে ১০ হাজারের ওপর শ্রমিককে চাকুরি দিয়েছিল এবং মিউনিসিপালিটিকে তারা বার্ষিক খাজনা জোগাত মোটা পরিমাণে। অতএব তাদের দাবীর অন্ত নেই। ১৮৯৬-৯৭ সালে বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, বনহুগলী, আড়িয়াদহ-কামারহাটি, বেলঘরিয়া-বাসুদেবপুর এবং সিঁথি, নোয়াপাড়া-পালপাড়া মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৪২১২ এবং সেখানে চটকল তিনটির শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১০৯৭৭[২২]। লক্ষণীয় ১৮৭৮ সাল হতে ১৮৯৬ সালের মধ্যে কলগুলির শ্রমিক সংখ্যা একটিও বৃদ্ধি পায়নি এবং মিউনিসিপালিটির এলাকাধীনে জনসংখ্যা বরং সামান্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। অর্থাৎ চটকলগুলি না থাকলে বরানগরের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। এখানেই ছিল চটকলগুলির জোর। তাদের বক্তব্য ছিল যে, কলগুলিকে কেন্দ্র করেই জনবসতির বিন্যাস ঘটেছে। অতএব মিউনিসিপালিটির দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের বিশেষ প্রয়োজন।

কামারহাটিকে কেন্দ্র করে নতুন মিউনিসিপালিটির দাবী ক্রমশঃ জোড়দার হয়ে ওঠে। 'নর্থ বরানগর জুট মিল' হতে 'কামারহাটি জুট মিলেব' দূরত্ব ছিল তিন মাইল। কল দুটির দেয় রাজস্বের পরিমাণ একই হারে হলেও দুটি অঞ্চলের পৌর পরিষেবা একই নয়— এমনই যুক্তি শোনা যেতে লাগল। ২১শে মার্চ ১৮৯৮ তারিখে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের তৎকালীন কমিশনার সি. ই. বাকল্যান্ড বাংলা সরকারের কাছে এক বিস্তারিত পত্রে কামারহাটি জুট মিলকে কেন্দ্র করে একটি পৃথক মিউনিসিপালিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। যদিও জেলাশাসক মিঃ ওয়ালশ প্রাথমিক রিপোর্টে বরানগরকে ভেঙে দুটি মিউনিসিপালিটি গঠন করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, বরানগরের থেকেও অধিক জনবসতিপূর্ণ এলাকার জন্য একটি মাত্র মিউনিসিপালিটির ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। কিন্তু বাকল্যান্ড এই মত মানেন নি। কারণ, বরানগরে চটকলগুলিকে কেন্দ্র করে জনবসতির ঘনত্ব অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। অতএব কামারহাটির চটকলকে কেন্দ্র করে নতুন একটি মিউনিসিপালিটি গড়া যেতেই পারে[২৩]। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক বরাবর ম্যাগাজিন রোড এবং দাঁতিয়ে খালকে সীমানা ধরে দুটি মিউনিসিপালিটির এলাকা চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে বরানগরের এলাকার পরিমাপ হল ২.৭৫ বর্গমাইল যেখানে লোকসংখ্যা হল ২২১৫০ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩২ হাজার টাকা। অপরদিকে কামারহাটির প্রস্তাবিত এলাকার পরিমাপ হল ৩.৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১২১২৮ এবং বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫ হাজার টাকা। এসবই ১৮৯৬-৯৭ সালের হিসাবের ভিত্তিতে।

সরকারীভাবে যতই বলা হোক না কেন যে, বরানগরের পৌর এলাকায় সব কয়টি অঞ্চলের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের জন্যই এই বিভাজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে — সাধারণ মানুষ তা মানতে চায়নি। এমনকি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন আইনসভায় সরাসরি অভিযোগও করেছিলেন যে, 'কামারহাটি জুট মিলে'র কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই এই বিভাজন[২১]। কিন্তু কোনভাবেই সেই বিভাজন রোধ করা যায় নি। লক্ষণীয় বিষয় হল 'বরানগর করদাতা সমিতি' যা কি না মিউনিসিপালিটির খুঁটিনাটি বিষয়ে সোচ্চার হত — সেই সমিতিও এক্ষেত্রে মৌন ছিল। সম্ভবতঃ, মিউনিসিপালিটির পরিচালকদের সঙ্গে সমিতির কর্তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। যাই হোক না কেন, ১৮৯৮ সালে নতুন কামারহাটি মিউনিসিপালিটি গড়ে উঠল। ১২ জন সদস্যের মধ্যে 'কামারহাটি জুট মিলের' প্রতিনিধি ছিল ১ জন, অপরদিকে বরানগরে ৯ জন সদস্যের মধ্যে 'বরানগর জুট মিল' দুটির প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ২ জন[২২]।

আলোচ্য প্রবন্ধে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, লর্ড রিপন এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে যতই জনমুখী করে তোলার কথা বলুন না কেন ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রভাব কোনভাবেই খর্ব করা যায় নি। বরং গণতন্ত্রের নতুন রূপ ধরে তারাও নতুনভাবে প্রকট।

সূত্র নির্দেশ

১। **বরানগর পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মরণ**

২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার (এরপর থেকে লেখ্যাগার), মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, অক্টোবর ১৮৯১, ফাইল এম ১১৩/৪৫, কার্যবিবরণী ১৩-১৪।

৩। রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, ফোর্ট উইলিয়াম ইন্ডিয়া হাউস করসপন্ডেন্স,
লেটার টু দ্য কোর্ট ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৪৯-৫০, অনুচ্ছেদ ১৮
লেটার টু দ্য কোর্ট ৩১ জানুয়ারী ১৭৫১-৫২, অনুচ্ছেদ ৮

৪। লেখ্যাগার, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, নভেম্বর ১৮৭৮, কল নং ১, কার্যবিবরণী ৪৬-৪৭।

৫। তদেব

৬। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, এপ্রিল ১৮৯৭ 'বি' ফাইল এম ডি/৪ কার্যবিবরণী ৪০৫-৪১১।

৭। লেখ্যাগার, মেডিকেল এবং মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মার্চ ১৮৮২, কল নং ১৪, কার্যবিবরণী ১৭, ১৮, ২০।

৮। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, জুলাই ১৮৯৯, ফাইল এম ১ এম/৩, কার্যবিবরণী ১১।

৯। লেখ্যাগার, জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, খণ্ড ১৩৮, কার্যবিবরণী ৫৭-৫৮।

১০। লেখ্যাগার, ঐ, ঐ, খণ্ড ১৫৮, কার্যবিবরণী ৬১।

১১। লেখ্যাগার, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, জুলাই ১৮৭৮ এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ দ্য মিউনিসিপালিটি অফ সাবার্বস অফ ক্যালকাটা।

১২। লেখ্যাগার, জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ ব্রাঞ্চ, নভেম্বর ১৮৭৬, ফাইল ৭২ এফ, কার্যবিবরণী ১৯।

১৩। সূত্র ৬।

১৪। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, জুলাই ১৮৯৮, 'বি' ফাইল এম ২২এ/২।

১৫। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, এপ্রিল ১৮৮৪, 'বি' ফাইল ৪, কার্যবিবরণী ৯।

১৬। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, অক্টোবর ১৮৮৬, 'বি' ফাইল ৩, কার্যবিবরণী ৭০-৯৮।

১৭। তদেব।

১৮। তদেব।

১৯। সূত্র ৮

২০। সূত্র ১৮

২১। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, অগাস্ট ১৮৯৮, 'বি' ফাইল এম ১ বি/২০।

২২। সূত্র ১৯

২৩। তদেব।

২৪। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, জুলাই ১৮৯৯, ফাইল এম ১ এম/৩ কার্যবিবরণী ২৫।

২৫। লেখ্যাগার, মিউনিসিপাল ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ, জুলাই ১৮৯৯, ফাইল এম ১ এম/৩ কার্যবিবরণী ১৩-১৪।

জিম করবেট, পরিবেশভাবনা ও উপনিবেশের প্রেক্ষিতে একজন ইউরোপীয়ের ভারতদর্শন

শুভাশিস বিশ্বাস

অরণ্যের নির্জন প্রকোষ্ঠে পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্য মানুষের রোমাঞ্চকর অভিযানের শুরু অষ্টাদশ শতক থেকেই। উত্তর-রেনেসাঁ যুগে ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্নের এই জ্ঞানতৃষ্ণার চরিত্র বিবিধ ও এই অভিযানও লক্ষ্যবিহীন নয়। সর্বোপরি উপনিবেশীকরণের এটি একটি অনিবার্য যাত্রাপথ। এরই সূত্র ধরে ভারতের অরণ্য ও প্রকৃতিকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি রূপকল্প। 'উপজাতি' হিসাবে বিশেষীকরণ করা ভাবতবর্ষের কিছু সম্প্রদায়ের ও ভারতেব অরণ্যের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে — কিন্তু তবুও রোমান্টিক কল্পনার আচ্ছন্নতা কাটেনি। প্রাচ্যের অরণ্য জীবন সম্পর্কে এই 'মিথ' সবচেয়ে গভীরতা পেয়েছে এখানকার পাহাড়, অরণ্য, অজানা উপজাতি, সাধু সন্তদের বিষয়ে ভাবনায়। ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয়রা সারা জীবন বসবাস করেছিলেন তারাও ভারতবর্ষকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এই রূপকল্পের বাইরে যেতে পারেন নি। কিন্তু একই সঙ্গে ভারতবর্ষ বিষয়ে তাদের ভাবনার মধ্যে একটা নিজস্ব অবয়ব গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে নির্মোহ পর্যবেক্ষণের চেয়ে এলিট মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অংশভাগ বেশি। জিম করবেটের চিন্তার রূপরেখাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সেই একই প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়।

করবেট তার শৈশব কাটিয়েছিলেন কুমায়ুনের পাহাড়ি অঞ্চলে। এখানকার গাছ, পাথর, মানুষ ও জীবজন্তুর বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮৭৫ সালে নৈনিতালে করবেট জন্মেছিলেন এবং তারপর স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্ন পর্যন্ত ভারতবর্ষেই ছিলেন। করবেট তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছেন কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের অরণ্যে। ভারতবর্ষের পরিবেশ সংরক্ষণবাদী আন্দোলনের প্রথমপর্বের তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৯০৬-৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'Preservation of Wild Life Association in the United Provinces'-এর সম্পাদক। জিম করবেট ও হাসান আবিদ জাফরি **Indian Wild Life** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যে পত্রিকার মূল বক্তব্য ছিল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা। ১৯৫৮-তে প্রকাশিত দেরাদুনের 'Wild Life Preservation Society of India-র পত্রিকা 'চিতল'-এর বক্তব্য অনুযায়ী করবেট প্রথমপর্বে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনের

অন্যতম নেতা ছিলেন।[১] ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পর আফ্রিকাতেও ১৯২৯ সালে তিনি 'Wild Life Preservation Society' গড়ে তোলেন। অনেক পূর্বে ১৯২৭ সালে যখন 'Bombay Natural History Society. সংযুক্ত প্রদেশ শাখার 'Empire Fauna Society'-ব সহায়তা চায় সেইসময় করবেট তাদের বহুভাবে সাহায্য করেছিলেন।[২] ১৯৫৫ সালে করবেট ১০ই মে তারিখের লন্ডন টাইমস্-এ মিস্টার ব্রাম্বলিকে লেখা চিঠিতে ভারতবর্ষে ব্যাঘ্রপ্রজাতির সম্ভাব্য বিলুপ্তির কথা লিখেছিলেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে সুস্পষ্ট, প্রথম পর্বের পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন জিম করবেট।

করবেটের এই পরিবেশভাবনার চরিত্র অনুধাবনে প্রথমেই ঔপনিবেশিক পর্বের পরিবেশ ভাবনাব মূল রূপরেখাটির অনুসন্ধান প্রয়োজন। সাধারণভাবে বিশ শতকীয় পরিবেশ ভাবনার ক্ষেত্রে মূল পাঁচটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায় — (১) মানুষের জৈব অবস্থান ভিত্তিক, (২) বাস্তুতন্ত্রীয়, (৩) অর্থনৈতিক, (৪) নীতিগত, (৫) সাংস্কৃতিক।[৩] মানুষের প্রকৃতির এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে নিজের ক্ষুদ্র অবস্থান বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটি জৈব অবস্থান ভিত্তিক ধারণা গড়ে ওঠে যার ফলশ্রুতিতে প্রকৃতি পূজা প্রভৃতির প্রতি প্রাচীনযুগ থেকেই মানুষ আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। প্রকৃতিতে জৈব উপাদান, বস্তু উপাদান সমগ্র নিয়ে যে বাস্তুতন্ত্রীয় চক্রশৃঙ্খল গড়ে ওঠে তার একটি উপাদানের ভারসাম্য বিনষ্ট হলে ক্রমপরম্পরায় অন্যান্য উপাদানগুলিও বিনাশের পথে যাবে --- এরূপ একটি ধারণা থেকে বস্তুতন্ত্রের দিক দিয়ে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক— গবেষণার নিরিখে এই ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পরিবেশকে দেখা হয় প্রকৃতির সম্পদকে ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত 'modes of resource use' তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে।[৪] সাংস্কৃতিক ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে ও এই প্রক্রিয়ায় মানুষ স্বতঃসিদ্ধভাবেই পরিবেশকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। 'Ethical' বা নৈতিক ধারার মূল বক্তব্য এই পৃথিবীর অসাধারণ দুর্লভ প্রাকৃতিক— বস্তুগুলিকে রক্ষা করা। বিভিন্ন বিরল প্রজাতির প্রাণীকে রক্ষা করা শ্রেষ্ঠতম প্রজাতি হিসাবে মানুষের সাধারণ কর্তব্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পরিবেশকে রক্ষা করার বিষয়টি ঊনবিংশ শতকের শেষপর্ব থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল— বিংশ শতকের প্রথমপর্বে আমেরিকার পরিবেশ আন্দোলন— যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিংশ শতকের সূচনা থেকেই পরিবেশ আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করার দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার যে ভীতি তৃণমূলে ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তা মহীরুহে পরিণত হয়। এই পর্বে পরিবেশভাবনা তাই শুধু দুর্লভ প্রাণীদের রক্ষা করার নৈতিকতায় আচ্ছন্ন ছিল না তা মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির রকমফের পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতের পরিবেশভাবনার একটি নিজস্ব চরিত্র ছিল। ভারতের দার্শনিক চিন্তায় বহুপূর্বেই মানুষ ও প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়নি। উপনিষদের বাণী 'ঈশা বাস্যবিদ্যং সর্বম্' অর্থাৎ 'ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান', এই বক্তব্য মানুষ, বস্তু ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এক এবং অখণ্ড শক্তির ধারণাকে প্রকাশ করে যা আধুনিক বাস্তুতন্ত্রীয় ধারণারই একটি বিশেষ রূপ। আমরা উপনিষদে একটি শক্তিচক্র বা Circle of energy' - র সন্ধান পাই যার কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বর। এই ঈশ্বরভাবনা মূলত পরিবেশ ভাবনার একটি দিককেই প্রতিফলিত করে। ভারতবর্ষের অরণ্যের— অধিবাসীদের নিজস্ব অরণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন ধ্বংসের প্রক্রিয়া কখনই অবারিতভাবে হয় নি— পাশাপাশি বৃক্ষপূজা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার সাংস্কৃতির ধারাটিও বহমান ছিল। উপজাতীয় সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির এই সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলটি গুরুত্বপূর্ণ যা জন্ম নিয়েছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়।

ঔপনিবেশিক যুগ এই পরিবেশভাবনার ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ আঘাত। আলফ্রেড মেমিজ - উপনিবেশের চরিত্র অনুসন্ধানে বলেছেন যে শাসকশ্রেণীর শোষণেরও একটি মাত্রাবোধ প্রয়োজন, কারণ অন্যথায় যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে তারা কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে সেই মাটির ভিতই শিথিল হয়ে যায়।" এই বক্তব্য ইংরেজ শাসকদের পরিবেশ ভাবনার ক্ষেত্রে সত্য নয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য পরিবর্তনের সময়রেখা এতই দীর্ঘ যে পরিবেশের সম্পদকে যথেষ্ট ব্যবহারের নেতিবাচক দিকটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রতিকূল হয়ে ওঠে নি। সে কারণেই এই সম্পদের ধ্বংস সাধন ছিল নিরবচ্ছিন্ন ও নিরঙ্কুশ এমনকি উপজাতীয় সমাজের যে পরিবেশ সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল তাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আঘাতে ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন অরণ্যকে সংরক্ষিত অরণ্যরূপে চিহ্নিত করে তাদের জঙ্গলের চিরাচরিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ আইনকে আরোপের প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম শৃঙ্খলা বা 'Order' সৃষ্টি করা হয় যা একদিকে সরকারের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ও অপরদিকে সনাতন অধিবাসীদের সমস্ত প্রতিরোধকে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধমূলক কার্যকলাপ রূপে চিহ্নিত করে। 'বিজ্ঞানসম্মত অরণ্য সংরক্ষণ' বা 'Scientific Foresty'র প্রক্রিয়ার বিপরীতে অবিরতভাবে বন ধ্বংস করা হয়। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'অরণ্যের আইন'-এর মাধ্যমে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত থাকে। জঙ্গলের সম্পদের উপর ভিত্তি করে রেলপথ তৈরি হয়। অরণ্য ধ্বংস শুধু নয়, খনিজ নিষ্কাশনের পদ্ধতির মাধ্যমে মাটির নীচের কাঠামোর পরিবর্তন আসে, জমির গুণগত মানও পরিবর্তিত হয়। সব মিলিয়ে ঔপনিবেশিক শোষণের অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভারতের অরণ্য সম্পদ চরম বিপর্যয়ের পথে চলে।"[৬]

সমগ্র উন্নত দেশগুলির পরিবেশ ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তের সন্ধান মেলে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে।

পরিবেশ চিন্তার দিক থেকে এই শোষণকে আদর্শায়িত করার প্রয়োজন ছিল। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নৈতিক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে এই আদর্শায়িতকরণের

প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের 'রহস্যময়' অরণ্যের দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের অরণ্যপ্রীতি প্রকাশিত হয় এবং এরই অন্তরালে চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে অরণ্য সম্পদের বিনাশের প্রক্রিয়া। যে যুগপর্বে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই পর্বে একটি ধারাই ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিল— তা হল 'Ethical approach' বা নীতিগত ধারা। ব্যাঘ্রপ্রজাতির সংরক্ষণ এই নৈতিকতার মধ্যে পড়ে, অরণ্যের ধ্বংসসাধন এই নৈতিকতার বিরুদ্ধ নয়। এইপ্রকার পরিবেশ ভাবনারই আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় জিম করবেটের জীবন ও সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে।

ভারতবর্ষের অরণ্যসম্পদ ধ্বংসের কাজে মূল ভূমিকা নিয়েছিল রেল কোম্পানীগুলি। মোকামা ঘাটের সরকারী কাজে যোগদানের পূর্বে করবেটের মূল জীবিকা ছিল কুমায়ূনের জঙ্গলের কাঠ কেটে রেলকোম্পানীগুলিকে সরবরাহ করা। এমনকি করবেট এই কাজটি দীর্ঘ সময় ধরে এতই নিপুণভাবে করেছিলেন যে পরবর্তীকালে সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছিল। করবেট 'Bengal and North Western Railway-তে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৯৫ সালে ও এখান থেকে অবসর নিয়েছিলেন ১৯১৪ সালে। ১৯১৪ সালে তিনি স্বেচ্ছায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন ও মেজর পদে উন্নীত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি অরণ্যের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে গেরিলা যুদ্ধে সৈনিকদের পারদর্শী করে তোলার কাজ নিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর পদোন্নতি হয় ও তিনি লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল হন। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'Friend of the Indian Empire' বা 'ভারতীয় সাম্রাজ্যের বন্ধু' সম্মানে ভূষিত করেন।

করবেট সারা জীবনই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারীদের একজন। তাঁর প্রথম বই ১৯৪৬ সালে 'Man eater of Kumaon' যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রথম অভিনন্দন ব্রিটিশ আমলাদের কাছ থেকেই আসে। ভাইসরয় লিনথ্‌লিগো করবেটের বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "a tale well told of action and adventure."[৭]

এই রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারই ছিল করবেটের মনের সর্বাধিক প্রভাবকারী শর্ত। M. G. Hallet করবেটের বইয়ের ভূমিকায় করবেটের লেখার সঙ্গে কিপলিং-এর 'Jungle Book'-এর তুলনা করেছিলেন।[৮] একথা সত্য যে করবেটের সকল লেখাই তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি ও কিপলিং-এর রচনা মূলত রঙিন কল্পনা। কিন্তু করবেটের লেখায় যেমন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে রোমান্টিক ভাবালুতা সবসময়ে প্রচ্ছন্ন তেমনি কিপলিং-এর লেখায় রোমান্টিক কল্পনার মধ্যে দিয়ে অরণ্যের সমাজের শুধুমাত্র প্রাচীনত্ব ও রহস্যময়তাকেই এই সমাজের প্রকৃত চরিত্ররূপে চিত্রিত করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

সাধারণ মানুষদের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হিসেবে করবেট চিহ্নিত করেছেন তাদের 'চরম আনুগত্য'কে। তিনি মোকামা ঘাটের কুলিদের আনুগত্যের বর্ণনা দিয়েছেন যারা সুদীর্ঘকাল ধরে কোন বেতন না পেয়েও বিদ্রোহ করেনি। করবেট লিখেছিলেন 'অনাহারও আমার লোকেদের আনুগত্যে ভাঙন ধরায় নি, তারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত

ছিল।'[৯] করবেটের মতে গাড়োয়ালী সৈন্যদের সবচেয়ে বড় অবদান দুটি বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে লড়াই করা।

হেনরী র‍্যামজেকে করবেট চিহ্নিত করেছিলেন 'কুমায়ুনের রাজা' হিসাবে[১০]। র‍্যামেজের বিচার বিষয়ে করবেটের বক্তব্য—

"তাঁর বিচার নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলে নি। যাকে তিনি জরিমানা করতেন বা কারাদণ্ড দিতেন সে সরকারী খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে জরিমানা দিয়ে দিত বা সবচেয়ে কাছের জেলে নিজেই গিয়ে হাজির হয়ে র‍্যামেজের হুকুম মত বিনাশ্রম বা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করত।'[১১]

একদিকে করবেট ইউরোপীয় বিচারকদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে চিত্রিত করেছেন, অপরদিকে ছিল ভারতীয়দের অসীম আনুগত্য, অরণ্যের মানুষ ও অরণ্যের জীবনের অর্থ করবেটের কাছে ছিল প্রতিবাদহীন ও প্রতিরোধহীন। 'My India' তে করবেট লিখেছেন —

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ লোক যুদ্ধের নৃশংসতার নিন্দা করে অভিযোগ করেছিলেন যে মানুষে মানুষে যে যুদ্ধ তার মধ্যে জঙ্গলি কানুন প্রয়োগ করছে শত্রুপক্ষ। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অরণ্যে যে আইন করেছেন তা সকল মানুষের মধ্যে করলে যুদ্ধ হত না।'[১২]

অর্থাৎ অরণ্যের আইনের অর্থ কোন যুদ্ধবিহীন প্রতিবাদবিহীন এক শান্তির সাম্রাজ্য— অরণ্য নির্বিবাদী মানুষের ও প্রাণীর এক রোম্যান্টিক সুখী পরিবার করবেট অরণ্যের এই রূপকল্পটিকেই বারবার আদর্শায়িত করেছেন।

করবেট ইউরোপীয়দের নৈনি লেক আবিষ্কারের একটি অভূতপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। যা তার মতে একটি বহুপ্রচলিত গুজব।

"পাহাড়ের লোকেরা লেকটির সঠিক অবস্থান বহিরাগতদের মানতে দিতে নারাজ ছিল। শেষমেশ ১৮০৯ সালে একজন প্রশাসক একজন পাহাড়ি মানুষের মাথায় একটি বিরাট পাথর চাপিয়ে দিয়ে বললেন যে যতক্ষণ না লোকটি নৈনি লেকে পৌঁছাবে ততক্ষণ তাকে পাথরটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। বহুদিন ঘুরে ঘুরে লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও নৈনিতালের অবস্থান ইউরোপীয়দের জানাতে বাধ্য হল।'[১৩]

প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীটি নৈনিতালে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের স্বকল্পিত গুজব। কুমায়ুনের অভ্যন্তরে ইউরোপীয় আগ্রাসন ও সাধারণ মানুষের তা প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টাকেই কাহিনীটি চিত্রিত করে। কিন্তু করবেট এক রূপকথার গল্পের মত করে এটিকে বর্ণনা করেছেন যা থেকে ইউরোপীয়দের এক অজানা রহস্যময় পৃথিবী খুঁজে বের করার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের প্রকাশ ঘটে। এই বর্ণনা করবেটের মনের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত শাসকের মূল্যবোধকেই প্রকাশ করে। সাধারণ মানুষ ইউরোপীয় আগ্রাসনের প্রতিরোধ করতে চেয়েছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের শোষণমূলক মনোভাবের সঙ্গে সমমনস্কতায় করবেটের ক্ষেত্রে এককভাবে সত্য নয়, পাশাপাশি একটি মানবতাবাদী ধারাও প্রবাহিত ছিল।

অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত জাতিগুলি বিষয়ে সরকারী নীতি প্রসঙ্গে করবেটের বক্তব্য 'সরকার থেকে অপরাধীদের নিষ্কর উর্বর জমিদান করেও তাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি।'[১৪]

অপরাধপ্রবণ জাতিগুলিকে সকলকেই জেলে বন্দী করে রাখার ক্ষেত্রে করবেট তাঁর লেখায় পরোক্ষে সরকারী নীতির সমালোচনা করেছেন, 'সমগ্র জাতটিকে অপরাধপ্রবণ শ্রেণীভূক্ত করা ও তাদের সবশুদ্ধ নাজিবাবাদ ফোর্টে আটক রাখা ঠিক কি ভুল, সে বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করব না। শুধু এটুকুই বলা যথেষ্ট যে সুলতানা তার যুবতী স্ত্রী, শিশুপুত্র ও আরও কয়েকশো ভান্টুসহ আটকে ছিল ও একদিন সে কেল্লার মাটির দেওয়াল টপকে পালায়।'[১৫]

এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে করবেট তাদেরকে বন্দী করে রাখার বিরোধিতা করেছেন এবং সে কারণেই সরকারী জাতির বিষয়ে কোন মন্তব্য না করার কথা বলেছেন। কিন্তু এই ভান্টু জাতির নেতা সুলতানা কেল্লা থেকে পলায়ন করলে পুলিশবাহিনীর ফ্রেন্ডি ইয়ং-এর সঙ্গে করবেট তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। করবেট গভীর অরণ্যে সুলতানাকে খুঁজে বের করার রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করেছেন। করবেট গভীর অরণ্যে একটি নরখাদক চিতাবাঘকে খুঁজে বার করার বর্ণনার সঙ্গে খুব পার্থক্য নেই। সরকারী নীতি ভুল হতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে করবেট মনে করতেন যে সুলতানার কেল্লা থেকে পলায়নও অন্যায। অর্থাৎ সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন ভাষা-সাধারণ মানুষের নেই। শোষণ অন্যায় হতে পারে, কিন্তু শোষিতের প্রতিবাদও অন্যায্য — এরূপ একটি ধারণায় করবেট বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে গাড়োয়ালের জঙ্গলে যখন জঙ্গল সত্যাগ্রহ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে তখন করবেট এই অঞ্চলেই ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের বিষয়ে করবেট অত্যন্ত নীরব - এবং যে কারণে এই সত্যাগ্রহ বিষয়েও তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। ভান্টু প্রজাতির নেতা সুলতানা করবেটের ভাষায় 'ভারতের রবিনহুড'। করবেট স্পষ্টতঃ লিখেছেন — 'এই ছোট মানুষটা সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অসীম সাহস ও দক্ষতায় সরকারের প্রচণ্ড শক্তিকে উপেক্ষা করে আসছিল। ওকে আমি প্রচুর প্রশংসা করি।'

কিন্তু সেই সুলতানাকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যেই করবেট পুলিশবাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন। সুলতানার বীরত্ব করবেটের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও সে কারণেই সুলতানা রবিনহুডের সঙ্গে সমতুল্য, কিন্তু একই সঙ্গে সুলতানা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। করবেটের কাছে সবসময়ই আইনের বিধিনিষেধের গুরুত্ব, জঙ্গলে ব্রিটিশ সরকার সৃষ্ট কৃত্রিম শৃঙ্খল বা 'Order'-এর গুরুত্ব, সুলতানার যে কোন প্রকার বীরত্বের চেয়েও বেশী। এই বীরত্বের কাহিনী নিয়ে রবিনহুডের মত একটি সুখপাঠ্য গল্প লেখা যায় কিন্তু বাস্তবে প্রতিবাদের কোন ভাষা তা ডাকাতির শিরোনামেই হোক আর 'সত্যাগ্রহের' শিরোনামেই হোক— তা সমর্থন করা যায় না।

অরণ্যসম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বন্যপ্রাণীকে হত্যা না করার ক্ষেত্রে করবেট অনেকক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন।

"কোন চিতাকে জঙ্গলে খুঁজে বের করে রাইফেলের ট্রিগার টেপার চেয়ে ক্যামেরার বোতাম টিপলে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়।'[১৬] এখানে প্রকৃতির প্রতি করবেটের অসাধারণ মমতাবোধ কাজ করেছে ও পশুহত্যার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু আইনসিদ্ধ "Organised Hunting' বা 'সুপরিকল্পিতভাবে শিকার'-এর ক্ষেত্রে করবেট কখনও দ্বিমত হন নি। জিন্দের মহরাজার সঙ্গে তিনি বাঘ শিকারে মেতে উঠেছিলেন যে বাঘগুলি নরখাদক ছিল না। রাজার সঙ্গে জঙ্গলে বিট্ দিয়ে শিকার করতেও করবেট কুণ্ঠিত হন নি। জিন্দের মহারাজা এত বাঘ শিকার করেছিলেন যে তার উপর তিনি একটি বইও লেখেন। জিন্দের মহারাজার প্রাসাদে কয়েকটা বাঘের পাশে এখনও লেখা আছে- 'জিমের বাঘ।' তাই এই মহারাজার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত করবেট লিখেছিলেন - 'জিন্দের মহারাজার মৃত্যুতে ভারত একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে হারাল। তিনি ছিলেন একজন বড়মাপের শিকারী।'[১৭] শুধু জিন্দের মহারাজা নন বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে করবেট বহুবার বিট্ দিয়ে বাঘ শিকার করেছেন যার রোমাঞ্চক কাহিনী তিনি 'মাই ইন্ডিয়া'তে বর্ণনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে করবেটের সংরক্ষণবাদীতার সঙ্গে এই ধরনের শিকারের খেলা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কিন্তু কববেটের সামগ্রিক মানসিকতার মধ্যেই এর সূত্র সন্ধান পাওয়া যায়। আইনসিদ্ধ শিকার বা 'Organised Hunting'-এর সরকারী নীতির তিনি বিরোধিতা করতে পারেন নি। ব্রিটিশদের সমর্থন পুষ্ট মহারাজা বা বড়লাটের সঙ্গে শিকারে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাই তার কোন দ্বিমত ছিল না ও এক্ষেত্রে ক্যামেরার বোতামের চেয়ে বন্দুকের ট্রিগার টেপাকেই তিনি অধিক কাম্য বলে মনে করেছিলেন। করবেটের প্রকৃতি ভাবনা এই ইউরোপীয় মানসিকতার বাইরে নয়। তাই করবেটের বরদাদা 'টম' শৈশব অবস্থা থেকেই 'বড় শিকারী'. কিন্তু চাঁদনী চক গ্রামের গ্রামপ্রধান ও কুমায়ুনের জঙ্গল বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ একজন মানুষ কুনওয়ার সিং একজন চোরাশিকারীর চেয়ে অধিক কিছু নয়।[১৮]

ব্রিটিশ অরণ্যনীতির দ্বৈতসত্তা এক্ষেত্রে অরণ্যপ্রেমী করবেটের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। অরণ্য বিষয়ে করবেটের চিন্তা তাই সাম্রাজ্যবাদী অরণ্য নীতিরই পথানুসারী। পরিবেশভাবনার নৈতিক দিকটিকে অতিরিক্ত গুরুত্বদান করে ও পরিবেশের অসাধারণ উপাদানগুলিকে সংরক্ষণের প্রকল্পের বিপরীতে ব্রিটিশ সরকার অরণ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিল। অরণ্য ধ্বংসের নেতিবাচক দিকটি নিয়ে করবেটের কোন বক্তব্য নেই ও তার মতে এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে।

'আমার জীবনে আমি তরাই ও ভাবর-এর জঙ্গলে অনেক পরিবর্তন দেখেছি। এর কিছু হয়েছে মানুষের হাতে ও কিছু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। কোন কোন ঘন বনে যেখানে মানুষের হাত পড়েনি এখন সেখানে কেবল ঝোপ-ঝাড়। অর যেখানে আগে ছিল ঘন ঘাস জমি সেখানে এক গভীর জঙ্গল।'[১৯] প্রকৃতির এই স্বাভাবিক পরিবর্তনের তত্ত্ব, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে মানুষের মত ক্ষুদ্র প্রজাতির ক্ষুদ্র প্রয়াসের সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একধরনের আগ্রাসনকেই যথার্থতা দান করে। 'অরণ্যকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা

মানুষের সাধ্যাতীত। এই ধারণার অন্তরালে চলে আগ্রাসন। করবেটও এই আগ্রাসনের চরিত্রকে বুঝতে পারেন নি। সে কারণেই জঙ্গলের কাঠ কেটে রেল কোম্পানীগুলিকে সরবরাহ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। শুধু 'Ethical' বা আদর্শগত ধারায় বিশ্বাসী করবেট কখনো কখনো লিখেছেন—

"জঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণে আনার অন্যতম সম্ভাব্য অনিষ্ট হল সেইসব গাছ কেটে ফেলা যার ফল ও ফুল পশুপাখিদের খাদ্য। গাছগুলো কাটার ফলে লক্ষ লক্ষ বানর চাযের ক্ষেতে গিয়ে পড়ল ও তার ফলে যে সমস্যা দেখা দিল ভারতীয়দের ধর্মীয় সংস্কারের জন্য তার সমাধান করা সরকারের পক্ষে কঠিন।'[১০] জঙ্গলের প্রাণীদের সমস্যা নিয়ে করবেট চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু অধিবাসীদের সমস্যা সকল মানবতাবোধ সত্ত্বেও গভীরভাবে বুঝতে পারেননি কারণ একধরনের ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদী দর্শনের আবর্তের বাইরে তিনি যেতে পারেন নি।

করবেটের মধ্যে এই দ্বৈতসত্তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সঙ্গে করবেট অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের চেয়ে বেশী পরিচিত হলেও ভারতবর্ষের 'মিথ' তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। পরিবেশ চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি বিংশ শতকের প্রথম পর্বের সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবচেতনে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। কুমায়ুন, গাড়োয়ালেব মানুষকে তিনি নিবীর্য, প্রতিবাদহীনরূপে চিত্রিত করেছেন এখানকার সমগ্র বিদ্রোহের আগুনকে উপেক্ষা করে। ভারতবর্ষের প্রকৃতিও সেই রূপকল্পেব অংশ বিশেষ। স্বর্গকে করবেট উল্লেখ করেছিলেন, "Happy hunting ground' রূপে যেখানে শিকারের ও অ্যাডভেঞ্চারের কোন বিধিনিষেধ নেই।[১১]

করবেট কখনোই এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেননি। ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তার বিষয় হলেও, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর সমস্ত আবেগ সত্ত্বেও তাঁর ধমনী দিয়ে প্রবাহিত শোণিত ধারাই তার চিন্তার মূল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে করবেট 'এলিট' মানবতাবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এই এলিট মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিল ও এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর চিন্তাকে সাধারণ মানুষ থেকে বহু যোজন দূরের এক রূপকল্পের মধ্যে সীমায়িত করে রেখেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। 'চিতল'. **Journal of 'Wild Life Preservation Society of India,** দেরাদুন, প্রকাশ ১৯০৮

২। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত **'জিম করবেট অমনিবাস'** ১৯৯৩ পৃঃ ২৫

৩। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় - Towards an understanding of environmental history of India. **The Calcutta Historical Journal,** Vol XVI No. -2. July-Dec. 1994

৪। রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাডগিল - **'This Fissared Land — An Ecological History of India.'** (প্রকাশ ১৯৯২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।)

৫। আলুফ্রেড মেমিজ - **"The Coloniser and the Colonised."**

৬। রামচন্দ্র গুহ, মাধব গ্যাডগিল - পূর্বোল্লেখিত **Chap 4. Page 113-14.**

৭। জিম করবেট, "দ্য ম্যানইটার অফ কুমায়ুন", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৫৪ পৃঃ ৫
৮। ঐ, পৃঃ ৭
৯। জিম করবেট 'মাই ইন্ডিয়া' পৃঃ ৪৮
১০। ঐ, পৃঃ ৫৮
১১। ঐ, পৃঃ ৬১
১২। ঐ, পৃঃ ৭৭
১৩। ঐ, পৃঃ ৩
১৪। ঐ, পৃঃ ৯০
১৫। ঐ, পৃঃ ৯১
১৬। করবেট, **ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ্ রুদ্রপ্রয়াগ**, পৃঃ ২৮
১৭। জিম করবেট, **'জঙ্গল লোর'**, ১৯৫৩, (মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত 'করবেট অমনিবাস', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫)
১৮। জিম করবেট, **'মাই ইন্ডিয়া**, পৃঃ ১৭
১৯। জিম করবেট **'জঙ্গল লোর'** পূর্বোল্লেখিত পৃঃ ৩৩১
২০। ঐ পৃঃ ৩৪৫
২১। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত করবেট অমনিবাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে নারী মানসে নারী ভাবনা

জয়শ্রী সরকার

নাবীকে পুরুষের অনুগামী করে বাখা হযেছে, দেওয়া হয়নি কোন বিকাশের সুযোগ, তার উন্মীলনেব কোন সম্ভাবনাকেই গ্রাহ্য করা হয়নি, কারণ এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে ''আমবা স্ত্রীলোক আমাদের অন্তঃকরণ খুদুর, মন অল্প, কাজে-ই অল্পেতে তুষ্টু হই ..''[১]। আজ বিংশ শতাব্দীব শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে যখন প্রখর নারী আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন জাগে। এই চেতনার সূত্রপাত কবে? এই উন্মেষেব সূচনা জানতে হলে আমাদেব ফিরে তাকাতে হবে ফেলে আসা শতাব্দী, ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে।

সেই যুগের নারী সমাজের একটি চিত্র সৌদামিনী খাস্তগীরের লেখায় বেশ স্পষ্ট হয়েছে ''ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা বহুকাল হইতে অন্তঃপুরে নিবদ্ধ থাকাতে ও জড়ের ন্যায় কালযাপন করিয়া আসাতে তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ভাব অত্যন্ত প্রবল''[২]। তাই যখন বাংলায় প্রথম আত্মজীবনী লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী বাল্যবিবাহ প্রথার বলি হয়ে বলেন, ''আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবনে ধিক্''[৩]? তখন তা অত্যাশ্চার্য উক্তি বলেই মনে হয়। তবে তিনি ''আমার জীবন'' লিখেছিলেন পরিণত বয়সে এবং স্বাভাবিকভাবেই পরিণত বয়সের প্রজ্ঞার আলোকে নিজের বালিকা-বধূরূপে বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন। সেই একই রকমভাবে কেশবজননী সারদাসুন্দরীর 'আত্মকথা'তেও এই প্রথা অনুমোদিত হয়নি এবং এর কারণ তাঁর বালিকাবধূরূপে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি।

আর একটু এগিয়ে এসে যদি তাকাই শতাব্দীর মাঝের দশকে তাহলে দেখব, শুধু নিজের সামাজিক অবস্থাই নয়, নারীর সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে তার সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে। প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্ব্বকথা' বা সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে শতবর্ষ পূর্বের সমাজচিত্র ও সমসাময়িক কুসংস্কারের বলি অসহায় নারীর করুণ অবস্থা। এক মর্মস্পর্শী বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে বহু নারীর রচনার মধ্যে। সেই তীব্র অনুভূতির এক উদাহরণ কবি মানকুমারী বসু —

''কারে গো সাজাস ভাই, মূক সন্ন্যাসিনী
না বাজিতে হাতে হাত
আগে হবিষ্যান্ন ভাত

না হতে সন্ন্যাসিনী আগে পথ ভিখারিণী
বোঝে না সে খাদ্যাখাদ্য
'ব্রহ্মচর্য্য' তার সাধ্য'?

কৌলিন্য প্রথার মতো এক নিকৃষ্ট দেশাচারের প্রতিও সোচ্চার হয়ে দেশবাসীর কাছে এক আকুল আর্তি পৌঁছে দেন যোগীন্দ্রমোহিনী বসু— 'হে দেশহিতৈষী মহাশয়গণ, আপনারা এই কুপ্রথা মোচনার্থে যত্নশীল হউন এবং এই জন্মভূমিকে পাপ হইতে মুক্ত করুন .....''।

আমাদের দেশে সেসময় কোন নারীবাদী নারী ছিলেন না, হযতো নিভৃতে ছিলেন, ছিলেন কিছু নারীহিতৈষী পুরুষ। এঁদেরই প্রযত্নে নারী পেয়েছিলেন তাঁর বিকাশের সুযোগ আর উন্মীলনের সম্ভাবনা। রামমোহন-বিদ্যাসাগর এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের কিছু নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ছিল যা নারীকে সমাজের স্মার্ত্য কাঠিন্য ভেদ করে উন্মুক্ত আলোকে এসে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। নারীবাদী অগ্রপথিকদের ধারণা সূত্রে শিক্ষার বিস্তার লাভ হতে থাকে মেয়েদের মধ্যে। ইত্যবসরে নারী শুধু অন্তঃপুরেব চার দেয়ালের বাইরেই পা দেয়নি, সমুদ্রপাড়ি দিয়েছেন, বৃহত্তর সমাজের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নারীর এই নতুন আঙ্গিকে সমাজে প্রতিষ্ঠার পিছনে পুরুষের উৎসাহ, প্রয়াস ও প্রেরণা অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত ছিল।

শিক্ষাকে নারী প্রগতির এক প্রধান অঙ্গ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাবলম্বন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে "সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ যদি শিক্ষক হন তাহা হইলে অধিক বয়স পর্য্যন্ত এমন কি বিবাহের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ছাত্রীগণের শিক্ষার ব্যাঘাত হয় না"। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে "স্বামী পুত্রহীন অবলারা" যারা সংসারের "গলগ্রহ" তাঁদের আহ্বান করা হচ্ছে এবং সাথে সাথে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের একটি পথ উন্মুক্ত করা হচ্ছে।

স্ত্রী স্বাধীনতা ঠিক কী বস্তু — এ সম্পর্কে গত শতাব্দীর মহিলাদের ধারণা কোন সুস্পষ্ট আকার নিতে পারেনি, তবে তাঁদের চেতনায় নারীর হীনবস্থার কারণ হিসাবে কিছু সামাজিক প্রথা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল এবং তাঁর উদাহরণ হিসাবে ষাটের দশকের জনৈক ক্ষীরদা মিত্রর রচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে

"আহা! কতদিন আর রবে এসকল,
অবলার দুঃখানল করিতে প্রবল।
অসভ্যতা কুসংস্কার আর দেশাচার,
করিতেছে ক্রমে ক্রমে দেশ অধিকার
বিদ্যাহীনা জ্ঞানহীনা যত নারীগণ,
রয়েছি মোরা পশুর মতন"।

না, শুধু আক্ষেপ নয়, নারী তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন এক দৃপ্ত, ঋজু ভঙ্গিতে "স্ত্রী জাতি ..... অবশ্য বুঝিতে পারিবে, পাতিব্রত্য ও সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে অবৈধ পরাধীনতা এবং দাসীত্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়। ..... স্ত্রী জাতির আপনাদিগেরই চেষ্টা করা উচিত যাহাতে ক্রমে এই তাহাদিগের অন্যায় অধীনতা বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে"[১০]।

শুধু নারীহিতৈষী পুরুষদের কর্মপ্রয়াসেই নয়, নারীর অবস্থা উন্নতির জন্য নারীর সমবেত প্রয়াস অত্যাবশ্যক "স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয় পুরুষ সমাজে আলোচিত হওয়া যত আবশ্যক, স্ত্রীগণের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক"[১১]।

নারী প্রজাতির এক নতুন সংজ্ঞা আমরা পাই এর পরবর্তী দশক থেকে। নারীর মধ্যে অনুভূত হচ্ছে বঞ্চিতা নারীর প্রতি সমবেদনা। সামাজিক ইতিহাসে এই চেতনার উন্মেষ এক অভিনব অধ্যায়। অন্তঃপুরিকারা অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে নারীকে স্বনির্ভর করে তোলার আগ্রহে এগিয়ে এসেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর "সখী সমিতি" (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) এই রকমই এক প্রচেষ্টা যেখানে "সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও স্থলবিশেষে অর্থ সাহায্য করা, এবং পরে অবস্থা অনুকূল হইলে ..... সেই শিক্ষিত বালিকাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা"[১২]।

বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি তাই সমসাময়িক পত্রিকাতে নারী ভাবনার প্রতিফলন "তাহাদিগের বিবাহ দিতে পারা গেল না, তবে তাহারা মরুক এ বলিয়া কি আর তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা যায়"[১৩]? সখী সমিতি তার কর্মসূচীর মাধ্যমে চেষ্টা করেছিল যাতে সঙ্গতিহীনারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমর্থ হন এবং পরান্নজীবিকার উপর নির্ভর না করিয়া আপনাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবেন, ..."[১৪]। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে কবি মৃণালিনী সেন বলেছিলেন, "..... it is an admitted duty to help to make everyone fit to survive."[১৫] কবি মৃণালিনী সেনের জেনিভা কংগ্রেসে (১৯২০) বক্তৃতার অনেক আগেই তৎকালীন শিক্ষিতা নারীদের মধ্যেও একই ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল "যদি বিধবা হইয়া তাহা হইতে তাহাদিগকে পাট কাটা, সূতা কাটা ও শিল্পকর্ম্ম করাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে কি তাহাদিগের ও সাধারণের মঙ্গল হয় না"[১৬]? "একটি ব্যর্থ জীবনকে সার্থক"[১৭]। করে তোলার উদ্দেশ্যই প্রেরণা দিয়েছে, সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তাই দেশবাসীর কাছে এক আকুল আর্তি ধ্বনিত হয়েছে শরৎকুমারী চৌধুরানীর লেখনীতে "এ যে দশজনের কাজ তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব"[১৮]?

শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বহুমুখী ধারায় নারীর চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে তার এক উদাহরণ পাই 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে "যাঁহারা এত দিন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিলেন তাঁহারা ..... স্বদেশের অশিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতা ভগ্নীগণের উন্নতির পক্ষে কিছু কিছু সাহায্যদান এবং সময় ব্যয় করেন"[১৯]।

নারীর জন্য শুধু করুণা ভিক্ষা নয়, তাঁদের যোগ্যতা অর্জনের সহায়তা করা বিভিন্ন জনহিতকর সমিতি ও কাজের মাধ্যমে -- বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগেই এর সূচনা হয়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীর বিশেষ করে প্রথমার্ধে এই প্রবাহ বয়ে চলেছিল নারী পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে, যেমন সরলাদেবী চৌধুরানীর 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল', লেডী অবলা বসুর 'নারী শিক্ষা সমিতি' বা 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন', সরোজনলিনী দত্ত'র 'নারী মঙ্গল সমিতি' ইত্যাদি। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলায় নারীমুক্তি আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মুসলমান বোনেদের কাছে তাঁর আহ্বান ".... জাগ, জাগ গো ভগিনি!"[১০]

কিন্তু তাঁর নারীবাদী ভাবনার মধ্যে আর একটা দিক লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে, "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব"[১১]।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অমসৃণ পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে নারী আত্মপ্রকাশ করেছে এক অভিনব প্রাণচঞ্চল কর্মোদ্যমে। মহিলাদের শিক্ষা এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সেকালের ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধিতা ছিল সুতীব্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে সব চেষ্টা সফল হয়নি কিন্তু নারীকে মানুষের মর্য্যাদা দেওয়ার চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের এক যথার্থ সময়োচিত উক্তি "..... পুরাতন সামাজিক রীতি এবং আদর্শের মাপকাঠি বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা অযৌক্তিক। ..... নারীকেই অগ্রণী হইতে হইবে, এবং অকুণ্ঠ নির্ভীকতায় এই সকল নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ..... আপনাদের জন্য নূতন পথ এবং নূতন জীবনধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে"[১২]।

সূত্র নির্দেশ

১। কৈলাসবাসিনী মিত্র, "**গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী**", পৃঃ ১১, নরেশচন্দ্র জানা ও অন্যান্য, (সম্পাঃ), **আত্মকথা**, খণ্ড ২, কলিকাতা, ১৯৮২।

২। **বামাবোধিনী** পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

৩। রাসসুন্দরী দেবী, "**আমার জীবন**", পৃঃ ২৭, নরেশচন্দ্র জানা ও অন্যান্য (সম্পাঃ), **আত্মকথা**, খণ্ড ১, কলিকাতা, ১৯৮১।

৪। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, **বঙ্গের মহিলা কবি**, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

৫। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আশ্বিন ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

৬। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, কার্ত্তিক ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

৭। ঐ

৮। ঐ

৯। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ভাদ্র ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

১০। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আশ্বিন ১২৮০ বঙ্গাব্দ।

১১। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

১২। **ভারতী ও বালক**, পৌষ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

১৩। **বামাবোধিনী** পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।

১৪। **ভাবতী ও বালক**, পৌষ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

১৫। মৃণালিনী সেন, **নকিং এ্যাট দ্য ডোর**, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ১৫-১৬। (ইং)

১৬। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, শ্রাবণ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।

১৭। শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম', **শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী**, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃঃ ৭১।

১৮। ঐ

১৯। **বামাবোধিনী পত্রিকা**, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

২০। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'মতিচুর', **রোকেয়া রচনাবলী**, বাংলাদেশ, পৃঃ ১৯-২২ (পুনঃমুদ্রিত), ১৯৯৩।

২১। ঐ

২২। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, **জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ**, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৫

'গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী' কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' : কিছু প্রসঙ্গ

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের এ আলোচনায় বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু মৃত্যু শতবর্ষে (জন্ম ঃ ৫ শ্রাবণ ১২৪০ বঙ্গাব্দ, জুলাই, ১৮৩৩; মৃত্যু ঃ ৫ বৈশাখ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ১৬, ১৮৯৬) কাঙাল হরিনাথের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব না হলেও, তাঁর ভূমিকার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গেলেও বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা, চরিত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসতে বাধ্য এবং তা আনতোনিও গ্রামশি কথিত নাগরিক ও গ্রামীণ চরিত্রের বুদ্ধিজীবীদের আলোচনাব পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কাঙাল হরিনাথের প্রসঙ্গে আসার আগে এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞার কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ নেই। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ, চরিত্র সংজ্ঞাও পাল্টায়। ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল ম্যানহাইম, মিচেলস্, আনতোনিও গ্রামশি থেকে আধুনিক কালের জাঁ পল সার্ত্র, রেমন্ড উইলিয়ামস্, ওয়ালটার বেঞ্জামিন এবং উত্তর-আধুনিক (post-modern) চিন্তকরা বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। আমাদের এখানে (পশ্চিমবঙ্গে) বিনয় ঘোষ, সমর সেন, সুশোভন সরকার, অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখও আমাদের ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বিশেষ করে উনবিংশ শতকের নবজাগরণকে মনে রেখে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তবু বিতর্ক থাকলেও মোটামুটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। বুদ্ধিজীবী কথাটির অর্থ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যিনি বুদ্ধির সাহায্যে জীবনকে বিশ্লেষণ, আপন জীবনযাত্রায় বুদ্ধির অনুসরণ এবং বুদ্ধির অনুশীলন করে সমাজে প্রভাব বিস্তার করেন। যে সব ব্যক্তি তাঁদের বিচারবোধের সাহায্যে সমাজে যুগান্তর এনেছেন অথবা আনার চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরকেই সম্ভবত আমরা বুদ্ধিজীবী বলে থাকি।

বুদ্ধিজীবী একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থারই সৃষ্টি। জন্মসূত্রেই এটি একটি গোত্র, একটি প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ আমলেও তার প্রয়োজন ঘটেছিল শাসনযন্ত্রের অংশ হিসেবে। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবী আর পাঁচজন অর্থজীবীর তুলনায় ভিন্ন, শাসনযন্ত্রের একটি টুকরো হয়েও সে তার থেকে স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে চলে খানিকটা। কেননা, এই গোত্র তার চেতনা দিয়ে জানে এই ব্যবস্থাপনার ক্ষত, জানে এর থেকে বেরুতে না পারলে শেষ অবধি

তার কোন মঙ্গল নেই। এইটেই তার দ্বন্দ্ব। তার জানার সঙ্গে তার কাজের এই বিচ্ছেদ ঘটে গেছে প্রথম থেকেই, জন্মসূত্রেই, এই তার বিপদ। শঙ্খ ঘোষ[১] এই দোটানারই এক ছবির কথা বলেছেন 'রক্তকরবী' নাটকের অধ্যাপক চরিত্রে। যক্ষপুরীর যা কিছু ব্যাধি বা সংকট তারই অন্তর্গত ছিল এই চরিত্র। তবু সেই একই সঙ্গে এই অধ্যাপক জানেন তার সংকটের অবয়ব কেমন, নন্দিনীর কাছে সেকথা তিনি বলেনও বেশ ঘোষণা করে, বিশ্লেষণ করে। শঙ্খ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের বুদ্ধিজীবী গোত্রেরও কি মুক্তি ঘটতে পারে ঐ অধ্যাপকেরই মত? যদি ঘটে, কোন্ পথে সেই মুক্তি? শঙ্খ ঘোষ পরিশেষে বলছেন, শুধু কথায় নয়, জ্ঞানে নয়, জীবন বা কর্মের সঙ্গে সেই কথা বা জ্ঞানের অব্যাহত যোগ চাই। না হলে, বুদ্ধিজীবী জানতেও পারেন না কখন একদিন তিনি হয়ে উঠেছেন নিস্ফল এক 'শব্দজীবী মাত্র।

উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে কাঙাল হরিনাথের অবস্থান বুঝতে গেলে উপরিউক্ত চিন্তাসূত্রটি চলে আসে। কাঙাল হরিনাথকে কতটা বুদ্ধিজীবী বলা যাবে, তা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। বিনয় ঘোষ[২] ইংরাজীতে 'ইণ্টেলিজেন্সিয়ার' বাংলা প্রতিশব্দ 'বিদ্বৎসমাজ' করেছেন। সমব সেন[৩] 'ইণ্টেলেকচুয়াল' কথাটার সঠিক অনুবাদ 'বুদ্ধিজীবী' বলে মনে করেন না। অন্যদিকে, সুশোভন সরকার[৪] 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটির বদলে 'বুদ্ধিবাদী' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতি। অম্লান দত্ত[৫] 'চিন্তক' ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্য নয়, ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাঙলার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ আমলের ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র সেকালের সেই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে — We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.[৬]

সমাজ বিজ্ঞানী ম্যানহাইম[৭] এ যুগের বিশ্বজনদের খণ্ডিত রূপের কথা স্মরণ করে তাঁদের কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, যেমন 'পলিটিক্যাল', 'অর্গ্যানাইজিং' 'ইন্টিলেকচ্যুয়াল', 'আর্টিস্টিক', 'মর‍্যাল', ও 'রিলিজিয়াস'। ভারতবর্ষ তথা বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানহাইমের বিভাজন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য না হলেও গ্রামশি কথিত জৈবও প্রথাগত বুদ্ধিজীবী[৮] এবং কাঙাল হরিনাথের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে গেলে নাগরিক ও গ্রামীণ চরিত্রের বুদ্ধিজীবী[৯] — এই বিভাজন অনেকটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। গ্রামশি দুই বর্গের বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছেন। একটি বর্গকে তিনি বলছেন জৈব অর্থাৎ একটি শ্রেণী তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজস্ব পরিচয়, ভূমিকা, আন্তর সমজাতীয়তা ইত্যাদি গুছিয়ে নির্দেশ করে দেবার দায়িত্বে নিজ থেকেই যাদের প্রতিষ্ঠিত করে, সেই বুদ্ধিজীবীকুল ঐ শ্রেণীর উন্মেষের ইতিহাসের এক স্বাভাবিক অঙ্গ এবং ঐ শ্রেণীর সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্য বর্গ 'প্রথাগত'— এই বুদ্ধিজীবীরা আপাতদৃষ্টিতে কোন বিশেষ শ্রেণীর বিকাশ অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়নি, বরং যেন প্রাচীনতার কোন পরম্পরার প্রতিভূ। গ্রামশি পুরোহিত শ্রেণীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে ধরিয়ে

দেন যে, এই 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীরাও কোন শুদ্ধ, স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রেণী নয়, তাদের শ্রেণী পরিচয় তথা শ্রেণীগত আনুগত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র।

গ্রামশির মতে, নাগরিক চরিত্রের বুদ্ধিজীবীরা গড়ে উঠেছেন শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ তারই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ চরিত্রের বুদ্ধিজীবীরা বহুলাংশেই 'প্রথাগত'। কাঙাল হরিনাথকে এই অর্থে গ্রামীণ চরিত্রের বুদ্ধিজীবী বলা যেতে পারে।

উনবিংশ শতকে নবজাগরণের সময় বাংলার বৌদ্ধিক চিত্রটা কেমন ছিল। নবজাগরণের মূল চরিত্রই ছিল নগরকেন্দ্রিক। প্রথম স্তরে ছিল ব্রিটিশ আশ্রিত বানিয়া-মুৎসুদ্দী-গোমস্তা-কেরানী-ফড়ে-দালাল-দেওয়ান। যারা অবাধে অঢেল অজস্র কাঁচা টাকা অর্জনের ও সঞ্চয়ের দেদার সুযোগ পেয়ে ইংরেজের এ দেশে উপস্থিতিকে ভগবানের কৃপা-করুণার দান বলে জেনে ছিল ও মেনেছিল এদের মধ্যে থেকেই উন্মেষ হল দ্বিতীয় স্তরের মানুষজন। জ্ঞানী-কর্মী-মনীষী-শিল্পী-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-সাংবাদিক-স্বাদেশিক প্রমুখ। প্রাচ্যে অবজ্ঞা ও প্রতীচ্যে শ্রদ্ধা নিয়েই এঁদের প্রথম জীবনে ভাবনাচিন্তা-কর্ম-আচরণের শুরু; কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে আবার এঁরাই হলেন কিছুটা সুস্থ সনাতনী এবং স্বাদেশিক-স্বাজাতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনার অনুশীলনে নিষ্ঠ। যদিও ইংরেজ রাজত্বই যে এঁদের এই নবলব্ধ ধন-মন-মননের উৎস, তাও এঁদের মনে সদা জাগরুক ছিল। তখন এঁদের কাছে ইংরেজপ্রীতি, ইংরেজশাসন, ইংরেজী বিদ্যা আর উন্নতি সমার্থক। ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জিগির তাদের মুগ্ধ করল বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে তারা এর কোনটাই কামনা করেনি। তাই সমর্থন পায় নি সিপাহী বিদ্রোহসহ অনেক বিদ্রোহ। কিংবা নারী-পুরুষের সাম্য, বহুবিবাহ-নিরোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বর্ণভেদ লোপ কিংবা অস্পৃশ্যতা বিদূরণ প্রভৃতি কোনটাই তাদের আন্তরিক প্রয়াসের অঙ্গ হয়নি। বেন্থাম-কোঁত-মিলের হিতবাদ, মানবতাবাদ কিংবা নাস্তিক্য শিক্ষিত বাঙালীর বৈঠকী আলোচনার বিষয় হল, কিন্তু নাস্তিক রইল দুর্লভ, জনগণের হিতকামনা শুধু প্রবন্ধের শব্দেই নিবদ্ধ থাকল। জমিদার সমিতি ও হিন্দুমেলা গড়ে উঠল, কৃষক সমিতি তৈরী হল না। আসলে উনিশ শতক ছিল অস্থিরতার ও স্ববিরোধের কাল।

নবজাগরণের এইরকমের মূল্যায়ন যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ এবং এই ধরনের মন্তব্য, আলোচনাও যথেষ্ট চর্চিত। আসলে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অতীত ইতিহাসকে বুঝতে গেলে 'ডিসকোর্সের' দ্বারা করতে হবে। ইতিহাসও বর্তমানের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। বর্তমানের চশমার মাধ্যমে অতীতকে বিচার করা হয়। Sir Lewis Namier-এর ভাষায়— 'Historians imagine the past, remembering the future.'

এই চিন্তাসূত্রে বাঙালির আদি বুদ্ধিজীবী রামমোহন রায়কে বলা যেতে পারে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আধুনিক বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব। কিন্তু তাঁদের প্রায় সকল কর্মকর্তাই কলকাতা শহরে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে, সাহিত্যিক-গীতিকার-

সাংবাদিক-শিক্ষক-সমাজহিতৈষী নদীয়ার কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথ তাঁর সব কর্মকাণ্ড গ্রামেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। 'মৃত্তিকাসংলগ্নতা' একজন বুদ্ধিজীবীকে কঠোরতম কর্মকান্ডে প্রেরণা দেয় তা কাঙাল হরিনাথের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে।

গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী হরিনাথ কলকাতা শহরকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না বলেই মনে হয়। নিজে সারাজীবন গ্রামেই থেকেছেন। গ্রামের মানুষের স্বার্থে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অসম সাহসিকতায় 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করেছেন, জমিদারী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাস্বার্থে রুখে দাঁড়িয়ে পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭২) সমর্থন করেছেন, কোনরকম আপস না করেই। ছেলেবেলায় পড়াশোনার আশায় একবার কলকাতায় গিয়ে নিরাশ হয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। এরপর বৃদ্ধ বয়সে বন্ধুস্থানীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে কলকাতায় গিয়েছিলেন, একবার, তাও গান গাইতে। গ্রামে থেকেই তিনি সাংবাদিকতার পাঠ নিয়েছেন, সাহিত্য রচনার কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, কলকাতা কালচারের বিপরীতে সুদুর মফঃস্বলে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্য-চক্র। হরিনাথকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর মশারফ হোসেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রশেখর কর প্রমুখের সাহিত্য-চর্চার আসর। এঁদের মধ্যে মোশারফ-জলধর-অক্ষয়-দীনেন্দ্রনাথ-চন্দ্রশেখর প্রমুখ পরবর্তীতে বাঙলা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হয়েছিলেন। এঁরা সকলে হরিনাথকে সাহিত্য গুরু বলে স্বীকার করেছেন। হরিনাথ নিজেই ছিলেন একটা প্রতিষ্ঠান। সুদূর মফঃস্বলে এমন 'জাগ্রত চিত্ত' তখন আর দ্বিতীয় ছিল না[১৩]। স্বভাবতঃ বোঝা যায়, গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী যথার্থই সচেতন বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বই পালন করার প্রয়াসী ছিলেন।

শহর নয়, তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রাম জীবনে। তাঁর কাজগুলি গ্রামীণ চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। হরিনাথের জন্মস্থান কুমারখালি 'ইতিহাস ঐতিহ্য'-গত দিক দিয়ে কুষ্ঠিয়ার চেয়ে 'সমৃদ্ধ এবং প্রাচীনতর', যার জন্য ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে কুষ্ঠিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে 'কুমারখালি-কুষ্ঠিয়া' বলা হত। চৈতন্যদেবের আমলে এই কুমারখালির নাম ছিল তুলসীগ্রাম। এ অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করার জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কালেক্টর হিসেবে কমরকুলি খাঁ-কে নিযোগ করার পর কমরকুলির নাম থেকে কুমারখালি নামের উৎপত্তি হয়। ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলার অধীনে কুমারখালি, খোবা, পাংসা এবং কলিয়াকান্দি থানা নিয়ে কুমারখালি মহকুমা গঠিত হয়। এর ১৪ বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৮৭১ সালে কুমারখালিকে পাবনা জেলা থেকে বের করে এনে নদীয়া জেলার একটা থানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একসময় নাটোর রাজের অধীনে থাকলেও পরবর্তীতে কুমারখালি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাঙাল হরিনাথের কাজগুলি যে গ্রামীণ চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ফিকিরচাঁদ

বাবাজির গীতিকার রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। তাঁব পত্রিকা এলিটদের জন্য নয়, গ্রাম বাঙলার কৃষক সম্প্রদায়ের সমস্যা তাঁর পত্রিকায় সমাধানকল্পে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল। পাবনা-সিরাজগঞ্জ কৃষকবিক্ষোভে তিনি সরাসরি প্রজাস্বার্থে জমিদার, বিশেষ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। লক্ষণীয় যে এই অবস্থানের কারণে জমিদারের তরফ থেকে নিপীড়ন; প্রাণহানির হুমকিকেও তিনি গ্রাহ্য করেন নি। এক্ষেত্রে স্বয়ং লালন ফকির তাঁকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেন নি। জমিদার প্রভাবিত পত্রিকাগুলি হরিনাথের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে। কৃষক বিক্ষোভকে নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলবার চেষ্টা করেছে, সরকারি দরবারে মিথ্যা স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় যে জমিদারি-স্বার্থসংলগ্ন মধ্যশ্রেণীর সেদিন কেউই হরিনাথের পক্ষে দাঁড়ান নি। বিশেষ করে প্রভাবশালী ঠাকুর জমিদারদের দাপটে তাঁরা নীরব ছিলেন।

হরিনাথের কর্মকান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামক পত্রিকা প্রকাশ। এই প্রত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হরিনাথ নিজেই জানিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় যে এর উদ্দেশ্য ছিল — (১) বাংলা সংবাদপত্রের অনুবাদের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হতে চান, (২) গ্রামবাসী প্রজারা যেভাবে অত্যাচারিত হন, তা যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, তবে সরকারই তা অনুবাদের মাধ্যমে অবহিত হবেন, (৩) সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিকার প্রার্থনা করা যায় সরকারের কাছে, তবে সরকার অনুবাদের মাধ্যমে সে ব্যাপারে অবহিত হয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং হরিনাথ মুখ্যত যে উদ্দেশ্যে 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর সংবাদপত্রের সংবাদ ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে সরকারের কর্ণগোচর হবে, হরিনাথের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে নি।

গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও দৃঢ়তা বোঝা যায় যখন হরিনাথের সাহসী এবং তথ্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কারণে অনেক সময় বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁকে ডাকা হত। এর থেকে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসে — (১) কোনরকম লোকশ্রুতির ওপর নির্ভর করে সংবাদ পরিবেশন হরিনাথ করতেন না বলে তাঁকে স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানানো হত এবং (২) হরিনাথ সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেশনের সময় যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় রাখতেন, সেই দুঃসাহস সবার না থাকায় হরিনাথকেই স্বচক্ষে ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ করার জন্য ডাকা হত। ঠাকুর জমিদারদের অমানবিক অত্যাচার নিপীড়নের সংবাদ সেসময় হরিনাথ অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। আর সেসবের ফলশ্রুতিতে তাঁর জীবননাশের চক্রান্তও হয়েছে, তবু তাঁর আদর্শবোধ তাঁকে বিচলিত করেনি, তাঁকে দ্বিধাগ্রস্থ করেনি। গ্রাম ও শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন মানুষজন ও তাঁদের জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনা, খবর তো বটেই, খবরের আড়ালে যে খবর তা নিয়েই তিনি লিখতেন।

হরিনাথেব এই 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন — 'এ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফস্বলেব কিছুই প্রকাশিত হয় না'।[১১] আর এর ফলেই যেহেতু 'গ্রামবাসীদিগের কোন প্রকার উপকার দর্শিতেছে না' সেইহেতু হরিনাথ 'গ্রামীয় অবস্থাদি' প্রকাশ করে 'প্রতিকাব' পাবার লক্ষ্যে এবং গ্রামবাসীদের 'উপকার' সাধন করার উদ্দেশ্যেই গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর, 'গ্রাম-ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া' পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'[১১]।

গ্রামবার্ত্তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭০ বঙ্গাব্দ) মাসিক সমাচার পত্র হিসেবে। এই সংবাদপত্র প্রকাশের আগে হরিনাথ 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ সাংবাদিকের তালিম নিয়েছিলেন। একটা সময় তিনি 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর আঞ্চলিক সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি প্রজার প্রতি নীলকরের অত্যাচার কাহিনী 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লিখতেন। কেননা হরিনাথের ভাষায় 'সাধ্য ততদূর না থাকুক, প্রজার প্রতি নীলকরের অত্যাচার যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার উপায় চিন্তাকরণ আমার নিত্যব্রত ছিল'[১১]। এছাড়া হরিনাথ নীলকর-অত্যাচারের সংবাদ 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট'-এ পাঠাতেন।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-র প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১২৭০) হরিনাথ পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেনঃ 'যেমন চিকিৎসক রোগীর অবস্থা সুবিদিত না হইলে তাহার প্রতিকারে সমর্থ হন না, তদ্রূপ দেশহিতৈষী মহোদয়গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরূপে তাহার প্রতিকার করিতে যত্নবান হইবেন? যাহাতে গ্রামবাসীদিগের অবস্থা, ব্যবসায়, রীতি, নীতি, সভ্যতা, গ্রামীয় ইতিহাস, মফস্বল রাজকর্মচারীগণের বিচার এবং আশ্চর্য ঘটনাদি প্রকাশিত হয় তাহাই এই পত্রিকার প্রধানোদ্দেশ্য এবং লোকরঞ্জনার্থ, ভিন্নদেশীয় সম্বাদ ও গদ্য পদ্য নানারূপ চিত্তরঞ্জন বিষয়ও লিখিত হইবেক। এই পত্রিকা সম্প্রতি বর্তমান বৈশাখ অবধি প্রতিমাসে একবার প্রকাশিত হইবেক'[১১]।

১৮৬৩ সালে মাসিক প্রকাশন হিসেবে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হতে থাকলেও অচিরে তা পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে আর্থিক প্রতিকূলতার জন্যই গ্রামবার্ত্তা তার কোন প্রকাশনকেই নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়ায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবু প্রকাশনার নিয়মিত-অনিয়মিত প্রক্রিয়ায় গ্রামবার্ত্তা দীর্ঘ বাইশ বছর (শেষ ১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। মাসিক থেকে সাপ্তাহিকরূপান্তরপর্বে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার যে রাজনৈতিক পত্রিকা 'হয়ে-উঠার' ঘটনা তা সমসময়ের রাজনীতির আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় এবং বলা যেতে পারে যে গ্রামবার্ত্তার এই উত্তরণ তার যুক্তিধর্মিতার ও সাহসী দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য ফলশ্রুতির সঙ্গেই সমন্বিত।

এ প্রসঙ্গে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে। ১৮৭৪-৭৫ সালে ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ২৪৮টি। এর মধ্যে

সর্বাধিক সংখ্যক প্রকাশিত হত বাংলাদেশ থেকে— ৯৫টি। ১৮৭৩ সালের হিসেব অনুযায়ী প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৩৬টি। এর মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশ পেত ১৭টি[১১]। বাকি ১৯ টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত জেলা সদর ও গ্রামাঞ্চল থেকে। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে গ্রামভিত্তিক সংবাদপত্রের যে প্রকাশ শুরু হয়েছিল, পরবর্তী সত্তরের দশকে এসে তার বেশ কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক বাড়বাড়ন্ত ঘটে। এ সময়ে গ্রামীণ সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলির নাম হিসেবে সামনে আসে তা হল হালিশহর পত্রিকা, কাঁচরাপাড়া পত্রিকা, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, বরিশাল বার্তাবহ এবং সর্বোপরি হরিনাথ সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'।

বাইশ বছর ধরে প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা'-র বিষয় বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। যেমন — গ্রামবাসীদের অবস্থা, ব্যবসা, রীতি-নীতি, সভ্যতা, গ্রামের ইতিহাস, মফঃস্বল রাজকর্মচারীদের বিচার, বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা, লোকরঞ্জন, চিত্ত মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের গদ্য ও পদ্য ইত্যাদি। মাসিক অবস্থায় গুরুত্ব পেত যে সকল বিষয় — ধর্মনীতি, সমাজনীতি বিষয়ক সাহিত্যময় প্রবন্ধ, রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ, বিবিধ সংবাদ। পাক্ষিক অবস্থায় আগের বিষয়গুলি থেকে ধর্মনৈতিক সাহিত্য বাদ গিয়েছিল। সাপ্তাহিক অবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধ বন্ধ হয়ে রাজনীতির বেশী আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি আলোচনার জন্য স্বতন্ত্ররূপে একটি মাসিক বেরুত। গ্রামবার্ত্তার এই বিষয়গুলি অনুবাদ করে ব্রিটিশ প্রশাসকের গোচরে আনতেন মিঃ রবিনসন। সেই সময় জমিদার প্রভাবিত বেশকিছু সংবাদপত্র ছিল, যেমন — সোমপ্রকাশ, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি। কিন্তু গ্রামবার্ত্তার অর্থ সংস্থান মাঝে মাঝে মহারাণী স্বর্ণময়ী করলও মূলত হরিনাথ নিজেই করতেন।

জমিদারদের প্রজা-অত্যাচারী ভূমিকার সরব সাক্ষী ছিলেন হরিনাথ। গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে তিনি প্রজার ওপর জমিদারের নির্মম অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা'-য় তা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে প্রজাস্বার্থে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। হরিনাথের অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকের দৃষ্টিতে এই 'দেখা' পরবর্তীকালে গ্রামবার্ত্তায় 'লেখা'-তে রূপ পরিগ্রহ করে সবসময়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

হরিনাথের চিন্তাভাবনার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল, যদিও তা তর্কসাপেক্ষ। যেমন, ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরোধিতা করলেও ব্রিটিশ সরকার ও তার দ্বারা প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা তিনি করেন নি। অনুরূপভাবে জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের বিরোধিতা করলেও জমিদারী প্রথার অবসান তিনি চান নি। হরিনাথের চিন্তাভাবনার এই সীমাবদ্ধতা উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনা বিন্যাসের সাধারণ ধর্মের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হরিনাথের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য নিয়ে যথাযথ গবেষণা আজও হয়নি। সে কি শুধু 'গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী' বলে? আমরাও এখানে তাঁর সাহিত্য, বাউল গানের ও বাউল দলের আলোচনা করিনি। মূলতঃ দেশপ্রেমিক, কৃষকদরদী ও সর্ববিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ও 'গ্রামবার্ত্তা-র সাংবাদিক

'গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী' হরিনাথ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হল। কিন্তু আমাদের বৌদ্ধিক জগতে হরিনাথের এরূপ উপেক্ষিত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত পরিতাপের, এমনকি তাঁর মৃত্যু শতবর্ষেও। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, মীর মোশারফ হোসেন, দীনেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ, তাঁদের রচনায় হরিনাথকে বিশেষ মর্যাদা না দিলে সম্ভবতঃ হরিনাথ হয়ে যেতেন বিস্মৃত। হরিনাথের ডায়েরী আকারে ৮ খণ্ডে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠার জীবনস্মৃতি আজও প্রকাশিত হয়নি। যেখানে তিনি জীবন কথার মোড়কে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাহসী পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মজুমদার, জলধর সেন, অরুণ রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ডায়েরী পড়েছিলেন। এর সামান্য অংশ 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায়[১১] প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ আজও প্রকাশ না পাওয়া বিস্ময়ের।

তবু বলতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রথাগত শিক্ষায় অনভ্যস্ত, নাগরিক রুচির বৈদগ্ধ্যে অশাসিত, ইংরেজী না-জানার দরুন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে অপরিচিত হরিনাথ খুব স্বাভাবিকভাবেই সমসময়ের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে উপেক্ষাব শিকার হওয়া সত্ত্বেও তাঁব চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সমসময়ের বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্ম ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। শঙ্খ ঘোষ — 'শব্দজীবীর ভয়', **বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন** গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত, সম্পাদনাঃ লতিকা মুখোপাধ্যায়, পরিবেশনাঃ শিল্প সাহিত্য, কলকাতা-৯, শ্রাবণ, ১৩৭৯।

২। বিনয় ঘোষ — **বাংলার বিদ্বৎসমাজ**, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-১২, পৃঃ-৪, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭৩।

৩। সমব সেন — **'চন্দ্রবিন্দু বাদে'**, সূত্র (১) দ্রষ্টব্য।

৪। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন ভট্টাচার্য অনূদিত ও সম্পাদিত — **আনতোনিও গ্রামশি নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ**, প্রথম খণ্ড; পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, পৃঃ-১ (বুদ্ধিজীবী শ্রেণী), জুলাই, ১৯৯৩।

৫। সূত্র (৪) দ্রষ্টব্য।

৬। H Woodrow **Macaulay's Minutes on Education in India,** Calcutta 1862, P 115.

৭। Karl Mannheim **Man and Society**. London 1940. P 82।

৮। সূত্র (৪) দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২ (বুদ্ধিজীবী শ্রেণী)।

৯। সূত্র (৪) দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫ (বুদ্ধিজীবী শ্রেণী)।

১০। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, **বাংলা কবিতার নবজন্ম**, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা,১৯৬২, পৃঃ ৩১৯।

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : **বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮)**, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ পৃঃ ২১৯।

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

১৩। জলধর সেন : **কাঙাল হরিনাথ**, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃঃ ৯।

১৪। **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা**, বৈশাখ, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

১৫। Uma Dasgupta **Rise of an Indian Public** 1977 P I

১৬। চতুষ্কোণ পত্রিকার দুটি সংখ্যায় এই ডায়েরীর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল — শারদীয় ১৩৭০ এবং আষাঢ় ১৩৭১। সম্প্রতি (এপ্রিল, ১৯৯৬) জানা গেছে যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে 'কাঙাল রচনাবলী' প্রকাশের এবং কাঙাল-স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কাঙাল হরিনাথ সম্পর্কে কিছু গ্রন্থ

১। অমর দত্ত (সম্পাদিত) — **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা**; গ্রন্থভারতী; কলকাতা, ১৩৯৭।

২। আবুল আহসান চৌধুরী — **কাঙাল হরিনাথ মজুমদার**; বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।

৩। জলধর সেন — **কাঙাল হরিনাথ**, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩২০; দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩২১।

৪। প্রবীরকুমার দেবনাথ — **প্রসঙ্গ কাঙাল হরিনাথ**; মণ্ডল এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৯।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — হরিনাথ মজুমদার, **সাহিত্য সাধক চরিতমালা** - ৩৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫৪।

৬। মুনতাসীর মাসুন — **উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র**; প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫।

৭। যোগেশচন্দ্র বাগল — কাঙাল হরিনাথ; **ভারতকোষ**, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৬।

৮। অশোক চট্টোপাধ্যায় — উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হবিনাথ, **লেখক সমাবেশ**, জুন, ১৯৯৫, কলকাতা।

এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাঙাল হরিনাথের উপর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি ফরাসী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, ১৯০৭-১৯১৯

অমিয় ঘোষ

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে চরমপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে নানা গবেষণা হলেও বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি ফরাসী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষ চর্চা হয়নি। এই দিক থেকে বিচার করে ভারতীয় উপমহাদেশের ফরাসী উপনিবেশে বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও সে সম্পর্কে ফরাসী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, আলোচ্য সময়কালে বাংলায় ফরাসী উপনিবেশ বলতে চন্দননগর বোঝাতো। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র প্রবন্ধটি চারটি উপাখ্যানে বিভক্ত করা হয়েছে — (১) বাংলায় ফরাসী উপনিবেশ (১৭৫৭-১৯৪৭), (২) বাংলায় বিপ্লববাদ (১৯০৭-১৯২০), (৩) চন্দননগরে বাঙালী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড (৪) বিপ্লবীদের প্রতি ফরাসী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি।

বাংলায় ফরাসী উপনিবেশ (১৭৫৭-১৯৪৭)

২৩ শে মার্চ ১৭৫৭ খ্রীঃ, ১৩ দিন জল-স্থলে অবিরাম যুদ্ধের পর বাংলায় ফরাসীদের একমাত্র ঘাঁটি চন্দননগর ইংরেজদের করতলগত হয় এবং দীর্ঘ আটবছর চন্দননগর ইংরেজ অধীনে থাকার পর প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) সূত্রে ১৭৬৫ খ্রীঃ সেটি পুনরায় ফরাসীরা ফিরে পায়[১]। রবার্ট ক্লাইভ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রে বাংলায় যে রাজনৈতিক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন হেস্টিংস সেটি সম্পূর্ণ করেন। অন্যদিকে, 'ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার তুলে দেওয়ার ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগরে দেখা দেয় আর্থিক বিপর্যয়। ঘটনার গতিতে বাংলার রাজনীতিতে ফরাসীদের প্রয়োজনীয়তার দিনও শেষ হতে থাকে দ্রুতগতিতে। ইতিমধ্যে বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হলে (জুলাই, ১৭৮৯) সে সংবাদ এসে পৌঁছায় ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে (তিন মাস পর)[২]। চন্দননগরবাসী উত্তেজিত হয়ে তৎকালীন শাসক (কর্নেল দে মন্তিগ্রিঁও) ও তার সেনাদলকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৭৯০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে এক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে[৩]। (প্রাথমিক পর্যায়ে) ফরাসী বিপ্লবের পিছনে ইংরেজ সমর্থন থাকলেও লক্ষণীয় বিষয় হলো, ফরাসী উপনিবেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ কিন্তু ইংরেজ শাসকরা পছন্দ করতেন না। তৎকালীন ভারতে

ইংরেজ শাসক লর্ড কর্নওয়ালিশ বিপ্লবীদের কার্যকলাপে বিরক্ত ও শঙ্কিত হয়ে চন্দননগরের বিপ্লবী সরকারকে চরমপত্র দেন (৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৯০ খ্রীঃ)[৫৩]। কিন্তু প্রত্যক্ষ আক্রমণের জন্য ইংরেজবাহিনীকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। ইউরোপে মিলিত বাহিনী ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ১৭৯৩ খ্রীঃ ১১ জুন কলিকাতা থেকে এক বিশাল ইংরেজবাহিনী চন্দননগর আক্রমণ করে ও সহজেই দখল করে নেয়[৪]। ইউরোপের রাজনীতির পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে (১৮১৫ খ্রীঃ) দীর্ঘ ২২ বছর পর বাংলার ফরাসী উপনিবেশ পুনরায় ফিরে পায়।

ইতিমধ্যে ৮ মার্চ, ১৭৯০ খ্রীঃ ফরাসী 'জাতীয় সভা' চন্দননগর কমিটির উদ্দেশ্যে একটি 'ডিক্রী' জারী করে। এই অনুশাসনে ফরাসী উপনিবেশগুলি ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসার কথা বলা হয় এবং স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে শাসিত হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়[৫]। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেটি উপনিবেশে বাস্তবায়িত করা হয়নি। ভারতীয় ফরাসী উপনিবেশে গড়ে ওঠে একনায়কতন্ত্রী ও গণতন্ত্রের মধ্যবর্তী এক খিচুড়ি শাসন ব্যবস্থা। তারা না ছিল পার্লামেন্টের অধীনে না ছিল স্বাধীন, ছিল একটি কাউন্সিলের অধীনে। ২২ আগস্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ এক নির্দেশ বলে প্যারিসের জাতীয় সভায় দুইজন 'ডেপুটি' চন্দননগর ও পণ্ডীচেরী থেকে মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়। ফ্রেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর (১৮৪৮ খ্রীঃ) ভারতীয় উপনিবেশে কিছুটা গণতান্ত্রিক সুবিধা প্রদান করে (ডেপুটি নির্বাচন, বাক্ স্বাধীনতা ইত্যাদি)। অবশ্য এই সুযোগ প্রদানের পিছনে ছিল বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

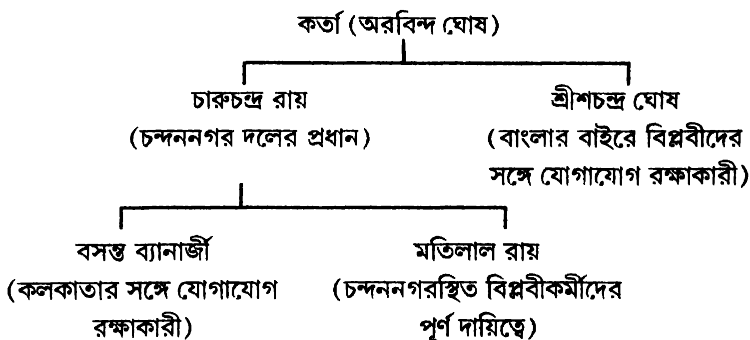
বাংলায় বিপ্লববাদ (১৯০৭-১৯১৯)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চিন্তার জগতে বিপ্লববাদের দ্রুত প্রসার ঘটতে দেখা যায়। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী ভারতীয় রাজনীতির এই চরমপন্থী মতবাদের সঙ্গে টয়েনবি কথিত 'আর্কেইজম্'-এর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন,[৫৬] ভ্যালেনটিন করল যাকে 'হিন্দুবিদ্রোহ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন, ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিতে যেটি 'আতঙ্কবাদ' ছাড়া অন্যকিছু ছিল না, বর্তমানে কিছু গবেষক বোমা পিস্তলের রাজনীতি ছাড়া বিপ্লববাদকে অন্যভাবে দেখতে অনিচ্ছুক — আমরা এ বিতর্কে এই মুহূর্তে প্রবেশ করতে চাইনা। সাধারণ ভারতবাসী মামুলি অর্থে বৈপ্লবিক আন্দোলন বলতে কি বুঝে থাকেন সে দৃষ্টিতে আমরা বিষয়টি দেখলে কালকে অস্বীকার করা হবে না। যাঁরা সেযুগে গুপ্তসমিতি গঠন করে এবং সশস্ত্র সংঘাতের পথে দেশকে ব্রিটিশ অকটোপাশ বন্ধন হতে মুক্ত করতে নির্বিকারে প্রাণবলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি বা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই দুঃসাহসী কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরাই দেশবাসীর কাছে বিপ্লবী ও তাঁদের কার্যাবলী বৈপ্লবিক আন্দোলন নামে পরিচিত।

এখনও পর্যন্ত ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের আত্মপ্রকাশের প্রথম ঘটনা হিসাবে মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের নেতৃত্বে রামোজি সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে (১৮৭৭-৭৮) চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপীয় বিপ্লবের সাহিত্যে খুঁজে চরমপন্থী মনোভাবাপন্ন নেতারা চরমপন্থার যৌক্তিকতা ও অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের কথা প্রমাণের চেষ্টা চালাতে থাকেন। মহারাষ্ট্রে তিলক ও পাঞ্জাবে লাজপত রায়ের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়লেও বাংলা প্রদেশে চরমপন্থীদের শিকড় ছড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত[৬]। 'সঞ্জীবনী সভা' দিয়ে যার সূত্রপাত 'অনুশীলন' (১৯০১), 'আত্মোন্নতি সমিতি' (১৮৯৭) 'সার্কেল অব ফ্রেণ্ডস্' (১৯০১) 'যুগান্তর' (১৯১০), ইত্যাদি গুপ্তসংগঠনগুলি ধীরে ধীরে গড়ে তোলে তার পূর্ণরূপ। বঙ্গভঙ্গের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী দলগুলোর কর্মচঞ্চলতা এনে দিয়েছিল। গভীরভাবে অনুধাবন করলে ভারতের চরমপন্থার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে, বিপ্লবী দলগুলো হিন্দু ধর্মের কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছিল তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে এবং ব্যক্তিহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির উপর দিয়েছিল বিশেষ গুরুত্ব। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯১০) সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে বৃহৎ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়[৭] (রাসবিহারীর প্রচেষ্টা ১৯১৫, জার্মানি থেকে অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা ও মাস্টারদা সূর্য সেনের বিদ্রোহ)। তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, বিপ্লবপন্থীদের সাম্যবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে গণআন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করছে (ভগত সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাব দল, শচীন সান্যালের নেতৃত্বে যুক্ত প্রদেশের দল, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে বিহারের দল ও রজতভূষণ দত্তের নেতৃত্বে বীরভূমে বিপ্লবীদের বড় অংশ)। যদিও বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য ছিল, কিন্তু সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের অবসান।

ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে বাঙালী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড

বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষকে আমরা সকলে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি। ইউরোপে অবস্থান কালে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, ইতালীর ঐক্য আন্দোলন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল আন্দোলন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হলেও তাঁর স্বপ্নের নগরী হয়ে ওঠে ফ্রান্স। ভারতবর্ষে ফিরে বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দ্বারা (আনন্দমঠ) তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তখন থেকে বাংলাই হয়ে ওঠে তাঁর স্বপ্নের ফ্রান্স। ১৯০৬ খ্রীঃ বিপ্লববাদের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বরোদা থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন[৮]। তাঁর অন্যতম সহযোগী বারীন্দ্র ঘোষ (ভাই) ১৯০৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে এসে সংগঠনের জন্য চারুচন্দ্র রায়কে নিযুক্ত করে যান। প্রথম দিকে 'অনুশীলন' দলের শাখা হিসাবে পরিচিত থাকলেও ১৯১১ খ্রীঃ পর 'চন্দননগর দল' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত 'চন্দননগর দল' অরবিন্দ ঘোষের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল এবং ভারতের অন্যান্য গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষা করা এই দলের বিশেষ কাজ ছিল। দলটি ছিল নিম্নরূপ (১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত)—



ব্রিটিশ পুলিশের কাছে চন্দননগরের বিপ্লবীদের তৈরী বোমা যেমন ছিল আতঙ্কের তেমনই চন্দননগরবাসী বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের দুঃসাহসিক কর্ম আজও আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি। রাসবিহারী বসু লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কর্মসূচী ও বোমাটি তৈরী হয়েছিল চন্দননগরে। এই ফরাসী উপনিবেশটিকে বাঙালী বিপ্লবীরা বোমা তৈরীর ঘাঁটি, পিস্তল সংগ্রহের স্থান ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল — এই তিন কাজে মূলত ব্যবহার করতেন। অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডীচেরীতে আশ্রয় গ্রহণের আগে চন্দননগরের কয়েকজন বিপ্লবী তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন[১০]। পণ্ডীচেরী থেকে অরবিন্দ ঘোষ বাংলার বিপ্লবীদের গোপন নির্দেশ পাঠাতেন ভায়া চন্দননগর হয়ে এবং এই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন চন্দননগরের নেতা মতিলাল যায়। তাই নানা দিক থেকে বাংলার এই ফরাসী উপনিবেশটি যেমন ছিল বিপ্লবীদের কাছে নিরাপদ ঘাঁটি, অন্যদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ছিল 'মাথাব্যথা'র কারণ। ফরাসী সরকার পরিস্থিতির সুযোগে এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে 'রাজনীতি' করতে দ্বিধা করেননি।

বিপ্লবীদের প্রতি ফরাসী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চন্দননগর ও পণ্ডীচেরী দুই ফরাসী উপনিবেশ বিপ্লবপ্রসূত কিছু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আস্বাদ পেতে শুরু করে। রাজনৈতিক সংগঠন, বাক্‌স্বাধীনতা ও প্রচার যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে কিছু না বলা হলেও (যদিও ফ্রান্সের জনগণ সে স্বাধীনতা পেয়ে আসছিল) চিরশত্রু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপ্লবীরা যখন সেগুলির রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু করেন, ফ্রান্স গণতন্ত্রের নামে সমর্থনই জানিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ফরাসী অধিকৃত ভারত থেকে ফরাসী পার্লামেন্টের জন্য দুই 'ডেপুটি' মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, চন্দননগরের 'মেয়র' পদটিও ছিল নির্বাচিত। চন্দননগরে ইউরোপীয়রা ছিল সংখ্যালঘু, নির্বাচনের জয় পরাজয় নির্ভর করত বাঙালীদের ভোটের উপর। 'ভোটের রাজনীতি'র প্রশ্নে বাঙালী বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপকে ফরাসী কর্তৃপক্ষ মৌন সমর্থন জানাতো।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ ১৯০৮ খ্রীঃ ইংরেজ গোয়েন্দার দল চন্দননগর দলের সংবাদ জানাব পব মেয়রের সাহায্য প্রার্থনা করলেও বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড দমনের অনুরোধ জানালে তান্দির্ভাল ইংরেজ অফিসারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেনঃ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন যেহেতু বাঙালীদের ভোটের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু আমাদের করার বিশেষ কিছু নেই[১১]। তৃতীয়ত, ফরাসী উপনিবেশে আইন অনুসারে আগ্নেয় অস্ত্র রাখা কোন দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলনা, ছিলনা সেখানে অস্ত্রের লাইসেন্স প্রথা। ফরাসী ডাকঘর মারফত বিপ্লবীরা বিনা বাধায় বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতেন। ইংরেজ সরকারের চাপে ১৯০৭ খ্রীঃ ফরাসী উপনিবেশে আগ্নেয় অস্ত্রের লাইসেন্স প্রথা চালু করা হলে ফরাসী. ও তামিল জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তোলে, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি কার্যকর হতে পারেনি[১২]। চতুর্থত, ফবাসী রাজ্যে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া গ্রেপ্তার করা ছিল আইন বিরুদ্ধ। রাজনৈতিক কারণে চারুচন্দ্র রায়কে ইংরেজ পুলিশ গ্রেপ্তার করলে (১৯০৮) ফরাসী পার্লামেন্টে ভারতীয় উপনিবেশ থেকে নির্বাচিত 'ডেপুটি'রা প্রশ্ন তোলে। ফরাসী বিদেশ দপ্তরের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পুলিশ চারুচন্দ্র রায়কে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়[১৩]। সুতরাং আলোচ্য রাজনৈতিক সুবিধাগুলোব জন্য যেমন চন্দননগর ও পণ্ডীচেরীকে বিপ্লবীরা নিবাপদ ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করতে থাকেন, অন্যদিকে ইংরেজ গোয়েন্দাব দল ফরাসী উপনিবেশে বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারলেও কার্যকবী ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয়।

মূলত দুটি প্রধান ঘটনা ফরাসী উপনিবেশে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারকে বিচলিত করে — (১) ১৯০৮ খ্রীঃ চন্দননগরের সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় (যাঁর সব সভ্যই ছিল বিপ্লবী) বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে এক প্রকাশ্য অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজ গোয়েন্দার চাপে চন্দননগরের তৎকালীন মেয়র তান্দির্ভাল সভা বন্ধের নির্দেশ দেন[১৩]। বিপ্লবীরা মেয়রের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন। তান্দির্ভাল পরদিন পণ্ডীচেরীতে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কয়েকদিন পর পণ্ডীচেরী থেকে ফরাসী গভর্নর চন্দননগরে আসেন। তিনি বোমানিক্ষেপকারী নগেন্দ্র বসুকে মুক্তি দেন এবং সভার অনুমতি দেন। ফরাসী গভর্নরের এই আচরণে ইংরেজ গোয়েন্দা দল ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। (২) ১৯১১ খ্রীঃ 'ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলা' র দুই রাজসাক্ষী গোপাল মুখার্জ্জী ও নরেন ব্যানার্জ্জী চন্দননগর দলের নানা গোপন তথ্য ইংরেজ গোয়েন্দাদের জানিয়ে দেয়। গোয়েন্দা দল তদন্তের সূত্রে জানতে পারে যে, মতিলাল রায়ের বাড়িতে বোমা তৈরীর কারখানা রয়েছে এবং অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে (তখন পণ্ডীচেরীতে) শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও মতিলাল রায় 'স্বদেশী স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী' মারফত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ খ্রীঃ ২৫ এপ্রিল আই. জি. (পুলিশ) ফরাসী শাসক গঁসিয়ের কাছে চিঠিতে বিষয়টি অবগত করলে গঁসিয়ে উত্তরে জানানঃ 'ফরাসী এলাকায় ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা চলেছে এবং এজন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিরূপায়' .....[১৫]। চিঠির পাশে আই.

জি. (পুলিশ) নোট দিচ্ছেন "......his hands were to a great extent tied by the political conditions prevailing in Chandernagore.[১৫(ক)]" সামগ্রিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর বাংলা সরকার এই সিদ্ধান্তে আসেন, আন্তর্জাতিক স্তরে কোন সিদ্ধান্ত ব্যতীত ফরাসী উপনিবেশে বিপ্লবীদের প্রতি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। অতঃপর বৈদেশিক দপ্তরের সাহায্যে ইংরেজ সরকার ফরাসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী হয়।

ভারত সরকারের মহাফেজখানা ও চন্দননগরস্থিত 'ফরাসী ইনস্টিটিউট'-এর নথিপত্র থেকে জানতে পারা যাচ্ছে, ১৯০৯ খ্রীঃ থেকেই ইংরেজ সরকার নানা প্রস্তাব ফরাসী বিদেশ দপ্তরকে দিয়ে আসছিল। ১৯০৯ খ্রীঃ ৪ এপ্রিল এক চিঠিতে ব্রিটিশ সরকার নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করে ঃ—

১। 'ব্রিটিশভারতে সমস্যা সৃষ্টিকারী চন্দননগর ও পণ্ডীচেরী এই দুই ফরাসী এলাকা ইউরোপে কিছু ব্রিটিশ রাজ্যাংশের বিনিময়ে ইংরেজদের হস্তান্তর করা হোক।

২। যদি না হয়, চন্দননগর ও অন্য ভারতীয় ফরাসী উপনিবেশ ইংরেজ সরকারের কাছে ইজারা দেওয়া হোক।

৩। যদি না হয়, ১৮১৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসীচুক্তি পুনঃপ্রবর্তন করা হোক।

৪। অস্ত্র ও বিস্ফোরন দ্রব্য বিপ্লবীরা ফরাসী রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, সেগুলির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক[১৬]'।

লণ্ডনস্থিত সেক্রেটারী অব স্টেট অফিসের কর্তারা এ বিষয়ে ফরাসী বিদেশ দপ্তরেব সঙ্গে যোগাযোগ করলে (ডেসপ্যাচ নং ১০৭, তারিখ - ৪ আগস্ট, ১৯১০) ফরাসী সরকার আগামী পার্লামেণ্ট নির্বাচন না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে বলে[১৭]। ১৯১২ খ্রীঃ নির্বাচন শেষে ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, বিপ্লবীদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে কি কি বিষয়ে ফরাসী সরকার সাহায্য করতে পারবে[১৮] —

ক) ফরাসী পুলিশ এখন থেকে বিপ্লবীদেব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করবে;

খ) ব্রিটিশ ও ফরাসী পুলিশ এখন থেকে নিয়মিত তথ্য বিনিময় করবে এবং প্রতি পনের দিন অন্তর বিপ্লবীদেব কাজকর্মের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে;

গ) চন্দননগর ও পণ্ডীচেরীর বিপ্লবীদের ফরাসী নাগরিকত্ব নিয়ে ফরাসী সরকাব প্রশ্ন তুলবে না।

ফরাসী সরকারের এই লিখিত প্রতিশ্রুতি ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উৎসাহিত ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের পদস্থ অফিসার চার্লস টেগার্ট চন্দননগরে অবস্থানরত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে 'নোট অন দি চান্দরনগর গ্যাং' (১৯১৩) শিরোনামে এক গোপন রিপোর্ট তৈরী করেন[১৯]। এই রিপোর্টে চন্দননগর ও পণ্ডীচেরীতে অবস্থানরত বাঙালী চরমপন্থীদের রাজনৈতিক কার্যাবলী

দুঃখের বিষয় হলো, ফরাসী সরকার উপনিবেশ রাজ্যে (ভারতবর্ষে) মুক্তিকামীদের প্রতি কতখানি সহানুভূতিশীল ছিলেন সেটি আজ প্রশ্নের মুখোমুখি। ইতিহাস আজ সে নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার জন্য মুক্তিকামী জাতীর আশা-আকাঙ্খাকে পদদলিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি ফ্রান্সের মতো দেশও। 'স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির ট্রাজেডি সেখানেই।

সূত্র নির্দেশ

১। **প্রবর্ত্তক** (পত্রিকা) — চন্দননগর, বৈশাখ, ১৩৩১, পৃঃ ২০১-২১৭

২। Calcutta Review _ Vol C IX 1899. p 287

৩। ১৭৯০ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে চন্দননগরের বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন নাগরিকরা এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে একটি বিপ্লবী কমিটি গঠন করে। একজন প্রেসিডেন্ট (দেভেরেন) একজন সম্পাদক (দেনেভিল) ও আটজন সদস্য নিয়ে নবগঠিত 'এসেম্বলি জেনারেল' তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কর্মসূচী তৈরী করে — (ক) চন্দননগরের নিরাপত্তার জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সেনাদল গঠন, (খ) বিদেশী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও (গ) চন্দননগরের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির জন্য পরিকল্পনা তৈরী।

৩ক। **Bengal Past and Present** - Calcutta. Vol XVI. Part - II p 123

৪। **Calcutta Gazette** - Vol II. p 372 (1793)

৫। **প্রবর্ত্তক** — বৈশাখ, ১৩৩১, পৃঃ ২১৫

৫ক। Amalesh Tripathi - **The Extremist Challenge**. Calcutta 1967. p 1

৬। D M Laushey - **Bengal Terrorism and the Marxit Left**. 1905-1942 Calcutta. 1975. p 1

৭। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ — **ভারত কোন্ পথে?** কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃঃ ৫১-৫৪

৮। পশুপতি ভট্টাচার্য — **বাংলার মহাপুরুষ**, কলিকাতা

৯। Govt of Bengal. Home/Pol. File No 190/1911

১০। সংঘগুরু শ্রীমতিলাল — **জীবনসঙ্গিনী**, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১০৪

১১। Govt of Bengal. Home/Pol (Conf) File No 171/1915. p.3

১২। **তদেব**, পৃঃ ৯

১৩। **তদেব**, পৃঃ ১০

১৪। Govt of Bengal. Home/Pol (Conf). File No 171/1915. p 5

১৫। Govt of Bengal. Home/Pol (Conf) File No. 28-29/1912

১৫ক। **তদেব**

১৬। Govt. of India. Home/Pol.(Secret) 29/1912/Part-A

১৭। **তদেব**

বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার যে বিভিন্ন রিপোর্ট সংগ্রহ সেগুলি যথাক্রমে :

ক) F.C. Dally - **Note on the Growth of the Revolutionary Movement in Bengal, 1911**

খ) C. Tegart - **Note on the Chandernagore Gang,** 1913

গ) J C Nixon - **On Account of the Revolutionary Organization in Bengal other than Dacca Anushilam Samiti,** 1917

ঘ) S A T Rawlatt - **Sedition Committee Report, 1918**

১৮। Govt of India Home/Pol (Proceedings) File No 29/May 1912

১৯। C Tegart - **Note on the Chandernagore Gang** (Report) 1913

২০। Govt of India Home/Pol File No 145/1915

২১। **তদেব**

২২। Govt of India Home/Pol File No 45/Jan /1915

২৩। রাসবিহারী বসু — কলিকাতা হইতে টোকিও (প্রবন্ধ) প্রকাশিত **প্রবর্তক**, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, পৃঃ ২৭১-২৭৩

২৪। চিঠি — মতিলালকে অরবিন্দ ঘোষের লেখা পত্র সংখ্যা ১৮, প্রবর্তক সংগ্রহশালা, চন্দননগর

২৫। Govt of India Home/Pol File No 626/C/1916

২৬। Govt of India Home/Pol File No 37/1925 (C)

২৭। মতিলাল রায় — **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** কলিকাতা ১৯৮৪ (সং) পৃঃ ১১২

ঔপনিবেশিক যুগে প্রথম দুটি সর্বভারতীয় বন আইনের প্রেক্ষাপটে দার্জিলিঙে বনব্যবস্থা

দিগন্ত চক্রবর্তী
রত্না রায় সান্যাল

ইংরেজরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনসংরক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ নয়। জার্মান বন কর্মচারীদের কাছ থেকেই তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রথম পাঠ নিতে হয়েছিল[১]। বনসংরক্ষণ বিষয়ে প্রাচীন ভারত যথেষ্ট সচেতন ছিল। বনের অর্থনৈতিক মূল্যও তাদের অজানা ছিল না। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে এবং গৌতম বুদ্ধের যুগেও বনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস যাতে না করা হয় সেজন্য ১৮ রকমের অরণ্য সম্পর্কিত আইনের কথা অর্থশাস্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে[২]। মৌর্যদের বনের পশুদের প্রতি মমতা ও বনের কাঠের বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে সচেতনতার ইঙ্গিত দেয়[৩]।

ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক, পহ্লব বা কুষাণরা বন ব্যাপারে কিছু ভেবেছে বলে শোনা যায় না। আর সুলতানি ও মুঘলযুগে কৃষিজমি বৃদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য। বন নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময় তেমন নেই[৪]। তবে সামান্য কিছু চিন্তাভাবনা যে মুঘলরা করেনি তা নয়। কাঠের ওজনের ওপর ভিত্তি করে ৭২ ধরনের কাঠের বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে তারা যে ওয়াকিবহাল ছিল তা বোঝা যায় আইনি আকবরী গ্রন্থ থেকে[৫]। মুঘল উত্তর যুগে হায়দার আলি ও টিপু সুলতান নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেগুন গাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন[৬]। আরবদের চাহিদা মেটাবার জন্যও টিপু সুলতান সেগুন বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন[৭]। এটা ছিল একেবারেই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর সংস্পর্শে আসার পর ইংরেজরা টিপু সুলতানের পথ ধরেই সেগুন বন সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করে। এছাড়া সামরিক দিকও তাদের বনসংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। বৃটেনের রাজকীয় নৌবহরের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ দরকার ছিল। নিজেদের দেশে সেই ওক্ কাঠের বন সংরক্ষণের অভাবে শেষ হয়ে যাওয়ায় তাদের নজর পড়ে ভারতীয় উপনিবেশের কাঠের ওপর। ওকের বদলি কাঠ হিসেবে সেগুন যে ব্যবহার করা যায়, তা তারা শিখেছিল সম্ভবত আরবদের কাছ থেকে[৮]।

বনের ওপর লোভ থাকলেও বনসংরক্ষণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইংরেজদের জানা ছিল না। জানলে নিজেদের দেশের ওক্ কাঠের বন ধ্বংস হয়ে যেত না। তাই বন সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হাতেকলমে জানার জন্য তারা জার্মান বন বিশেষজ্ঞ স্যার ডিয়েট্রিচ ব্র্যাণ্ডিসকে নিয়োগ করেন। এই ব্র্যাণ্ডিস ব্রহ্মদেশে কাজ করে বনসংরক্ষণের একটা রূপরেখা তৈরী করেন। পদ্ধতি স্থির হয়ে যাওয়ার পর বন সংরক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজরা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। কলকাতা বন্দরে তখনও প্রয়োজনীয় কাঠ আনা হত মূলতঃ বিদেশ থেকে[৮]। উত্তর ভারত থেকে নিচু মানের সামান্য কাঠ আসত। ভারতে রেলগাড়ির জন্য স্লিপার, জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র, প্যাকিং বাক্স, দেশী নৌকো, কাঠকয়লাা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য কাঠ দরকার। চাহিদা বাড়ছে কিন্তু যোগান নেই। বন আছে কিন্তু ইংরেজরা জানে না প্রয়োজনীয় কাঠ বনে আছে কিনা, থাকলেও তার পরিমাণ কি। ১৮৬২ পর্যন্ত বাংলার বন বিষয়ে ইংরেজদের অজ্ঞতা সত্যিই বিস্ময়কর। ডিয়েট্রিচ ব্র্যাণ্ডিস এবং কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের তৎকালীন পরিদর্শক টি. অ্যাণ্ডারসন বাংলার বনসংরক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করেন।

E. P. Stebbing তাঁর **The Forests of India** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বারবারই উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার বনসংরক্ষণ ব্যবসার সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ সিকিমে। এই ব্রিটিশ সিকিম কথাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং এই ব্যাখ্য থেকেই পরিষ্কার হবে কীভাবে দার্জিলিঙের বনসম্পদ ইংরেজদের আয়ত্তে এল। ১৮১৪-১৭র নেপাল যুদ্ধের সূত্র ধরে সিকিমের যে অঞ্চল নেপালিরা অধিকার করে নিয়েছিল তিতালিয়ার চুক্তিতে সে অঞ্চল সিকিমের রাজা ফেরত পায়। এই চুক্তিতে একটি শর্ত রাখা হয়েছিল যে, এরপর নেপাল ও সিকিমের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সমস্যা সমাধানে ইংরেজদের মধ্যস্থতা মেনে নিতে হবে। ১৮২৭র সীমান্ত নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে Captain Lioyd ও মালদার ইংরেজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি J. W. Grant বিনচিনপঙ্ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং দার্জিলিং গ্রামটি দেখে আকৃষ্ট হন। এরপর কৃতজ্ঞ রাজার কাছ থেকে কৌশলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিনা শর্তে দার্জিলিং ইংরেজরা উপহার পায। পরে অবশ্য দয়া পরবশ হয়ে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইসূত্রে ইংরেজদের হাতে এল বড় রঙ্গীত নদীর দক্ষিণের সমস্ত পাহাড়; বালাসন, কাহাইল ও ছোট রঙ্গীত নদীর পূর্ব অঞ্চল এবং রুন্‌গনো ও মহানদীর (মহানন্দা) পশ্চিম অঞ্চল। এই অঞ্চলকেই E. P. Stebbing বৃটিশ সিকিম বলে উল্লেখ করেছেন আর **A Satistical Account of Bengal** এ Hunter একে দার্জিলিং পাহাড় এবং বৃটিশ সিকিম এই দুভাবেই উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলের মধ্যে কার্শিয়াং অঞ্চলও ছিল। এভাবেই ১৩৮ বর্গমাইল নিয়ে বৃটিশ-সিকিম হল[১০]। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অচিরেই ইংরেজরা বুঝতে পারল। কিন্তু ১৮৩৫-এ উত্তর বাংলার যে অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে ছিল এবং দার্জিলিঙের যে অঞ্চল পেল তার মাঝখানে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজনে সিকিম-তরাই তাদের দরকার ছিল। তাই ১৮৫০-এ কৌশলে সিকিম-তরাই তারা দখল করে নিল। এ সূত্রে

ইংরেজদের হাতে এল উত্তরে বাল্মান এবং বড় রঙ্গীত নদী, পূর্বে তিস্তা এবং পশ্চিমের নেপাল সীমান্ত দিয়ে ঘেরা অঞ্চল। এই সূত্রে ৬৪০ বর্গমাইল বৃটিশ সিকিমের সাথে যুক্ত হল[১১]। এরপর তাদের চোখ পড়ল তিস্তার পূর্ব দিকে কালিম্পং অঞ্চলে। এ জায়গাটাও একসময় সিকিমের ছিল। ১৭৬০-এ ভূটান কেড়ে নেয়। এ অঞ্চলটি অর্থনৈতিক কারণে ইংরেজদের প্রয়োজন হওয়ায় নানা অজুহাতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে কালিম্পঙ ইংরেজরা দখল করে। এই ভাবে বৃটিশ-সিকিম বর্তমান দার্জিলিং জেলায় রূপান্তরিত হল। Arthur Jules Dash থেকে আরম্ভ করে E.P. Stebbing পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ সবাই উল্লেখ করেছেন যে, এই অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল বনাঞ্চলে আবৃত ছিল। উচ্চ অঞ্চল থেকে নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত মাটি ও আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী বিচিত্র ধরনের গাছ ছিল। এত অল্প জায়গায় এত বিচিত্র ধরনের গাছ খুব কম অঞ্চলেই দেখা যায়। ফার, রডোডেনড্রন, বাঁশ, চেস্টনাট, ম্যাপল, ওক্, ম্যাগনোলিয়া, লরেল, বার্চ, অ্যালডার, পিপলি, তুন, চাপ, ফালাট, কাটুস, ওয়ালনাট এবং সর্বোপরি শাল এবং সাভানা ঘাস এ অঞ্চলে প্রচুর ছিল[১২]। ১৮৩৬ সালে লয়েডও এ অঞ্চলে প্রচুর বন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন[১২] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইংরেজরা এ অঞ্চল অধিকার করার পরই বনাঞ্চল অদৃশ্য হতে থাকে। E. P. Stebbing বারবারই বোঝাতে চান যে, ইংরেজরাই বনসংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে বনরক্ষা করেছে। ১৮৩৬-এ লয়েড যে অঞ্চলে প্রচুর বন দেখেছিলেন ১৮৬৩-তে সে অঞ্চলেই বন হালকা হয়ে এসেছে বলে ইংরেজদের পরিবেশিত তথ্যেই উল্লেখ করা হচ্ছে। তাহলে ১৮৩৬ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে বৃটিশ সিকিমে যে বন উধাও হয়ে যাচ্ছে তার জন্য দায়িত্ব ইংরেজদের ওপর বর্তায়। বিষয়টি একেবারেই ফাঁস করে দিয়েছেন E.C. Dozey তাঁর **'A Concise History of Darjeeling District Since 1835'** গ্রন্থে (1916)। তিনি লিখেছেন যে, এই অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বন অদৃশ্য হতে থাকে। E.C. Dozey লিখেছেন "..........and so for many years their sole aim was to expedite their conversion into timber in order to lay our the clearings as tea estates or cultivated lord; infact reckless exploitation ran riot."[১৩]। ইংরেজরা সপ্তদশ শতাব্দীর আগে থেকেই চীন ও ফরমোসাতে যে চা চাষ হত, তার খবর রাখত। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ডাচরা প্রথম ইওরোপে চা নিয়ে যায় এবং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে Thomas Garraway প্রথম ইংলণ্ডে চা পরিবেশন করে। ১৮৩৯-এ আসাম কোম্পানী প্রথম ভারতে চায়ের ব্যবসা শুরু করে। ফলে ১৮৩৫ এ ইংরেজরা যখন বৃটিশ-সিকিম সিকিমের রাজার কাছ থেকে নেয়, তখন তাদের মাথায় চা বাগান ছিল না — একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তারা দার্জিলিঙে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে চায়[১৪]। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যও তো এই দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে থাকতে পারে। দার্জিলিং নেওয়ার পেছনে পরিকল্পনা থাকলে এত দ্রুত এ বন ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হত না। ঝুম চাষের যে অজুহাত ইংরেজরা দিয়ে থাকে তা যদি সত্য হত, তাহলে ১৮৩৬-এ অত বন থাকে কী করে? নিজেদের ত্রুটি ঢাকতেই ঝুম চাষের অজুহাত খাড়া করে স্থানীয় লোকেরাই বন ধ্বংসের জন্য দায়ী বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যের

স্ববিরোধিতাই সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

১৮৬২ থেকেই ইংরেজরা বাংলার বন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল — এই সূত্রে বৃটিশ-সিকিমও তাদের মাথায় ভালভাবেই ছিল। বৃটিশ-সিকিম থেকেই তাদের বনশাসন ও সংরক্ষণের সূচনা। তবুও সেটাই ছিল প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মত। বনের ব্যাপারে ব্র্যাণ্ডিস প্রস্তাবিত নীতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত অ্যাণ্ডারসনের ১৮৬৪-র অক্টোবরের প্রথম স্মারকলিপির প্রতিটি শব্দে ইংরেজদের বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে বৃটিশ-সিকিম ও হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলের (Lower Provincess) অস্থায়ী বনসংরক্ষক নিয়োগ করা হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে স্থায়ী করা হয় এবং বনবিভাগের একটি কার্যালয় দার্জিলিঙে স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়[১৬]। এই অ্যাণ্ডারসনই বনদপ্তরের প্রথম বাজেট তৈরী করেন। আবার তিনিই প্রথম ১৮৬৪-৬৫ সালে বন শাসনের প্রথম অগ্রগতির বিবরণ রচনা করেন। ১৮৬৪ সালের আগস্ট মাস থেকে বাংলার বনসংরক্ষণ শুরু হয়[১৭]। কলকাতায় বনসংরক্ষণের অফিস স্থাপিত হয় ১৮৬৬ সালের জানুয়ারীর মাসে। ইতিমধ্যে আসামে রেল ব্যবস্থা সম্প্রসারণে শাল কাঠের স্লিপারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় ভাবনাচিন্তা চলছিল। তখনই ভারতে প্রথম অরণ্য সম্পর্কিত সর্বভারতীয় আইন পাশ হল। এটা ১৮৬৫ সালের ঘটনা। এই আইনে বলা হল যে, বড় বড় বৃক্ষের বন এবং ঝোপজঙ্গল এখন থেকে সরকারি বনাঞ্চলে রূপান্তরিত করা যাবে। তবে এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বনের ওপর যে অধিকার বর্তমান আছে তা কেড়ে নেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, এখন থেকে বন সংরক্ষণের জন্য প্রদেশে প্রদেশে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করা যাবে, তবে সর্বভারতীয় আইনের প্রেক্ষিতে তা করতে হবে। তৃতীয়ত, আইন ভঙ্গকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। এরই বেশ কিছুকাল পরে ১৮৭৮ সালে বন সম্পকিত ব্যাপক আইন তৈরী হয়। এই আইনে বনকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বনশাসনের ক্ষেত্রে সারা ভারতে একই পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা করা হয়। বনের শ্রেণীবিভাগ হল —(ক) সরকারিভাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, (খ) সুরক্ষিত বন এবং (গ) বনবাসী অধ্যুষিত বন। এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল বনের ওপর মানুষের অধিকারের ভিত্তিতে। সরকারিভাবে সংরক্ষিত বলে মানুষের ইচ্ছামত প্রবেশের ও গাছ কাটার অধিকার অস্বীকার করা হল। সুরক্ষিত বলে মানুষের প্রবেশাধিকার মেনে নেওয়া হলেও সরকারের অনুমোদনের পরই গাছ কাটার অধিকার দেওয়া হল। বনবাসী অধ্যুষিত বলে গোষ্ঠীর সাংসারিক প্রয়োজনীয় গাছ কাটার অধিকার মেনে নেওয়া হল। এই বন থেকে কাঠ কেটে ব্যবসা করা চলত না। এই আইনে বনবিভাগে নানা পদ সৃষ্টি করে বনদপ্তরে আমলাতন্ত্রের সূচনা করা হয় এবং স্থানীয়ভাবে গ্রামবাসীদের নিরস্ত করে বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারত সরকার এই দুটি আইন জনগণের স্বার্থেই করা হল বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে তা ইংরেজদের অর্থনৈতিক সুবিধার দিকে তাকিয়েই করা হল। প্রথমত, এই বননীতি বনকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করল। ইংলণ্ডের

শিল্প বিপ্লবকে সহায়তা করার জন্য বনকে কাঁচামালের মূল্যবান উৎস হিসেবে গণ্য করা হল[১]। দ্বিতীয়ত, এই বননীতি থেকে বোঝা যায় যে, বনশাসন এখন থেকে জনগণের জন্য করা হচ্ছে না, জনগণকে বন থেকে দূবে রাখার জন্যই করা হচ্ছে। ভারতের নানা স্থান থেকে এই আইনেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হওয়া থেকেও জনগণের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়। তৃতীয়ত, এই বননীতি প্রকৃতপক্ষে সরকারকে সরাসরি বনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেয় এবং কালক্রমে তা প্রতিষ্ঠানগতভাবে হস্তক্ষেপের পথে অগ্রসর হয়। এই পর্যায়েই সরকার আর বনের সাথে জনগণের যোগাযোগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার ভূমিকায় না থেকে একেবারে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চলে যাবে। চতুর্থত, বনকে বাণিজ্যিক মানদণ্ডে দেখা শুরু হওয়াতে বন এখন থেকে অর্থনীতির এলাকাভুক্ত হয়ে যাবে। এখন থেকে অর্থনীতিকে দৃঢ়তর ও আধুনিক করার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা বন সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ দেখাতে শুরু করবে। অন্যদিকে, যারা ঐতিহ্যগতভাবে একদা বনের মালিক ছিল তারা বনশ্রমিকে পরিণত হবে। রেনু খাটোর লিখেছেন "Forests thus provided a rich ground for the extension of capitalism and imperialism."

এই দুটি আইনের পটভূমিতে দার্জিলিঙে বন স্থাপন ব্যবস্থার ক্রমপর্যায় লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১৮৬৫-র বন আইন পাশের বছর অ্যাণ্ডারসন বাংলা সরকারের সেক্রেটারির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার প্রশাসনিক বিভাগগুলির কমিশনারদের কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন উক্ত সেক্রেটারিকে পাঠান, আর সেক্রেটারি অক্টোবর মাসে বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে এই চিঠির ভূমিকা লিখে পাঠান[১১]। এই চিঠিতে বন সম্পর্কে নানা ধরনের সংবাদাদি চাওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি বিভাগীয় অঞ্চলে বনের ধরন ও এলাকা, কোন ধরনের বনসংরক্ষণ চালু আছে কিনা, বনের মালিকানা কার এবং কী ধরনের গাছ পাওয়া যায়, বন থেকে কোন ধরনের রাজস্ব পাওয়া যায় কিনা, কোন বন ইজারা দেওয়া আছে কিনা, থাকলে তার শর্ত কী, গঙ্গা ছাড়া বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির মাধ্যমে কাঠ ভাসিয়ে আনা যাবে কিনা, কী দামে কাঠ স্থানীয় বাজারে বিক্রী হয়, কী ধরনের জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় এবং কী দামে তা বিক্রী হয়, কাঠ ও বাঁশ কাটার অধিকার গ্রামবাসীদের দেওয়া আছে কিনা, বনাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে আছে কিনা, বনাঞ্চলে ঝুম চাষের প্রথা প্রচলিত আছে কিনা —এই প্রশ্ন গুলি বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে রাখা হয়। তৎকালীন বাংলার সমস্ত বিভাগ থেকেই এর উত্তর আসে এবং বাংলার বনচিত্র অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে।

দার্জিলিং তখন ভাগলপুর প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভাগলপুরের কমিশনার এর উত্তরে তার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫ সালের চিঠিতে বনসংরক্ষককে (অ্যাণ্ডারসন) জানাচ্ছেন যে, তরাই অঞ্চলে ভাল সংখ্যক শাল গাছ আছে এবং নদীর ধারে ধারে কিছু শিশু গাছও আছে। নিম্ন তরাই অঞ্চলে ১২,০০০ একর এলাকায় শাল বন থাকলেও মূল্যহীন গাছও অনেক আছে। উচ্চ তরাই অঞ্চলে ৫০,০০০ একর এলাকা বনাঞ্চল এবং এখানেও মূল্যবান গাছ কম বলেই তার অনুমান। তবে রঙ্গীত নদীর পাড়ে ২ থেকে ৩ হাজার একর জমি খুবই দামী শাল গাছে আবৃত। এই এলাকার একটা অংশ

মেজর ওয়াড্রপারকে ১৫ বছরের জন্য নিষ্কর লিজ দেওয়া হয়েছে। শর্ত একটাই যে, লিজ নেওয়ার ১০ বছরের মধ্যে লিজভুক্ত জমির এক পঞ্চমাংশ কৃষিজমিতে (চা বাগান?) রূপান্তরিত করতে হবে। এই লিজ দেওয়া হয়েছে ১৮৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর। ছোট রঙ্গীত ও বড় রঙ্গীতের সঙ্গমস্থল থেকে এই অঞ্চল ৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। ১২০০ একর জমি এই লিজের অধীন ছিল। এই অঞ্চলের বাকি শাল বনাঞ্চল মিঃ বার্নসের লিজের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সবটা তার লিজের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে, ঐ শালবনের কিছুটা সরকারের অধিকারে পাওয়া যেতে পারে। তিনি আরও জানাচ্ছেন যে সাম্প্রতিক একটি আদেশ বলে ৬,৫০০ ফুটের ওপরের বনাঞ্চল কাঠের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। তিনি জানাচ্ছেন যে, ঠিকমতো হিসেব করা না গেলেও ৬০ থেকে ৮০ হাজার একর বনাঞ্চল এভাবে সংরক্ষণ করা গেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, দার্জিলিঙের সবটাই সরকারি সম্পত্তি। দার্জিলিঙে সামন্তপ্রথা বা জমিদারীপ্রথা না থাকায় বনসংরক্ষণের সুবিধা হল। প্রশ্নের উত্তরে আরো জানা গেল যে ১৮৬৫ সালের আগে থেকেই দার্জিলিঙে বনসংরক্ষণ ব্যবস্থার শুরু হয়েছে। এছাড়া জানা গেল যে রেলপথের জন্য স্লিপার ও কাঠ একমাত্র মহানদী দিয়ে ভাসিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে। এই উত্তর থেকে আরো জানা গেল যে ভাগলপুরের শহুরাঘাট, ভাগলপুর সদর, কোলগঙ্গা, কোলেহাট, উমরপুর, মহাদেব, খড়কপুর, কল্যাণপুর, সুলতানগঞ্জে কাঠের বাজার আছে। আর পূর্ণিয়াতে কাঠের বাজারের নাম তালপুয়া, গুঞ্জরমারি, রাইসা, রামপুর, বুঁদেশুরি, মীরগঞ্জ ও সোনাপুর।

অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়েছে ঘুম পাহাড় ও সিঞ্চল বনাঞ্চল জ্বালানি কাঠেব জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এই সম্পত্তির মালিক পৌরসভা। ঝুম চাষের ক্ষেত্রে দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার বিভাগীয় কমিশনারকে জানিয়েছেন যে পাহাড়ে ঝুম চাষের পদ্ধতি চালু থাকলেও তা বনাঞ্চলের কোন ক্ষতি করেনা। শুধু যেখানে চাষবাস হয় সেখানেই এটা করা হয় এবং দার্জিলিঙের জোলো আবহাওয়ার জন্য সে আগুন ছড়াতে পারেনা। আর লিজ্ অঞ্চলে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তরাই অঞ্চলে গোচারণভূমির মালিকরা ঘাস পোড়ায়। তবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘাস পোড়ানোর পর আবার যে কচি কচি নতুন ঘাস গজায় তা গরু মোষের খাদ্য হয়ে থাকে। তবে এই আগুন তরাই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে কাঠের ক্ষতি করে এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে শালগাছ ছোটখাটই থেকে যায় — গাছের বৃদ্ধি নষ্ট হয়[২০]।

বিভাগীয় কমিশনারের এই প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হলেও কয়েকটি বিষয়ে ধন্দ থেকে যায়। প্রথমত, বৃটিশ সিকিম অঞ্চলে জমিদারি প্রথা না থাকায় বন অধিগ্রহণে সরকারের সুবিধা হয়েছে। বাংলার অন্যত্র এ ব্যাপারে যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তা এখানে দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই বৃটিশ সিকিমে সরকার প্রথম সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিবেদনে কোথাও বলা হয়নি যে বৃটিশ সিকিম বা তরাইতে বন ধ্বংস হয়ে গেছে। তরাইতে কিছু অঞ্চলে ঘাস পোড়ানোর ফলে কিছু শাল গাছের ক্ষতি হলেও পাহাড়ী অঞ্চলে ঝুম চাষের ফলে বনের

ক্ষতি হয়নি। ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে বন না আসাতে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যে বন গেল গেল রব তুলেছেন তা কিন্তু দার্জিলিঙের প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ করেনা। তৃতীয়ত, ব্রহ্মদেশে মিঃ কলভিন ১৮৪১ সালে যে লিজ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন তা লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলী সমর্থন করেননি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই লিজ ব্যবস্থা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙে চালু হল। চতুর্থত, মহানদী দিয়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই কাঠ সমতলে আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই কাঠ কোথায় যেত তা প্রতিবেদনে পরিষ্কার নয়। ওদিকে পূর্ণিয়াতে ও ভাগলপুরে কাঠের অনেকগুলি বাজারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাঠ কি তাহলে পূর্ণিয়ার বাজার হয়ে কলকাতায় যেত? আর এই কাঠের ব্যবসার সাথে কারাই বা যুক্ত ছিল তাও পরিষ্কার নয়। তিস্তা দিয়ে কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা এ প্রতিবেদনে নেই, শুধুমাত্র মহানদী দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। তাহলে অ্যাণ্ডারসন তিস্তা দিয়ে কাঠ ভাসিয়ে গোয়ালন্দে নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার সূচনা হয়েছিল মহানদীতে। এ থেকে পরিষ্কার যে অ্যাণ্ডারসনের আগেও কেউ এ ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন। সে কে? অন্য কোন ইংরেজ না কি চৌকস ব্যবসায়ী সিকিমের প্রধানমন্ত্রী নামগুয়ে (Namguay)?

যা হোক, ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাণ্ডারসন বাংলার বন সম্পর্কে যে অগ্রগতির বিবরণ দিয়েছেন তাতে বৃটিশ-সিকিম বা সিকিম বন বিভাগের অগ্রগতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। আবার অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়নি তাও স্বীকার করা হয়েছে। অ্যাণ্ডারসন উল্লেখ করেছেন যে বাংলায় একমাত্র এই জেলাতেই বনশাসন শুরু হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে বনসংরক্ষণ ব্যবস্থা নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ অঞ্চলে এগিয়ে চলেছে। বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা বন্ধ হওয়াতে কাঠের দাম বেড়েছে। শতকরা ২০০ ভাগ কাঠের দাম বাড়াতে অবশ্য কাঠের চাহিদা বাড়াটাকেই মুখ্য কারণ বলেছেন। বাণিজ্যিক দিক থেকে বন শাসন কতটা এগিয়েছে তার কথাও Progress Report-এ উল্লিখিত হয়েছে। আবার রাস্তাঘাটের অসুবিধার জন্য যে অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে তাও জানানো হয়েছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দুর্গম পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়েছে এবং ১৮৬৪ তে কার্টরোড কার্শিয়াং পর্যন্ত হয়েছে। পেশক রোড চলার মত আগেই হয়েছে। এছাড়া বর্তমান তিস্তাবাজার থেকে সেবক পর্যন্ত রাস্তার কাজও অনেকটা এগিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে এক হাজার কাঠের স্লিপার এনে কার্টরোডের ধারে রাখা হয়েছে। কিন্তু কার্শিয়াং থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রাস্তা শেষ না হওয়ায় এই স্লিপার সমতলে পাঠানো যাচ্ছে না। অ্যাণ্ডারসন জানাচ্ছেন যে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবে ৫০০ স্লিপার নিয়ে যেতে চায় যদি তা গোয়ালন্দে পৌঁছে দেওয়া যায়। রেল কোম্পানী প্রতি স্লিপার ৩ টাকা দাম দিতে চেয়েছে। তিনি জানাচ্ছেন যে এই অঞ্চলের ৯ ধরনের অতি উৎকৃষ্ট কাঠ নমুনা হিসেবে ঐ রেল কোম্পানীর এজেন্টের মাধ্যমে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। উক্ত এজেন্ট কয়েক টন চেস্টনাট কাঠ রেলওয়ে ওয়াগনের জন্য বরাত দিয়েছে। রেলের চাহিদা অনুযায়ী আরও ৪,৪৮২টি স্লিপার কাঠুরেরা মজুত করেছে বলেও জানানো হয়েছে। এই কাঠুরেরা দেশীয় ঠিকাদারদের হয়ে কাজ করে এবং এই ঠিকাদারেরা

অগ্রিম না পেলে কাজ করতে চায়না — ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে এও জানানো হল যে ইছাপুরের বন্দুক কারখানায় এনফিল্ড রাইফেলের জন্য বারুদ তৈরীর উদ্দেশ্যেও কাঠকয়লার জন্য এক বিশেষ ধরনের কাঠ ৫ মণ পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদনে নানা ধরনের গাছের চাড়া তৈরী ও বনসৃজনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরেই সহকারী বনসংরক্ষক গুস্তাভমানকে নিয়ে অ্যাণ্ডারসন মেচি নদী থেকে তিস্তা নদীর ভুটান সীমা পর্যন্ত ভূভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘুরে দেখেন। এই সময়েই তারা যে সমস্ত বনাঞ্চল সংরক্ষণের উপযুক্ত সেগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে অস্থায়ী স্তম্ভ স্থাপন করেন। বাকি তরাইয়ের বনাঞ্চল দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি এই কাঠ বিক্রি বা লিজ দিতে পারবেন। যা হোক অর্থনৈতিক দিক থেকে ১৮৬৫-৬৬ -র বন লাভজনক হয়নি — সরকারের তরফে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৩,৪১৫ টাকা। ক্ষতির কারণ সম্পর্কে সহকারী বনাধ্যক্ষ জানাচ্ছেন যে ১৮৬৫-৬৬ সালে যে কাঠ কাটা হয়েছে তার এক চতুর্থাংশ মাত্র বনাঞ্চল থেকে বার করা গেছে। বাকি কাঠ বনেই নষ্ট হচ্ছে। আর বন ধ্বংসের ফলে দার্জিলিঙের ৫/৬ মাইলের মধ্যে কাটার মত গাছ আর নেই। এখন থেকে অবশ্য ৭ ফুট পরিধির নিচের গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসময় নিম্নলিখিত বনাঞ্চল সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হল।

ক) জলাপাহাড়ের ক্যান্টনমেণ্ট অঞ্চল ও সিঞ্চল অঞ্চলসহ ৬০০০ ফুটের ওপরের সমস্ত বনাঞ্চল।

খ) লেবং পাহাড়ের সমস্ত বন।

গ) তিস্তার উত্তর পারসহ রঙ্গীত ও তিস্তা উপত্যকার ৩০০০ ফুটের ওপরের সমস্ত বনাঞ্চল।

ঘ) দার্জিলিং পাহাড়ের নিচ অঞ্চল থেকে পাহাড়ের চতুর্দিকের ৩০০০ ফুটের ওপরের অরণ্যভূমি।

ঙ) তরাই অঞ্চলের ঘন শিশু ও শাল বনাঞ্চল।

দার্জিলিঙের বনপ্রশাসনের জন্য নানা ধরনের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীও এসময় থেকেই নিয়োগ করা হতে থাকে। এক কথায় বলা যায় যে বাংলার ভবিষ্যৎ বনব্যবস্থার সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই এসময় বৃটিশ-সিকিমে করা হয়েছে। বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যকরী করা শুরু হয়েছে ১৮৬৬ সনের ১৫ই আগস্ট থেকে[২১]।

১৮৬৬ সালের পরবর্তী চার বছরে বাংলায় বন প্রশাসনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না, যদিও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। ১৮৬৭-৬৮ সালের মিঃ লিড্‌সের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে প্রশাসনিক গাফিলতি এবং অন্যান্য কারণে বন তখনও লাভজনক হয়ে ওঠেনি। ১৮৬৫-৬৬ সালে বৃটিশ-সিকিম বনবিভাগের নীট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২০,২৭৩ টাকা এবং ১৮৬৭-৬৮ সালে নীট ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬,৭১৫ টাকা[২২]। তবে লিড্‌স আশাবাদী এবং তিনি মনে করেছেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটু উন্নতি হলে এই ক্ষতির পরিমাণ কমে

আসবে। পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলেব কাঠ বাজারে আনার জন্য আদুলপম-শুকনা রাস্তা এবং সিভোক-সারাগোলা রাস্তা তৈরী হয়েছে। উচ্চ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ একটু ভাল হলে কাঠ সহজে নামানো যাবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে এই সময়ে বন বিভাগেব স্থায়ী সম্পদের পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছিল। ভবিষ্যতে এই স্থায়ী সম্পদ বনবিভাগকে লাভের মুখ দেখাবে এরপর ১৮৬৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্নরের পক্ষে বাংলা সরকারের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি H.L. Dampier একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রথমত, এই প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে দার্জিলিঙের ৩০০০ থেকে ৬০০০ ফুট উচ্চতার বনাঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং সেই জমি দেশীয় চাষীরা নয়তো চা বাগানের মালিকরা নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়ত, মহানদী দিয়ে যে কাঠ কলকাতায় আসছে তা উচ্চ মানের হওয়ায় প্রশংসিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে দাম যদি একটু কম রাখা যায় তবে নেপালের (সম্ভবতঃ মোরাং) কাঠের সাথে এই কাঠ প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। তৃতীয়ত, এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে দার্জিলিঙেই একটি কাঠের বাজার হয়েছে[১৮]। আবার Stenhouse কর্তৃক ১৮৬৮-৬৯ সালের অগ্রগতির বিবরণে দেখা যায় যে সিকিম বন বিভাগে দুটি কাঠের বড় গুদাম হয়েছে — একটি শুকনাতে ও অপরটি সিভোকে। তবে মূল গুদাম স্থাপিত হয়েছে শিলিগুড়িতে এবং সিভোক ও শুকনা থেকে কাঠ গরু বা মোষের গাড়িতেই এখানে আনা হত ও এখান থেকেই কলকাতার বাজারে পাঠানো হত। এই ব্যবস্থায় বন বিভাগের ক্ষতি হয়েছে ২,০৫০ টাকা ১০ আনা ৬ পাই। ক্ষতির পরিমাণ কমে আসছে। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় কাঠ নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল Messers. Mackenjie Lyall & Company-কে[১৯]।

ইতিমধ্যে বৃটিশ সিকিমে বন পরিচালনার ক্ষেত্রেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা হয়েছে। ১৮৭০ পর্যন্ত বৃটিশ-সিকিম বনাঞ্চল ভাগলপুর প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিমধ্যে আলাদাভাবে বনবিভাগ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৮৬৫ সালের বন আইনের সপ্তম ধারা অনুযায়ী এই সম্পর্কিত আইন হতে শুরু হয়েছে। এই নিয়মে ১৮৭০-৭১ সালে সমগ্র উত্তরবঙ্গের বনকে কুচবিহার বনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং বৃটিশ-সিকিমের ৭০ বর্গ মাইল এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল করা হল। ১৮৭১-৭২ এর সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আরও ২ বর্গমাইল এলাকা এর সাথে যুক্ত হল। ১৮৭২-৭৩-এ ডাঃ শ্লিচ বনবিভাগে যোগদান করলে বন প্রশাসন আরও গুরুত্ব পেল। ১৮৭৪-৭৫-এ কুচবিহার বনবিভাগ থেকে বৃটিশ-সিকিমকে বার করে এনে দার্জিলিঙ বনবিভাগ তৈরী করা হল[২০]। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দার্জিলিং বনবিভাগকে ভেঙে দার্জিলিং, তিস্তা ও কার্শিয়াং বনবিভাগ তৈরী করা হল যথাক্রমে ২৬, ৫৭ এবং ৭৮ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে। ইতিমধ্যে ১৮৭৮ সালের বন আইন পাশ হল এবং তিস্তা বন বিভাগ কালিম্পঙ বনবিভাগে রূপান্তরিত হল। কিছু নতুন জায়গা যুক্ত হয়ে সংরক্ষিত

বনের পরিমাণ দাঁড়াল —

দার্জিলিং — ২৭,১৪৩ একর

কার্শিয়াং — ৬০,৯৯৪ একর

কালিম্পং — ২৭,০৭৯ একর

এটা হচ্ছে ১৮৭৯ সনের হিসেব[১৪]। ঠিকমত working plan এখনও করা হয়নি, যদিও working plan-এর একটি খসড়া ১৮৬৮-৬৯ সনে করা হয়েছিল। দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিগত working plan তৈরী হবে মিঃ ম্যানসনের তত্ত্বাবধানে ১৮৯২ সালে, যা কার্যকরী থাকবে ১৯০২ পর্যন্ত। কার্শিয়াঙের working plan তৈরী হবে ১৯০২-তে যা ১৯১৮ পর্যন্ত চলবে। আর কালিম্পঙের working plan তৈরী হবে ১৮৯৬ সালে যার কার্যকাল থাকবে ১৯০৫ পর্যন্ত।

ইংরেজরা তো এইভাবে দার্জিলিং ও সন্নিহিত অঞ্চলে সংরক্ষিত বন তৈরী করল। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা যারা জঙ্গলকে নিয়েই জীবনযাপন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের কী হল? দার্জিলিঙের আদি অধিবাসী ছিল রঙরা (Rong), যাদের নেপালিরা অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করে লেপচা বলত। এই লেপচারা তাদের ভাষায় পাহাড়ের সবকটি গাছের নাম দিয়েছিল[১৫]। এরা দার্জিলিং ও কালিম্পং বনাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ঝুম চাষ জানত। ইংরেজরা বৃটিশ-সিকিমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল তৈরীর পথে এগোলে এদেরকে বনাঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৬৫ সালের আইনে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সুব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে বনের কাছাকাছি যারা থাকবে তারা পারিবারিক প্রয়োজনে সংরক্ষিত বৃক্ষ ছাড়া বাঁশ, কাঠ ব্যবহার করতে পারবে[১] । কিন্তু দার্জিলিং সংক্রান্ত গেজেটিয়ারগুলির নির্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই রঙ বা লেপচারা জঙ্গলের ওপর জন্ম জন্মান্তরের অধিকার হারানোর পর আর নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছেনা। প্রথমে তারা ঝুম চাষ ছাড়তে বাধ্য হল। তারপর নেপালিদের কাছ থেকে গ্রাম পদ্ধতিতে কৃষিকাজে অভ্যস্ত হতে শুরু করল। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেচরা সরকারের সাথে দর কষাকষি করে নতুন বাসস্থানের এবং জীবিকার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল[১৯]। কিন্তু এরা তেমন কিছু করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এদের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা গারোদের মত। অভ্যস্ত অরণ্য না পাওয়ায় এরা দার্জিলিং নেপালিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কালিম্পঙে চলে এল কারণ, সেখানে ভুটানের অরণ্য ছিল। কিন্তু ভুটান যুদ্ধের পর এখানেও একই বিপদে পড়ল লেপচারা। এরপর O'Malleyর অনুসরণেই বলা যায় যে অনেক লেপচা ভুটানে চলে গেল কারণ সেখানে বন ছিল, ফলে অভ্যস্ত পরিবেশে তারা সেখানে বাস করতে লাগল। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং নেপালিদের আহ্বান করল শ্রমিক হিসেবে, কারণ সস্তা শ্রমিক ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল। রঙরা 'লেপচা' নাম নিয়ে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে নেপালিরা রঙদের স্থান অধিকার করে বসল। ঔপনিবেশিকরা

ঐতিহ্যের বদলে বর্তমানকেই সমাদর করল। সেনসাসের কঠোর তথ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াঙে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল। কিন্তু তাতে রঙ বা লেপচাদের তেমন বলার মত কোন অংশ থাকল না। জমি হারিয়ে ভুটানের পথে তারা পা বাড়াল। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। নীরবে বিদায় জানাল সিকিমের তুষারমন্দ্রিত পর্বতশ্রেণী।

সূত্র নির্দেশ

১। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ (Macropedia) উনবিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৬।

২। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র সম্পাদনা, রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬।

৩। ডেভিড হার্ডিম্যান সম্পাদিত **Peasant Resistance in India 1858-1914** গ্রন্থে মাধব গ্যাডগিল এবং রামচন্দ্র গুহর প্রবন্ধ 'State forestry and social conflict in British India' পৃষ্ঠা ২৬১।

৪। কল্যাণ চক্রবর্তী, Man plant and Animal Interaction পৃষ্ঠা ২৫।

৫। অজয় সিংহ রাওয়াত সম্পাদিত '**Indian Forestry : A perspective**' গ্রন্থে এ. কে ঘোষের প্রবন্ধ 'Forest Policy in India', পৃষ্ঠা ৭২।

৬। **The Political Economy of Forest use and Management** এস ভি. নাদকার্নী, এস এস প্রভাকর এবং সৈয়দ আজমল পাশা, পৃষ্ঠা ৩৩।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩।

৮। **The Forests of India** — ই. পি স্টেবিং, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩।

৯। কলকাতা কাস্টমস হাউসের কালেক্টর জে. ডি. ম্যাকলেয়ডের কলকাতা বন্দরে ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত কাঠ আমদানীর বিবরণ, ১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২, (Appendix - G of the **Progress Report of the Lower Provincess of Bengal for the year ending 1st April (1872)**।

১০। **A Statistical Account of Bengal** — উইলিয়ম হান্টার, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

১২। **Bengal District Gazetteers : Darjeeling** — এল. এস. এস. ও'ম্যালি পৃষ্ঠা ৮৭।

১৩। **A Concise History of Darjeeling District Since 1835** — ই. সি ডোজি, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৭।

১৫। সিকিমের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত দলিল। A J Dash কর্তৃক দার্জিলিং গেজেটিয়ারে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা, ৩৭-৩৮।

১৬। **The Forests of India** — ই. পি. স্টেবিং, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৫।

১৭। বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে টি. অ্যাণ্ডারসনের (Conservator of Forests, Lower Provinces) চিঠি। নং ১২৬, তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৬ সাল।

১৮। **Forests ; The people and the Government** — রেনু খাটোর, পৃষ্ঠা ১৪।

১৯। বাংলা সরকারের সব বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে জে জিওমেগান (Esq under secretary) এর চিঠি। নং ৩৪৭৮। তরিখ ১৯ শে অক্টোবর, ১৮৬৪ সাল।

২০। বাংলার বনসংরক্ষক (conservator) টি অ্যাণ্ডারসনকে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার এ. মনির চিঠি। নং ৪৩৯, তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫ সাল।

২১। বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে অ্যান্ডারসন (Conservator of Forests Lower Provinces) এর চিঠি। নং ৬২, তারিখ ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬ সাল।

২২। বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে এইচ লিডসের (Conservator of Forests Lower Provinces) চিঠি। নং ৩৬, এ (A), তারিখ দার্জিলিং ১৩ই অক্টোবর, ১৮৬৮ সাল।

২৩। পি ডিকেন্সের (Officiating Undersecretary to the Government of Bengal) চিঠিতে উদ্ধৃত এইচ. এল. ড্যামপিয়রেব প্রতিবেদন। নং ৬৬৫, তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৯।

২৪। ডবলু স্টেনহাউস (Officiating Conservator of Forests, Lower Provinces) এর চিঠি বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে। চিঠির নং ২৫৪, তাবিখ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ সাল।

২৫। **The Forests of India** — ই পি. স্টেবিং, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫।

২৬। টি. এন রায়ের প্রবন্ধ 'History of the Forest Management in North Bengal' মূলগ্রন্থ 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের শতবার্ষিকী স্মরণ সংখ্যা, ১৯৬৪। পৃষ্ঠা ৮২।

২৭। **Bengal District Gazetteers : Darjeeling** — এল এস এস ও'ম্যালি পৃষ্ঠা ৪৪।

২৮। বাংলার বনসংরক্ষক এইচ লিডসের বাংলার নিম্নাঞ্চলের বনের অগ্রগতির বিবরণের (Year ending 1st April 1871) Appendix-A এবং বাংলার নিম্নাঞ্চলের অস্থায়ী বনসংরক্ষক স্টেনহাউসের বনের অগ্রগতির বিবরণ। Section II পৃষ্ঠা ১৯।

২৯। জলপাইগুড়িব বিভাগীয় কমিশনারকে ডব্লু রেলির (Sub-divisional Officer Buxa) চিঠি। নং ৪৫৪ জি, তারিখ আলিপুর ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ সাল।

[এই প্রবন্ধ লিখতে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।]

আঠারো শতকের মেদিনীপুরের এক কাপড় ব্যবসায়ী

মৃণালকুমার বসু

পলাশীর যুদ্ধের আগেই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার অর্থনীতিতে কার্যত অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর ফলে দেশীয় বণিকদের পক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই দেশীয় বণিকদের পক্ষে আর্থিক সাফল্য লাভের সহজ রাস্তা ছিল বিদেশী বণিকদের তাঁবেদারী করে নিজেদের উন্নতি সুনিশ্চিত করা। সাধারণত এ ধরনের উঠতি বণিক গোষ্ঠী বেড়ে উঠেছিল রাজধানী শহর কলকাতাতে যেখানে পুরোনো সামাজিক বন্ধন ছিল অনেক শিথিল। অন্যদিকে এই গোষ্ঠী তাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বাড়াবার জন্য নিরাপদ ও লাভজনক জমিদারী বন্দোবস্তে নিজেদের যুক্ত করেছিল। এদের দাপট বেড়েছিল পৃষ্ঠপোষকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার বিপুল শ্রীবৃদ্ধিতে। বর্তমান প্রবন্ধে কলিকাতাকেন্দ্রিক সফল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ছকের বাইরে মেদিনীপুর জেলার একজন ব্যবসায়ীর কথা আলোচনা করা হবে যাঁর আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা জমিদার হিসেবে সুনিশ্চিত ছিল। আরো লক্ষণীয় যে তাঁর বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল শাসনের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মচারীর অভূতপূর্ব তৎপরতায়।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মীরকাশিম ও ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে বন্দোবস্তের ফলে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ অধীনে এলে মেদিনীপুর জেলায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে। রাজস্ব ব্যবস্থায় নতুন নিয়ম চালু হয়। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নতুন ব্যবস্থার চাপে পড়ে ও অনেকেই নতুন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করে। একই সময়ে কোম্পানী দাদনী বণিকদের বদলে গোমস্তার মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা চালাবার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রায় স্বাধীন দেশীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উচ্ছেদের মাধ্যমে ব্যবসায় নিরঙ্কুশ বিদেশী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কারণ, ১৭৫৩ সালে দাদনী ব্যবসায়ীদের বদলে কোম্পানী গোমস্তা নিয়োগ করলেন যাদের মাইনে অত্যন্ত কম কিন্তু দাপট সেই তুলনায় খুব বেশী। ক্রমবর্ধমান বিদেশী শক্তির ছত্রছায়ায় গোমস্তাদের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত। ব্যাপারটা আরো গুরুতর আকার নিয়েছিল কেননা কোম্পানীর ব্যবসার পাশাপাশি কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। এজন্য ব্যক্তিগত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেশীয় গোমস্তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে কোম্পানীর প্রশাসনিক কর্মচারী ও কোম্পানীর ব্যবসায়িক কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে কোম্পানীর

ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা প্রশাসনিক কর্মচারীদের তুলনায় এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যে প্রশাসনিক কর্মচারীদের পক্ষে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে মেদিনীপুরের এক জমিদার ব্যবসায়ীর ব্যতিক্রমী কাহিনী বেশ উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুরের একজন সফল ব্যবসায়ী নারায়ণ দত্ত সেনাপতি যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু ব্যবসায়ী বলতে প্রায়শই একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী যেমন বোঝায় তেমনি বৃত্তির অপরিবর্তনীয়তার ছবিও ফুটে ওঠে। অন্যদিকে এ যুগে সফল ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারী তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ জমিদারীতে নিয়োগ করে সামাজিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। এ ধরনের সফল পরিবারের মধ্যে কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবার উল্লেখযোগ্য। সেদিক থেকে নারায়ণ দত্ত ব্যতিক্রমী চরিত্রের। মেদিনীপুরের এই ব্যবসায়ী অন্যদিকেও উল্লেখযোগ্য। কেননা কোম্পানী তার আর্থিক আধিপত্যের নমুনা হিসেবে যখন দাদনী ব্যবসায়ীর বদলে গোমস্তা নিয়োগ স্বাভাবিক তখন নারায়ণ দত্ত সেনাপতির অবস্থান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তিনি 'Merchant in Account with the Hon'ble Company'। এছাড়া মেদিনীপুরের এই ব্যবসায়ীর সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে ইংরেজ কোম্পানীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কালেকটর ও জজ কিন্তু তাঁরা ব্যবসায়ীদের থেকে দূরের মানুষ। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে জেলাস্তরে প্রশাসনিক কর্তাদের তুলনায় ব্যবসায়িক কর্তারা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। দু ধরনের কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার সম্পর্ক কীভাবে তিক্ত হয়ে উঠেছিল সেকথা নারায়ণ দত্ত সেনাপতির কার্যকলাপ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মীরকাশিমের নবাবী পাবার মূল্যস্বরূপ তিনটি জেলা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ অধীনে আসে ও এর ফলে ওড়িশার প্রান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলার ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণ দত্ত সেনাপতির সঙ্গে কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি গোমস্তা নন এমনকি সাধারণ দাদন পাওয়া ব্যবসায়ী নন। কোম্পানীর কর্মচারী ব্যবসায়ীরা তাঁকে উদার হাতে টাকা দিতে শুরু করেন। এমনকি সবক্ষেত্রে তিনি কোম্পানীকে কাপড় দিয়েও টাকা শোধ করেন না। ১৭৬২ সালে তিনি ৮,০০০ টাকা পান যাতে বাট্টায় ৬৪০ ধরে মোট হিসেব দাঁড়ায় ৮৬৪০। পরের বছর দেখা গেল বাকি রয়েছে ৭৭৫ টাকার বেশী, তবু নতুন করে অগ্রিম দেওয়া হয় ৪,২১১ টাকা ১০ আনা[২]। ১৭৬৪ সালে নানাধরনের কাপড় দিয়ে শোধ দিলেন ৪,৫৬১-৭ এবং বাট্টা ৩৬৪-১৪-৬ অর্থাৎ বাকি ছিল ৩৯৮--৯।

আবার পেলেন ৩৪,৪৯১-৭-৯। ১৭৬৫ সালে ওয়াটস সাহেবের মাধ্যমে অগ্রিম দেওয়া হল ৩৩,৪২৯-৮-৬ পয়সা কিন্তু ১৭৬৬ সালে গ্রাহাম অগ্রিম দেন ৭২, ৫৮২-১৪ আনা। কোনও সাহেবই মেদিনীপুরের এই ব্যবসায়ীর বাকি নিয়ে চিন্তিত নন। তিনি জিনিস দিলেন[৩]

৩৪,৬৩৮ ৬
বাট্টা ২৭৭৬ ৬
- -
৩৭৪০৯ ঃ
চলতি ১৫১৯ ৫ ৯

বাকি ৩৮৯২৮ ৬ ৯
ভ্যান্সিটার্ট সাহেব ১৭৬৭ সালে আরো উদারতা দেখান। ১৭৬৭ সালে বাকি ছিল
১৪,১৫৬ - ৯ ৯
ভ্যান্সিটার্টের অগ্রিম ৬৬৮৬১ ১৫
বাট্টা ৫৩৪৮ ১৫ ৩
- -- - - ----- --- -- - - - -
মোট ৭২, ২১০ ১৪ - ৩
চলতি হিসেব ৮৬, ৩৬৭ - ৮
১৭৬৯ সালে বাকি রইল ৫১,৯৬৩ - ৩। তবু মন্বন্তরের বছরে নতুন করে অগ্রিম দেওয়া হল ৭৮,৯৩০ ১৩।
মন্বন্তরের পরেও সম্পর্কের হেরফের হল না। ১৭৭৩ সালে নানারকম জিনিস দিলেন
১৫,৪৯০ ১ ৬
বাট্টা ১২৩৯ ২ ৬

১৬,৭২৯ - ৪ - ৩
বাকি ৫৭,১৭৬ ১৩
------------- -- --- -- - ------
চলতি হিসেব ৭৩,৯০৬ - ১- ৩

নারায়ণ দত্ত সেনাপতির কার্যকলাপ মেদিনীপুরের কালেকটর রোজওয়েল সাহেবের কাছে শুধু যথেষ্ট আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল নয় তিনি সন্দেহ করেন নারায়ণ দত্ত কোম্পানীর কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট পিকার্স সাহেবের তল্পিবাহক। সেজন্য তিনি এ ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বর্ধমানের প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন[৭]। তাঁর মতে এ ধরনের অনুগ্রহ অস্বাভাবিক ও অনুচিত কিন্তু পিকার্স সাহেব জানালেন যে টাকা বাকি থাকা স্বাভাবিক না হলেও মনে রাখতে হবে যে এই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ইংরেজ ভদ্রলোকদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করেছেন। তাছাড়া ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাঁকে অনুগ্রহ করেছেন শুধু বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী বলেই নয় একজন সম্পন্ন জমিদার হিসেবে। তাই তাঁকে সুবিধেমত কিস্তিতে টাকা শোধ করার সুযোগ দেওয়া স্বাভাবিক[৮]। বিশেষত মনে রাখা দরকার যে নারায়ণ দত্তের জমিদারীতে বহু তাঁতী বাস করে যাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে কোম্পানীর টাকা শোধ দেওয়া

সম্ভব। নারায়ণ দত্তের জমিদারী বিক্রি করে টাকা আদায় করায় জবাবে পিকার্স জানালেন যে জমিদারী বিক্রি করে ১০,০০০ টাকার বেশী পাওয়া যাবেনা। বরং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার মাধ্যমে খাজনা আদায় করাই যুক্তি সঙ্গত। অবশ্য মনে রাখা দরকার দুর্দশাগ্রস্ত জমিদারদের প্রতি এরকম সুবিবেচনা দেখায়নি। এমনকি পিকার্স অভিযোগ করলেন যে শুধু কালেক্টরই কোম্পানীর স্বার্থ দেখেন এ দাবী অযৌক্তিক। ১৭৭৬ সাল জুড়ে কোম্পানীর প্রশাসন ও ব্যবসায়িক সংগঠন নারায়ণ দত্ত সম্পর্ক তাঁদের স্বতন্ত্র ধ্যানধারণা ও বাদানুবাদ চালিয়ে গেলেন। ১৭৭৬ সালের মার্চ মাসে পিকার্স স্বীকার করলেন যে নারায়ণ দত্তের জমিদারীর বাৎসরিক মালগুজারি ২৬,০০০ ফলে তালুক বিক্রি করে টাকা আদায়ের চেষ্টা হবে সোনার ডিম পাড়া হাঁস মারার মত বোকামির কাজ। শুধু তাই নয় বোজওয়েল নারায়ণ দত্তের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন।

অথচ এই বছরে মেদিনীপুরের জমিদারেরা কোম্পানীর কাছে খাজনা মকুব করার জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। নারায়ণ দত্ত শরীর সারাতে কলকাতার দিকে গেলেন। বোঝা যায় যে কোম্পানীর ব্যবসায়ীদের কৃপাদৃষ্টি থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। নাছোড়বান্দা বোজওয়েল নারায়ণ দত্ত সম্পর্কে আরো তথ্য জোগাড় করে দেখালেন যে জমিদারী বিক্রি করলে ৫০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি বিষয়ে তথ্য জোগাড় করে তিনি জানালেন যে নারায়ণ দত্তের ধান বিক্রি করলে ২০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। আবার গরু ও বলদ বিক্রি করলে পাওয়া যাবে ১০,০০০ ৪০০ মোষ বিক্রি করলে ২,০০০ মোট ৮২,০০০।
এছাড়া তার পারিবারিক গহনা বিক্রি করলে আরো ২০০০ টাকা পাওয়া যাবে। নারায়ণ দত্ত সেনাপতির আরো কুকীর্তি ফাঁস করে বোজওয়েল জানালেন যে, যে কলসি পরগণায় জমিদারের জমিদার হিসেবে সেখানকার জমিদারদের তিনি ১২,০০০ টাকা ঠকিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটা প্রাদেশিক কাউন্সিল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে জানালেন। কিন্তু সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হলনা। এ সব তথ্য থেকে মেদিনীপুরের এক বিচিত্র কাপড় ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাকে রক্ষা করার জন্য স্থানীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্তব্যপরায়ণ প্রশাসনিক কর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যিনি ব্যবসায়িক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীর অসাধু যোগসাজসের শেষ দেখার জন্য অসাধারণ তৎপরতা দেখিয়েছিলেন এবং ফলে নারায়ণ দত্ত সেনাপতির মত ব্যবসায়ীর কাজ নতুন মাত্রা পেয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। প্রসিডিংস বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল, ৮ মার্চ ১৭৭৬
২। ঐ ২৯ মার্চ ১৭৭৬
৩। ঐ, ৩ এপ্রিল ১৭৭৬
৪। ঐ
৫। ঐ

প্রাক-পলাশী বাংলায় গ্রন্থাগার

শ্রীকান্ত বসু

প্রাক-পলাশী যুগ অর্থাৎ ১৭০০ হতে ১৭৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার সমগ্র ইতিহাসকে অনেকেই আলোকোজ্জ্বল বলে স্বীকাব কবেন নাই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই"।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগ যদি অধোগতি দোষে দুষ্ট হয় তবে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে অধোগতি শুরু হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে যেমন বেশ কিছু মৌলিক সাহিত্য রচিত হয়েছে তেমনই পুঁথি নকল করে পঠনপাঠনের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তাই এইবকম একটি বিতর্কিত যুগের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিহাস অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই সময়ে ছাপানো বাঁধানো বই-এর কোন অস্তিত্ব বাঙালীদের মধ্যে ছিলনা। তখন ছিল হাতে লেখা পুঁথির যুগ। তারা লিখেছিল তাল পাতা, গাছের ছাল কিংবা তুলোট কাগজে[২]। শর, শকুনের পালক, কঞ্চি বা লোহার কলম দিয়ে বড়ো এবং পোক্ত ছাঁদে বিশেষ প্রকার কালির দ্বারা সাধারণত তুলোট কাগজের লম্বা ফর্দে বা তালপত্রে এই সকল পুঁথি লেখা হতো। সাধারণ কাব্যসাহিত্যাদি লেখা হতো তুলোটের উপর। বিশেষ পূজা পদ্ধতির পুঁথি হতো তালপত্রে। তাগা, তাবিজ, মাদুলি দেওয়া হত ভূর্জ্জপত্র বা গাছের ছালে লিখে। তেরেট পাতা, তুঁত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল বা পশুচর্মের বাঙ্গলা পুঁথিও দুর্লভ ছিল না[২]। এই হাতে লেখা পুঁথির যুগে সমাজে সাধারণ পাঠক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব ছিল না।[৩]। রাজা-মহারাজা ও জমিদার তালুকদাররা মধ্যে মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনে পুঁথি নকল করিয়ে নিতেন। অনেক সময় দান করবার জন্যেও পুঁথি নকল করাতেন। পুঁথি দান করলে নাকি পুণ্যলাভ হতো। পুঁথি নকল করানো বেশ ব্যয়বহুলও ছিল। ১১৫৯ সালে অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীঃ কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের পুঁথি নকল করে লিপিকার আত্মারাম ঘোষ দগিনা ১ জোড়া কাপড় আর দু-তঙ্কা পেয়েছিলেন। (সোসাইটি পুঁথি ৯/৩২২)। তখনকার দিনে একজোড়া কাপড়ের দাম দু-টাকা ধরলেও খরচ পড়ে চারটাকা। এখনকার অর্থমূল্য হারে প্রায় এক হাজার টাকা[৪]। এত ব্যয় করে ও কষ্ট করে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে পুঁথি নকল করানো হতো না তা বলাবাহুল্য। পুঁথির ধনিক মালিকই পুঁথি পাঠ করতেন অথবা দান করতেন। পুঁথিগত বিদ্যার কোন প্রচার

বা প্রসার হতো না। বাইরের সমাজের সাধারণ লোক পুঁথি পাঠ করবার কোন সুযোগ পর্যন্ত পেত না। লিপিকররা, পুঁথির মালিকদের পরামর্শে পুঁথির শেষে কড়া দিব্য দিয়ে রাখতেন যেন কেউ পুঁথি চুরি না করে।

বংশোক্ষয় ভবেৎ অভিশাপ উপেক্ষা ক'রে কেবল জ্ঞানার্জনের তাড়নায় পুঁথি চুরি যে কত কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। পুঁথির যুগে জ্ঞানবিদ্যা তাই ধনিকের গৃহে ও রাজসভায় বন্দী হয়ে থাকত। সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না[।]।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সাধারণের গ্রন্থাগার বা পুঁথি ভাণ্ডারের অস্তিত্ব ছিল না, তা নয়। সেই সময় গ্রন্থাগার সীমাবদ্ধ ছিল মূলত তিন স্থানে -- (এক) নবাব, রাজ-মহারাজাদের ও জমিদার তালুকদারদের প্রাসাদে। (দুই) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, মন্দির, মসজিদে। (তিন) অল্প হলেও শিক্ষানুরাগী মানুষেরগৃহে।

মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭১৭-১৭২৭) বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তার নামানুসারে বর্তমান মুর্শিদাবাদ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) দিল্লির সিংহাসনের অধিকার নিয়ে টালবাহানার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে সমাজ ও সংস্কৃতির উপর তার প্রভাব পড়েছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ কাটরা মসজিদে পাঠশালা এবং পুঁথি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭২৩ খৃস্টাব্দে কাটরা বা গঞ্জের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হয়েছিল বলে এটি কাটরা মসজিদ নামে খ্যাত। কথিত আছে এটির গৌরবময় যুগে ইসলাম ধর্মের একটি বৃহৎ পাঠশালা রূপে ব্যবহৃত হতো এবং এখানে ৭০০ কোরান পাঠার্থী থাকতে পারতো। ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূমিকম্পে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়[১]। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে কোরান নকল করতেন। প্রায় আড়াই হাজার কোরান পাঠক এবং নকলকারদের ভরণপোষণ চালাতেন। শুধু তাই নয় তিনি নিজে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। দরবারে অনেক জ্ঞানী গুণী উলেমাকে স্থান দিয়েছিলেন। এই সব থেকে স্পষ্টতঃ ধারণা করা যায় তার প্রাসাদেও উন্নত পুঁথি ভাণ্ডার ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ-র মৃত্যুর পরেও কাটরা মসজিদে অবস্থিত গ্রন্থাগার নষ্ট হয়ে যায় নি। সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ-এর সময়েও সেখানে ইসলামী পাঠশালা ও গ্রন্থাগার চালু ছিল। আলিবর্দীর বেশিরভাগ সময় বর্গীদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যয়িত হলেও তিনি এদিকেও নজর দিতেন। তিনি আজিমাবাদ (পাটনা) ত্যাগ করার সময়ে বিদ্বান ব্যক্তিদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসতে সফল হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন বিদ্বান ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করতেন। কালিনি এবং কাফি থেকে পাঠ শুনতেন[২]। তাই তার আমলেও যে পুঁথিপত্রের বিশাল সম্ভার নবাব দরবারে ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরীতে রক্ষিত নল-দময়ন্তী পুঁথিচিত্র নবাবদের গ্রন্থাগারের পরিচয় বহন করে। আর একটি ওই সময়ের পুঁথি দস্তুর-ই-হিম্মত রক্ষিত আছে বৃটিশ লাইব্রেরীতে[৩]। মুর্শিদকুলী খাঁ এবং আলিবর্দী খাঁ মুসলিম ও হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করতেন।

নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭২৮ ১৭৮২)

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বহু পণ্ডিত, কবি, নৈয়ায়িক ও অন্যান্য শাস্ত্রাধিকারীগণ মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। ফলে কৃষ্ণনগরের চারপাশে সংস্কৃত স্মৃতি মীমাংসা ন্যায় শাস্ত্রচর্চার নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সভাকবি ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। সাধককবি রামপ্রসাদ তাঁর অন্যতম সভাসদ। কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রায় আশি জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে প্রতিপালন করতেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রবিদ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম এবং প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ধর্মশাস্ত্রবিদ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি এবং বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, দর্শন শাস্ত্রবিদ শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার এবং শঙ্কর তর্কবাগীশ । শাস্ত্রচর্চা ও সাহিত্যচর্চা গ্রন্থ বা পুঁথি ভাণ্ডার ব্যতীত সম্ভব নয়। এই সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদে পুঁথির মূল্যবান সংগ্রহশালা ছিল। এই সংগ্রহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অনেক বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য কৃষ্ণনগর রাজবাটী গ্রন্থাগারে রক্ষিত ভারতচন্দ্রের পুঁথি অবলম্বনে দুই খণ্ডে অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন । এর থেকে বোঝা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শুধুমাত্র সেই সময়ে শিক্ষা সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে ব্রতী ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন নিয়ে মানবসম্পদ সংরক্ষণেও উদ্যোগী ছিলেন।

বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র (১৭০২-৪০ খ্রীঃ) ও তিলকচন্দ্র (১৭৪৫-৭০) ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে বর্ণিত বর্ধমানের চিত্র তৎকালীন অবস্থার পরিচয় বহন করে। সেই সময়ে বর্ধমান রাজবাড়ীতেও গুণী সমাদরের অভাব ছিল না। ধর্মমঙ্গলের বিখ্যাত কবি ঘনরাম দাস কীর্তিচন্দ্র কর্তৃক নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। এখানেও বিশাল পুঁথি সম্ভার ছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সময়ের কোন পুঁথি আজ আর অবশিষ্ট নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুঁথিগুলি সংগৃহীত আছে সেগুলি পলাশীর যুদ্ধের পরে রচিত।

কোচবিহারের রাজা নারায়ণ ও তার বীর ভাই শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় কবি পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর করতেন। সাহিত্যের প্যাট্রন হিসেবে কোচবিহারের রাজাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এখানেও পুঁথিসম্ভার ছিল ।

পূর্ববাংলার **রাজনগরে রাজবল্লভ** শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিতে যত্নবান হন। তার প্রাসাদেও পুঁথি সংগৃহীত হতো।

মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে **গড়বেতা অঞ্চলে** মঙ্গলাপাতা নামক স্থানে **রাজা ছত্রসিংহের** রাজধানী ছিল। তিনি বিশেষ ধার্মিক এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তার সংগ্রহে অনেক পুঁথি ছিল। পরে সেগুলি বর্ধমান সাহিত্য সভায় স্থানান্তরিত হয়[১০] ।

বাঁকুড়া জেলার খাতরা থানার **সুপুর রাজবংশেও** পুঁথির সংগ্রহ ছিল[১১]।

এই প্রসঙ্গে **নাটোরের রানী ভবানী** এবং **নোয়াখালির জমিদারের** ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নোয়াখালির জমিদার সাহিত্য অনুবাদ করিয়ে তা সংগ্রহ করতেন। এর

জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো। যেমন দ্বিজ ভবানী রামায়ণ অনুবাদের জন্য তাঁর নিকট হতে দৈনিক দশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পেতেন। বর্তমানে যার মূল্য প্রায় দু হাজার টাকা''।

বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহের নাম একটু অন্যভাবে স্মরণীয়। তিনি নিজে বিদ্যানুরাগী ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং কখনো কখনো নিজহাতে পুঁথি নকল করতেন। কিন্তু রাজকার্যের তাড়নায় সবসময় সে সুযোগ তার মিলত না। সেই অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছিলেন **তার মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী**। তাঁর লিখিত 'প্রেম বিলাস' গল্পের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় আছে''। এই সময়ের পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাসে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। কিছু বিদুষী নারীর সাক্ষাৎ আমরা পাই। যেমন 'হরিলীলা'-র কবি জয়নারায়ণ সেনের আত্মীয়া আনন্দময়ী, দয়াময়ী ও গঙ্গমণি সকলেই ছিলেন বিদুষী ও অল্পবিস্তর কবিখ্যাতিসম্পন্না। রাজনগরের জমিদার রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন আনন্দময়ী অথর্ববেদ ঘেঁটে সেই যজ্ঞের বেদি প্রস্তুত করে দেন। এ থেকে মনে হয়, এ যুগে উচ্চবংশীয় মহিলারা সংস্কৃত জানতেন। এছাড়া নাটোরের রানী ভবানী এবং আলিবর্দীমহিষী সেই সময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন' ।

এরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগত পুঁথিসম্ভারগুলির কথা আলোচনা করা যাক্। এদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা নিজেদের চৌপাড়িতে পঠন-পাঠনে সগৌরবে ব্যাপৃত থাকতেন। পড়ুয়াদের কাছে থাকতো অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতি হাতে লেখা পুঁথি। মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসাতে এবং সাধারণ ভদ্র মুসলমানদের বাড়িতে থাকতো কোরান, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পুঁথি নস্‌খ, নাস্তালিক কিংবা শিকস্তা। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ছিল গুরু মহাশয়ের পাঠশালা। সেখানেও ছিল হাতে লেখা পুঁথির সম্ভার। বৈষ্ণবের আখড়ায় থাকত চৈতন্য-জীবনী ও পদাবলী; বাউলের আখড়ায় থাকত গোর্খ গোপীচাঁদের হেঁয়ালী। মাঠে ঘাটে ছিল শাক্ত-পদাবলী। মঙ্গলকাব্যের মন্দিরা বাজতো সমাজের সকলের ঘরে। কাশীরাম কৃত্তিবাস পূজিত হতেন ঘরে ঘরে। কোকশাস্ত্র কবিরাজী পুঁথি, হেকিমি তিব্ প্রভৃতির বহুল প্রচলন ছিল। বাট, দৈবক, ঘটক মহাশয়দের বগলে ফিরত গ্রন্থকুলজী, পঞ্জিকা ইত্যাদি। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পুরাণ পাঠ ও কথকতা হতো। সেটাও হাতে লেখা গ্রন্থ থেকে। অর্থাৎ এই সময়ে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহারের সকল সনাতন ধারা দেশের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে হাতে লেখা পুঁথির মাধ্যমে। আর এর থেকেই বোঝা যায় সেই সময়ে পুঁথিসংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব' ।

এযুগে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় বা সংসদের অধীনে কোন সুশৃঙ্খল সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ, নবাব অভিজাত ও জমিদারদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ ব্যবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা — পাঠশালা ও তোলবাখানা, (২) মুসলমান ছাত্রদের জন্য

শিক্ষাব্যবস্থা — মক্তব ও মাদ্রাসা এবং (৩) হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা — চতুষ্পাঠী ও টোল[২০]।

সাধারণত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বর্ণের কোন ব্যক্তি গ্রামের পাঠশালার গুরুগিরির দায়িত্ব নিতেন। গুরু মহাশয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছাত্রদের শেখাতেন অঙ্ক।

নবদ্বীপ তখনও পঠনপাঠনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত চতুষ্পাঠী ও টোল চালাতেন। চতুষ্পাঠীর শিক্ষান্তে মেধাবী ও উচ্চাভিলাষী ছাত্ররা সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান টোলে পড়তে যেত। এই সমস্ত টোলে থাকত মূল্যবান পুঁথি সম্ভার। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সংস্কৃত সাহিত্যের পুঁথি। এক একটি টোলে প্রায় তিনশত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। নবদ্বীপ ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী হাওড়ার বালী, পূর্ববাংলার রাজনগর, নাটোর, নোয়াখালি এবং রাঢ় বাংলার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে। এই টোলগুলিতে ন্যায়শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাকরণ, স্মৃতি (আইন), কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, বেদ, পুরাণ অভিধানের পুঁথি সংগ্রহ ছিল। বাংলাদেশে পাঠ শেষে অনেক ছাত্র উচ্চতর পাঠের জন্য কাশী ও মিথিলায় যেত। সেখান থেকে ফিরে এসে তারা নিজেদের গ্রাম বা শহরে চতুষ্পাঠী বা টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিত[২১]। একথা বলা নিশ্চয় অতিরঞ্জিত হবে না যে কাশী ও মিথিলা থেকে ফিরবার কালে নব্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত পুঁথির নকল নিয়ে আসতেন।

রামপ্রসাদ তাঁর রচিত 'বিদ্যাসুন্দরে' বর্ধমানের একটি চতুষ্পাঠীর বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ধমানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দ্রাবিড়, উৎকল, এমনকি কাশী ও মিথিলা থেকেও ছাত্ররা আসত[২২]।

নবদ্বীপের টোলের অন্যতম আকর্ষক বিষয় ছিল জ্যোতিষ শাস্ত্র। ১৭১৮ খ্রীঃ নবদ্বীপে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চাকেন্দ্র খোলা হয়। ওই চর্চাকেন্দ্রের অন্যতম কাজ ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবের ওপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্জিকা প্রণয়ন। জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চার জন্য পুঁথি সংগ্রহশালা অবশ্য প্রয়োজন। মনে করা যেতে পারে নবদ্বীপের ওই চর্চাকেন্দ্রগুলিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নত সংগ্রহশালা ছিল। রামরুদ্র বিদ্যানিধি এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ই. বি. কাউয়েল নবদ্বীপের টোল সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন।

শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের পুঁথি সংগ্রহশালার আলোচনায় আসা যাক এবার। এই সময়ে প্রচুর মৌলিক রচনা রচিত হয়েছে। উজ্জ্বল কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, ঘনরাম দাস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ডঃ সুকুমার সেন প্রায় পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় উদ্ধার করেছেন যাঁরা এই সময়ে পদরচনা করে গেছেন। এছাড়া এই সময়ে পুঁথির নকল হয়েছে রাশি রাশি[২৩]। এত সব নকল হয়েছে নিশ্চয় জনসাধারণের মধ্যে পুঁথির চাহিদার জন্যেই। শিক্ষানুরাগী সাধারণ মানুষদের মধ্যেও পুঁথি সংগ্রহের প্রচেষ্টা ছিল। ভারতচন্দ্র বাল্য বয়সে মাতুলালয় মণ্ডলঘাট পরগনার অধীনে নওয়াপাড়া গ্রামে ব্যাকরণ, অভিধান পাঠ করে চোদ্দ পনের বৎসর বয়েসে সংস্কৃত ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। পরে তিনি বাঁশবেড়িয়ার নিকটবর্তী দেবানন্দপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রামচন্দ্র

মুন্সীর আশ্রয়ে মনোযোগপূর্বক ফারসী শিক্ষা করেন। ভারতচন্দ্র তার অধীত বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখেছেন—

"ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক
পুরাণ আগামবেত্তা নাগরী পারসী"

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভারতচন্দ্র যে সমস্ত গৃহে আশ্রয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সেই গৃহস্বামীগণের মূল্যবান পুঁথিসম্ভার ছিল। এছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ যাঁরা আর্থিক সঙ্কুলান কবতে পারতেন তাঁরাও কিছু কিছু পুঁথির নকল সংগ্রহ করতেন। সাধারণ মানুষের এই যে চাহিদা এটাই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পূর্বাভাস বহন করে। এটা ঠিক যেন আরম্ভের আগে আরম্ভের মতো। সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য সকালবেলায় সলতে পাকানোর কাজ।

পুঁথি সংরক্ষণ ঃ এখনকার মতো তখন দোকান থেকে গ্রন্থ ক্রয় করা যেতনা। পুঁথি সংগ্রহ ছিল বিশেষ কষ্টের ব্যাপার। একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তখনকার দিনের মানুষ পুঁথি সংরক্ষণেও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। হরিতাল, অভ্রাদি প্রলিপ্ত করা হতো পোকামাকড়ের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য পুঁথির মধ্যস্থলে ছিদ্র করে কাঠের পাটা দিয়ে সজোরে বাঁধা হতো। পুঁথির মলাট হিসেবে দেখা যেত শাল সেগুন কাঠের পাটা। চামড়ার খোলও ব্যবহার করা হতো। কাঠের পাটার উপরে নানা নক্সা, চক্রাদি, চিত্রণাদিও থাকত। সাধক কবি কমলাকান্ত রচিত সাধকরঞ্জনের পুঁথি ১৯১৮ সালে অক্ষত অবস্থায় সংগ্রহ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভাষা ঃ এ যুগে বাংলা ভাষা রাজকার্যে ব্যবহৃত হত না। ফারসী ছিল এযুগের দরবারী ভাষা। চাকুরী পাবার অন্যতম শর্ত ছিল ফারসী ভাষা শিক্ষা। টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পুঁথির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ওই সময়ে বিদেশীদের গ্রন্থাগার ঃ বাংলায় স্বদেশীদের মধ্যে গ্রন্থাগার বা পুঁথিসম্ভার কষ্ট করে খুঁজতে হলেও ওই সময়ে বিদেশী বণিকদের কুঠি থেকে গ্রন্থাগারের ইতিহাস জানা যায়। তারা ওই সমস্ত বই জাহাজে করে ইউরোপ থেকে আনত। কাশিমবাজার কুঠিতে গ্রন্থাগার ছিল। জব চার্ণক কলকাতায় কুঠি স্থাপন করার পর সেখানেও গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। প্রথম প্রথম ইংরেজরাও হাতে লেখা পুঁথি দিয়ে কাজ চালাত কিন্তু ছাপাখানার দ্রুত উন্নয়ন তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আধুনিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে ইংরেজগণ নিঃসন্দেহে অগ্রণী। তারা প্রচুর পড়াশোনা করতেন। রবার্ট ক্লাইভ নিজে বই লিখতেন। গ্রন্থ সংগ্রহ ছাড়া তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন অচল ছিল[২৬]। তাই প্রাক-পলাশীযুগে স্বদেশী মানুষদের মধ্যে গ্রন্থাগার চেতনা তেমনভাবে পরিলক্ষিত না হলেও বিদেশাগত মানুষদের মধ্যে গ্রন্থ বা পুঁথি সংগ্রহ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এখন ইতিহাস গবেষণার বহুমাত্রিক (multi-dimensional) পদ্ধতির চলন হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুসন্ধানে তাই শুধুমাত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়। সেই সময়ের দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক জীবনের অনুসন্ধানও আমাদের করতে হবে এবং বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য জেনে নিতে হবে তখনকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সত্যরূপ।

এ যুগের শহর ও নগরকেন্দ্রিক অভিজাত জীবন এক ধরনের ছিল, আর গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও বৃত্তিধারী মানুষের জীবনচর্যা অন্যরকম ছিল। বাংলার হিন্দু মুসলিম অভিজাতরা যে জীবনযাপন করত তার সঙ্গে অনেকটা মিল দিল্লি-আগ্রা মুঘল রাজপুত চর্যার। এর মধ্যে মিশে আছে বহু সংস্কৃতির সমন্বয়। এ জীবনধারা অনেকখানি আন্তর্জাতিক শহরমুখী চকচকে আড়ম্বরপূর্ণ, অনেকটা বিদেশী। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রন্থ বা পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্ভব ছিল। তাই বিদেশীদের দেখেও তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার চেতনা জাগার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দূর গ্রামাঞ্চলে শান্ত, সাদাসিধা, দরিদ্র অধিবাসীদের পক্ষে গ্রন্থাগার চেতনার উন্মেষ সম্ভব ছিল না। এদের মধ্যে অনেকে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হিন্দুদর্শন, হিন্দুবিজ্ঞান শাস্ত্র কিংবা কোরান বা ইসলামী ধর্ম ও সাহিত্যের বই সংগ্রহ করতেন। সেটা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সমগ্র গ্রাম্য সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার চেতনার জাগরণ সেই সময় হয় নাই।

বাঙালীর জীবনচর্যায় শান্ত, ধীর, স্থির ভাবটি বিদেশীরা লক্ষ্য করেছিল। বাঙালীর আবেগ সংযত। বিক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু নীরব। তার কৃতজ্ঞতা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতা রক্ষায় বাঙালী ক্লান্তিহীন। যে কোন মূল্যে এ গোপনতা সে রক্ষা করে। এই রকম প্রবণতা থেকে বাঙালীর গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার অধিক সম্ভাবনা পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায়। সেই যুগেও বাঙালী গ্রন্থ বা পুঁথিমুখী ছিল একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কিন্তু গ্রন্থাগার বাঙালী জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা পড়ে নি।

এই আলোচনার পরিশেষে প্রাক-পলাশী বাংলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশংসা করতে পারলে খুশি হওয়া যেত কিন্তু আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ সেটা হতে দিল না। ওই সময়ে বাংলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার সর্বস্তরে সমান পরিব্যাপ্ত ছিল না। তাই পুঁথিসম্ভার বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত সেভাবে দেখা যায় না। নবাব, রাজা-মহারাজদের পুঁথি সম্ভার যতটা না ছিল, শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ তার চেয়েও বেশী ছিল অর্থ ও ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগত পুঁথিসম্ভারের অবশ্যই গুরুত্ব ছিল কিন্তু তা ছিল এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যেই আলোকরেখা দেখা যায় মানুষের পঠন-পাঠনের উৎসাহের মধ্যে। নিদারুণ দারিদ্র্য এবং সামাজিক অস্থিরতাও মানুষকে পুঁথি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। এই আসল সত্যটাই প্রাক-পলাশী বাংলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে।

সূত্র নির্দেশ

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **সাংস্কৃতিকী** ১ম খণ্ড বাকসাহিত্য কলিকাতা পৃ ৮৭
২ ইরফান হাবিব (সম্পা) **মধ্যকালীন ভারত** কে পি বাগচী কলি ১৯৯০ পৃ ২৭ ২৮
৩। পঞ্চানন মণ্ডল পুঁথি পরিচয় বিশ্বভারতী পৃ ৭
৪। বিনয় ঘোষ জনসভার সাহিত্য সংবাদ লাইব্রেরী কলি ৬ ১৩৬২ পৃ ১৫১
৫। ঐ
৬। ঐ
৭। আর্কিটেকচারাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে পুরাতন লিখিত বিবরণ এবং কাটরা মসজিদের চত্বরের ফলকে লিখিত বিবরণ।
৮। ওয়ালশ মেজর জে এইচ টল **এ হিস্ট্রি অব মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট** লণ্ডন জেরাল্ড ১৯০২ পৃ ১৩৫
৯। হুসেন সৈয়দ গোলাম দি শের মুতাখখিরিন ২য় খণ্ড বিভাগ ৭ম পৃ ১১
১০। [illegible] চট্টোপাধ্যায় **ইতিহাস অনুসন্ধান** ২
১১। সুবোধ মুখোপাধ্যায় **প্রাক পলাশী বাংলা** কে পি বাগচী কলিকাতা ১৯৮২ পৃ ১১৩
১২। ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত** ৩য় খণ্ড ২য় পর্ব মডার্ন বুক কলিকাতা ১৯৮১ পৃ ১২০
১৩ বিনয় ঘোষ **জনসভার সাহিত্য** সংবাদ লাইব্রেরী কলি ৬ ১৩৬২ পৃ ২৩
১৪। পঞ্চানন মণ্ডল **পুঁথি পরিচয়** বিশ্বভারতী পৃ ২২২
১৫। ঐ
১৬ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত** ৩য় খণ্ড ২য় পর্ব পৃ ৩৪
১৭ বিনয় ঘোষ **জনসভার সাহিত্য** সংবাদ লাইব্রেরী কলি ৬ ১৩৬২ পৃ ২৩
১৮। দীনেশচন্দ্র সেন **বৃহৎবঙ্গ** ২য় খণ্ড পৃ ৯১০ ৯১২
১৯। দ্রষ্টব্য ১৪ নং সূত্র
২০। সুবোধ মুখোপাধ্যায় **প্রাক-পলাশী বাংলা** পৃ ১০৩
২১। ঐ পৃ ১১০
২২। রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী বসুমতী পৃ ৫০ ৫১
২৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত** ৩য় খণ্ড ২য় পর্ব পৃ ২
২৪। Law N N **Promotion of learning in India by early European settlers up to about 1800, Lond. 1915, p-88**

বন্দর-নগর কলকাতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার

ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই অবগত আছেন উপনিবেশবাদের পশ্চাতে পুঁজিবাদের অবদান। নদী বা সমুদ্র এ বিষয়ে অপরিসীম সাহায্য করে। বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টাকালীন সময়ে বাংলার পুঁজির বাজার ছিল অকল্পনীয়ভাবে লাভজনক, শুধু তাই নয়, বিশ্বের তাবৎ বিনিয়োগকারীর পক্ষে আদর্শ বিনিয়োগ ক্ষেত্র। বাংলার বন্দরের সাহায্যকারী ভূমিকা সম্পর্কে সে রকম কিছু কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বাংলা তথা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে কলকাতা বন্দরের অবদান এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনোত্তর যুগে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ একটা স্বাধীন সমাজের, বন্দরের সমাজের অবক্ষয়ের প্রতি তার, নৈতিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে এই গবেষণাপত্রে আমরা আলোচনা করেছি।

কলকাতা অবশ্যই নদী বন্দর। তবে হুগলি বন্দরের ন্যায় দেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সামরিক দিক থেকে সুবিধার মাত্রাও সেজন্য বেশী। পর্তুগীজ-প্রতিষ্ঠিত হুগলি বন্দর থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া মুঘল সুবাদারের পক্ষে অনেক সহজ ছিল[১] এর অভ্যন্তরীণ অবস্থানের জন্য। ইংরেজরা পর্তুগীজদের এই হেনস্থা থেকে কিছু শিক্ষালাভ করেছিল কি না আমাদের জানা নেই, তবে সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় বন্দর প্রতিষ্ঠার বিষয় স্মরণে রাখলে এরকম একটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, পর্তুগীজদের ভাগ্য বিপর্যয়ে ইংরেজরা আশাতীতভাবে নিরাপদ ছিল। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় সমুদ্রের দিকে পালানো সহজসাধ্য হয়েছিল ইংরেজদের পক্ষে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই সেদিন তারা নিজেদের দূরদর্শিতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

বাংলা থেকে পর্তুগীজ বিতাড়নের তিনটি ফলশ্রুতি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজদের কাছে মাল বিক্রি করে বাংলার উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা যে দু'টো পয়সা পাচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় কুড়ি বছর এভাবে চলার পর বাণিজ্যিক শূন্যতা ভরাট করতে এগিয়ে এসেছিল ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকরা। তবে হুগলিতে তারা বেশীদিন থাকেনি। আরও দক্ষিণে সরে আসে কলকাতায়। পর্তুগীজদের বাংলা ত্যাগ আর ইংরেজদের আগমন— এই মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার বাণিজ্যের হাল ধরেছিল—আর্মেনীয়, ইহুদি, আরব, গুজরাটি, পার্সি প্রভৃতি জাতির ব্যবসায়ীরা —

বাঙালী ব্যবসায়ীরা নয়[১]। বাংলার মালের পর্যাপ্ত চাহিদা ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং ইউরোপে। মধ্যবর্তী সময়ে যে সব জাতির ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করত তাদের জাহাজ যেত পশ্চিম এশিয়ার মোখা বন্দরে, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন্দরগুলিতে, করমণ্ডল উপকূলে, সিংহলে এবং পশ্চিম ভারতের সুরাট বন্দরে। তাদের জাহাজ ইউরোপে যেত এরকম কোন তথ্য আমাদের নজরে আসেনি। খুব সম্ভবত পশ্চিম এশিয়ার মোখা বন্দর থেকে আধুনিক তুরস্ক বা ইরাক হয়ে ইউরোপে বাংলার মাল রপ্তানি হত। এরকম তথ্য **English Factories in India** গ্রন্থের বিভিন্ন ভল্যুমে পাওয়া যায়। ইউরোপের বাজারে বাংলার মালের যেমন ব্যাপক চাহিদা ছিল তেমনি বিপুল মুনাফাও অর্জিত হত। উপরোক্ত গ্রন্থেই পাওয়া যায় দু'শো/তিনশো গুণ বেশী দামে এই মাল ইউরোপে বিক্রি হত। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা বাংলার ব্যবসায়ী ও প্রশাসক শ্রেণীর লোভ সীমাহীন করে দিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ী হিসাবে ইংরেজদের আগমন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ী আগমনে হিসাবে বাংলার ব্যবসায়ী, প্রশাসক ও উৎপাদক শ্রেণী প্রাথমিক পর্যায়ে উৎফুল্ল হয়েছিল সন্দেহ নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে বলার কারণ, এই পর্যায়ে চাপ দিলেই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রশাসকদের কাছে ঘুষের থলি উপুড় করে দিত[৩]। সহজলব্ধ ঘুষের পয়সার আকর্ষণ ক্রমেই ব্যবসা বাণিজ্যে, বিদেশীদের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 'অতি-রাষ্ট্রিক' সুবিধা দিতেও কার্পণ্য করেনি[৪]। উৎপাদক শ্রেণী উৎফুল্ল হয়েছিল কারণ তারা ভেবেছিল, বাজারে ক্রেতা থাকায় তাদের মালের চাহিদা হবে এবং বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করবে[৫]। হাতে পয়সা আসবে, সঙ্গে সুদিন। এতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলার ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, প্রশাসক নিয়মিত বাণিজ্য শুল্ক ও ঘুষের টাকা আদায় করবে, আর উৎপাদক প্রচুর মাল বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু ইংরেজদের হিসেব ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা শুল্কের টাকা জমা দিল দিল্লীতে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে জোর করে সবাইকে হটিয়ে নিজেরা জায়গা করে নিল, আর পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে একচেটিয়াত্ব স্থাপন করে ইচ্ছামত দাম নির্ধারণ করল[৬]।

এই পরিস্থিতিতে বাংলায় ইংরেজ বণিকরা পাকাপাকিভাবে এল ১৬৫১ সালে — হুগলি বন্দরে। কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। অল্পদিন পরেই সরে এল দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের কাছাকাছি— কোম্পানির নতুন বন্দর কলকাতায়।

নদীবন্দর কলকাতায় বিদেশী জাহাজ আসার অর্থ দেশের অভ্যন্তরে চলে আসা। এভাবে ভিতরে চলে এলে দেশের মানুষের দুর্বলতা কোথায় তা বোঝা সহজ হয়। জাতির দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে এরপর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা ধুরন্ধর ইংরেজ ব্যবসায়ীর কাছে নতুন কিছু নয়। নদীতে জোয়ার এলে জাহাজ আসে, নইলে নয়। আধুনিক গবেষণামূলক বিশ্লেষণে কলকাতা বন্দর কী ধরনের বন্দর— 'বন্দর নগর', অথবা 'শুধু বন্দর' বা 'শুধু নগর'— কী বলা যেতে পারে? দ্বিতীয়ত, বন্দর ও নগরের সামাজিক অস্তিত্বের এবং সাংস্কৃতিক প্রকৃতি ও বিস্তৃতির পারস্পরিক ক্রিয়া ও

প্রতিক্রিয়া কীরূপ? তৃতীয়ত, বন্দর নগরের সামাজিক গঠন কী প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটে?

প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাবে বন্দরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কলকাতা বন্দর একটা শহর যেখানে সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত উদ্যোগ, বিনিময় এবং পরিবহনের সুসংগঠিত সংগঠন আছে। সাধারণ শহরের সঙ্গে বন্দর-শহরের পার্থক্য এখানে এবং এই পার্থক্য বন্দর-নগরের আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক গঠনকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে। বন্দর বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষকে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে। ফলে বন্দরে গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি। দেশের যে অবিমিশ্র সংস্কৃতি তা থেকে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। নগরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বন্দরে অনুপস্থিত। তাই বন্দরের সঙ্গে নগরের চারিত্রিক পার্থক্য দুস্তর। সেজন্য উভয়ের ক্রিয়াকলাপে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় না রাখলে বন্দর ও নগর উভয়ের স্বার্থই বিপন্ন হয়। বন্দরের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের ফল নাগরিকগণ যেহেতু ভোগ করছে সেহেতু নগরের সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত করার দায়িত্ব নাগরিকদের বহন করা বাধ্যতামূলক। নচেৎ শহর ও বন্দর—দুটো আলাদা জগতে পরিণত হবে যেটা উভয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষেই খারাপ। পৃথিবীর বেশীর ভাগ বন্দর-নগরে ভারসাম্যহীন অবস্থাই দেখা যায় — যার পরিণতিতে বন্দর এলাকা হয়ে দাঁড়ায় অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের পীঠস্থান। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা সমীচীন হবে না যে বন্দর এলাকার অপরাধমূলক কার্যকলাপের রেশ বেশ শক্তিশালী হয় ফলে এর প্রতিক্রিয়াও অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করে।

বন্দরের উন্নতির অর্থ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উন্নতি। ফলে, নিশ্চিতভাবেই বন্দরের ক্রিয়াকলাপে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। যেহেতু বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক স্বার্থের সহাবস্থান সম্ভব নয় সেইহেতু হিংসাত্মক ঘটনা বন্দর এলাকায় বেশী মাত্রায় ঘটতে দেখা যায়। রাজনীতির স্বার্থেই নগরের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, বিশেষ করে সদ্য উপনিবেশের খোলস ছাড়া ভারতের ন্যায় আধা সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন দেশে বন্দর এবং শহরের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না।

বন্দর তো দেশের অপরিহার্য অংশ। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেক বেশী। বন্দর-শহর বন্দরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সুতরাং শহরের উপর বন্দরের মানুষের জীবনে কোন ছাপই রাখেনি তা অভিজ্ঞ মানুষমাত্রই জানেন। বন্দরের উন্নতি অনেকাংশে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। Reeves ও তাঁর সহযোগী (Broeze ও Mc Pherson) এ বিষয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে গুণগত ও পরিমাণগত যে সূচক ব্যবহার করেছেন ভারতের বন্দরগুলির ক্ষেত্রেও তা উপযোগী[৭]। বন্দর-নগর ধীরে বন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ নগরে পরিণত হয় নগরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে। কলকাতা নগর বন্দরকে কেন্দ্র করেই প্রথম গড়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে বন্দর দক্ষিণে সরতে থাকে জলের গভীরতার কারণে, আর কলকাতা নগর গড়ে উঠতে থাকে বন্দর থেকে দূরে,

বন্দরের প্রভাব আপাতদৃশ্যে মনে হয় নগরে অনুপস্থিত। ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়ে পশ্চিম ভারতের উপকূলে লাহারি বন্দর, ক্যাম্বে, ব্রোচ, সুরাট, সোমনাথ, দ্বারকা, দিউ, বান্দের প্রভৃতি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গড়ে উঠেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে তাদের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের পার্থক্য অনেক। ঐ সব বন্দর গড়ে উঠেছিল দেশীয় মানুষের পরিশ্রমে ও প্রয়োজনে। কিন্তু কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ বিদেশী বণিক ইংরেজদের সাহচর্যে ও স্বার্থে।

কলকাতা বন্দরকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য দরকার ছিল সমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি। উত্তরে যেমন বিহার, উত্তপ্রদেশ, পূর্বে তেমনি আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারত। পশ্চাদ্‌ভূমির উপর একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন অনিবার্য ছিল। এই অনিবার্যতাই কি ইংলিশ কোম্পানীকে রাজ্য জয়ের জন্য ঠেলে দিয়েছিল? সপ্তদশ শতকে কলকাতা বন্দরকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে **Home Miscellaneous**-এ অনেক তথ্য আছে। বাণিজ্য সম্ভার সংগ্রহের জন্য নেপাল এবং নেপালের ভিতর দিয়ে তিব্বত যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল লণ্ডনের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বাংলার কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে। এরই পরিণতিতে 1767 সালে Captain Kinloch-এর নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল নেপাল গিয়েছিল। কিন্তু নেপাল সরকারের অসহযোগিতার জন্য ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এই পর্যায়ে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়েও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করেছিল এবং অবশেষে কয়েক বছরের মধ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, অবশ্য অন্য অজুহাতে। কিন্তু তখনই যুদ্ধ বাধলে বলা যেতে পারত কলকাতা বন্দরের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ। কিন্তু নেপাল জয় না করলেও ইংরেজরা আসাম জয় করতে এগিয়েছিল। নেপালে সুবিধা করতে না পারায় লণ্ডনের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আসাম ও ভুটানের মধ্যে দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য বাংলার সরকারকে নির্দেশ দেন। এই পর্যায়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তিব্বত, আসাম নয়। কারণ, তিব্বতের বাণিজ্য সম্ভার সম্পর্কে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। আসামের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে প্রথম জ্ঞাতব্য তথ্য সরবরাহ করেছিলেন George Bogle নামে ভারতে কোম্পানির এক কর্মচারী। Bogle সম্ভবত কলকাতা বন্দরে বাণিজ্য সম্ভার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই আসাম দখল করার জন্য লণ্ডনে কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির কিছুটা এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

> **"Assam itself is an open country of great extent and by all accounts well-cultivated and inhabited; the road into it either by land or the Brahmaputra lies open .... As the great objection against entering Nepal, etc. arises from the difficulty of keeping open the communications; so, on the other hand, the easy access to Assam, whether by land or water, invites us to the attempt" (Of conquest?)[৮].**

প্রাথমিক পর্বে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে তার পশ্চাদ্ভূমি আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'relatively inaccessible', কিন্তু তা সত্ত্বেও আসাম জয়ের পর কলকাতা বন্দরের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াল প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট বাণিজ্যের পরিমাণের প্রায় সমান। ১৮২৬ সালে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে আসামের সংযুক্তির পর কলকাতা বন্দর থেকে আসামের পণ্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক লণ্ডনে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে লিখিত চিঠিতে আসামে চায়ের উৎপাদনের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৪২ সালের মধ্যে ৪০০০ পাউণ্ড চা কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে লণ্ডনে প্রেরিত হয়[১]। ১৮৩৪ সালে থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে কলকাতা বন্দরের রপ্তানি বৃদ্ধির একটি পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হল[১০]:

১৮৩৪-৩৫	—	৪,১৫৮,৫৯৮	পাউণ্ড
১৮৩৫-৩৬	—	৫,৫৯৩,৮৯৬	”
১৮৩৬-৩৭	—	৬,৮৪৯,৫২৭	”
১৮৩৭-৩৮	—	৬,৯০৫,৮০৯	”
১৮৩৮-৩৯	—	৬,৯৫৪,৩৮১	”
১৮৩৯-৪০	—	৭,০০০,৯৪৩	”
১৮৪০-৪১	—	৮,২০৬,৭৭১	”
১৮৪১-৪২	—	৮,২২৫,৫৩৯	”
১৮৪২-৪৩	—	৭,৪৩৬,৩৬৯	”
১৮৪৩-৪৪	—	১০,০৭৬,৯০৪	”
১৮৪৪-৪৫	—	১০,২১৮,৭৪০	”
১৮৪৫-৪৬	—	১০,১০২,৭৫৫	”
১৮৪৬-৪৭	—	৯,৫১৯,৭৯৭	”
১৮৪৭-৪৮	—	৮,৮৬৬,৯২৮	”
১৮৪৮-৪৯	—	৯,৮১৯,৭৪২	”
১৮৪৯-৫০	—	১০,৫০২,২৪৪	”

সুতরাং, ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থেই কলকাতা বন্দরের সঙ্গে তার পশ্চাদ্ভূমির রেল ও সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা অনিবার্য ছিল। পরিণামে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় এর ফলে বাংলা ও আসামের মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল কি না, তাহলে তার উত্তর হবে নঞর্থক। কারণ, যথাসম্ভব শোষণ করে লাভের সমস্ত টাকা ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তবে কিছু মানুষ যারা ইংরেজদের সহযোগী ছিল তারা ফুলেফেঁপে উঠেছিল, কলকাতার সাবেক ধনীরা তারই উদাহরণ। আমাদের আলোচ্য সময়ে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব মাদ্রাজ (১৬৩৮) অথবা বোম্বাই বন্দর (১৬৬৭) অপেক্ষা বেশী ছিল,

কারণ রপ্তানির জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য, যথা— মসলিন, কাঁচা সিল্ক ও সোরা পাওয়া যেত এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে।

সূত্র নির্দেশ

১। পাদশাহনামা (হলিয়ট ও ডাওসন) VII ৩৫

২। উইলসন, Annals । ১২, ডাইরি অব উইলিয়াম হেজেস (ইউল সম্পাদিত) iii, ১৬৭ ফস্টার, **ইণ্ডিয়ান অ্যান্টি কোয়ারি**, ১৯১১, XI , পর্তুগীজ কর্তৃক হুগলি বন্দর স্থাপিত হয়েছিল ১৫৭৯ সালে। খুব দ্রুত এর উত্থান এবং প্রায় এক শতাব্দী ধরে জনবহুল এই বন্দর বাংলার সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে চলেছিল।

৩। লিনসোটেন, । ১৮৫, টম পাইরেস, । ৪৫, স্ট্রেনসাম মাস্টার । (রিচার্ড টেম্পল সম্পাদিত), ২৬,৩৯৯, ই এফ আই, ১৬১৮-২১, ৫৬।

৪। মোরল্যাণ্ড, আই ডি এ ২১২

৫। বালকৃষ্ণ, আর্লি ইংলিশ সেট্‌লমেণ্ট ইন বেঙ্গল P, IHRC ১৯৩৯। সমৃদ্ধ বন্দর হিসাবে কলকাতার আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকে।

৬। বালকৃষ্ণ, উপরোক্ত।

৭। আতিয়া হবিব কিদোয়াই, **পোর্ট সিটিজ ইন এ ন্যাশনাল সিস্টেম** ২০৭।

৮। মারখাম, সি আর (সম্পাদিত), **ন্যারেটিভ্‌স অব দ্য মিশন অব জর্জ বোগল টু তিব্বত**, ৫৭-৫৮

৯। আর সি দত্ত, **দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া**, II ৭৩

১০। পূর্বোক্ত, ১১৪। বোটানিক্যাল গার্ডেনের Dr Loyle 1827 ও 1834 সালে আসামে চা চাষ করার জন্য প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে। 1842 সালে প্রথম চা উৎপাদিত হয়। অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেছেন 1833 সাল। **ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি** পৃ ১৩৪।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ও সমসাময়িক বাংলার সমাজ-চিন্তা

সংযুক্তা রায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলায় যে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল তার পুরোভাগে ছিলেন বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পরবর্তীকালে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে দেশের শাসনভার যতদিন বিদেশীর করায়ত্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেশের সার্বিক উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে এ-দেশের মানুষের পরিচয় যত নিবিড় হতে থাকে, ততই সমাজের উচ্চ বর্গের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে আরও বেশি সাহেব হয়ে ওঠে। অপরদলের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও গর্ববোধ। সেই সময়ই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে ও বাংলায় সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। সমসাময়িক সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি তুলে ধরার সাথে সাথে মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগরূক করার জন্য বিভিন্ন নাটক, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচিত হতে থাকে। এমনই এক সময়ে বাংলার সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)।

শহরের শিক্ষিত উচ্চবর্গের মধ্যে যে নতুন সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল তার বিকাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তখন দিনরাত্রি সেখানে সাহিত্যের হাওয়া। তার সঙ্গে রয়েছে ললিত-কলা ও নাট্যচর্চার প্রতি তীব্র অনুরাগ। এরই মধ্যে নিহিত ছিল তাঁদের স্বদেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন — "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। .... তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন"[১]। এই পরিবেশেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন জোড়াসাঁকো থিয়েটার। পরবর্তীকালে তিনি নাট্যকার রূপে পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া ফরাসী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক নাটকটি একটি প্রহসন — 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। সনাতনপন্থীরা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম নিয়ে মহর্ষির ছত্রছায়ায় রয়ে গেছেন। সেই নব্যতন্ত্রী ব্রাহ্মপন্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে যে উগ্রতা দেখা দিয়েছিল তাকে ব্যঙ্গ করেই এই প্রহসনটি রচিত[৩]। **Indian Mirror** পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই এই নাটকের বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকত[৪]। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এর সুখ্যাতি করেছিলেন[৫]। তৎসত্ত্বেও এই নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন — "ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আমি আর অবরোধ-প্রথার বিরোধী (পক্ষপাতী?) নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগের দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই"[৬]।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত '**এমন কর্ম্ম আর করব না**' ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে '**অলীকবাবু**' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই নাটকটিতে তৎকালীন সমাজের কয়েকটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। নাটকের নায়িকা হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমচন্দ্রের 'নভেলের' একনিষ্ঠ পাঠিকা কিন্তু বাস্তবের জগত এবং নভেলের কল্পিত জগতের মধ্যে পার্থক্য করতে সে অক্ষম। নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা কল্পনা করে সেইরূপ আচরণ করতেই সে ব্যস্ত। অপরদিকে হেমাঙ্গিনীর বিবাহার্থী অলীকপ্রকাশ শেক্‌স্‌পীয়রের **'Webster Dictionary'**, বায়রণের **'Chamber's Atlas'** ও কালিদাসের **মুগ্ধবোধ** পড়ে অর্জিত বিদ্যা জাহির করতেই ব্যস্ত। নাটকটির আরেক চরিত্র গদাধর শুধুমাত্র পুরস্কারের লোভে হেমাঙ্গিনীর বিধবা দাসী প্রসন্নকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সত্যকারের সমাজ-হিতৈষণা তার উদ্দেশ্য নয়। গদাধরের বক্তব্য — "এতে দেশের ভালোই হোক আর মঙ্গলই হোক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না — আমার কিছু লাভ হলেই হল"[৭]।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হিতে বিপরীত' নাটকের মূল কাহিনী হল চতুর্থবার দার পরিগ্রহে আগ্রহী কৃপণ ভজহরি কীভাবে তার পৌত্রের হাতে জব্দ হন।

এই নাটকগুলিকে প্রহসন আখ্যা দিলেও এগুলিতে সমাজ-সচেতনতা অপেক্ষা হাস্যরস অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকি স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকেও শুধুমাত্র প্রথম অংশেই নারী স্বাধীনতার প্রতি বক্রোক্তি করা হয়েছে। মাইকেল বা দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে সমাজকে যতটা নাড়া দেওয়া হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে অনুরূপ কোনও প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এগুলিতে নতুন নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব খুবই স্পষ্ট। সমাজের উচ্চবর্গের মধ্যে সীমিত এই সংস্কৃতি শহরের বাইরে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে গ্রাম্য জীবনের পরিচয় ছিল কম। তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীরাও সকলেই নগর

কলকাতার বাসিন্দা ও এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। একমাত্র ব্যতিক্রম **'এমন কর্ম্ম আর করব না'** নাটকের সত্যসিন্ধুবাবু। তবে তিনি কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা হলেও সেখানকার একজন "সম্ভ্রান্ত" ব্যক্তি, এবং নাটকটির ঘটনাবলী ঘটছে কলকাতাতেই। এই নাটকগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত বলে তাদের ভাষাও সেই সম্প্রদায়ের ভাষা। কিন্তু নাটকের ভৃত্য বা দাসীরা অবশ্যই নিম্নবর্গের। তাই বোধ হয় তাদের মুখে নাট্যকার যে ভাষা বসিয়েছেন তা একটু অন্যরকম। 'স্বপ্নময়ী' নাটকেব পরিচয়লিপিতে ও মূল নাটকেও গ্রামের সাধারণ মানুষকে 'ইতরলোক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত প্রথম নাটকটি একটি প্রহসন হলেও, মূলতঃ জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকের বচয়িতা হিসেবেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। সেই সময় প্রকাশিত টডের 'রাজস্থান' তখনকার নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছিল[৭]। রাজপুত বীরদের গৌরবগাথার ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি নাটক তখন রচিত হয়। রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা'-র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুরবাড়ির সাথে হিন্দুমেলার যোগ ছিল খুবই নিবিড়। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন— "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব-কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে"[৮]। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্যরচনা করলেও তিনি ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন নি। তাঁর নাটকে বহু অনৈতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক — **'পুরুবিক্রম'** — প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর মূল বিষয় আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ প্রতিরোধে রাজা পুরুর বীরত্ব ও দেশপ্রেম।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **'সরোজিনী'** নাটকের পটভূমিকা হল আলাউদ্দীন খলজীর চিতোর আক্রমণ। পিতার কর্তব্যের সাথে রাজার কর্তব্যের দ্বন্দ্ব এই নাটকের মূল উপজীব্য। শত শত রাজপুত রমণীর জহরব্রত পালনের কাহিনী নাট্যকারের লেখনীর গুণে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের আমরণ সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত **'অশ্রুমতী'** প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। এটি হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতীকে আকবর-পুত্র সেলিমের অনুরাগিণী হিসেবে চিত্রিত করায় পাঠক ও দর্শকের একাংশ, বিশেষতঃ অবাঙালীরা ক্ষুব্ধ হন[৯]। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নাটকটির

অষ্টম সংস্করণে নাট্যকারের 'কৈফিয়ৎ'-এ আত্মপক্ষ সমর্থন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন যে "যাহাতে প্রতাপসিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি"[১০]।

'স্বপ্নময়ী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাজস্থানের বদলে বাংলার ইতিহাস থেকে তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বর্ধমানে শোভা সিংহ নামে এক তালুকদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে শোভা সিংহ হয়েছেন[১১] শুভ সিংহ যিনি দেবতার ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষদের জমিদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন।

তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশপ্রেম ও স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধের আদর্শকে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন। শত্রুর অধীনে দাসত্ব করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় — এই মানসিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

স্বদেশ চেতনার জন্মের সাথে সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ তাদের সংস্কৃতিগত বিভেদগুলি ভুলে একতার সূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রাদেশিক ইতিহাস নিয়ে রচিত হলেও তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরা ভারতবর্ষকেই তাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি রূপে বন্দনা করেছে। **'পুরুবিক্রম'** ও **'স্বপ্নময়ী'** নাটক এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল সমাজে নারীর মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও নারী স্বাধীনতার সমর্থক হয়ে ওঠেন। নারীর প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায় তাঁর নাটকের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ **'পুরুবিক্রম'** নাটকে রানী ঐলবিলা ও 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপের মহিষীকে উল্লেখ করা যায়।

দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচিকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিল। 'পুরুবিক্রম' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন — "এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিত রুচি মহোদয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়"[১২]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ প্রথম প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির জগতে। ভারতবর্ষে তখন জাতীয়তাবাদের অঙ্কুরোদগম হচ্ছে মাত্র। ইউরোপীয় সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতি কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নয় — তখন এটি প্রমাণ করতে সবাই সচেষ্ট। এর ফলেই জন্ম নিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ বা 'Cultural Nationalism'। ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করতে গিয়ে হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সংস্কৃতির কথা তুলে ধরা হল। জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াসে মুসলমান বিজেতাদের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজন্যবর্গের সংগ্রাম ও বীরত্বের কাহিনী প্রচার করা হল। কিন্তু এর ফলে সবার অগোচরে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হচ্ছিল তা কেউ লক্ষ্য করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই সীমাবদ্ধতা

কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর নাটকের ষড়যন্ত্রকারীরা সকলেই ইসলামধর্মাবলম্বী। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে সুরজমলের স্বগতোক্তি — "যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়"।[11]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'হিতে বিপরীত' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বশেষ মৌলিক নাটক। এরপর তিনি কিছু গীতিনাট্য রচনা করেছেন, সঙ্গীত চর্চা করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি নানারকম কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সঞ্জীবনী সভা স্থাপন করেন, সর্বভারতীয় পোশাক পরিকল্পনা করেন, বরিশালে স্টীমার চালানোর সূত্রে বিদেশী কোম্পানীর (ফ্লটিলা) সাথে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। স্বদেশী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছায় তিনি দিয়াশলাইয়ের কারখানা ও কাপড়ের কল তৈরী করার চেষ্টা করেন। তাঁর কোনও প্রচেষ্টাই সফল হয় নি। তবুও প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ বয়সে তিনি রাঁচিতে মোরাদাবাদি পাহাড়ের ওপর 'শান্তিধাম' নামক একটি বাড়িতে বাস করতেন। কলকাতার সাংস্কৃতিক জগত থেকে দূরে এই বাড়িতে বসেও তিনি সঙ্গীত সাধনা করে গেছেন, কিন্তু মৌলিক নাট্যরচনায় আর হাত দেন নি। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন — "ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম।....... দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম"।[12]

যে নাটকের মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম দেশবাসীর মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি আর সেই পথ অবলম্বন করেন নি কেন? যদি তিনি যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে এই দায়িত্ব দিয়ে সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে সেই রচনাগুলিতে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার ছায়া লক্ষ্য করা যায় না কেন? এর কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনার পাশাপাশি তিনি যে প্রহসনগুলি লিখেছিলেন সেখানেই বা তাঁর এই চেতনার প্রতিফলন ঘটেনি কেন, তারও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সমসাময়িক সমাজে তাঁর নাটক খুবই জনপ্রিয় ছিল। বিশেষত 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী'র রচয়িতা হিসেবে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুবই খ্যাতিলাভ করেন[13]। ততদিনে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্যও নাটকের দরজা খুলে গেছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক বহুবার অভিনীত ও প্রশংসিত হয়েছে। নাটকের মাধ্যমে দেশপ্রেম জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াসই বাংলায় সর্বপ্রথম হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রথমনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র ও তাঁর অন্যান্য সমসাময়িকরা তাঁরই প্রদর্শিত ধারা অনুসরণ করেছেন[14]। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে তাঁর এই প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করেছে।[15]

সূত্র নির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **জীবনস্মৃতি** কলকাতা ১৯৭৪ পৃ° ৮৬
২। সুশীল রায় **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ**, কলকাতা ১৯৬৩ পৃঃ ১৩৭
৩। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, **জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি**, কলকাতা, ১৯২০, পৃ° ১৩৭
৪। **তদেব**, পৃ ১৩৭
৫। **তদেব**, পৃঃ ১৩৮
৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, **নাট্যসংগ্রহ** কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ২৩৩
৭। অজিতকুমার ঘোষ, **বাংলা নাটকের ইতিহাস**, কলকাতা ১৯৮৫ পৃ ১২৮
৮। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, op cit পৃ° ১৪১
৯। সুশীল রায়, op cit পৃঃ ১৫০
১০। **তদেব**, পৃঃ ২১৭
১১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, op cit পৃ. ৬৭৩
১২। সুশীল রায়, op cit পৃঃ ১৪৫
১৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর op cit পৃ°৪৪০
১৪। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় op cit পৃ ১৪৮ ১৫১
১৫। **তদেব**, পৃঃ ১৪৮
১৬। অজিতকুমার ঘোষ op cit পৃ° ১২৮

প্রাক স্বাধীনতার যুগে জলপাইগুড়ির শিক্ষার বিস্তার একটি সমীক্ষা

প্রবাল সেনগুপ্ত

ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষাধারার মূল গতিসূত্র ছিল এমন কিছু ব্যক্তিকে তৈরী করা, যারা কিছু পাশ্চাত্য বিদ্যার কচকচানি শিখে ইংরেজদের ব্যবহারিক কাজে সাহায্য করবে। আমরা জানি যে, ইংরেজরা আসবার পরে ভারতবর্ষে পাঠশালা/মক্তব কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা প্রথম দিকে শিক্ষার প্রতি কোন নজরই দেয় নি। পরবর্তীকালে তারা নিজেদের স্বার্থেই সীমিত আর্থিক সাহায্য দিয়ে কিংবা স্থানীয় উৎসাহ উদ্দীপনাকে উস্‌কে দিয়ে কাজ চালানোর মত একটা শিক্ষাধারা তৈরী করেছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার এই 'ল্যাডার সিস্টেমকে' কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্তরা একটি বিকল্প শিক্ষাদর্শ চালু করতে চেষ্টা করেছিল। অবশ্য উভয় ধরনের চেষ্টাতেই সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

আমাদের আলোচ্য জলপাইগুড়ি শহরের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের শিক্ষা কাঠামোটিও মূলগতভাবে উপরোক্ত ব্যবস্থারই অনুরূপ। কিন্তু এক হয়েও, এক অর্থে স্বতন্ত্রতার অধিকারী। আসলে জলপাইগুড়ি জেলার জন্মের ইতিহাসের মধ্যেই ঔপনিবেশিক বাংলার অন্যান্য অংশের সঙ্গে তার ঐক্য ও বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্বটি লুকিয়ে আছে। আর জলপাইগুড়ির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাচিত্রে তার ছাপ পড়েছিল। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা একটি ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে স্থাপিত হয় ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী। ভুটানের অধিকারভুক্ত এই অঞ্চলটির উপর অধিকারের প্রশ্নে অনেক টানাপোড়েনের পর এই অঞ্চলের উপর বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

ইংরেজী শিক্ষা চালু হওয়ার আগে বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই পাঠশালা, টোল কিংবা মাদ্রাসা - মক্তব কেন্দ্রিক একটি বিকল্প শিক্ষাধারা চালু ছিল। এই শিক্ষা সম্পূর্ণতই বাঙালী বর্ণহিন্দু ও আশরফ মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জলপাইগুড়িতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে যেহেতু এই শ্রেণীগুলোর প্রায় অস্তিত্বই ছিল না, তাই এইরকম কোনো শিক্ষাব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠে নি। রাজবংশী, মেচ, টোটো প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় মানুষদের জন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থাই সেখানে ছিল না।

নূতন জেলার সদর শহর হিসেবেই জলপাইগুড়ি শহরের সূচনা হয়েছিল। ডুয়ার্সের অরণ্যসংকুল অঞ্চল থেকে নিরাপদ দূরত্বে তিস্তা নদীর পাশেই গড়ে উঠেছিল

শহরটি। স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ প্রশাসনের প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারী, আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীরা এল নতুন জেলার সদর শহরে। এর আগে ইংরাজরা বাংলার অন্যান্য অংশে কেরানি তৈরীর শিক্ষাদানের জন্য ও মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবী, স্বশ্রেণীভুক্ত, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ও কায়স্থের শিক্ষার জন্য উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু কিছু পদক্ষেপ নিলেও জলপাইগুড়ির আদি অধিবাসীদের শিক্ষাদানের কথা তারা চিন্তাই করেনি। সরকার কেরানি তৈরীর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে যেমন সারা বাংলাতেই প্রথম দিকেই নারী শিক্ষার প্রতি জোর দেয় নি, ঠিক সেই কারণেই জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সাধারণ শিক্ষার বিকাশে তারা খুব একটা উৎসাহ দেখায় নি।

কিন্তু দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছিল। পূর্বে উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্মচারীর পাশাপাশি চা বাগিচার কাজেও বাঙালী ভদ্রলোক সম্প্রদায় আসতে শুরু করেছিল। এই সমস্ত প্রথম প্রজন্মের পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মানুষেরা তথা 'ভাটিয়া বাবু'রা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে জলপাইগুড়ি শহরে এসে বসবাস করতে থাকলেন। পেশাগতভাবে জোটবদ্ধ এই সব মানুষেরা শহরে উকিল পাড়া, হাকিমপাড়া, বাবু পাড়ার পত্তন করে বসবাস করছিলেন। একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯০১ সালে এই অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৯৫,৮৯৯ জন।

এই নতুন আগত বাবুদের সন্তানদের পড়াশোনার প্রয়োজনেই শহরে পাশ্চাত্য শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার দাবী জোরদার হয়ে উঠছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নয়, বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রভাবিত অঞ্চলে তথা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও রংপুর সন্নিহিত অঞ্চলেই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ইংরেজ প্রভুদের অনুকরণে বাঙালী মধ্যশ্রেণীও প্রথম থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে জেলার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বদলে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেই ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯৪ সালে যে ৩৬ টি অনুদানভিত্তিক বিদ্যালয় জেলায় স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে ২০টিই ছিল জলপাইগুড়ির সদর মহকুমায় অবস্থিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রই বাঙালী হিন্দু-মুসলমান মধ্যশ্রেণী থেকে আগত।

তবে, এর অর্থ এই নয় যে, এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার ক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যশ্রেণী ইংরেজ প্রশাসনের সার্বিক সাহায্য লাভ করেছিল। সারা ভারতের মতোই জলপাইগুড়ি প্রশাসনও চাইছিল যে, নিজেদের সামর্থ্যেই কিংবা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর দ্বারাই ভারতীয়রা নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিক। অর্থাৎ, তারা ঢাক বানাবার দায়িত্ব এড়িয়ে মধু খাওয়ার শঠতা দেখাচ্ছিল। প্রথম যুগের অমৃতেশ্বরী বা করিমন্নেচ্ছা বিদ্যালয়, কিংবা পরবর্তী যুগের শিশু মহল বা শিশু নিকেতন বিদ্যালয়, ব্যক্তিগত কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের অন্যতম নিদর্শন। পাশাপাশি সরকারী চেষ্টাও অবশ্য ছিল।

একথা স্বীকার করা ভাল, জলপাইগুড়ি শহরের প্রথম উচ্চবিদ্যালয়টি সরকারী তত্ত্বাবধানেই গড়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়ি শহরে রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের

সচিব এইচ জে রেনল্ডস্ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য "ডিরেক্টর"কে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এই জেলা স্কুলের জন্য মাসিক ২০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন নীলমণি পাল।

প্রাথমিক পর্বে এই বিদ্যালয় বৃটিশ ঘনিষ্ঠ মধ্যশ্রেণীর স্কুল ছিল। ব্রিটিশ-ঘেঁষা অভিজাত রায়কত পরিবার ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই এই স্কুলে প্রবেশাধিকার পেত। স্কুল রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭৮ থেকে ১৯২০ অবধি এই স্কুলের ছাত্ররা মূলত মধ্যবিত্ত এবং রাজভক্ত পরিবার থেকে এসেছিল। ১৯১২ সালের দিল্লী দরবারের স্মরণে প্রতি বছর জিলা স্কুলে 'দরবার দিবস' পালন করা হত। স্কুলের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিদানে সরকার এই স্কুলটিকে 'মডেল স্কুলের' মর্যাদা দিয়েছিল। কিছুদিন এদিক-ওদিক স্কুল হবার পর, বিশেষ করে ১৯০৬ সালে সম্ভবত বৃটিশ বিরোধী ছাত্রদের দ্বারা বিদ্যালয় গৃহ ভস্মীভূত হওয়ার পর, সরকার ১৯১১ সালে তিস্তার তীরে কর্নেল হেদায়েত আলীর বাগান বাড়ীতে সুন্দর বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করে দেন। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের হস্টেল ছাড়াও ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ প্রভৃতি এই স্কুলে ছিল। একদিকে ইংরাজীর মাধ্যমে পড়াশোনার ফলে এই বিদ্যালয় মনের দিক থেকে ইংরেজ ছাত্র তৈরী করত, অন্যদিকে, সাধারণ ভারতীয় স্কুলের বিপরীত ক্রমে এখানে শারীরশিক্ষা, বিতর্ক, আলোচনা সভা প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষা দেওয়া হত — অবশ্যই সরকারী নির্দেশিকা মেনে। শেষ পরীক্ষার ফলাফলও ভাল হত। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত রেকর্ডপত্র ঠিকমতো পাওয়া না গেলেও ১৯২০ সালের রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতেও এই বিদ্যালয়ের ১৭ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশী-ভীত অভিভাবকেরা এই স্কুলকেই আদর্শ মনে করতেন।

তবে, আস্তে আস্তে, ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে মধ্যবিত্তের মোহ কেটে যাবার ফল হিসেবেই এই স্কুলটিতেও স্বদেশী আন্দোলনের ছাপ পড়েছিল। ইংরেজদের আখড়া বলে পরিচিত স্কুলটিরই ছাত্র রায়কত পাড়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কুখ্যাত ডি.আই.জি. সমসুল আলমকে হত্যা করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এই স্কুলের কৃতী ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্কুল পরিত্যাগ করে কলকাতায় স্বদেশী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯১০ সালে ঢাকা স্কুল থেকে আগত স্বদেশী মনোভাবাপন্ন প্রধান শিক্ষক রাজকুমার দাসের পরোক্ষ অবদানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবু স্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে শহরের অন্যান্য স্কুলের তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের খুব কম সংখ্যায় যোগদানের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে এবং ১৯৩৬-৩৭-এ স্কুলে সাড়ম্বরে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে, জেলা স্কুল মূলত ছিল ইংরেজদের তল্পিবাহক ভবিষ্যতের আই.সি.এস. এবং বিচারকদের উৎপাদন কেন্দ্র। যদিও শিক্ষাদানের মানের নিরিখে এই বিদ্যালয় শহরের সেরা ছিল। তার মূল্যও বড় কম নয়।

জলপাইগুড়িতে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে জেলা স্কুল ছাড়াও কিছু মধ্য বাংলা স্কুলও গড়ে উঠেছিল। স্কুলগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্। ১৮৭১ সালে জলপাইগুড়িতে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ সালে এটি মধ্য বাংলা এবং ১৯১০ সালে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৮৯৪ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, সেই সময় বিদ্যালয়টির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯০ জন ও মাসিক গড় ব্যয় ছিল প্রায় ৪৯ টাকা। সরকারী তত্ত্বাবধানে না থাকার জন্য এটি সরকারী সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল। সহজেই বোঝা যায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী তো দূরের কথা ছাত্রদের সঠিকভাবে শিক্ষাদান করাই একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে সরকারী বিদ্যালয়ের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও বাংলাদেশের অনেক বেসরকারী বিদ্যালয়ের মতোই, পরবর্তীকালের ফণীন্দ্র দেব স্কুলের সম্পদ ছিল অন্যান্য শিক্ষক সহ প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ সিংহ, সম্পাদক অনুদাচরণ সেনের বিদ্যালয়ের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা। প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ সিংহও পরবর্তীকালে সঠিক ভাবেই বলেছিলেন সর্বসাধারণের সন্তানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল 'সদর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়' বা এফ.ডি.আই। ১৯১৫ সালে বিদ্যালয়টির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩২৫ জন। সেই সময় শিক্ষা-অধিকর্তা ডি ডি. হর্নেল ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক ও স্থানের অভাবের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, এই রকম বিদ্যালয়ের সরকারী অনুমোদন থাকাই উচিত নয়। অবশ্য প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ সিংহ, সম্পাদক অনুদাচরণ সেনসহ এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের একটি বড় অংশ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে, প্রথম থেকেই এই বিদ্যালয় সরকারের বিরাগভাজন ছিল। হর্নেলের মন্তব্যে তার প্রতিফলন পড়া আশ্চর্যের নয়।

১৯১৮ সালের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের সময় স্কুলটির নাম 'ফণীন্দ্র দেব ইন্সটিটিউশান' হয়। এই সময় রাজা প্রসন্নদেব রায়কত নগদে ও দ্রব্যে প্রায় ৫০,০০০ টাকা দান করলে বিদ্যালয়টি উচ্চবিদ্যালয়সুলভ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা জি.এফ.ওটেন বিদ্যালয়টির অবস্থা সম্বন্ধে যে সদর্থক রিপোর্ট দেন, তার ওপর ভিত্তি করে এবং আশুতোষ মুখার্জীর সহায়তায় ১৯২০ সালে স্কুলটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মাসে মাসে সরকারী সাহায্য মেলে ২৪০ টাকা।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধূলাতেও এই বিদ্যালয় যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়েছিল। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, কনিষ্ক নাথ ঘোষ প্রভৃতি প্রধান শিক্ষক খেলাধুলায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। রাজশাহী বিভাগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ট্রফি ১৯২৪ সালে দখল করেছিল এই বিদ্যালয়।

প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রভাবিত করেছিল। ১৯২০ এবং ১৯৩০-এ গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনের ঢেউ জলপাইগুড়ি শহরের এই বিদ্যালয়েই সবচেয়ে বেশী পড়েছিল। এর ফলে বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। দেশবন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জলপাইগুড়ির দানবীর সোনাউল্লা

সাহেব স্কুলটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বারো হাজার টাকা দান করেছিলেন। বিদ্যালয়ের অভিভাবকতুল্য প্রসন্নদেব রায়কত আইন সভায় সরকারপক্ষের সদস্য হলেও বাঙালী শিক্ষিত মানসে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন। তাই জাতীয় আন্দোলনে ফণীন্দ্র দেবের যোগদানকারী ছাত্রদের বিদ্যালয় থেকে চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়নের সরকারী আদেশ অমান্য করে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ছাত্রদের ধরাইয়া দিয়া আমরা পুলিসদের গোয়েন্দার কাজ করিতে পারিব না'।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী জলপাইগুড়িতে আসেন। স্কুলের পরিচালক অনুদাচরণ সেন এবং তারিণীপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর সকল ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয় চেতনা এতটাই প্রবল ছিল যে, স্কুলেরই শারীর শিক্ষককে তার কাজের প্রয়োজনেই বিদেশী পোষাক পরতে হত বলে, অন্য শিক্ষকেরা ব্যঙ্গ করে বলতেন, 'হ্যাট্টো, কোট্টো, প্যাণ্টো। লেফটো, রাইটোহণ্টো ডাইন হাতে ছড়ি। বাঁয়ে অচল ঘড়ি'। এই বিদ্যালয়ের কিছু কিছু ছাত্র গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনেও যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক খগেন দাসের উৎসাহে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'বালক সংঘ' নামে সমিতি গঠন করে এই গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।

প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার বর্ণচ্ছটায় যখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আচ্ছন্ন সেই সময়ের প্রতীক ছিল জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল। ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বেও আমরা সেই মুগ্ধতার রেশ দেখতে পাই। কিন্তু পূর্বতন মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় যখন ফণীন্দ্র দেব উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তখন জলপাইগুড়ি শহরের ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ইংরেজ প্রশাসনের সদর্থক রূপটি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছিল এবং তাঁরা স্বনির্ভর হতে চাইছিলেন। এরই প্রতীক যেন ছিল ফণীন্দ্র দেব ইন্সটিটিউশন।

এর আগেই অবশ্য ১৯০৫-এ স্বদেশী শিক্ষার জোয়ার জলপাইগুড়ি শহরেও আছড়ে পড়েছিল। সেই সময় ছাত্র সমাজের একাংশ জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়। তার ঢেউ, এমনকি জিলা স্কুলেও পড়ে। মূলত রাজভক্ত কর্মচারী ও অভিজাতদের সন্তানরাই এই বিদ্যালয়ে পড়ত। তা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের সময় এই স্কুলের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রথম স্কুলের সমাপ্তি পরীক্ষা বয়কট করে ১৯০৬-এ কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯০৭ সালে তারিণীপ্রসাদ রায়, শশীকুমার নিয়োগী, জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল প্রমুখের চেষ্টায় শহরের আর্য নাট্য সমাজ গৃহে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য স্থানের মতই এই বিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে আবেগ যতটা ছিল, আগ্রহ ততটা না থাকার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের ভাটার সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যালয়েরও অবলুপ্তি ঘটে। তবে এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রভাব পরবর্তীকালের জলপাইগুড়ির শিক্ষাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মধ্যে সোনাউল্লা ইন্সটিটিউশনের জন্মবৃত্তান্ত একটু অন্যরকম। জেলা স্কুল ও ফণীন্দ্র দেব স্কুলে ভর্তি হতে অপারগ কিছু ছাত্রের দাবীতে রায়কত বাড়ীর জগদিন্দ্র দেব, রাজবাড়ীতে ১৯২০ তে একটি স্কুল স্থাপন

করেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে অন্য কাজ ছেড়ে তরণীমোহন চক্রবর্তী এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জগদিন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের ভার বহনে অক্ষমতা জানালে, প্রধান শিক্ষক তরণীবাবু জলপাইগুড়ির মৌলবী মহম্মদ সোনাউল্লার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সোনাউল্লা স্বনামে বিদ্যালয়টির নামকরণ করার শর্তে নিজ বাড়ীতে স্কুলটি চালাতে রাজী হলেন। স্কুলের জমিসহ পাঁচ হাজার টাকাও দান করেছিলেন তিনি। তবে, স্কুলটি পুরোপুরি সোনাউল্লা সাহেবের উপর নির্ভরশীল থাকার ফলে কিছু স্বাধীনতাও হারিয়েছিল। সোনাউল্লা সাহেবের ছেলের জন্ম উপলক্ষে স্কুল ছুটি দেবার হাস্যকর ঘটনাও ঘটেছিল সেই সময়।

১৯২৮ সাল অবধি সোনাউল্লা ইন্সটিটিউশনটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। তখন, স্কুলের শিক্ষক সংখ্যাও ছিল খুব কম। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করার পরে, ১৯২৮-এর মার্চ মাসে আবেদনের ভিত্তিতে ১৯২৯ সালে স্কুলটি সরকার তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছিল।

তবে, দারুণ উদ্যোগী প্রধান শিক্ষক তরণীমোহন চক্রবর্তীর চেষ্টা সত্ত্বেও এই স্কুল শহরের মেধাবী ছেলেদের আকর্ষণ করতে পারে নি। এমনকি তোষামোদ করেও স্কুলের ছাত্র জোগাড় করতে হত। প্রথমবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১২ জনের মধ্যে দশজন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছিল এবং সেটাকেই 'ভালো' ফল বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

তবে, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকলেও খেলাধুলাতে সোনাউল্লা স্কুল জলপাইগুড়ি শহরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সোনাউল্লা স্কুল থেকে প্রথম ব্যাচের ম্যাট্রিক উত্তীর্ণদের মধ্যে ডাক্তার নগেন রায়, সুশীল চক্রবর্তী ও অমূল্য মিত্র মজুমদারের মত খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। প্রধান শিক্ষক তরণীবাবু এবং হরিপদ চৌধুরী ও বিনয় সেনের মত শিক্ষকেরা পড়াশোনার পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্রীড়াচর্চার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টসে বিদ্যালয় কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। স্কুলের ছাত্রদের এই ক্রীড়াপ্রীতি তাদের জাতীয় চেতনার দ্যোতক ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, জেলা স্কুলের অভিজাত মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিকতা ও ফণীন্দ্র দেবের জাতীয় চেতনা সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত প্রবণতার পাশাপাশি সোনাউল্লা স্কুল মধ্যবিত্তের দ্বারা পরিচালিত হলেও প্রচুর নিম্নবৃত্তের হিন্দু-মুসলিম ও আদিবাসী এই স্কুলের ছাত্র হতে পেরেছিল। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তের এই স্কুলের প্রতি অনীহাজনিত শূন্যতারই সুযোগ নিয়েছিল তারা।

প্রথম থেকেই সোনাউল্লা স্কুল জাতীয় চেতনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোনাউল্লা সাহেব স্বয়ং দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টির পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। তিরিশের দশকে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৩৯ সালে জনৈক ছাত্র স্কুলের দেওয়ালে 'বন্দেমাতরম্' লিখলে, স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারী কোপের ভয়ে ছাত্রটিকে শাস্তি দিলে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন জেলা সম্পাদক পরিমল মিত্রের নেতৃত্বে স্কুলের ছেলেরা একটি সফল ধর্মঘট করে। ১৯৪২-এর

আন্দোলনেও সোনাউল্লার ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল। জলপাইগুড়ির সংগৃহীত ছাত্র-আন্দোলনেব কেন্দ্রভূমিই ছিল সোনাউল্লা স্কুল।

আমরা আগেই বলেছি যে সরকারী কাজে তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের অংশ গ্রহণ অসম্ভব ছিল। তাই প্রশাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যয় কবতে খুব একটা উৎসাহিত ছিল না। জলপাইগুড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। করলা নদীর ধারে ১৮৭২ সাল থেকেই মেয়েদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু অভিজাত ঘরের মেয়েরা নিজেদের বাড়ীতেই সেইসময় সামান্য শিক্ষা পেত। পরবর্তীকালে কোচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী ও জলপাইগুড়ির রাণী অশ্রুমতির উৎসাহ ও আনুকূল্যে বালিকা বিদ্যালয়টি উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষিকা সুনীতিবালা চন্দ চা-বাগান ও সরকারের সাহায্য নিয়ে ১৯২৭-এর মধ্যে বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। একাজে তিনি তাঁর স্বামী দেবেন্দ্রকুমার চন্দ্র ও তারিণীপ্রসাদ রায়ের সাহায্য পেযেছিলেন। প্রতিষ্ঠানগতভাবে ইংরেজরা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে অনুৎসাহিত হলেও উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ডেপুটি কমিশনার বেকেট সাহেব এই বিদ্যালয়েব উন্নয়নে সাহায্য করেন। সুনীতিদেবী বিদ্যালয়েব গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। প্রথম দিকে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিকার প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ও সরস্বতী উপাধিপ্রাপ্তা সুনীতিবালা চন্দের সময় স্কুলটি গৌরবের অধিকারী হয়। শহরের বিখ্যাত মুসলিম জালান মিঞা এবং তাঁর স্ত্রীও স্কুল গড়বার প্রাথমিক পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯১১-১২ সালে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীর বদান্যতায় স্কুলটি পাকা হয়। এখানকার ছাত্রীনিবাসে হিন্দু-মুসলিম মেয়েরা একত্রে থাকত, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর মনে হয়। কঠোর শৃঙ্খলা এই বালিকা বিদ্যালয়টির বৈশিষ্ট্য ছিল। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্যায়ে কলকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্রনেতা রামেশ্বরের মৃত্যুতে এই স্কুলের ছাত্রীরাও প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছিল। শহরের বিশিষ্ট পরিবার রাথুতদের সহায়তায় ১৯২৮ খ্রীঃ দশ বারোটি ছোট মেয়ে নিয়ে একটি পাঠশালার সূচনা হয়। প্রথম শিক্ষিকা ছিলেন অনুপমা দেবী। পরে এটি কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্বাধীনতা পূর্ব যুগে ১৮৮৮ সালে শহরে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রেকর্ডে উল্লিখিত এই বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে অবলুপ্ত হয়েছিল। বেগম ফয়েজুন্নেসা বিদ্যালয়ের নামও এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

জলপাইগুড়ির নারী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে মনে রাখা দরকার যে ইংরেজ প্রশাসনের সাহায্য ব্যতিরেকে দেশময় মধ্যবিত্ত এবং স্বদেশপ্রেমিক মানুষদের সহায়তাতেই এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বাংলার অন্যস্থানের মতো শুধুমাত্র পুরুষদের দয়ার উপর নির্ভর না করে তিন মহিয়সী নারী মহারানী সুনীতি দেবী, রানী অশ্রুমতী

এবং সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতিবালা চন্দ বিশিষ্ট অবদান রেখেছিলেন। অন্যদিকে, নারী শিক্ষা এই শহরে কখনোই তৃণমূলস্তরে প্রবেশ করে নি। স্থানীয় রাজবংশী ও মুসলিম নারীরা প্রচুর সংখ্যায় কখনোই এই সমস্ত বিদ্যালয়ে স্থান পায় নি। তাদের দারিদ্র্যের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত নারীশিক্ষার প্রবক্তাদের উদাসীনতাও এক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করি।

চা ও পাট শিল্প কেন্দ্রীয় রাজশাহী ডিভিশনের অন্যতম প্রধান শহর হিসেবে জলপাইগুড়িতে উনবিংশ শতকের সাতের দশক থেকে শিক্ষা বিস্তারে একটি ধারা জোরাল না হলেও স্থানীয় করলা নদীর স্রোতের মতই তির তির করে বইছিল, যদিও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। আর উচ্চশিক্ষার জন্য শহরের লোকদের রংপুর, কুচবিহার, কলকাতাতে ছুটতে হত। তবে ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সাল অবধি সময়কালটি জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষাচিত্রের একটি অনুজ্জ্বল পর্ব। ১৯৩০ সালের পৃথিবীব্যাপী মন্দার প্রভাব জলপাইগুড়ির চা ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার মন্দা সৃষ্টি করে। ফলে পরিকাঠামের ক্ষেত্রে শিক্ষাও যথেষ্ট ব্যাহত হয়। ১৯৩৯-এর মহাযুদ্ধও এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। ১৯৩৯-এ জলপাইগুড়ি জেলাতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। চারুচন্দ্র সান্যাল, খগেন দাশগুপ্তের মত জিলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের নেতৃত্বে এই সম্মেলন, শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে।

স্বাধীনতা নমঃ গান্ধীজীর এই বাণীকে শিরোধার্য করে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি ইংরেজরাও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ছাত্র শক্তির সমর্থন লাভের জন্য কদমতলা সিনেমা হলে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে একটি সভা ডাকে, কিন্তু ছাত্ররা সভাটি ভণ্ডুল করে দেয়। সভা সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তামসরঞ্জন রায়কে এর জন্য ব্রিটিশরা তীব্র তিরস্কার করে।

১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষা কাঠামোতে একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। আমরা আগেই বলেছি শহরে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাদানের একটি কাঠামো গড়ে উঠলেও কলেজীয় শিক্ষার জন্য শহরের অধিবাসীদের অনাত্র যেতে হতো। এই পরিস্থিতিতে শহরের শিক্ষিত মানুষজন একটি কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সদর গার্লসের প্রধানা শিক্ষিকা সুনীতিবালা চন্দ তাঁর উৎসাহী সহকর্মী ও স্বামী দেবেন্দ্রকুমার চন্দ ও সোনাউল্লা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তরণীমোহন চক্রবর্তী এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রস্তাবের পরিপূরক হিসেবেই জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র রাউতের পুত্র নলিনীকান্ত রাউত তার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে চার বিঘা জমি ও নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় এ. সি. কলেজ। কোনো সরকারী কলেজের দয়াদাক্ষিণ্য নয়, জলপাইগুড়ির শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা কলেজীয় শিক্ষাপ্রসারেও স্বনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খান বাহাদুর মুকুলেশ্বর রহমান, চা-বাগান মালিক ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের যথেষ্ট অবদান ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে সুনীতিবালা চন্দ, দেবেন্দ্র চন্দ, ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মত ব্যক্তিরা

বিনা পারিশ্রমিকে এখানে অধ্যাপনা করে কলেজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন, সরকারী সাহায্যের কোন তোয়াক্কা তাঁরা করেন নি। অবশ্য জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা কোম্পানী কলেজের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এটা সত্য যে, ঔপনিবেশিক কাঠামো প্রদত্ত সামান্য কেরানি তৈরীর শিক্ষাব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে বাংলার অন্যান্য স্থানের মতই জলপাইগুড়ির হিন্দু ও মুসলমান মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জীবিকার প্রয়োজন ও জীবনের প্রয়োজনের মেলবন্ধন তাঁরা সার্থক ভাবেই করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অংশের তুলনায় জলপাইগুড়ি নারী শিক্ষার বিস্তারে যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। ঔপনিবেশিক যুগের শেষপর্বে উচ্চশিক্ষার দ্বারও খুলে গিয়েছিল জলপাইগুড়িতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য একটাই, জলপাইগুড়ির সরকারী কেরানি তৈরীর শিক্ষাই হোক আর মানুষ গড়ার শিক্ষাই হোক, শেষদিন পর্যন্ত তা সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই। জেলার জনসংখ্যার বৃহদংশ, অধোবর্গ রাজবংশী, মেচ, টোটোদের অন্ধকার ঘরে তা আলো জ্বালাতে পারেনি। সার্বিক ভাবেই এ শিক্ষা ছিল মধ্যশ্রেণীর, মধ্যশ্রেণীর জন্য এবং মধ্যশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা।

সূত্র নির্দেশ

১। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৮৬৯-১৯৬৮, মহালয়া ১৩৭৭-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি
২। মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা — ১৩৯৪, ইং ১৯৮৭-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি
৩। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা, ১৯৭৬
৪। ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয় — পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৯২-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি
৫। সোনাউল্লা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় — হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৮৪-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি
৬। জলপাইগুড়ি সদর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, ১২৫ বছর স্মরণিকা ১৯৯৫-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি
৭। চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারকগ্রন্থ — ১৯৯২-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি
৮। আনন্দ চন্দ্র কলেজ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৯৩-এর অন্তর্গত প্রবন্ধ
৯) ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, জলপাইগুড়ি — অবনীমোহন কুশারী এট অল। ১৯৮১
১০। ইকনমি, সোসাইটি এণ্ড পলিটিকস ইন বেঙ্গল — জলপাইগুড়ি ১৮৬৯-১৯৪৭, রণজিৎ দাশগুপ্ত, ১৯৯১।
১১। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস — সুকুমার দাস, ১৯৮২
১২। উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি — উপেন্দ্রনাথ বর্মন — ১৩৯২

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রী সুজাতা নাথ নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

উত্তরাখণ্ড আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা

সোনালী চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। কয়েকটি বিষয় আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন - ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা, সংরক্ষণ ইত্যাদি। সকল আন্দোলনের চরিত্র ও প্রকৃতি এক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা নিছক কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবি জানায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতা অধিগ্রহণের কোন বাসনা তারা প্রকাশ করে না। শাসক শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত নীতিসমূহের পরিবর্তন দাবি করে অথবা নতুন কোন নীতি অনুসরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এই ধরনের আন্দোলন প্রায় সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বাভাবিক ঘটনা। ভারত ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখানে এক বিশেষ ধরনের আন্দোলন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল, আন্দোলনকারীরা একটি অঙ্গরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, নতুন একটি রাজ্য গঠনের দাবী জানায়। উত্তরপ্রদেশে এ ধরনের একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সেই আন্দোলনটি এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

উত্তরাখণ্ড অঞ্চল আলমোড়া, নৈনিতাল, পিথোরাগড়, দেরাদুন, উত্তরকাশী, তেহরী গাড়োয়াল, চামোলি, পৌরি এই আটটি জেলা নিয়ে গঠিত[১]। এই অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক সত্তা আছে। এখানকার সেচযোগ্য জমির পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং এখানকার কৃষি মূলতঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভর। তবে এখানকার শিক্ষার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলের (যা মানসখণ্ড নামে পরিচিত ছিল) অধিবাসীরা মল্লাদের সঙ্গে তাদের রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম করেছিল। ব্রিটিশরা এই রাজ্যগুলিকে আগ্রা ও অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করে এবং তেহরীকে স্বতন্ত্র ভারতীয় রাজ্য হিসেবে গণ্য করে। নেহেরু স্বাধীনোত্তর ভারতের সংবিধানে অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হওয়ার পর কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের সাংসদরা স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গঠনের জন্য কমিশনের কাছে স্মারক লিপি পাঠালেও সেই দাবীও বাস্তবায়িত হয়নি[২]। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, তেহরীর প্রাক্তন মহারাজ নেহেরুর কাছে পার্বত্য জেলাসমূহের স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের প্রস্তাব জানানোর সময় থেকেই উত্তরাখণ্ড সংক্রান্ত সমস্যার সূত্রপাত হয়[৩]। ১৯৯১ ও '৯৩ সালে বি.জে.পি দল পরিচালিত এবং সমাজবাদী দল ও বহুজন সমাজ পার্টি পরিচালিত দুটি সরকার রাজ্য বিধান সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব ক্রমে কেন্দ্রীয়

সরকারের কাছে স্বতন্ত্র উত্তরাখণ্ড রাজ্যের দাবী জানায় এবং তাতে নতুন রাজ্যের সীমারেখারও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কর্ণপাত করেননি[৪]।

বাজনৈতিকভাবে উত্তরাখণ্ডীদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তারা প্রাথমিক ভাবে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল[৫]।

অধিকাংশ সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতেই আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার মনোভাব বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। উত্তরাখণ্ড আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথমতঃ বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী হিসেবে পাহাড়ী অঞ্চলের পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় গ্রহণ করা হলেও সেই অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ কিছুই করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সঠিক ভাবে হয়নি।

চতুর্থত, নগরায়নের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৯ ভাগের মধ্যেই সীমিত থেকেছে। দেরাদুন ও নৈনিতাল ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের অগ্রগতি হার রাজ্য ও সারা ভারতের তুলনায় অনেক কম।

পঞ্চমত, কর্মনিযুক্তির সংখ্যা কম হওয়ায় বাধ্য হয়ে জনগণ ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেন এবং এ ভাবেই এই অঞ্চল 'মনি অর্ডার' অর্থনীতিতে পরিণত হয়[৬]। উত্তরপ্রদেশের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত এই অঞ্চলের অধিকাংশ জনগনেবই জীবিকা নির্বাহ শ'মিল ও আটাচাকিতে হয়ে থাকে। কৃষি থেকে তাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এখানকার জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত নয় এবং জমি থেকে যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া যায় না। এখানে শিল্পের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য কর্মনিযুক্তি সম্ভব হয় না। ফলতঃ মাত্র ১৫ বছরের কোন কিশোরকেও জীবিকার অন্বেষণে সমতল ভূমিতে নেমে আসতে হয়। এই কারণে কৃষিকার্যেও লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই অবস্থায় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়নের কথা ঘোষণার ফলে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে[৭]। কিন্তু প্রাথমিকভাবে আন্দোলনটি ছিল এক অদ্বিতীয় ভৌগোলিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত একটি অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের দাবী। উত্তরপ্রদেশের সরকার অন্যান্য পাশ্চাদপদ জাতির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করলে উত্তরাখণ্ড অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররা ঐ ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে[৮]। পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগ হল অন্যান্য অনগ্রসর জাতি[৯]। পূর্বে পাহাড়ী অঞ্চলের সকল নাগরিক চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পেত। বহিরাগতরা ঐ অঞ্চলের চাকরী গ্রহণ করত না। কিন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হলে তার সুযোগ বহিরাগতরাই পাবে এবং অধিকাংশ পদই শূন্য থাকার সম্ভাবনা থাকবে। তাই ছাত্ররা দাবী জানায় এই সংরক্ষণের সুযোগ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে উত্তর প্রদেশের সকল জেলার অধিবাসীদেরই দিতে হবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব এই দাবী অগ্রাহ্য

করে প্রকৃতিগতভাবে মূলত রাজনৈতিক একটি আন্দোলনকে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন[১] । এছাড়াও তিনি রাজ্য পুলিশ ও প্রাদেশিক সশস্ত্র কনস্টেবলদের যাদবীয়করণ করার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রাদেশিক সশস্ত্র কনস্টেবল বিভাগে চাকুরী প্রাপ্ত ৩৫০০ জনের শতকরা ৭০ ভাগই যাদব[১১]। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। উত্তরাখণ্ডীরা স্লোগান তোলেন, 'উত্তরাখণ্ড রাজ্য হামারা জন্মসিদ্ধ অধিকার হ্যায়', 'দো অভি দো, উত্তরাখণ্ড হামে দো' ইত্যাদি।

পূর্বে এই অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র পৌর আইন এই অঞ্চলের জনসাধারণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন হিন্দু আইন অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ সহ ভারতের সর্বত্র মিতাক্ষরা ব্যবস্থা চালু থাকলেও উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে 'কর ভাগ' ব্যবস্থা চালু ছিল, এবং তা বিশেষ প্রথাগত আইনের দ্বারা সংশোধন করে খাসা পরিবারগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র পার্বত্য বিভাগ সৃষ্টি করেন। পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বিভাগে একজন করে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়। বি.ডি. পাণ্ডে প্রমুখ মনে করেন, এই ধরনের স্বাতন্ত্র্য উত্তরপ্রদেশ সরকার মেনে নিলে সংরক্ষণের প্রশ্নেও এই অঞ্চলকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবে গণ্য না করার কোন কারণ নেই[১২]।

ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল, যেমন—কাশ্মীর, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, গোর্খাল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির মত এই অঞ্চলের আন্দোলনকারীরা কিন্তু ব্যাপক হিংসাত্মক সামরিক, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পথ অবলম্বন করেনি, তারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের দাবী সরকারের নিকট পেশ করেছে। তারা ঘেরাও, ধর্ণা, ধর্মঘট ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করে। তবে পুলিশি অত্যাচার আন্দোলনকে কিছুটা হিংসাত্মক করে তোলে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিচালনার প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা দেরাদুনে একজন ডি.এস.পি.-কে হত্যা করে। তাছাড়া বহু সরকারী অফিস ও পরিবহনে তারা অগ্নিসংযোগ করে[১৩]।

এই আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আন্দোলনে এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রখ্যাত পরিবেশবাদী সুন্দরলাল বহুগুনা ও ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্ত চণ্ডিপ্রসাদ ভাট আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন[১৪]। সমস্ত স্তরের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ছাত্রসম্প্রদায়, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ছত্র ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তরাখণ্ড সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি, এইচ.এম.কে.পি ও সমতা পার্টি এবং সি.পি.আই.এম.এল. দলের ছাত্র সংগঠন এ.আই.এম.এ. এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উত্তরাখণ্ড সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক গত বছর বিধানসভায় গৃহীত উত্তরাখণ্ডকে স্বতন্ত্র পাহাড়ী রাজ্য হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত অভিসন্ধিমূলক[১৫]। গত বছর ৬ই ও ৭ই নভেম্বর ঐ অঞ্চলের সি.পি.আই.এম.এল

(লিবারেশন) দল নৈনিতালে একটি সম্মেলন গঠনের উদ্যোগ নেয়। এই সম্মেলনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নতুন ফ্রন্ট গঠনের কথা ঘোষিত হয়, আন্দোলনে নতুন মাত্রা আনার কথা বলা হয় এবং মুলায়ম সিং যাদবের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ ও বি.জে.পি-র ঐ আন্দোলনে হিন্দুত্ব আরোপের বিরোধিতা করা হয়। ঐ বছর ২৭ শে অক্টোবব জর্জ ফার্নাণ্ডেজের এইচ এম.কে.পি. ও সমতা পার্টির উদ্যোগে লক্ষ্ণৌতে জনসমাবেশ ও ধর্না দেওয়া হয় এবং সেখানে তৎকালীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মানব অধিকার লঙঘনেব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার দাবী উত্থাপিত হয়। এ.আই.এম.এ ঐ বছব ২রা অক্টেবার শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব তার নিজের বিরোধী এবং সমাজের ধনীদের ৫ শতাংশ -এর বিরোধী দুটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে 'হল্লাবোল' কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন বি.এস.পি. তা সমর্থন করেনি[১৬]।

কোন আন্দোলন সংগঠিত হওয়া ও তা অব্যাহত থাকার পশ্চাতে সরকারের প্রতিক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। মুলাযম সিং যাদব প্রাক্তন রাজ্যপাল মতিলাল ভোরা কর্তৃক প্রেরিত ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের বিষয়টি সংশোধন করার প্রস্তাব বাতিল করেন এবং আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু দেখা যায়, পুলিশি অত্যাচার আন্দোলনকে স্তিমিত করার পরিবর্তে তীব্রতর করে তোলে। জনসমর্থন লাভের আশায় মুলায়ম সিং গত বছর ২৪শে আগস্ট বিধানসভায় ৮টি পাহাড়ী জেলা নিয়ে স্বতন্ত্র উত্তরাখণ্ড রাজ্য সৃষ্টির দাবী সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করলেও খাতিমা, মুসৌরি ও মুজাফ্ফর নগরে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন পুলিশের গুলিতে নিহত হলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জনগনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়[১] । ঐ বছর ২রা অক্টোবর পুলিশ মুজাফ্ফর নগরে ধর্না দিতে ইচ্ছুক আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায় এবং মুজাফ্ফর নগর ও রামপুরে নারী নিগ্রহও করে[১৮]। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তারা মনে করেন রাজ্য সরকার পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কয়েকজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীর বদলি ব্যতীত কোন সদর্থক ব্যবস্থা নেননি[১৯]।

দেখা গেছে যে, এই অঞ্চলের জনগণ আরও মনে করেন যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পাহাড়ী পরিবেশকে স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে নয়, নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করেছেন[২০]।

তাদের মতে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ঐ অঞ্চলের জনগনের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও দাবীর প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি। বরং বলা যায়, তারা উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি বৃক্ষ এখানকার উল্লেখযোগ্য সম্পদ হলেও গাছগুলি নষ্ট হওয়ার পশ্চাতে প্রশাসনিক আন্তরিকতার অভাবকেই দায়ী করা যায়[২১]। বস্তুতঃ উত্তরাখণ্ড একটি সর্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। উত্তরাখণ্ড

সমস্যাটি হল দুটি পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক এক বিকল্প উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গী ও কৌশলের মধ্যে সংগ্রাম। উত্তরাখণ্ডকেও একটি পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দিলে এবং তার প্রতিনিধিরা যদি কার্যনির্বাহী সংস্থায় প্রধান ভূমিকা পালনের সুযোগ পেত, তাহলে এই অঞ্চলের উন্নয়ণ তার বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হত[১১]। কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ অঞ্চলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের পশ্চাতে সম্ভাব্য কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, ঐ অঞ্চলে অন্যান্য অনগ্রসর জাতি কংগ্রেসের মূল ভোটার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার মুলায়ম সিং-এর বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখাতে পারেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল যাদব সরকার অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা প্রমাণ করা। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্র কংগ্রেস (ই) শাসিত কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কথা স্মরণে রেখে মুলায়ম সিং-এর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কারণ অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের মনোভাবকে তা আঘাত করতে পারে[১১]। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্র কর্তৃক মুলায়ম সিং এর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত এন.ডি. তিওয়ারির ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি গড়ে ওঠার পথ প্রস্তুত করতে পারে এবং তা কংগ্রেস দলের নেতৃত্বকে দুর্বল করতে পারে। চতুর্থতঃ, মুলায়ম সিং-এর সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বি.জে.পি. বা কংগ্রেস কেউই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারেনি[১]।

এই ধরনের আন্দোলনগুলির একটি সদর্থক দিক হল এগুলি কোন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'ইনপুট' হিসেবে কাজ করে। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমেই সরকারী নীতি নির্ধারণ, তাদের নীতিগুলির কার্যকারিতা, দেশের সর্বত্র সেগুলি সঠিকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা এবং এগুলির প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তারা তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ স্থিত করতে পারেন। আন্দোলনগুলির সমর্থনে অনেকে মনে করেন, ক্ষুদ্র রাজ্য উন্নতি বিধানের সহায়ক এবং এর ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বঞ্চিত মনোভাব দূরীভূত হবে এবং দেশে সুস্থিতি আসবে। অপরপক্ষে অনেকে মনে করেন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ভিত্তিক আত্মমর্যাদার আন্দোলনগুলি গণতান্ত্রিক দাবীর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রতিভাত হলেও শেষপর্যন্ত তার ফলাফল বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেবে। ক্ষুদ্র রাজ্যের গঠন শেষপর্যন্ত ভারতের 'বলকানাইজেশন' সৃষ্টি করবে। উত্তরাখণ্ডীদের দাবীর, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দাবীর যাথার্থ মেনে নিয়েও বলা যায়, এই প্রবণতা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্ষুন্ন করবে এবং এই প্রবণতা জাতীয় সংহতিরও বিরোধী।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এই ধরনের আন্দোলনগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সুস্পষ্ট নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকেও আন্দোলনকারীদের জনজীবনের মূলস্রোতধারার সঙ্গে একাগ্রতা গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ যোগানের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে

বোঝাতে হবে যে, নিজ রাজ্যের বা মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকাই তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে লাভজনক হবে। তাছাড়া, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উত্তর পূর্ব ভারতের বহু রাজ্য পৃথক হলেও পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখেনি।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বোঝাতে হবে যে, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি যথাসময়ে পূরণের জন্য তারা সচেষ্ট থাকবেন। দমন মূলক নীতি কার্যকর করার ব্যাপারেও সরকারকে সচেতন হতে হবে। কারণ এই নীতি বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে দূরীভূত করতে পারেনা। পরিশেষে, উত্তরাখণ্ডীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা যায়, উত্তরাখণ্ডীদের ন্যায় সঙ্গত দাবীর প্রতি সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য এর জন্যও সরকারের কিছু পদ্ধতি স্থির করা বাঞ্ছনীয়।

সূত্র নির্দেশ

১। Joshi. P C **Uttarakhand Issues and challenges**, Har-Anand Publications. New Delhi-110017. 1995. pp. 16-16.

২। Chandra. S. **"Hotting Up"**. October 23-29. 1994. pp. 36-38.

৩। Despande. R. "Fire in the Hills" **The Telegraph,** September 11. 1994

৪। Pande. B.D. "Case For a State" **The Hindustan Times**. February 14. 1995.

৫। Pande. A.. "Matters of State". **Sunday**. October. 23-29. 1994 P.P 39-40

৬। Singh. Bhupal. "Political Economy of U P." **The Hindustan Times**, February 9. 1995.

৭। Joshi. M.. "The Uttarakhand – Is separation Necessary"? **Times of India**, September 22. 1994.

৮। Chandra. S. প্রাগুক্ত

৯। Pande Mrinal. "The Trained Trappings of Social Justice. "**The Telegraph**. September 11. 1994.

১০। **The Statesman**. September 4. 1994.

১১। Zafar Aga. "Portents of Trouble". & Dilip Avasthi. "Mulayam Singh Jadav - Holding the access" **India Today**. Vol. XIX. No. 20. October 31. 1994. P.P. 50-54. & 54-55.

১২। Pande. B.D. প্রাগুক্ত

১৩। Chandra. S. প্রাগুক্ত

১৪। ঐ — প্রাগুক্ত

১৫। **The Hindu**, January 4. 1995.

১৬। Misra, A., "New Forces in Uttarakhand". **Economic and Political Weekly**"

Vol XXIX No 47 November 19 1994 P 2964

১৭। **The Hindu** প্রাগুক্ত

১৮। Chandra S প্রাগুক্ত

১৯। Sahay Mohan Centre U P plays politics as Uttarakhand continues To Burn **The Statesman** October 10 1994

২০ Aitken Bill Uttarakhand Is Fighting For Self respect **The Hindustan Times** September 18 1994

২১। ঐ

২২। Joshi P C প্রাগুক্ত pp 202 46

২৩। Sahay Mohan প্রাগুক্ত

২৪। Naveem Sk Sadar Up for Grabs **The Telegraph** October 16 1994

ভারতে পঞ্চায়েততন্ত্রের উদ্ভব : আধুনিকীকরণ ও প্রগতির পথে পঞ্চায়েত

তপতী দাশগুপ্ত

আর.এন. চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তর আধুনিক ভারতবর্ষে নাগরিক শাসনব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার উপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার মূল চাবিকাঠিটি ন্যস্ত করা হয়েছে পঞ্চায়েততন্ত্রের উপর। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে পঞ্চায়েততন্ত্রের উদ্ভব বিংশ শতাব্দীর ঘটনা নয়। পঞ্চায়েততন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছিল ঋক্-বৈদিক যুগে, সমাজ তখনও নগরকেন্দ্রিক হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নিয়েই গড়ে উঠেছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার ভারতের শাসন কাঠামো। 'গ্রামণি' বা 'গ্রাম-প্রধান' ছিলেন গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভ। যুদ্ধে ও শান্তিতে তিনিই ছিলেন গ্রামের সর্বেসর্বা। প্রতি গ্রামে গড়ে উঠেছিল 'সভা' ও 'সমিতি' এবং এই 'সভা' ও 'সমিতি'গুলি গ্রাম-কল্যাণের সর্বাঙ্গীন দিক নিয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করতেন গ্রামীণ সভাগৃহে। এতে সভাপতিত্ব করতেন 'গ্রামণি' বা 'গ্রামপ্রধান'। বৈদিক গ্রন্থ, ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে 'গ্রামণি'র ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সারা রাজ্যব্যাপী এক সুষম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের' মধ্যে এই সুসম শাসনবণ্টনের এক বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থগুলিতে 'গ্রামণি'র ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতে গ্রামীণ সভাগুলি মিলে 'গ্রামণি'কে নির্বাচিত করত বলে জানা যায় এর জন্য বিশেষ কোন আলঙ্কারিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হত না। অন্যদিকে, দক্ষিণভারতে 'গ্রামণি' পদে নির্বাচিত হবার জন্য বিশেষ গুণাগুণের প্রয়োজন হত এবং নিয়মিতভাবে নির্বাচন পদ্ধতিতে 'গ্রামণি' তার নির্দিষ্ট আসনে আসীন হতেন। পুরাকালে ভারতবর্ষে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার তিনজন পুরোধা ছিলেন, ক) গ্রাম সভাপতি (গ্রামণি) খ) গ্রামণি কোষাধক্ষ্য, গ) গ্রামীণ রক্ষনাবেক্ষক। গ্রামীণ এই বিধি-ব্যবস্থার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। নির্বাচন কতটা সুষ্ঠুভাবে হত বা না হত, সেগুলি এখানে মৌলিক প্রশ্ন; বৌদ্ধ এবং জৈন গ্রন্থে এবং জাতকের গল্পগুলিতে পাওয়া যায় যে এই 'গ্রামণি' বা 'গ্রামভোজক' বা

বংশপরম্পরায় নির্বাচিত হতেন। তাঁরা আলাদা করে কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। তবে তাঁরা কর মুক্ত জমির সত্ত্ব উপভোগ করতেন এবং কখনও কখনও করের অধিকাংশ তাঁরা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করতেন। 'গ্রামণি' বা 'গ্রামভোজক' ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার হর্তাকর্তাবিধাতা।

গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার এই ধারা ক্রমান্বয়ে চলে আসছিল যুগপরম্পরায়—হিন্দুযুগ থেকে পাঠানযুগ, পাঠানযুগ থেকে মুঘলযুগ এবং মুঘল যুগ থেকে বৃটিশযুগ। আধুনিক ভারতের বিকাশের সন্ধিক্ষণেই কিন্তু প্রথম অন্তরায় দেখা দিল গ্রামীণ শাসনব্যবস্থায়। যুগ যুগ ধরে যে শাসন নীতি ভারতের গ্রামগুলিকে করেছিল সমৃদ্ধ ও সাবলম্বী, বৃটিশ রাজতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী শোষননীতির ধারা গ্রামগুলিতে করেছিল সহায়হীন, সম্বলহীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংরেজ তার স্বৈরাচারী নীতি আরোপ করল শস্যশ্যামল শিল্পপ্রধান গ্রামগুলিতে। নিজের হাতে তুলে নিল তারা গ্রামীণ কল্যাণের সার্বিক ব্যবস্থা। ভেঙে গেল তিল তিল করে গড়ে ওঠা গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ শাসননীতি।

১। মূল রাজস্বের শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ অংশ ন্যস্ত ছিল গ্রাম-শাসনের জন্য। বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে 'গ্রামণি'দের হাত থেকে তুলে নেওয়া হল এই আর্থিক গুরু দায়িত্ব।

২। বৃটিশ রাজ নিজেই গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পুকুর খনন বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলেন।

৩। বৃটিশরাজের আকস্মিক অর্থনৈতিক শোষণের জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্পগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইংরেজ সরকারের বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে গ্রামীণ শিল্প মার খায় এবং গ্রামীণ শিল্পীরা হয় দিশাহারা। পূর্বে গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির লাগামটি ধরা ছিল গ্রাম প্রধানের হাতে; এই দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা কেড়ে নেওয়া হল গ্রাম প্রধানের হাত থেকে।

৪। পূর্বে গ্রামীণ বিচারের সর্বাঙ্গীন ক্ষমতার ভার ছিল 'গ্রামণি' বা 'গ্রামভোজকের' উপর। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলিতেও প্রতিষ্ঠিত হল বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা। 'গ্রামভোজক'দের ক্ষমতা হল শিথিল, তারা ক্রমশ গ্রামের উন্নতির এবং শাসনবিধির ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ল।

৫। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী থেকে বৃটিশরা নিজেরাই তৎপর হয়ে গ্রামীণ শাসনকে ক্রমশঃ প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করে, তারা উপলব্ধি করে গ্রামই হচ্ছে ভারতের প্রাণকেন্দ্র, তাই গ্রাম উন্নয়ন ছাড়া এ দেশে কায়েমী শাসন অসম্ভব। ১৮৮২ সালে উদারপন্থী ভাইসরয় লর্ড রিপন প্রবর্তিত করেন স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা (Local Self Government)। এই স্বায়ত্ত শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামগুলি আবার যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সাবলম্বী হয়ে ওঠে। ১৯১৯-১৯২০ সালের বৃটিশ অ্যাক্টের ফলেও বৃটিশরাজ নতুন করে গ্রাম-শাসনের প্রতি যত্নবান হন। ১৯১৯-এর মন্টেগু-চেমসফোর্ড অ্যাক্ট এই হিসেবে এক ঐতিহাসিক নজির।

৬। ইংরেজ আগমনের ফলে ভারতের মাটিতে কায়েম হল ইংরেজ শাসন, ইংরেজ শোষণের শিকার হল ভারতীয় অর্থভাণ্ড। ভারতীয় বা প্রাচ্য সংস্কৃতি আচ্ছাদিত হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পীড়নে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মিলনে গড়ে উঠল নতুন প্রগতি - চাপা পড়ে গেল প্রাচীন প্রগতি। গ্রামের মানুষ দুর্বার নেশায় ছুটে গেল শহরে-গঞ্জে অর্থের নতুন পিপাসায়। চুরমার হয়ে গেল গ্রাম ভিত্তিক ভারতের শাসন-দারিদ্র আর অনিশ্চয়তা, গ্রাম নগরের মানুষগুলিকে গ্রাস করল তার করাল ছায়ায়।

৭। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ফলে ভেঙে পড়ল পুরাতন জমিদারী ইমারৎ। নব্য জমিদারীর পত্তনের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে দেখা দিল বৃটিশরাজকে তোষণ করে এক নির্মম শোষণের খেলা। নব্য জমিদাররা ভেসে গেলেন নব্য যুগের স্রোতে; গ্রামগুলিকে শঙ্কামুক্ত করার আর মানুষ রইল না।

এই ভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বহু কালের এক সুসঙ্গত গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমাধি খোঁড়া হয়।

২

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম প্রয়াসটি দেখা যায় ১৯৪৯ সালে, ভারতীয় সংবিধান গঠনের পর। প্ল্যানিং কমিশন গঠনের সাথে সাথে ভারতে গ্রামীণ বিকাশের কথা নতুন করে ভাবা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত রাজ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সর্বসম্মতিক্রমে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া যে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ সম্ভব নয়, এ কথার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্লক ও তালুক করার কথা ভাবা হয়।

এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় উন্নয়ণ সমিতি (National Development Council) গঠিত হয় এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য জনউদ্যোগের কথা চিন্তা করা হয়। সংবিধানের আরটিকেল ৪০ কে নভেম্বর ১৯৪৮-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাশ্যপের মতে সংবিধানের এই ধারাটিকে নিয়ে বহু বাকবিতণ্ডা হয় এবং এই ধারাটি যাতে স্থায়ীভাবে কায়েম না হয়, তার প্রচেষ্টাও করা হয়। অবশেষে, ১৯৪৮ এর ২২শে নভেম্বর, ৩১-এ ধারা প্রবর্তিত হয়। ডাঃ অম্বেদকার কোন বিতর্কের সুযোগ না দিয়ে এই ধারাকে স্বীকৃতি দেন। ৩১-এ ধারা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনকে পুর্ণ অধিকার দিলেও দুটি সংশোধনী আইনের প্রস্তাব দেন কে.টি. সাহা এবং লোকনাথ মিশ্র। তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাবগুলি নাকচ করা হয়, কিন্তু কে.টি. সাহার মূল বক্তব্যটি, অর্থাৎ কেন্দ্রের অধীনে গ্রামগুলি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এটি স্বাধীনতার বহু বৎসর পরেও প্রতিধ্বনিত হয়। লোকনাথ মিশ্রের আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি পরবর্তীযুগে একটি মূল্যবান তথ্য হিসাবে গৃহীত হয়। ২১ বছর বয়সের প্রতিটি সুস্থ এবং ন্যায় সঙ্গত নাগরিকের ভোটাধিকারকে

পঞ্চায়েততন্ত্রের মূল কাঠামো বলে মেনে নেওয়া হয়। ১৯৪৯-এর নভেম্বরে পঞ্চায়েত-রাজকে ভারতীয় সংবিধানের নথিভুক্ত করা হবে কিনা এই নিয়ে আরও একবার বিতর্ক হয়। অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে এটি গান্ধীনীতির প্রকৃত প্রতিচ্ছবি নয়. আবার অনেকে মনে করেন ভারতীয় সংবিধানে পঞ্চায়েততন্ত্রের প্রবর্তন একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সূচনা।

পঞ্চায়েত শাসনের সুষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পরপর চারটি কমিটি যথেষ্ট সহায়তা করে। ১৯৫৫তে সংগঠিত হয় বলবন্ত মেহেতা কমিটি. এই কমিটি প্রত্যেক গ্রামে নির্বাচিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা করে এবং জেলা পরিষদ নামে একটি সহায়ক সমিতির পত্তন করে। জেলা পরিষদ জেলায় জেলায় গ্রামীণ শাসনব্যবস্থাকে পূর্ণ সহায়তা করে চলেছে।

১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর মহীশূর পঞ্চায়েত রাজ আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃত পঞ্চায়েত রাজ কায়েম হয়। মহীশূরকে অনুসরণ করে যথাক্রমে রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও এই নতুন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে. জনতা পার্টির নেতৃত্বে অশোক মেহেতা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজ-সম্পদ বৃদ্ধি, চাকুরির সংস্থান. দারিদ্র দূরীকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি।

১৯৮৫ সালের জি ভি কে রাও কমিটি ঘোষণা করে যে জেলা স্তরে যথেষ্ট ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজন। এই কমিটি গ্রাম উন্নয়নের সর্বোপরি দায়িত্ব জেলা পরিষদের থাকা উচিত বলে মনে করে। এই বিকেন্দ্রীকরণ ঠিকমত পালিত হলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল্যবোধ স্থায়ীরূপ পাবে। ১৯৮৬ সালের এল এল সিংভী কমিটি পঞ্চায়েত রাজকে কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় টিয়র বা তৃতীয় ধাপ বলে মনে করে। এই কমিটি পঞ্চায়েত অধীনস্থ বিচার-বিভাগীয় সংস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই সংস্থা যাতে প্রত্যেক রাজ্যে থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়।

এই কমিটিগুলি ব্যতীত সারকারিয়া কমিশন বলে একটি কমিশন স্থাপিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হল কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা করা।

৩

পঞ্চায়েতরাজ প্রশাসনের ধারাটি সংবিধান গঠনের পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পালিত হয়ে আসছে। এরই মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় পঞ্চায়েততন্ত্রের নারী প্রগতির ধারাটি। প্রাচীন বৈদিক রাজনৈতিক সংস্থা 'সভা' ও 'সমিতি' তে তাঁরা যোগদান করতেন অকপটে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক অবক্ষয়ের সাথে সাথে নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সংস্কারের অন্ধকারে নারীর প্রাচীন মহিমা অবলুপ্ত হয়। নারীকে সংসারের ক্রীড়নক রূপে গণ্য করা হত এবং পুরুষ শৌর্য্যের কাছে তাকে মাথা নত করে থাকতে হত। বৃটিশ যুগে নবীন আশা-উদ্যম ও প্রগতিশীল মননশীলতাও কিন্তু নারী মর্যদার এই বিশেষ দিকটিকে উন্নত করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক

যুগে, ১৯১৭ সালে, সরোজিনী নাইডু কিছু মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে বৃটিশ রাজদরবারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ দাবীগুলি উত্থাপন করেন। ১৯১৭ ছিল রুশ বিপ্লবের বছর, সেক্ষেত্রে এটি ছিল প্রগতির নতুন সোপান গড়ে তোলার বছর। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড অ্যাক্ট গ্রামীণ অর্থনীতি ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। ১৯২১ সালে শিক্ষা ও সম্পদের জোরে কিছু মহিলা ভোটাধিকার অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে এক বিশেষ আবেদন পেশ করা হয়। ১৯৩১ সালে, কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে মহিলা শিক্ষা এবং মহিলা ভোটাধিকার সম্পর্কে বিশেষ আর্জি পেশ করা হয়।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে, ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়; সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে মহিলাদের সমান অধিকারের কথা ব্যক্ত করা হয়। ১৯৫৫-র বলবন্তী মেহেতা কমিটি সর্বপ্রথম মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ হয় এবং মহিলা ও শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি, মহিলাদের আয়বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে চিন্তার খোরাক জোগায়। ১৯৭৪এ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মহিলা পঞ্চায়েত গঠনের কথা ভাবা হয়। ১৯৭৮এ অশোক মেহেতা কমিটির মাধ্যমে নারীকে প্রথম স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৮১র নরসিংহ কমিটি আরেকটি প্রগতিশীল এবং বলিষ্ঠ প্রস্তাব দেয় যে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক ব্লকের ন্যায়পঞ্চায়েতে অথবা সরপঞ্চে মহিলাদের জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ১৯৮৫র নাইরোবি কনফারেন্স ঘোষণা করে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে ৩৫ শতাংশ করে মহিলা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। ১৯৮৮ সালে, National Perspective Plan for Women-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে, পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী ধারায় (মার্চ ১৯৯৩), নারীমুক্তির এক প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে।

ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি পঞ্চায়েতরাজের এই নতুন নীতিটিকে আগামী দিনের এক প্রত্যয়পূর্ণ দিশারী রূপে গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবে এর বিভিন্ন রূপায়ণ দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রে। পঞ্চায়েততন্ত্রের প্রগতির অল্প কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হল।

কর্নাটক: এপ্রিল ১৯৯৪ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন এই রাষ্ট্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। ৪৩ শতাংশ মহিলা এই নির্বাচনে নির্বাচিত হন এবং তার মধ্যে ৩২ শতাংশ তপশিলী জাতিভুক্ত। ১৯৯৫-তে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত বুলেটিনের একটি নিবন্ধে (Women in Panchayati Raj), শান্তামা নামে একজন তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলার বৈপ্লবিক মুক্তি প্রয়াসের কথা জানা যায়। এক রক্ষণশীল দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ শান্ত, সুশীলা শান্তামা কিভাবে মণ্ডল পঞ্চায়েতের একজন সুদক্ষা সদস্যায় পরিণত হন, তারই বিবৃতি পাওয়া যায় এই নিবন্ধে। আজকের শান্তামা আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেন। কর্ণাটকে জনতা দলের এটি একটি রাজনৈতিক কৃতিত্ব।

বিহার : বিহার কিছু কিছু কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এক্ষেত্রে। ধানবাদে, এপ্রিল ১৯৯৪তে একটি দু দিনের বৈঠক বসেছিল—'পঞ্চায়েত রাজে মহিলাদের ক্ষমতা। রাঁচিতে মে ১৯৯৪তে মহিলা এবং পঞ্চায়েতরাজ সম্পর্কিত আরেকটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অক্টোবর ১৯৯৪তে দুমকাতে অনুষ্ঠিত হয় আরও একটি কর্মশালা. এতে ভবেশ্বর হেমবিয়ান, প্রাক্তন সাঁওতাল এম পি পৌরহিত্য করেন। দুমকা, দেওঘর, পাকুড়, ঔরঙ্গাবাদ, ধানবাদ এবং গড্ডা থেকে অন্ততঃ ৯৬ জন সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া মহিলা এবং ২৫ জন পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। এই সবগুলি কর্মশালাই সাফল্যের সোপানে পরিগণিত হয়।

ওড়িশা : ওড়িশা হচ্ছে অন্যতম প্রধান রাজ্য, যেখানে পঞ্চায়েতে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়েছে সদস্যদের জন্য। ৯৪টি মিউনিসিপ্যালিটিতে ৪৮০ জন মহিলা সদস্যা রয়েছেন এবং পঞ্চায়েতগুলিতে সর্বসাকুল্যে ২৫,০০০ মহিলা রয়েছেন। ভুবনেশ্বরে. মে ১৯৯৪তে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় পঞ্চায়েতে মহিলাদেব সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে। নারী এবং শিশু সংক্রান্ত সবরকম উন্নতিমূলক কাজেই মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ওড়িশায়।

মধ্যপ্রদেশ : কর্ণাটকের শান্তামার মত, মধ্যপ্রদেশে তপশিলী জাতিভুক্ত কস্তুরবাঈ ১৯৯৫তে সরপঞ্চে বিজয়ী হয়ে এক নতুন বাঁচার লড়াই শুরু করেছেন। মধ্যপ্রদেশে ব্লক ডেভলেপমেন্ট দপ্তরের সাথে জনপদ পঞ্চায়েতকে একত্রিত করার এক প্রয়াস চলেছে। আরেকটি সৎ প্রচেষ্টা হল গ্রামে গ্রামে ন্যায়ালয় স্থাপন করা—এতে মহিলা এবং তপশিলী জাতিভুক্ত মানুষের এক্তিয়ার থাকবে—মনোনয়ন হবে জনপদ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। মনু এন কুলকার্নি মধ্যপ্রদেশ থেকে সম্প্রতি রিপোর্ট পেশ করেছেন (আগস্ট, ১৯৯৫), যে বিলাসপুরে 'ঘুঙঘট বা ঝঞ্ঝাট'-এর ওপর একটি আলোচনাচক্র বসেছিল। আজকের যুগে এই ঘুঙঘটই যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, পঞ্চায়েতের সর্বস্তরে, বিশেষতঃ সরপঞ্চে মহিলাদের মুখ্য ভূমিকায় দেখে আজ সবাই অভিভূত। মহিলারা আজ নিজের হাতে সমাজের চাবুক তুলে নিয়েছেন।

হিমাচল প্রদেশ : ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিত্ব সত্ত্বেও এ রাজ্যে মহিলাদের পঞ্চায়েতের কার্যকলাপের সঙ্গে তেমন গভীর যোগাযোগ নেই বি জে পির অধীনস্ত এ রাজ্যে কিছু ইতস্ততঃ সমাজ কল্যানমূলক কাজ ছাড়া মহিলাদের তেমন সুদৃঢ় ভূমিকা নিতে দেখা যায়না।

হরিয়ানা : হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রী ধনিকলাল মণ্ডল আসন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মহিলাদের আহ্বান জানিয়েছেন। 'মহিলাদের আইন শিক্ষা' সংক্রান্ত একটি একদিনের সেমিনারে তিনি বলেন যে মহিলাদের নিজেদের অধিকার এবং দাবী প্রতিষ্ঠা করার এটি হবে একটি সুবর্ণ সুযোগ। মহিলা মুক্তি মঞ্চ বলে হরিয়ানায় আছে গ্রামীণ মহিলা সংস্থা;

মে ১৯৯৪তে গুরুগাঁওতে, মুক্তি মঞ্চের নেতৃ বীরমতি সোচ্চারে ঘোষণা করেন যে পুরুষের থেকে মহিলারাই সমাজের দুর্নীতি সম্পর্কে বেশী সজাগ। মাদকদ্রব্য চালান, ঘুষ, জালিয়াতি বা ধর্ষণের বিরুদ্ধে মহিলারাই এ রাজ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন হরিয়ানা পঞ্চায়েত-রাজের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ : এখানে ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি আছে হিমাচল প্রদেশের মত এবং তারা মণ্ডল প্রজা পরিষদের অধিকাংশ কাজও করেন পুরুষদের সহায়তায়। কিন্তু তেলেগু দেশমের নেতৃত্বে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত আসনগুলি শুধুমাত্র উচ্চ জাতি এবং সম্পদের অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যেই বণ্টন করা হয়। ভারতব্যাপী সমস্ত রাজ্যে পঞ্চায়েতের প্রগতিশীল ধারার ইতিহাসে এই রাজ্যের নজির একটি ব্যতিক্রম।

পশ্চিমবঙ্গ : পঞ্চায়েত-রাজ উদ্ভবের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গ প্রথমদিকে অনগ্রসর ছিল, ১৯৮৯-এর নির্বাচনে এক শতাংশেরও কম মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আসনে। ৭৩তম সংশোধনী ধারার প্রবর্তনের পর, ১৯৯৩-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত শাসনে মহিলা প্রগতির এক বৈপ্লবিক নজির রাখতে সফল হয়। ১৯৯৩-এর নির্বাচনে ২৪,৭৯৯ জন মহিলা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আসনে নির্বাচিত হন। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই আজ একটি নতুন প্রত্যয় ও প্রত্যাশার সম্মুখীন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে বহু কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির উদ্যোগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং মহিলামুক্তির এই বিশেষ দিকটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) বেইজিং কনফারেন্সে (৪র্থ আন্তর্জাতিক নারী প্রগতি কনফারেন্স) এই তথ্য প্রমানিত হয়েছে। এই কনফারেন্সের মূল লক্ষ্য যদিও পূর্ণ সাফল্য লাভ করেনি, তবুও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এটি একটি অসামান্য পদক্ষেপ।

৪

উপসংহার : পঞ্চায়েততন্ত্র উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েততন্ত্রের ভাবনা নূতন নয় - এ ভাবনা ভারতের ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় লুকিয়ে ছিল - তাকে নতুন ইমারত, নতুন চিন্তার সরঞ্জামে সাজাবার দায়িত্ব আজকের দিনের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীর।

গণতান্ত্রিক ভারতের উন্মেষ ১৯৪৭-এর ঘটনা এবং আধুনিকীকরণের প্রকৃত উদ্যম তারও পরের ঘটনা। নাগরিক সভ্যতা এবং শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি যে গ্রামীণ বিকাশেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে, তা ক্রমশঃ প্রকাশ্যমান। বৃটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির শিকার হয়েছিল একদিন ভারতবর্ষ। ভারতীয় অর্থ এবং সম্পদে ইংরেজ

নিজেদের অর্থনীতিকে করতে চেয়েছিল পুষ্ট। রাজনৈতিক অনৈক্য, সামাজিক বৈষম্য অক্রান্ত ভারত সেদিন ইংরেজদের এই শোষণকে রুখতে পারেনি শক্ত হাতে। তার ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলি হোল হতশ্রী, রিক্ত। ভারত হারাল তার কুটীর শিল্প, গ্রামীণ সমৃদ্ধি, সামাজিক মূল্যবোধ। যে গ্রাম ছিল একদিন ভারতের গৌরব, সেই গ্রাম পরিণত হল শ্মশানে।

তাই, ভারতে গ্রাম উন্নয়নের কাজ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত এমনই একটি শাসকবর্গের উপর, যারা দৃঢ় হাতে প্রতিষ্ঠা করবে আবার গ্রামের মূল সঞ্জীবনী শক্তি - ফিরিয়ে আনবে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে আর্থসামাজিক ভারসাম্য। আজকের দিনে, পঞ্চায়েত রাজকে তাই এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে - দেওয়া হয়েছে তাকে স্বাধিকার - যার বলে ফিরিয়ে আনা যাবে পুরাতন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও গৌরব, তার সাথে গড়ে উঠবে নূতন যুগের নূতন প্রগতির ধারা।

ভারতে, পুরাকালে নারীকে সম্মান দেওয়া হত তার পূর্ণ মর্যাদায়। কিন্তু নারী তার আপন আসন থেকে বিচ্যুতি হয় বৈদিক যুগের শেষ ভাগ থেকে। কুসংস্কারের অন্ধকারে, পুরুষশৌর্য্যের অহমিকায়, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতায় ভারতীয় নারী তার মর্যাদা হারিয়েছে বার বার। ভারতীয় সংবিধান রচনার সাথে সাথে ভারতীয় নারীকে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে তার অধিকার আয়ত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রে, গ্রামে গ্রামে তারই সাড়া পড়েছে আজ। শুধু একটি দুটি শান্তামা, কস্তুরবাঈ বা তুলাবতী হেমব্রম ভারতের অগণিত মানুষের শত-লক্ষ বেদনার ছাপ মুছে ফেলতে পারবে না। , এর জন্য চাই সহস্র কোটি নারীর মিলিত এবং শানিত শক্তি। নারীকে শুধু ক্ষমতায় অলঙ্কৃত করলে চলবে না - নারীকে তার আপন আসন সুরক্ষিত রাখতে গেলে, বুঝতে হবে আজকের দিনের গ্রামীণ সমস্যা, মোকাবিলা করতে হবে সেই সমস্যার, কঠিন হাতে। আজকের নগরপালিকাকে প্রতি ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নিতে হবে, নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে।

ভারতের মাটিতে পঞ্চায়েত তন্ত্রের উদ্ভব এক অভিনব অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি যেন পঞ্চায়েত রাজত্বের নেশায় মেতে উঠেছে। এও যেন এক প্রতিযোগিতার খেলা। কিছু আশা, কিছু স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে ঠিকই। গ্রামগুলি আবার হয়ে উঠেছে সাবলম্বী, গ্রাম-উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে চলেছে গ্রামের অভ্যান্তরে; কিন্তু গ্রামবাসী - সত্যিই কতটা লাভবান হচ্ছে, তা গ্রামের গভীরেই লুকানো আছে। পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ বা কর্ণাটক হয়তো কিছুটা গতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু সব রাজ্যগুলি সমান্তরালভাবে এই গতির বশবর্তী হতে পারেনি। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি, অনেক আশা-ভঙ্গ, আনেক প্রতিশ্রুতি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও আমরা আশা করব এক বিকাশমুখী পঞ্চায়েততন্ত্র, যা আগামী দিনের ভারতের ইতিহাসে রেখে যাবে এক স্বপ্নোজ্জ্বল সাক্ষর।

সূত্র নির্দেশ

১। কাশ্যপ অনির্বাণ **পঞ্চায়েতী-রাজ** নিউদিল্লী ১৯৮৯।

২। সি. রামবিং প্রসাদ **'ফাইনান্সিং অফ পঞ্চায়েতী-রাজ ইনস্টিটিউশানস'** নিউ দিল্লী ১৯৮৩।

৩। সিভাম এ. **পঞ্চায়েতী-রাজ রিফর্মস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভালেপমেণ্ট'** এলাহাবাদ ১৯৯০।

৪। চতুর্বেদি টি এন **পঞ্চায়েতী রাজ** নিউদিল্লী ১৯৮১।

৫। রাজপুত আর এস **'পঞ্চায়েতী-রাজ ইন ইণ্ডিয়া ডেমোক্রেসী অ্যাক্টগ্রাসকটস'** নিউদিল্লী ১৯৮৪।

৬। ওয়েবস্টার নিল **'পঞ্চায়েতী-রাজ অ্যাণ্ড দ্যা ডিসেন্ট্রাইসেশন অফ ডেভালেপমেণ্ট প্ল্যানিং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'**, ক্যালকাটা ১৯৯২।

৭। ভলাণ্টারি অ্যাকশন নেটওয়ার্ক ইণ্ডিয়া **স্টেট পঞ্চায়েত অ্যাক্টস অ্যা ক্রিটিক্যাল রিভিউ, নিউদিল্লী, ১৯৯৫।**

৮। **পঞ্চায়েতী-রাজ আপডেট - ১৯৯৪** ভল্যুম ১ ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্স নিউদিল্লী ১৯৯৫।

৯। **পঞ্চায়েতী-রাজ আপডেট** জানুয়ারী-আগষ্ট ১৯৯৫ ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্স নিউদিল্লী ১৯৯৫।

চুঁচুড়া-চন্দননগরের নারী আন্দোলন (১৯৬৫-৭৫)

পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়

হুগলী জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর চুঁচুড়া ও চন্দননগব। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দুই শহরের ভূমিকা অপরিসীম। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি হুগলী জেলা তথা বাংলাদেশেব শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনসহ বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ছাত্রআন্দোলনসহ বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে শহর দুটির অবদান ইতিহাস সচেতন সকল মানুষের কাছেই স্বীকার্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তিব পববর্তী সময়েও শহর দুটি গণ আন্দোলনেব অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৫-১৯৭৫ এই সময়কালে এখানকাব নরী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিক কিছু অতীতের কথা বলা আবশ্যক।

১৯৪৩ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টি'র উদ্যোগে এক মহিলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 'প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে (১৯৬৯) 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-তে পরিণত হয়। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি এই সব সংগঠনের ছত্র ছায়ায় চুঁচুড়া-চন্দননগরে নারী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। কিন্তু ১৯৪৩ সালের আগেই চন্দননগরে নারী আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৩৯৩ সালের প্রথম দিতে 'নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে (বর্তমান চন্দননগর পাঠাগার) একটি সভা হয় এবং সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'চন্দননগর মহিলা সমিতি' গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা লাভ, আর্থ-সামাজিক শোষণের হাত থেকে নারী সমাজের মুক্তি -এই আদর্শ নিয়েই চন্দননগর মহিলা সমিতি পথ চলতে শুরু করে। উল্লেখ্য মহিলা সমিতি গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা যোগান কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা কালীচরণ ঘোষ ও তিনকড়ি মুখার্জ্জী। এই সময় এখানকার মহিলা সমিতির কর্মীদের মধ্যে যাঁদের কথা জানা যায় তাঁরা হলেন - নলিনী বালা সেন (ভড়), বীনা দাস, আশালতা চট্টোপাধ্যায়, পুষ্প ঘোষ, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে চন্দনগরের বিধায়িকা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী)। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছাত্র আন্দোলনসহ অন্যান্য গমতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হন।

১৯৬৫ সাল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে এক সঙ্কটময় মুহূর্ত। এই বছরের সূচনা থেকেই কংগ্রেস সরকারের খাদ্যনীতি, মূল্যনীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলো মিলিত হয়ে খাদ্য আন্দোলন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকে। সারা রাজ্যব্যাপী মহিলারাও এই আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। হুগলী জেলার অন্যান্য

অঞ্চলের মত চুঁচুড়া-চন্দননগরেও এই আন্দোলন দানা বাঁধে। চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে এবং চন্দননগরের থানার সামনে মহিলাদের সমাবেশ হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন পুষ্প ঘোষ, মুক্তা কুমার, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বছর ১৭ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ডাকে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতার সুবাধ মল্লিক স্কোয়ারে মহিলাদের এক বিশাল সমাবেশ হয়। এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন জেলার যে ২৫টি আঞ্চলিক সমিতি যোগদান করে তাতে চুঁচুড়া-চন্দননগরের ব্যপক অংশের মহিলাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। এই সময় ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এখানকার মহিলা সমিতি জনমত গড়ে তোলে। উল্লেখ্য এইসব কর্মসূচীগুলো তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই পালিত হয়। কেননা এখানে যাঁরা সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন তারা অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই চল্লিশের দশকে সদস্যপদ লাভ করেন (যেমন মুক্তা কুমার, পুষ্প ঘোষ, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ)।

১৯৬৫-র ৪-৫ ডিসেম্বর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির রাজ্য সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে চুঁচুড়া-চন্দননগরের মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কার্যকরী সমিতির সদস্যা হন - মুক্তা কুমার, পুষ্প ঘোষ। এর পরবর্তী রাজ্য সম্মেলনগুলোর মধ্য দিয়ে এরা কখনও রাজ্য সম্পাদিকা, কখনও রাজ্য সহ-সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। কখনওবা কার্যকরী কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালের প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গব্যাপী খাদ্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। সংযুক্ত বামপন্থী-ফ্রন্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির ডাকে ১০ই মার্চ রাজ্যব্যাপী ঐতিহাসিক হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই আন্দোলনে মহিলারাও সামনের সারিতে পৌঁছায়। এই কর্মসূচী উপলক্ষ্যে মহিলা কর্মীরা চন্দননগর-চুঁচুড়ার পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির প্রধান নেত্রী মুক্তা কুমার পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে যে কথা লিপিবদ্ধ করেন তা থেকে এখানকার সমকালীন নারী আন্দোলনের চিত্র ধরা পড়ে। মুক্তা কুমার লিখেছেন :—

"১০ই মার্চ থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত চুঁচুড়ার কামারপাড়া, কনকশালী, শ্যামবাবুর ঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশী হামলা চলে। নির্দোষ, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের বাড়ী পুলিশ জোর করে প্রবেশ করেছিল এবং জোর করে বাড়ীর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের মারপিট করে ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মা অথবা স্ত্রী বা বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের কাতর আবেদনের জবাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে মেয়েদের ধাক্কা দিয়ে পুরুষদের টেনে নিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির চুঁচুড়া শাখার কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ নিয়ে, এই সকল বাড়ীর কয়েকজন মহিলাসহ ১৮ই মার্চ জেলাশাসকের কাছে পুলিশী হামলার প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল। হরতালের পরদিন ১১ই মার্চ, শুক্রবার চন্দননগরে পুলিশের এক তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। প্রথমে পথচারী ব্যক্তিদের কারফিউ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অজুহাতে বেপরোয়া গ্রেপ্তার করতে থাকে। ১২ই মার্চ ভোর রাতে গড়ের ধার

শুকসনাতনতলা, ফটকগোড়া ও বাউরীপাড়া এলাকায় পুলিশ প্রতি বাড়ীতে অত্যাচার চালায়। চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে গড়ের ধারের গরীব বাস্তুহারা পরিবারগুলো। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল এই এলাকাগুলোতে যান" (কনক মুখোপাধ্যায়, **'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা**, পৃষ্ঠা, ১৭৯-১৮০)।

প্রধান মহিলা নেত্রী মুক্তা কুমার তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, এই সময় বামপন্থী গণসংগঠনগুলো খাদ্য ও কেরোসিনের দাবীতে রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চন্দননগর-চুঁচুড়া তথা হুগলী জেলার মহিলা সমিতিও উপরোক্ত দাবীতে পথে নেমেছিল। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস সরকার খাদ্যের বদলে জনগণকে বুলেট বর্ষণে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল।

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সাংগঠনিক কার্যকলাপ মূলতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের সংগ্রামী মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের তেমন কোন প্রভাব ছিল না। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মহিলা আন্দোলন একটি পেশাদারী সংগঠনের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চন্দননগর চুঁচুড়ার মহিলা আন্দোলন এই বৈশিষ্ট্যের বাইরে ছিল না। কিন্তু এরপর এই সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে হুগলী জেলা তথা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী মিতালী কুমার বলেন এই সময় পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে জমি ও মজুরীর আন্দোলন সংগঠিত হওয়ায় গ্রামের সংগ্রামী মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহিলা সংগঠনের ছত্রছায়ায় আসেন। ফলে মহিলা সংগঠনের মধ্যে শ্রেণীচরিত্র আরও প্রকট হয়ে ওঠে। মুক্তা কুমারও এপ্রসঙ্গে একই কথা বলেন। সেসময় চন্দননগর-চুঁচুড়ার মহিলা কর্মীরা গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অংশ নেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুক্তা কুমার, পুষ্প ঘোষ, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, ইরা মুখোপাধ্যায়, মিতালী কুমার, সতী দাশগুপ্ত, নন্দা গুহ, লতিকা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এসময়ে কৃষক-শ্রমিকের দাবী দাওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামে ও শহরে মহিলা সমিতির কর্মীরা বিশেষভাবে যুক্ত হন।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে ভাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে স্বতঃস্ফূর্ত মহিলা আন্দোলন লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার প্রতিবাদে হুগলী জেলার শহরগুলোর মতো গ্রামাঞ্চলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। দাদপুর থানার শিখতে গ্রাম, মগলপুর গ্রাম, হরিপাল থানার কলাছড়া গ্রাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়। দাদপুর থানা এলাকার কৃষক কর্মী লেদাম হাঁসদা ১৯৭০ সালের ২৪ শে মার্চ, হরিপাল থানার ঐ গ্রামের হায়দার আলি ২১ শে মার্চ জোতদার ও পুলিশী আক্রমণে খুন হন। এছাড়াও ঐ বছর ১৭ই মার্চ রামজীবন সাঁতরা, ননী দেবনাথ, তারণ মাঝি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। এই বছর ১২ই জুন চুঁচুড়ার দিলীপ শূর ও ৬ই জুলাই হৃদয়রঞ্জন চৌধুরী এবং ১০ ই মে চন্দননগরের তপন দাশ কংগ্রেসী ঘাতক বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। এইসব খুন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং জমির লড়াইয়ে গ্রাম-শহরে সংগঠিত মহিলা আন্দোলন হয়। হরিপাল, পাণ্ডুয়া, বলাগড়ে গ্রামের মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। গ্রামের মহিলাদের উপরও অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। ধনেখালির কংসারী

পাড়ায় নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে থানা ঘেরাও হয়। ফলে ১২জন মহিলা গ্রেপ্তার বরণ করেন, এঁদের মধ্যে একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। লক্ষ্মীরানী পাখিরা এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন। হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রভাবে মহিলা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। আর এই সময়ই দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভাঙ্গার প্রতিবাদে, সংগঠিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, গ্রামে জমির আন্দোলনাকে জোরদার করার দাবীতে মহিলা সমিতির উদ্যোগে জেলাগতভাবে চুঁচুড়ায় ডেপুটেশন কর্মসূচী পালিত হয়। প্রায় ৫০০ মহিলা এই কর্মসূচীতে যোগ দেন। চন্দননগর-চুঁচুড়ার বহু মহিলা এই কর্মসূচীতে সামিল হন। ১৯৬৯ সাল থেকে মহিলা সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৭০-এর ৭ ৮-ই মার্চ ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মহিলা সমিতি দ্বিধা বিভক্ত হয়। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা নেত্রীরা 'পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি তৈরী করেন। সেদিনের সেই মতাদর্শগত সংগ্রামে চন্দননগরের মহিলারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। রাজ্য ত্রয়োদশ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুষ্প ঘোষ সংগঠনের অন্যতম সম্পাদিকা এবং মুক্তা কুমার কার্যকরী কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভাঙ্গার পর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করা হয়। এর বিরুদ্ধে এখানকার মহিলারা প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৭১ সালের নির্বাচনেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এ প্রসঙ্গে মুক্তাকুমার বলেন এই নির্বাচনে যে সব বুথে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা প্রবেশ করতে পারেননি সেইসব বুথে মহিলা কর্মীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৭২-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের জমানায় পশ্চিম বাংলায় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের হত্যা করা হয়। মহিলারা সেদিন এই হত্যালীলার অঙ্গনের বাইরে ছিলনা — একথা সর্বজনবিদিত। এখানে কোন মহিলাকর্মী খুন না হলেও মহিলাদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল আর এখানকার মহিলারা হুগলী জেলা তথা পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এখানে মহিলা আন্দোলন কোন পৃথক আন্দোলন ছিল না — তা ছিল মূল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতধারার অংশ মাত্র।

সূত্র নির্দেশ

১। কনক মুখোপাধ্যায়, **'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা'**।

২। কমল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, **প্রগতি**, শারদীয়া ১৩৯০, সংকলন সংখ্যা, চন্দননগর।

৩। **স্মরণিকা**, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রয়াত সংগঠক ও শহীদ স্মরণে হুগলী জেলা ত্রয়োদশ সম্মেলন ১৯৮৫।

৪। সাক্ষাৎকার, মুক্তা কুমার, ১০.৪.৯৬ চুঁচুড়া, হুগলী।

৫। সাক্ষাৎকার, মিতালী কুমার, ২০.৪.৯৬ চুঁচুড়া, হুগলী।

৬। **ইতিহাস অনুসন্ধান ১০**: 'চন্দননগরের ছাত্র আন্দোলন এই শতাব্দীর তিরিশের দশক', মনিরুল ইসলাম।

মাতৃভাষার নবায়নে 'ইয়ংবেঙ্গল'দের ভূমিকা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গল নামে খ্যাত হিন্দু কলেজের তরুণ জাতকদেব সম্পর্কে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিদগ্ধ ভাষ্যকাররা যে গুরুতর অভিযোগটি এনে থাকেন সেটি হচ্ছে এই, পাশ্চাত্য শিক্ষার মদ্যপানে উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল এই তরুণের দল অযথা কিছু হৈ চৈ করে হারিয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসের অন্ধকারে। দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে এবা বিদেশী ভাযা ও সংস্কৃতির দাসত্ব করেছিলেন মাত্র। তাঁরা "Anglophile"[১], 'দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শিকড়চ্যুত'[২] ইত্যাদি ...... ডিরোজিও সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ডিরোজিও-ও বাংলা জানতেন না, বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কখনো পরিচয় ঘটেনি, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য কোনো কৌতূহল কখনো প্রকাশ করেন নি।[৩] ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত তাঁর শিষ্যমণ্ডলী সম্পর্কে বলা হয়েছে 'নব্য বাংলার এই যুব মণ্ডলী দেশের কোনো পরিচয় রাখতেন না, তাঁরা নিজেদের পুরোপুরি শিকড়চ্যুত করে ফেলেছিলেন'[৪]। বাংলার রেনেসাঁস-ভায্যের দুই বিপরীত মেরুর ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী[৫] ও সুমিত সরকার[৬] ইয়ং বেঙ্গলদের মূল্যায়নে মোটামুটি একই রকম নেতিবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

প্রথমেই আমরা দেখে নেব মাতৃভাষা ছাড়া অন্যতর ভাযা ও সংস্কৃতির চর্চা রেনেসাঁসের ইতিহাসে কোন অমার্জনীয় অপরাধ কিনা? রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। সুতরাং হিউম্যানিস্ট নামে খ্যাত ইতালির বুদ্ধিজীবীরা এ ব্যাপারে কি করেছিলেন তা এক ঝলক দেখে নেওয়া যেতে পারে। 'হিউম্যানিজমে'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এল. ডাবলু. স্পিৎজ বলেছেন 'এটা হচ্ছে প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারমূলক একটা শিক্ষা দর্শন।'[৭] প্রাচীনবিদ্যা বলতে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা। ইতালির হিউম্যানিস্টরা রেনেসাঁসের আমলে মাতৃভাষার পরিবর্তে গ্রীক ও লাতিন ভাষার চর্চায় নিরত হয়েছিলেন। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয় লগ্নে তখন সবকিছুরই বদল হচ্ছিল।[৮] চার্চশাসিত মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজনে তার বুদ্ধিজীবীরা তখন অধিকতর জীবনবাদী গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির কথা তুলে আনছিলেন। গ্রীক ও লাতিন ভাষার চর্চা তাঁরা করছিলেন এইজন্য যে তা ছিল মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্রের বিশুষ্কতা থেকে মুক্ত। রক্তস্ফীত প্যাগান জীবনবাদ ও রোমান জীবনচর্যার ঐশ্বর্য ও উত্তাপকে তাঁরা নতুন করে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন তাঁদের বিস্তারমুখী জীবনে। ভাষাচর্চা এখানে ভাষাচর্চা মাত্র নয়, মধ্যযুগের শেকল কেটে অন্যতর আকাশের দিকে উড়ে যাওয়া। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের

জনক হিসাবে খ্যাত পেত্রার্কা ইতালির মুখ ঘুরিয়ে দেন লাতিন চর্চার দিকে। বোক্কাচিওর মনে তিনি জাগিয়ে দেন গ্রীক চর্চার আগ্নেয় আকাঙ্খা। বিখ্যাত গ্রীকবিদ্ ক্রাইসোলরসের কাছে গ্রীক ভাষা শিখলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ব্রুনি, গুয়ারিনো, পোগ্গিও, ফাইলেলফো প্রমুখ। ব্রুনি লিখেছেন 'ক্রাইসোলরসের কাছে দিনের বেলায় যা শুনতাম রাত্রে নিদ্রার মধ্যেও তা আমার মনকে অধিকার করে থাকতো।'[১০] ফিকিনো প্লেটোবিদও পম্পোনাজ্জি এরিস্টটলবিদ্ হিসাবে খ্যাত হলেন। শুধু গ্রীক ভাষার চর্চা নয় লাতিন ভাষার চর্চাতেও ইতালির হিউম্যানিষ্টরা চূড়ান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পেত্রার্কা হতে চাইলেন তাঁর সময়ের সিসেরো।, বোক্কাচিওকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন 'আমি ভার্জিল, হোরেস, লিভি, সিসেরো একবার নয় সহস্রবার পড়েছি দায়সারা গোছের পড়া নয়, আমি পড়েছি, আস্তে আস্তে এবং তা দিয়ে আমি সঞ্জীবিত করেছি আমার সমগ্র মনকে, সকালে যা পড়তাম, সন্ধ্যায় সেগুলো রোমন্থন করতাম, বালকের মত গোগ্রাসে গিলতাম এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষের মত হজম করতাম। তাদের লেখাগুলি শুধু মস্তিষ্কে নয়, মজ্জাগত করে নিতাম ('not only in my memory but in my very marrow')[১১]। এই বক্তব্য থেকে আন্দাজ করা যায় অন্যতর ভাষার চর্চায় তাদের আগ্নেয় অনুরাগের স্বরূপটি কি রকম ছিল? প্রখ্যাত হিউম্যানিষ্ট লরেঞ্জো ভাল্লা লাতিন ভাষা চর্চার সপক্ষে রচনা করলেন 'এলিগেন্সেস অব দ্য ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৪৪৪ খ্রীঃ)। রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলিতে পড়ানো হতে থাকে গ্রীক ও লাতিন পাঠ্যক্রম[১২]। প্রিসকোট লিখেছেন রেনেসাঁসের রাজন্যকদের শুধু যুদ্ধ ও রাষ্ট্র শাসনবিদ্যায় নয় গ্রীক ও লাতিন ভাষাতেও পারদর্শী হতে হত।[১৩] রুসেল্লি নামে এক বণিক তাঁর ডায়েরীতে সুখী মানুষের সাতটি লক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় পারদর্শিতা সুখী মানুষের অন্যতম গুণ হিসাবে ধরা হয়েছে।[১৪] বলদাসের কাস্তিলিওনে তাঁর 'কোর্টিয়ার' গ্রন্থে আদর্শ ভদ্রলোকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন গ্রীক ও লাতিন ভাষা মানুষের মনকে মার্জিত ও সুসংস্কৃত করে।[১৫] বুর্খ হার্ডট তাঁর রেনেসাঁস সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন, লাতিন ভাষার মর্যাদা ও তার প্রতি অনুরাগ সে সময় এমন বৃদ্ধি পায় যে ছেলেমেয়েদের নামকরণও লাতিনে হতে থাকে।[১৬] তখনকার বিখ্যাত বক্তাদের বক্তৃতাগুলি গ্রীক ও লাতিন উদ্ধৃতিতে ছাওয়া থাকত। কারো কারো সম্পর্কে বলা হত তিনি হাঁ করলে গ্রীক ও লাতিন কোটেশন দেখা যেত। প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার, সেগুলির সঠিক সংস্করণ, অনুবাদ, মুদ্রণ প্রভৃতি মিলিয়ে রেনেসাঁসের আমলে যে বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে মাতৃভাষা ইতালিই হয়ে পড়েছিল দুয়োরাণী।[১৭] রেনেসাঁসের ভাষাচর্চার ইতিহাস কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অনুধাবন করলে দেখা যায় গ্রীক ও লাতিন ভাষা চর্চার পাশাপাশি মাতৃভাষা ইতালির সপক্ষেও ফল্গুধারার মত একটি অনুরাগতপ্ত ভাষাচর্চার ধারা সে সময় প্রবাহিত হত। সুপণ্ডিত ভাল্লা যেমন লাতিন ভাষার সপক্ষে প্রস্তাব লিখেছিলেন, আলবের্তি বাত্তিস্তা নামে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন লেখক শিল্পীও তেমনি মাতৃভাষা ইতালির সপক্ষে রচনা করেছিলেন একটি জোরালো প্রস্তাব - 'দেল্লা ট্রাঙ্কুইলিত্তা দেল্লা নিমো'

(১৪৪৫ ১৪৫০)। সেখানে তিনি প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে লেখেন 'সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন ভাষায় যদি আমি লিখি কার এমন ক্ষমতা আছে যে আমাকে আক্রমণ করে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।'[১৮] এই তীব্র ভাষা থেকে বুঝতে পারা যায় কতটা বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে এই প্রস্তাব লিখতে হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিকরা ইতালি ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। সাননাজারো মাতৃভাষায় লেখেন **'অর্কেদিয়া'** (১৫০৪), এরিস্তো লেখেন **'অরল্যান্দো ফুরোসা'** (১৫১৫), মেকিয়াভেলি ও গুইচারদিনি তাদের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন ইতালি ভাষাতেই। পেত্রার্কা ও বোক্কাচিও নব্য লাতিন ভাষার স্থপতি হলেও ইতালি ভাষার প্রতি তাঁদের মমত্ব কম ছিল না। বেসিল উইলি তাঁর **'টেন্ডেন্সিজ ইন রেনেসাঁস লিটারারি থিওরি'** নামক গ্রন্থে 'ডিফেন্স অব দ্য ভার্নাকুলার' নামক ২য় অধ্যায়ে তা উদ্ধৃতি সহযোগে দেখিয়েছেন।[১৯] আরেতিনো ঘোষণা করেন 'প্রত্যক্ষ ক্ষমতাশালী লেখকের উচিত বোক্কাচিওকে এড়িয়ে মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করা। পেত্রার্কা ও বোক্কাচিওর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাঁদের অক্ষম অনুকারীরা নন, প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি যিনি তাঁর অনুভূত আবেগকে মাতৃভাষায় মধুর ও প্রাঞ্জল করে ব্যক্ত করতে পারেন।' রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বেম্বো তাঁর **'প্রোজ দেল্লা লিঙ্গুয়া ভোলগার'** (১৫২৫) নামক লেখায় ভাষাদর্শ সম্পর্কে একটি আলোচনামূলক সংলাপ রচনা করেছেন। সেখানে বিতর্ক সমাপ্ত হয়েছে মাতৃভাষার অনুকূলে। কাস্তিলিওনের 'কোর্টিয়ায়' গ্রন্থেও পেত্রার্কা - বোক্কাচিওর ভাষাদর্শ ও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় তা নিয়ে মনোরম আলোচনা আছে। সেখানে কাউন্ট চলতি ও সজীব ভাষার পক্ষে। বলা বাহুল্য কাউন্টের মধ্যে দিয়ে কাস্তিলিওনে নিজের অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। ত্রিসিনো তাঁর **'এল ক্যাসতেল্লানো'** নামক রচনায় বলেছেন দান্তের ভাষাকেই ফিরিয়ে আনা উচিত। ইতালীয় রেনেসাঁসে ভাষাচর্চার বিবর্তন রেখাটি খুবই স্পষ্ট। ক্লাসিকাল গ্রীক, লাতিন থেকে মাতৃভাষা ইতালির দিকে তার স্বাভাবিক ক্রমাপসরণ বা উত্তরণ ঘটেছিল। প্রথমদিকে হিউম্যানিস্টরা গ্রীক লাতিনাদি অন্যতর ভাষাচর্চার দিকে পতঙ্গের মতো ধাবিত হলেও ক্রমশ তারা ফিরে এসেছিলেন লোক চলতি মাতৃভাষার দিকে। দ্বিমুখী সেই ভাষাপ্রকল্পের মধ্যে একটি অনিবার্য অন্তঃসংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। গ্রীক ও লাতিন ভাষা উৎস থেকে সম্পদ ও সৌন্দর্য আহরণ করে অবশেষে তাঁরা তাদের মাতৃভাষাকেই সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করে তুলেছিলেন। রেনেসাঁসের ভাষাচর্চার এটাই সার-সত্য। এর ফলে বুর্খহার্ডটের উক্তি অনুসারে ইতালীয় ভাষা ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ ও সুরচিত একটি উদ্যানে পরিণত হয়েছিল।[২০] ইতালীয় রেনেসাঁসে ভাষাচর্চার এই ইতিবৃত্ত থেকে মূল দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে — এক, অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা রেনেসাঁসে কোনো অমার্জনীয় অপরাধ নয়, বরং আবশ্যক শর্ত। দুই, অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক ও নিবিড় চর্চা আখেরে মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনেই শেষ পর্যন্ত উৎসর্গিত হয়।

ইয়ং বেঙ্গলরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বহ্নিমুখী পতঙ্গের মত কিভাবে ধাবিত হয়েছিলেন, কিভাবে ব্যক্ত করেছিলেন প্রতীচ্যবিদ্যার প্রতি তাঁদের অনুরাগ, কিভাবেই বা সেসব বিদ্যা রপ্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন ও অধিগত করেছিলেন সে আলোচনা বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন। অমলেশ ত্রিপাঠী যদিও তাঁদের পাশ্চাত্য বিদ্যার গভীরতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন তাঁরা প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে 'ডিথ্রোন' করে প্রতীচ্য সংস্কৃতিকে বরণ করেছিল 'without knowing much of the either'.[১১] তথাপি ইয়ং বেঙ্গলদের পাশ্চাত্যবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানগম্যির যতটুকু প্রাথমিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা যথেষ্ট সমীহ করার মত। প্রতীচ্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা কিভাবে গলাধঃকরণ ও আত্মস্থ করেছিলেন সে বিষয়ে দুটি সাক্ষ্য আমরা উপস্থিত করতে পারি। প্রথমটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ স্বয়ং আলেকজান্ডার ডাফের বিবরণ, দ্বিতীয়টি ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপাত্র ও এডভোকেট কৃষ্টদাস পালের বক্তব্য। ইয়ং বেঙ্গলরা আলোচনা ও বিতর্ক সভায় মিলিত হয়ে কি ধরনের বক্তৃতাদি করতেন? আলেকজান্ডার ডাফ জানিয়েছেন 'প্রত্যেক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সময় বক্তারা ইংরাজী সাহিত্য থেকে ভাল কথা অনর্গল আবৃত্তি করতেন। ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টসন ও গিবন, রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি, ধর্মীয় বিষয় হলে হিউম ও টমাস পেইন, আধ্যাত্মিক বিষয় হলে লক, রীড, স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন প্রমুখ মনীষীদের রচনা তরুণ তার্কিকরা নিজেদের উক্তির সমর্থনে অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতে পারতেন। গুরুগম্ভীর বিষয় ও রচনার মধ্যে হীরে মুক্তোর মতন তাঁরা ছড়িয়ে দিতেন তখনকার স্বনামধন্য ইংরাজ কবিদের উৎকৃষ্ট সব কবিতার পংক্তি, বিশেষ করে বাইরন ও ওয়াল্টার স্কটের।'[১২] ইয়ংবেঙ্গলদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ ও মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব দিতে পরের দিকের এক ইয়ংবেঙ্গলপন্থী কৃষ্টদাস পাল একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখেছিলেন। মুক্ত অনুবাদে তার থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি — 'বল, ভারতে কে বা কারা জ্ঞানের প্রতি প্রজ্জ্বলন্ত ভালোবাসা বশতঃ তা অধিগত করতে অগ্রসর হয়েছে, ব্রিটেনের বলিষ্ঠ চেতনার সঙ্গে সজীব সম্পর্ক রচনা করেছে, মিলটন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের পবিত্র ও ধ্রুপদী কাব্যের ধারায় সানন্দে তৃষ্ণা মিটিয়েছে, নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে বেকন ও নিউটন প্রদত্ত দর্শনের শাস্ত্র দিয়ে, ইতিহাসের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছে হিউম ও গিবনের বই পড়ে; বার্ক, পিট, উইন্ডহ্যাম ও পার্সিভ্যালের রাষ্ট্রনৈতিক সূত্রগুলি দিয়ে মীমাংসা করতে চেয়েছে তাঁর সম্মুখস্থ জটিলতাগুলি? ...... If I mistake not, all with to a man answer, "Tis Young Bengal : Tis young Bengal :"'[১৩] সুতরাং পাশ্চাত্য বিদ্যার চর্চায় তাঁদের অবহেলা, অনাগ্রহ বা অগভীরতা নয় বরং পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি ও আনুগত্যই তাঁদের বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগের মূল ভিত্তি।

কিন্তু ইতালীয় রেনেসাঁসের দিকে তাকান। সেখানে দেখবেন রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কা হাহুতাশ করছেন এই বলে 'আমি যদি লিভির যুগে জন্ম নিতাম কি ভালোই না হত!'[১৪] বোক্কাচিও উন্মত্ত প্রায় হয়ে মঠে মঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন

জীর্ণপ্রায় গ্রীক ও লাতিন পুঁথির সন্ধানে,[২৫] গুয়ারিনো গিয়ে ভিড়ছেন গ্রীক গুরুর ডেবায়[২৬], প্লেটোর দর্শন ব্যাখ্যা করে ফিকিনো মাতিয়ে তুলছেন ফ্লোরেন্সের প্লেটোনিক একাডেমি,[২৭] পোপের সেক্রেটারির কাজে ফাঁকি দিয়ে পোগ্গিও দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার হাতড়ে বেড়াচ্ছেন,[২৮] ভেনিসের বিখ্যাত মুদ্রণ ব্যবসায়ী অলডো ম্যানুটিয়াসের বাড়ি গ্রীক কলোনিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে,[২৯] বতিচেল্লি[৩০] বা জর্জিনোর[৩১] মত শিল্পীরা আঁকছেন 'ভেনাসেব জন্ম' বা নিদ্রামগ্ন নগ্নতার প্যাগান সৌন্দর্য, রাফায়েল তাঁর সুবিখ্যাত 'স্কুল অব এথেন্স' ছবির কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করছেন দুই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলকে[৩২], ফাইলেলফো বলছেন ইতালিতে মাথা তুলছে নবীন গ্রীস। অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই ধরনের অনুরাগদীপ্ত আবেগ ও আনুগত্যের জন্য ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাষ্যকাররা কিন্তু তাঁদের অপরাধীজ্ঞানে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি। কেন না এই সাংস্কৃতিক প্রবাস ব্যতীত রেনেসাঁসের আমলে নবতর সংস্কৃতির জন্মই হত না। মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ব্যতীত সম্ভব হত না আধুনিক যুগে প্রবেশ। যে জীবন এখন বিশুষ্ক কিন্তু একদা সঞ্জীবিত ছিল তাব সন্ধানে ইতালিব হিউম্যানিস্টরা প্রবেশ কবেছিলেন গ্রীক ও লাতিন বিদ্যার প্রাচীনতর ভুবনে এখানেও কি সেই একই রকম তাগিদ থেকে আধুনিক যুগের বঙ্গপথিকরা তৃষিত আগ্রহে ধাবিত হন নি প্রতীচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির জীবনময় পৃথিবীর দিকে? যে জীবন এখানে বিশুষ্ক, মৃতপ্রায়, তা অন্য কোনো গোলার্ধে সজীব ও সঞ্জীবিত রয়েছে অতএব 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' — এই আবেগ থেকে তাঁরা প্রধাবিত হয়েছিলেন প্রতীচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে। অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে ইয়ংবেঙ্গলদের এই মানসিক প্রস্থান রেনেসাঁসের প্রক্রিয়া বহির্ভূত কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপাব নয় ববং আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত।

এখন আমরা আসব দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের প্রাথমিক ঝোড়ো অনুরাগ সত্ত্বেও মাতৃভাষার পরিপুষ্টি প্রকল্পে তাঁদের অনুরাগ ও অবদান যে কোন অংশেই কম নয় সেই প্রসঙ্গে। ইংরাজী থেকে মাতৃভাষার দিকে তাঁদের ক্রম পরিবর্তিত অনুরাগের সেই ইতিবৃত্ত আমরা মূলতঃ তিনদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করবো। তাঁদের সভা সমিতি, তাঁদের সম্পাদিত পত্রপত্রিকা ও তাঁদের রচিত মননশীল ও সৃজনশীল সাহিত্য।

১। **সভা-সমিতি** : কোনো সন্দেহ নেই ১৮২৮ সালে ডিবোজিও ও ডিরোজিয়ানদের স্থাপিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'ই ছিল পাশ্চত্যপন্থীদের প্রথম সভা। এখানে কি ভাষায়, কি ধরনের বক্তৃতা ও বিতর্ক হত তার পরিচয় আছে পূর্বোদ্ধৃত ডাফের বিবরণে। ইংরাজীই ছিল এই সভার মুখ্য এবং বলতে গেলে একমাত্র ভাষা। ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই ধরনের আত্যন্তিক অনুরাগের সমান্তরালে মাতৃভাষার সপক্ষে সংগঠিত সওয়াল শুরু করে ১৮৩২ সালে ৩০শে ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের সিমলা স্কুলে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি সভা 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'। এর

উদ্যোক্তারা ইয়ংবেঙ্গল না হলেও অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।[৩৩] এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়। সভাটি আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে ছোট নয়। এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বিশেষ অনুশীলন করা।

১৮৩৮ খ্রীঃ ১২ মার্চ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত তরুণদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়—

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ঃ এর ১৫০ জন নিয়মিত সদস্যের মধ্যে প্রায় ৮০ জন ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। এখানে কেবল ইংরাজী নয় বাংলা ভাষাতেও প্রবন্ধ পঠিত হত। উদয়চাঁদ আঢ্য নামে এক ব্যক্তি, 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় মাতৃভাষার সপক্ষে একটি সুরচিত প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রস্তাবটির নাম '**এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব।**' এতে বলা হয় 'দেশের মনুষ্য সেই দেশের ভাষায় কর্ম্মদক্ষতা হইলে পরাধীন দাসত্বের কারণচ্যুত হইয়া স্বপ্রধান হইতে পারেন, তৎপ্রমাণ দেখুন যে এমত দেশও অদ্যাপি কতিপয় আছে যে তত্রস্থের স্বীয় জাতীয় ভাষায় জ্ঞান দ্বারা বৃহৎ ২ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেছেন, রাজার ভাষা বা কোন রাজার সহিত সংসৃষ্ট রাখেন না।[৩৪] উদয়চাঁদ আঢ্যের এই প্রস্তাব মনে করিয়ে দেয় ইতালির 'ইনফিয়ামেত্তি একাডেমি'তে স্পেরোনে স্পেরোনি কর্তৃক গঠিত 'ডায়লক অন ল্যাঙ্গুয়েজ' নামক নিবন্ধটির কথা। তাতে তিনি বলেছিলেন শুধু গ্রীক লাতিন নয, ইতালি ভাষাতেও যে কোন সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করা যায়।[৩৫] এরপর থেকে উক্ত একাডেমি মাতৃভাষা ইতালিতে বক্তৃতা দেওয়া ও রচনা প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেয়। বেনেদত্তো ভার্চি ইতালি ভাষায় ওভিদ ও থিওক্রিটাস অনুবাদের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বক্তৃতার ভাষা নিয়ে তাদের সমস্যায় পড়তে হয় নি বা পিছু হটতে হয় নি তা নয়। 'ফ্লোরেনটাইন একাডেমি'তে ভার্চি 'নিকোমাচিয়েন এথিকস্' এর জ্ঞানগর্ভ ও জনপ্রিয় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রথম বক্তৃতা তিনি ইতালি ভাষাতেই দেন। কিন্তু পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে তাকে নিরুপায় হয়ে লাতিনে ফিরে যেতে হয় কেন না ক্রমবর্ধমান শ্রোতারা আসরে ফরাসী ও জার্মানিরা ভিড় জমাতে থাকে।[৩৬] লাতিনই ছিল তখন ইউরোপের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'। ১৮৪৪, ২৩ জুন ডেভিড হেয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গঠিত হয় '**হেয়ার প্রাইজ ফান্ড কমিটি**'। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলরাই ছিলেন এর উদ্যোক্তা সদস্য। এই কমিটি সমাজ মঙ্গল বিষয়ে বাংলার লিখিত একটি বইকে বাৎসরিক পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করে। ১৮৫১, ১২ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় '**বেথুন সোসাইটি**'। বাংলার বিদ্বৎসভার ইতিহাসে অনন্য সাধারণ, এই সভাটির সেক্রেটারী ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। এর সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রমুখ হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্ররা। সামাজিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে এখানে নিবন্ধ পঠিত হতো। সোসাইটির ট্রানসাকশনসে প্রকাশিত বিষয়ের

তালিকা থেকে দেখা যায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃত কাব্য', কৈলাসচন্দ্র বসু 'ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক', প্যারীচরণ সরকার 'বাংলার শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা', রেভারেন্ড লালবিহারী দে 'বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা', 'বাংলায় মাতৃভাষা শিক্ষা' প্রভৃতি বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর সুবিখ্যাত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামক বাংলায় রচিত প্রস্তাবটি এখানেই পাঠ করেন। সোসাইটির নিয়মাবলী যা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বলা হয়েছিল 'Discourses (written or verbal) in English Bengali or Urdu, on literary or Scientific subjects, may be delivered at the society's meeting'. অর্থাৎ ইংরেজী, বাংলা বা উর্দু ভাষায় লিখিত বা মৌখিক ভাষণ দেওয়া যাবে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় গঠিত নিবন্ধের সঙ্গে বেথুন সোসাইটিতে গঠিত নিবন্ধগুলির তুলনা করলে দেখা যায় মাতৃভাষার প্রতি ঝোঁক অনেক বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে সমকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র (১৮৫৩) কথা উল্লেখ করা যায়। বিনয় ঘোষের মতে 'বেথুন সোসাইটির খাঁটি বাঙালী সংস্করণ হয়েছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভা।' ...... সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে সভার আলোচনা হতো। ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই আলোচনা হতো। কিন্তু বাংলা ভাষার আলোচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী।[৩৮] এই প্রসঙ্গে দুটি সংবাদ খুব জরুরী। এক, 'বেথুন সোসাইটি'র সব বাঙালী সভ্যই প্রায় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।'[৩৯] দুই, বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকেই মেঘনাদবধ কাব্যের রচয়িতা ও নবযুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

২। **পত্র-পত্রিকা** : সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে ইয়ংবেঙ্গলদের যে সুস্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাঁদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার দিকে তাকালেও তা নজরে পড়ে। ১৮৩০ সালের শরতে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তার তরুণ ছাত্ররা বের করে **'পার্থেনন'** নামে একটি পত্রিকা। এটিই বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সমাচার পত্র। কেন তারা পত্রিকা বের করেছেন তার জবাবদিহিতে ইয়ংবেঙ্গলরা লিখেছেন — "Hindu by birth, yet European by education and all its concomitants, they need some organ for the communication of their sentiments, some tablet where they may register their thoughts."[৪০] হিন্দু সমাজপতিদের প্রকোপে তা অনতিবিলম্বে রুদ্ধবাক হয়। এরপর তাদের দ্বারা প্রকাশিত 'হেসপেরাস' নামক বার্ষিক সঙ্কলনও অনুরূপ কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩১ খ্রীঃ মে মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'এনকোয়ারার পত্রিকা'। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'Written with fire'[৪১]। ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন অপর এক সুবিখ্যাত ডিরোজিয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'জ্ঞানান্বেষণ'। ১৮৩৩ খ্রীঃ জানুয়ারী মাস থেকে

পত্রিকাটি ইংরাজী-বাংলা দ্বিভাষী কাগজে পরিণত হয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিকও এর সম্পাদক হয়েছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' মনে করত 'জ্ঞানের বিস্তারই দেশপ্রেমের সবচেয়ে মহান নিদর্শন'।[৩৮] 'জ্ঞানান্বেষণে' একটি নিবন্ধে বলা হয়েছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল জ্ঞানের উৎসভূমি। ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারকে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর কাছে অবারিত করে দেওয়া।[৩৯] এই লক্ষ্যে কিছু মৌলিক বাংলা বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার জন্য সমিতি গঠন করার আহ্বানও জানানো হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামে একটি দ্বিভাষিক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল -- 'to communicate to the natives a knowledge of European Literature and science'[৪০] ১৮৩৯ সালে মার্চে শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সেকালের অন্যতম জনপ্রিয় সাপ্তাহিক **'সংবাদ ভাস্কর'**। পত্রিকাটি সেই অর্থে ইয়ংবেঙ্গল পরিচালিত ছিল না বটে তবে ইয়ংবেঙ্গলদের পরিচালিত আন্দোলনের ফলে পরিবর্তিত তৎকালীন সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে নিহিত ছিল পত্রিকাটির প্রগতিশীল ভূমিকার রহস্য। উপরন্তু এও জানা যায় 'জ্ঞানান্বেষণে'র পূর্বতন সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৪১] ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে বিখ্যাত ডিরোজিয়ান রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় দ্বিভাষিক, স্বল্পজীবী, কিন্তু প্রগতিশীল একটি পত্রিকা **'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'**। গোবিন্দ চন্দ্র বসাককে লেখা রামগোপাল ঘোষের একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর বাড়িতে তারাচাঁদ (চক্রবর্তী), প্যারী (চাঁদ মিত্র) ও রামগোপাল স্বয়ং মিলিত হয়ে বাংলা ও ইংরাজীতে একটি মাসিক পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেন ('We resolved upon establishing a monthly magazine in Bengali and English ..... It is in short to be our peculiar organ')[৪২] পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পড়েছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের উপর। মাসিক থেকে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক শেষে দৈনিক হিসাবে এটি প্রকাশিত হতে থাকে। বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিন্তাতরঙ্গের গতিরোধ করার শক্তি হিন্দু সমাজের নেই (নভেম্বর ১, ১৮৪২)[৪৩]। পত্রিকার স্তম্ভে মন্তব্য করা হয় 'আজ আমাদের সামনে একটি নতুন উষার উদয় হতে চলেছে। চিন্তাজগতে যে দাসত্ব এতদিন জাতির মনকে জড়পদার্থ করে রেখেছিল, আজ তা দূর হতে চলেছে, সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা ক্রমশ সেই স্থান দখল করেছে।' (ডিসেম্বর ১, ১৮৪২)[৪৪]। এমন পত্রিকাও অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তুলে দিতে হয়। ১৮৫৪ সালের ১৬ই আগস্ট প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করেন **'মাসিক পত্রিকা'**। এবার আর দ্বিভাষিক নয়। খাঁটি বাংলা পত্রিকা। প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা থাকত এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়। তাহাতেই প্রস্তাব ও সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন।

কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।'' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত গ্রীক, পুরাণ, ইংরাজী, জাপানী প্রভৃতির নীতিমূলক গল্প। এতে মহিলাদের জগতের অন্যান্য দেশেরও কথা থাকত প্রচুর। 'মাসিক পত্রিকা'তে বের হয়েছিল 'আলালের ঘরের দুলাল'। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 'সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা বাধানাথের একটা বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রিকাতে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কিনা। শুনিতে পাওয়া যায় একদিন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই প্যারীচাঁদ মিত্রের গৃহের দ্বারে গিয়া ডাকাডাকি, — "প্যারি, প্যারি! উঠ, উঠ, এবারকার পত্রিকা পড়িয়া তোমার স্ত্রী কি বলিলেন?''

'পার্থিনন' বা 'এনকোয়াবার' থেকে 'মাসিক পত্রিকা' ইয়ংবেঙ্গলদের প্রকাশিত সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকার এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ দিয়ে শুরু হয়েছিল ইয়ংবেঙ্গলদের পথচলা, ক্রমে দ্বিভাষিক পত্রিকা পর্ব পেরিয়ে সহজবোধ্য বাংলা পত্রিকায় এসে যেন সম্পূর্ণ হয় তাদের মানসেতিহাসের বৃত্তান্তটি। ইংরাজী থেকে বাংলার দিকে ইয়ংবেঙ্গলদের এই মানস বিবর্তনের বৃত্তান্তটি রেনেসাঁসীয় মানস-বিবর্তনের বৃত্তান্ত। প্রথম দিকে ইতালির হিউম্যানিস্টরা গ্রীক ও লাতিন ভাষাচর্চার মধ্যে অতিনিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের আগ্রহ। ভাল্লা, গুয়াবিনো, পোগ্গিও, ব্রুনি, বেসারিন, ফাইলেলফো, পলিজিয়ানো সকলেই ছিলেন গ্রীকবিদ্ বা লাতিন ভাষার প্রবক্তা। পরের দিকে বেম্বো, ভার্চি, স্পেরোনে স্পেরোনি প্রমুখ হিউম্যানিস্টরা গ্রীক ও লাতিন ভাষার গুরুত্ব হ্রাস করে মাতৃভাষা ইতালিকে মুখ্য স্থান দেন। লাতিন থেকে ইতালির দিকে এই অপসরণের ইতিহাসটিই যেন আমরা পেয়ে যাই ইয়ংবেঙ্গলদের ভাষাচর্চার বৃত্তান্তে।

৩। **গ্রন্থাদি রচনা** : ইয়ংবেঙ্গলদের সম্পর্কে সমকালীন অভিযোগ ছিল তাঁরা 'হিপোক্রিট'[২] আধুনিককালে কেউ কেউ বলেছেন তাঁদের অবদান 'very nearly nil' — কিন্তু তাঁরা শুধু সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বা স্বল্পজীবী পত্রপত্রিকায় তাৎক্ষণিক রিপোর্টাজ ধর্মী লেখা লিখে তাঁদের কাজ শেষ করেন নি, গুরুত্বপূর্ণ অনেক মননশীল ও সৃজনধর্মী প্রস্তাব, পুস্তিকা ও গ্রন্থাদিও রচনা করেছিলেন। তাঁদের সেই রচনাগুলির আনুপূর্বিক বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এখানে দেখাবো রেনেসাঁস প্রকল্পের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তাঁরা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন। জে. এ. সাইমন্ডস রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আন্দোলনকে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন, তার মধ্যে একটি পর্বের নামকরণ করেছেন 'এজ অব ট্রানশ্লেসন' নামে।[২] সঠিক ও সম্পাদিত অনুবাদ এক সংস্কৃতির সঙ্গে আরেক সংস্কৃতির সেতুবন্ধন করে। গ্রীক বিদ্যাকে সেখানে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের লাতিনে স্থানান্তরিত করতে হয় এবং প্রাচীন লাতিন রচনা সম্ভারকে নিয়ে আসতে হয় সঠিক ইতালি ভাষায়। বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ইতালির মতো কোন 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' ছিল না। উভয়মুখী একটি ভাষা প্রকল্পে তাদের চলাচল করতে হয়েছিল। প্রখ্যাত ডিরোজিয়ান কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রস্তাবে পেশ করেছিলেন ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে উনিশ শতকের সর্বাধিক ভারসাম্যমূলক একটি অভিমত "Academic education for native must, for years to come, comprise both English and oriental literature; the one for introducing and the other for naturalising the enlightenment of Europe in Asia." .... "It should not be exclusively English, it must have Sanskrit or Arabic by its side."[৫২]

এইভাবে মাতৃভাষার পবিত্রতা রক্ষা ও উন্নতিবিধান সম্ভব।[৫৩] বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উভমুখী ভাষা প্রকল্পটি ছিল এই রকম — সংস্কৃত বিদ্যাকে ইংরাজীতে পৌঁছে দেওয়া এবং পাশ্চাত্য বিদ্যাকে নিয়ে আসা বাংলায়। অনেক সময় একই বিষয়কে দ্বিভাষিক সূত্রে প্রকাশ করা। কৃষ্ণমোহনের বক্তব্য ও ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি এইজন্য যে তাঁর মতো নিখাদ ইয়ংবেঙ্গল কিভাবে পালন করেছিলেন (উভমুখী নয়) ত্রিমুখী ভাষা প্রকল্পের কাজটি, তা অনুধাবন করতে পারলে ডিরোজিয়ানদের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি অনুধাবন করা সহজ হবে। কৃষ্ণমোহন প্রায় তিরিশটি পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।[৫৪] লিখেছেন মূলত তিনটি ভাষায় ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত। প্রাচ্যবিদ্যাকে তিনি যেমন ইংরাজীর মাধ্যমে বিদেশী প্রাচ্যানুরাগীদের গোচরে পৌঁছে দিয়েছিলেন— তেমনি পাশ্চাত্য বিষয় ও ভাবনাকে বাংলার মাধ্যমে এদেশীয়দের কাছে এনে দিয়েছিলেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্যবিদ্যা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান তেমনি রয়েছে এদেশীয় দর্শন, কাব্য ও বিদ্যা সম্পর্কে বিপুল পাণ্ডিত্যের পরিচয়। তাঁর রচিত 'ডায়লগ অন হিন্দু ফিলোজফি' পাঠ করে বিখ্যাত প্রাচ্যবিশারদ গোল্ডস্টুকার মন্তব্য করেছিলেন — "he combines in a high degree the erudition of Hindu Pandit with that of an English Professor".[৫৫] ভট্টিকাব্য, ভবভূতি, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদির সটীক ইংরাজী আলোচনা ও অনুবাদ কৃষ্ণমোহন করেছিলেন। তাঁর কিছু রচনা আছে যেগুলি ইংরাজী ও বাংলা এই দ্বিভাষিক সূত্র মেনে লেখা। যেমন 'জিওগ্রাফি' (১৮৪৮ খ্রীঃ), 'এলিমেন্টস অব জিওগ্রাফি' (২ খণ্ড), দ্য হিষ্ট্রি অব এনসিয়েন্ট ইজিপ্ট (১৮৪৭), ডায়লগ অন দা হিন্দু ফিলজফি (১৮৬১) প্রভৃতি। কৃষ্ণমোহনের বাংলা রচনার সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন সভা ও সোসাইটিতে পঠিত সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত নিবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে তাঁর সুপরিব্যাপ্ত অধ্যয়ন ও মৌলিক ভাবনা চিন্তার পরিচয়। আর্যদের সাক্ষ্য (১৮৭৫), বিশেষ করে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ১৩ খণ্ড (১৮৪৬-৫১) তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করে। তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার আর্থার হবহাউস সম্মান প্রদানকারী সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'His Bengal Encyclopaedia have greatly advanced our knowledge of Indian literature, politics and religion' (convocation Address, Vol-I pp. 342-3, Cal-Univ.)[৫৬]

বেঙ্গল এনসাইক্লোপেডিয়া বলতে ১৩ খণ্ডে বচিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হয়।

১। রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত (১৮৪৬)
২। ক্ষেত্রতত্ত্ব
৩। বিবিধ বিষয়ক পাঠ
৪। রোমরাজ্যের পুবাবৃত্ত
৫। জীবন বৃত্তান্ত
৬। ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত
৭। বিবিধ বিষয়ক পাঠ
৮। ভূগোল বৃত্তান্ত
৯। ক্ষেত্রতত্ত্ব
১০। নীতিবোধ বিষয়ক ইতিহাস
১১। চিত্তোৎকর্যবিধান
১২। বিত্তোৎকর্যবিধান
১৩। জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫১)

বোক্কাচিত্তর 'জেনোলজি অব দ্য গড' নামক রচনাটিকে 'এনসাইক্লোপেডিক' বলে প্রশংসা করা হয়েছে। কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাকল্পদ্রুম পরিকল্পনার দিক থেকে অনেক বেশী এনসাইক্লোপেডিক তাতে সন্দেহ কী? 'পারসিকিউটেড' (১৮৩১) নামে একটি ইংরাজী নাটক লিখে কৃষ্ণমোহন শুরু করেছিলেন তাঁব লেখকজীবন। ইয়ংবেঙ্গলদের তেজ ও তীক্ষ্ণতা এর মধ্যে বিবৃত হয়ে আছে। পরবর্তীকালের রচনাগুলিতে আছে স্থিতধী মনস্বিতার পরিচয়। কৃষ্ণদাস পাল একটি নিবন্ধে ইয়ংবেঙ্গলদের বিবর্তনের ইতিহাসকে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছে। কৃষ্ণমোহনের মানসিক অবস্থান দুই যুগেই ব্যাপ্ত।[৫৮] তাঁর রচনায় যেমন আছে প্রবাস তেমনি প্রত্যাবর্তন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী পটলডাঙা স্কুলে শিক্ষকতাকালে সঙ্কলন করেন বাংলা-ইংরাজী অভিধান। তাঁর অন্যতম কীর্তি মনুসংহিতার (পাঁচ খণ্ড) সটীক সম্পাদনা। উইলিয়াম জোন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদ, মূল সংস্কৃত ও তৎসহ বাংলা অনুবাদ — এই ত্রিমুখী প্রকল্প এশিয়াটিক সোসাইটিতে সূচিত প্রাচ্য বিশারদদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করে তাঁরা পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যবিদ্যার বাতায়ন খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যবিদ্যাকে বাংলায় নিয়ে আসা বা সংস্কৃতের জটাজালে আবদ্ধ প্রাচীন জ্ঞানের মন্দাকিনী ধারাকে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অবারিত করার জন্য বঙ্গানুবাদের কোন দায় তাঁরা পালন করেন নি। উজ্জীবক জ্ঞানের ভাণ্ডারকে বঙ্গভাষীর কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা না হলে বঙ্গীয় জাগরণের

কথা আসতে পারে না।"[৮০] এ কাজ রামমোহন শুরু করেন। ইয়ংবেঙ্গলরা উত্তরসূরির দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। রেনেসাঁসের মূল প্রবাহ থেকে তাঁরা ছুট হয়ে যান নি।

প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। ইয়ংবেঙ্গলরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে অগ্নিতৃষিত পতঙ্গের মতো প্রথমদিকে ধাবিত হলেও সাংস্কৃতিক প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের একটা অনিবার্য নাটকও সেখানে ছিল। বেসিল উইলি 'টেন্ডেন্সিজ ইন রেনেসাঁস লিটারারি থিয়োরি' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন ইতালিতেও প্রথম দিকে ধারণা ছিল যা কিছু উন্নত ও সূক্ষ্ম তা লিখতে হবে গ্রীক ভাষায় বা লাতিনে, পরের দিকে তারা 'decided the issue in favour of vernacular.'[৮১] সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় জনৈক উদয়চাঁদ আঢ্য মাতৃভাষার সপক্ষে প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন[৮২] পরবর্তীকালে স্বনামখ্যাত ইয়ংবেঙ্গল প্যারীচাঁদ মিত্র এগিয়ে এলেন সহজবোধ্য লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচনাকর্মে। 'মাসিক পত্রিকায়' টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে তিনি লিখলেন 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিল'।[৮৩] রেনেসাঁসের ভাষা প্রকল্পের দিক থেকে এ বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদের কীর্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাংলা সাহিত্যের এবং বাংলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক ...... দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করেন। যে ভাষা সকল বাঙালীর বোধগম্য ও সকল বাঙালী কর্তৃক ব্যবহৃত তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করেন এবং তিনিই প্রথমে ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।' 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে।'[৮৪] প্যারীচাঁদ অন্তত এগারোখানি গ্রন্থের রচয়িতা।[৮৫] অধিকাংশই নারীদের পক্ষে শিক্ষামূলক গল্প, উপন্যাস বা সমাজচিন্তামূলক রচনা। ইংরাজীতে তিনখানি জীবনী গ্রন্থ লিখেছিলেন গ্রান্ট, রামকমল সেন ও ডেভিড হেয়ারকে নিয়ে। ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮) নামে একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করেন। রেনেসাঁসের দিক থেকে দেখতে গেলে এই জীবনীগ্রন্থগুলির আলাদা তাৎপর্য আছে। কেন না কীর্তিমান ব্যক্তিমানুষের স্বয়ং-স্বতন্ত্র জীবনী রেনেসাঁসের আমলেই প্রথম লেখা শুরু হয়েছিল। প্যারীচাঁদ রচিত বা সম্পাদিত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ 'কৃষিসংগ্রহ' ৫ খণ্ড (১৮৫৪-৫৫) একটু আলাদা মনোযোগ দাবী করে। ভূমিকাতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন 'যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই আশায় কৃষিবিষয়ক বিবিধার্থ সংগ্রহ ক্রমাগত সংকলন পূর্বক প্রকাশ করিতেছেন, যে এই পুস্তকে কৃষি বৃত্তান্ত যে সকল বিষয় সংকলন হইতেছে ভবিষ্যতে এ দেশের লোকেরা তত্তাবৎ

কি পর্যন্ত আবশ্যক ও এদেশের পক্ষে হিতকর তাহা বুঝিয়া গ্রহণ করিবে।'[১৮] [একজন গবেষক লিখেছেন 'এই সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি বহু পাশ্চাত্যমণ্ডলীর গ্রন্থ থেকে বিবিধ অংশ সংগ্রহ করে নিজের অনূদিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সি. কে. রবিনসন কৃত অ্যারারুট নামে পলো প্রস্তুত করিবার প্রণালী, ক্যাপ্টেন রিচমণ্ডের আলুর চাষ, কর্নেল স্টোসি প্রণীত ফুলকপির চাষ, কর্নেল হেরী প্রণীত গিনি ঘাস, এইচ রিনিং-এর তামাকুর চায়ের বর্ণনা দিয়েছেন।'[১৯]] রেনেসাঁসের মৌল সত্যটিই যে মাতৃভাষায় রচিত এই ধরনের অনুবাদধর্মী রচনাদির মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এবং এ কাজ করেছিলেন সেই ইয়ংবেঙ্গলরাই, যাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাঁরা নিজের দেশকালের কথা ভাবেন নি, তাঁরা ছিলেন শিকড়চ্যুত একটি শ্রেণী মাত্র। ইয়ংবেঙ্গলদের রচনাদি ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনে তাঁদের সদর্থক ভূমিকা কিন্তু এর বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়।

পরিশেষে **মাইকেলের** প্রসঙ্গ টেনে আমরা শেষ করবো আমাদের নিবন্ধ। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের যে বৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছিলেন, ইয়ংবেঙ্গলরা ছিলেন তারই শাখা-প্রশাখা স্বরূপ. মাইকেলের মাতৃভাষা চর্চায় লক্ষ্য করা যায় তারই বিস্ময়কর পুষ্পিত পরিণাম। পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ এবং ক্রমশ তার থেকে রসদ ও প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে মাতৃভাষাকে নবজীবন দান করা — এই রেনেসাঁসীয় প্রকল্পে ইয়ংবেঙ্গলদের দ্বিপর্বিক বৃত্তান্তের একটি নিবিড় প্রদর্শনীও প্রমাণক্ষেত্র হচ্ছে মাইকেলের জীবন ও সাহিত্যচর্চা। মাইকেলের জীবন ও সাহিত্য চর্চারও দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য প্রবাস, দ্বিতীয় পর্বে স্বভাষায় প্রত্যাবর্তন। যাঁরা প্রথম পর্বটিকে মাইকেলের ভ্রান্তি ও দ্বিতীয় পর্বটিকে তার সংশোধন হিসাবে দেখেছেন, তাঁরা রেনেসাঁসের সত্যটাকেই বোঝেন নি। প্রখর নিদাঘ যে কাঙ্খিত বর্ষারই আবশ্যক পূর্ব শর্ত, প্রকৃতির এই অন্তঃক্রিয় সত্যটিকেই যেন অস্বীকার করা। বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ যদি মিথ্যা না হয় তাহলে মাইকেলের ইলিয়ড, ওডিসি, দান্তে, ভার্জিল, মিল্টন, পড়া মিথ্যে হতে পারে না। তাঁর রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যদি স্বীকার করে থাকি তবে তার লাতিন শেখা ও পেত্রার্কা পড়াকে অস্বীকার করবো কোন যুক্তিতে? কৃষ্ণকুমারী, বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমাসম্ভব, ব্ল্যাঙ্কভার্স। সনেট — এ সব তো আকাশ থেকে পড়ে নি। তার পেছনে ছিল নিবিড় প্রস্তুতি, সাত সমুদ্রের সিন্দবাদকল্প নাবিকের মত বিশাল সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার প্রেক্ষাপট। **কিভাবে মাইকেল প্রস্তুত করছিলেন নিজেকে তার নিবিড় চিত্র ধরা পড়েছে মাদ্রাজ থেকে লেখা এক চিঠিতে (১৮ই আগস্ট, ১৮৪৯)। তিনি লিখেছেন তাঁর ভাষাচর্চার রুটিন এইরকম ঃ ৬টা-৮টা হিব্রু, ১২টা-২টা গ্রীক, ২টা-৫টা তেলেগু এবং সংস্কৃত, ৫টা-৭টা লাতিন, ৭টা-১০টা ইংরাজী। চিঠির শেষে লিখেছেন 'আমার মাতৃভাষাকে (father's tounge) সমৃদ্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কি আমি নিজেকে প্রস্তুত**

করছি না?'[৬৭] ১৮৬৪ সালের ১১ জুলাই এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন 'ফরাসী ও ইতালি ভাষা আমি রপ্ত করে নিয়েছি, জার্মানিও শীঘ্র শিখে নেব। লাতিন, ফরাসী ও ইতালির পর স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষা শিখে নেওয়া এমন কিছু শক্ত হবে না।[৬৮] মাস তিনেক পর অপর একটা চিঠিতে লিখেছেন 'জার্মানি ভাষার নিরুদ্ধ দরজা আমি খুলে ফেলেছি। দারুণ লাগছে। আমি এখন গ্যেটে, শীলর, বেবর পড়ছি।'[৬৯] ১৮৬৫ সালের ২৬ শে জানুয়ারী অন্য এক চিঠিতে বলেছেন 'আমি এখন পেত্রার্কা পড়ছি এবং তাঁর সনেট বাংলায় লেখার চেষ্টা করছি।'[৭০] 'Albion's shore' এর সোনালি স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিত একথা ঠিক,'[৭১] ১৮ বছর বয়সেই তাঁর ইংরাজী কবিতা লন্ডনের সম্পাদকের ঠিকানায় ছুটে যেত একথাও ঠিক। তিনি হতে চেয়েছিলেন ইংরাজী ভাষার বড় মাপের কবি, ঐ অভিলাষ নিজেই ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর ইংরাজী কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি' ব্যর্থ হল তাঁর প্রত্যাশা ও সৌভাগ্য পূরণে। বিলেত নয় মাদ্রাজ থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয় কলকাতায়। এই প্রত্যাবর্তন এক অর্থে হয়ে উঠল মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন। দায়িত্ব পেয়েছিলেন একটি বাংলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করার। মূলের দারিদ্র্যে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজেই লিখে ফেললেন একটি বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন প্রভূত সমাদর। লিখলেন 'আমি যে এতটা সাফল্য লাভ করব এ আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। 'শর্মিষ্ঠা' আমাকে বাংলার সেরা লেখকদের সারিতে বসিয়ে দিয়েছে।'[৭২] 'ভাই সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাংলা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল প্রতিভাশালী লোকেদের হাতে ইহা মার্জিত হওয়া চাই মাত্র ...... ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, একথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়।'[৭৩] মাইকেলকে কেউ কেউ 'ইংল্যান্ড প্রেমের শহীদ,'[৭৪] বলে উল্লেখ করেছেন, কেউ বা তাঁকে অর্ধক্ষিপ্ত,'[৭৫] ইয়ংবেঙ্গলের যথার্থ উত্তরাধিকার মাইকেলে বর্তায় নি,'[৭৬] বলে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন — এ সবই খণ্ডিত বিচার-বিশ্লেষণের ফল। সামগ্রিকভাবে রেনেসাঁসের আলোকে ইয়ংবেঙ্গলদের ঐতিহাসিক ভূমিকা যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে ডিরোজিও থেকে যে প্রকল্প শুরু হয়েছিল মাইকেলে তা পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। বিচ্ছিন্ন করে দেখলে 'ডিরোজিও বাংলা জানতেন না'[৭৭] বলে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো বা মাইকেল আদৌ ডিরোজিয়ান নন[৭৮] বলে রায় দেওয়া হয়তো সহজ হয় কিন্তু ইতিহাসের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে ইয়ংবেঙ্গলদের আন্দোলন ও তাঁদের অবদানকে যদি স্থাপন করা হয় তাহলে দেখা যাবে ডিরোজিও থেকে মাইকেল একটি অখণ্ড প্রক্রিয়ারই নাম। ডিরোজিও কেন বাংলা লেখেন নি প্রশ্নটি শেকড়ে কেন ফুল ফোটেনির মত। স্বাদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গলদের সম্পর্কহীনতার শত অপবাদ সত্ত্বেও ঐতিহাসিকভাবে এইটাই সত্য বঙ্গসংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার নবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা পালন করেছিলেন একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

ডিরোজিও না এলে কোন পথ দিয়ে আসতেন মাইকেল ? পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল কর্ষণ ছাড়া মাইকেল কি বদলে দিতে পারতেন মাতৃভাষার বঙ ও রূপ ?

সূত্র নির্দেশ

১। A Poddar — **Renaissance in Bengal Quests and confrontation,** Calcutta 1970 p 89

২। পবিত্র কুমার ঘোষ — বাংলার রেনেসাস ° স্বপ্ন মায়া না মতিভ্রম শিকড়ের খোঁজে গ্রন্থমালা ২ কলিকাতা ৩০ জানুয়ারী ১৯৮১ পৃ° ৭।

৩। তদেব — পৃ° ৭।

৪। তদেব — পৃ ৭।

৫। A Tripathi — Vidyasagar **The Traditional Moderniser** Calcutta 1974 1974 p 87

৬। Sumit Sarkar — A Critique of colonial India 1985 p 36

৭। L W Spitz — **The Renaissance and Reformation Movement** Chicago 1971 p 139

৮। M A Von — **Sociology of the Renaissance** (Tran) England 1944

৯। W Ullman — **Mediaeval Foundations of the Renaissance Humanism** London 1977 p 107

১০। H O Taylor — **Thought and Expression in the Sixteenth Century** New York 1920 Vol-1 p 36 Quoted by L W Spitz p 156

১১। New Literary History — The University of Virginia Vol-22 Number 1 Winter 1991 P 6 What is Tradition ? G L Bruns

Quoted from Letters from Petrarch tr Morris Bishop Bloomingtom 1966 p 183

১২। P F Grendler — Schooling in Renaissance Italy Literacy and learnig 1300-1600 Baltimore and London The John Hopkins University Press 1989

১৩। O Prescott — **Princes of the Renaissance** London 1969 P 36

১৪। A Malho (ed) — **Social and Economic Foundation of the Italian Renaissance** U S A 1969 P 201

১৫। B Castiglione — **The Courtier.**

১৬। J Burckhardt, — **The civilization of the Renaissance in Italy (1860)** London edition 1945 P 147

১৭। J A Symonds — **Renaissance in Italy Vol 2 Revival of Learning** 1967

১৮। B Willey — Tendencies in Renaissance Literary Theory, (1921-22) Norwood edition 1977 P 25

১৯। Ibid — Chapter - II

২০। J Burckhardt — Ibid P 230

২১। A Tripathi — Ibid P 86

২২। উদ্ধৃত ও অনূদিত বিনয় ঘোষ বিদ্রোহী ডিরোজিও কলিকাতা ১৯৬১ পৃ ৫৩।

২৩। Alok Roy (ed) — Nineteenth Century Studies Nos 1-4 Calcutta 1973 PP 456-479 Young Bengal Vindicated A Discourse read at the Hare Anniversary Meeting held on June the 1st 1856 Kristo Doss Paul

২৪। L W Spitz — Ibid P 142

২৫। J E Sandys — History of Classical Scholorship Cambridge 1908 Vol-2 P 13 Quoted in Spitz P 147

২৬। Renaissance Quarterly — Vol XLIV Num-2 Summer 1991 Renaissance Society of America N Y The Scholar as Hero in Ianus Pannonius Penegyric on Guarinus Veronesis Ian Thompson PP 197-212

২৭। Renaissance Quarterly Vol XLIII — Num 4 Winter 1990 The Inward Zodiac A Development in Ficino s Though on Astrology M M Bullard PP 687-708

২৮। W Rospigliosi — Writers in Italian Renaissance London 1978 Pp 167-178

২৯। W Durant — The Story of Civilization Vol-V The Renaissance New York 1953

৩০। L Venturi — Botticelli Britain Birth of Venus

৩১। T Colletti — All The Paintings of Giorgione London 1961 Sleeping Venus

৩২। J H Beck — Raphael New York 1976. The school of Athens

৩৩। G Chattopadhyay — (ed) Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents) Vol one Calcutta 1965

৩৪। Ibid — Appendix — I P 1-9

৩৫। Renaissance Quarterly — Number 4 Winter 1986. Vol 29 Benedetto Varchi the Accademia degli Infiammati and the Origins of the Academic Movements — R S Samuel P 610

৩৬। Renaissance Quarterly, Ibid. PP 619-20

৩৭। উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলি, ১৯৭৩, পৃঃ ৯৫।

৩৮। বিনয় ঘোষ, তদেব পৃঃ ১০১।

৩৯। তদেব, পৃঃ ৯৯।

৪০। G. Chattopadhyay ed Ibid. P XXI

৪১। Ram Chandra Ghosh : **A Biographical Sketch of the (Rev) K M Banerjee,** Calcutta (1893) First Reprint Sept 1980 P 15

৪২। S C Mitra Compiled **'Selections from Jnanannesan'** Prajna August 1979 PP 57-59 Native Improvements

৪৩। Ibid

৪৪। Quoted N S Bose Indian Awakening and Bengal Cal 1976 edition P 371

৪৫। Ibid P 371

৪৬। Quoted G Chattopadhyay Ibid P XLII

৪৭। উদ্ধৃত নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত **উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক**, কলি ১৯৮৪ পৃ° ৪৩।

৪৮। তদেব পৃ ৪৩।

৪৯। উদ্ধৃত শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ **প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাংলা** কলি ১৩৯২ পৃ. ৪৭।

৫০। শিবনাথ শাস্ত্রী **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ** (১৯০৩) কলি বিশ্ববাণী সং ১৩৮৩ পৃ ১০২।

৫১। Alok Roy Ed Ibid Article of K D Paul P 459

৫২। Sumit Sarkar Ibid P 56

Its impact on Bengal Society as a whole as distinct from its intelligentia crust was very nearly nil

৫৩। J A Symonds Ibid Vol-2 1967 P 117

৫৪। The proceedings and Transaction of the Bethune Society from Nov 10th 1859 to April 20th 1869 The proper place of Oriental Literature in Indian Collegiate Education A Lecture read before The Bethune Society in February 1968

৫৫। কৃষ্ণকলি বিশ্বাস **উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**, কলি ১৯৮৬ পৃঃ ১০২।

৫৬। Ram Chandra Ghosha Ibid P 38

৫৭। Convocation Addresses Vol-I PP 342-43 Calcutta University Date of Address 11th March 1876

Encyclopaedia Bengalensis অর্থাৎ বিদ্যাকল্পদ্রুম দু খণ্ড লিখে কৃষ্ণমোহন শিক্ষা সংসদের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। ১৮৪৫ ৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা সংসদের রিপোর্টে এ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য রয়েছে (পৃ ৮)—

considerable progress had been made in Vernacular translation On the 12th July 1845 The Reverend Krishna Mohan Banerjee offered to prepare and publish a series of works in Bengalee adopted for the purpose of Vernacular instruction being of opinion that his plan was in every respect a sound one

৫৮। Alok Roy edited ibid Article of K D Paul PP 456-479

The blood that boiled within them when in the May flush of youth having become cool they have sobered themselves down in their literary habits They are now the zelous advocates of Bengali

৫৯। D Kopf British Orientalism and Bengal Renaissance University of California 1969
ডেভিড কফ বঙ্গীয় রেনেসাসের সূচনা করেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে সূচিত প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা থেকে, মনে রাখা দরকার প্রথমদিকে এখানে কোন দেশীয় সদস্য ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ দেশীয়দের কাছে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার কোন প্রভাব পড়বে এমন কোন বাতাবরণও সেখানে তৈরী হয়নি।

৬০। শিবনাথ শাস্ত্রী তদেব পৃঃ ১০৪।

৬১। B Willey Ibid P 23

৬২। G Chattopadhyay edited Ibid Appendix-I Article of Udday chand Addya

৬৩। শিবনাথ শাস্ত্রী তদেব পৃঃ ১০৪।

৬৪। উদ্ধৃত শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ তদেব পৃঃ ৬৬-৬৭।

৬৫। তদেব, পৃঃ ৯২।

৬৬। তদেব পৃঃ ৫৯।

৬৭। ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী কলি, ১৯৭৭ মধুসূদনের পত্রসংখ্যা-৪২ (ইং)

৬৮। তদেব পত্রসংখ্যা ৯৮ (ইং)

৬৯। তদেব পত্রসংখ্যা ১০৫ (ইং)

৭০। নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি ২য় সং ১৩৬১ পত্রসংখ্যা- ১১২ (ইং)

৭১। অজিত ঘোষ সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী ৪র্থ সং ১৯৭৩ ইংরাজী রচনাবলী
Collected Poems (No 8 Poetry) I sigh for Albion s strand As if she were my native land (Extemporary Song)

৭২। ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত তদেব পত্রসংখ্যা ৫১ (ইং)

৭৩। উদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি গৌরদাস বসাককে লেখা পত্র বাংলা অনুবাদ দীননাথ সান্যালকৃত।

৭৪। অরবিন্দ পোদ্দার রচিত বাংলার রেনেসাঁস ও মধুসূদন ঃ
একটি মূল্যায়ন (প্রবন্ধ) — ইংল্যান্ড প্রেমের শহীদ হয়ে মধুসূদন আমাদের রেনেসাঁসের উদভ্রান্তির প্রবলতম সাক্ষ্য স্থাপন করে গেছেন নিজ জীবনে।'

৭৫। পল্লব সেনগুপ্ত ঝড়ের পাখি ঃ কবি ডিরোজিও কলি তৃতীয় সং, ১৯৮৫। পৃঃ ৬৯।

৭৬। পবিত্র কুমার ঘোষ তদেব, পৃঃ ৭

৭৭। পল্লব সেনগুপ্ত, তদেব, পৃঃ ৭১।

১৯১৫ সালের ভারতব্যাপী অভ্যুত্থান — একটি অসমাপ্ত বিপ্লব

সুধন্য মণ্ডল

কোন পবাধীন জাতিব উপব শাসক শ্রেণীব অত্যাচাব, অনাচাব ও নিপীডনেব ফলে দীর্ঘদিনেব পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অসন্তোষজনিত উদ্ভূত পবিস্থিতিই একটি বাষ্ট্র বিপ্লবেব পবিবেশ সৃষ্টি কবে। বৃটিশ শাসিত ভাবতবর্ষে তেমনিই বড আকাবেব এক বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে। তা মূলতঃ সিপাহী ও দেশীয বাজন্যবর্গেব অসন্তোষে, তাদেবই উদযোগে সংগঠিত হয়েছিল। পববর্তীকালে ১৯১৫ খৃস্টাব্দেব মধ্যে ক্ষুদ্র আকাবে আবো অনেক বিদ্রোহ ও বিপ্লবাত্মক কার্যাবলী সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু ১৯১৫ খৃস্টাব্দেব ২১শে ফেব্রুয়াবী বিপ্লবী মহানাযক বাসবিহাবী বসু, যিনি নিজেকে ঋষি অববিন্দেব মন্ত্রশিষ্য এবং মতিলাল বাযকে বিপ্লবী গুরুরূপে মেনে নিয়ে বিপ্রবীব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হযে সমগ্র ভাবতব্যাপী যে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান পবিকল্পনা কবে ছিলেন, তা ছিল বৃটিশ বিবোধী এক বৃহৎ বিদ্রোহ।

ব্রিটিশ বিবোধী এহেন ব্যাপক অভ্যুত্থান পবিকল্পনাব পিছনে অবশ্য যুক্তি ছিল। কাবণ সে সময অর্থাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দেব সেপ্টেম্বব মাসে পৃথিবীব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হযে গিযেছিল। যুদ্ধকালীন সেই আন্তর্জাতিক পবিস্থিতিব সুযোগে বাসবিহাবী বসু তাঁব পবিকল্পনাব সদ্ব্যবহাব কবতে চেযেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকাব জার্মানীব সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার দরুন ভাবতীয সেনানিবাসে যে সকল ভাবতীয সেনা ছিল তাদেব দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবে তাদেরই সাহায্যে অভ্যুত্থান ঘটিযে ভাবতবর্ষকে স্বাধীন কবা সহজ হবে। ইওরোপের রণাঙ্গনে ভারতীয গোরা সৈন্য চলে যাওয়ায এটা ছিল অভ্যুত্থানেব একটা সুবর্ণ সুযোগ। উপরন্তু দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে এবং অনভিজ্ঞ বিদ্রোহীদেব পবিবর্তে উন্নত ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবহাবে অভিজ্ঞ দেশীয সৈন্যদেব দ্বাবা দেশেব স্বাধীনতা আনয়নের প্রচেষ্টায় যে সুফল পাওয়া সম্ভব তা বাসবিহারীব মতো দূরদর্শী বিপ্লবী নেতা অনুভব করেছিলেন[১]।

উপরন্তু রাসবিহারী বসু বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে বাংলার বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মতো অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে কবেছিলেন যে ব্রিটিশ শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে বিদেশী অস্ত্র সংগ্রহ ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাতে ধবা পড়ারও সম্ভাবনা ছিল বেশী, তাছাড়া বিদেশী অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার না জানলে তা

সংগ্রহ করবার সার্থকতা নেই। সে তুলনায় দেশীয় অস্ত্রে দেশীয় অভিজ্ঞ সৈন্যদের কাজে লাগানোই ছিল অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তাই এজন্য শুধুমাত্র যেকোন একটি স্থানে নয় সমগ্র ভারতব্যাপী এ অভ্যুত্থান না ছড়িয়ে দিলে তার সার্থক সফলতা আসবে না। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতের অভ্যন্তরে সৈন্যদের দ্বারা যদি ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটানো যায় তবে তা দমন করার শক্তি সাধারণতঃ ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের থাকবে না। কারণ ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোরা সৈন্যকে সরিয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।

আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের মনে বৈপ্লবিক ভাবধারা সঞ্চার

ঠিক এই সময়ে আমেরিকায় অবস্থিত প্রবাসী ভারতীয় গদর বিপ্লবীরাও ভারতে এসে ব্রিটিশ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানে ভারতীয় দুই বিপ্লবী সোহন সিং ভাখনা এবং তারকনাথ দাস প্রথম এই সব আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের মনে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। তারকনাথ দাস স্বয়ং তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'। পরে ১৯১১ খৃস্টাব্দে অপর এক পলাতক ভারতীয় বিপ্লবী লালা হরদয়াল আমেরিকার ফ্রান্সিসকোতে এসে প্রবাসী ভারতীয়দের বিশেষ করে প্রবাসী শিখদের মনে তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি 'গদর' নামক এক পত্রিকা ও 'যুগান্তর আশ্রমে'রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতঃপর ১৯১৩ খৃস্টাব্দে তিনি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'গদর পার্টি', যার সভাপতি নিযুক্ত হয়ে ছিলেন সোহন সিং ভাখনা এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন লালা হরদয়াল নিজেই। পি. এল মাথুরের 'ইণ্ডিয়ান রিভোল্যুশনারী মুভমেণ্ট ইন দি ইউনাইটেড স্টেট' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 'আমেরিকার গদর বিপ্লবীরা সেখানকার প্রবাসী হিন্দু মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেদের ধর্মনিরপেক্ষভাবে সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।' আমেরিকার এই গদর বিপ্লবী নেতা হরদয়ালও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এ পরিকল্পনায় সামিল হয়েছিলেন কর্তার সিং, হরনাম সিং, পরমানন্দ, সোহন সিং ভাখনা, পৃথ্বী সিং, রহমত আলি, নিধন সিং চুঘা, বিষ্ণুগণেশ পিংলে, পাণ্ডুরাজ খানখোজ প্রভৃতি গদর বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ।

আমেরিকার গদর বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগ

গদর বিপ্লবীরা উত্তর ভারতের মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগযোগের চেষ্টা করেন যে, রাসবিহারী বসু স্বয়ং ও উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা মিলে ১৯১২ খৃস্টাব্দে বড়লাট হার্ডিঞ্জ হত্যা ও অত্যাচারী গর্ডন হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। গদর বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বেই উত্তর ভারত থেকেই বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে লালা হরদয়াল আসন্ন যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে কয়েকজন গদর বিপ্লবীকে রাসবিহারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ভারতে প্রেরণ করেছিলেন[১]। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিষ্ণুগণেশ পিংলে, বিনায়ক রাও কাপলে, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রতাপ সিং, হরনাম সিং, সুচা সিং প্রভৃতি[৬]। এই সকল গদর বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে প্রায় চার হাজার শিখ বিপ্লবী ভারতে এসেছিলেন। বিদ্রোহ শুরু হলে আরো প্রায় কুড়ি হাজার গদর বিপ্লবীও ভারতে আসবেন, গদর বিপ্লবী নেতা বিষ্ণুগণেশ পিংলে রাসবিহারী বসুকে এ খবর জানান। এছাড়াও ডঃ ভগবান সিং গিয়ানী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবাসী পাঞ্জাবী শিখদেরও বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। তিনিও প্রায় দশ হাজার বিদ্রোহীকে ভাবতে প্রেরণের আশ্বাস দেন[৭]।

ভারতের বিভিন্ন সৈন্যব্যারাকে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার

প্রবাসী এই সকল গদর বিপ্লবীদের ও পাঞ্জাবী শিখদের ভারতে আগমনের আশ্বাসে ভারতের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু উৎসাহিত হলেন। তিনি সুন্দর বাংলা জানা গদর বিপ্লবী নেতা বিনায়ক রাও কাপলেকে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের যোগসাজশের জন্য বাংলাদেশে প্রেরণ করেন এবং বিষ্ণুগণেশ পিংলেকে পাঞ্জাবী শিখ গদব বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন[১]।

সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'বারাণসীতেই' রাসবিহারী বসু বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী নেতাদের এক জরুরী সম্মেলন আহ্বান করে রাসবিহারী বিভিন্ন সৈন্য ব্যারাকে ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবীদের প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বারাণসীর প্রধান কর্মকেন্দ্রের ভার অর্পিত হয়েছিল বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের উপর। ঢাকা দুর্গের সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহে সামিল করানোর জন্য চেষ্টা চালানোর ভার দেওয়া ছিল প্রতুল গাঙ্গুলির উপর। জলন্ধরের ক্যান্টনমেন্টে বিপ্লবী হৃদয়রাম, জকোরাবাদে বিপ্লবী হরিচরণ, কোহট্ট শিবিরে বিপ্লবী পিয়ারা সিং, বান্নুর সৈন্যব্যারাকে বিপ্লবী গুলাব সিং ও হরনাম সিং, দিল্লীর দুর্গে বিপ্লবী বাখসা সিং, মীরাটের সৈন্যব্যারাকে বিপ্লবী বিষ্ণুগণেশ পিংলে, সূচা সিং ও কর্তার সিং, লাহোর অমৃতসরে মূলা সিং, উত্তর পশ্চিম সৈন্যব্যারাকে বিপ্লবী পাণ্ডুরাজ খানখোজ, জব্বলপুর সেনা শিবিরে বিপ্লবী নলিনী মুখার্জী প্রত্যেকেই নিজ নিজ সেনা শিবিরের ভারতীয় সেনাদের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এরকম ২৬টি সেনাশিবিরের কোন না কোন বিপ্লবী রাসবিহারীর নির্দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের প্রয়াস চালাতে সচেষ্ট ছিলেন[৯]। উপরোক্ত বিপ্লবী ছাড়াও প্রতাপ সিং, বিভূতি হালদার, রামশরণ দাশ, ভাই পরমানন্দ, দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক কাপলে, সুশীল লাহিড়ী, কিষন সিং, অজিত সিং, প্রিয়নাথ, গিরিজাবাবু, প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীও বৈপ্লবিক কর্মধারা প্রচার করছিলেন হাতিমরদান, ঝিলাম, কর্পুর, এলা, ঝাঁসি, আগ্রা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি স্থানের সেনাশিবিরগুলিতে।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে ইওরোপে যখন রণদামামা বেজে ওঠে, জার্মানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইংল্যাণ্ড যখন ব্যতিব্যস্ত ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে বাঙলার বিপ্লবীরা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। উত্তরপাড়ার গঙ্গাতীরের একটি প্রাচীন শিব মন্দিরে বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবীরা— যেমন নরেন্দ্রনাথ সেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মতিলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মাখনলাল সেন প্রমুখেরা এক গোপন বৈঠকে উপস্থিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকে নেতৃত্বে বরণ করে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন[১০]। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গোলা বারুদ পিস্তল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কাজে মন দিয়েছিলেন। এমন কি তাঁরা চুরি করেও অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রড়া কোম্পানীর ৫০টি মশার পিস্তল ও ৪৬ হাজার রাউণ্ড কার্তুজও ছিল। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট বুধবার দুপুরে রড়া কোম্পানীর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবসার জন্য হাওড়া স্টেশনে এলে শ্রীশচন্দ্র সরকার নামে এক রড়া কোম্পানীর কর্মচারী এক গাড়ি মশার পিস্তল ও কার্তুজ চুরি করে[১১]। এ চুরির ব্যাপারে অবশ্য বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখার্জী, হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রী হরিদাস দত্ত, হাবু মিত্র, আশুতোষ রায়, খগেন দাস প্রমুখ বিপ্লবীরাও ছিলেন[১২]। জামনীর তৈরী এই মশার পিস্তলগুলি ছিল অতীব শক্তিশালী। এগুলি হাতে পেয়ে বাংলার বিপ্লবীরা আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। এই পিস্তলগুলি কাঠের ফ্রেমে ঢুকিয়ে কোমরে বেঁধে রাখা যায়, সেই কাঠের ফ্রেমটিই আবার পিস্তলের বাঁটে জুড়ে দিয়ে রাইফেলের মতো ব্যবহার করা যেত[১৩]। বিভিন্ন বিপ্লবী দল এই ৫০টি মশার পিস্তল বণ্টন করে নিয়েছিল। এই পিস্তলগুলি বাংলার ৫৪টি স্থানে ডাকাতির কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিস পরবর্তীকালে অনুসন্ধান চালিয়ে অবশ্য ৩১টি পিস্তল উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল[১৪]।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর আলোচনা

বাংলার বিপ্লবীদের এ সকল কার্যকলাপের প্রতি মহানেতা রাসবিহারী বসুর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তিনি ১৯১৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠান এবং দুজনে আসন্ন ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাংলায় এ বিদ্রোহ পরিচালনার ভার নিতে রাসবিহারী বসু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর 'বন্দীজীবন' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ডে) উল্লেখ করেছেন যে — "বাংলার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যতীনবাবুর নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত হয়েছিল সত্য কিন্তু তিনি পূর্ব বাংলার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে কিংবা চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে অথবা উত্তর ভারতের রাসবিহারীর বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গেও মিলিত হবার চেষ্টা করেন নাই"। তথাপিও লাহোর যাত্রার পূর্বে রাসবিহারী বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে আসন্ন সুপরিকল্পিত ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা জানিয়ে বিশেষ করে যতীন্দ্রনাথকে বাংলার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন[১৫]।

এসময়ে রাসবিহারী বসু ও বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর আলাপ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন — একথা দুই বিপ্লবী অকপটে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু রাসবিহারী বসু আসন্ন সৈন্য অভ্যুত্থানের জন্য ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী যে দিন স্থির করেছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘাযতীন উক্ত দিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার সম্বন্ধে এক মত পোষণ করেননি। কারণ যতীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিদেশ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে। জার্মান থেকে এ সময় অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়। জামর্নীতে এ সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা যথা ডঃ ভূপেন দত্ত, প্রফেসর বরকতুল্লা, ডঃ মনসুর, ডাঃ হাফিজ, ওবেদুল্লা সিদ্ধি, বীরেন চ্যাটার্জী, মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিও এ সময় বিদেশী অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী সেই সাহায্যের প্রত্যাশায় ছিলেন। এজন্য আবশ্যকতা হলে অভ্যুত্থানের দিনও তিনি পেছানোর পক্ষপাতী ছিলেন[১৬]। এজন্য তিনি রাসবিহারী বসুকে জার্মান জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কিন্তু রাসবিহারী বসু যতীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে, এসময় প্রতিটি দিন ছিল মূল্যবান। ইওরোপের যুদ্ধে ভারতবর্ষ সর্বক্ষণ রসদ যুগিয়ে যাচ্ছিল ব্রিটিশ সরকারকে। এই সুযোগে একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে পারলেই ইওরোপে ইংল্যাণ্ডেরও যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী অবশেষে রাসবিহারীর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন[১৭]।

ভারতব্যাপী অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা

এইভাবে বাংলার বিপ্লবীদের ও সর্বভারতীয় বিপ্লবী নেতাদের সম্মতিক্রমে রাসবিহারী বসু ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর থেকে কোয়েটা পর্যন্ত সৈন্য বিদ্রোহ ঘটাবার দিন স্থির করেছিলেন। প্রতিটি সৈন্যব্যারাকের সৈনারাও উক্ত দিনে সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহ আরম্ভ করবেন এমন সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই অভ্যুত্থানের প্রধান কর্মকেন্দ্রগুলি ছিল দিল্লী, লাহোর, মীরাট, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, এলাহাবাদ ও বেনারস প্রভৃতি। এই সময় ভারতবর্ষে মাত্র ৩০,০০০ সৈন্য ছিল, এর মধ্যে মাত্র ১,৫০০ ছিল ইওরোপীয় সৈন্য এবং অবশিষ্টরা ছিল ভারতীয় সৈন্য। সুতরাং এদের সাহায্যে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে সমূলে উচ্ছেদ করা ছিল অতি সহজ[১৮]। উপরন্তু আমেরিকার সদর বিপ্লবীরাও বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে জানিয়েছিলেন এবং সেরকম প্রস্তুতিও নিয়েছিল। তদুপরি গ্রামের কৃষকরাও সংঘবদ্ধ হয়ে মুলা সিং-এর নেতৃত্বে আসন্ন অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণে স্বীকৃতি জানিয়ে ছিল।

লাহোর ক্যান্টনমেন্টেই সর্বপ্রথম অভ্যুত্থান ঘটানো হবে স্থির হয়েছিল। তারপর মীয়ানমীর ও ফিরোজপুরের কৃষকরাও গ্রাম থেকে এসে লাহোর, অমৃতসরের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করবে। পরিকল্পিত মতো লাহোরের বিদ্রোহ সফলতার পথে অগ্রসর হলেই

অন্যান্য সেনানিবাসের সৈন্যরাও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে যুক্ত হবে ঠিক হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনের রাত্রিতেই সমস্ত ক্যান্টনমেন্টগুলিতে ভারতীয় সৈন্যরা একযোগে ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করবে। এই সকল ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের বন্দী করা হবে এবং যারা করবে না তাদের হত্যা করা হবে। সমস্ত টেলিগ্রাফ তার কেটে ফেলা হবে। ট্রেজারী লুঠ করা হবে। জেলখানাগুলি ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। লাহোরে নিজেদের সরকার গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন[১৯]।

পরিকল্পনা অনুযায়ী লাহোরে অভ্যুত্থান শুরু হলে ঢাকায়ও বিদ্রোহ শুরু হবে স্থির হয়েছিল। ঢাকার শিখ সেনারাও ময়মনসিং ও রাজসাহীর সুরুলের জঙ্গলে গোপন প্রস্তুতি স্বরূপ কুচকাওয়াজ অভ্যাস করত। বাংলা তথা কলকাতার বিপ্লবী দলগুলি ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করার চেষ্টা চালাবে। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী মাদ্রাজ রেলপথ, ভোলানাথ চ্যাটার্জী বি.এন.আর. রেলপথ, সতীশ চক্রবর্তী ই.আই. রেলওয়ের অজয় সেতু উড়িয়ে দেবে, যাদুগোপাল মুখার্জী ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সুন্দরবনের নদীতে আগত জার্মান জাহাজ থেকে আগ্নেয় অস্ত্র পাচার করে বিপ্লবীদের বিদ্রোহে সাহায্য করবে এমত পরিকল্পনা ছিল[২০]।

সমগ্র ভাবতব্যাপী এই অভ্যুত্থানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বোমা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এমনকি উত্তর ভারতে যথা লুধিয়ানার জারেয়াল ও লোহবাদীতে বোমার কারখানা তৈরী করে বাংলাদেশ থেকে বোমা বিশারদ এনে বোমা তৈরী করা হয়েছিল[২১]। অভ্যুত্থান পরিচালক রাসবিহারী বসু বিপ্লবীদের সম্মতিক্রমে একটি ঘোষণাপত্র ও স্বাধীন ভারতের জন্য একটি জাতীয় পতাকাও তৈরী করেছিলেন। পতাকাটি লাল, হলুদ ও নীল বর্ণের ছিল। লাল বর্ণটি ছিল হিন্দুর, হলুদ বর্ণটি ছিল শিখ জাতির এবং নীল বর্ণটি ছিল মুসলমানদের প্রতীক। এ অভ্যুত্থানের সফলতার প্রতি রাসবিহারী বসুর বিশ্বাস ছিল অটুট। তাইতো অভ্যুত্থানের পর স্বাধীন ভারতের পরিকাঠামোর প্রতি এবং নিজস্ব স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার প্রতিও তাঁর পরিকল্পনা ছিল।

সমগ্র পরিকল্পনা যখন স্থির, সমগ্র ভারতের ক্যান্টনমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন শুধু একটি মাত্র সংকেতের অপেক্ষায়, টোটা ভরা বন্দুক যখন বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে নির্দেশের অপেক্ষায়, সমস্ত বিপ্লবী বীর সৈন্যরা যখন দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উম্মুখ, ঠিক তখনই ঘটে গেল এক মহাবিপদ। বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সমস্ত সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বিপ্লবীদের সমগ্র পরিকল্পনা ও আশা নিরাশা করে দিয়েছিল ভারতের চরম কলঙ্ক ও চরম লজ্জা বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং[২২]। বাধ্য হয়েই গোপন বৈঠকে আলোচনার পর বিপ্লবীরা ২১শে ফেব্রুয়ারী পরিবর্তে ১৯ শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের দিন স্থির করেছিলেন। কিন্তু সে খবরও বিশ্বাসঘাতক পুলিশের অনুচর কৃপাল সিং বৃটিশ পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিল[২৩]।

ভারতের বিদ্রোহী বিপ্লবীদের উপর ইংরেজদের দমন নীতি

বিপ্লবী নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহেব পরিকল্পনাব সংবাদ পাওয়া মাত্রই ভারতীয় সৈন্যদের সমস্ত সেনানিবাসগুলি ব্রিটিশ সৈন্যরা হস্তগত করে নেয়। বিদ্রোহী বিপ্লবীদেরও পুলিশ গ্রেফতার করতে তৎপব হন। কুখ্যাত অত্যাচাবী মাইকেল ও'ডায়ারের নেতৃত্বে একই সঙ্গে পুলিশ লাহোরের প্রতিটি বাড়িতে খানাতল্লাসী শুরু করে এবং বিপ্লবীদের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে। ব্যাপক ধরপাকড়ের সময় অনেক স্থানে পুলিশের সঙ্গে বিদ্রোহী বিপ্লবীদের তুমুল যুদ্ধও হয়েছিল। ফিরোজপুরের এরূপ সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন বিপ্লবী মারা গিয়েছিলেন। জব্বলপুবে এক বাক্স বোমা আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটলে নলিনী মুখার্জী ধরা পড়েন। লাহোরের অন্যান্য প্রান্ত হতে প্রায় ১৩ জন বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার কবে। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২৩শে মার্চ মীরাটের দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইন থেকে বিষ্ণুগণেশ পিংলেকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছে অতীব শক্তিশালী ১০টি বোমা ছিল। এইভাবে বিভিন্ন স্থানের বহু বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তবু অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারী বসুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে নি। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১২ই মে তিনি পি.এন. টেগোর ছদ্মনামে জাপানী য়ুসেন কোম্পানীর নিপুণ জাহাজ 'সানুকিমারী'তে করে সশস্ত্র পাহারা বেষ্টিত ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাপানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক, পববর্তীকালে এইসব বিদ্রোহী বন্দী বিপ্লবীকে নিয়ে শুরু হয়েছিল 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'[২৪]। ব্রহ্মদেশ ষড়যন্ত্র মামলা ও সিঙ্গাপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবীদের বিচার হয়েছিল।

যাই হোক, পাঞ্জাবে সেদিন বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও অন্যান্য স্থানে ছিল টান টান উত্তেজনা। বাংলায় বিশেষ করে কলকাতার বিপ্লবীরাও একটা সংকেত যথা 'পাঞ্জাব মেল' সঠিক সময় কলকাতায় এসে না পৌঁছালে বিদ্রোহ শুরু করবে, কারণ তারা বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পাঞ্জাব মেল সঠিক সময়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলো। ফলে বাংলার বিপ্লবীরা হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যরা কোন নির্দেশের অপেক্ষা না করেই ঐ নির্দিষ্ট দিনেই বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। সেখানে বিদ্রোহী সেনারা ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন ভারতের নিজস্ব জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে তারা সরাসরি ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সারা শহরটি এক সপ্তাহ ধরে তাঁরা নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, তখন বিদ্রোহী সেনারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। সিঙ্গাপুর আবার পরাধীন হয়ে গিয়েছিল[২৫]।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে সামান্য একজন সেনানী মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চলে গিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। সেই পরাধীন দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিপ্লবী প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল অন্য আর এক বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং-এর চরম বিশ্বাসঘাতকতায়। নতুবা সেই দিনই হয়তো ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ করে লেখা হোত অন্য এক নতুন অধ্যায়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এটাই হোত ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর আর একটি খুব বড় আকারের সুপরিকল্পিত সমগ্র ভারতব্যাপী দ্বিতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহের প্রারম্ভেই যেহেতু বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু এটি ছিল একটি অসমাপ্ত বিপ্লব। তাই পরবর্তীকালীন ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবীরা আরো সজাগ ও সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণের ত্রুটিগুলিকে শুধরে নেওয়ার এবং যথার্থই শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিপ্লবীরা নির্ভীক ভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার কলাকৌশলগত অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিলেন। ১৯১৫ সালের বাঘাযতীন ও ১৯৩০ সালের মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে দুটি প্রত্যক্ষ যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়াও বিপ্লবীদের ভারতব্যাপী এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার অসফলতার পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীতেও নতুন সংগ্রাম নীতি পরিলক্ষিত হয়।

সূত্রনির্দেশ

১। অমলেন্দু দে, দ্রঃ 'অনুশীলন বার্তা' ১ম সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, ১৯৮২, পৃঃ ১০।

২। অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত পৃঃ ১০।

৩। **Sedition Committee Report;** London, 1918, পৃঃ ৬২।

৪। নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, '**বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু**', কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৪২।

৫। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ওঙ্কারনাথ গুপ্ত '**বিপ্লবী ভারতের কথা**', কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ৯৮।

৬। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, '**ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস**', কলিকাতা, ১ম সংকলন, ১৯৮২, পৃঃ ১০৯।

৭। মনোরঞ্জন ঘোষ, '**বিপ্লবী মহানায়ক**', কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৫।

৮। শান্তিকুমার মিত্র, **বিপ্লবী মহানেতা রাসবিহারী বসু**, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ১৫।

৯। সুবোধ মজুমদার, **বিপ্লবী মহানায়ক, রাসবিহারী**, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ৪৫

১০। সুধীরকুমার মিত্র '**বাঘাযতীন**', কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃঃ ৫৭।

১১। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ওঙ্কারনাথ গুপ্ত পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

১২। রাতুল রায়চৌধুরী, **ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলন**, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ২১।

১৩। সতীশ পাকড়াশী, **অগ্নিদিনের কথা**, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৯।

১৪। **Sedition Committee Report;** London, 1918, পৃঃ ৯২।

১৫। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, **পূর্বোক্ত**, পৃঃ ১০৯।

১৬। সতীশ পাকড়াশী, **পূর্বোক্ত**, পৃঃ ৪৮।

১৭। নলিনী কিশোর গুহ, **'বাংলায় বিপ্লববাদ'**, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৩২০।

১৮। বিজনবিহারী বসু, **কর্মবীর রাসবিহারী**, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ১৭।

১৯। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, **'বন্দীজীবন'** (১ম), কলিকাতা, পৃঃ ১১৫।

২০। সতীশ পাকড়াশী, **পূর্বোক্ত**, কলিকাতা, পৃঃ ৫০।

২১। সুপ্রকাশ রায়, **ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস**, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৪০০।

২২। Uma Mukherjee. **Two great Indian Revolutionaries**, Calcutta 1966 পৃঃ ১৩০।

২৩। শান্তিকুমার মিত্র, পৃঃ ২০।

২৪। **Report of Rowlatt Committee** - para 157, পৃঃ ১৬৬।

২৫। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), **জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম**, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ৯৭।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলন (১৯০৬) একটি পর্যালোচনা

শ্যামাপদ ভৌমিক

ভারতীয় রেল ইতিহাসে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের (বি.এন.আর) আবির্ভাব ইস্ট ইণ্ডিয়া ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের অনেক পরে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। বেঙ্গল নাগপুর বেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের সাথে ভারত সরকারের স্টেট ইন কাউন্সিলের সচিবেব চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয ১৮৮৭ সালের ৯ই মার্চ। এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু হয় ১৮৮৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে। মোটামুটিভাবে কাজ শেষ হয় ১৮৯৭-৯৮ সালে। ১৯০১ সালে নাগপুরের সাথে, ভায়া খড়গপুর, কলকাতা যুক্ত হয়। ১৯০৪ সালেব মধ্যে খড়গপুর একটি বড় রেলওয়ে জংশন স্টেশনে রূপান্তরিত হয। এই সময় থেকে ওয়ার্কশপেও কাজ শুরু হয়। আর খড়গপুরকে করা হয় বি.এন.আরের লোকো, ক্যারেজ ও ওয়াগন বিভাগের মূল কেন্দ্রস্থল[১]। খড়গপুরের ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য বিভাগে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। কৃষি প্রধান মেদিনীপুর জেলায় আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

খড়গপুরের রেলশ্রমিকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যায় ছিল স্থানীয় লোক। অধিকাংশ ছিল দুর্ভিক্ষ কবলিত ও প্লেগ সংক্রামিত অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও বিহারের। পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশেরও কিছু শ্রমিক ছিল[২]। খড়গপুরে স্থানীয় শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ার কয়েকটি কারণও ছিল। যেমন, এক, স্থানীয় লোকেরা কৃষিকাজ করাকে অধিক লাভজনক ও সম্মানের বিবেচনা করত। দুই, খড়গপুরে রেলজংশন ও ওয়ার্কশপ স্থাপনের ফলে বহু জঙ্গল-আদিবাসীর জীবিকা বিপন্ন হয়েছিল। তাই বি.এন.আরকে তারা শত্রু হিসাবে দেখতো। তিন, মেদিনীপুরের উত্তরাংশের ইউরোপীয় জমিদাররা চাইতো না স্থানীয় লোক রেল কোম্পানীতে কাজ করুক। কারণ, তাতে শ্রমিকের অভাব দেখা দিতে পারে। চাষবাস ও জঙ্গল কাটার জন্য সস্তায় স্থানীয় সাঁওতাল ও অন্যান্য নিচু সম্প্রদায়ের মজুর পাওয়া যাবে না[৩]। চার, সর্বোপরি, এই অঞ্চলে একদা খয়রা, পাইক, চোয়াড় প্রভৃতি বিদ্রোহ নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে[৪]। তাই ব্রিটিশ মালিকানাধীন বি.এন.আর. কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়কে রেল শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে, বহিরাগত শ্রমিকরা বাড়ি কম

যাবে। রেলের কোয়ার্টারেই থাকবে। তাদের অনুপস্থিতির হার কম হবে। বেশি সময় কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। স্থানীয় শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মজুরীতে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাতি ও প্রদেশের শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি গড়ে উঠতে অনেক বিলম্ব হবে। হয়ত আদৌ ঐক্য গড়ে উঠবে না। জাতিগত বিভাজন নীতি প্রয়োগ করলে আরও সুফল ফলতে পারে।

সুতরাং. প্রথমাবধি ব্রিটিশ মালিকানাধীন বি.এন.আরের অতিরিক্ত মুনাফালাভের আকাঙ্খা প্রবল ছিল। অথচ এই কোম্পানীর আর্থিক ঝুঁকির কোন প্রশ্ন ছিল না। তাদের বিনিয়গের শতকরা চারভাগ লভ্যাংশ সরকার কর্তৃক সুনিশ্চিত করা হয়েছিল'। তথাপি, অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙ্খা কোম্পানীর দিন দিন বাড়তে থাকে। ফলে শুরু থেকেই কোম্পানী অশিক্ষিত ও অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের উপর চরম শোষণ ও অত্যাচার চালাতে থাকে। এরই বিরুদ্ধে সমস্ত হিসেবনিকেশ উল্টে দিয়ে খড়গপুর ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকরা ১৯০৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট শুরু করে।

এই ধর্মঘট তথা শ্রমিক আন্দোলনের অনেক কারণ ছিল। যেমন, প্রথমাবধি বি. এন. আরের দরিদ্র রেলশ্রমিকদের চাকরির ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা ছিল না। শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল হয় আংশিক সময়ের কিংবা সম্পূর্ণ অস্থায়ী। যেমন—গ্যাংম্যান, মেট্, কেবিনম্যান, সিগ্‌নালার প্রভৃতির মধ্যে দু-একজন ছাড়া সবাই ছিল আংশিক সময়ের কিংবা অস্থায়ী[৩]। যে কোন মুহূর্তে চাকরি হারানোর ভয় তাদের ছিল। দুই, শ্রমিকদের জন্য নির্মিত বাসগৃহগুলি আদৌ বাসোপযোগী ছিল না। কোয়ার্টারগুলিতে ছিল না পানীয় জলের ব্যবস্থা অথবা শৌচাগার। বস্তি সংলগ্ন বহিরস্থ জলকলের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আয়তনেও কোয়ার্টারগুলি ছিল অত্যন্ত ছোট[৪]। তিন, 'সর্দার'দের দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও শোষণ শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বি.এন.আরের শ্রমিকরা মাস মাইনে পেতো না। তিন-চার মাস বাদে তারা তাদের প্রাপ্য মাইনের একটি অংশমাত্র পেত। বাকি টাকা তাদের 'সর্দার' জোর করে নিয়ে নিত। সুতরাং কাজ করে যে টাকা তারা হাতে পেত তাতে জীবনধারণ অসম্ভব ছিল। তাছাড়া তারা জানতে পারছিল যে একই কাজ করে অন্য রেল কোম্পানীর শ্রমিকরা অনেক বেশি মাইনে পায়। চার, শ্রমিকদের ছুটির আইনবিধি ছিল অত্যন্ত আঁটোসাঁটো ও কঠোর। 'প্রিভিলেজ লীভ' তাদের জন্য কালেভদ্রে অনুমোদন করা হতো। প্রায় প্রত্যেকটি ভারতীয় শ্রমিককে কাজের নির্ধারিত সময়সীমার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করতে হতো। ছুটির দিন ওয়ার্কশপে এসে মেশিন পরিষ্কার করতে হতো। ফলে অসুস্থ শ্রমিকের তালিকা দিন দিন বাড়ত[৫]। পাঁচ, শ্রমিকদের উপর অনেক সময় অকারণে, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হতো। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অধিকার ছিলনা[৬]। ছয়, ইউরোপীয় অফিসারদের জাতিগত বৈষম্য ও অবিচারমূলক আচরণের শিকার হত রেল শ্রমিকরা, তবে খড়গপুরের রেলশ্রমিক আন্দোলনের মূল ও আশু কারণ ছিল

খড়গপুরের বাজারে চালগমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। অবশ্য তখন সারা মেদিনীপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। জেলার অধিকাংশ কৃষক অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। জেলার বিভিন্ন জায়গায় এ কারণে খাদ্যসামগ্রী লুঠপাট হচ্ছিল। চালের দোকান, চালের নৌকা, চালের গাড়ী লুঠ হয়, ঘাটাল, পাঁশকুড়া ও খড়গপুরে, বিশেষতঃ মালঞ্চতে। খাদ্যাভাবে খড়গপুরেই হাজারখানেক শ্রমিকের কিংবা পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হয়। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে খড়গপুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে যায় যে, সাধারণ শ্রমিকের দুবেলা আহারের সংস্থান করা ছিল অসম্ভব[১০]। তার উপর, দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনরা কাজের আশায় শহরে এসে তাদের আর্থিক দুরবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে। উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপায়ান্তর না দেখে খড়গপুরের প্রায় দশ হাজার রেলশ্রমিক সম্মিলিতভাবে কলকাতায় অবস্থানকারী এজেন্টের কাছে বিভাগীয় প্রধানদের মাধ্যমে মাইনে বাড়ানোর দাবি জানায়[১১]।

শ্রমিকদের দাবিপত্রের উত্তর দিতে এজেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপ করে। অন্যদিকে, শ্রমিকরাও মাইনে বাড়ানোর দাবিতে খড়গপুরের চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বেইলীর কাছে ডেপুটেশন দিতে থাকে। প্রত্যুত্তরে বেইলী জানায়, এজেন্টের নির্দেশ না পেলে তার করণীয় কিছু নেই। এমতাবস্থায়, শ্রমিকরা উপায়ান্তর না দেখে ১৯০৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়[১২]।

১৯০৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সকালে 'ক্যারিজ বিল্ডিং বিভাগ'-এর ঠিকাদার ও তাদের লোকজনেরা 'কন্ট্রাক্ট রেট'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাজে আসা বন্ধ করে। খড়গপুর ওয়ার্কশপের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বেইলী ঠিকাদারদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, প্রাতরাশের পর তিনি তাদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবেন। ফলে ঠিকাদাররা কাজে ফিরে এলেও দৈনিক মজুরী পাওয়া কিছু পাঞ্জাবী ছুতোর কাজে যোগ দিল না। বেইলী ঠিকাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুনহারে একটি ঠিকা চুক্তি করে। সন্তুষ্ট ঠিকাদাররা জানালো তাদের সমস্ত মিস্ত্রি পরের দিন কাজে যোগদান করবে। কিন্তু শ্রমিকরা সন্ধ্যায় একটি বিশাল জমায়েত করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা পরের দিন কেউ কাজে যোগদান করবে না। কোন শ্রমিক করলে, সে যদি হিন্দু হয় তাহলে তাকে গরুর মাংস, আর মুসলমান হলে শুয়োরের মাংস উপহার দেওয়া হবে[১৩]।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে খড়গপুর ওয়ার্কশপের প্রায় চার হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মবিরতি করে। ক্রমশঃ রেলওয়ে পয়েন্টম্যান, লাইনম্যান, শান্টার, জমাদার প্রভৃতি আরো প্রায় ৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়[১৪]। তবে ওয়ার্কশপের ৫,০০০ শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৭৫০ জন শ্রমিক কাজে যোগ দিতে যায়। ধর্মঘটরত শ্রমিকরা তাদের কাজে যোগ না দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলতে থাকে। ওয়ার্কশপে যাওয়ার রাস্তাগুলিতে বিশেষতঃ রেলওয়ে ব্রিজের উপর কিছু ছুতোর লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে[১৫]। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বেইলীকে আক্রমণ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু ওয়ার্কশপ ম্যানেজার কের (Kerr)-এর প্রচেষ্টায় বেইলী রক্ষা পায়। কিন্তু কের নিজেই আক্রান্ত হন। কোনক্রমে

পালিয়ে মান বাঁচান[১৬]। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্ষুধার্ত শ্রমিকরা খড়গপুরের সবচেয়ে বড় বাজার 'গোলবাজারের' দোকানপাট লুঠপাট করার চেষ্টা করে। একজন 'ইউরেস্যান' পথচারীকে তাড়া করে। নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে 'তার' পাঠিয়ে ডেকে এনে আন্দোলনে সামিল করার চেষ্টা করে। রাস্তায় 'টুপিওয়ালা' দেখলেই তাড়া করতে আরম্ভ করে[১৭]।

বেইলী সমস্ত ঘটনা এজেন্ট ও মেদিনীপুরের জেলাশাসককে জানিয়ে অবিলম্বে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের আবেদন জানায়। এজেন্ট জানায়, খিদিরপুর ও শালিমারের শ্রমিক বিক্ষোভ নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাই তার পক্ষে খড়গপুরে আসা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, যে সমস্ত শ্রমিক সকাল আটটায় কাজে এসেছিল তাদের ধর্মঘট-কারীরা ভয় দেখায় ও বাড়ি ফিরে যেতে বলে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে অফিসের 'বাবু'রা কাজে আসা নিরাপদ নয় বলে ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্টকে জানায়[১৮]। এই অবস্থায় বেইলী কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মেদিনীপুরের জেলা শাসককে পুলিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে[১৯]।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও ৫০ জন বন্দুকধাবী পুলিশ নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রেন মেদিনীপুর থেকে খড়গপুরে আসে। ম্যাজিস্ট্রেট গোলবাজার ও স্টেশন এলাকা পরিদর্শন করে। এরই মধ্যে দুজন পাঞ্জাবী ছুতোর সর্দার পুলিশের ভয় উপেক্ষা করে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে একটি আবেদনপত্র জমা দেয়। তারা দাবি করে, বেইলী ও কের-কে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং কের-এর জায়গায় ওল্ডফিল্ডকে ফিরেয়ে আনতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট অবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করে মেদিনীপুর ফিরে যায় এবং একজন অফিসারসহ আরো ৫০ জন লাঠিধারী পুলিশ পাঠায়। রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ওঠে, কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে[২০]। স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও হাজার হাজার শ্রমিক শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ ধাওয়া করলে সামান্য গোলমালের সৃষ্টি হয়। কিছু শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তথাপি, সারা রাত অবস্থা শান্তই থাকে[২১]।

৫ই সেপ্টেম্বর সকালে বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকরা বেইলীর সাথে সাক্ষাৎ করে জানায় যে, বেলা ১২টার সময় অধিকাংশ শ্রমিক কাজে যোগদান করতে ইচ্ছুক, যদি ওয়ার্কশপ খোলা রাখা হয়। বেলা ১২টার সময় ওয়ার্কশপ খোলার ও কাজে যোগদানের জন্য সংকেত বাঁশি বাজানোও হয়। কিন্তু বিশাল সংখ্যক শ্রমিক রেলব্রিজ ও ওয়ার্কশপমুখী রাস্তাগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তথাপি প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক কাজে যোগদান করে। অন্যদিকে, মেদিনীপুরের জেলা সুপারিনটেনডেন্ট বর্ধমানের কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মঘটকারীদের সাথে কথা বলে[২২] এবং তারা জানতে পারে যে, শ্রমিকদের বিক্ষোভের মূল কারণ হল স্থানীয় বাজারে চাল ও গমের অগ্নিমূল্য। বি.এন.আর-এর এজেন্ট ম্যানসনেরও ধারণা, চালগমের অত্যধিক দামই শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণ[২৩]। যাই হোক, ৫ই সেপ্টেম্বর বর্ধমানের কমিশনার ধর্মঘটকারীদের এই বলে আশ্বস্ত করে যে, শ্রমিকদের দাবিগুলি পুনর্বিবেচনা করা হবে। কাজে যোগদানে ইচ্ছুক শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, যদি তারা শান্তিপূর্ণ

উপায়ে সমস্যা সমাধানেব জন্য সহযোগিতা করে। প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক মিছিল করে গিয়ে বেইলীকে তাদের আবেদপত্র জমা দেয়। বেইলী রেল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জানায় যে, যদিও রেল কর্তৃপক্ষ 'শস্যভাতা' দিতে পারবে না, তবুও স্থানীয় বাজারে চালগমের মূল্য যাতে হ্রাস পায় তার জন্য প্রাইভেট ব্যবস্থা নেবে। বাকি সব অভিযোগগুলি বিভিন্ন বিভাগ সংশ্লিষ্ট। তাই ওই অভিযোগগুলির প্রতিকার বিভিন্ন বিভাগ মারফৎ আন্তরিকতার সঙ্গে সুবিবেচনা করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি পাওযার পর শ্রমিকরা ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে কাজে যোগদানে সম্মত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর হুগলী থেকে আগত মিলিটারী পুলিশ স্বস্থানে ফিরে যায়[২৪]।

৭ই সেপ্টেম্বর শ্রমিকরা কাজে যোগদান করায় এজেন্ট ম্যানসন একটি বিজ্ঞপ্তি জাবী কবে জানায় যে, এক, কিছু শ্রমিকের নতুন বেতনহার ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে এবং আরও কিছু শ্রমিকের নতুন বেতনহার ঘোষণা করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। দুই, যে সমস্ত শ্রমিক ইতিমধ্যেই কিছু ছুটি অর্জন করেছে তাদের যাতে সহজে ছুটি দেওয়া যায় তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ 'রিলিভিং হ্যাণ্ডের' ব্যবস্থা করবে। তিন, একনাগাড়ে কোন শ্রমিককে অতিরিক্ত কাজ করানোর দৃষ্টান্ত কোন বিভাগে থাকলে এবং তা জেলা পদস্থ অফিসারের গোচরে আনলে তার প্রতিকার করা হবে। তবে, সমস্ত কর্মচারীর জন্য কাজের নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না। কারণ, কিছু ক্ষেত্রে 'কর্তব্যরত থাকা' মানে একনাগাড়ে কাজ করা নয়। চার, কোয়ার্টারগুলি শ্রমিকদের বসবাসের অনুপোযোগী নয়। রেল কোম্পানী তার শ্রমিককে এমন কোন কোয়ার্টার দিতে পারবে না যেখানে শ্রমিকের বাবা, মা, সমস্ত ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি বাস করতে পারবে। তবে যে সমস্ত কোয়ার্টারগুলির অসুবিধা বা ত্রুটি যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হবে, সেগুলি যথাসম্ভব মেরামত বা উন্নত করা হবে। পাঁচ, যদি কোন শ্রমিক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে কাজে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে 'মেডিক্যাল লিভ' না নিয়ে 'প্রিভিলেজ লিভ'-ও নিতে পারে অবশ্য যদি তার এই ছুটি পাওনা থাকে। ছয়, যে সমস্ত শ্রমিক ১০ বছরের কম সময় কাজ করছে তাদের বিভাগীয় প্রধান অনুমোদন করলে এজেন্ট তাদের বোনাস দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। সাত, যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী মাসে ৩০ টাকা থেকে ৯৯ টাকা মাইনে পায় তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের পাশ বছরে একবার অনুমোদন করা হবে। তবে 'ফ্রি পাশের' সুযোগ পরিবারের সমস্ত সদস্যকে এবং পরিবারের মুখাপেক্ষী ব্যক্তি বা ভৃত্যকে প্রদান করা হবে না। 'ফ্রি পাশে'র সুযোগ পাবে কর্মচারীর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পরিবারের দুজন নির্ভরশীল সদস্য। তাছাড়া, কলেজে পড়াশুনার জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কর্মচারীর একটি ছেলে একটি বিশেষ পথে যাতায়াতের জন্য ফ্রি পাশ পাবে। আট, ট্রাফিক বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের নতুন বেতনহার ও ইনক্রিমেন্ট বি এন আর. কোম্পানী ঘোষণা করে[২৫]।

ধর্মঘটের দিনগুলিতে শ্রমিকরা মূলতঃ শান্তিপূর্ণই ছিল। আবেদন নিবেদন করা ও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশার মধ্যেই তাদের আন্দোলন চলেছিল। কেবল কোন ইউরোপিয়ান

স্থানীয় বাজার থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য কিনলে তাদের ভয় দেখাত, তাড়া করত, কখনো গায়ে হাত তুলতো না। এছাড়া পোলিশবাজার লুঠের ঘটনা রেল কর্তৃপক্ষের রটনামাত্র ৮।

আন্দোলন পরিচালনায় শ্রমিকদের ধর্মীয় হাতিয়ার ব্যবহারের দিকটি বিশেষ লক্ষণীয়। খড়গপুরে থাকাকালীন বর্ধমানের কমিশনার তদন্ত করে জানতে পারেন শ্রমিকদের ভয় দেখানোর জন্য গরু ও শুয়োরের কাঁচা মাংস ও হাড় (... পরিমাণ) শ্রমিক বস্তী এলাকায় ও ওয়ার্কশপ যাওয়ার রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এগুলি ময়লা নিষ্কাশন করা ট্রেন গাড়ি দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় । আসলে ধর্মীয় ব্যাপারটি হুমকি বলেই মনে হয়। কারণ ধর্মঘট চলাকালীন (৫ই সেপ্টেম্বর) যে ১৫০ জন শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছিল তাদের গরু/শুয়োরের মাংস খাওয়ানো বা ... দেওয়ার কোথাও কোন নজির নেই।

বেশ কিছু উচ্চপদস্থ ভারতীয় রেলকর্মচারী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। মেদিনীপুরের জেলাশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মন্মথকৃষ্ণ দেবও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর যে সমস্ত শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য জেলা শাসকের এজলাসে রেল কর্তৃপক্ষ পাঠায়, তাদের চরম দুর্দশা ও হতাশার কথা শুনে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সঠিক তথ্য প্রমাণ না থাকায় জেলাশাসক তাদের বেকসুর খালাস করে দেয় । রেল কর্তৃপক্ষ জেলা শাসককে তার প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে শ্রমিকদের কাজে যোগদান করানোর জন্য খড়গপুরে আসতে অনুরোধ করে একটি বিশেষ ট্রেন পাঠায়। কিন্তু জেলাশাসক মন্মথকৃষ্ণ দেব এ কারণে খড়গপুরে আসতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। কারণ, শ্রমিক আন্দোলনে প্রশাসনিক প্রভাব প্রয়োগ করা তার কাছে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়নি। জেলাশাসকের এই সিদ্ধান্ত ছিল ঘটনোপযোগী ও বুদ্ধিজনপ্রসূত। নতুবা সমস্যা আরো জটিল হতো ।

এই রেল শ্রমিক আন্দোলনের যা কিছু ব্যর্থতা তার জন্য দায়ী ছিল অসংগঠিত নেতৃত্ব ও শ্রমিক সংগঠনের অভাব। সুযোগ্য নেতৃত্ব থাকলে এই আন্দোলন হয়ত আরও সফল হতো। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মন্তব্য অনুযায়ী, খড়গপুরের আন্দোলন পরিচালনার জন্য ঘোষ অথবা প্রেমতোষ বোস কিংবা অন্য কোন নেতার প্রয়োজন ছিল[৩]। অবশ্য এই আন্দোলনে মহিলা ও ছাত্রের কোন ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, শ্রমিক শ্রেণীর সহধর্মিণীরা আত্মত্যাগ না করলে এই আন্দোলন আদৌ সফল হত কিনা সন্দেহ।

মেদিনীপুর জেলায় এ সময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। মেদিনীপুর সংলগ্ন খড়গপুরের শ্রমিক আন্দোলনে স্বদেশীদের নেতৃত্ব প্রদান প্রত্যাশিত ছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলের সর্বদা আশঙ্কা ছিল, স্বদেশী আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটি মেদিনীপুর শহর খড়গপুরের শ্রমিক আন্দোলনে অবশ্যই সহায়তা করবে। তাই রেল কর্তৃপক্ষ বার বার ভারতীয়দের সতর্ক করেছেন : "If the Swadeshi agitators really desired to good of their fellow-countrymen, they should do all in their power to

encourage works like those at Kharagpur and Jamalpur which give employment to thousands of natives..... ."[১১] সম্ভবতঃ খড়গপুরের রেল শ্রমিকরা স্বদেশীদের রেল আন্দোলনে সংযুক্ত করতে চায়নি। কারণ, তারা দেখেছে স্বদেশীরা পারস্পরিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সমসাময়িক ইস্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শ্রমিক আন্দোলনের কী ক্ষতি করেছে। তাছাড়া খড়গপুরের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করেছে প্রধানতঃ অবাঙালী শ্রমিকরা, যাদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের অংশীদাব হওয়ার অনীহাও ছিল। অথচ শ্রমিক ও স্বদেশীদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটলে সামগ্রিক ঘটনা অন্য খাতে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

তাছাড়া, এই আন্দোলনে উচ্চতর বেতন কাঠামো, শস্যভাতা প্রভৃতি দাবি ছাড়া তেমন কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব ছিলনা। আন্দোলন সফল কবার জন্য শ্রমিক কর্তৃক ধর্মীয় হাতিয়ারের প্রয়োগ সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না।

তবু এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শ্রমিক সংহতি এনেছিল। তাদের শ্রেণীগত সচেতনতা ও মনোবল বৃদ্ধি কবেছিল। সর্বোপরি, ১৯০৬ সালের খড়গপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার যথা মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, কলাইকুণ্ডা, দাঁতন প্রভৃতি স্থানের শ্রমিক আন্দোলন ছিল সমগ্র বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলন ও পরবর্তী রেল শ্রমিক আন্দোলনের দিশারী।

সূত্র-নির্দেশ

১। O'Malley, L.S.S **Bengal District Gazetteers, Midnapore,** (Calcutta, 1911) P 130

২। Saha, Panchanan **History of the Working Class Movement in Bengal,** (New Delhi 1978), P 74

৩। Proceedings of the Hon'ble Government of Bengal for the month of May 1906 P 77

৪। **Midnapore District Census Report** (1951) P xxviii

৫। Bhandari R R, **The Blue Chip Railway,** (Calcutta, 1987) P 23-24

৬। Behula, **Nababarsha Sankalan** (Kharagpur 1396 B S) P 11

৭। Saha **Working Class Movement in Bengal,** P 74

৮। **The Bangalee**, 12 August, 1906

৯। **Ibid**

১০। **Amritabazar Patrika,** 7 September, 1906

১১। **Ibid,** 5 September, 1906

১২। **Ibid,** 7 September, 1906

১৩। Home Public. Progs A December 1906 n. 75

১৪। A.B.P, 7 September, 1906

১৫। Home Public Progs A December 1906. n 75

১৬। **A.B.P,** 7 September. 1906

১৭। **Ibid**

১৮। **Ibid**

১৯। Home Public. Progs A December 1906 n 75

২০। **A.B.P,** 7 September. 1906

২১। **Ibid**

২২। Telegram From the Chief Secretary to the Govt. of Bengal to the Secretary to the Govt of India. Home Department. dated the 5th September. 1906

২৩। Home Department. Public - A Progs n. 70-75

২৪। **Ibid**

২৫। **A.B.P,** 8 September. 1906

২৬। Home Public. Progs A. December 1906. n 75

২৭। **Ibid**

২৮। **A.B.P,** 7 September. 1906

২৯। **Ibid**

৩০। **Ibid,** 5 September. 1906

৩১। Simla Records-I. 1906. Government of India Home Department. Public-A. Progs. December 1906. n 70-75

বাংলার রেলশ্রমিক আন্দোলনের একটি রূপরেখা (১৯২০-৪৭)

নির্বাণ বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে রেলপথ স্থাপন ও বিস্তারের পরেই আধুনিক শিল্পায়নের সূচনা। গোড়ার দিকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সব সরকারী কোম্পানীগুলি রেললাইন স্থাপন ও রেলচালনার কাজ শুরু করলে এবং কালক্রমে বিভিন্ন রেলপথ বিভিন্ন কোম্পানী চালালেও তাদের উপর সামগ্রিক সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। কাজেই রেলকে একটি আধা-সরকারী লাভজনক বিভাগ হিসাবেই দেখা হত। বেঙ্গল নাগপুর, ইস্ট-ইণ্ডিয়ান (পরবর্তীকালের ইস্টার্ন) এবং ইস্টান বেঙ্গল (পরবর্তীকালের আসাম বেঙ্গল) এই তিনটি রেলপথেরই প্রধান কেন্দ্র কলকাতা হাওড়ায় হওয়ার সুবাদে রেল এবং সেই সঙ্গে রেলের শ্রমিক বাংলার আর্থনীতিক সামাজিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী হয়। শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, যেহেতু রেলপথ প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল, তার ফলে রেল শ্রমিকরা বহু ক্ষেত্রে অন্য ধরনের শ্রমিকদের সংগঠন ও আন্দোলনেও পথিকৃৎ নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। রেলকর্মীদের মধ্যে যেমন বিপুল সংখ্যায় ছিল অফিস ও বুকিং ক্লার্ক, টিকিট চেকার, স্টেশন স্টাফের মত কর্ণিক শ্রেণী, ড্রাইভার গার্ডের মত দক্ষ শ্রমিক কিংবা গ্যাংম্যান গেটম্যানের মত অদক্ষ শ্রমিক আবার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে -- খড়গপুর, লিলুয়া বা কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি স্থানে নিযুক্ত হাজার হাজার দক্ষ শ্রমিক ও অদক্ষ কুলি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলার রেলশ্রমিক নিয়ে বিশেষ করে কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা এখনও চোখে পড়ে না।

আধুনিক শ্রমিক ধর্মঘটের প্রথম খবর ভারতে পাওয়া যায় রেল থেকেই। ১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনের ১,২০০ কুলি আটঘণ্টা কাজের দাবীতে কয়েকদিন ধর্মঘট করে[১]। যদিও এরা কারখানা শ্রমিক ছিল না এবং এই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট সম্ভবত সফলও হয়নি ও বিস্তৃত কোনো তথ্যও আর পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও খবরটি নিঃসন্দেহে কৌতূহল উদ্রেককারী।

এরপর স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইস্টইণ্ডিয়া রেলের কর্মচারীরা, যাঁরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার থেকে এসেছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে বেতন, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যাপারে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্মীদের সঙ্গে যে বৈষম্যে ভুগছিলেন, তার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন (জুলাই, ১৯০৬)। স্বীকার্য যে, এটা শ্রমিক ধর্মঘট ছিল না। ছিল স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্কদের মতো কর্মচারীদের ধর্মঘট। স্টেশনে স্টেশনে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ও রেল ব্যবস্থা গুরুতর ব্যাহত হয়। কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত এক প্রস্তাবে রেলকর্মীদের দাবীগুলি সমর্থিত হয়। এই সময়েই সম্ভবতঃ ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন — The East Indian Railway Employees' (Railway mens') Union গঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই ধর্মঘট তখনকার মত ব্যর্থ হয় এবং নেতৃস্থানীয় বহুকর্মীর কর্মচ্যুতি ঘটে। রেলকর্মীদের প্রথম ধর্মঘট বলে এর গুরুত্ব অপরিসীম[১]। পরের বছর, ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে আবো ব্যাপকহারে রেলকর্মীদের ধর্মঘট দেখা দেয়। এবারের ধর্মঘটীরা ছিল প্রধানতঃ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এমনকি ইউরোপীয় গার্ড ও ড্রাইভার। আসানসোল থেকে উত্তর ভারতের এলাহাবাদ-টুণ্ডলা পর্যন্ত এই ধর্মঘট বিস্তৃত হয়। বি.এন.আরেও এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কনসিনিয়েশন বোর্ডে নিষ্পত্তির জন্য পাঠালে ধর্মঘটের অবসান ঘটে (ডিসেম্বর, ১৯০৭)। এর পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের দেশীয় ড্রাইভার, ব্রেকম্যান ইত্যাদিরা ধর্মঘট শুরু করে (২১ শে ডিসেম্বর)। সরকারের চূড়ান্ত নিপীড়নের সামনে ১৯০৮ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এই ধর্মঘট ভেঙে যায়[২]।

এরপরে রেলশ্রমিক আন্দোলনে নতুন করে জোয়ার আসে, অন্যান্য বহু শিল্পক্ষেত্রের মতই, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে। বেশ কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়[৩] যেমন **বি. এন. আর. ওয়ার্কমেনস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া** (জুলাই, ১৯২০, খড়গপুর. ইংরেজ, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় সবাই এর সদস্য ছিলেন); **বি. এন.আর ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন, খড়গপুর** (নভেম্বর, ১৯২০; পূর্বোক্ত ইউনিয়নের সহ সভাপতি অযোধ্যাপ্রসাদ ও সহ-সম্পাদক গোডবোলের উদ্যোগে কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসাবে বাংলার প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতারা ছিলেন); বি.এন.আর. ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়নের, গার্ডেনরীচ শাখা চালু হয় ১৯২১ সালে কর্মীদের নিজেদের উদ্যোগে, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়িজ এ্যাস্যোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ সালে। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বেতে অনুষ্ঠিত রেলশ্রমিকদের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর ভারতের সবকটি রেলওয়ের শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় **অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন**। এর নেতৃত্ব গোড়া থেকেই ছিল প্রধানত রিফর্মিস্টদের হাতে এবং নবগঠিত অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত তারা হয়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে (জুলাই, ১৯২০ থেকে মার্চ, ১৯২১-এর মধ্যে) বাংলায় ৫টি রেল ধর্মঘটের তথ্য পাওয়া যায়[৪]। তার মধ্যে দুটি হল বি.এন.আরের খড়গপুরের লোকো ও ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের দশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট (অক্টোবর ৮, ১৯২০) ও ই.আই.আরের লিলুয়া ওয়ার্কশপের ৭,০০০ ভারতীয় কর্মীর ধর্মঘট (ফেব্রুয়ারী ৩ —এপ্রিল, ১, ১৯২১)। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল আসামের চারগোলা

ও লুংগাই উপত্যকার চা বাগান থেকে পালিয়ে আসা "কুলীদের" উপর অকথ্য সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় ৮,০০০ শ্রমিক কর্মচারীর চারমাসব্যাপী ধর্মঘট (মে-সেপ্টেম্বর, ১৯২১)। নিজেদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার জন্য নয়, সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা অনন্য হয়ে আছে[*]। এই সময়ে জে.এম. সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন গঠিত হয়। ধর্মঘট শেষ হবার পর এর অস্তিত্ব অবশ্য বেশীদিন টেকে নি। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আসানসোলকে কেন্দ্র করে ই.আই.আর কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করে। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী[৭], অসহযোগ আন্দোলনের নেতা স্বামী দর্শনানন্দ এই সঙ্গে কুলটির লৌহ কারখানা ও কয়লাখনির শ্রমিকদেরও ধর্মঘট শুরু করে সমগ্র অঞ্চলে অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট বলে সরকারী মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন দমনের জন্য মিলিটারী পাঠানো হয়। তীব্র দমনপীড়নের ফলে শেষ পর্যন্ত এপ্রিলের মাঝামাঝি ধর্মঘট ভেঙে যায়।

১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রখ্যাত 'মডারেট' শ্রমিক নেতা ভি.ভি. গিরির নেতৃত্বে বি.এন.আর ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার যে, বি. এন. আরের মূল ওয়ার্কশপ ও শেড খড়গপুরে অবস্থিত হলেও এর অধিকাংশ কর্মী ছিল বিহারী ও দক্ষিণ ভারতীয় এবং বাংলার মূল সামাজিক রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে এদের বিশেষ যোগ ছিল না। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে চাকুরীর নিরাপত্তা, বেতনবৃদ্ধি, উপযুক্ত কোয়ার্টার ও উর্ধ্বতন কর্তাদের দুর্ব্যবহার বন্ধ প্রভৃতি দাবীতে ইউনিয়ন একটি সনদ পেশ করে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে এবং ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্যদের বদলি করার প্রতিবাদে খড়গপুরের প্রায় ২০,০০০ ওয়ার্কশপ কর্মী ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ ধর্মঘট শুরু করে। রেল কোম্পানীর সাহায্যে সরকার পুলিশ বাহিনী পাঠায়। বিনা প্ররোচনায় পুলিশী গুলিচালনার প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের সমর্থনে শুধু খড়গপুর নয়, বাংলা তথা সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। বি.এন.আরের প্রায় ৪০,০০০ কর্মী ধর্মঘটে নেমে পড়ে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্যরা প্রশ্ন তোলেন। সংবাদপত্রে পুলিশের কঠোর সমালোচনা করা হয়। ধর্মঘটীদের সমর্থনে কলকাতায় বিরাট জনসভায় জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী শ্রমিক নেতারা দলগোষ্ঠী নির্বিশেষে অংশ নেন ও একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। ধর্মঘটীদের দৃঢ়মনোভাব ও তাদের পক্ষে জনসমর্থন দেখে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করে ও কর্মীদের দাবীগুলির সন্তোষজনক মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর ভিত্তিতে ইউনিয়নের মডারেট কর্মকর্তারা ৯ই মার্চ, ১৯২৭ ধর্মঘট তুলে নেয়।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতির ভাঁওতা ধরা পড়ে। রিট্রেঞ্চমেন্টের নামে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, বিশেষতঃ বিগত ধর্মঘটে যারা উদ্যোগী ছিল, তারাই আক্রমণের শিকার হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর প্রায় ১,৭০০ শ্রমিককে একসঙ্গে ডিসচার্জ নোটিশ ধরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। কোম্পানী লক আউট ঘোষণা করে। ইউনিয়নের রিফর্মিস্ট নেতৃত্ব এবং শ্রমিক

সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এই ধর্মঘটের সময়ে স্পষ্টতরভাবে ধরা পড়ে - নেতৃত্ব কোম্পানীর কাছে আবেদন নিবেদন করে, আইনসভায় প্রশ্ন তুলে, সরকারের কাছে আপোস মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল কিন্তু শ্রমিকরা কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্মঘটই চালিয়ে যায়নি, সমস্ত বি.এন.আর শ্রমিককে এমনকি সারা ভারতের রেল শ্রমিককে যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। প্রথম ধর্মঘটের মত এবারেও জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী মহল শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এ.আই.সি.সি. ও এ.আই.টি.ইউ.সির অধিবেশনে শ্রমিকদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। সরকার ও কোম্পানী শেষ পর্যন্ত অংশত নতি স্বীকারে বাধ্য হয় ও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, লক-আউট সময়ের বেতন দেওয়া হবে, আর কোন ব্যাপক ছাঁটাই হবে না। ইতিমধ্যে যারা ডিসচার্জড হয়েছে তাদের মধ্যে যাদের অবসর গ্রহণের সময় হয়নি, তাদের বিষযগুলি এনকোয়ারী কমিটিতে পাঠানো হবে। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। রেল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে খড়গপুরের ধর্মঘট অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ।

বি.এন.আর ধর্মঘট অন্যত্রও রেল শ্রমিকদের উৎসাহিত করে। কিরণচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক রেলকর্মী যুক্তপ্রদেশ থেকে বদলি হয়ে লিলুয়ায় আসার পর গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জী সহ বামপন্থী সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ করেন ও লিলুয়া ই.আই.আর ওয়ার্কশপের মধ্যে সংগঠন গড়ে ওঠে। দু'জন সহকর্মীকে বরখাস্তের প্রতিবাদে ১৪,০০০ শ্রমিক ৫ই মার্চ, ১৯১৮ ধর্মঘট শুরু করে। বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্বহাল ছাড়াও বেতন বৃদ্ধি, বাসস্থান ও ইউনিয়নের স্বীকৃতি তারা দাবী করে। ২৮শে মার্চ শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটীদের উপর পুলিশের গুলিচালনা সর্বত্র ধিকৃত হয়। সরকারী রিপোর্টে ধর্মঘটের জন্য কম্যুনিস্টদের উস্কানিকে দায়ী করা হয়। ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের সমর্থনে আশপাশের চটকল, সূতাকল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় প্রতীক ধর্মঘট হয়। চারমাস ধর্মঘট চলার পরও কর্তৃপক্ষের মনোভাব অনমনীয় থাকায় ইউনিয়ন নেতাদের নরমপন্থী অংশ (কিরণ মিত্র, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ) আপোসে ধর্মঘট তুলে নেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, কম্যুনিস্ট অংশ পুরো ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া রেলপথে ধর্মঘট ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়। অণ্ডাল ও আসানসোলে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। ১৩৪ দিন চলার পর ধর্মঘট নিঃশর্তে প্রত্যাহৃত হয় (জুলাই ৯, ১৯১৮)। শান্তিরাম মণ্ডলের নেতৃত্বে জঙ্গী শ্রমিকদের একাংশ তার পরেও ধর্মঘট চালানোর পক্ষপাতী ছিল[৯]।

বারবার ভাঙনের ফলে ১৯২৯-৩১ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। এ.আই.আর.-এফএর ছত্রতলে অবশ্য রিফর্মিস্ট, সোশ্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট সব মতের ট্রেড ইউনিয়নই ঐকবদ্ধ ছিল। তবুও ভারতের সর্বত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে ভাটার টান এসেছিল, রেল শ্রমিকও তার থেকে মুক্ত ছিল না। ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে শ্রমিক আন্দোলনে আবার জোয়ার আসে। বাংলাদেশে বি.এন.আর শ্রমিকের ধর্মঘট দিয়েই নতুন জোয়ারের সূত্রপাত[১০]। খড়গপুরের

২৬,০০০ শ্রমিক ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ পর্যন্ত ধর্মঘট করে। ব্যয় সংকোচের নামে প্রায় ১,০০০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট। রেল কোম্পানী ধর্মঘট ভাঙার জন্য একদিকে দমনপীড়ন, অন্যদিকে দালালদেব ব্যবহাব করতে থাকে। ধর্মঘটীদের সমর্থনে ই.বি. রেলওয়ে ইউনিয়ন ও ই. আই. রেলওয়ে ইউনিয়নসহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি এগিয়ে আসে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও ধর্মঘটীদেব সমর্থন জানায়। কিন্তু এবারেও সরকার ও কোম্পানীর মনোভাব ছিল অনমনীয়। কোন আপোস নিষ্পত্তি এমনকি বিষয়টি কনসিলিয়েশন বা আরবিট্রেশনে পাঠাতেও তারা রাজী ছিল না। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটীদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং ধর্মঘটের অনুপস্থিতিকে বিনা বেতনে ছুটি বলে গণ্য করা হবে, এই প্রতিশ্রুতিতে রাজী হয়েই ইউনিয়ন ধর্মঘট তুলে নিতে বাধ্য হয়। কাজেই, এবাবেও বি.এন.আর শ্রমিকের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ব্যর্থ হল।

রেল শ্রমিকের সংগঠন বাংলায় শুধু বি.এন.আরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্য রেলপথগুলিতেও তা সমান তালে এগিয়ে চলে। ১৯১৮ সালের ধর্মঘটের সময়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস লেবার ইউনিয়ন, লিলুয়া শাখা স্থাপিত হয়। এই শক্তিশালী ইউনিয়নে কিরণ মিত্র ('জটাধারী বাবা' নামে সুপরিচিত), শিবনাথ ব্যানার্জীর পাশাপাশি কম্যুনিস্ট গোপেন চক্রবর্তী, ফিলিপ স্প্রাট প্রমুখ সক্রিয় ছিলেন। গোড়ার দিকে এর নেতৃত্ব শিবনাথ ব্যানার্জীর সংস্কারবাদী (সোশ্যালিষ্ট) গ্রুপের হাতেই ছিল। তবে শিবনাথের গ্রেফতার (১৯২৯) ও জটাধারী বাবা সরে যাবার পর ইউনিয়ন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে রণেন সেনের নেতৃত্বে কয়েকজন সদস্য ইউনিয়নের ভিতর ঢুকে তাকে সক্রিয় করে তোলেন[১১]। ১৯২৮ সালেই জটাধারী বাবার সভাপতিত্বে এই ইউনিয়নের আসানসোল শাখা স্থাপিত হয়। ঐ বছরেই সংস্কারবাদী কে.সি. রায়চোধুরী-লতাফৎ হোসেন গোষ্ঠী কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন গঠন করেন।[১২]

ই.বি. রেলে শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাস আরো পুরনো। **ই.বি. রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন** ১৯২০ দশকের গোড়ায় গঠিত হয় এবং ১৯২৪ সালে এ.আই.আর এফের স্বীকৃতি লাভ করে। এটি ছিল মূলতঃ কর্মচারীদের নিজেদের নেতৃত্বে সাংবিধানিকভাবে পরিচালিত সংগঠন, কোন বহিরাগত র‍্যাডিকালের দ্বারা চালিত নয়। বিভিন্ন ব্রাঞ্চের আলাদা শাখা ছিল। দীর্ঘদিন জে.এন.গুপ্তা এর সম্পাদক ছিলেন। আর একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক ছিলেন জ্যোৎকুমার (জে.কে) চ্যাটার্জী। সিগনালার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে ইনি এ.এস.এম. হিসাবে অবসর নেন। ১৯২৯ সালে গঠিত রয়াল কমিশন অন লেবারের রেলকর্মী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ব্যাপারে শ্রমিকদের তরফের প্রতিনিধি হিসাবে ইনি কমিশনের অন্যতম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। চ্যাটার্জীর মত সুযোগ্য কর্মচারী নেতাদের উপস্থিতির জন্যই রেলকর্মীদের সংগঠনের সুদৃঢ় গোড়াপত্তন সম্ভব হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে এঁরা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন[১৩]। কালক্রমে এই ইউনিয়ন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

গঠিত হয় আসাম বেঙ্গল বেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। এব মূলকেন্দ্র ছিল মৈমনসিংহ এবং অনুশীলন গোষ্ঠী ও সি এস পিব কর্মীবা ছিলেন এব প্রধান সংগঠক। ১৯৩৪ সালে অ্যাসোসিয়েশনেব তৎকালীন সম্পাদক মাখনলাল বসুব গ্রেফতাবেব পব এব অস্তিত্ব বিপন্ন হযে পডে। এব পব ১৯৩৮ সালে বাজনৈতিক বন্দীবা মুক্তি পাবাব পব মৈমনসিংহে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনেব দ্বাবা এই ইউনিযন পুনরুজ্জীবিত হয। সভাপতি হন বাংলা কংগ্রেসেব সর্বোচ্চ নেতা শবৎচন্দ্র বসু সভাপতি ছিলেন আসাম ও বাংলাব বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাবা ও সম্পাদক ছিলেন যামিনী পাল নামে এক বেলকর্মী । ১৯৪৩ ৪৪ সাল থেকে হুমাযুন কবীব এই বি এ বেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনেব সভাপতি হন। কাঁচবাপাডা ওযার্কশপ সহ হাওডা ও শিযালদহ বিভাগ পূর্ববঙ্গ ও আসাম সব ব্রাঞ্চেই এই ইউনিযনেব প্রভাবশালী শাখা ছিল।

এই জাতীযতাবাদী ইউনিযনেব প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ১৯৩০ সালে কম্যুনিস্টদেব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ই বি বেলওযে ওযার্কার্স ইউনিযন । অফিস ছিল বেলেঘাটাব কলভার্ট বোডে। প্রধান সংগঠক ছিলেন সোমনাথ লাহিডী ও সবোজ মুখার্জী। বোজ বাত্রে শ্রমিক লাইনে ও বস্তীতে গিযে ইউনিযন কবাব জন্য বৈঠক কবতেন। শিযালদহ থেকে বাণাঘাট পর্যন্ত শ্রমিকদেব মধ্যে তাঁদেব কাজেব প্রোগ্রাম ছিল। নুন্টিযা, বামসেবক, বঘুনাথ প্রভৃতি কযেকজন শ্রমিক ও গ্যাংমান ইউনিযন গডাব কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। কযেকজন বেল কর্মচাবী যেমন প্রফুল্ল ব্যানার্জী ও ননী বসু বিশেষ উৎসাহ নিযে এগিযে আসেন এবং পবে কম্যুনিস্ট পার্টিব সদস্য হন। ১৯৩৪ সালেব জুলাই মাসে সবকাবী নির্দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাদেব সমর্থক সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ কবা হয। তখন ই বি আব ওযার্কার্স ইউনিযনও বেআইনি ঘোষিত হয। ১৯৩৮ পর্যন্ত লাহিডী ও সবোজ মুখার্জী প্রমুখ কাবান্তবালে থাকেন। তখন নীহাবেন্দু দত্ত মজুমদাবেব নেতৃত্বে নবগঠিত বেঙ্গল লেবাব পার্টি ইউনিযনকে নিজেদেব দখলে আনতে উদ্যোগী হন[১৯]। দত্ত মজুমদাবকে সভাপতি ও শিশিব বাযকে সম্পাদক কবে ইউনিযন পুনর্গঠিত হয। ১৯৩৮ সাল নাগাদ সবোজ মুখার্জী, ভবানী সেন, নিবঞ্জন সেন প্রমুখ জেল থেকে মুক্তি পাবাব পব কম্যুনিস্ট পার্টি এঁদেব নিয়ে বেলওযে সেল গঠন কবে। শিযালদহেব ননী বসু ও কাঁচবাপাডাব অমূল্য উকীলেব মত বেলকর্মী পার্টি সদস্যদেব সাহায্যে ইউনিযনের মধ্যে কম্যুনিস্টবা আবাব শক্তিশালী হযে ওঠেন এবং দত্ত মজুমদাবেব লেবাব পার্টি গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ইউনিযন ত্যাগ কবতে বাধ্য হয়[১]। খডগপুবে ও লিলুযায় ১৯৩৮ সাল থেকে কম্যুনিস্টবা সক্রিয হযে ওঠেন।

১৯৩৯ সালে এ আই আর এফেব উদ্যোগে ২১শে আগস্ট রেল কর্মচারীদের সাবা ভাবত দাবী দিবস পালিত হয় ছুটি, বেতনবৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ, কাজের ঘণ্টা বেআইনীভাবে বাডানো, তুচ্ছ কারণে চার্জশীট, কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার প্রভৃতিকে কেন্দ্র কবে। সারা ভাবতের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া ও ইস্ট বেঙ্গল রেল কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হয় মূলতঃ কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে। কংগ্রেস নেতারা বিশেষত

সুভাষচন্দ্র বসু শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে বিবৃতি দেন। সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্যে শুরু হয়ে গেল মহাযুদ্ধ (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সাল থেকে ই.বি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নাম পরিবর্তিত হয় বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এর সভাপতি ছিলেন জে.এন.গুপ্ত (ইনি আগে ই.বি. ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন ও ১৯৩৭ সালে রাজ্য বিধানসভায় রেলশ্রমিক কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়মতান্ত্রিক ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন) ও সম্পাদক ছিলেন এঁর ভাই বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কলকাতার কাছে দমদমে এই ইউনিয়নের প্রধান অফিস ছিল। এই ইউনিয়নে কম্যুনিস্টদের প্রাধান্য ছিল। ১৯৪০-৪১ সালে কম্যুনিস্ট কর্মীদের উপর সর্বত্র সরকারী দমনপীড়ন শুরু হলে রেল শ্রমিক আন্দোলনেও সাময়িক স্তব্ধতা আসে। তদুপরি জে.এন.গুপ্তর মৃত্যু ও তাঁর অনেক সহকর্মী কারারুদ্ধ হবার ফলে ইউনিয়নের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। আবার ১৯৪২ সাল থেকে ইউনিয়নের কাজ নতুন করে শুরু হয় এবং ১৯৪৩ সালে তা পুনরায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এই সময় থেকে এই ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে বঙ্কিম মুখার্জী এম.এল.এ. সভাপতি ও জ্যোতি বসু সাধারণ সম্পাদক হন। রেলশ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে[১১]।

১৯৩৭ সালে জে.এন.গুপ্তার নেতৃত্বে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হয়। প্রধান সংগঠক ছিলেন তাঁর ছোটভাই প্রাক্তন ছাত্র নেতা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন বীরেন দাশগুপ্ত। পরে শচীন দাশগুপ্ত, পরিমল মিত্র, পটল ঘোষের মত কম্যুনিস্ট কর্মীরা ইউনিয়নের সর্বস্তরের সংগঠক হিসাবে যোগ দেন। জলপাইগুড়ি জেলার দোমোহনীতে এই রেলের সদর দপ্তরকে কেন্দ্র করে দ্রুত সংগঠন বিস্তার লাভ করে। বি.ডি. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বি. এ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন যুক্ত হয়ে ১৯৪৪ সালে নতুন নাম হয় বেঙ্গল আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বা BARRU)। এই ইউনিয়নটি নামে অরাজনৈতিক হলেও এর সদস্যরা বেশীরভাগই ছিলেন কম্যুনিস্ট সমর্থক ও পুরো সময়ের সংগঠকরা সবাই কম্যুনিস্ট দলের সদস্য। এঁদের লাগাতার চেষ্টার ফলে যুদ্ধ শেষ হবার আগে উত্তর বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম সর্বত্র এই ইউনিয়ন প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করে। রেলকর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃতি পায় এবং সংস্কারবাদীদের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় এ. আই. আর এফের অন্তর্ভুক্ত হয়[১০]। এই সময়ে রেল শ্রমিক আন্দোলনে একটা জোয়ার আসে। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের ঢাকা, সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট মূল্যে চাল সরবরাহ প্রভৃতির দাবীতে জোরদার আন্দোলন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ সালে ঢাকায় ই.বি. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শাখা গঠিত হয় তরুণ রেলকর্মী ও সাহিত্যিক সোমেন চন্দ্রের উদ্যোগে। ১৯৪১ সালে তিনি এই ইউনিয়ন শাখার সম্পাদক হন। সি.পি.আইর উদ্যোগে বিভিন্ন

শিল্পভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হচ্ছিল, তার অঙ্গ হিসাবে রেল শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১৯৪৪ সালের ১৩-১৪ মে[২১]।

১৯৪৬ সালের আইনসভা নির্বাচনে বাংলার রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনেব সভাপতি ও কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট হুমায়ুন কবীর এবং রেলরোড ওযার্কার্স ইউনিযনেব সম্পাদক ও কম্যুনিস্ট প্রার্থী জ্যোতি বসুর মধ্যে। আসাম বাদ দিয়ে সমগ্র বি.এ. রেলপথই রেলওয়ে নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কেন্দ্রে ভোট হত পরোক্ষভাবে, ভোটাধিকারী কর্মীদের প্রতিনিধিরা ইলেক্টোবাল কলেজ গঠন করতেন ও তাদের ভোটে এম.এল.এ. নির্বাচিত হতেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয়পক্ষই পরস্পবের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, কৌশল, ও কাবচুপিব অভিযোগ আনেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পব কম্যুনিস্ট প্রার্থী স্বল্প ভোটের ব্যবধানে জযী হন। যে নির্বাচনে বাংলার সমস্ত শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেসের হাতে কম্যুনিস্ট প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয ঘটেছে, সেখানে রেলকেন্দ্র কম্যুনিস্ট প্রার্থীর জয়লাভ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিক থেকেই কম্যুনিস্ট কর্মীবা চা বাগান শ্রমিকেব মধ্যে বেলের গ্যাংম্যান, পয়েণ্টসম্যান প্রভৃতির মারফৎ সংগঠন করার কাজ শুরু করেন। বি ডি রেলের গ্যাংম্যানরা ছিলেন প্রধানতঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং এই সব শ্রেণী থেকেই চা বাগান শ্রমিকরাও এসেছিলেন। বি ডি. বেলের অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকরা অধিকাংশ ছিলেন বিহারী। ১৯৪৬ সালের গোড়ায় আসামের লামডিং-এ বি.এ. রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নেব বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার সময় বি.ডি. রেলের পয়েণ্টসম্যান মান সিং হৈহয়পাথার চা বাগানের দুই শ্রমিক জগন্নাথ ওঁড়াও ও অর্জুন ভগৎকে সঙ্গে নিয়ে যান। সম্মেলন থেকে ফিরে এসে উদ্দীপ্ত এই দুই শ্রমিক চা-শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার শুরু করেন। এই হৈহয়পাথার চা বাগান থেকেই ডুয়ার্স অঞ্চলের চা শ্রমিকের প্রথম সংগঠন শুরু হয় এবং ১৯৪৬-এর জুলাইয়ে ত্রিশটি চা বাগানেব প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় জলপাইগুড়ি জিলা চা শ্রমিক ইউনিয়ন। চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ ভূমিকা নেন রেলের তিনজন পয়েণ্টসম্যান যদুনাথ সিং, মান সিং এবং লালবাহাদুর ছেত্রী। মালবাজার স্টেশনের কাছে ছেত্রীর কোয়ার্টার ঘরেই প্রথম ইউনিয়ন অফিস গড়ে ওঠে। চা বাগানের ভেতর দিয়েই ডুয়ার্সের রেলপথ গেছে এবং সেখানে গ্যাংম্যানদের কোয়ার্টার। চা শ্রমিক ও গ্যাংম্যানদের মধ্যে সামাজিক আত্মীয়তা ছিল যার সুবিধা নিয়ে চা মালিকদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে ইউনিয়ন গড়া গেছে। ডুয়ার্সের আদিবাসী কৃষকদের মধ্যেও জোরালো সংগঠন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেয় রেল শ্রমিকরা, যার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তেভাগা আন্দোলনের সময়ে (১৯৪৬-৪৭)। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে রেল শ্রমিকরা ডুয়ার্সে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে[২২]।

১৯৪৫-৪৬ সালেই সারা ভারতে রেল শ্রমিক আন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এ.আই.আর. এফ ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে সরকারের কাছে ১৬ দফা এক

দাবী সনদ পেশ করে যার মধ্যে বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি ছিল প্রধান। সরকারের উদাসীন মনোভাবের প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ইউনিয়ন স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করার কথা বলা হয়। ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে সরকার এ.আই.আর.এফের সঙ্গে আপোস সমঝোতা করে কিছু দাবী মেনে নেয়। ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট অংশ আপোস বিরোধী ও ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিল। তা সত্ত্বেও দাবী কর্তৃপক্ষ অংশত মেনে নেওয়ার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়[২৬]। এর একটি পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে নৌবিদ্রোহের সমর্থনে রেল শ্রমিকের একদিনের সর্বাত্মক প্রতীক ধর্মঘটের থেকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রেল শ্রমিক আন্দোলন একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রেলপথ, তার বিপুল শ্রমিক সংখ্যা, তুলনায় দক্ষ ও শিক্ষিত শ্রমিকের অধিক আনুপাতিক হার, রেল কর্মচারী ('বাবু') ও শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; এই কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই অন্য শিল্পের তুলনায় অনেক বেশী করে ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবস্থিতি (যেমন কিরণ মিত্র, জে.এন. গুপ্তা, জে.কে চ্যাটার্জী, ননী বসু, অমূল্য উকীল, সোমেন চন্দ প্রভৃতি); একমাত্র বি.আন.আর ছাড়া অন্যত্র ধর্মঘট না করেও শ্রমিকদের অনেক দাবীদাওয়া মেটাতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করার জন্য ইউনিয়নের কৃতিত্ব— সব কিছু মিলিয়ে রেল শ্রমিক আন্দোলন তার স্বকীয় বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

সূত্র নির্দেশ

১। সুকোমল সেন — **ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ইণ্ডিয়া ঃ হিস্ট্রি অফ এমার্জেন্স এণ্ড মুভমেন্ট ১৮৩০-১৯৭০** (কলিকাতা, ১৯৭৭) পৃঃ ৭৮

২। সুকোমল সেন — ঐ, পৃঃ ৯৫-৯৬, পঞ্চানন সাহা, **হিস্ট্রি অফ ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল** (নয়াদিল্লী, ১৯৭৮) পৃঃ ২১-২৫

৩। সুকোমল সেন — ঐ, পৃঃ ১০২ ০৩

৪। স্পেশাল ব্রাঞ্চ, কলিকাতা পুলিশ অফিসে রক্ষিত তালিকার ভিত্তিতে প্রস্তুত পঞ্চানন সাহা — ঐ, পরিশিষ্ট ৮, পৃঃ ২১৮-২৯ থেকে সংগৃহীত।

৫। পঞ্চানন সাহা — ঐ, পৃঃ ৩০-৩১

৬। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রাণহরি চ্যাটার্জী — **ওয়ার্কিং ক্লাস এণ্ড দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া ঃ দ্য ক্রিটিকাল ইয়ার্স** (নয়াদিল্লী, ১৯৮৪) এবং নির্বাণ বসু — **দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস এণ্ড দ্য লেবার পলিটিক্স ঃ বেঙ্গল, ১৯৩৭-৪৭** (কলিকাতা, ১৯৯২) পৃঃ ২০।

৭। হোম (পল), গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফাইল নং - ২৫/১৯২৩, সুকোমল সেন — প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৫-১৬ থেকে সংগৃহীত।

৮। বিস্তৃততর বর্ণনার জন্য সুকোমল সেন — ঐ, পৃঃ ২৪৫-৫২; পঞ্চানন সাহা — ঐ, পৃঃ ৭৪-৯১।

৯। সুকোমল সেন, ঐ, পৃঃ ২৫২-৫৫; পঞ্চানন সাহা, ঐ, পৃঃ ৯৩-১০২।

১০। পঞ্চানন সাহা, ঐ,পৃঃ ১৪৪-৪৮।

১১। রণেন সেন, **বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ**, ১৯৩০-৪৮ (কলিকাতা, ১৯৮১) পৃঃ ৫২; সরোজ মুখার্জী, **ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা** ১ম খণ্ড (কলি, ১৯৮৫) পৃঃ ৫৯।

১২। পঞ্চানন সাহা, ঐ, পৃঃ ২২৫, ২২৮।

১৩। ই বি রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন রেকর্ডস শ্রী জিষ্ণু চ্যাটার্জীর সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

১৪। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, বেঙ্গল পুলিশ, ফাইল নং ৪১৯এ/৩৮;

১৫। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, বেঙ্গল পুলিশ, ফাইল নং ৪১৯এ/৩৮; সরোজ মুখার্জী, **ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা** ১ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৮৫) পৃঃ ৫১, ৫৬।

১৬। সরোজ মুখার্জী, ঐ, পৃঃ ১৬০-৬১।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

১৯। আই. বি. ফাইল নং ৪১৯এ/৩৮; ২৮.১২.৪৩ তারিখে ও ১৪.১০ ৪৪ তারিখে প্রদত্ত নোট; ধবীন সেন, **পাঁচ অধ্যায়** (কলিকাতা, ১৯৯৩) পৃঃ ৩২, ১৬০

২০। মনোরঞ্জন রায়, **সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন** (কলিকাতা, ১৯৮৭) পৃঃ ১৩৭; জ্যোতি বসু **জনগণের সঙ্গে** (কলিকাতা, ১৯৮৬) পৃঃ ২২-২৩।

২১। সরোজ মুখার্জী, **ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা** ২য় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৮৬) পৃঃ ১৪, ৮০, ৩৩০।

২২। মনোরঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯-৪০; রণজিৎ দাশগুপ্ত, পেজেন্টস, ওয়ার্কার্স এণ্ড ফ্রীডম স্ট্রাগল, জলপাইগুড়ি, ১৯৪৫-৪৭ (**ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি**, বর্ষ - ২০, সংখ্যা - ৩০, জুলাই, ১৯৮৫)।

২৩। মনোরঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯; সরোজ মুখার্জী, প্রাগুক্ত, ৩৯৫।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে কয়লা শিল্প ও রেল যোগাযোগের বিকাশ (১৮৫০-১৯১৪) — একটি পর্যালোচনা

শশধর মিস্ত্রী

আমি আমার প্রবন্ধে কয়লা শিল্প ও রেলওয়ে ব্যবস্থা কীভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, মেলবন্ধন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধিতা দ্বারা বিকশিত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এটি করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, এই দুই শিল্প তৎকালীন ভারতে শিল্প বিকাশের এক অভূতপূর্ব পরিমণ্ডল এবং সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

কয়লা শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, ১৭৭৪ খ্রীঃ ৩ জন ব্রিটিশ কর্মচারী রানীগঞ্জ এলাকায় মাটির নীচে কয়লার সন্ধান পান এবং এই কয়লা উত্তোলনের জন্য সরকারের কাছে অনুমোদন চাইলেন[১]। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার নানান টালবাহানা করে। এর পর ১৮০৯ খ্রীঃ কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বানীগঞ্জ এলাকায় কয়লা অনুসন্ধান করতে বলেন[২]। এক্ষেত্রে অবশ্য মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কাজ করেছিল। এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১৮২০ খ্রীঃ[৩] নাগাদ কয়লা শিল্পের বিকাশ শুরু হয়।

কয়লা উত্তোলন শুরু হলেও উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা এবং বাজারের অভাব এই শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, সেই সময় ভারতবর্ষের মূলকেন্দ্র কলকাতা বন্দরে রানীগঞ্জ অঞ্চল থেকে কয়লা একমাত্র নৌকাযোগে দামোদর ও অজয় নদের উপর দিয়ে গঙ্গা হয়ে পরিবহন করা হত[৩]। কিন্তু দামোদর ও অজয় বৎসরের সব সময় পরিবহন যোগ্য থাকত না। দেশী নৌকায় করে কয়লা পরিবহনের ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হত এবং কয়লার গুনগত মান লোপ পেত। তাই উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থার দরকার হোল।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে সবুজ মাঠের বুক চিরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলে কয়লা শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির দরজা খুলে যায়। অবশ্য মনে রাখতে হবে, বৃটিশ সরকার ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কয়লা শিল্পের উন্নয়নের জন্য রেল যোগযোগ স্থাপন করেনি। তারা ভারতের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান জনরোষ এবং গণআন্দোলন দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক স্বার্থে রেল যোগযোগ স্থাপন করেন। পূর্ব ভারতে সর্বপ্রথম হাওড়া থেকে কয়লা

শিল্পাঞ্চল রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হল। এই রেলপথ তৈরীর দায়িত্ব কতকগুলি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এর জন্য রেল কোম্পানীগুলিতে বিনামূল্যে জমি এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ দেওয়া হয়।

কয়লা শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে এই রেলপথ স্থাপন এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। বেলওয়েব জ্বালানী হিসাবে রেল কোম্পানীগুলি প্রচুর কয়লা কিনতে শুরু করে। সমকালীন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদিত কয়লাব এক তৃতীয়াংশ রেলকোম্পানীগুলি ক্রয় করত[৩]। আবার রেলপথে সুপরিবহনের দ্বারা অল্প সময়ে কম খরচে কয়লা কলকাতা বন্দরের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা হোল। এর ফলে কয়লা শিল্প এক বিস্তৃত বাজার লাভ করল এবং ভারতবর্ষের বুকে বিশাল শিল্পায়নের সুযোগ এনে দিল। এইভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে কয়লা শিল্প এবং বেল ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত হয়ে অগ্রসর হতে লাগল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ইংলণ্ডে প্রথমে রেলপথ পরে কয়লা শিল্প, ভারতে প্রথমে কয়লা এবং পরে রেলপথ স্থাপিত হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই বিকাশমান কয়লা শিল্পে দেশী এবং বিদেশী বহু কোম্পানী অংশ নেয়। যদিও বিদেশী কোম্পনীগুলির প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত।

কয়লা ও রেল একে অপরের পরিপূরক। এই দুই শিল্পের মধ্যে শুরু হোল প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যা ক্রমশ বিরোধিতায় রূপান্তরিত হল[৪]। রেল কোম্পানীগুলি বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী এবং বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানী তাদের রেলের জন্য কয়লা উত্তোলনের অনুমতি নিয়ে বিনা পয়সায় পাওয়া জমিতে কয়লা শিল্প গড়ে তুলল। অপরদিকে কয়লা কোম্পানীগুলিকে জমি লিজ নিতে হত। এই ইস্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানী তাদের উদ্বৃত্ত কয়লা বাজারে বিক্রয় করে ব্যবসা শুরু করল। এতে সাধারণ কোল কোম্পানীগুলি প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হোল। তাই এই কোল কোম্পানীগুলি সরকারের কাছে প্রতিবাদ করল। ১৮৮১ খ্রীঃ আগস্ট নাগাদ এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

কোল কোম্পানীগুলির কাছে রেলপথ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই যখন রেলপথ পাতা শুরু হোল তখন কোল কোম্পানীগুলি তাদের নিজ নিজ কোলিয়ারী এলাকায় নিকটবর্তী স্থান দিয়ে লাইন পাতা হোক এটা চাইছিল এবং এর জন্য তারা রেল কোম্পানীগুলির কাছে তদ্বির শুরু করে। কিন্তু অব্রিটিশ কোল কোম্পানীগুলি বঞ্চনার শিকার হয়। স্বভাবতই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়।

কয়লা শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সময়মত এবং পর্যাপ্ত রেল ওয়াগনের যোগান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আলোচ্য সময়কালে রেল কোম্পানীগুলি চাহিদামত ওয়াগন যোগান দিতে পারত না। স্বভাবতই চাহিদামত ওয়াগন পাওয়ার জন্য তদ্বির তদারকি করতে থাকে। কিন্তু একেত্রেও যেহেতু রেল কোম্পানিগুলি প্রায় সবই ছিল ব্রিটিশ পরিচালনাধীন, স্বভাবতই তারা ব্রিটিশ কোল কোম্পানীগুলিকে ওয়াগনের ক্ষেত্রে বেশী

সুযোগ দেয়। এর ফলে অব্রিটিশ কোল কোম্পানীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। সমকালীন সরকারী এবং বেসরকারী রিপোর্টে এর উল্লেখ দেখতে পাই[৭]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পূর্বভারতে বেশ কিছু চটকল এবং সূতাকল গড়ে ওঠে। এগুলি কয়লা শিল্পের বাজার সম্প্রসারিত করে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে মাটির নীচে প্রচুর লৌহ আকরিকের সম্ভার ছিল। যার দ্বারা এই অঞ্চলে বিশাল লৌহ ইস্পাত ও রেলওয়ে কারখানা গড়ে তোলা যেত। তাহলে কয়লা শিল্প আরও বিকশিত হোত। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার তাদের স্বার্থে এই শিল্প গড়ে তোলেনি।

কয়লা ও লৌহ শিল্পের এই স্বল্প পর্যালোচনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কয়লা ও রেলওয়ে শিল্পের যে বিকাশ হয়েছিল তা অবশ্যই সীমাবদ্ধ। তবুও তা ভারতবর্ষে বিশাল শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা বাস্তবায়িত করেনি। রেল ও কয়লা থেকে উদ্ভূত মুনাফা তারা ভারতে পুনর্নিয়োগ না করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে চলে যায়[৮]। ফলে, ভারতে একটি দুর্বল শিল্প পরিকাঠামো বিরাজ করতে থাকে। অবশ্য ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে এর বেশী কিছু আশা করা যায় না। তারা ভারতবর্ষের শিল্প বিকাশের জন্য আসেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কাঁচামাল এবং বাজারকে ব্যবহার করে ইংলণ্ডের শিল্পের বিকাশ সাধন করা। ভারতের তৎকালীন ধনশালী ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা থেকে তারা মুক্ত হয়ে শিল্প স্থাপনে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেনি[৯]। তারা যে সামান্য উদ্যোগ নিয়েছিল তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খুশি করবার জন্যই, স্বাধীনভাবে শিল্পায়নের চিন্তা তাদের মধ্যে অনুভূত হয়নি।

সূত্র-নির্দেশ

1 I J Baraclough – A further contribution to the history of development of the coal mining industry in India M J M Institute of India Vol 47 [April 1951]

2 H D G Humphreys – 'The early history of coal mining in Bengal" Golden Jubilee Vol – **The Progress of the Mineral Industry of India** 1906 & 1955

3 Blair B Kling. "Ranigang" **Partner in empire.**
Dwarakanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India

4 W W Hunter, A **Statistical account of Bengal** Vol - [First reprint in India–1973]

5 M. G Institute of India
Vol – VIII, part-I
Presidential address of A S Thomas
Output of coal and the Rail-way consumption between 1885-1911'

Year	Out put	Rly Consumption
1885	1 294 221	486 716
1895	3 540 019	1 119 621
1905	8 417 739	2 656 530
1911	12 715 533	4 223 020

এব থেকে দেখা যাচ্ছে উৎপাদিত কয়লাব এক তৃতীয়াংশ বেল কেম্পানীওলি ক্রয় করত।

6 Hennes Papendieck British Managing Agenciesc in the Indian Coal Field
D Rother Mund ed Zaminder Mines and Peasant

7 Proceedings of the Second Legislative Assembly First Session 1924 p 881 f 912 1138 — ভাবতীয, বিশেষ করে বাঙ্গালী শিল্পপতিদেব অভিযোগেব কথা নথিভুক্ত কবা আছে।

৪ 6 নং সূত্র ঃ

9 N K Sinha The Economic History of Bengal.

চিবস্থায়ী বন্দোবস্তেব ফলে মান সম্মান প্রতিষ্ঠাব মোহে সম্পদশালী ব্যক্তিবা জমিতে অর্থলগ্নী কবেছিল। তাবা শিল্প গঠনে উদ্যোগী হয়নি। কিন্তু কয়লা শিল্পে কিছু দেশীয অর্থ লগ্নী হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারেনি। বিড়লা মিউজিয়াম, গুরুসদয় দত্ত বোড, কলকাতা, এখানে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ", 1 নথিপত্র আছে। শ্যামসুন্দব কলেজের মাননীয় অধ্যাপক প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত মহাশয় সেই নথিপত্র দেখেছেন। • াব পরামর্শে এবং সহযোগিতায় এই প্রসঙ্গে (কয়লা এবং বেল) অনেক বিষয়ে অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুর

প্রদ্যোতকুমার মাইতি

লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বভারতীয় স্তরে এই আন্দোলন সৃষ্টির পটভূমি সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া দরকার। লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।

ব্রিটিশ সবকাব ১৯২৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে নেহেরু রিপোর্ট (ভারতবাসীব স্বায়ত্ত শাসনের দাবী) মেনে না নেওযায ভারতীয জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ্যেব দাবী গৃহীত হয় এবং স্থির হয, এই স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের যে সংগ্রাম শুরু হবে তা অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হবে। আইন অমান্য আন্দোলনেব পবিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনাব পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর দেওয়া হয়।

গান্ধীজীর উপর আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনাব দায়িত্ব পড়লে তিনি প্রথমে লবণ আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশচাতে তাঁর দূরদৃষ্টি বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি প্রথমে এই আইন ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন এই জন্য যে, এই আইনের আওতায় সর্বশ্রেণীর মানুষকে পড়তে হয়েছিল অর্থাৎ লবণ এমনই একটি বস্তু যা ধনী দরিদ্র সবার কাছে একান্ত অপরিহার্য। এই আইনটি ভঙ্গ করার প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই আন্দোলনকে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আন্দোলনের ভাগীদার করতে চেয়েছিলেন।

লবণ আইন অমান্য বা লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার পূর্বে গান্ধীজী ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২রা মার্চ এক চিঠিতে বড়লাট আরউইনকে (১৯২৬ - এপ্রিল, ১৯৩১) লবণ সত্যাগ্রহের কথা জানান। কিন্তু তাঁর কাছে থেকে কোন সহযোগিতার ইঙ্গিত না পেয়ে তিনি ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ৭৮ জন আশ্রমবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডি (বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত গুজরাটের সমুদ্রতীরে অবস্থিত) অভিমুখে যাত্রা করলেন[১]। ৬১ বছরের মানুষ গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা ভারতবাসীর মনে এক গভীর অনুপ্রেরণা তথা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা জাগায়। আশ্রম ত্যাগের পূর্বে তিনি সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : "আমরা জীবনমরণ সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছি, এ একটি পবিত্র সংগ্রাম ..... আমরা আজ ভারতের দরিদ্রতম, হীনতম ও দুর্বলতম মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছি"[২]। বলা বাহুল্য ,গান্ধীজীর এই উক্তি ভারতবাসীর মনে এক তীব্র স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাতে সাহায্য করেছিল।

এই হ'ল আইন অমান্য তথা লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা মেদিনীপুবে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

ব্রিটিশ বিরোধী তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ উর্বর ক্ষেত্র যে মেদিনীপুর তা আমাদের অজানা নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বে এখানে একাধিক ব্রিটিশ বিরোধী গণ অভ্যুত্থান তথা আন্দোলন হয়েছিল, যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, মালঙ্গীদের বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ, নীলচাষীর বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ[৩]। বিদ্রোহগুলি দমিত হলেও মেদিনীপুরবাসীর শোষণ মুক্তির প্রয়াসের চেষ্টার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। মেদিনীপুরবাসীর এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রাখলেই লবণ সত্যাগ্রহে তাঁদের অবদানের মূল্যায়ন করা সহজ হবে।

সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী মেদিনীপুর লবণ আইন অমান্যের যে উপযুক্ত ক্ষেত্র তা কুমিল্লায় (বর্তমান বাংলাদেশে) অবস্থিত অভয় আশ্রমের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতম সদস্য অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে (৭ই মার্চ ১৯৩০) জানান। ঐ সময় মেদিনীপুরবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের কথাও আলোচিত হয়। গান্ধীজী অভয় আশ্রমের কর্মীদের মেদিনীপুরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তার নির্দেশ দেন[৪]।

এরপর মেদিনীপুরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ১৯ শে মার্চ সমগ্র জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এক সম্মেলন আহূত হয় মেদিনীপুর শহরে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা আইন অমান্য সমিতি (পরিষদ) গঠিত হয়। মহকুমা এমনকি থানা স্তরেও এই সমিতি গঠিত হয়, যাতে করে আইন অমান্য কর্মসূচী বিশেষ করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফলতা লাভ করে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে কারণ, মানুষের লবণাক্ত জল প্রবেশের সুযোগ এ দুটি মহকুমায় অধিক থাকায় লবণ উৎপাদনের জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর সদর মহকুমায় লবণাক্ত জল প্রবেশের কোন সুযোগ না থাকায় এ দুটি মহকুমার কোথাও লবণ তৈরীর কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। তবে এ দুটি মহকুমার কর্মীরা কাঁথির অন্তর্গত পিছাবনী লবণ কেন্দ্রে গিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন[৫]। ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জে কেবল একটি বড় লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ৭ই এপ্রিল থেকে এই কেন্দ্রে লবণ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও প্রায় পঁচিশ জন স্বেচ্ছাসেবক এই কেন্দ্রে যোগদান করেন। পরে ময়মনসিংহ জেলার কিছু নেতা এই কেন্দ্রকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে থাকেন[৬]।

কাঁথি মহকুমার আইন অমান্য সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র জানা (ইনি ঐ সময় মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন)। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মহকুমার প্রধান লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র হয় পিছাবনি এবং কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে মহকুমার প্রধান সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়। অভয় আশ্রমের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী সত্যরঞ্জন সেন এই শিবির পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না[৭]। অভয় আশ্রমের কর্মীগণ কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন[৮]।

তমলুক মহকুমায় আইন অমান্য সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী নির্বাচিত হন[৯]। হলদী নদীর তীরে অবস্থিত নরঘাট হয়ে ওঠে এই মহকুমার প্রধান লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র। তমলুকের মাহিষ্য রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আনুকূল্যে তাঁদেরই রাজবাড়ীর একাংশে লবণ সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়। শিবিরের আচার্য ও উপাচার্য পদে সতীশচন্দ্র সামন্ত ও সুশীলকুমার ধাড়া নির্বাচিত হন[১০]। প্রায় দেড় হাজার নারীপুরুষ ৬ই এপ্রিলের পূর্বে এখানে সত্যাগ্রহী হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হন[১১]। বারে বারে তালিকাভুক্ত হয়ে মোট প্রায় ১৫ হাজার যুবকযুবতী স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেন[১২]।

এইভাবে আইন অমান্য সমিতি গঠনের মাধ্যমে মেদিনীপুরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার পরিকাঠামো গ্রহণ করা হ'ল। এদিকে, গান্ধীজী ২৪ দিন পায়ে হেঁটে ডাণ্ডিতে উপস্থিত হন এবং ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডির সমুদ্র তীরে লবণ তৈরী করে লবণ আইন ভঙ্গ করলে সারা দেশে লবণ আইন ভঙ্গের কাজ শুরু হয়ে যায়। যেখানে লবণ উৎপাদনের প্রাকৃতিক সুযোগ ছিল না, সেখানে সরকারের নিষিদ্ধ অন্যান্য আইন ভঙ্গ করা হয় যেমন— মধ্য প্রদেশে অরণ্য আইন, নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ্যে পাঠ করে আইন ভঙ্গ ইত্যাদি।

সত্যিকথা বলতে কী গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গকে আইন অমান্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করায় ভারতের দরিদ্র গ্রামবাসীদের হৃদয়তন্ত্রীতে তা ঘা দেয়। কারণ অন্নের সঙ্গে সামান্য লবণ গ্রহণেও তারা ব্রিটিশের শিকার হয় — এই বোধ তাদের উদ্দীপ্ত করে। ভারতের বহু স্থানের ন্যায় মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় ৬ই এপ্রিল লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়[১৩]। অসংখ্য লবণ উৎপাদন কেন্দ্র এ দুটি মহকুমায় গড়ে ওঠে। কাঁথিতে পিছাবনী (কাঁথি শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) এবং তমলুক মহকুমায় নরঘাট (তমলুক শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) উভয় মহকুমার প্রধান লবণ আইন অমান্য কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দিনের পর দিন নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করেও নারীপুরুষ সত্যাগ্রহীরা লবণ উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যান।

আন্দোলন শুরুর প্রথম কয়েকদিন ব্রিটিশ সরকার লবণ উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম ভেঙে দিয়ে লবণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা এবং আন্দোলনের পরিচালকরা আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য সভা সমিতির মাধ্যমে প্রায় প্রত্যহ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে চলেন। এই আন্দোলনে

মেয়েদেরকে অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন জনসভায় মহিলা নেত্রীদের দিয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দেওয়াব ব্যবস্থা কবা হয়। যেসকল মহিলা সত্যাগ্রহীরা নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন তাঁরা হলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী রায়, শান্তি দাস, অশোকলতা দাস, ইন্দিবা দেবী প্রমুখ। এঁরা অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের তাৎপর্য এবং নির্যাতন সহ্য করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন[১১]। নারী-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি শুরু হল ব্রিটিশ সরকাবেব অমানুষিক অত্যাচার, নির্বিচারে প্রহার, গ্রেপ্তার, জেল, জবিমানা, গৃহদাহ, নারী নির্যাতন, গুলি করে হত্যা ইত্যাদি। কিন্তু তাতেও আন্দোলনকে স্তব্ধ কবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ প্যাডী তমলুকে আসেন কিন্তু তাব ফলে অবস্থার কিছুই উন্নতি হয়নি। ১৯৩১-এর মার্চে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়াব পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলন মেদিনীপুবে পুরোদমে চলেছিল।

মেদিনীপুবে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দিকগুলি তুলে ধরা যেতে পাবে।

প্রথমতঃ নাবীপুরুষ নির্বিশেষে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যদিও কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় যথেষ্ট পবিমাণ মুসলমানের বসবাস তথাপিও এই আন্দোলনে তাদেব অংশগ্রহণেব পরিমাণ ছিল অত্যন্ত নগণ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম থেকেই তারা দূরে সবে ছিল।[১৩]। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক দক্ষতা নানা ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হলেও এক্ষেত্রে অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদাযকে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে তেমনভাবে পাবেনি। তবে, জনসংযোগেব ফলে এখানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল অর্থাৎ যথার্থ গণ আন্দোলনের ভূমিকা নিয়েছিল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুব জেলায ইউনিযন বোর্ড বাতিল আন্দোলনের সাফল্য এখানকাব জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের সুফল সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। ফলে এখানকার অধিবাসীদের আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামেব প্রেরণা বহুগুণ বেড়ে যায। তাই সব রকম অত্যাচর সহ্য করেও এখানকার নারীপুরুষ সত্যাগ্রহী রূপে লবণ আইন অমান্যের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ অহিংসা পন্থা অবলম্বন এই আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য থাকায় অমানুষিক অত্যাচর সহ্য করেও সত্যাগ্রহীরা সংহিস যেমন হয়ে ওঠেননি, তেমনি সত্যাগ্রহীর পথ থেকেও তাঁরা সরে আসননি। গান্ধীজীর অহিংস পন্থায় তাঁরা আমৃত্যু একপ্রকার অটল ছিলেন। জনগণের মনে এই বিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতারা একনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এখনও কয়েকজন জীবিত বর্ষীয়ান নেতা রয়েছেন (যেমন সুশীল কুমার ধাড়া, গুণধর ভৌমিক) যাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে এসব জানা যায়।

তৃতীয়তঃ মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এখানকার আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মূলে ছিল একদিকে নারী সমাজের কাছে গান্ধীজীর বিশেষ আবেদন (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩০)[১৬], অপরদিকে জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বের গণ সংযোগের ফলশ্রুতি।

লবণ আইন অমান্য কেন্দ্রগুলির প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। শতকরা ৭৫টির ক্ষেত্রে সরকাবী পুলিশ বাহিনীর লাঠি, বেত্রাঘাত ইত্যাদি সহ্য করেও সত্যাগ্রহী মহিলারা লবণ উৎপাদন করে লবণ আইন ভঙ্গ করে যেতে থাকেন। কাঁথি থানার মির্জাপুর ও খোলাখালি লবণ উৎপাদন কেন্দ্রে যথাক্রমে ৩০/৪০ জন ও ৫০/৬০ জন মহিলা সব রকম অত্যাচার সহ্য করেও লবণ তৈরী করতেন। তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার ১৫টি ইউনিয়নে সত্যাগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল ৯৭ টি স্থানে এবং মহিলারা ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকায়[১৭]।

চতুর্থতঃ এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরে চরম শাস্তিভোগ তথা মৃত্যু বরণ অবিভক্ত বাংলার তথা সমগ্র ভারতের অন্যত্র ঘটেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। প্রহার, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ছাড়াও লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, ধানের গোলা থেকে সব ধান খড়ের গদার সাহায্যে পোড়ান (এই জেলায় প্রথম ঘটে পিছাবনীর নিকটস্থ ঝাড়েশ্বর মাঝির বাড়ীতে, ১১ই এপ্রিল, ১৯৩০। অপরাধ, তিনি ও তাঁর ৭০ বছর বয়স্কা মা পদ্মাবতী দেবীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ)[১৮], নারী নির্যাতন ও গুলিবর্ষণ করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালান হয়। শহীদ হন ৫৯ জন; তাঁর মধ্যে একজন মহিলা (কেশপুর থানার খেচুয়া গ্রামের শ্রীমতি উর্মিলাবালা পড়িয়া — তাঁর মৃত্যু হয় পুলিশের প্রহারে)।

সরকারী মতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ১৪২৯ জন। এর মধ্যে কিছু মহিলাও ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে এই জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ঘটনার সূত্রপাত ১লা জুন, ১৯৩০। স্থান, কাঁথি মহকুমার পটাশপুর থানাব প্রতাপ দীঘি লবণ কেন্দ্র। শহীদ হন রামকৃষ্ণ দাস (২৫), কার্তিকচন্দ্র মিশ্র (১৭) ও উপেন্দ্রনাথ মিশ্র[২০]।

পঞ্চমতঃ ছাত্র সমাজের অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ এখানকার আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেন। এঁরা হলেন সুশীলকুমার ধাড়া, গুণধর ভৌমিক, হৃষীকেশ গায়েন। বিনয়কৃষ্ণ হাজরা, নিত্যাগোপাল মাইতি, নবীনচন্দ্র মহাপাত্র, সুধীরচন্দ্র দাস, মৃত্যুঞ্জয় ভুইঞা, শ্যামাচরণ বেরা, প্রসন্নকুমার ত্রিপাঠী, সুরেন্দ্রনাথ প্রধান, গিরীশচন্দ্র সাঁতরা, কৃত্তিবাস গিরি প্রমুখ। অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় এই আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের পরিমাণ অধিক ছিল।

ষষ্ঠতঃ এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে পুলিশি অভিযান শুরু হয়। ঐ সময় নারীধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা যথেষ্ট ঘটেছিল। আসন্ন প্রসবা মহিলারাও রেহাই পাননি। পুলিশের পাশবিক অত্যাচারের ফলে তাঁরা প্রসব করে ফেলেন। এমনকি আসন্ন প্রসবা মহিলা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালাতে গিয়ে প্রসব করে ফেলেন এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যান। আসন্ন প্রসবা মহিলা পালাতে গিয়ে পথিমধ্যে প্রসব করে ফেলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ ফিরে পেলেও সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর ফিরে পাননি। ধর্ষিতা হওয়ার পর মনের ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এমন নজিরও রয়েছে[২১]।

মেয়েদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হত। এমনকি মেয়েদের লজ্জাস্থানে বা তলপেটে সবুট লাথি মারার কাহিনীও আমাদের অজানা নয়[২২]।

সপ্তমতঃ এই আন্দোলনের সূত্র ধরে সাধারণ মানুষ যে কত অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয়ও মেদিনীপুর জেলায় চোখে পড়ে। এপ্রসঙ্গে আমরা ঝাড়েশ্বর মাঝির মা পদ্মাবতীর কথা স্মরণ করতে পারি। যিনি সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয়হীনা হয়ে পরের দিন সকালে লবণ কেন্দ্রে হাজির হয়ে বললেন ঃ "আমার একটি ছেলে জেলে গেছে, আরো ছেলে রয়েছে; আটাশ মন ধান ছাই হয়েছে, আবার ফসল ফলবে; কোন দুঃখ নেই আমার, বীরপুত্রের জন্য আমি গর্বিত"।[২৩] এ গর্ব শুধু পদ্মাবতী দেবীর ছিল না; ঐ সময়কার আমাদের আলোচ্য জেলার বহু মা-বাবার এটি ছিল মনের কথা। তাই '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় আমরা এমন নজির আমাদের জেলায় আরও বেশ কিছু পেয়েছি।

সবশেষে এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে এক বারবনিতার নির্যাতন কাহিনীও আমাদেরকে বিস্ময়াভূত করে। নন্দীগ্রাম থানার তেরপেখিয়া বাজারে বসবাসকারী এই বারবনিতা সত্যবতী কী অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেও আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসেননি। দৈহিক নির্যাতনের পাশাপাশি কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল[২৪]।

মেদিনীপুর জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এসব আলোচ্য দিকগুলি লক্ষ্য করলে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, মেদিনীপুর সত্যিই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অনন্য। এই অনন্য চরিত্র সৃষ্টি হয়ছিল সুদূর অতীতে। তাই বলি, মেদিনীপুরের মাটি ও মানুষ সত্যই নমস্য। মেদিনীপুরের মহিমা তাই তুলনা রহিত।

সূত্রনির্দেশ

১। চাঁদ তারা, **হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডাম মুভমেন্ট**, ভলিউম, ৪, ১৯৯২, পৃঃ ১২২-২৫।

২। দাস, বসন্ত কুমার, **স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর**, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৬।

৩। মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, **বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার**, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১-১৪।

৪। দাস, বসন্ত কুমার, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭।

৫। তদেব

৬। তদেব, পৃঃ ১০৪-১০৫

৭। তদেব, পৃঃ ১০-১১

৮। তদেব, পৃঃ ৭

৯। তদেব, পৃঃ ৭৩

১০। ধাড়া, সুশীল কুমার, **প্রবাহ**, ১ম খণ্ড, ১৩৯০, পৃঃ ২৬।

১১। দাস বসন্ত কুমার, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

১২। গোস্বামী, গোপীনন্দন, **বাংলার হলদিঘাটি তমলুক**। ১৯৭৩, পৃঃ ২০।

১৩। দাস, বসন্তকুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৭, ৭৬-৭৭।

১৪। তদেব, পৃঃ ২২

১৫। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বলা হল। তাছাড়া দ্রষ্টব্য, গোস্বামী, গোপীনন্দন, **মেদিনীপুরের শহীদ পরিচয়**, ১৯৭৭, পৃঃ ৩৬।

১৬। বসু, নিমাই সাধন, **দি ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট— এন আউট লাইন**, কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ৯২।

১৭। **ইতিহাস অনুসন্ধান** — ৮, পৃঃ ২৭০-৮০; দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪-৩৭

১৮। ঘটনার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯-২২। ঝাড়েশ্বব মাঝির উপর অত্যাচাবের কাহিনী "সমগ্র বাংলার কেন, সমগ্র ভারতেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবল; সৃষ্টি হল এক অপূর্ব উন্মাদনা"। (দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২)।

১৯। গোস্বামী, **মেদিনীপুরের শহীদ পরিচয়**, পৃঃ ৩৩; ভারত ছাড়ো আন্দোলনেব সুবর্ণ জয়ন্তী ও মেদিনীপুরের অগ্নিযুগের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা, মেদিনীপুর সম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বব ২, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭।

২০। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১-৬৫।

২১। **ইতিহাস অনুসন্ধান** — ৮, আঃ পৃঃ ২৭৮-৭৯।

২২। তদেব, আঃ পৃঃ ২৮০

২৩। মেদিনীপুর সম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা, পৃঃ ৩২।

২৪। **ইতিহাস অনুসন্ধান** — ৮ আঃ পৃঃ ২৭৯-২৮০।

কোচবিহার রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কমিশনারদের ভূমিকা ও কার্যাবলী (১৭৮৯-১৮৬১)

বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মোঘল সম্রাট বাবরের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রায় দু'বছর আগে মহারাজ বিশ্বসিংহ কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নরনারায়ণ এবং রাজ্যের প্রধান সেনাপতি চিলা রায়ের প্রচেষ্টায় কোচবিহার রাজ্য পূর্বভারতের এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। কোচ অসমীয়াদের সাথে বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতিদের ধর্ম, ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে কোচবিহার দ্রুত উন্নতির শিখরে পৌঁছায়।

কূটনীতিব জটিল আবর্তে পড়ে রাজ্যের সামরিক শক্তি ও রাজ্যসীমা ক্ষয়িত হতে থাকে। মোঘল আক্রমণে কোচবিহার রাজ্যের আয়তন হ্রাস পেলেও সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। মোঘল আক্রমণের বেশ কিছুকাল পরে পার্শ্ববর্তী পার্বত্য দেশ ভুটানের আক্রমণে কোচবিহার রাজ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। তৎকালীন কোচবিহার রাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে কৌশলে বন্দী করে ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসানো হলে ভুটান রাজ সৈন্য পাঠিয়ে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য উদ্ধারের জন্য নাবালক রাজার পক্ষে রাজ্যের নাজিরদেব রঙপুরের তৎকালীন ইংরেজ কালেক্টরের কাছে সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।

ভারত ইতিহাসে তখন এক ক্রান্তিকাল। মুঘলশক্তিকে পরাজিত করে ইংরেজ শক্তি উদ্ভাসিত। বাণিজ্যের স্বার্থে দেওয়ানীর সীমা প্রসারে আগ্রহী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে কোচবিহার রাজ্যের সাহায্যের আবেদন এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছিল। তিব্বত, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলার বাণিজ্য বহরের একমাত্র বাণিজ্যপথ ছিল কোচবিহার। কোচবিহার রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান কোম্পানীর নজর এড়ায়নি। ফলে কোচবিহার রাজ্য রক্ষার আবেদন কোম্পানী তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে এবং ১৭৭৩ সালে রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির পর কোম্পানী তার সামরিক শক্তি পাঠিয়ে ভুটানরাজকে পরাজিত করে কোচবিহারকে ভুটানের হাত থেকে মুক্ত করে। ভুটানের হাতে বন্দী কোচবিহার রাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ মুক্ত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু রাজ্যের এবং রাজার এই মুক্তি এসেছিল কোচবিহার রাজ্যের স্বাধীনতার মূল্যে। কেননা ১৭৭৩ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোচবিহার রাজ "Will acknowledge subjection to the will of the English East India Company upon his country .... and will allow the Coochbehar Country

to be annexed to the province of Bengal." এছাড়াও রাজা 'Further agrees to make over to English East India Company one half of the annual revenue of Coochbehar for ever."

স্বাধীনতার মূল্যে পাওয়া এই চুক্তি কোচবিহারকে করদরাজ্যে পরিণত করে এবং পরবর্তীকালে গৃহবিবাদ, রাজপরিবারভুক্ত লোকেদের পারস্পরিক ষড়যন্ত্র রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কমিশনারদের মাধ্যমে কোম্পানীর হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোচবিহার রাজ্যের অভিজাতদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ঘোরতর গোলযোগ দেখা দেয়। নিজ স্বার্থে চিন্তিত হয়ে কোম্পানী কোচবিহারের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। রঙপুরের কালেক্টর গুডল্যাড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কিন্তু গুডল্যাডের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হওয়াতে এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে কোম্পানীর বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী এই রাজ্যের গোলযোগে বিচলিত হয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল কোম্পানীর দুইজন কর্মচারী লরেন্স মার্শার এবং জন লুইস শোভের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের বিবেচ্য বিষয় ছিল (১) কোচবিহার রাজ্যের অভিজাতদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটানো, (২) কোচবিহার রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর রিপোর্ট তৈরী করে কোম্পানীকে দেওয়া।

বিস্তারিত তদন্তের পর লরেন্স ও শোভে কোম্পানীকে যে চূড়ান্ত বিবরণী পেশ করেছিলেন তার উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল, কোচবিহার রাজ্যে বিবদমান পরিস্থিতির অবসানের জন্য এবং কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে কোচবিহারে একজন রেসিডেন্ট কমিশনার নিয়োগ করা। প্রাথমিকভাবে কোম্পানী রাজস্ব এবং প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের জন্য লরেন্স-শোভে কমিশন নিয়োগ করলেও কোম্পানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কোম্পানীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পথ প্রস্তুত করা। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে হেনরী ডগলাস ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কোচবিহারের প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হন। কোম্পানীর পক্ষ থেকে কমিশনারদের কার্যের একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এগুলি ছিল (১) রাজদরবারের কার্যধারার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, (২) রাজাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা, (৩) কোম্পানীর প্রভাব বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা এবং (৪) কোচবিহার রাজ্যের ভিতর ও বাইরের শত্রুদের প্রতিরোধ করা।

কমিশনারদের নিয়োগের ফলে কোচবিহার রাজ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে পরবর্তীকালে কোচবিহার রাজাদের সঙ্গে কোম্পানী নিযুক্ত কমিশনারদের রাজ্যের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ক্রমশ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই সময়কালকে কোচবিহার রাজ্যের যুগ সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে।

হেনরী ডগলাস প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হয়ে এসে কৌশলে রানী ও মন্ত্রীকে ক্ষমতাহীন করে রাজ্যেব বাজস্বদপ্তরের পরিচালনা এবং বিচারালয়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়া তিনি ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কোচবিহারের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরী করেন। ডগলাসের পরবর্তীকালে কমিশনার নিযুক্ত হয়ে আসেন যথাক্রমে মি. সি. এ ব্রুস, মি. ডবলিউ টাওয়ার্স স্মিথ এবং রিচার্ড আমুটি। এছাড়া রঙপুরের কালেক্টর মি. লামসডেল এবং মি. রাইটও কখনও কখনও কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই কমিশনারগণ কোচবিহার রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবল বিরোধের সুযোগ নিয়ে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে বারবার হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। চুক্তি সম্পাদনেব কয়েক বছরের মধ্যে তাদের হস্তক্ষেপ এত ব্যাপক হয়েছিল যে তাঁরা কোচবিহার রাজ্যের নিজস্বমুদ্রা 'নারায়ণী মুদ্রা' তৈরী করার অধিকারও কেড়ে নিয়েছিলেন। কমিশনারদের কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তবীণ ব্যাপারে এই ধরনের হস্তক্ষেপ ছিল ১৭৭৩ সালে সম্পাদিত চুক্তির তাৎপর্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

১৭৮৯ থেকে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কমিশনারগণ কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করলেও কোম্পানী ও রাজার মধ্যে কোন সংঘাত দেখা যায়নি, কেননা তৎকালীন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন নাবালক এবং স্থানীয় জনগণের দিক থেকে কোন প্রতিরোধ ছিল না।

১৮০১ সালে হরেন্দ্রনারাযণ সাবালক হয়ে রাজ্যক্ষমতা লাভ করলে কমিশনার তথা কোম্পানীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায়। নিজ ঐতিহ্যেব প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্বাধীনচেতা রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কমিশনারদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীতে আপত্তি জানান এবং ১৭৭৩-র চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কমিশনার অপসারণেব দাবী জানালে কোম্পানী ১৮০২ সালে কমিশনারকে অপসারিত করে।

গভর্নর জেনারেল এবং ক্যালকাটা কাউন্সিল কোচবিহার রাজ্যে সঠিক পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়, পরিচ্ছন্ন শাসনব্যবস্থা ও রাজ্যের সামগ্রিক সমৃদ্ধির জন্য ১৮০২ সালেই পুনরায় কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৮০৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্সিস পিয়ার্ড কমিশনার নিযুক্ত হয়ে আসেন। হরেন্দ্রনারায়ণ এই নিয়োগে প্রবল আপত্তি জানালে কোম্পানী পিয়ার্ডকে নিয়োগের দেড় বছরের মধ্যে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় (১৮০৪, আগস্ট)।

এই সময় কোচবিহার রাজ্যে নানা কারণে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে রাজস্ব সংগ্রহ খুবই কমে যায়। রাজস্বই ছিল কোম্পানীর প্রধান স্বার্থ তাই আবার কমিশনারদের কার্যাবলীকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করে কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থির হয় যে কমিশনার কেবলমাত্র রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজাকে সাহায্য করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ জরুরী মামলায় পরামর্শ দেবেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে মি. জন ফ্রেঞ্চ কমিশনার নিযুক্ত হন। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ এই

নিয়োগের বিরুদ্ধেও প্রবল আপত্তি জানালে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুন কোচবিহারে পৃথক কমিশনার পদ লোপ করেন।

হরেন্দ্রনারায়ণের বিরোধিতার ফলে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যে কোন ইংরেজ কমিশনার ছিলেন না। এই সময় রঙপুরের কালেক্টর মন্টগোমারী, মোরগান এবং ডিগবী কমিশনারের দায়িত্ব পালন করতেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দেশ দিয়েছিল যে কোচবিহারের রাজা যদি তাঁর কোন কর্মচারীর প্রতি অন্যায় অবিচার করে তাহলে কমিশনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কালেক্টররা সৈন্য দিয়ে হলেও সেই উৎপীড়িত কর্মচারীকে সাহায্য করবে। রাজ্যে যাতে অশান্তি বজায় থাকে, রাজা দুর্বল থাকেন সেজন্য তাঁরা রাজার বিরুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের উত্তেজিত করতেন এবং প্রায়ই রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের তুচ্ছ বিচ্যুতিকে বড় করে দেখিয়ে কলকাতায় রিপোর্ট পাঠাতেন। এই প্রসঙ্গে একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে প্রবল শক্তিশালী কোম্পানীর প্রতিভূ হিসাবে এই ক্ষুদ্র রাজার স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের বিরক্তি উৎপাদন করত।

এই পরিস্থিতিতে লর্ড মিন্টোর সরকার ১৮১৩ সালের ৭ই আগস্ট রাজার আচরণকে সংযত করার জন্য নরম্যান ম্যাকলয়েডকে কমিশনার নিযুক্ত করেন। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী ম্যাকলয়েডকে "দেওয়ানী ও ফৌজদারী অফিস সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল" এবং পুলিশ বিভাগের উন্নতি সাধনার্থ কমিশনারকে রঙপুরস্থ কয়েকটি থানার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যায় কোম্পানীর পক্ষ থেকে তিনি যে কার্য এখানে সম্পাদন করতে চান তাতে তিনি রাজার সম্মতি পাচ্ছেন না। ম্যাকলয়েড কোম্পানীর কাছে হরেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানোর অভিযোগ আনেন। কোম্পানী অবশ্য সেই অভিযোগে গুরুত্ব দেয়নি। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তাঁকে শাসনকার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কোম্পানীও কমিশনার মারফত কোচবিহার রাজ্য শাসনের চেষ্টা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে। কোচবিহারের ইংরেজ কমিশনারদের সাথে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের এই বিরোধকে আমরা রাজার সার্বভৌম অধিকার রক্ষার চেষ্টা ও ইংরেজদের আগ্রাসী নীতির মধ্যে সংঘর্ষ বলে উল্লেখ করতে পারি।

১৮১৬-৩৯ সাল পর্যন্ত কমিশনারদের শাসনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই চব্বিশ বছর ধরে রাজার বিরোধিতার ফলে কোচবিহারে থাকার পরিবর্তে কোচবিহারের জন্য নিযুক্ত কমিশনাররা রঙপুর অথবা গোয়ালপাড়া থেকে নিজেদের কর্তব্য পালন করতেন।

১৮১৬ সালে মিঃ ডেভিড স্কট কমিশনার নিযুক্ত হন। চোদ্দ বছর ধরে কমিশনার থাকাকালীন রাজার সাথে তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দেওয়ান ও নাজীর সম্পর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করা ও কোম্পানীকে দেয় রাজস্বের বকেয়া আদায় করা। পরবর্তী কমিশনার নিযুক্ত হন মিঃ সি. রবার্টসন (১৮৩০-৩৪)। কিন্তু তিনি কখনও কোচবিহারে আসেননি।

১৮৩৪ সালে মেজর ফ্রান্সিস জেনকিনস কমিশনার নিযুক্ত হলে কোচবিহার রাজ এবং কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্কের নতুন যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৮৯ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বছরে যে দশজন কমিশনার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কেউই তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেননি। এজন্য দায়ী ছিল কমিশনারদের ষড়যন্ত্রমূলক আচবণ, আগ্রাসী মনোভাব, সংঘাতমূলক উদ্ধত কার্যপ্রণালী এবং রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব রক্ষার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। মহাবাজাব অদম্য চেষ্টায় কমিশনারদের মাধ্যমে শাসনসংস্কারের অজুহাতে রাজ্যেব সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেবার চেষ্টা প্রতিহত হয়েছিল। তিনি রাজ্যের নিজস্ব মুদ্রা 'নারায়ণী মুদ্রা' তৈরী করার অধিকার ফিরে পান। হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতিরোধের ফলেই কোচবিহার রাজ্য শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন জমিদারী হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং নিজ অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

কমিশনারদেব মাধ্যমে কোচবিহারেব অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা দখল করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে কোম্পানী নতুন কমিশনার জেনকিনসের নিয়োগের মাধ্যমে কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়। জেনকিনস তাঁর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতিকে মার্জিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টার ফলেই কোম্পানী এবং রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্ক অনেকখানি কমে আসে।

মিঃ জেনকিনস ছিলেন কোচবিহার রাজ্য এবং কোম্পানীব মধ্যে যোগসূত্র। তিনি রাজ্যের প্রশাসনের ক্রটি দূর করে প্রশাসনিক উন্নতিব জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন এবং সার্থক হন। দীর্ঘদিন তিনি কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁব কূটকৌশল এবং দূরদর্শিতার ফলেই কোচবিহারেব সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন এসেছিল। ১৮৩৪ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠাশ বছর তিনি একটানা কোচবিহারের কমিশনার ছিলেন। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল এবং নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের কিছুদিন তিনি কমিশনার হিসাবে কোচবিহারের শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জেনকিনস তাঁর কার্যের দ্বারা ভবিষ্যৎ ইংরেজ কমিশনারদের কর্তব্যের রূপরেখা স্থির করে যান। পরপর তিনজন রাজার রাজত্বকালে তিনি যে কার্য সম্পাদন করেন তার উচ্চ প্রশংসা করে ক্লড ক্যাম্পবেল বলে গেছেন 'তার মত সুযোগ্য ব্যক্তিকে এ যাবৎ এ রাজ্যে পাঠানো হয়নি।'

হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর কোম্পানী এবং কোচবিহার রাজাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল মেজর জেনকিনস ছিলেন তার মূল সূত্রধর। নতুন রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসনে বসার ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। এই প্রথমবার উত্তরাধিকার প্রশ্নের মীমাংসা করতে কোম্পানী ১৭৭৩-র চুক্তি ভঙ্গ করে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। অন্যদিকে রাজার উত্তরাধিকার নির্বাচনের অধিকার যে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের তথা কমিশনারের রয়েছে তা কোচবিহার রাজ

দরবার স্বীকার করে নেয়। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কৃতিত্ব ছিল জেনকিনসের। নিজ পছন্দমত রাজা নির্বাচনের অধিকার কোম্পানী লাভ করল যা কোম্পানীর কোচবিহার রাজ্যের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণের সূচনা করেছিল।

তবে ভূখণ্ড জয় না করেও রাজা জয় করে রাজ্য জয়ের যে পরিকল্পনা জেনকিনস শুরু করেছিলেন সেই নীতির পূর্ণতা শিবেন্দ্রনারায়ণ ও নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে লাভ করেনি। সে নীতির পূর্ণতা লাভ করেছিল (অর্থাৎ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের সার্বিক বিষয়ে) নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে। এই সময় থেকেই কোচবিহার রাজ্যের কোম্পানীর কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতার যুগ শুরু হয়েছিল। অবশ্য এই বশ্যতার মূল্যেই কোচবিহার রাজ্য তার পুরাতন কাঠামো থেকে পশ্চিমী আধুনিকতার যুগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। **রাজোপাখ্যান** ঃ জয়নাথ মুন্সী (সম্পাদনাঃ বিশ্বনাথ দাস ১৯৮৫)

২। **কোচবিহারের ইতিহাস**, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনাঃ ডঃ নৃপেন পাল ১৯৮৭)

৩। **কোচবিহারের ইতিহাস**, খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহমদ, ১৯৩৬

৪। **দি রিপোর্ট অব মোরাঙ, সিকিম এণ্ড কোচবিহার**, (জেনকিনস রিপোর্ট), কলিকাতা ১৮৫১

৫। **সিলেক্ট রেকর্ডস**, ভল্যুম এক, দুই, ১৮৮২

৬। **স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল**, হান্টার, ভলুম দশ, পুনঃমুদ্রণ ১৯৭৪

৭। **মডার্নাইজেশন অফ এ প্রিন্সলি স্টেট কোচবিহার আন্ডার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬৩-১৯১১)**, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, ডঃ কমলেশ চন্দ্র দাস (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯)

ঔপনিবেশকতাবাদ ও কোচবিহার বিবাহ — একটি সমীক্ষা

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

কোচরা ভারতের আদিবাসীদেব একটি অংশ যারা ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্ন ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বসবাস শুরু করে। একসময়ে তারা সমগ্র উত্তরপূর্বে ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই রাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ইংবাজ সংস্পর্শে আসতে থাকে।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর ১৭৭২ সন পর্যন্ত চারজন স্বাধীন নৃপতি কোচবিহারে রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন শেষ স্বাধীন নৃপতি। এরপর সিংহাসনে বসেন নাবালক ধরেন্দ্রনারায়ণ। এঁর নাবালকত্বর সুযোগ নিয়ে ভুটিয়াগণ বারবার কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। শেষ ১৭৭২ সালে রাজধানী কোচবিহার অধিকার করে নেয়। অনন্যোপায় নাবালক মহারাজার নাজিরদেও (প্রধান সেনাপতি) মহারাজের পক্ষে ১৭৭২ সালে বাংলার তৎকালীন শাসক ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৭৩ সালে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২] এই চুক্তির ফলে ইংরাজ সহাযতায় কোচবিহার রাজ্য ভুটিয়াদের কবল মুক্ত হয়। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে কোচবিহার রাজাকে প্রতি বছর করস্বরূপ অর্ধেক রাজস্ব কোম্পানীকে দিতে স্বীকৃত হতে হয়েছে।[৩]

কোচবিহার নিজস্ব সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলে ইংরেজরা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। এর অন্যতম কারণ এই রাজ্যের ভৌগোলিক গুরুত্ব। ইংরেজরা কোচবিহারকে Buffer State হিসেবে ব্যবহার করত। ভুটান ও নেপালের সঙ্গে ইংরাজ বিরোধ থাকার ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোচ-ভুটিয়া যুদ্ধ, ইংরেজ কোম্পানীর সামনে এই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দেয়। ১৭৭৩ সালের চুক্তিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সীমান্তবর্তী এই রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোম্পানীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রধান কারণ কোম্পানী চেয়েছিল এই রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইংরেজশাসিত রাজ্যের ন্যায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করতে। সামন্ততান্ত্রিক এই রাজ্য পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে পারেনি।

কোম্পানির এই প্রচেষ্টা খুব সহজে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভবপর হয়নি। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং প্রতিপত্তির ফলে ইংরেজ শাসনের প্রভাব এখানে বাধা পায়। শেষ স্বাধীন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসকের ন্যায় কোচবিহারের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা কবতে থাকেন। এরপর দুর্বল রাজাদের সময়ে ক্রমশ শাসন শিথিল হয়ে আসে এবং ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৩ সালে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর, দশমাস বয়সে নৃপেন্দ্রনারায়ণ উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত হন।

নাবালক রাজার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকেন তিনজন রানী, কিন্তু রাজপ্রাসাদে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজ সরকার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইংরেজ অভিপ্রেত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম হয়। এই রাজ্যের জন্য ইংরেজ নীতিগুলি নির্দিষ্টভাবে জানা যায়, ১৮৬৪-১৮৬৯ সালের Tabboys Wheeler-এর বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে। এতে বলা হয় কর্নেল হটন হবেন কোচবিহারের নূতন কমিশনার। পুলিশী প্রশাসনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিধি গ্রহণ করতে বলা হয়। এদিকে ইংরেজরা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনিই প্রথম কোচবিহারের রাজা যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজরা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিবিভাষিত বাঙালী সমাজের সংস্পর্শে আনতে চেয়েছিলেন। ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা এবং বুদ্ধিবিভাষিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে ১৮৭৮ সালে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়।[৪]

এই সময়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হল ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে ও উৎসাহে Coochbehar Marriage Episode। কেশবচন্দ্রের বিরাট জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা এই বিবাহ মারফত কোচবিহারে তাদের রাজনৈতিক সীমান্ত অবশ্যই সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু বাঙালীর কাছে রাজবংশ ও কোচবিহার রাজ্য আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়ে যায়। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় Marriage diplomacy-র এটাই সর্বশেষ সফল উদাহরণ।

এবার কোচবিহার বিবাহ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ব্যবস্থাপক সভায় বিবাহ বিল উপস্থাপিত করা হয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ১৮৭২ সালে তা আইনে পরিণত হয়, Act III of 1872 রূপে। প্রস্তাবিত বিবাহ বিল ব্রাহ্ম সমাজে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মরা চিরাচরিত হিন্দু রীতিনীতির বিরোধী ছিল। হিন্দু সমাজে পুরুষ ও মহিলা সমান অধিকার ভোগ করত না। বিবাহের আগে কন্যার মতামত গ্রাহ্য করা হত না। কেশবচন্দ্রের দলের ব্রাহ্মরা উদার সংস্কার দাবী করলে আদি ব্রাহ্মদের সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হয়। এই সংঘাতের বিষয় সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "Friend of India" আদি ব্রাহ্মদের সমর্থন করে, পক্ষান্তরে Indian Mirror বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে সমর্থন করে।

১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাশ হলে কেশবচন্দ্র একে ভগবতের ইচ্ছা বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় নিজেই ভগবানের নির্দেশ অমান্য করেন। ১৮৭৭ সালে জনসাধারণকে অবাক করে দিয়ে কেশবচন্দ্র সার্কুলার রোডে বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করেন। এর নাম দেন 'লিলি কটেজ'। তারপর উদার হস্তে আসবাবপত্রের জন্য প্রচুর খরচ করে এই গৃহকে উপযুক্ত করে তোলেন যাতে কোচবিহারের রাজকুমার এসে তাঁর কন্যাকে দর্শন করেন।

এর কিছুদিন পর থেকেই গুজব ছড়াতে শুরু করে যে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজার বিবাহ হবে। কন্যার বয়স তখন চৌদ্দও হয়নি এবং মহারাজার বয়স পনেরো। অতএব ১৮৭২ সালের বিবাহ আইন অনুযায়ী এই বিবাহ হতে পারে না। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে অ-ব্রাহ্ম রীতি অনুযায়ী। প্রথম প্রথম অনেকেই এই গুজবে কান দেননি কারণ তাদের কেশব সেনের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্তু ক্রমে তা সোচ্চার হয়ে উঠলে কেশব সেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হয় সঠিক তথ্য জানবার জন্য। আনন্দমোহন বোস তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান আজও পর্যন্ত কিছু ঠিক হয় নি।

১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে সঠিক খবর পাওয়া গেল যে কোচবিহারে বিবাহ স্থির হয়েছে এবং তাতে কতকগুলি নীতি নির্দেশিত হয়েছে। এগুলি হল— (১) বিবাহ এখনই দিতে হবে, কারণ তারপরই মহারাজা বিলাতে লেখাপড়া শিখতে যাবেন। (২) এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে কোচবিহারের রীতি নীতি অনুযায়ী। (৩) কেশব সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন কন্যা সম্প্রদান করবেন এবং কেশব সেন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না যেহেতু তিনি ব্রাহ্ম। (৪) বিবাহে অংশগ্রহণ করবে কোচবিহারের পুরোহিতরা এবং এখানে কোন ব্রাহ্ম আচার-অনুষ্ঠান পালিত হবে না।

এই সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী আবার কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র কিছুতেই তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন না।[৫] এই ঘটনার তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী এবং ৯ই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হল যে বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। আনন্দমোহন বোস, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ, শশিপদ ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ২৩ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্ম স্বাক্ষরিত এই প্রতিবাদ পত্র কেশবচন্দ্র একবার পড়েও দেখেন নি। এই সংবাদ জানার পর বিভিন্ন সমাজ থেকে এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার সমাজ থেকে প্রতিবাদপত্র ব্রাহ্ম সমাজে এসে উপস্থিত হতে শুরু করে। ৮০টি সমাজের মধ্যে ৫০টি সমাজ তাঁদের অমত জানিয়ে দেয়, ৩টি সমাজ এই বিবাহের পক্ষে মত দেয়, ৪টি সমাজ সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষমতা জানান এবং বাকিরা তাদের মতামত জানায়নি।

এই পরিস্থিতিতে কোচবিহার বিবাহের পক্ষে দৃঢ় থেকে কেশবচন্দ্র তাঁর কন্যার বিবাহের দিকে এগিয়ে যান। পাত্রপক্ষ কলকাতায় এসে সুনীতিদেবীকে আশীর্বাদ করে যান। এরপর ইণ্ডিয়ান মিরর থেকে জানা যায় বিবাহের সব ব্যবস্থাই এগিয়ে চলে। ব্রাহ্ম নেতারা কেশবচন্দ্রকে প্রতিবাদপত্র পাঠান। তিনি উত্তরে জানান বিবাহ তিনি দেবেন এবং অপর কেহ যদি এই কাজ করে তাহলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ

করবেন।[৬] কেশবচন্দ্র নিজ কন্যার বিবাহের ব্যাপারকে ঈশ্বরের আদেশ বলে যতই জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন কেশবচন্দ্রের ইংরাজ প্রীতি ও ইংরাজ সাহায্য লাভ চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত কেশবকন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কোচবিহার মহারাজার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

অবশ্য এই বিবাহের ফলে সমাজে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল কারণ হল — কোচবিহার রাজপরিবার প্রাচীনপন্থায় বিশ্বাসী। প্রগতি বিরোধী এবং বহুবিবাহ রাজপরিবারে প্রচলিত প্রথা। এছাড়া পাত্রপাত্রীও ব্রাহ্মবিবাহ আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু বহু আলোচিত এই ব্রাহ্ম বিবাহ কোচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলনে ক্ষতি স্বীকার করে। মহারাজা স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেনের মত মহাপুরুষের নিকটসান্নিধ্যে আসতে পরেছিলেন। তাঁর উন্নত জীবন ধারা এবং উদার ধর্মভাব তরুণ মহারাজার মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ফলে তিনি চিরকাল ধর্মকর্মে উৎসাহী ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র সুদূর কোচবিহার রাজ্যে এই সমাজের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন।[৭]

কোচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ শুরু হয় ১৮৬৮ সালের পরে। এই রাজ্যের দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত ব্রাহ্মধর্মী ছিলেন।[৮] তিনি ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, আনন্দমোহন ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। সুনীতিদেবীর বিবাহে সারা বাংলাদেশের ব্রাহ্মরা যেভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন তার সঙ্গে কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজ হাত মিলিয়েছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত এই রাজ্যের ব্রাহ্মসমাজেও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কোচবিহারের ব্রাহ্মরা নববিধানের অনুগামী হন। রাজ্যের রাজা-রানীর চেষ্টায় নববিধান সমাজ রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। এই রাজ্যে নববিধান সমাজের উপাসনার জন্য সরকারী ব্যয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয়।[৯]

কেশবচন্দ্র শুধুমাত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণকে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, অপর কন্যা সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে বিবাহ দেন ভ্রাতা গজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে। তিনিও নববিধান সমাজের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। গজেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্ম আদর্শ অনুসারে গড়ে তুলেছিলেন ব্রাহ্মপল্লী, ব্রাহ্মবোর্ডিং এবং কেশব আশ্রম।[১০] এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে তিনি অনগ্রসর কোচরাজ্যে ব্রাহ্ম আলোকবর্তিকা বহন করেছেন।

এই ব্রাহ্মবিবাহের অনেকগুলি সুফল কোচবিহারে লক্ষ্য করা যায়। কোচবিহার ছিল একটি অনগ্রসর রাজ্য। রাজসভায় ষড়যন্ত্র ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এ রাজ্যে শিক্ষার প্রসার ততটা ঘটেনি। সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রথা এই রাজ্যে বহুল প্রচলিত ছিল।[১১] ব্রাহ্ম সমাজের মূল লক্ষ্যগুলিকে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাস্তবে রূপায়ণ করতে চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে অজ্ঞতা, গোঁড়ামী, কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা করেছেন। রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

রাজ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থাপিত হয়েছিল Victoria College যেখানে M. A. ও Law পড়ানো হত। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এই কলেজের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।

সবকাবি ব্যযে এখানকাব অনেক ছাত্র ভাবতেব বাইবেও উচ্চশিক্ষা লাভেব সুযোগ পেযেছে।

ব্রাহ্ম আন্দোলনেব প্রভাব বাজ্যেব প্রশাসনেও লক্ষণীয়। ধর্মীয় প্রথাগত সংকীর্ণতাব অবসান ঘটিযে মহাবাজ শাসন ব্যবস্থায সর্বধর্মেব জনসাধাবণকে সমান অধিকাব দিযেছেন।' ' তাঁব চেষ্টায সুনীতিদেবীব সাহায্যে কোচবিহাবে প্রথাগত পর্দা ব্যবহাবেব অবসান ঘটে। প্রচলিত বাজবংশেব বহুবিবাহ প্রথাকে অস্বীকাব কবেছিলেন নৃপেন্দ্রনাবাযণ। এই নীতিকে বাজ্যেব মধ্যে প্রচাব কবতেও তিনি উদ্যোগী হযেছিলেন।'`৩'

উপবিউক্ত আলোচনা থেকে একথা পবিষ্কাব, কেশবকন্যা সুনীতিদেবীব সঙ্গে কোচবিহাবেব মহাবাজাব বিবাহ দুদিক দিযেই সফল হযেছিল। প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র সেন তথা বাংলাব জনসাধাবণ কোচবিহাব বাজবাড়ীব সঙ্গে আত্মীযতাব সূত্রে আবদ্ধ হযেছিলেন। এব ফলশ্রুতি হিসাবে বাহ্ম সমাজেব বিস্তাব এবং কোচবিহাব বাজ্যেব আধুনিকীকবণ সম্ভব হযেছিল। ব্রাহ্ম সংস্কাব আন্দোলন কোচবিহাবে প্রভাব বিস্তাব কবে সামাজিক, ধর্মীয ও প্রশাসনিক কাঠামোব অনেক পবিবর্তন সাধন কবেছিল।

দ্বিতীযতঃ কেশবচন্দ্র সেন তথা বাঙালী মধ্যবিত্তকে ইংবাজ সবকাব সন্তুষ্ট কবতে সক্ষম হযেছিল। কোচবিহাব বাজ্য সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সবকাবেব কুক্ষীগত হযেছিল। বৃটিশ সবকাব কবদ বাজ্যে নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় কবে ভুটান ও উত্তব পূর্ব সীমান্তকে সুবক্ষিত কবেছিল। Marriage diplomacy ব এখানেই সার্থকতা।

সূত্র নির্দেশ

১। Nath D — **The Koches in the North East : Their role in the nation building process** pp-114
২। দাস কমলেশ **স্মৃতিব শহব কোচবিহাব** পৃঃ ১২৭
৩। Ganguly K C **Settlement Report of Coochbehar,** (1913 27) pp 56
৪। Sunity Devi **An autobiography of Indian Princess** 1921 pp - 24
৫। Sastri, S N **History of the Brahmo Samaj,** pp-174
৬। Majumdar P C P 205
৭। দাস কমলেশ **ইতিহাস-অনুসন্ধান** ২ পৃঃ ২২৬।
৮। Campbell A C — **Glimpses of Bengal** Cal 1907 pp-300
৯। Kopf D The Brahmo Samaj and the Shaping of Modern Indian Mind p - 329
১০। সাবিত্রী দেবী, **স্বর্গত কুমার গজেন্দ্রনাবায়ণ,** পৃ° ৩৩।
১১। Sunity Devi **Autobiography of an Indian Princess,** পৃ° ৭২।
১২। The Coochbehar Select Records - Vol I, 1882
১৩। Sunity Devi op. cit. pp 53

রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে শিক্ষার প্রসার

নীলাংশুশেখর দাস

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর এক সময়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। নানা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যটি বেশ কয়েকবার রাজ্যের নাম ও রাজধানীর অবস্থান পরিবর্তন করে অতি আধুনিককাল পর্যন্ত টিকেছিল। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা চন্দন তুর্কি সুলতান হোসেন শাহকে পরাস্ত করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন[১]। এই রাজ্য প্রথমে বেহার ও পরবর্তীতে কোচবিহার রাজ্য নামে পরিচিত হয়। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশ সগৌরবে রাজত্ব করে গেছে[২]। দেশীয় রাজ্য হিসেবে 'কোচবিহার' ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' করদ রাজ্যরূপে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল[৩]। অবশেষে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার দেশীয় রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়[৪]।

কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রজা-সাধারণের শিক্ষালাভের সুযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এই রাজ্যে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যচর্চার একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। যে সব রাজ্য বাংলার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে কোচবিহার সুনাম অর্জন করেছে। কোচবিহার রাজ্যে সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ এখানকার সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে। পুরাণাদি অনুবাদও কোচবিহারেই বেশী।[৫]

এই রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি মহারাজা নরনারায়ণের রাজসভা (১৫৩৩ খ্রীঃ - ১৫৮৭ খ্রীঃ) বহু জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা অলংকৃত ছিল। মহারাজ নরনারায়ণের চেষ্টায় কামরূপ প্রদেশে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল এবং সেজন্য এখনও তিনি পূর্ব ভারতের 'বিক্রমাদিত্য' নামে অভিহিত। "আকবরনামার' উল্লেখ আছে যে 'মাল গোঁসাই' (মল্লদেব অর্থাৎ নরনারায়ণ) প্রজ্ঞাবান এবং অত্যুৎকৃষ্ট গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন[৬]। তাঁর রাজত্বকালেই কোচবিহার রাজসভার পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য সভাপণ্ডিত হিসাবে যোগদান করেছিলেন। মহারাজার আদেশেই তিনি বিখ্যাত ব্যাকরণ 'প্রয়োগ রত্নমালা' রচনা করেছিলেন।[৭] [illegible] [illegible] রচনা করেছিলেন আঞ্চলিক

ভাষায় 'ভাগবত পুরাণ'। এছাড়াও রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ পুরাণের পদ্যানুবাদ। মহারাজ নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় আসামের বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেব 'সীতা স্বয়ম্বর' নাটক, 'কৃষ্ণরত্নাবলী' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেছিলেন[৮]।

নরনারায়ণের পব এই রাজ্যের অন্যান্য মহারাজারাও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁরাও পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মহারাজ লক্ষ্মীনাবায়ণেব রাজত্বকালে (১৫৮৮-১৬২১ খ্রীঃ) আসামের অন্যতম ধর্মপ্রচারক মাধবদেব কোচবিহারে এসেছিলেন এবং রাজপৃষ্ঠপোষকতায় 'ভক্তিরত্নাবলী', 'শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য' 'আদিকাণ্ড' নামে গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন[৯]। এইভাবে কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়। এই অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলি এখনও কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। কোচবিহাব রাজদরবাবে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সংখ্যা প্রায় একশত। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন পণ্ডিতব্যক্তি লিখিত গ্রন্থগুলি কোচবিহার রাজ্যকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাত্রা দান করেছিল। কিন্তু এ তো হলো রাজদরবারে সাহিত্যচর্চার ইতিহাস। সাধারণ প্রজাদের শিক্ষালাভের জন্য মহারাজাদেব উদ্যোগ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোন দৃষ্টান্ত তখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। রাজপরিবাবের সন্তানবাও শিক্ষালাভ করতেন। কোচবিহার রাজ্যের বাইরে গিয়েও শিক্ষালাভ করতেন। কিন্তু সাধারণ প্রজাদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এখানেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় যে, কোচবিহার রাজদরবার সাহিত্যচর্চাব এক পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ প্রজাদের শিক্ষালাভের সুযোগ তখন ছিল না। সাধারণ প্রজাদের শিক্ষার সুযোগ ও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যায়তন গড়ে ওঠে আরও অনেক পরে।

কোচবিহার দেশীয় রাজ্য 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হওযার সময় থেকে কোচবিহারের শিক্ষাসম্পর্কিত কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ রাজ্যে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময় পর্যন্ত (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীঃ) সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল। হরেন্দ্রনারায়ণের পর মহরাজা নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৪৭-১৮৬৩ খ্রীঃ) বাংলা শিক্ষার জন্য কোচবিহার শহরে ১৮৫৭ সালে সর্বপ্রথম একটি Vernacular School প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[১০]। এই স্কুল স্থাপনের পর থেকেই কোচবিহার রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস শুরু হয়। রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ প্রজাদের শিক্ষালাভের সুযোগ যদিও অনেক পরে শুরু হয়, তবু লক্ষ্য করা যায় যে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। Vernacular School স্থাপনের দু'বছরের মধ্যেই ১৮৫৯ সালে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার রাজ্যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন 'জেঙ্কিন্স স্কুল'। এই স্কুল স্থাপনের সময় কোচবিহার রাজ্যে ইংরেজ রেসিডেন্ট কর্নেল জেঙ্কিন্স মহারাজাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। এমনকি মহারাজা নাবালক থাকাকালীন তাঁর রাজ্যের সুযোগ্য পরিচালনার জন্য রাজকোষ থেকে মঞ্জুর করা

সমস্ত অর্থই কর্নেল জেঙ্কিন্স এই বিদ্যালয়ে দান করেছিলেন [১১]। এই 'জেঙ্কিন্স স্কুল' কোচবিহার রাজ্যে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমে Vernacular School এবং পরে জেঙ্কিন্স স্কুল মূলত রাজধানী শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাব কথা ভেবে ইংরেজ রেসিডেন্ট Colonel Haughton এক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আরও তিনটি Vernacular School প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৬৪-৬৫)। প্রায় ১৩৫ বৎসর পূর্বে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল স্থাপন এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে কোচবিহারের মহারাজার আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শুধুমাত্র স্কুল স্থাপন করলেই যথাযথভাবে শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না। স্কুলগুলির সঠিক পরিচালনার জন্যও মহাবাজার যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ বাবু রামচন্দ্র ঘোষ নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দানের জন্য কোচবিহার শহরে তৈবী হল একটি ছাত্রাবাস। এখানে শিক্ষার্থীরা বিনা খরচে থাকা খাওয়ার সুযোগ পেতেন।[১২] এইভাবে কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটতে শুরু করে। এরপর মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষায় বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

কোচবিহাব রাজ্যে মহারাজা নৃপেন্দ্রনাবায়ণের রাজত্বকালকে শিক্ষাব্যবস্থার স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা বললে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালকে কোচবিহার রাজ্যে 'নবজাগরণের যুগ' বলা হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, রাজ্যশাসন, বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সবক্ষেত্রেই তাঁর রাজত্বকাল বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। এই নবজাগরণের কথা এখানে আলোচনা না করে শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেই আলোকপাত করছি। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ১৮৬৩ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। আবার কোচবিহারের ইতিহাসে ১৮৬৪ সালকে একটি যুগান্তকারী বৎসর বলে মনে করা হয়। এই সময়ে কোচবিহার রাজ্যে বৃটিশ কমিশনার 'কর্নেল হটন' ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের জন্য বহুবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। হটন সাহেবের তত্ত্বাবধানে এবং রাজপৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় এক ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। ফলে দেখা যায় যে ১৮৬৫ সালের মধ্যে কোচবিহার রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে ৫৮টি স্কুল স্থাপিত হয়। স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ৫টি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া একটি পারশী ও তিনটি সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠা হয়[১৩]। ১৮৭৫-৭৬ সালের Annual Administrative Report এ দেখা যায় যে এ রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধে ছিল যে এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের কোন অভাব ছিল না। পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে দেখা যায়, '১৮৬৫ সালে রাজসরকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন ৭০২২ টাকা। মাত্র ৫ বৎসরের ব্যবধানে শিক্ষার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২১,৫১৫ টাকা ১৫ আনা ব্যয় করতেন। পাশাপাশি তখন থেকেই বাংলাদেশের বিশিষ্ট

শিক্ষাবিদদের দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়। ফলস্বরূপ কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার উন্নতি ঘটে এবং অল্পদিনের মধ্যেই শহরে ও গ্রামে অনেকগুলি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এত দ্রুত অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকায় পরিচালনগত দিক দিয়েও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। Local Committee-গুলির পক্ষে বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় ১৮৭০ সালে রাজ-সরকার সুষ্ঠু শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টি করেন। এই বিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়কের উপর সরকার শিক্ষার উন্নতির জন্য পরামর্শ দান, বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন[১৪]। ঠিক তখনই 'রেভারেন্ড আর. রবিনসন শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার সময় থেকে কোচবিহার রাজ্যে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা একটি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে চলে আসে। শহরে ও গ্রামে ক্রমে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপযুক্ত শিক্ষকের চাহিদা বাড়তে শুরু করে। ফলে ১৮৭৩ সালে কোচবিহারে একটি 'গুরু ট্রেনিং স্কুল' স্থাপিত হয়[১৫]। রবিনসন গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে কোচবিহারে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদেব চেষ্টায় কোচবিহাব রাজ্যো বিশেয করে গ্রামাঞ্চলে আরও অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষাব গুণগত মান কতটা বেড়েছিল সে বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় যে রাজ্যো সাধারণ প্রজাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিস্তারে নারী শিক্ষার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৮৭৪-৭৫ সালের Annual Administrative Report-এ কোচবিহার রাজ্যে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৫ সালে কোচবিহারে যখন মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩৫ তখন বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৩টি। নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা না করলেও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোচবিহার রাজ্যে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল 'সুনীতি একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৮১ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার শহরে বালিকাদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন 'সুনীতি কলেজ'[১৬]। পরবর্তীতে এই সুনীতি কলেজ সুনীতি একাডেমী নামে পরিচিত হয়। মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম রাজমহীষী সুনীতিদেবীর নামে হওয়ারও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করছি না।

বিদ্যালয় স্থাপন ও সাধারাণ প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য রাজসরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও লক্ষণীয় বিষয় হল যে তখনও পর্যন্ত কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে উচ্চশিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার জোয়ার তখন বৃহত্তর বাংলাদেশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। গড়ে উঠেছিল অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজমহীষী সুনীতিদেবী ছিলেন কেশবকন্যা, উপরন্তু ব্রাহ্ম। ফলে অস্বীকার করার উপায়

নেই যে, কোচবিহার রাজ্যে কলকাতার ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। এটাই যে শুধু কারণ, তা নয়। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনও তখন যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। ফলে কোচবিহার রাজ্যের শিক্ষা কাঠামোতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। উচ্চশিক্ষার জন্য মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' (বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করেন[১৭]। এই কলেজে এম. এ. ও ল (আইন) পড়াব ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে এই কলেজের ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হতো না। ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন Mr. Goodlay, M. A. (১৮৮৮)। পরবর্তী কয়েকজন অধ্যক্ষ হলেন যথাক্রমে — Mr. W. H. Wood, M. A. F. S. (১৮৮৯-১৮৯২), Mr. C. F. Dela Posses, B.A. (১৮৯২-১৮৯৬)। এরপর বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৯৬ সালে এই ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের নামেই বর্তমান কলেজটি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ নামে পরিচিত।

এরপর শুরু হয় কোচবিহার রাজ্যের মফঃস্বল শহরগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার উদ্যোগ। ১৮৯০ সালে মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা এবং দিনহাটা মহকুমার প্রজাসাধারণ তাঁদের মহকুমা শহরে Entrance School স্থাপন করবার জন্য ২৫,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। ঐ বছরই জুলাই মাসে মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা মহকুমা শহবে একটি করে Entrance School স্থাপিত হয় এবং এই স্কুলগুলি নিয়মিত রাজসরকারের অনুদান পেতে শুরু করে[১৮]। তখন মিঃ লোইস কোচবিহার রাজ্যে সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনিও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ফলে ১৮৯২ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে কোচবিহার রাজ্যে মোট ৩৫৭টি স্কুল স্থাপিত হয় এবং শিক্ষার জন্য রাজ-সরকারের বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তে শুরু করে[১৯]। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে আমরা যদি ১৯৩৩-৩৪ সালের সরকারি রিপোর্ট লক্ষ্য করি তবে দেখা যায় যে সে সময়ে কোচবিহার রাজ্যে High English School ছিল ৫টি, Middle English School ছিল ২৫টি, Upper Primary School ৪৫টি, Lower Primary School ২১৯টি, Night School ৪টি, মক্তব ১৮টি ও কলেজ ১টি। সব মিলে ঐ সময়ে ৩৫০টির ও বেশী স্কুল ছিল। এরপর যদি আমরা ১৯৩৮-৩৯ সালের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করি তবে দেখা যায় যে, সে সময়ে স্কুলের সংখ্যা ছিল মোট ৪৩৭টি। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭,৯১৩ জন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে কোচবিহার স্টেট কাউন্সিল শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা একটি 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গ্রহণ করে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পালা। ফলে 'স্টেট কাউন্সিলের' পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল না।

সূত্র নির্দেশ

১। **কোচবিহারের ইতিহাস** — শ্রী হেমন্তকুমার রায়বর্মা এম. এ. বি. এল।
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃঃ ১৩৪

২। **কোচবিহারের ইতিহাস** — ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদনাঃ ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল, পৃঃ ১৭৯।

৩। **কোচবিহার পরিক্রমা** ঃ সম্পাদনা ঃ কৃষ্ণেন্দু দে ও অন্যান্য, পৃঃ ৩০।

৪। **কোচবিহারের ইতিহাস** — ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদনা ঃ ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল, পৃঃ ১৭৯।

৫। **বাংলাদেশের ইতিহাস**, মধ্যযুগ — ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৫৯।

৬। **মধুপর্ণী**, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৩৯৬, সম্পাদনাঃ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।
কোচবিহার রাজপরিবারে সাহিত্যচর্চা - ডঃ মৃণালকান্তি দাস পৃঃ ২৪৭।

৭। **রাজোপাখ্যান** — জয়নাথ মুন্সী। সম্পাদনা ঃ বিশ্বনাথ দাস। পৃ. ২৭।

৮। **কোচবিহারের ইতিহাস** — (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮) হেমন্তকুমার রায়বর্মা।

৯। **ঐ**

১০। **Administrative Reports of Coochbehar State,** Relevent years

১১। **ঐ**

১২। **কোচবিহার পরিক্রমা** — সম্পাদনা কৃষ্ণেন্দু দে ও অন্যান্য। দ্বিতীয় অধ্যায়, **শিক্ষার একাল ও সেকাল** — কৃষ্ণেন্দু দে। পৃঃ ৪৩

১৩। **Annual Administrative Report** Relevent years, of Coochbehar State.

১৪। **কোচবিহার পরিক্রমা** — সম্পাদনাঃ কৃষ্ণেন্দু দে ও অন্যান্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, **শিক্ষার একাল ও সেকাল**, কৃষ্ণেন্দু দে।

১৫। **ঐ**।

১৬। **শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা**। সুনীতি একাডেমী।

১৭। **আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ— শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ**।

১৮। **মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল** — শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ।

১৯। **Annual Administrative Report** — Relevent years of Coochbehar State.

মেট্রোপলিটন ও মফস্বল
উনিশ শতকে মফঃস্বল ব্রাহ্ম সমাজগুলির কার্যবিধি

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতা ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণাব প্রভাবে জাত এদেশের আধুনিকীকরণের (modernizatıon) যে বিপুল পবীক্ষা-নিরীক্ষা অনুসৃত হয়, যে সব গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে এর প্রভাব অনুভব কবে বা নিজেবা এতে হাত লাগায়— ব্রাহ্মবা তাব মধ্যে অন্যতম। ইতিহাস সংসদেব পূর্ববর্তী অধিবেশন সমূহে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা গেছে। বামমোহন, কেশব সেন বা কোচবিহার বিবাহ নিয়ে পৌনঃপুনিক গতানুগতিক আলাপ-আলোচনার গভীরে গিয়ে সম্ভবত এটাই আমাদের অধিকতব ফলপ্রদ আকর্ষণীয় পর্যালোচনাব ক্ষেত্র হতে পারে।

এই আধুনিকায়নেব অভিজ্ঞতা যে কত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে তা ব্রাহ্মদের বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটে দেখলে স্পষ্ট হয়। ঐ আধুনিকায়নকে উপজীব্য করে যে সুবিস্তৃত সাহিত্য ঐতিহাসিকবা প্রস্তুত করেছেন — তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে ঐগুলি অত্যন্ত মাত্রায় কলকাতাকেন্দ্রিক। নিঃসন্দেহে ১৯ শতকেব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পবম্পরায় কলকাতা শহবের বহু ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তা বলে ১৯ শতকের বাঙালীদের সামাজিক সংস্কৃতি কার্যকলাপেব সমার্থক হতে পারে না। কলকাতাব বাইরে বাঙলা ও বাঙালীদের একটা ভূমিকা ছিল — আব তা স্থান, কাল ও পাত্রগতভাবে মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না।

ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৯১ সালের ব্রাহ্ম আদমসুমারীতে যেখানে কলকাতায় বসবাসকারী ব্রাহ্মদের সংখ্যা ১৩২০ জন সেখানে বাংলাদেশের অন্যত্র বসবাসকারী ব্রাহ্মদেব সংখ্যা ১২৮৮ জন দেখানো হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের বিস্তৃত চালচিত্রটি বিশ্লেষণের সূত্রে দেখা যাবে যে ব্রাহ্ম ধর্মের অভ্যুদয় কলকাতায়, এর বিশিষ্ট প্রবক্তারাও কলকাতায় বসেই নিজেদের মূল চিন্তাসূত্রগুলি পরিস্ফুট করেন, এর মধ্যেকার দুটি বিভাজনও উদ্ভূত হয় কলকাতায়। ব্রাহ্মদের উদ্দিষ্ট কী প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি এখানেই পরিকল্পিত ও বহুলাংশে রূপায়িত হয়। এদের সামাজিক আদর্শের অনুসারী অভিনব ব্যবস্থা যথাসঙ্গত সভা ভারত আশ্রম কি সাধনাশ্রম এখানেই সংগঠিত হয়। আর মফঃস্বলের ব্রাহ্মদের ওপর তাদের কলকাতার সংস্থাগুলির প্রভাব এমনই ছিল যে এর প্রতিটিই কোনো না কোনোভাবে মফঃস্বলের এক বা একাধিক শাখা সমাজ কর্তৃক অনুকরণ করা অনুসৃত হয়েছিল। কলকাতা ছিল শীর্ষস্থানীয় স্থাপিত মডেল যাকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নির্দেশ করা হত।

কলকাতা থেকে মফঃস্বল অঞ্চলে ব্রাহ্ম সমাজের বিস্তৃতির যোগসূত্র নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রাহ্ম সমাজেরই ঐতিহাসিক শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন যে প্রতিটি সংস্কারাত্মক ধর্মের মতো ব্রাহ্ম ধর্মও প্রথমাবধি সুপ্রচারিত হবার প্রেরণা নিয়েই যাত্রা শুরু করে।[১] এখন প্রয়োজন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির একটা সংজ্ঞা। কীভাবে ঐ সংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল তা অনুসরণ করে এবং কীভাবে কোন পরিস্থিতির মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ কলকাতার বাইরে পা বাড়ায় তা বুঝলে আমাদের কাছে বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হবে।

রামমোহনের আমলেই (১৮১৫-৩০) ব্রাহ্ম কার্যকলাপ কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে পা বাড়ায়। কিন্তু ব্রাহ্ম আদর্শ তখন সবে রূপ নিতে শুরু করেছে। তাই বিধিবদ্ধভাবে আদর্শ প্রচার এর কাজের তালিকায় পড়ত না তখন। তবু তখনই অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়াতে[২] ও নন্দকিশোর বসু বোড়ালে[৩] যখন ঐ জাতীয় প্রকাশ্য উপাসনা শুরু করেন — তখন তাঁদের কেউ একাজে প্রণোদিত করেনি বা তাঁরা ঐ কাজের জন্য কলকাতার মুখাপেক্ষী ছিলেন না কোনো ভাবে—আর তাঁদের কাজের দ্বারা যা গড়ে উঠেছিল তাকে ঢাকা, ময়মনসিংহ বা বরিশালে যে অর্থে স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে উঠেছিল এমনটা আমরা স্পষ্ট করে বলে উঠতে পারি না।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় যে স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে কয়েক ধরনের পদ্ধতিগত সাজুয্য দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথমতঃ উল্লেখ করা যায় কলকাতার কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্ম নেতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত সমাজগুলির কথা। দ্বিতীয়তঃ সমাজমনস্ক একদল লোক, কোনো ব্রাহ্ম নেতার বক্তৃতা বা লেখার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ঐ জাতীয় উপাসনার জন্য স্থানীয়ভাবে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করে থাকতে পারেন। তৃতীয়তঃ সংবেনদশীল ছাত্র যুবকদের নিজেদের স্থায়ী আবাস অর্থাৎ দেশের বাড়ীঘর ছেড়ে কলকাতার বসবাস বা ভ্রমণকালে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে একটি স্থানীয় সমাজ স্থাপন করতে দেখা যায়। এমনও দেখা গেছে যে একটি অঞ্চলের লোকেরা সংলগ্ন স্থানীয় কোন সমাজে বা সেখানকার ব্রাহ্মদের কার্যকারণ সম্বন্ধে জেনে বা শুনে কলকাতায় যোগযোগ করে স্থানীয়ভাবে নিজেদের অঞ্চলে একটি সমাজ স্থাপন করেছেন। সর্বশেষে বলা যায় যে মফঃস্বলে ভ্রমণরত ব্রাহ্ম প্রচারকরা কার্যব্যপোদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারের সূত্রে কোনো সমাজ স্থাপন করতেই পারেন।

প্রথমোক্ত পথে স্থানীয় সমাজ স্থাপনের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বর্ধমান (আশ্বিন ১৮৪৮), কৃষ্ণনগর[৪] (১৮৪৪), জগদ্দল (১৮৫২), খিদিরপুর (১৮৫৩), ডুমুরদহ (১৮৫৩), ত্রিপুরা (১৮৫৪) এবং ভবানীপুরে[৫] দুটি সমউদ্দেশ্যসাধক সংস্থা স্থাপিত হয়। এদের তিনি আর্থিক, নৈতিক ও কার্যকরীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার দ্বারা তারা[৬] অনেক প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। অপরদিকে কিন্তু ঐ সমাজগুলির স্থাপনের পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই স্থাপয়িতাদের তীব্র আন্তরিক তাগিদ অনুভূত হয় না। যেমন বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের সমাজ দুটির কথা ধরা যাক। দু'ক্ষেত্রেই স্থানীয় রাজারা নিজেদের রাজবাড়ির

মধ্যে এক একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু স্থাপয়িতাদের উৎসাহের অভাবহেতু এগুলি প্রাণহীন হয়ে পড়ে[৭]। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ভ্রাম্যমাণ প্রচারকারী নিযুক্ত করেন। লালা হাজারীলালের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ইনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে লোকেদের ব্রাহ্মধর্মের প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করতে প্রণোদিত করতেন। প্রতিটি নবস্বাক্ষরকারী প্রতি মাসিক উপাসনার শেষে ওঁকার চিহ্নিত একটি স্বর্ণঅঙ্গুরী লাভ করতেন আর হাজারীলালকে দেওয়া হত প্রতি ব্যক্তির জন্য এক একটি স্বর্ণমুদ্রা। এইভাবে হাজারীলালের খাতায় ১৮৪৫ সালের মধ্যে প্রায় ৫০০ স্বাক্ষর সঞ্চিত হয়। কিন্তু অর্থ প্রদানের বিনিময়ে স্বাক্ষরকারী সংগ্রহের ঐ পন্থা সুপ্রযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হয়। তবে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার ব্যবস্থা বহাল থাকে। গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যে উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৯] তখন উপবীত পরিত্যাগ করা হত। পরে তা পুর্নগ্রহণ করা যেত।[১০] প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রবর্তক প্রতিস্বাক্ষর করতেন।[১১] তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনও এই দিকে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম একটি পদক্ষেপ। এই পাঠশালার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মপ্রচার ও প্রচারকদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা[১২] নিয়েছিল। রেলপথ নির্মাণের পূর্বে বা আদি পর্বে যখন দ্রুত গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল না এবং সহজে উদ্যমী কর্মব্রতী প্রচারক পাওয়া সহজসাধ্য ছিল প্রায় দুষ্কর তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ছাপা অক্ষরগুলি ভ্রাম্যমাণ প্রচারকের মুখের প্রচারের চেয়ে বেশী মাত্রায় সক্রিয়ভাবে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ সুবিস্মৃত করে। রমেশচন্দ্র দত্ত মন্তব্য করেছিলেন যে বাংলার সর্বত্র পাঠকরা এর প্রতিটি সংখ্যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া হুগলী, সুখসাগর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাত, মেদিনীপুর, কাশী, ঢাকা, বহরমপুর, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানেও এর গ্রাহক ছিল। এই পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ব্রাহ্মরা তাঁর মতো ক্রমাগত ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি তাদের মনোভঙ্গি বদলে দিতে দ্বিধা করত না।[১৩]

কেশব সেনের আমলে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রসার ও প্রচারের জন্য বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একসূত্রে আবদ্ধ করার ব্যাপকতর প্রয়াস হয়। এ কাজে সঙ্গতসভা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থাটির সভ্যদের খ্রীষ্টিয় আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে মানবসেবা ও সদাচরণীয় ও জীবনের মাধ্যমে পালনীয় কর্তব্যকর্ম বলে বিবেচিত হওয়ায়—এঁরাও খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের আদর্শে ভবিষ্যৎ নিয়ে অকারণে ভাবিত না হয়ে বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, এই দিকে পথ দেখালেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র, তাঁর ব্যাঙ্কের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য আদর্শ প্রচারে ব্রত নিয়ে। ১৮৬৬ সালের প্রথম দিকে ব্রাহ্ম যুবকরা দক্ষিণবঙ্গের ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য চালিয়ে দৃষ্টান্ত রাখলেন। একে পি. কে. সেন 'যুব আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এরপর কৃষ্ণনগরে ভ্রমণকালে কেশব সেন খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে এক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে এই ঘটনা ব্রাহ্ম যুবকদের নিরুৎসাহিত না করে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে। এর ফলস্বরূপ কেশবচন্দ্র

একাদিক্রমে ১২টি ক্ষুদ্র প্রচাব পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যাতে যুবকদের ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণের আবেদনসহ অন্য বিষয়ে পথ নির্দেশ করা হয়। 'ইন্ডিয়ান ইয়ার বুক'-এর হিসাব অনুযায়ী ব্রাহ্মদের সংখ্যা ১৮৬১-তে ১৬০০-তে[১৪] গিয়ে দাঁড়ায়, যাঁরা ছিলেন তখনকার শিক্ষিতদের এক বৃহদাংশ। এমনকি ডঃ ডাফ্, যিনি কোনোভাবেই ব্রাহ্মদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এমন বলা যায় না, তিনিও বলেন যে প্রকাশ্যভাবে দীক্ষিত ব্রাহ্মদের সংখ্যা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৫০০ ও অন্যত্র আংশিক সমর্থক ও আগ্রহীদেব সংখ্যা ছিল শত শত। ১৮৬৪ সালে ধর্মতত্ত্ব জানায় যে ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত একেশ্বরবাদী সংস্থাগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৩০।[১৫]

একটি সুস্থির প্রচার সংস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্ব কেশবচন্দ্রের প্রাপ্য। তাঁর আদর্শে উদ্দীপ্ত যুবকরা গ্রামাঞ্চল ও মফঃস্বল শহরগুলি ঘুরে, বক্তৃতা দিয়ে ও মাসাধিক কাল ধরে প্রচার কর্ম চালিযে ও জনকল্যাণমূলক কাজে হাত লাগান।

কেশবের প্রচাবকার্যের বিশিষ্ট পর্ব উপনীত হয় বম্বে ও মাদ্রাজ ভ্রমণের মাধ্যমে। (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ১৮৬৪)। এই স্থানে তিনি খ্রীস্টান প্রচাবকদের মত সরাসবি জনগণের কাছে না গিয়ে ঐ স্থানেব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁদের মাধ্যমে সভা সমিতি পত্রপত্রিকার দ্বারা পরিচিতি অর্জন কবে তার পরে অগ্রসব হতেন প্রকাশ্য জনসমাবেশে ভাষণ দিতে। ঐ সব স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিব বিষয় নির্বাচনেও সতর্কতা সৃষ্টি না করে। এই ভ্রমণসমূহ একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম প্রচাবকদের ভ্রমণপথ ধরেই প্রবাসী বাঙালীদের আতিথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারক বা নেতাবা ভাবতে কর্মক্ষেত্র প্রসারে অগ্রসর হন। এইভাবেই ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেকার ভাবগত আদানপ্রদানের সূত্রপাত হয়। ও ব্রাহ্ম সমাজ কালক্রমে প্রথম সর্বভারতীয় সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১৬]

কেশবচন্দ্র ও তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের নানা ভ্রমণের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশে ঐ শ্রেণীর লোকদের ১৮৬০-এর দশকে ব্রাহ্ম সমাজে অধিক পরিমাণে যোগদান করতে দেখা যায়। এদের বৃহদংশ আসছিল বিস্তীর্ণ দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে। এদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা ইংরাজী শিক্ষা অর্জন করেছিলেন কোনো প্রাগ্রসর স্কুল বা কলেজ থেকে এবং শিক্ষান্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুবাদে উন্মুক্ত কোনো বৃত্তি (সে শিক্ষকতা বা ওকালতি বা সাংবাদিকতা যাই হোক না কেন) অবলম্বন করতেন। আর এদের মধ্যে যাঁরা তেমন ইংরেজী শেখেননি, তাঁরাও ঐ নব্য সামাজিক বিবর্তনের বাতাবরণের অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন নব্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ না করেও। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বল্প ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই প্রাগসর পশ্চিমী মূল্যবোধ ও চিরায়ত ভারতীয় হিন্দু পরম্পরায় সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষ সাধিত হয়।[১৭] যিনি নিজের কার্যকলাপ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐ সংশ্লেষকে সার্থকভাবে আত্মস্থ ও বিকশিত করে তোলেন তিনি হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা সমাদৃত ও কর্মদক্ষ কর্মপটু ব্রাহ্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সমগ্র ১৯ শতক ধরেই ব্রাহ্ম সমাজের খানিকটা আবেগবর্জিত

নাগরিক উন্নাসিক যুক্তিপ্রধান বাতাবরণের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতা সমন্বিত গান ও সংকীর্তন চালু করে তিনিই ব্রাহ্ম আদর্শকে অনেক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উন্নীত করেন। বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিতে ব্রাহ্ম আদর্শ যেখানে কিছুমাত্র পা রাখতে সমর্থ হয়েছিল সেই স্থানের যুবকদের ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর অবদান সর্বাধিক। বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিই নয়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অনেক ক্ষেত্রে পদব্রজেও ঘুরে অনাড়ম্বর ভক্তিতে অভূতপূর্ব আলোড়নের সূচনা করেন। গিরিশ ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে, নিজের সামান্য ক'টি নিত্যব্যবহার্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাপড়ের পুঁটলীতে বেঁধে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করতেন। তাঁর সহজ আন্তরিক ব্যবহারের জন্য দু'পাশের যুবকদের ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হতেন, যার ফলে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত অথচ অযৌক্তিক নিয়ম নীতির বিরুদ্ধাচারণ করতেও দ্বিধা করতেন না। গোস্বামীর উপস্থিতিতে তখনকার মতো ম্রিয়মান হলেও তাঁর স্থান ত্যাগের পরেই ঐ শহরগুলিতে ঐতিহ্যবাদীরা নিজেদের ঘর গুছোবার উদ্দেশ্যে যেসব "ধর্মরক্ষিণী সভা' সমূহ স্থাপন করতেন তার থেকেই তাঁর অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণের কাজের স্বার্থকতার মাত্রা অনুধাবন করা সম্ভব।[০৮] দ্বিতীয়তঃ হিন্দু আদর্শের রক্ষকরা (যাঁদের মধ্যে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিতকেও দেখা যেত)[০৯] প্রচলিত আচার আচরণ অমান্য করার অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্ম যুবকদের কঠিন প্রত্যাঘাত করতে অগ্রসর হতেন— যার ফলে বেচারাদের জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ। পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রবিশেষে পরিবারের মধ্যে এক ঘরে (পিতার তর্জন, গর্জন, মায়ের কাকুতি-মিনতি, গৃহে বন্দিদশা) অথবা পলাতক অবস্থায় দারিদ্র্য ও দুর্দশায় দিনযাপনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা যখন (প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে আসে ব্রাহ্ম হয়ে তার কী শারীরিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে) সময় ও ব্যক্তি বিশেষে শুনতে হত রাস্তায় তির্যক মন্তব্য এমনকি পেতে হত ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে প্রাণনাশের ভয়। এরই ফলে সূচিত হয় গ্রামাঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে মফঃস্বল[২০] শহরগুলিতে ও সেখান থেকে কলকাতায় আশ্রয়প্রার্থী ব্রাহ্ম যুবকদের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা। আঠারশ ষাট, সত্তর ও আশির দশকে মফঃস্বল শহর ও মহানগরীর[২১] ব্রাহ্মরাও বাধ্য হয়ে ঐ সব যুবকদের সাহায্যার্থে স্থাপন করতেন বোর্ডিং ও মেস, যেগুলি অনেকক্ষেত্রেই ঐ যুবকদের নিজেদের জেলার নামে গড়ে উঠত।[২২] ব্রাহ্ম সমাজগুলি সাধারণ কার্যবিধি — ব্রাহ্মসমাজগুলির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁদের কার্যকলাপ কতগুলি সাধারণ খাতে প্রবাহিত হয়। ঐ সর্বাধিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু বা উৎস ছিল তাঁদের মন্দির বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল একটা পাকা কোঠাবাড়ী। আর তাদের কাজের তালিকা ছিল নিম্নরূপ ঃ

আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় — (১) সাপ্তাহিক বা অর্ধ সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা, (২) ধর্মীয় বা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে উৎসব (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণত তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত); (৩) বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম আদর্শানুগ অনুষ্ঠান-বিবাহ জাতকর্ম শ্রাদ্ধ ইত্যাদি; (৪) সঙ্গত সভা বা অত্যুৎসাহী সভ্যদের সমন্বয়ে গঠিত আধ্যাত্মিক, নৈতিক আলোচনা সভা; (৫) একেশ্বরবাদী গ্রন্থের সংগ্রহশালা,

(৬) প্রচারকর্ম, বক্তৃতা, গ্রন্থ প্রণয়ন বা পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির দ্বারা বিবিধভাবে একেশ্বরবাদের সম্প্রচার।

জনহিতৈষণা বা সামাজিক— (৭) দরিদ্র, অসহায়দের দাতব্য সাহায্য; (৮) বন্যা, খরা ও দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ত্রাণকার্য (৯) অসুস্থদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়; (১০) বিভিন্ন সমাজের প্রতি আর্থিক সাহায্য; (১১) মদ্যপান, বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথা নিবারণী সভা স্থাপন; (১২) ব্রাহ্মিকা সমাজ, ব্রাহ্মবন্ধু সমাজ স্থাপন।

শিক্ষাগত — (১৩) মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার; (১৪) বালক, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন; (১৫) নৈতিক বিদ্যালয় ও শ্রমিকদের জন্য বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়।

বিবিধ — (১৬) একটি সুসংবদ্ধ ব্রাহ্ম জনগোষ্ঠী স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মপাড়া বা পল্লী স্থাপন; (১৭) বইয়ের বা মনিহারি দ্রব্যের দোকান স্থাপন; (১৮) সাংগঠনিক কাজকর্ম বিশেষ করে স্বদেশীয় বা বিদেশীয় একেশ্বরবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে পত্রালাপ যোগাযোগ ও পারস্পরিক পরামর্শ ও পথনির্দেশ ও সহায়তা, মাসিক পাক্ষিক বা বাৎসরিক সমাবেশ সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা। তবে এমন কোনো একক সমাজের পক্ষে একাধারে ঐ সবকটি কাজে আত্মনিয়োগ করা কঠিন। তাই কাজের প্রবণতা ও সামর্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও সভ্যদের মানসিক ও বাস্তব সামর্থ্যের ওপর।

সূত্র নির্দেশ

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, **হিস্ট্রি অফ্ ব্রাহ্ম সমাজ**, পৃঃ ৩৭৪
২। পি. সি. গঙ্গোপাধ্যায় **আত্মীয়সভার কথা**, পৃঃ ৮৯
৩। **তদেব**, পৃঃ ১৭৮
৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আত্মজীবনী**, পৃঃ ১১৫-১২১, ৩৬১-৩৬৩
৫। **তদেব**, পৃঃ ৩৮৯
৬। ডেভিড কফ্, **ব্রাহ্ম সমাজ অ্যান্ড দি সেপিং অফ্ মডার্ন ইন্ডিয়ান মাইন্ড**, পৃঃ ৩১৮
৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, **পূর্বোল্লিখিত**, পৃঃ ১১৯
৮। **তদেব**, পৃঃ ৩২২
৯। **তদেব**।
১০। **তদেব**।
১১। পি. কে. সেন, **বায়োগ্রাফী অফ্ এ নিউ ফেথ**, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৪০
১২। তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৮৮ শনের আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক, ভূমিকা, তৎসহ দেখুন - (**তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**, ভাদ্র ১৭৬৫ শকাব্দ.
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, **পূর্বোল্লিখিত** পৃঃ ৪৪৩-৪৫২,
দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগর এ্যান্ড দি তত্ত্ববোধিনী সভা',
অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাঃ) 'স্টাডিস ইন বেঙ্গল রেনেসাঁ (কলকাতা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, ১৯৫৮) পৃঃ ৩৫,
অমিয়কুমার সেন, **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এ্যান্ড বেঙ্গল রেনেসাঁ (কলকাতা : সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ১৯) পৃঃ ১৩,**

বিনয় ঘোষ, সংবাদপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা,
রমেশচন্দ্র দত্ত, '**লিটারেচার অফ্ বেঙ্গল**, দিলীপ বিশ্বাসের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪০,
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রথম কল্প, চতুর্থভাগ, ৩৪ সংখ্যা, জ্যেষ্ঠ, ১৭৬৮ শকাব্দ, পৃঃ ২৮৯।)

১৩। অবন্তী দেবী, **ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ**, পৃঃ ১৪৩-১৪৬

১৪। শাস্ত্রী, **হিষ্ট্রী**, পৃঃ ৮২ তৎসহ দেখুন — পি. কে. সেন, **বায়োগ্রাফী**, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬১, পি সি. মোজেমদার, **লাইফ্ এ্যান্ড টিচিংস অফ্ কেশবচন্দের সেন**, পৃঃ ১২৪-১২৫, মেরিডিথ বর্থউইক, **কেশবচন্দের সেন ঃ এ সার্চ ফর কালচারাল সিনথেসিস** গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫।)

১৫। **ধর্মতত্ত্ব**, কার্তিক, ১৭৮৬ শকাব্দ

১৬। এম. বর্থউইক, **পূর্বোল্লিখিত**, পৃঃ ৪১-৪২, তৎসহ দেখুন— **ধর্মতত্ত্ব**, চৈত্র ১৮৮৭ শকাব্দ পি. কে সেন, **বায়োগ্রাফী** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯

১৭। ডেভিড কফ্, **ব্রাহ্ম সমাজ**, পৃঃ ২১৭

১৮। বিস্তৃত তথ্যের জন্য বর্তমান লেখক কর্তৃক ১৯৯৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত '**দি হিস্ট্রি অফ এক্সপ্যানসন্ অফ্ ব্রাহ্মইজম্ আউট্সাইড ক্যালকাটা বিটুইন ১৮১৫ এ্যান্ড ১৯০০ ঃ কেস স্টাডিস অফ সাম সেন্টারস্ অফ্ দি মুভমেন্ট ইন ইস্ট এ্যান্ড নর্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া** 'শীর্ষক অভি-সন্দর্ভব ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখতে পারেন।

১৯। লক্ষণগতভাবে এরা খুবই অদ্ভুত গোষ্ঠী এবং সুস্পষ্টভাবে এদের শ্রেণীকরণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। কারণ এদের অন্তর্নিহিত লক্ষণগত জটিলতার দরুণ একটি গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদেব মধ্যে অপর গোষ্ঠীর লক্ষণাবলী খুঁজে পাওয়া যায়। যদি বা এদের গভীর দেশজ বিশেষত বৈষ্ণব ভাবাদর্শ একটি কার্যকরী বিভেদের লক্ষণ বলে ভাবা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে অপর গোষ্ঠীভুক্তদের এর অভাব ছিল না।

২০। এগুলি ছিল স্থানীয় প্রশাসনের ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। বিস্তৃত ব্যাখ্যাব জন্য প্রদীপ সিন্হা, **নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী বেঙ্গল**, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১। ডেভিড কফ্, **ব্রাহ্ম সমাজ**, পৃঃ ২২৪-২২৫, ১০৯

২২। **তদেব**, পৃঃ ৯৮ ১০০, তৎসহ ব্রাহ্ম নেতাদের জীবনী দ্রষ্টব্য।

উইলসন : হিন্দু কলেজ : ইংরেজী শিক্ষা

ভবতোষ কুণ্ডু

উনিশ শতকের বিশেষ দশকের গোড়ায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ইংল্যান্ডের Evangelical বা ক্ল্যাপহাম গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩) এবং উইলিয়াম উইলবারফোর্স (১৭৫৯-১৮৩৩) ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীস্টিয় শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয়গণেব নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তব অবস্থার উন্নতি ঘটাতে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে এর ফলে ভারতীয়দের রুচি ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং ব্রিটিশ ব্যবসার সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হবে।[১] অর্থাৎ ইংল্যান্ডেব শিল্পজাত দ্রব্যের সুবিধাজনক বাজার তৈরী হবে। এইরূপে Evangelical গোষ্ঠীর Cultural Mission-এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ইংল্যান্ডের Free Traders-এর Commercial Interest. উনিশ শতকের গোড়ার দিকে না হলেও বিশের দশকের প্রথমদিকেই Evangelical গোষ্ঠীর সাথে ইংল্যান্ডের Free Traders-এর আঁতাত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২] ইংল্যান্ডের শিল্পপতি ও বণিকগোষ্ঠী তাদেব বাণিজ্যের স্বার্থে একদিকে কোম্পানীর একচেটিয়া কারবারের অবসান এবং অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ইংল্যান্ডের সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।[৩] ১৮২৩ সাল থেকেই কোম্পানীর ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের বা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস-এর উপর ইংল্যান্ডের Free Traders-এর যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল[৪], অন্যদিকে ইংল্যান্ডের Home Government বা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়দের নিয়োগ করে ব্যয় সংকোচন করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল[৫] — এই মনোভাব তিরিশের দশকের গোড়াতে প্রবলভাবে বজায় ছিল।[৬] এই অবস্থায় বাংলার গর্ভনর জেনারেল ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামক এক শিক্ষা কমিটি স্থাপন করেছিলেন। এই কমিটি স্থাপিত হয়েছিল এদেশের জনগণের উত্তম ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিশেষ করে ইউরোপের জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে।[৭] এইচ এইচ উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) এই শিক্ষা কমিটির সেক্রেটারী এবং হিন্দু কলেজের সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উইলসনের জন্ম হয়েছিল ১৭৮৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর লন্ডন শহরে। ঐ শহরের যোহো স্কোয়ারের এক স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রসায়ন, ধাতুবিদ্যা এবং ট্যাকশালের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।

তিনি কলকাতায় ১৮০৯ সালে এসে প্রথমে কলকাতা ট্যাঁকশালের সহকারী এ্যাসে মাস্টার হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পরে ১৮১৬ সালে এ্যাসে মাস্টারের পদে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন। ট্যাঁকশালে কর্মরত অবস্থায় তিনি ডঃ জন লিডেন এবং হেনরী টমাস কোলব্রুকের ন্যায় প্রাচ্যবিদগণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তিনি এক প্রাচ্যবিদ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন অধ্যাপক সোসাইটির ডিরেক্টর প্রভৃতি পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি ঋগ্বেদ, পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন।[৮] এ হেন প্রাচ্যবিদ উইলসন হিন্দু কলেজের ইংরেজী শিক্ষার উন্নয়নে যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তা লক্ষণীয়।

২

উইলসনের সময়ে হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষার পাঠ্যসূচী প্রতিবছরই একধরনের ছিল না। ১৮২৬-২৭ সাল থেকে ১৮২৯-৩০ সালের মধ্যে প্রথম চার শ্রেণীর পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ঐ সূচীর মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা ছিল তা হল শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার অথবা ম্যাকবেথ বা ওথেলো বা হোমারের দি ইলিয়াড বা দি ওডেসি বা মিলটনের দি প্যারাডাইস লস্ট। তার সাথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকত জয়েসের Dialogues, Gay's Fables, এনফিল্ডের স্পীকার, মারের গ্রামার এবং টেগোর বুক অফ নলেজ। এছাড়া ছিল স্যার ওয়ালটার স্কটের Element Writers-এর বা Eminent Writers-এর উপর গ্রন্থ। সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল ইংরেজী বা স্কটিশ সাহিত্যের অংশ বিশেষ।[৯]

উইলসন তাঁর ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে হিন্দু কলেজের বার্ষিক রিপোর্টে ঐ কলেজের ইংরেজী শিক্ষার উন্নয়নে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

(১) ১৮২৭ সালের রিপোর্টে তাঁর অন্যতম প্রস্তাব ছিল সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের সাথে কলেজের Senior Class-এর ছাত্রদের ব্যাপক পরিচিতি প্রদান করা এবং বেলসের বক্তৃতার একটি নয়া সংস্করণ প্রকাশ করা।[১০]

(২) ১৮২৮ সালে তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজী লেখকদের রচনা (গদ্য ও পদ্য) থেকে বিবিধ ধরনের নির্বাচিত অংশের (প্রয়োজনীয় ও সুরুচিসম্পন্ন) কয়েক খণ্ড প্রকাশন। এই Selections -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ইতিহাস, ন্যাচারাল ইতিহাস, জীবনবৃত্তান্তমূলক বর্ণনা, উপদেশমূলক অংশ, কবিতা, নাটক এবং উপন্যাস।[১১]

(৩) ১৮২৯ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছিল প্রথম শ্রেণীর (Final Class-এর) ছাত্রদের জন্য Metaphysics সম্পর্কে শিক্ষা প্রবর্তন করা। উল্লেখ্য যে এই Metaphysics ছিল ডেভিড ড্রামন্ড এবং তাঁর প্রিয় ছাত্র হিন্দু কলেজের ইংরেজী ও ইতিহাসের শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয় বিষয়। যাই

হোক, উইলসন হিন্দু কলেজের অঙ্কের শিক্ষক ডঃ টাইটলোরের লাইব্রেরী এবং কলেজের সাধাবণ লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ কবার জন্য বই কেনার প্রস্তাব প্রদান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে লাইব্রেরীতে ছাত্রবা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান অর্জন করবে— যা ক্লাশে তাদের পক্ষে অর্জন কবা সম্ভব নয়। কলেজেব সাধারণ লাইব্রেরীব জন্য তিনি পঁয়ষট্টিটি বইয়েব একটি তালিকা পেশ করেছিলেন। এই তালিকার মধ্যে ছিল উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনেব Commentaries on The Law of England (1765-1769), লর্ড বাযরনের রচনা সমূহ, কোলব্রুকের এলজেববা, গিলিব Ethics of Aristotle, ডেভিড হিউমের Treatise on Human Nature (1740), টমাস রবার্ট ম্যালথুসেব Principles of Political Economy (1820), ভলটেয়াবের Charles XII এবং Peter the great এবং মন্টেস্কুর The spirit of laws (1750)।[১২] এটা উল্লেখযোগ্য যে উইলসনেব পুস্তক তালিকাব মধ্যে উদারনৈতিক, উপযোগবাদী এবং চরমপন্থী লেখকদেব বচনা ছিল।

(৪) ১৮৩০ সালে তাঁব খেদোক্তিব মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে তিনি হিন্দু কলেজেব শিক্ষাব জন্য উৎসাহী এবং উচ্চ ইংবাজী শিক্ষাসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেব Exclusive Service কামনা কবেছিলেন।[১৩]

(৫) ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি এবং ইংরেজী, হিন্দু ও মুসলিম আইনের পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে এই ধবনের শিক্ষা কলেজের যুবকদের নিকট চাকুরী ও সম্মানের সুযোগ এনে দেবে। তাঁব বিশ্বাস ছিল যে এই শিক্ষিত হিন্দু যুবকেরা অল্প সময়ের মধ্যে সরকাবেব দক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারীতে পরিণত হবে।[১৪] এইরূপে উইলসন মেকলেব ন্যায় ইংবেজী শিক্ষার মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে এক অনুগত দেশীয় কর্মচারী তৈরীব কথা ভেবেছিলেন।

৩

কিন্তু প্রাচ্যবিদ উইলসন হিন্দু কলেজের ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান অবহেলার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে প্রাচ্য শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

(১) হিন্দু কলেজের ইংরেজী ক্লাস শেষ হওয়ার পর পার্সিযান ও বাংলা ক্লাস শুরু হত। উইলসন চেয়েছিলেন যে পালা করে ইংরেজী শিক্ষকেরা ঐ প্রাচ্যভাগের ক্লাসগুলি চলাকালীন কলেজে উপস্থিত থাকুন (এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে প্রথম বছরেই তার ফল ভাল হয়েছিল)। উইলসনের আর একটি প্রস্তাব ছিল যে দিনের বেলায় যখন ইংরেজী ক্লাস চলে তখনই প্রাচ্যবিভাগের ক্লাস চালু থাকুক।[১৫]

(২) তিনি চেয়েছিলেন যে ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রাচ্য ভাষা এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে লেখা হোক। এতে ছাত্রদের কম সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে।[১৬] তিনি এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য—

The progress of tuition is so traditions that if demands the whole of a student's time and the pupil of the Anglo-Indian College had little or no time to spare. Until therefore we teach these languages through the medium of English little good can be effected from their forming a part of the college course.[১৭]

ইতিমধ্যে ১৮১৮ সালে তিনি হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সুবিধার্থে ইংবেজী ভাষার মাধ্যমে পারশি ভাষার একটি ছোট ব্যাকরণ ও অভিধান রচনাব প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৮]

(৩) ১৮২৯ সালে উইলসন 'বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত চর্চার জন্য ইংবেজীতে একটি ছোট ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৯] তাছাড়া এক নূতন এবং উন্নত ধরনের সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার প্রস্তাবও তাঁব ছিল।[২০]

৪

উইলসন Evangelical বা Utilitarian গোষ্ঠীর ন্যায় ভারতীয় সভ্যতাব প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নি। তিনি জেমস মিলেব ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের উপর যে সংস্কবণ (নয় খণ্ডের) প্রকাশ কবেছিলেন তার পাদটীকায় মিলেব ভাবতীয় সভ্যতাব প্রতি বা ভারতীয়গণের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব মেনে নেননি।[২১]

বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে— "The conservatives including orientalists like H. H. Wilson, were in favour of governing India is the traditional style of Indian Rajahs and Nababs, and of pursuing a policy of non-interference will socio-religious customs and institutions of Indian people."[২২] টমাস মানরো, জন ম্যালকম, মনস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন এবং চার্লস মেটকাফের ন্যায় ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর [২২ক] সাথে উইলসনের শিক্ষার বিষয়ে অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে মিল লক্ষণীয়— (১) প্রাচ্য শিক্ষার অবহেলা না করে পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নয়ন, (২) পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের আলোকে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের পরিবর্তন। উইলসন বাইরে থেকে হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক মনোভাবকে আখ্যা তো দিতে চান নি। তিনি তাঁর হিন্দু কলেজের ১৮৩২ সালের রিপোর্টে লিখেছিলেন :

It has always been my wish and that of the Majority of the Managers to accustom the friend of pupils gently and insensibly to the attend principles and conduct by which sound knowledge must infallibly be followed.[২৩]

তিনি উপসংহারে লিখেছিলেন :

In order, however, to give is (the Hindu college) the opportunity of accomplishing all the good it is capable of undying it is absolutely indispensable to persevere is a cautious and prudent course and avoid as much as possible the violation of the prejudices and feelings of the parents, whilst we prevent the same from taxing root in the minds of the rising generation.[২৪]

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাঁর সতীদাহ প্রথার উপর প্রতিবেদনে (নভেম্বর ৮, ১৮২৯) লিখেছেন যে উইলসন সরকারি আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা বিলোপের বিপক্ষে ছিলেন. বেন্টিঙ্ক লিখেছেন যে. Mr. Wilson considered is to be a dangerous evasion of the real difficulties, to attempt to prove that sutters are not essentially a part of the Hindu religion '' উইলসন মনে করতেন যে ঐ প্রথা নিবারণে সরকারি প্রয়াস হিন্দুদের জনমানসে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরী করবে। তারা ভাবতে শুরু করে যে ব্রিটিশ সরকার ধর্মের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের না হস্তক্ষেপের নীতি বর্জন করছে। সুতরাং ''they will no longer be tractable to any arrangement intended for their improvement and .... the principles of morality as well as of a more virtuous and effected rule of action, new activity inculeated by European education and knowledge will receive a fatal check.'' বেন্টিঙ্ক লিখেছেন যে উইলসনের ন্যায় বামমোহনও মনে করতেন যে সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে সবকারী উদ্যোগের ফলে সরকাবেব ভবিষ্যৎ অভিপ্রায সম্পর্কে জনগণেব মনে ব্যাপক সন্দেহ দেখা দেবে।[২৫]

উইলসনের সময়ে হিন্দু কলেজের বিতর্কিত ইংবেজী ও ইতিহাসেব শিক্ষক ডিরোজিওব কলেজ থেকে পদচ্যুতির ব্যাপারে উইলসন হস্তক্ষেপ কবেন নি, কারণ যে পরিপ্রেক্ষিতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হয়েছিল তাতে হিন্দুদেব মনোভাব জড়িত ছিল।[২৬] কিন্তু উইলসন ১৮৩২ সালে হিন্দু কলেজের রিপোর্টে যা লিখেছেন তা থেকে পরিষ্কার যে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষাব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিযাব জন্য ডিরোজিওব শিক্ষাকে দায়ী করেন নি। এই প্রতিক্রিয়ার জন্য তিনি মূলতঃ তিনটি বিষয়েব উপব জোর দিয়েছেন— (১) হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্পর্কে সংবাদপত্রেব ''In termperate Discussions''. (২) কোন কোন খ্রীস্টান মিশনারী কর্তৃক গৃহীত পদ থেকে (এক্ষেত্রে উইলসন আলেকজান্ডার ডাফের হিন্দু কলেজের বিপরীত দিকে খ্রীষ্ট ধর্মেব বক্তৃতাকে বুঝিয়ে দেন বলে মনে হয়), (৩) প্রকাশ্য ভোজসভায় হিন্দু কলেজের কোন কোন ছাত্রেব যোগদানের ঘোষণা (এই ভোজসভা বলতে টাউন হলে জন রিকেটের সম্মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভাকেই বোঝানো হয়েছে)। উইলসনের মতে উপরোক্ত কারণে হিন্দু সমাজে হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফল সম্পর্কে আশঙ্কার সূচনা হয়। হিন্দু কলেজ থেকে ছাত্র সরিয়ে নেওয়া হতে থাকে। এই অবস্থায় হিন্দুদের আশঙ্কা দূর করার

জন্য কলেজ কমিটি তৎপর হয়ে ওঠে। পিতামাতার মনোভাবের জন্য ডিরোজিওর শিক্ষাকে দায়ী করে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। অবশ্য ডিরোজিওর পদচ্যুতির পরেও হিন্দুদের মধ্যে শঙ্কা দূর হয়নি এবং কলেজ থেকে ছাত্র সরিয়ে নেওয়া হতে থাকে। ১৮৩৩ সালে জেমস প্রিন্সেপ তাঁর হিন্দু কলেজের রিপোর্টে লিখেছিলেন যে উইলসন মনে করতেন যে ১৮৩১-৩২ সালে হিন্দু কলেজ থেকে ছাত্র সরিয়ে নেওয়ার পিছনে হিন্দু অভিভাবকদের ছাত্রদের ধর্ম মতে ডিরোজিওর তথাকথিত হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সাময়িক এবং অস্থায়ী অবিশ্বাস কাজ করেছিল, "a partial and temporary district — regarding the supposed interference with the religious opinions of the pupils heightened by the conduct of the late Mr. Derozio, who acquired a powerful ascendency over the affections of boys."(২৮)। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উইলসন ডিরোজিওর পদচ্যুতির বিরুদ্ধে যাননি। তিনি অবস্থার চাপের কাছেই নতি স্বীকার করেছিলেন বলেই মনে হয়। এজন্য তাঁর সমালোচনা করা যেতে পারে।

তবে একজন প্রাচ্যবিদ ও হিন্দু কলেজের পরিদর্শক হিসেবে তিনি যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর পরবর্তী পরিদর্শক জেমস প্রিন্সেপ বহন করেছিলেন। ১৮৩৫ সালের বেন্টিঙ্কের শিক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণা ছিল অনেক Cautious এবং তাকে সেকালের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি বলা যায় না, কেন না কলকাতা মাদ্রাসার অবলুপ্তি হয়নি, প্রাচ্য কলেজগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়নি এবং প্রাচ্য শিক্ষার জন্য Existing Stipends-এর বিলোপ সাধন হয়নি।(২৯)

সূত্র নির্দেশঃ

১। এরিক স্টোকস, **দি ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস এ্যান্ড ইন্ডিয়া**, অক্সফোর্ড, ক্লেযারেনডেন প্রেস, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৩-৩৫

২। ঐ, পৃঃ ৪০

৩। ঐ, পৃঃ ৩৭-৪৬

৪। মি. এইচ ফিলিপস, **দি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী**, ১৭৮৪-১৮৩৪, বোম্বে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃঃ ২৪৩-২৪৭

৫। ঐ, ২৪৭-২৪৮

৬। মি. এইচ ফিলিপস সম্পাদিত, **দি করসপন্ডেন্স অফ লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্ক**, ভলিউম ১, ১৮২৮-১৮৩১, কলিকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃঃ ৫১৫, ৫২৫-২৬, ৫৩১

৭। মি. এইচ. ফিলিপস, **দি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী**, পৃঃ ২৪৬

৮। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, **বিদেশীয় ভারত বিদ্যাপথিক**, কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৭, পৃঃ ৫০-৬০

৯। এইচ. এইচ. উইলসনের **হিন্দু কলেজের বার্ষিক রিপোর্টগুলি**, জানুয়ারী ১৫, ১৮২৭, জানুয়ারী

৮. ১৮২৮, জানুয়ারী ২৩, ১৮২৯, জানুয়ারী ১৪, ১৮৩০, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (কপি বুক অফ লেটার্স) — এরপর থেকে জি. সি. পি. আই — ভলিউম ৪, ১৮২৭ পৃঃ ২৬১-২৬৪, ভলিউম ৫, পার্ট ২, ১৮২৮, পৃঃ ৫১১-৫১৪, ভলিউম ৭, ১৮২৯, পৃঃ ৩৯-৪৬, ভলিউম ৮, ১৮৩০, পৃঃ ১৩-১৪।

১০। জি. সি. পি আই, ভলিউম ৪, ১৮২৭, পৃঃ ২৪৮-২৪৯

১১। জি. সি পি আই, ভলিউম ৫, পার্ট ২, ১৮২৮, পৃঃ ৫০১-৫০৩

১২। জি. সি. পি. আই ভলিউম ৭, ১৮২৯, পৃঃ ৩৩-৩৪, ৯২-৯৪

১৩। জি. সি. পি. আই ভলিউম ৮, ১৮৩০, পৃঃ ৭-৯

১৪। উইলসনের হিন্দু কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট, জানুয়ারি ৩১, ১৮৩১, জানুয়ারি ৩১, ১৮৩২ — জি. সি. পি. আই, ভলিউম ৯, ১৮৩১, পৃঃ ৩২-৩৪, জি সি পি আই, ভলিউম ১০, পার্ট ১, ১৮৩২, পৃঃ ৪৫-৪৬

১৫। জি. সি. পি. আই ভলিউম ৪, ১৮২৭, পৃঃ ২৫৩-২৫৪

১৬। জি. সি পি. আই ভলিউম ৫, পার্ট ২, ১৮২৮, পৃঃ ৫০৫

১৭। জি সি. পি. আই ভলিউম ৭, ১৮২৯, পৃঃ ৩৪-৩৫

১৮। জি. সি পি. আই ভলিউম ৫, পার্ট ২, পৃঃ ৫০৫

১৯। জি. সি পি আই ভলিউম ৭, ১৮২৯, পৃঃ ৩৪-৩৫

২০। জি. সি. পি আইকে লেখা উইলসনের চিঠি, মে ২১, ১৮২৯, জি সি পি. আই, ভলিউম ৭, ১৮২৯, পৃঃ ৬৩৯-৬৪০

২১। James Mill, **The History of British India** (1820) ed by H H Wilson, Reprint, New York, Chelsea House, 1968, VIII. এবং J Majeed, 'James Mill's The History of British India and Utilitarianism As a Rhetoric of Reform'. Modern Asian Studies, Vol. 24 2, 222

২২। বিনয় ঘোষ, **সিলেকশনস্ ফ্রম দি ইংলিশ পিরিওডিক্যালস অফ নাইনটিন্থ সেনচুরি বেঙ্গল**, কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৭৮, সম্পাদকীয়, পৃঃ ১১, ২২(এ)। এই গোষ্ঠীর সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য এরিক স্টোকসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃঃ ৯-২৪, সি. এইচ. ফিলিপসের, **দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী**, পৃঃ ২৪৭-২৪৯, উইলিয়াম আদম, **রিপোর্টস অন দি স্টেট অফ এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৩৫ ও ১৮৩৮)**, অনাথনাথ বসু সম্পাদিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১, পৃঃ ৩৬৬-৩৭১

২৩। জি. সি. পি. আই, ভলিউম ১০, পার্ট ১, ১৮৩২, পৃঃ ৩৯

২৪। ঐ, পৃঃ ৪১

২৫। সি. এইচ. ফিলিপস্, **দি করসপন্ডেনস অফ লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্ক**, ভলিউম ১, পৃঃ ৩৩৮।

২৬। টমাস এডওয়ার্ডস, **হেনরি ডিরোজিও, দি ইউরেশিয়ান, পোয়েট, টিচার এ্যান্ড জার্নালিষ্ট**, কলিকাতা, ঋদ্ধি সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ৭৭।

২৭। জি. সি. পি. আই., ভলিউম ১০, পার্ট ১, ১৮৩২, পৃঃ ৩৯-৪১।

২৮। জেমস প্রিন্সেপের হিন্দু কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৮৩৩, জি. সি. পি. আই, ভলিউম ১২, ১৮৩৩ (প্যারাগ্রাফ ২০), পৃঃ ১৭০-১৭১।

২৯। সি. এইচ. ফিলিপস্ সম্পাদিত পূর্বোক্ত, ভূমিকা পৃঃ XLII.

আক্রমণের নানান দিক : প্রসঙ্গ ডিরোজিও

বোধিসত্ত্ব কর

আধুনিকতার গোটা ইতিহাসটি অস্বীকার করে মৌলবাদ যখন তার একটি অন্ধ নকশা প্রস্তুত করেছে, তখনই উত্তরাধুনিকতার প্রচ্ছদে আবৃত তথাকথিত নিম্নবর্গীয়তাবাদী ইতিহাসকারেরা 'আধুনিকতা'কে খারিজ করছেন। এই দ্বিমুখী আক্রমণ সার্বিকভাবেই প্রান্তিক পরিমণ্ডলের সংস্কৃতিতে একটি গভীর তাৎপর্য রচনা করেছে। যদিও ডিরোজিওর উপর একটি সাম্প্রতিক হিন্দুত্ববাদী আক্রমণকে[১] কেন্দ্র করে ডিবোজিও চর্চার মূল কাঠামোটির পর্যালোচনাই এই নিবন্ধের আশু প্রাসঙ্গিকতা, তবু বিস্তৃত অর্থে এ-হল প্রান্তিক আধুনিকতা বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন, এক অর্থে নিশ্চয় এলিটের সঙ্গে একটি কথোপকথন, স্ট্র্যাটেজিক ও অ্যাকাডেমিক অবস্থানেব মধ্যে কোনোটিকেই চবম ধবে না নেওয়া এবং একটি ডিসকোর্সের সম্ভাবনাকে সর্বদাই জীবন্ত রাখা।

আত্মপতনের বীজ লক্ষ্যই করিনি

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ডিরোজিওকে নিয়ে যে বইটি লিখেছেন, তা কোনো তাত্ত্বিক গুরুত্বের দাবী ছাড়াও নিতান্ত রণকৌশলগত কারণেই একটি প্রত্যুত্তবেব অপেক্ষা রাখে। আধুনিকতা সম্বন্ধে হিন্দুত্ববাদের দর্শন ও দৃষ্টিকোণ হিসেবে এ বইটিকে দেখা যেতে পারে। হাত-ফেরতা-তথ্য, স্বেচ্ছাবিকৃতি, আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ও গোরক্ষার সপক্ষে কল্প-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খাড়া করে সস্তা উত্তেজনা ছড়ানোই বইটির মুখ্য লক্ষণ[২]। তবু এর উপর জোর দেওয়ার কারণ, একটি সমকালীন রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে চিহ্নিত করা। ডিরোজিওকে অ্যান্টাগনিস্ট বেছে নেওয়ার এই তাত্ত্বিক প্রণোদনকে যদি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হয়, তবে একটি সার্বিক সমাজপ্রক্রিয়ার বহুমাত্রিকতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে : আধুনিকতার বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত প্রতিরোধের চিত্রটি আড়াল হয়ে যাবে। আর সেই চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে 'ইতিহাসের ইতিহাস' পড়তে হবে পাঠককে, এযাবৎ কীভাবে আধুনিকতাকে পোষণ করা হয়েছে ডিরোজিও-জীবনীতে।

প্রাক্-পুরাণিক বাল্যবন্ধু মত

টমাস এডওয়ার্ডস রচিত ডিরোজিওর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনটি সম্পর্কে রুদ্রপ্রতাপ প্রায় মোহান্ধ কেন না, "টমাস এডওয়ার্ডস-ই ডিরোজিওকে মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফের

পূর্বসূরী রূপে চিহ্নিত করে গেছেন। আমরা নতুন কিছু উচ্চারণ করছি না। উপযুক্ত পটভূমিকায় তথ্য প্রমাণ সহযোগে স্থাপন করছি ডিরোজিওকে'[৩]। আর সেই পটভূমি খুঁজে বার করতে হিন্দুত্ববাদীটি শুরু করেছেন ক্রিশ্চানিটির জন্মলগ্ন থেকে, আর মাঝপথে গিয়াসউদ্দীন বলবন[৫] বা ফ্রান্সিস জেভিয়াব[৬] কেউই বাদ যাননি। এভাবে সমস্ত সেক্যুলার জীবনীকারদেরও সেক্যুলারিজমের শর্তে আক্রমণ করা হয়েছে, কেবল এডওয়ার্ডস-ই সমস্ত বিসংবাদের ঊর্ধ্বে স্বতঃ সিদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই আত্মীয়তার প্রধান কারণ অবশ্যই একটি মৌলবাদী পরকলার ব্যবহার, যেখানে আন্তঃসাম্প্রদায়িক প্রান্তিক সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ ভূমি থেকে ডিরোজিওকে ছিন্ন করে একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখা হবে। এইটেই ছিল ডিরোজিওর বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রথম চাল, এইজন্যই ডিরোজিওর বিপক্ষে অভিযোগটি "an improper person to be entrusted with the education of the youth" থেকে পালটে "Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindu community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the college"—এই প্রস্তাব হিসেবে কথা হয়েছিল। একদিকে এটি যেমন 'হিন্দুত্বের অভ্যন্তরীণতায় হস্তক্ষেপের' থেকে বিরত থাকে, তেমনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আত্মাভিমানকেও[৭] প্রশ্রয় দেয় প্রায় সাম্প্রদায়িকতার মাত্রায়। এডওয়ার্ডস তাঁর গোটা বইটি থেকে একটি কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যে একজন য়ুরেশীয় কতদূর যেতে পারে, এবং তাকে বর্তমান (১৮৮৪) শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে[৮]। আর ডিরোজিওর সামাজিক বিনিময়ের দৈর্ঘ্য যেহেতু এখনও আবিষ্কার্য, অতএব অনুমানে ভর করে রুদ্রপ্রতাপ পৌঁছে গেছেন সহজ সিদ্ধান্তে, ডিরোজিও "উল্টো ব্যাটে খেলেই ভারত জুড়ে যিহোভার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায ছিলেন"[৯]। এডওয়ার্ডসও ডাফের পূর্বসূরী হিসেবে ডিরোজিওকে সনাক্ত করেছেন[১০]। একে বলা চলে অজ্ঞেয়বাদের ব্যবহার, একটি জিজ্ঞাসু অবস্থাকে 'হ্যাঁ/না'-হিসেবে চিহ্নিত করা। সামগ্রিকভাবেই ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণার ভিতটি টলিয়ে দিয়েছিলেন ডিরোজিও। সেই প্রাক্জমিক অবস্থাটিকে একটি ছাপ না দিয়ে দিতে পারলে উভয়পক্ষই প্রয়োজনমতো সরলীকরণ করতে পারে না।

টমাস এডওয়ার্ডস য়ুরেশীয়দের পরিচিত সংকটের সামনে ডিরোজিওকে একটি আদর্শ ধ্রুবমূর্তি হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন, আর এডওয়ার্ডস-কৃত কাঠামোটিকে কেবল পাল্টা শিবির থেকে মৌলিক ও অনড় হিসেবে গ্রহণ করেন রুদ্রপ্রতাপ। যে-কোনো 'সত্য'কে প্রশ্ন করাই হল আলোকনের লক্ষণ, আর উত্তরালোকনবাদীরাও সেই অর্থে আলোকনের সন্ততি। এডওয়ার্ডস যখন ভাবছেন অন্যান্য সব ধর্মই "can be expected to fall asunder and evaporate at the touch of the Ithuriel spear of christianity"[১১] তখন ডিরোজিও লিখছেন "One doubt suggests another, and universal scepticism is the consequence."[১১ক]

সাজানো দেওয়ালগুলি কৌতুকে সহসা ভেঙে পড়ে

১৯৬১ সালেব মার্চ মাসে বিনয় ঘোষের বিদ্রোহী ডিরোজিও বইটি প্রকাশের পাশাপাশি অধিবিচারের একটি দ্বিতীয় পথ খুলে গেল, যা প্রধানত জোর দিল যুক্তিবাদের উপর, জাতীয়তাবাদেব উপর, এবং আধুনিকতার উপর। আর এর পাশাপাশি ডিরোজিওকে তৈবি কবা হল 'আধুনিকতা'ব একটি উজ্জ্বল স্মারক হিসেবে, মেজে-ঘষে বানানো হল নিজস্ব নায়ক। একই সঙ্গে তাঁর চুম্বকপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ও বয়ঃসন্ধিসুলভ উচ্ছ্বাসগুলি ইতিহাসকারদের রোম্যান্টিক অনুভাবনায় জাবিত হল, আর এই সূত্রেই সামগ্রিক আন্দোলনটি পরিণত হল কিছু প্রতীক, প্রতিমা ও প্রতিমানে। অর্থাৎ, প্রান্তিক আধুনিকতার উভয়তোমুখী চরিত্র, সংশয় ও স্ব-বিরোধের যে জটিল বিন্যাসটি প্রার্থিত ছিল, তাব পরিবর্তে একটি মীথ হয়ে উঠল 'আধুনিকতা'। চক্রবর্তীদের বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপ[১২] অথবা ল্যাজ-কথিত সন্ন্যাসীর গল্প[১৩] এই 'আধুনিকতা'র নিজস্ব টোটেম এই জন্যই বিনয় ঘোষকে লিখতে হয়, "জ্ঞানের কাছে অজ্ঞানতার, সুশিক্ষাব কাছে অশিক্ষা-কুশিক্ষার, বিদ্যাব কাছে অবিদ্যার, যুক্তিবুদ্ধিব কাছে জাদুমন্ত্রের, আলোর কাছে অন্ধকারের পরাজয় যে আগামীকালে অনিবার্য, এ-সত্যও তাঁদের (ডিবোজিও-ছাত্রদের) কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল"[১৪]। অর্থাৎ, 'ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য বিজয়'-এব একটি টেকস্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে পূর্বেই, এই নির্ধারিত পথে শুধু ইতিহাসকে চলতে দেখাই হবে না, তাঁকে চালাবারও চেষ্টা করা হবে। একেই বলে 'আধুনিকতার মৌলবাদ': টেলিওলজিক্যাল ইতিহাসচেতনা, যা প্রবহশীলতাকে নির্বাসিত করে, 'প্রাচীন' ও 'মধ্যযুগীয়'-এর বিরুদ্ধে 'আধুনিক'-কে স্থাপন করে, আর 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র নামে সাম্প্রতিকতার সুযোগ নেয়।

আধুনিকতার দেশবদ্ধতাকে কালবদ্ধতা হিসেবে দেখে সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হল প্রান্তিক বিশ্বের সমাজপ্রক্রিয়ার ঐতিহ্য। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ভিন্নতাটি প্রতিষ্ঠিত না করার দরুন ডিরোজিও হয়ে উঠলেন একক বিপ্লবী, যিনি গোটা যুগ আর সামাজিক প্রতিবেশীর প্রতিকূলে অল্প বয়স ও সীমিত শক্তি সত্ত্বেও লড়াই করেছেন[১৫]। এতে 'আধুনিকতা' যেমন একটি তেজস্বী রূপ অর্জন করল, তেমনই ব্যক্তিগতভাবে ডিরোজিও হয়ে উঠলেন সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু ঔপনিবেশিক আধুনিকতার যে ছিন্নমূল চরিত্র, তাও প্রক্ষিপ্ত রইল ডিরোজিওর অনন্যত্বে নিঃসঙ্গতায়— এমনকি, বিদ্রোহে।

আজকে ডিরোজিওর ঐতিহ্য নির্দেশ করতে গিয়ে নাজেহাল হিন্দুত্ববাদীটির গলদঘর্মতা হাস্যোদ্রেক করতে পারে : কখনো তিনি ছুটেছেন মহম্মদ বিন কাশিমেব কাছে[১৬], কখনো বা শেখ আহমেদ শিরহিন্দীর কাছে[১৭], তবে অধিকাংশ সময়েই খ্রীস্টান মিশনারীদের কাছে[১৮], পাশাপাশি বিনয় ঘোষ কিন্তু তাঁর প্রোটাগনিস্টকে একটি সুনির্মিত পরম্পরা সরবরাহ করতে পেরেছেন, "এদেশে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মে ডিরোজিও কোথা থেকে এমন শিক্ষা পেয়েছিলেন যার শক্তিতে বাংলার একদল

তরুণকে নবযুগের জীবনদর্শনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো উদ্বুদ্ধ (Sic) করতে পেরেছিলেন এ-প্রশ্ন সকলের মনে জাগবে। প্রশ্নের উত্তর হল, শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডের কাছ থেকে''[১৯]। মূলত ড্রামণ্ডকে বিনয় ঘোষ নির্মাণ করেন প্রত্ন-আধুনিক সংশয়বাদী হিসেবে। সম্প্রতি সুবীর রায়চৌধুরী এই অতিকথাটির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন[২০]। এই কারণেই সুরেশচন্দ্র মৈত্র টমাস পেইন থেকে মোপার্তুই, সকলের প্রভাবের কথাই বলেন, চার্বাক বা বৈদিক সাহিত্যচর্চার কথা উল্লেখ করেন না[২১]। আর এ ধরনের সরলীকরণ একদা রাজনারায়ণ বসুকে যেভাবে প্ররোচিত করেছিল (''ডিরোজিওর শিষ্যরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল''[২২]), সেইভাবেই এই ফাঁকটিতে চটজলদি মাথা গলাতে প্রলোভিত করেছে রুদ্রপ্রতাপকে, ''ইতিহাস বলে ডিরোজিওর কৃতকর্মের পরোক্ষ ফলরূপেই পরবর্তীকালে বেশ কিছু শিক্ষিত বঙ্গসন্তান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন''[২৩]। এখানে মূলস্রোতের অর্থ অবশ্য হিন্দুস্রোত, কিন্তু তাত্ত্বিক অসংগতি একটি থেকেই যায়, তা হল ঔপনিবেশিক সূতিকাগারে একটি আধুনিকতার প্রসব হলে তা কখনো দেশীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কি না। 'আধুনিকতা'কে একটি বহিরাগত শক্তি হিসেবে ধরে নেওয়ার দরুনই এই সমস্যা। এর ফলে একটি স্ব-বিরোধ দেখা দেয় . পারিপার্শ্বিকের বাস্তবতার সঙ্গে ঐতিহ্যের বিযুক্তি ও ঔদাসীন্য। আর সেই কারণে ১৯৭১ সালে গিয়ে বিনয় ঘোষ আশ্রয় নেন প্রত্যাহারমূলক স্বীকারোক্তিতে : ''After devoting more than twenty years to the collection and interpretation of historical material on the 19th century Bengal renaissance, I find many lacunae in the work done.''[২৪] এ কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাখ্যান মাত্র নয়, বরং এ হল রোম্যান্টিক 'আধুনিকতা'-র প্যারাডক্স, যেখানে বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করছে একমাত্রিক হিস্টরিয়োগ্রাফি, দ্বন্দ্বের সরল বিন্যাস, এবং অবশ্যই 'একজন রাজকুমারের উজ্জ্বল গল্প' হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না আধুনিকতার সমূল নির্যাস।

হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই

১৯৭৩ সালে প্রকাশিত সুমিত সরকারের 'দ্য কমপ্লেকসিটিজ অফ ইয়ং বেঙ্গল' আত্মপ্রকাশ করল নিম্নবর্গীয়তাবাদী একটি টেকস্ট হিসেবে যা এডওয়ার্ডস-কৃত কাঠামোটিকে সচেতনভাবে প্রত্যাখান করল বটে[২৫], কিন্তু ঐতিহাসিক পরম্পরার সূত্রেই নিজেকে গ্রথিত করল 'রোম্যান্টিক' আধুনিকতার সুলভ সরলীকরণের সঙ্গে। য়ুরোপীয় আধুনিকতার মতাদর্শগত প্রকল্পের ''limited and inevitably distorted applicability''.[২৬] সুমিত সরকারকে প্ররোচিত করেছে রাশিয়ান ডিসেম্ব্রিস্টদের সঙ্গে ডিরোজিও-ছাত্রদের একটি তুলনায়, যেখান থেকে প্রান্তিক আধুনিকতার অনপেক্ষ অস্তিত্বটি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেহেতু উত্তর-ডিরোজিও 'নব্য বঙ্গ'কে নিয়েই মূলত সুমিত সরকার আলোচনা করেছেন, তাই তাঁর অধিকাংশ প্রতিপাদ্যই এই প্রবন্ধের সীমানা বহির্ভূত,

কিন্তু একটি প্রক্রিয়ান্তর্গত মানুষ হিসেবে ডিরোজিও অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত সুরক্ষা দাবী করতে পারেন যদি তাঁর আস্তিক্য-নাস্তিক্য উভয়প্রকার মতামত অধ্যয়নকে 'কূটনৈতিক চাল' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়[২৭]। সুমিত সরকার ডিরোজিও-প্রবর্তিত আধুনিকতাকে হিন্দু ঐতিহ্যের একটি উদার প্রসারণ হিসেবেই দেখছেন[২৮], যার অবাস্তবতা প্রমাণ করতে হলে হিন্দুত্ববাদী বইটিই যথেষ্ট, বা আরো যথেষ্ট তৎকালীন হিন্দু পত্র-পত্রিকার বিরূপ সাক্ষ্য। প্রান্তিক আধুনিকতার 'ভিন্নতা' অপ্রতিষ্ঠিত থেকে গেছে বলেই মধুসূদন দত্তকে ডিরোজিওপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেন সুমিত[২৯]— আর কৃষ্ণমোহন সৃষ্ট 'বাণীলাল'কে যুক্ত করেন দীনবন্ধুর 'নিমচাঁদের' সঙ্গে[৩০], ফলত পশ্চিমীকরণ আর আধুনিকতা, আব ডিরোজিও ও উপনিবেশবাদ এক হয়ে যায় : আলোকনের স্বাভিমানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আলোকনকেই অস্বীকার করবার বীজ রয়েছে এখানে।

কয়েকমাস আগে দেখলাম সুমিত সরকার উত্তরাধুনিকতার এই বিপজ্জনক প্রবণতার প্রতিবাদ করে নিম্নবর্গীয়তাবাদীদের আক্রমণ করেছেন[৩১]। এই দ্বিতীয় সুমিত সরকার কি পঁচিশ বছর আগের মতামত পুনর্বিবেচনা করবেন না?

সূত্র নির্দেশ

১। চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রতাপ, 'নবরূপে ডিরোজিও', **অমৃত শরণ** . **কলকাতা**, ১৯৯৫। বইটি 'শাশ্বত ভারত গ্রন্থমালা' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যেটি গৈরিক পরিবারের মতাদর্শগত রূপরেখা গত কয়েক বছর ধরে উপস্থাপিত করে আসছে।

২। "বিধবা বিবাহ-হীন সমাজে হিন্দু বিধবাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য না দেওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই", যেহেতু "উচ্চ প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য যখন কামোত্তেজক বলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত"। পৃ. ৬১-৬২। প্রায় ঐ কারণেই গোমাংস গ্রহণও নিষিদ্ধ। পৃ. ৪৯-৫০। উনিশ শতকের বৃন্দাবন ঘোষাল সুলভ ভঙ্গিতে আমেলিয়া ডিরোজিও ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-এর 'অবৈধ সম্পর্ক' যথেষ্ট তথ্য ছাড়াই অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পৃ. ৮২-৮৪। পল ভার্গিজ সম্পর্কে সুবীর রায়চৌধুরী উদ্ধৃত লাইনটি পুনরুদ্ধার করে ঠিক অতটুকুই বলা হয়েছে। অবশ্যই সূত্রতালিকায় প্রাথমিক গ্রন্থের নাম। পৃ. ৬৩। আর স্বেচ্ছা বিকৃতির চমৎকার উদাহরণ সুরেশচন্দ্র মৈত্রের উপর অযোগ্য আক্রমণ ঃ শ্রীমৈত্রর মন্তব্যকে ডিরোজিওর বক্তব্যের অনুবাদ বলে ধরে নিয়ে রুদ্রপ্রতাপ অযথা কটাক্ষ করেছেন। পৃ. ৫। ডিরোজিওকে 'টেনিদা' ইত্যাদি বলে ব্যাপারটিকে লঘু করেছেন, আর নিজেকে করেছেন অশ্রদ্ধেয়। পৃ. ৪৭।

৩। চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৫-৬।

৪। চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৯।

৫। চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮৮-৮৯।

৬। চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২০-২১।

৭। "Conservative upper class landlords, and the ruling British classes, conspired in vain to consign him to oblivion. The British India Association did not even admit Eurasians." ডিরোজিওর বিরুদ্ধে এই 'ষড়যন্ত্রের' কথা বলেন জর্জ অ্যালবার্ট উইলসন — ডিরোজিও। Das Gupta, Mary Ann (Ed). 'Henry Louis Vivian Derozio (1808-1831) : Anglo-Indian Patriot and Poet : A memorial Volume', Derozio Commemorative Committee : Calcutta. 1973. P 6.

৮। 'ডিরোজিওর জীবনের শিক্ষা' শীর্ষক স্থানে এডওয়ার্ডস বলেন, "The advantages which the training of a university course bestow are not by any means to be ignored or despised --- to the acquirement of some trade or handicraft which would render it unnecessary to import so largely. as at present. skilled European labour". Edwards. Thomas. '**Henry Derozia : The Eurasian Poet, Teacher and Journalist**' Riddhi India . Calcutta. 1980. pt. 172

৯। চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৫১।

১০। Edwards. p. 8

১১। Edwards. p 51

ক। Derozio's letter to H H Wilson. Esq Qtd in Madge. Elliot Walter. '**Henry Derozio : The Eurasian Poet and Reformer**', Naya Prokash · Calcutta. 1982. p 44

১২। তখন তাঁহাদের (ডিরোজিও-ছাত্রদের) 'সর্বপ্রধান সৎসাহসের কর্ম্ম ছিল মুসলমানের রুটী ও বাজার হইতে সিদ্ধ করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন. "ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়" ! আর কোথায় যায়। সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। "শাস্ত্রী, শিবনাথ, '**রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, নিউ এজ : কলকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ১০৬।

১৩। 'On one the Derozio's pupils introducing him to a sunnyasee the latter is said to have remarked to the pupil : "I am sorry your teacher will not remain much longer with us. I don't know his name. but one think I can tell you. he will not live more than there are letters in his name." The sum of the letters comprising "Henry Louis Vivian Derozio" makes up twenty-three and Derozio died in his twenty-third year". Madge. Elliot Walter.'**Henry Derozio : The Eurasian Poet and Reformer**'. Edited by Subir Ray Chowdhuri. Naya Prakash : Calcutta. 1982. P-17. কয়েক বছর আগে এই গল্পটিকে অপ্রসঙ্গে আলোকিত করেছেন নিখিল সরকার মশাই ('ডিরোজিওর শেষ ইচ্ছাপত্র', রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত 'ডিরোজিও' গ্রন্থে সংকলিত, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭ পৃঃ ১০৮)। এই গল্প রমেশচন্দ্র মজুমদারের "কলসে দ্বিধার মতো ভর করেনি' বলে রমাপ্রসাদ ক্ষুব্ধ হয়েছে ('ডিরোজিওর জন্ম সন : একটি বির্তকের অবসান', ঐ পৃঃ ১৭৯) এই উড়ো গল্পের ঐতিহাসিকীকরণেই চিহ্নিত ছিল না কি অতিকথার প্রকল্পটি গ্রহণ করবার অভিপ্রায়?

১৪। ঘোষ, বিনয়, 'বিদ্রোহী ডিরোজিও', অয়ন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ১২৭।

১৫। এই সূত্রেই উৎপল দত্ত তাঁর 'ঝড়' ছবিতে ডিরোজিওকে 'মহাজীবন' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

১৬। চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪।

১৭। চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০-৫১।

১৮। চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮, ৫১, ৮৮, ...।

১৯। ঘোষ, পৃঃ ৩৩।

২০। রায়চৌধুরী, সুবীর, '**হেনরী ডিরোজিও' ঃ তাঁর জীবন ও সময়**', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃঃ ১৯, ২০।

২১। "ইহারা (ডিরোজিও ছাত্ররা) কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈতবাদী (Sic) নিশ্চিন্ত আচার ব্যবহার দ্বেষী", এই রক্ষণশীল অভিযোগটি পাওয়া গেছে সমাচার দর্পণের ৬ নভেম্বর, ১৮৩০ সংখ্যায় - সমাচার চন্দ্রিকা থেকে একটি চিঠি পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। (এক্ষেত্রে আমি 'জড়বাদী' অর্থে 'চার্বাক' মানতে নারাজ, যেহেতু ইতিমধ্যেই কোলব্রুক তাঁর চার্বাক সম্পর্কিত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। আর 'এক আত্মবাদী' সম্ভবত 'Desit', নচেৎ 'নিশ্চিন্ত আচার ব্যবহার দ্বেষী বলা হত না, এ ধরনের ব্যবহার ঐ সময়ে বিরল নয়।) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, **'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'**, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-৪০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৪১, পৃঃ ২৩২। এছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে ডিরোজিওর বৈদিক সাহিত্য পড়ার স্কোপ নিয়ে নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন পল্লব সেনগুপ্ত **'ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও'** বইটিতে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২৭-৩৩। প্রথাগত গবেষক না হয়েও এ ব্যাপারটা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের চোখ এড়ায়নি ঃ 'কবি কিশোর **ডিরোজিও**' (রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত ডিরোজিও গ্রন্থে) প্রবন্ধে (পৃঃ ১৩৬-৭)।

২২। বসু, রাজনারায়ণ, **'সে কাল আর এ কাল'**, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৮৩ (বা), পৃঃ ২৫।

২৩। চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৯-৭০।

২৪। Ghose, Benoy, 'A Critique of Bengal Renaissance' in *Frontier* (Ed. Samar Sen), 25 September, 1971, P 11.

২৫। Sarkar, Sumit, 'The Complexities of Young Bengal', **Nineteenth Century Studies** Nos. 1-4, Ed. Alok Roy, Biographical Research Centre, Calcutta, 1973 P-507.
দ্রষ্টব্য 'নব্যবঙ্গের জটিলতা ঃ একটি ভিন্ন নির্মাণ, বোধিসত্ত্ব কর, **'এবং এই সময়'** শীত সংখ্যা, ১৪০২।

২৬। Sarkar, P 506

২৭। Sarkar, P 508.

২৮। Sarkar, P 508

২৯। Sarkar, P 509

৩০। Sarkar, P 510

৩১। **Economic and Political Weekly**, 30-1-1993 'The Fascism of the Sangh Paribar.'

কালনা মহকুমার অপরাধ প্রবণতার ইতিহাস (১৯৭০-'৯৫)
একটি সমাজবীক্ষণমূলক রচনা

মনিরুল ইসলাম

আজকের সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও তার মাত্রা বৃদ্ধি কোনো নতুন বিষয় নয়। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে অপরাধ প্রবণতা বিভিন্ন চেহারায় আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে একথা স্মরণে রাখা দরকার যে, এই নিবন্ধ কালনা মহকুমার আলোচ্য সময়ের (১৯৭০-৯৫) অপরাধ প্রবণতার ইতিহাস চিত্রায়িত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেন না, এই অল্প পরিসরে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত নির্যাসটুকু বিবৃত করা ছাড়া অন্য পথ নেই। যাইহোক এই মহকুমার অপরাধ প্রবণতার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করার আগে এর ভূগোল, অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বর্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা হল কালনা মহকুমা। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমকূলে বাংলার ইতিহাস ও ধর্মীয় আন্দোলনের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই মহকুমা। জেলার পূর্বাংশে কালনা, পূর্বস্থলী ১, পূর্বস্থলী ২ ও মন্তেশ্বর এই চারটি থানা এই মহকুমার অন্তর্গত। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কালনা শহরটি মহকুমা সদরে পরিণত হয় এবং ১৮৬৪-র মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ১৮৬৯ সালে কালনা পৌরসভা গঠিত হয় (**বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি**, পৃষ্ঠা ১৩০)। ষোড়শ ওঠে শতকে বাংলাদেশে যে সব বৈষ্ণব শ্রীপাট গড়ে তার মধ্যে কালনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ব্রিটিশ শাসনকালে কালনা ছিল ইংরেজ মিশনারীদের এক বড় প্রচার কেন্দ্র। বহু মিশনারী স্কুল এখানে তৈরী হয়। রেভারেন্ড লালবিহারী দে এখানকার মিশনারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখানকার মহান মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বহু প্রতিভাবান মানুষ। সাধক কবি কমলাকান্ত, যাত্রা জগতের মতিলাল রায় (ভাতশালা গ্রাম), বাংলা গদ্যের অন্যতম রচয়িতা ও সাংবাদিক অক্ষয় দত্ত (চুপী), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (চুপী), চলচ্চিত্র দুনিয়ার পাহাড়ী সান্যাল (মেড়তলা) প্রমুখ। বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্রের পদধূলিতে ধন্য এখানকার মাটি।

একটি গঞ্জ-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কালনার পরিচিতি বহু আগে থেকে। রেভারেন্ড লঙের বিবরণ অনুযায়ী নৌ-বাণিজ্যের উপযোগী স্থানরূপে এই শহরটি অন্তর্দেশীয় বন্দররূপে বিখ্যাত ছিল। লঙ সাহেবের বিবরণে জানা যায়, [Kalna] is noted for its great trade, being the port of the Burdwan District, the bazar has 1000 shops; the houses are chiefly of bricks. Great qnantities of rice

brought from merchants of Rangpur, Dewanganj, Jaffirganj, are here stored up, grain, silk and cotton also from a large staple'. বর্তমানেও কৃষিকাজ ও তাঁতশিল্প এই মহকুমার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রায় সাত লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত এই অঞ্চল বর্ধমান জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। জলদস্যুতা ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ইতিহাস - এখানকার অতীতকে ভারাক্রান্ত করেছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, খাস জমি উদ্ধারের আন্দোলন এই মহকুমার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে আলোচ্য সময়কালের বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার কথা জানা যায়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল হত্যাকান্ড (রাজনৈতিক ও পারিবারিক), চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। এছাড়া গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণ, পুজো-উৎসবে এক শ্রেণীর যুবকের মদ খেয়ে অশালীন আচরণের কথাও জানা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে এই সময়ের অপরাধমূলক কাজকর্মকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। এই তিনটি পর্যায় হল: (১) ১৯৭০-৮০, (২) ১৯৮০-৯০, (৩) ১৯৯০-৯৫।

কালনা মহকুমার গ্রামে-গঞ্জে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে বামপন্থী শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুব ও মহিলা সংগঠন শক্তিশালী হতে থাকে। জমি দখলের লড়াই, মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার প্রতিবাদে সারা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ বইতে থাকে। তামাম বাংলার লড়াকু জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই মহকুমার মানুষ ও ইতিহাস রচনায় বদ্ধপরিকর হয়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় ইস্যুতে এ অঞ্চলের প্রগতিশীল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। কিউবা-ভিয়েতনাম-কোরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে, জাতীয় স্তরে সাম্প্রদায়িকতা-বিচ্ছিন্নতাবাদ- মৌলবাদের বিরুদ্ধে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য এবং গণমুখী কৃষি-শিল্প-শিক্ষানীতির দাবীতে এখানকার মানুষ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। জনগণের এই অভূতপূর্ব জাগরণে আতঙ্কিত হয় শাসকদল কংগ্রেস ও জমিদার-জোতদার শ্রেণী। এই সময় এই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে (যেমন বৈদ্যপুর, কালনা, বাঘনাপাড়া, মধুপুর, ধাত্রীগ্রাম, নসরৎপুর, শ্রীরামপুর, পূর্বস্থলী, নাদনঘাট, কুসুমগ্রাম, মন্তেশ্বর) ইন্দোনেশিয়ার কামি-কাফি, জার্মানীর ব্লাক শার্টের আদলে গড়ে তোলা হয় মস্তানবাহিনী, — যারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজ এই অঞ্চলে সংগঠিত করে।

বৈদ্যপুরনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক শ্রীকালীকৃষ্ণ সামন্ত বলেন — ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে স্থানীয় জমিদারদের চোরাই জমি ভাগচাষীরা দখল করতে থাকায় জমিদারদের রাতের ঘুম চলে যায়। বৈদ্যপুর গ্রামের দক্ষিণে বরবরকুলি গ্রামের মোড়ল পরিবারের প্রায় ৭০০ বিঘা জমি এই সময় অধিগ্রহণ করা হয়। এই জমি দখলের নেতৃত্বে ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোনার, মহাদেব ব্যানার্জী, অনন্ত ঘোষ

প্রমুখ। মোরারী মুখার্জীসহ কয়েকজন বড় বড় জমিদার সরাসরি লড়াই-এর ময়দানে না নেমে কংগ্রেস(ই) মদতপুষ্ট যুবকদের নিয়ে পুলিশের সহায়তায় কুখ্যাত ফ্যান্সী ক্লাব গড়ে তোলে। টাকা, মদ, নারী ছিল এই ক্লাব সদস্যদের নিত্য সঙ্গী। বামপন্থী আন্দোলনকে দমন করার জন্য বামপন্থীদের হত্যা করা, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো ছিল তাদের কাজ। বর্ধমান জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা শহরের মেহেদী বাগানের সমাজবিরোধী ও গুণ্ডাদের যোগাযোগ ছিল।

ফ্যান্সী ক্লাব বৈদ্যপুর ও এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস কায়েম করে। বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষক কালীকৃষ্ণ সামন্ত, বিজন বিকাশ ভট্টাচার্য, তারক ঘোষ ও পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যকে উৎখাত করা হয। এই ক্লাব স্কুলের পরিচালন সমিতির ভূমিকা পালন করতে থাকে। ক্লাবের কোনো সদস্য কোনো সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে পাত্রীর বাবা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারতেন না। ফলতঃ বলপূর্বক সুন্দরী রমণীকে এরা বিবাহ করেছে। ক্লাব সদস্যদের বর্বর আক্রমণে নিহত হয়েছেন — আব্দুল মান্নান, জামাল উদ্দিন, মঙ্গল হেমরম, খেঁদা মুড়া, মলিনা সাধুখাঁ ও কালো শেখ। বামপন্থীদের হত্যা করা ছাড়াও সমগ্র সত্তরের দশক ফ্যান্সী ক্লাবের সদস্যরা বোমাবাজি, স্কুলবাড়ি পোড়ানো, টাকা আদায়ের জুলুম, দোকানপাট-ধান-মুরগী-ছাগল লুঠ ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

১৯৬৯-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নিধনের ভয়ঙ্কর সময়ে কালনা মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল তথা সমাজবিরোধীদের হাতে ৪৫ জন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীর যোদ্ধা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। নাদনঘাট, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর অঞ্চলে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। ১৯৭১-র ২রা জুলাই কালনা স্টেশনে কংগ্রেস ঘাতকবাহিনী রাতের অন্ধকারে জেলার বামপন্থী আন্দোলনের নেতা মহাদেব ব্যানার্জীকে অমানবিকভাবে খুন করে। মুজাফ্ফর আহম্মদের 'নির্বাচিত রচনা সংকলন'-এ এই হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সত্তরের দশকে খুন-সন্ত্রাসের নায়কেরা বিভিন্নভাবে নারীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই মহকুমা অঞ্চলে বামপন্থীদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ অব্যাহত আছে। অবশ্য আশির দশকে এই আক্রমণের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ১৫ই মার্চ কালনা কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী সুশোভন মুখার্জীকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করায় ১৬ই মার্চ তিনি নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অনেক মনে করেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বর্ধমান শহরের সমাজবিরোধীরা যুক্ত ছিল। আশির দশকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছাড়াও কিছু পারিবারিক হত্যাকাণ্ডও সংগঠিত হয়েছে। এমনকি সম্পত্তির লোভে বৌদিকে খুন করা হয়েছে (মহেশগড়িয়া গ্রামে)। পারিবারিক কারণে গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু বরণের ঘটনাও অসংখ্য।

বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকায় এই মহকুমা অঞ্চলে গরীব মানুষদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন করা হয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের মজুরীও বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ও তাঁত শিল্প এখানে বর্তমান। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশির দশকে এই মহকুমা অঞ্চলে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা হার বৃদ্ধি পেলেও জাত-পাত, ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষ করে সমুদ্রগড়, পূর্বস্থলী, খড়দত্তপাড়া, বাবুইডাঙ্গা লক্ষ্মীপুর, রাইগ্রাম, মামুদপুর, কুসুমগ্রাম ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে।

কালনা নিবাসী হরিশবাবু তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন — যারা চুরি-ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই যে অভাবের তাড়নায় এই কাজ করছে এমনভাবা সঠিক হবে না। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন — কালনা শহরের নীচুতলা এলাকায় মা তার সন্তানকে চুরি করতে না নিয়ে যাওয়ার জন্য পাড়ার অন্যান্যদের কাছে অভিমান প্রকাশ করেন। নতুন গ্রাম, নাদাই, কালীনগর, লক্ষ্মীপুর, সমুদ্রগড়, ভাগড়া ইত্যাদি গ্রামের যুবকরা চুরি-ডাকাতির সঙ্গে বেশীমাত্রায় যুক্ত। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত অনেকের ধরা পড়ে গণপ্রহারে মৃত্যু হয়েছে।

পূর্বস্থলী ১ (এক) থানার রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় ১৯৮৫ সালে ডাকাতি সংঘঠিত হয় ছয়টি, চুরি ৬৬টি, ধর্ষণ ৬টি, শ্লীলতাহানি ৪টি, বধূহত্যা ৭টি, বধূ নির্যাতন ২টি, হত্যা ১৩টি, দাঙ্গা ৪২টি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে ৬৮টি। ১৯৮৬ সালে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ১৯৮টি। ১৯৮৫ সালের থেকে সংখ্যায় কম হলেও এই বছর চুরি (৭০টি), ছিনতাই (১১টি), ডাকাতি (৯৯টি), নারীধর্ষণ (১০টি), বধূহত্যা (১০টি) বেশী হয়। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে যথাক্রমে ২০৯ ও ২৬৪টি করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে পূর্বস্থলী ১ থানা এলাকায় এর সংখ্যা ২২১টি। লক্ষণীয় যে, এই বছর সাম্প্রদায়িক দল বি. জে. পি.-র প্রভাব এই এলাকার কিছু সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদীরাও মাথাচারা দিয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ৪টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এলাকায় উত্তেজনার পরিমণ্ডল তৈরি করে।

১৯৯০-'৯৫ সময়কালে রাজনৈতিক আক্রমণ বেশীমাত্রায় লক্ষ করা যায়। সমগ্র কালনা মহকুমা অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে আই. পি. এফ.- কংগ্রেস জোটের কর্মীরা রাতের অন্ধকারে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে শাণিত করে। ধনী শ্রেণী বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যারা অতিরিক্ত জমির মালিক তারা বেশ কিছু আই. পি. এফ. কর্মীকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বামপন্থী কর্মীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বিশেষত নাদনঘাট বিধানসভা অঞ্চলে এই রাজনৈতিক অপরাধ প্রবণতার চিত্র লক্ষ করা যায়। নাদনঘাট অঞ্চলের বামপন্থী আন্দোলনের নেতা বাগবুল ইসলামকে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে হত্যা করায় কংগ্রেস-আই. পি. এফ. জোটের ষড়যন্ত্র স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় ব্যর্থ হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৯৯৪-র শেষভাগে। ১৯৯০-'৯৫ সময়কালে পূর্বস্থলী ১

থানা এলাকায় সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাব সংখ্যা নিম্নরূপ :

সাল	চুরি	ডাকাতি	ছিনতাই	ধর্ষণ	বধূহত্যা	সাম্প্রদায়িক	অন্যান্য
১৯৯০	৬৭	৪	২	৭	৯	৪	৬৬
১৯৯১	৭৭	২	২	২	৬	১০	৪২
১৯৯২	৩৯	২	৪	২	৩	২	২৬
১৯৯৩	২৮	২	২	১	২	২	১১
১৯৯৪	২৮	২	২	২	৪	x	২৫
১৯৯৫	২৩	১	১	২	৩	x	২৭

উপরের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৯০-'৯১ সালে চুরির সংখ্যা বেশী হলেও ১৯৯৫ সালে তা অনেক কম। বর্তমানে কালনা মহকুমায় ধর্ষণ বধূহত্যার সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। সবচেয়ে নেতিবাচক দিক হল এই দশকের শুরুতেই সমগ্র মহকুমা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। ১৯৯১ সালে 'রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক' ভারতের রাজনীতিতে যে অস্থিরতার জন্ম দেয় — তার প্রভাব এই মহকুমাব পূর্বস্থলী থানা এলাকায় অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রতীয়মান হয়। স্বভাবতই ১৯৯১-এ ১০টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আত্মপ্রকাশ করে। সমুদ্রগড় পূর্বস্থলী, খড়দত্তপাড়া, হামিদপুর, লক্ষ্মীপুর, চুপি, জামালপুর ইত্যাদি গ্রামে উত্তেজনা চরমে ওঠে। অবশ্য শেষপর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসন ও প্রগতিশীল-শান্তিপ্রিয় মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই জাতীয় অপরাধজনিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী - 'বর্ধমান · ইতিহাস ও সংস্কৃতি' তৃতীয় খণ্ড।
২। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী — ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড,
৩। হরিশ কর — সাক্ষাৎকার ৩০-১০-৯৫, কালনা, বর্ধমান
৪। কালীকৃষ্ণ সামন্ত — সাক্ষাৎকার ৩-৩-৯৬, বৈদ্যপুব, বর্ধমান
৫। বাগবুল ইসলাম — সাক্ষাৎকার ১৬-৮-৯৬, ইসলামপুব, বর্ধমান
৬। স্মরণিকা — সারা ভারত কৃষকসভা, বর্ধমান জেলা ৩২তম সম্মেলন ১৫-১৮ অক্টোবব ৯২ কম. সুবোধ ভাওয়ালনগর (জাহান্নগর)
৭। স্মরণিকা — DYFI বর্ধমান জেলা একাদশ সম্মেলন ১৮-২০ নভেম্বর '৯৪, পুরশ্রী, কালনা
৮। SFI বর্ধমান জেলা : ছাত্রসংগ্রামে বর্ধমান
৯। মুজাফ্ফর আহম্মদ — 'নির্বাচিত রচনা সংকলন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১০। পূর্বস্থলী থানা ১ (এক-)র রিপোর্ট।

আধুনিক ভারতের রাজস্ব ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

রঞ্জিত সেন

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জেমস মিল যখন তাঁর 'দ্য হিস্টরি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটি রচনা করেন তখন একটি রাজস্ব-বিতর্ক জোরালোভাবে আত্মপ্রকাশ করল। এর ঠিক চব্বিশ বছর আগে ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছে। এই বন্দোবস্তের মধ্যে সুনীতি ও সুসংগঠন ছিল — এ কথা অনেক ইংরাজই বিশ্বাস করতেন। যারা এ বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা আরও এক বৃহত্তর বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করেই তা মেনে নিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যাচার আর অরাজকতার যুগ। ইংরাজরা ভারতবর্ষকে নিঃসীম অসংগঠন (disorder) থেকে সংগঠনে নিয়ে গিয়েছিল, অব্যবস্থা (chaos) থেকে নিয়ে গিয়েছিল ব্যবস্থায়। আগে যেখানে ছিল নৈরাজ্য সেখানে এল শাসন, যেখানে ছিল অবিচার সেখানে এল যুক্তিগ্রাহ্য নীতি নির্ভর মার্জিত প্রশাসন।

জেমস মিল নিজেও এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎকর্ষে বিশ্বাস করতেন তাদের থেকে মিল ভিন্ন ছিলেন। তিনি একথা মানেননি যা অন্যরা মানতেন যে নীতি এবং সংগঠনের এমন মিলন আর কখনো এদেশে হয়নি। মিল ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে বসে ভারতবর্ষকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমন লোকও ছিলেন যারা জাতিতে ইংরাজ, পেশায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসক বা কর্মচারী এবং সেই উপলক্ষে অনেকদিন ভারতবর্ষের বাসিন্দা। তাঁরা ভারতবর্ষকে অনেক কাছ থেকে দেখেছিলেন। ফলে মিলের মতন দীর্ঘ সমালোচনা তাঁরা লিখতে পারেন নি। উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝানো যাক। মিলের বই প্রকাশের এক দশকের মধ্যে, ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জন ম্যালকমের "১৭৮৪ থেকে ১৮২৩-এর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস" (Political History of India, from 1784 to 1823)। দুই খণ্ডে রচিত এই বইটির মধ্যে ম্যালকম কুড়ি পৃষ্ঠার বেশী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন নি।

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মিল কোম্পানীর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে যতখানি চিন্তিত ছিলেন তাঁর সমসাময়িক অনেকে ততখানি ছিলেন না। আসলে আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত ভূমিরাজস্বের বিষয়টি নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব নিয়ে ইতিহাস রচয়িতারা যত বেশী মাথা ঘামাতেন তাদের

উত্তরসূরীরা ততখানি ঘামাতেন না। যা হয়েছিল কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্তে। "দ্য গ্রেট ল্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ বেঙ্গল" — "বাংলার অসাধারণ ভূমিব্যবস্থা" — এ রকম কথা তখন প্রশাসকদের মধ্যে প্রায় চালু হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এইখানেই ছিল মিলের আপত্তি। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে রাখা ভারতবর্ষের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় দলিল দস্তাবেজ মিল পাঠ করেছিলেন। তার ভিত্তিতে তাঁর ছয় খণ্ডে প্রামাণিক ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস — The History of British India — গ্রন্থে তিনি ২০০ পৃষ্ঠা কর্নওয়ালিস ব্যবস্থার সমালোচনা লিখে ফেলেন। প্রথমত জমিদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা, তার উপর চিরস্থায়ী — এর কোনটিকেই আর তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। কর্নওয়ালিস ভুল করেছেন — ভারতবর্ষের ইতিহাস আর রাজস্ব ব্যবস্থা কোনটাই তিনি বোঝেন নি। তা বলে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা তা মেনে নেবেন এ কথা মিল স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। কিন্তু তাই যখন বাস্তবে ঘটল তখন মিল কলম ধরলেন। লিখে ফেললেন কর্নওয়ালিস ব্যবস্থার ২০০ পৃষ্ঠা সমালোচনা। শুরু হল রাজস্ব নিয়ে নতুন বিতর্ক।

আসলে মিলের প্রেরণা ছিল একটি বড় প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। সংক্ষেপে এই রিপোর্টের নাম "দ্য ফিফম্ রিপোর্ট"। এই রিপোর্টের মধ্যে যে বক্তব্য ছিল তা মূলত রায়তওয়াড়ি ব্যবস্থার পক্ষে ব্যবহার্য যুক্তি ও তথ্য। মিল এই রিপোর্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভূমি রাজস্বের প্রশ্নটি কোথাও থেমে থাকে নি। আঠারো শতকের শেষে প্রশ্নটি ছিল সুষ্ঠু ও সর্বাধিক রাজস্ব আহরণের প্রশ্ন। তারপরে দাঁড়াল রাজস্বকে নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণীয় বা গ্রাহ্য ভূমি ব্যবস্থা হতে পারে তার প্রশ্ন। এর পরে প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়াল ভূমি সম্পর্কের প্রশ্ন। তার সঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়াল প্রজা স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত উনিশ শতাব্দীর শেষে সমস্ত প্রশ্নটি বিরাটাকার ধারণ করে ভারতীয় সম্পদের বহির্নিষ্কাষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের গুণাগুণের প্রশ্নে গিয়ে শেষ হল।

উনিশ শতাব্দীর শেষে যাঁর লেখা নিয়ে বিতর্ক শুরু হল তিনি হলেন "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া"র এবং তার সংশ্লিষ্ট "দ্য ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" গ্রন্থের লেখক ডব্লু. ডব্লু. হান্টার। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র কি তা হান্টার ভালভাবে বুঝতেন। তিনি একটি ছোট বই লিখেছিলেন নাম "ইংল্যান্ডস্ ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া"। এই বইটিতে তিনি লিখলেন যে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সমস্ত জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ — তাঁর ভাষায় চল্লিশ মিলিয়ন, মানুষ অনাহারে থাকে। খাদ্য জীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দান এ কথা বলাটা তখন দুঃসাহস বলে ধরে নেওয়া হতো। তাই জনগণ একেবারে খাদ্য পায় না এমন কথা না বলে হান্টার বললেন জনগণ অ-পর্যাপ্ত খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে— "go through life on insufficient food" যদি তাই হয় হান্টার প্রশ্ন করলেন — কিভাবে বলা যাবে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন, বিশেষ করে ব্রিটিশ কৃষি অর্থনীতি ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সার্থক? ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে অর্থসঙ্কট খুব বেশী ছিল

— এ কথা সবাই মেনে নিয়েছিলেন। খাদ্য সঙ্কট বললেও শাসনকর্তা মেনে নিতেন কারণ তা আপত্তি করার উপায় ছিল না, কারণ উনিশ শতকে দশকে দশকে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কিন্তু মানুষ খেতে পাচ্ছে না বা না খেয়ে বিপুল মানুষ জীবনধারণ করছে এমন কথা জাতীয়তাবাদীরাও সচরাচর বলতে সাহস করতেন না। রমেশ দত্ত ভারতীয় সম্পদের বহির্নিষ্কাষণের কথা বলেছেন। নওরোজী বলেছিলেন ব্রিটিশ ভারতের অভাবের বা দারিদ্র্যের জন্মদাতা অ-ব্রিটিশ শাসনের কথা। মানুষ যে বিপন্ন ও অসহায় এ রকম সমালোচনা প্রশাসকদের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হাত ধরে মহামারীর আনাগোনা, খালের অভাবে সেচবিহীন প্রান্তরে কৃষিকাজ শুকিয়ে যাওয়া, রেল বিস্তারের ফলে বিদেশী পুঁজিপতির জোরে সরকারী অর্থের বিনাশ ও সাদা চামড়ার মানুষের রাজকর্মচারী হওয়ার খেসারত দিতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাওয়া, ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যানচেস্টারের শিল্পপতিদের চাপে ভারতীয় শিল্পকে বাড়তে না দেওয়ার দুরভিসন্ধি প্রসূত শুল্ক নীতির সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ঔপনিবেশিক প্রসাশনে যাতে ভারতীয়রা প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমিয়ে দেওয়া, ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার যোগ্য দেশীয় মানুষদের না দেওয়ার চক্রান্ত এবং সর্বোপরি দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে জনমত গড়তে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র — এই সব বিষয়গুলির উত্থানের ফলে যে জটিল পরিস্থিতির অভ্যুদয় হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে হান্টারের কথাগুলি প্রশাসকদের কাছে খুবই যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হল। কিন্তু প্রশাসনে বসে নিজেদের কুকর্ম বা সুকর্মের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়া সাদা আদমীদের ধাতে ছিল না। তার উপর হান্টার নিজেই নিজের কথার মধ্যে ফাঁক রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূচনার আগে, অর্থাৎ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে, গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবন সংগ্রাম কম ছিল। ব্রিটিশ যুগে তা বেড়েছে। তিনি লিখলেন, "The struggle for life [of rural Indians] is hards than it was when the country passed into our hands". এর কারণ সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হান্টার সাহস করেননি। তিনি ব্রিটিশ কৃষিনীতির দুর্বল দিকগুলির কথা বলেছেন কিন্তু কৃষিনীতির ব্যর্থতাই যে দায়ী এইরকম স্পষ্ট করে তিনি বলেন নি। এর বিকল্পে সহজতর রাস্তাটি তিনি নিলেন। তিনি বললেন যে, ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধিই জীবন সংগ্রাম কঠিনতর হওয়ার কারণ।

এইখানেই প্রশাসকদের হাতে হাতিয়ারটি তিনি তুলে দিলেন। ব্রিটিশ অর্থনীতির সাফল্য না থাকলে কি জনসংখ্যা বাড়ত? জনসংখ্যা বৃদ্ধি ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় মাপকাঠি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বললে ম্যালথাসের (নীতিকে প্রয়োগ করে জনজীবনের বিপর্যয়কে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে পড়ে। তাতে সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব কমে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দায়িত্ব কমা সহজ ছিল না, কারণ হান্টার তাঁর England's Work in India তে (পৃঃ ৬১) স্পষ্ট করে বলেছেন যে শুধু বাংলাদেশের এক কোটি তিরিশ লক্ষ লোক — তাঁর ভাষায় তেরো মিলিয়ন (১৩,০০০,০০০) — মানুষ "বরাবরের মত খারাপ আছে" এবং আরও এক কোটি মানুষ (দশ মিলিয়ন ঘন দুর্ভিক্ষের জন্য বিপন্ন হচ্ছে।

হান্টার এত স্পষ্ট করে বলাব ফলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসল। এই সময়ে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সচিব ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড সি. বাক। তিনি স্থির করলেন যে হান্টারের সমস্ত কথার জবাব দিতে হবে। অতএব ভারতবর্ষের সমস্ত প্রেসিডেন্সিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল গ্রামীণ জীবনের অবস্থা ও গ্রামীণ দারিদ্র নিয়ে প্রতিবেদন তৈরী করতে। হান্টারের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে 'অসত্য' বা 'আংশিকভাবে সত্য' তা স্থির করার জন্য । লক্ষ্যণীয়, সরকারী সার্কুলারে যে কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা হল 'অসত্য' বা 'আংশিকভাবে সত্য'। মিথ্যা false, lie – এই রকম কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। ইংল্যান্ডে এই যুগটি ছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার যুগ। শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর মহারানী ভারতবাসীর সামনে এক সমৃদ্ধ যুগের ছবি তুলে ধরেছিলেন — দিয়েছিলেন ভারতবাসীকে এক স্বপ্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন। অথচ তার পর তিন দশক পার হতে না হতেই ছবি গেল বদলে। মহারানীর প্রতিশ্রুতি হল ব্যর্থ।

অতএব স্বাভাবিক নিয়মে হান্টারের লেখার পর শাসকদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এডওয়ার্ড বাক-এর নির্দেশ শিরোধার্য করে ভারতবর্ষে দারিদ্র্যর অভিযোগ থেকে সরকারকে বাঁচাবার জন্য মাদ্রাজের রাজকর্মচারী শ্রীনিবাস রাঘবায়েঙ্গার এক বিরাট প্রতিবেদন লিখে ফেললেন। এই প্রতিবেদনের নাম — "মেমোরান্ডাম অন দ্য প্রগ্রেস অফ দ্য ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি ডিউরিং দ্য লাস্ট ফরটি ইয়ার্স অফ ব্রিটিশ এ্যাডমিনিসট্রেশন ১৮৯৩ সালে মাদ্রাজ সরকার এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে রাঘবায়েঙ্গারের বিপরীত মেরু থেকে অন্যান্য লেখকরা ভিন্ন কথা বলতে শুরু করলেন। তাদের লেখনী থেকে পরবর্তী দু'দশকের মধ্যে প্রকাশ হতে শুরু করল ব্রিটিশ শাসনের অগ্নিবর্ষী সমালোচনা। ১৮৮৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হল উইলিয়াম ডিগবির 'ইণ্ডিয়া ফর দ্য ইণ্ডিয়ানস্ এন্ড ফর ইংল্যান্ড'। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হল তাঁর "প্রস্পেরাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, এ রিভিলেশন ফ্রম রেকর্ডস্', ১৯০১ সালেই লণ্ডন থেকে ছাপা হল দাদাভাই নৌরাজীর "পভারটি এ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন্ ইণ্ডিয়া" এবং ১৯০৮ সালে লণ্ডনের ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে এল রমেশচন্দ্র দত্তর বিখ্যাত বই "দ্য ইকনমিক হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া ইন্ দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ"।

এইভাবে ভারতীয় জনমত যখন ভারতীয় দারিদ্র নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে তখনই রাঘবায়েঙ্গারের উপর দারিদ্র নিয়ে গবেষণার দায়িত্ব পড়ল। তাঁর কাজ হল একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিরুদ্ধে লজিক গড়ে তোলা। বিষয়টিকে এইভাবে পেশ করা হয়েছিল : জনগণের অধিকাংশই প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না । এই বক্তব্য নাকচ করার কাজে রাঘবায়েঙ্গার নেমে পড়লেন।

রাঘবায়েঙ্গার যে বইটি লিখেছিলেন তার মোট আয়তন ৬৫০ পৃষ্ঠা। গ্রামীণ মানুষের কল্যাণ ব্রিটিশ শাসনে কমে আসছিল এই বক্তব্যকে নাকচ করা খুব সহজ ছিল না। রাঘবায়েঙ্গারও তা পারেন নি। কিন্তু তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে ব্রিটিশ শাসনের মর্যাদাকে তুলে

ধরতে। এই কাজের জন্য ১৮৯৩ সালে তাকে সি. আই. ই. খেতাব দেওয়া হয়। সি আই. ই.-র অর্থ হল Companion, Order of Indian Empire]। রাঘবায়েঙ্গার তিনটি কথা বলেছিলেন — এক, ভারতবর্ষের কৃষিজীবীদের অধিকাংশই দরিদ্র দুই, গ্রাম-সমাজের অপেক্ষাকৃত উপরের দিকের স্তরেব মানুষদের বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে তিন, গ্রাম সমাজের সমস্ত জনসংখ্যার সঙ্গে একেবারে নিম্নতম পর্যায়ের মানুষের যে অনুপাত তার হ্রাস হয়েছে। তাঁর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি — "the great majority [of the agricultural classes] was very poor... [though] three certainly has been an improvement in the material condition.... of the upper strata of society and a reduction in the percentage which the lowest grades bear to the total papulation" [**Memorandum on the progress of the Madres Presidency,** p, 176] ।

রাঘবায়েঙ্গার গ্রাম সমাজের উপরের স্তর, নীচের স্তরের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ গ্রাম সমাজের স্তরীভবনের কথা তিনি স্বীকার করে নেন। এবং তিনি একথাও স্বীকার করে নেন যে ব্রিটিশ শাসনে গ্রামসমাজেব উপরেব স্তরই শুধু উপকৃত হয়েছিল, অন্য কোন স্তবের মানুষ নন। এখন প্রশ্ন হল যে গ্রাম সমাজের স্তরীভবনের ঘটনা কি ঔপনিবেশিক ঘটনা, না প্রাক্-ঔপনিবেশিক? মাদ্রাজের হস্তান্তরিত জেলা বা সিডেড্ ডিস্ট্রিক্টস্ (ceded Districts) সম্বন্ধে মনরো (Munro) যখন লিখেছিলেন তখনও সমাজে স্তরীভবন স্পষ্ট ছিল। মন্‌রো গ্রাম সমাজে তিনটি স্তরকে দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথম স্তবে ছিল উন্নততব কৃষক যাদের "better sort" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বলা হত 'পট্টাদার' (pattadar)। এরা ছিল রায়তওয়াড় কৃষক জমির স্বত্বাধিকারী ও রাজস্ব প্রদানকারী কৃষকদের ২০ শতাংশ ছিল এই কৃষকরা। তারা সমস্ত রাজস্বের ৩৫ শতাংশ প্রদান করত। দ্বিতীয় স্তরে ছিল এই পট্টাদারদের সামান্যভাবে অবনমিত অংশ যাদের 'middling sort' বলা হয়েছে। সমস্ত পট্টাদারদের ৪৫ শতাংশ কৃষক এই মধ্যস্তরে বাস করত। তারা প্রথম স্তরের কৃষকদের মতই সমপরিমাণ রাজস্ব দিত। তৃতীয় স্তরে ছিল দরিদ্র কৃষক যাদের বলা হত 'poorer sort"। সামগ্রিকভাবে সমস্ত কৃষকদের ৩৫ শতাংশ মানুষ এই সর্বশেষ স্তরে বাস করত। মোট রাজস্বের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ তারা দান করত। হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে যত মানুষ বাস করত তার ২০ শতাংশ ছিল গ্রামের এই উপরের স্তরের মানুষ, আর ২০ শতাংশ ছিল গ্রামের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ। উপরের স্তরের গ্রামীণ মানুষ মধ্যস্তরের মানুষ খাদ্য ও পণ্য যা ভোগ করত তার থেকে দুই-তৃতীয়রাংশ বেশী ভোগ করত এবং সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদের থেকে দ্বিগুণ খাদ্য ও পণ্য তারা আত্মসাৎ করত। সমস্ত হস্তান্তরিত জেলায় এই রকম উচ্চস্তরের মানুষের সংখ্যা চিল চার লক্ষ - ৪০০,০০০।

উপরের যে পরিসংখ্যান মনরো দিয়েছেন তা ১৮১৩ সালের মাদ্রাজ জেলার একটি অংশের মানুষের মাথাপিছু পণ্যভোগের হার। এই পরিসংখ্যান থেকে এ কথাটি অনস্বীকার্য যে গ্রাম সমাজের স্তরীভবন ঔপনিবেশিক যুগের ঘটনা নয় — তা প্রাক্-

ঔপনিবেশিক। ঔপনিবেশিক যুগে তা জোরালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যা একান্তভাবে ঔপনিবেশিক ঘটনা তা হল এই যে গ্রামসমাজের উপরের স্তরের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল উনিশ শতকের শুরু থেকেই। সম্পন্ন কৃষকের সম্পদ বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। এইখানে ব্রিটিশ শাসন গ্রাম সমাজে মেরুবিন্যাস ঘটিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত কয়েকটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।

১। Burton Stein ed., **The Making of Agrarian Policy in British India 1770-1900.**

২। James Mill, **The History of British India.**

৩। Walters Relly Ferminger ed., **An Introduction to the Fifth Report.**

৪। John Malcolm, **Political History of India from 1784 ro 1823**

৫। Stein, **Eighteenth Century India**

৬। Stein, Thomas Munro.

৭। Srinivasa Raghavaiyangar, **Memorandum on the progress of the Madras Presidency.**

"বঙ্গীয় ইতিহাসতত্ত্বের" সন্ধান : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্ কথন: আধুনিককালে ইতিহাসচর্চা বলতে আমরা যা বুঝি তার তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বস্তুত আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অন্তত কয়েকটি দিক আজ সর্বজন গ্রাহ্য যথা-তথ্য এবং মিথের মধ্যে সুস্পষ্ট ফারাক নির্ণয়— তথ্যের যথাযথ উৎস নির্দেশ-তথ্যের বিশ্লেষণ — এক দিকে সমালোচনাহীন ভক্তি, অন্যদিকে ঘৃণামিশ্রিত প্রত্যাখ্যান দুটিকেই সযত্নে পরিহার করা ইত্যাদি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে ইংরাজরা আসার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চা বলে কি আদৌ কোন বস্তু ছিল? থাকলে তার চেহারাটা কী রকম? এখনও পর্যন্ত বেশীরভাগ ইতিহাসবিদেরই ধারণা যে ইতিহাস চর্চার উপরোক্ত লক্ষ্মণগুলির অস্তিত্ব এখানে ছিল না বললেই চলে (দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে)।

কথারম্ভ : আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্যায়ের বাংলাদেশকেই বেছে নিয়েছি। আমরা দেখতে পাব যে ইংরাজরা আসার পরও বাংলাদেশে এক ধরনের 'ইতিহাস' রচিত হয়েছে যেখানে একাধারে তথ্য-কল্পনা-ঈশ্বরচেতনা-নিয়তিবাদ মিলে মিশে গিয়েছে। যাদের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রামপ্রসাদ মৈত্রেয়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এদের রচনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।[১] আমরা দেখতে পাই যে, এদের রচনার সঙ্গে পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদ্‌দের রচনার শুধুমাত্র পদ্ধতিগত নয় এমনকি মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও গুণগতমাত্রায় তফাৎ ঘটে গিয়েছে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি এই দুই গোষ্ঠীর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী যখন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকটাই মোহমুক্ত বা কিছু পরিমাণে নির্মোহ মূল্যায়ন করেছেন সেখানে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর রচনা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি মায়াজ্ঞানে আবিষ্ট। কেন এই বৈপরীত্য? একথা বলার আগে আমরা এটাও দেখব যে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা যথাক্রমে উইলিয়াম কেরী থেকে শুরু করে শিশির দাশ, ডেভিড কফ্ অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রবোধচন্দ্র সেন পর্যন্ত কেউ-ই প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর রচনাগুলিকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা অনেক সময় সযত্নে এদের নামগুলিকেও পরিহার করেছেন।[২] কারণ ছিল দুটো, প্রথমতঃ "উনিশ শতকে জাতীয় ইতিহাস রচনার তাগিদ উঠে এসেছে এক বিশেষ আদিকল্প থেকে, সেই

আদিকল্পের উৎস দ্বিবিধ, একদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গ্রাহ্যতা ও দায় এবং অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের ক্ষমতার আকাঙ্খা ও স্বপ্নলব্ধ রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ''।[৩] দ্বিতীয়ত রামপ্রসাদ-মৃত্যুঞ্জয়দের ''রচনায় কোম্পানী কোনো উচ্চতর সভ্যতা, দর্শন ও জ্ঞানদীপ্ততার বাহক নয়। লক, হিউম বা যুক্তিবাদী দর্শনের আশীর্বাদ কোম্পানীর শাসনের দান হিসেবে স্বীকৃত হয় নি। যে রাষ্ট্র কোম্পানী স্থাপন করেছে তার ভিত্তি ধর্ম, তার গ্রাহ্যতা শরণে, মানীর মান রক্ষায়।'' .... তাই প্রাক্ কোম্পানী যুগ মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ শাসনের ব্যত্যয় এবং নিমকহারামি বারবার সুখের রাজ্যে আগুন লাগিয়েছে, দেশের কপাল ভেঙেছে। ইতিহাসের এই ছকে কোম্পানীর শাসনও পড়ে। ফলে সেই শাসনের ভাগ্যে যে অনুরূপ ব্যতিক্রম হবে না, পাপের স্পর্শ লাগবে না, এই রকম কোনো নিশ্চয়তা কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় নেই। ''ব্যতিক্রম হলে পতন অনিবার্য''।[৪]

প্রাক্ কোম্পানী যুগের তিনজন পণ্ডিত যথাক্রমে রামরাম বসু (**রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র** ১৮০১), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (**মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য-চরিত্রম** - ১৮০৫) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (**রাজাবলী** - ১৮০৮) উদাহরণ তুলে ধরে সমসাময়িক কালের আরেকজন ঐতিহাসিকও এদেরকে প্রথম ঐতিহাসিকের মর্যাদা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্য এবং ইতিহাস চর্চার স্তরে এই তিনটি গ্রন্থকে প্রাচীনতা এবং আধুনিকতার উত্তরণশীল পর্যায়ের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে।[৫] এই ধরনের ইতিহাস চর্চার কিন্তু এখানেই সমাপ্তি।

নতুন ইতিহাসচর্চার ধারা ক্রমশ তার পথ করে নিল এবং অবশেষে জাঁকিয়ে বসল যে ইতিহাসের দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্র তৈরী করা যায় — যে ইতিহাস পুরোপুরিভাবে 'পাথুরে প্রমাণের' ওপর নির্ভরশীল এবং ইংরাজী হুইগ দর্শনের ধারায় প্রভাবান্বিত। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে একের পর এক এই ধারায় রচিত হতে শুরু করল নীলমণি বসাকের তিন খণ্ডে **'ভারতবর্ষের ইতিহাস'** — কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের **'ভারতবর্ষের ইতিহাস : ইংরেজদিগের অধিকারকাল'**, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর **'ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'** অথবা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের **'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস'** প্রভৃতি গ্রন্থ। রণজিৎ গুহর মন্তব্য : বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীয় শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে শিখল কিভাবে 'আলোকপ্রাপ্তির' পরবর্তী যুগে যুক্তিবাদী চিন্তার সাহায্যে নিজেদের অতীত ইতিহাসকে পুনর্বিচার বা পুনর্মূল্যায়ণ করতে হয়।[৬] বাঙালী ঐতিহাসিকদের কাছে তখন ইতিহাস রচনার একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'আলেকজান্ডার ডাফ', 'গ্রান্ট', 'জেমস মিল', 'মার্শম্যান' প্রভৃতির ইতিহাস গ্রন্থ। এইভাবে ইংরাজ শাসক গোষ্ঠী যেভাবে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে ভারতের অতীত ও বর্তমানের ওপর নিজেদের দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল — এর ফলে বাংলার ইতিহাস চর্চার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা কিছুই অবশিষ্ট রইল না বলা চলে। ওই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ইতিহাস চর্চার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষে ইংরাজ

শাসনের যৌক্তিকতাকেই প্রশ্ন করা এবং চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করানো। কারণ, ঔপনিবেশিক ভারতে ইতিহাস চর্চা কখনই প্রকৃত অর্থে 'ভারতীয়ত্ব' অর্জন করতে পারত না। যতক্ষণ পর্যন্ত তা ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতার মূল দিকগুলির সমালোচনা হিসেবে না দাঁড়াতে পারত।[৮] যে প্রচলিত মাপকাঠিগুলি যথাক্রমে 'এনলাইটেনমেন্ট', 'রিজন', 'প্রগ্রেস', 'র‍্যাশনালিটি', 'আধুনিকতা', একমাত্র ইউরোপীয় সভ্যতারই অবদান ও বিশ্বজনীন বলে মনে করা হয়েছিল — সেগুলিই ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভিন্ন মতাদর্শগত রূপ নিয়ে কিভাবে আমাদের দেশে হাজির হয়েছিল তা নিয়ে ইতিপূর্বেই অনেক আলোচনা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাস চর্চার আরও যে কয়েকটি ধারায় বিভাজন করা যায় — তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেলা বা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা। এই ইতিহাস চর্চা সবটাই মাতৃভাষায় এবং স্বকীয় উদ্যোগে রচিত। ব্যতিক্রমী দু-একটি ক্ষেত্রে হয়ত স্থানীয় জমিদারদের অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। এর মূল প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী রচিত **জেলা গেজেটিয়ার্স**।

তা সত্ত্বেও মূল প্রকল্পের পাশাপাশি এক সমার্থক প্রতিকল্প রচনা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় তথ্যগত ও পদ্ধতিগত ত্রুটি বা নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টি কোণের প্রভাব বেশী হলেও এটির একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ খুবই জরুরি। বাংলাভাষায় রচিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৮] প্রথম প্রবন্ধটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন ইতিহাস দর্শনের ধারাকে আঞ্চলিকতা অর্থে তিনি কোনো যুক্তি সম্মত কাঠামো দাঁড় করাতে পারেন নি। অঞ্চলগত ইতিহাসের গণ্ডী পেরিয়েই রচিত হবে দেশ- ইতিহাস। প্রায় অজ্ঞাত কারণে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন অংশ বনাম পূর্ণর চিরাচরিত বিতর্কে। আঞ্চলিকতার যখন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের সর্বাত্মক জীবন যাপনের সংজ্ঞা, সে সময় ভাবা প্রয়োজন স্বয়ং সম্পূর্ণ আঞ্চলিকতা ইতিহাসের সংজ্ঞায় কতদূর সত্য। সম্ভব কি অঞ্চলে অঞ্চলে সর্বব্যাপী এক ভিন্নতা—নৃতত্ত্বে-বসনে-ব্যসনে, কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষণে আঞ্চলিক মানুষের ভিন্নতা! যদি এমন ভিন্নতা সম্ভব হয় এবং ইতিহাস স্বীকৃত হয় সে বৈসাদৃশ্য, তাহলে না মেনে উপায় নেই ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের। যে সমস্ত উপাদান, উপকরণ করণকৌশলের দিকে ইতিহাসের আগ্রহ ও ইতিহাস গড়ে ওঠে, সে সমস্তের একটি পূর্ণতর ইউনিটকে আমরা বলছি ইতিহাসচর্চা। লক্ষ করলে দেখব, সামাজিক-প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি স্তরে বিন্যস্ত মানব ইতিহাস আসলে রূপপরিগ্রহ করতে চাইছে এক সমগ্রতার মধ্যে অংশ হয়ে, এই সমগ্রতার লক্ষ্যই তার ইতিহাসের লক্ষ্য — পুনর্নির্মাণে, গঠনে ওর চলায়। এই মন্তব্যগুলি সবটাই প্রশ্নের আকারে রাখতে চাইছি — নিজের ধারণাকেই আরও স্বচ্ছ করে নেবার জন্য — কারণ এই বিষয়েরই অন্য এক মাত্রার কথা উল্লিখিত হবে সর্বভারতীয় ইতিহাস বনাম আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক রচনায়। সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

তার আগে আসি গেজেটিযারেব কথায়। ইংরাজ রাজত্বকালে গেজেটিয়ার রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থার জন্য দেশীয় ও স্থানীয় জনসমাজের ইতিহাসের তথ্যভিত্তিক এক প্রামাণ্য ইতিহাস পঞ্জির। ভারতীয় গেজেটিয়ার রচনার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা হল অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরীর **হিস্ট্রি অফ দি গেজেটিয়ার্স অফ ইণ্ডিয়া** বইটি। বর্তমানে ভারতে ভারত ইতিহাস ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনাব ধারা এক সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময়েই প্রয়োজন হয়ে পড়ে গেজেটিয়ার রচনাব উদ্দেশ্য ও ঐতিহাসিক বিচাব। এদেশে একদল সমাজ বিজ্ঞানীদের (বিশেষত হান্টার) মধ্যে গেজেটিয়ার্সের তথ্য উল্লেখ করাব রীতি দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করা গেছে। আধুনিক বাংলাদেশের তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গেজেটিয়ার, ব্রিটিশ আমলের অন্যান্য দলিল, দস্তাবেজ অন্যতম প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

এরপরই যে প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবার দাবী রাখে—তা হল সর্বভারতীয় ইতিহাস বনাম আঞ্চলিক ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কে জটিলতা-সংঘাত-সমন্বয়েব কথা। **বারোমাস** পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে[১] পার্থ চট্টোপাধ্যায় -বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামগতি ন্যায়রত্ন, রামসদয় ভট্টচার্য্য, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ক্ষিরোদচন্দ্র চৌধুরী, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ছৈয়দ আবদুল রহিম ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি বিস্তৃত আলোচনা কবে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—যেমন ভারতের ইতিহাস আর বাংলার ইতিহাসেব এই দুই ধারার ঘোর অসংগতি রাষ্ট্র বা জাতির সার্বভৌম কেন্দ্র কোনটা তা অনেক সময়েই স্থির থাকে নি। যেটা বেরিয়ে আসে তা হল দুটি স্বতন্ত্র 'জাতীয়' ইতিহাস —একটি আর্যসভ্যতা উদ্ভুত— যা প্রধানত উত্তর ভারত কেন্দ্রিক 'ভারতবর্ষীয়দিগের ইতিহাস', অন্যটি অনিশ্চিত সূত্র থেকে উদ্ভুত 'বহুজাতিক' বাঙালির ইতিহাস—এই দুই ইতিহাসের ক্রমপর্যায়, গতিপথ, ছন্দের যে বৈসাদৃশ্য, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, তাতে ভিন্নতর কোনো ইতিহাস বোধের সম্ভাবনা নিহিত ছিল কি?''—এই প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। বাংলার ইতিহাসে পাঠান আর মুঘলকে এক করে 'মুসলমান শাসনকাল' নাম দিয়ে পর্ব ভাগ করা যায় নি—কারণ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।[১০]

আর তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এরকম স্বতন্ত্র ইতিহাস যদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লেখা হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের কোনো নির্দিষ্ট ভারকেন্দ্র-আর্যাবতে বা দিল্লীর সিংহাসনে আবদ্ধ থাকতে পারে না—এমন কি 'জাতীয়' আর 'আঞ্চলিক' ইতিহাসের গণ্ডী ছাড়িয়ে তা হয়ে উঠবে-কোনটা সমগ্র-আর কোনটা অংশ এই নতুন বিতর্কের অঙ্গীভূত। তখন এই বিকল্প ইতিহাসের সামগ্রিকতা হয়ে উঠবে, রাষ্ট্রীয় নয়

এক সঙ্গে আমাদের ভাবতে হবে ব্রিটিশ ভারতে স্কুল পাঠ্য বাংলা ইতিহাস বইগুলি সম্পর্কে। এই সমস্ত স্কুল পাঠ্য বইগুলির পর্যাক্রমিক বিবর্তন আমাদের

এযাবৎকালের ইতিহাস আলোচনায় পুরোটাই উপেক্ষিত বলা যায়। অথচ আমরা খেয়াল করলে দেখব যে বিদ্যাসাগর, সঞ্জীবচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই।[১২]

বাংলার ইতিহাস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামগ্রিক প্রয়াস আমরা প্রথম লক্ষ করি, ১৯৪৩ ও ৪৮-এ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-খণ্ডের 'হিসট্রি অফ বেঙ্গল'। তার আগেই অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেন ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে ছিল। উনিশশো পঞ্চাশে প্রকাশিত হয় নীহাররঞ্জন রায়ের **বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব** এবং ১৯৫৩-তে প্রকাশিত হয় বাংলার ইতিহাস চর্চা সম্পর্কিত প্রবোধচন্দ্র সেনের **বাংলার ইতিহাস সাধনা**। এছাড়াও অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তির সমাহার ঘটিয়ে নতুন করে ইতিহাস চর্চার প্রয়াস লক্ষিত হয় 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' (১৯৯০) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (১৮৯৪) 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) 'বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ' (১৯৫০) ও তার মুখপত্র 'ইতিহাস' ইত্যাদির মাধ্যমে। এগুলির যথাযথ মূল্যায়ন খুবই প্রয়োজনীয় - বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধানেব আরও যথাযথ বিকাশেব জন্যই।

সাতচল্লিশ-এর পরে বাংলার সত্তা খণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চাও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। "যদিও এ পার্থক্য রেখা সাতচল্লিশ পূর্ব বাংলাতেও ছিল। ..... ইংরাজী শিক্ষাকে যেভাবে নিতে পেরেছিল বাঙালী হিন্দুরা, সে রীতির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও উদ্যমহীনতা অনেকটা পিছিয়ে দেবে বাঙালি মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে। বিদেশী নিয়ম রীতির প্রতিবাদস্বরূপ সাময়িক কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নয় বাঙালী মুসলমান যেন অনেকটাই আত্মতৃপ্ত ছিল ইসলামি মুঘল সংস্কৃতি, জীবনচর্চার অতীত গৌরবে।"[১৩] ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর দেখা গেল পূর্ববাংলা তার রাষ্ট্রীয় শরিক পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন, আর রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ভারতীয় প্রদেশ পশ্চিমবাংলার থেকে — যে অঞ্চলের সঙ্গে, পূর্ব বাংলা দীর্ঘকাল ধরে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকার বহন করে এসেছে।[১৪] এই বিচ্ছিন্নতার চরিত্র এত সর্বব্যাপী যে স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তরকালে বাংলার ইতিহাসচর্চার ধারাও হয়ে পড়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা অথচ বাংলার ইতিহাস চর্চাকে সম্পূর্ণ আকার নিতে হলে প্রয়োজন দুটি ধারার মধ্যে পাশাপাশি বিচার ও একটা বস্তুনিষ্ঠা সাযুজ্যের সন্ধান। এই সঙ্গেই প্রয়োজন 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৩৩), 'সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (১৯০০) 'বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি' (১৯১১) যে গুলির মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলমান খুঁজে পেতে চেয়েছিল তাদের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যতারও একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রয়োজন।[১৫]

সাম্প্রতিককালে নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গ্রন্থগুলির নব্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শুধুমাত্র এটুকুই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন আজকের নিত্য নতুন গবেষণার আলোকে এই চিরায়ত গ্রন্থগুলির পুনর্বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। তবেই বাংলার ইতিহাসের ছবিটা ক্রমশ আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করবে।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনায়-তথ্যে উপকৃত হয়েছি পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার্সের গ্রন্থাগারিক ও বন্ধু শ্রী তরুণ পাইনের কাছে।

সূত্র নির্দেশ

১।	গৌতম ভদ্র	'প্রাক রামমোহন যুগে কোম্পানীর শাসনের প্রতি কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনোভাব,' অকাদেমি পত্রিকা. (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৯৮)।
২।	গৌতম ভদ্র	পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।
৩।	গৌতম ভদ্র	পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭।
৪।	গৌতম ভদ্র	পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।
৫।	রণজিৎ গুহ	'অ্যান ইণ্ডিয়ান হিস্টরিয়োগ্রাফি ফর ইণ্ডিয়া : এ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি. অ্যাজেন্ডা অ্যান্ড ইট ইমপ্লিকেশনস', (কলকাতা. কে. পি. বাগচী. ১৯৮৮) পৃঃ ২৮।
৬।	রণজিৎ গুহ	প্রাক্তন. পৃঃ ৪৬।
৭।	রণজিৎ গুহ	প্রাক্তন. পৃঃ ৫০।
৮।	গৌতম নিয়োগী	'বাংলায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা'. (পদাতিক, বই মেলা সংখ্যা ১৯৮৮)
৯।	রঞ্জন গুপ্ত	'আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সমস্যা'. (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ. আগস্ট ১৯৮৮)
১০।	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	'ইতিহাসের উত্তরাধিকার'। (বারোমাস এপ্রিল ১৯৯১)
১১।	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।
১২।	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।
১৩।	তরুণ পাইন	'একই মাটি জল একই নীলাকাশ' (পরিচয়-চৈত্র. ১৩৯৪) পৃঃ ৩৫
১৪।	তরুণ পাইন	প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।
১৫।	আনিসুজ্জামান	'স্বরূপের সন্ধানে' (ঢাকা জাতীয় সাহিত্য-প্রকাশনী. ১৯৭৬. পৃঃ ৭৭)
১৬।	তরুণ পাইন	পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ-সাহিত্যিক

সোমেন চন্দ : কলমধারী সৈনিক

সুস্নাত দাশ

আজ আমাদের মধ্যে থাকলে সোমেন চন্দ-র বয়স পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হতো। প্রগতিশীল সাহিত্যের সঙ্গে এতটুকুও পরিচয় আছে এমন কোন বাঙালীকে সোমেন চন্দ নাম নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ফ্যাসিস্তপন্থীদের পৈশাচিক আক্রমণে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ যদি তাঁকে মাত্র ২২ বছর বয়সে প্রাণ হারাতে না হতো তবে বাংলা সাহিত্য যে তাঁর মরমী ও বলিষ্ঠ লেখনী স্পর্শে সমৃদ্ধতর হতো এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিয়াল্লিশের অভিমন্যু : নিহত গোলাপ

ভাবতে অবাক লাগে কত পৈশাচিক ও বর্বরোচিতভাবেই না সোমেন চন্দ-কে হত্যা করা হয়েছিল। যে প্রো-ফ্যাসিস্ত, উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি সোমেনকে ঐভাবে হত্যা করল— তারা প্রগতির শত্রু এমন কথা কেউ হয়তো বলবে না। নীতিগতভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই ছিল। কিন্তু চরম দুঃখের বিষয় ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। যেমন তারা ব্যর্থ হয়েছিল সেই সময় সোমেন চন্দ ও তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির নীতি-আদর্শ কর্মসূচী অনুধাবনে। বামপন্থী অভিধা নিয়েও তাই তাদের সোমেনেব মত প্রতিভাবান তরুণকে খুন করতেও হাত কাঁপেনি। যদিও এর জন্যে পরে তাদের নাকি আপসোসের সীমা ছিল না।

কী নির্মমভাবেই না সোমেনকে হত্যা করা হয়। সেদিন ছিল ঢাকার সূত্রাপুরে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র আহ্বানে ফ্যাসিস্ত বিরোধী সম্মেলন। কলকাতা থেকে স্নেহাংশু আচার্য ও বঙ্কিম মুখার্জী ঐ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এসেছিলেন প্রগতি লেখক সংঘ-র সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীসহ দুই শ্রমিক নেতা সামসুল হুদা ও জ্যোতি বসু। বিভিন্ন জেলার প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হন। ঢাকার তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তীর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে ঢাকা জেলার শক্তিশালী দুটি রাজনৈতিক দল 'আর. এস. পি.' ও 'ফরওয়ার্ডব্লক' এই সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করে। প্রথমে এই দুটি দলের ফ্যাসিস্ত-পন্থীরা টিকিট কিনে ভুয়া প্রতিনিধি সেজে সম্মেলন মণ্ডপে প্রবেশ করে এবং 'ফ্যাসিস্ত-পন্থী' ও 'কমিউনিস্ট বিরোধী' ধ্বনি দিতে থাকে। কিন্তু

স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা আবার সশস্ত্র অবস্থায় ফিরে আসে এবং দলবদ্ধভাবে সম্মেলন মণ্ডপ আক্রমণ করে। উপস্থিত পুলিশবাহিনীর সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং পুলিশের গুলিতে একজন আক্রমণকারী নিহত হয়।

এরপর নিহত যুবকের মৃতদেহ নিয়ে ক্ষিপ্ত তাণ্ডবকারীরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের মুখোমুখি পড়ে যান সোমেন চন্দ। তিনি সম্মেলন স্থলে ইতিপূর্বে সংঘটিত কোনো ঘটনার কথা কিছুই জানতেন না। এক্রামপুর অঞ্চল দিয়ে তখন রেলওয়ে শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করে তিনি সম্মেলনে যোগদান করতে আসছিলেন। ঠিক এই সময়ে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক সোমেন চন্দ-র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর হাত থেকে 'লাল-পতাকা' ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এবং কমরেড চন্দকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে থাকে। ফলে কমরেড চন্দ-র তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আর কী নৃশংস ছিল সেই হত্যাকাণ্ড। বিকাল তিনটায় সোমেন আক্রান্ত হয়। সদর রাস্তায় তাঁর সর্বশরীরে ছোরার আঘাত করা হয় এবং ভোজালি দিয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলা হয়। খুবলে নেওয়া হয় তাঁর স্বপ্নালু চোখ দুটি। তারপর হত্যাকারীর দল তাঁর দেহের উপর দাঁড়িয়ে জয়ের আনন্দে পৈশাচিক নৃত্য করতে থাকে।

সোমেনের সাহিত্যসাধনা : ভোরের পাখির গান

সোমেন চন্দ খুব বেশী দিন সাহিত্যসৃষ্টির সুযোগ পাননি। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ এই পাঁচ বছর সময়কালে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন মোট ২৪টি ছোট গল্প, একটি উপন্যাস, দুটি নাটক ও একটি কবিতা। এগুলি এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত। হয়তো সোমেন আরও দু-একটি কবিতা-গল্প রচনা করেছিলেন যার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'বন্যা' (নির্মল ঘোষ সম্পাদিত 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৩৬৪ সনের মাঘ থেকে ১৩৪৭ সনের মাঘ পর্যন্ত) সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর দ্বিতীয় ভাগ সোমেন চন্দ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি।

মূলতঃ ঢাকার প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় লিখলেও কলকাতার কয়েকটি সাহিত্যপত্রেও সোমেনের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে, ১৯৩৭ সালে সম্ভবত, তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়। গল্পের নাম 'শিশু তপন'। দুই বাংলার যে সব পত্রপত্রিকায় সোমেন লিখতেন সেগুলি হল মাসিক 'শান্তি', 'নবশক্তি', 'বলাকা', 'প্রভাতী', 'অগ্রগতি', 'সবুজ বাংলার কথা', 'বালিগঞ্জ' প্রভৃতি পত্রিকা। তাঁর মৃত্যুর পর 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ইঁদুর', সাপ্তাহিক 'অরণি'তে ও পাক্ষিক 'প্রতিরোধ'-এ 'দাঙ্গা' ও 'সংকেত' গল্প দুটি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ তিনটি ছোট গল্প হল বাংলা সাহিত্যের সেরা সম্পদ।

বস্তুত, ইঁদুর গল্পটির অশোক মিত্র (আই, সি. এস.)-কৃত ইংরাজী তর্জমা এবং সংকেত গল্পটির লীলা রায় কৃত তর্জমার ফলে বিশ্বের অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে এই গল্প দুটি পৌঁছে গিয়েছিল। 'ইঁদুর, গল্প পড়ে মুজফ্ফর আহমেদের মত রাজনৈতিক নেতা বলতে বাধ্য হন, "পার্টি যখন আইনসম্মত হল তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দ-র লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি প্রথম পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে উঠল ... সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন।"

সোমেনের মৃত্যুর পর ঢাকা-র প্রগতি লেখক সংঘ-র পক্ষ থেকে 'সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' নামে প্রতিরোধ পাবলিশার্স একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করে। সোমেনের বিশ্বখ্যাত সৃষ্টিগুলি এই সঙ্কলনের মধ্যেই ছিল। এতে ছয়টি গল্প অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৪৩ সালে 'অরণি' পত্রিকায় সাহিত্যিক গোপাল হালদার এই সঙ্কলন গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 'আমাদের বিস্ময় - বাইশ বছরের যুবক কি করিয়া জানিল জীবনের এই সঙ্কেত। এতো শুধুমাত্র তাহার সত্তার সঙ্কেত নয়, এ যে তাহার অচেতন সহযাত্রীদেরও জীবনের সঙ্কেত—সঙ্কেত তাহাদের জীবনের আর সতীর্থ সোমেনের জীবন বোধের।'' ১৯৪২ সালে কলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স সোমেন চন্দ-র আরও ১১টি গল্প নিয়ে 'বনস্পতি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ক্রান্তি' নামক প্রগতি সাহিত্যের একটি সংকলন গ্রন্থে ১৯৩৯ সালে। তিনি ছিলেন 'ক্রান্তি'-র অন্যতম প্রকাশক। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন : 'বনস্পতি' গল্পটি আয়তনে দীর্ঘ, বড়ো গল্প না হয়ে একটি উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত। কারণ, লেখক এখানে ইতিহাসের বিশাল পটভূমিকায় গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন। ইংরেজ শাসনের পূর্বকাল থেকে (১৭৫০) একেবারে ১৯৩৯ সনের বিশাল সময় সীমার মধ্যে গল্পের প্রসার। গল্পটির কেন্দ্রতে রয়েছে একটি অতি প্রাচান বটগাছ এবং এই গাছই পীরপুর গ্রামের সুদীর্ঘকালের বহু ঘটনাবলীর সাক্ষী। বাংলাদেশের ছোট অথচ প্রাচীন একটি গ্রামের সামাজিক ইতিহাস লেখককে গভীরভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। যেসব ঘটনাবলীর উল্লেখ এই গল্পে পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলো বিশেষ কোনো একসময়ে ঘটে নি, বলা যেতে পারে বিভিন্নকালের বিভিন্ন কাহিনীকে একটি গল্পসূত্রে গ্রথিত করে তরুণ লেখক তার সমসাময়িক কালের চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন।''

সোমেন চন্দ-র গল্প প্রসঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগে (চৈত্র, ১৯৪৯, পৃঃ ৬৮৭-৯০) সাহিত্য সমালোচক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন : 'একটি রাত' গল্পে সোমেন তার বক্তব্য খুঁজে পেয়েছে, পেয়েছে বিপ্লবী মনের দ্বন্দ্ব ও চিন্তাসূত্র। আর একটি জিনিস লক্ষ করার মত — সেটা হল গল্পের শেষ মোড়ে! 'সংকেত' গল্প টিতে এসেছে তার নিজস্ব অভিসঙ্কেত, পুঁজিবাদে অনাস্থা, শোষণ নীতির বিরুদ্ধে মাত্র তীব্র প্রতিবাদ নয়, সংঘবদ্ধ প্রয়াসের কামনা। ..... 'দাঙ্গা'য় পেলাম বিরোধী শক্তির প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িকতার সস্তা মোহ, অজ্ঞতার ভয়াবহ চোরাবালি, যার ওপরে শ্রেণীভেদহীন গণশক্তির ইমারৎ খাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গল্পটিতে সোমেনের সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাই।

'ইঁদুর' অবশ্য তাঁর সার্থকতম রচনা। শেষ গল্পে সে প্রমাণ করছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরোপিত বনস্পতির কোটরে ও ফাটলে যেসব অস্বস্তিকর ইঁদুরের উৎপাত, তার গভীর কারণ রয়েছে মাটির নীচে, মূল শিকড়ে সযত্নে চাপা দেওয়া। .... বই শেষ করলে বোঝা যায় যে সোমেন চন্দ শুধু এখানেই থামত না। এই মন নিয়ে আরো ভাবত এবং মেশাতে পারত প্রকাশের তাগিদকে কর্মের প্রেরণায়। তার ভাষার সজীবতা,

ভাবের সংযম ও উপমার নতুনত্ব আপনিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে হয় নতুন যুগের গণ সাহিত্য রচনায় সে একটি মৌলিক অধ্যায় যোগ করতে পাবত।"

সোমেন চন্দ-র মহান মানবিক চেতনা মমত্ববোধের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাব অসামান্য ছোটগল্প 'দাঙ্গা'য়। যেখানে গল্পেব নায়ক অশোক একটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভায় যোগদান করতে গিয়ে বাজপথে জমাট বেঁধে থাকা বক্ত দেখে সাইকেল থেকে নেমে আসে। তাবপর জলভবা চোখে সেই বক্তধাবাব দিকে তাকিয়ে ভাবে বক্তেব জাত কি! এ রক্ত হিন্দু না মুসলমানের -- কার বস্তুত এটা ছিল সোমেন চন্দ র নিজেব জীবনেরই এক বিষণ্ণ অনুভব। ঢাকাতে দাঙ্গাব সময বিপদ সঙ্কুল মহল্লাগুলিতে গল্পেব অশোকের মতই সোমেন ছুটে যেত পরস্পর আক্রমণোদ্যত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। সোমেনেব 'একটি বার্ত' গল্পে রয়েছে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' কাহিনীর প্রভাব।

দুটি নাটক সোমেন লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'বিপ্লব' ততটা সার্থক রচনা না হলেও 'প্রস্তাবনা' নাটকটি যথেষ্ট ভাল। নর-নারীর সম্পর্ক, সামাজিক অবক্ষয়ের প্রকৃতি নিয়ে বচিত এই একাঙ্ক নাটকেব একটি মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র আছে — যা আজও ভাবায়। 'বনস্পতি' সঙ্কলনেব গল্পগুলিতে (যা অধিকাংশই সোমেনের অল্পবয়সে বচিত) এই অবক্ষয়ের চিত্র নেই, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও তত পরিণত নয়। কিন্তু গল্পগুলিতে জীবনকে দেখার, জীবনের গভীরতাকে জানার অসীম আগ্রহ বিদ্যমান। তরুণ লেখকেব সজীব মন এবং উজ্জ্বল চোখ অতি সাধারণ পারিবারিক ঘটনায়, বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণে এবং উক্তিতে নতুন কিছুর সন্ধান করে বেড়িয়েছে। জীবনের সংঘাতের চেয়ে জীবনের রস ও সৌন্দর্যই গল্পগুলোর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'বন্যা' সোমেন চন্দর একমাত্র উপন্যাস। মাত্র সতের বছর বয়সেই ১৯৩৭-৩৮ সালে রচিত এই উপন্যাস সম্পর্কে অচ্যুত গোস্বামী লিখেছেন : . . . 'বন্যা' এমন কিছু যা পড়তে গেলে সতেব বছরে শরৎচন্দ্র যে বিস্ময় সৃষ্টি কবেছিলেন, আর একবার সেই বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হয়।" বস্তুতপক্ষে ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্যব পটভূমিকায় বচিত এই কাহিনী শুধু রজত-মালতীর প্রেমোপাখ্যান নয, তাব চেয়েও অধিক কিছু — এক জাগরণের গাথা। অনেক সমালোচকের মতেই 'বন্যা' যদি ১৯৩৮ সালে প্রকাশ পেত তবে এই বছরের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখা বলে সেটা পরিচিত হতে পারত অনায়াসে।

মাত্র ২১ বছর ৯ মাসের জীবনে সোমেন চন্দর সাহিত্য চর্চাব কাল ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২-এর এক দুটি মাস। এ পর্যন্ত সোমেনের রচনার যে সন্ধান পাওয়া গেছে তার কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হল।

রচনার সময়কাল

১৯৩৭ — শিশু তপন (গল্প)

১৯৩৮ — অমিল রানু ও স্যার বিজয় শঙ্কর, পথবর্তী, সত্যবতীর বিদায়, মরুভূমিতে মুক্তি। (গল্প) বন্যা ১ম খণ্ড (উপন্যাস)

১৯৩৯ — স্বপ্ন, গান, এস. সোলজার, প্রত্যাবর্তন, রাত্রিশেষ, একটি রাত, অকল্পিত, অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন (গল্প)। রাজপথ (কবিতা)।

১৯৪০ — মহাপ্রয়াণ, ভালো না লাগার শেষ, প্রান্তর, সিগারেট, বনস্পতি, সঙ্কেত (গল্প)। বিপ্লব, প্রস্তাবনা (একাঙ্ক নাটিকা)।

১৯৪১ — দাঙ্গা, ইঁদুর (গল্প)।

১৯৪২ - মুহূর্ত (গল্প)

এই তালিকা থেকে যেটা লক্ষণীয় যে ১৯৪১-৪২ সালে সোমেন চন্দ-র লেখার পরিমাণ কমে যায়। এটা ঘটেছিল কারণ সেই সময় সোমেন একদিকে প্রগতি লেখক সংঘ অপরদিকে রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠক রূপে যেমন কমিউনিষ্ট দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, তেমনি রসদ সংগ্রহ করছেন জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে আগামী নতুন সাহিত্য সৃষ্টির। এই সময়টা সোমেনের ভাঙাগড়ার কাল, পরিণত হয়ে উঠবার সময়। কিন্তু ফ্যাসিস্ট গুন্ডারা সোমেনকে আর সময় দিতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ 'সাহিত্যিক সোমেনের' মতন সংগঠক সোমেন' সত্ত্বাও ছিল তাদের কাছে আতঙ্কের ও ভীতির বিষয়।

সংগঠক সোমেন : বালক বীরের বেশে

সোমেন চন্দ-র সঙ্গে পরিচিত বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতা, কর্মী ও সাহিত্যিকের নানা ধরনের স্মৃতিকথা পাওয়া যায় একজন কমিউনিস্ট কর্মী, শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব রূপে সোমেনের নিবিড় পরিচয়। গোপাল হালদার মহাশয় একদা বলেছিলেন, "সোমেন শুধু 'Fine Writing'-এর নেশায় মাতাল হইয়া যায় নাই, 'Fine Doing'-এর প্রেরণাতেও সে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল।" এই "ভালো কাজ" করার তাগিদ থেকেই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ এসেছিলেন আন্দামান প্রত্যাগত কমিউনিস্ট বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশির সংস্পর্শে। তখন সোমেনের বয়স কবি সুকান্তর ভাষায় 'দুঃসহ আঠারো'। নতুন কিছু করার আগ্রহে সে যোগ দেয় ঢাকার মৈশাণ্ডিতে (যেখানে সোমেন ও তাঁর পিতা থাকতেন) মার্কসবাদী পাঠচক্রে। তারপর একদিন বেঁটেখাটো চেহারা, গোলগাল মুখ, বিদ্যাসাগরীয় মাথা, পায়ে চপ্পল, লাজুক ও সরল কিন্তু প্রত্যয়ে দৃঢ়, স্বপ্নে আবিষ্ট এই তরুণ সোমেনের উপরেই ভার পড়লো 'প্রগতি পাঠাগার' পরিচালনার। ঢাকায় তখন প্রগতি লেখকদের একটি সংঘে জড়ো করার আয়োজন চলছে সতীশ পাকড়াশি, রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী প্রমুখদের নেতৃত্বে। সোমেন জুটে গেলেন তাদের সঙ্গে। শুধু জুটলেনই না, চলে এলেন নেতৃত্বের স্তরে। তাঁর সঙ্গী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত প্রমুখ। রাতের পর রাত জেগে এই সময়ে সোমেন তাঁর অপরিমিত ইংরাজী ভাষাজ্ঞান নিয়েই পাঠ করে গেছেন দস্তয়ভস্কি, পুশকিন, গোর্কি, বানার্ড শ, ওয়েলস, টমাস মান, হেমিংওয়ে, বারব্যুস, রল্যাঁ এবং মার্কস-লেনিনের রচিত বিশ্বসাহিত্য ও তত্ত্বাবলী। বন্ধু কমরেডদের সঙ্গে করেছেন দিনের পর দিন তর্কবিতর্ক। এরই ফলে অগ্রজরা ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেন অনুজ প্রতিভ সোমেন চন্দ-র উপরেই। এই নির্বাচন যে সঠিক হয়েছিল তার প্রমাণ

কিছুদিনেব মধ্যেই মূলত সোমেনেব উদ্যোগে প্রকাশিত প্রগতি সাহিত্যেব সঙ্কলন গ্রন্থ 'ক্রান্তি'ব প্রকাশ।

১৯৪০ ৪১ সালে ব্রিটিশ সবকাব ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিব উপব যখন নামিয়ে আনে নির্মম দমন পীডন। বিনাবিচাবে যখন বন্দী হন হাজাব হাজাব কমিউনিস্ট। আত্মগোপন কবতে বাধ্য হন আবো অজস্র কর্মী। পার্টিব এই দুর্দিনে সোমেন চন্দ এগিয়ে আসেন অকুতোভয়ে। পবিচালনা কবতে থাকেন ঢাকাব বেলওয়ে ওযার্কার্স ইউনিযন। সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন তাব সম্পাদক। মাত্র কুডি একুশ বছব বযসে শ্রমিক ইউনিযন পবিচালনায সোমেন যে বিচক্ষণতা, দাযিত্ববোধ ও শ্রমিক দবদেব পবিচয দিয়েছিলেন তা আজও সোমেনেব সতীর্থবা এক বাক্যে স্বীকাব কবেন। সাহিত্যিক সোমেনেব মতন সংগঠক সোমেনও ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

কেউ কেউ আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য কবেন যে সোমেন যদি ইস্টান বেঙ্গল বেলওয়ে ওযার্কার্স ইউনিযনেব দাযিত্ব গ্রহণ না কবতেন, কিংবা কমিউনিস্ট কর্মী ও প্রগতি লেখক সংঘেব সংগঠক রূপে নিজেব ব্যক্তিগত সমযেব অপচয না কবতেন তা হলে তিনি সাহিত্য বচনায অনেক বেশী সময ও মন নিবেদন কবতে পাবতেন এবং এতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতো। কিন্তু সোমেন চন্দ ছিলেন এমন ধাবাব লেখক যাবা সত্যমূল্য না দিয়ে সাহিত্যেব খ্যাতি চুবি কবতে চান নি। গণ-আন্দোলনে সোমেনেব যোগদান তাই ছিল সোমেনেব সাহিত্য চেতনা বিকাশেবই উৎসভূমি। তাব বিশ্ববিখ্যাত দুটি ছোটগল্প 'সংকেত' এবং 'ইঁদুব' ছিল এই পবিণত চেতনাবই প্রকাশ।

অন্তরঙ্গ সোমেন হে মহাজীবন

বর্তমান বাংলাদেশেব ঢাকা শহবে ১৯২০ সালেব ২৪ মে (বঙ্গাব্দ ১৩২৭ ১০ জ্যৈষ্ঠ) সোমেন চন্দ ব জন্ম এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পবিবাবে। পিতা নবেন্দ্রকুমাব চন্দ ঢাকাতেই মিটফোর্ড হাসপাতালে সামান্য চাকুবি কবতেন। কিন্তু দাবিদ্র্য অসচ্ছলতাব কাবণে সোমেনেব পডাশোনাব কোনো অসুবিধা হতে তাঁব পিতা দেন নি। সোমেন ছিল ববাববই মেধাবী ছাত্র। তাই ম্যাট্রিকুলেশন পবীক্ষায উত্তীর্ণ হবাব পবই ১৯৩৬ [illegible] ১৬ বছব বযসে সোমেনকে তিনি মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি কবে দেন [illegible] আজন্ম সাহিত্যপ্রাণ সোমেন চিকিৎসা বিদ্যাব সঙ্গে মানসিকভাবে নিজেকে [illegible] খাওযাতে পাবেন নি। এই সময প্লুবিসি বা ব্রঙ্কাইটিস জাতীয কঠিন অসুখে তিনি ভুগছিলেন, আর্থিক সমস্যাও হয়ে উঠেছিল প্রবলতব। সম্ভবত এই সবকিছুব [illegible] প্রতিক্রিয়াতেই সোমেনকে ডাক্তাবী পডা ছেডে দিতে হযেছিল।

এই সময সোমেন এবং তাব পিতা ঢাকা শহবেব উপকণ্ঠে দক্ষিণ [illegible] একটা ঘবে বসবাস কবতেন। ১৭ বছব বযস থেকে ঐ [illegible] ছিল সদা [illegible] সাহিত্যচর্চার প্রধান আশ্রয় স্থল। রুগ্ন ছেলেকে তাঁব [illegible] পিতা [illegible] বা উপার্জনে পাঠাননি পাছে সে আবও অসুস্থ হযে পডে এই আশঙ্কায [illegible] কিছুদিনেব মধ্যেই মেতে উঠলেন প্রগতি সাহিত্য [illegible] সেই সঙ্গে চলল পডাশোনা ও সাহিত্যচর্চাব কাজ

সোমেন সুহৃদ সরলানন্দ সেন একস্থানে বলেছেন : সোমেন অল্পভাষী ছিল। এই কচি বয়সে তাই বলে সে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকতো না। তার মৃদু হাসি আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেবল হাসিই নয়, আহার, উৎসব, ভ্রমণ এবং সঙ্গীত দিয়ে জীবনকে মুখর করে উপভোগ করতে জানত সে। শুধু তাই নয়, সোমেন ছিল প্রকৃতই বন্ধু দরদী। ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের সবুজ ঘাসে বসে যখন প্রগতি সাহিত্যের তরুণ লেখকেরা সাহিত্যের আড্ডা জমাতেন তখন লাল একটা বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে গলিয়ে সোমেনও প্রায়ই আসতেন সেখানে। কথা কম বলতো। কিন্তু হাসি ঠাট্টার ভিতরে যখন একে অপরকে বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করার চেষ্টা হতো — তখন সেই দুর্বল আক্রান্ত সাহিত্যিক বন্ধুকে সাহায্যের জন্য নিজের যুক্তিতর্ক নিয়ে এগিয়ে আসতো সোমেন। তাঁর পরোপকারী প্রাণ যে কোনো বিপন্ন ও অসহায় মানুষের জন্যই কেঁদে উঠতো। ভীষণ রকম সংবেদনশীল ছিল তাঁর মন।

অগ্রজ প্রতিম সাহিত্যিক অচ্যুত গোস্বামী থাকতেন ঢাকায় সোমেনদের বাসার সন্নিকটেই। ঢাকার অন্যতম শ্রমিক নেতা অনিল মুখার্জী একদিন গোপনে গেছেন অচ্যুত গোস্বামীর বাসায়। পার্টি তখনো বেআইনী বলে তাঁদের লুকিয়ে চলাফেরা করতে হতো। অনিল মুখার্জী লিখেছেন (প্রতিরোধ ১৩৫০, 'সোমেন স্মৃতি সংখ্যা') : "একদিন রাত্রিতে গোঁসাই-এর বাড়িতে যাই কি একটা কাজে। পাঁচড়াতে অচ্যুতবাবু নড়াচড়া করিতে পারেন না। তার উপর হাঁপানীর প্রকোপ এবং জ্বর। অচ্যুতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার খোঁজ খবর করেন কে। তিনি বলিলেন, প্রত্যহই সোমেন আসে বার্লি এবং তরকারী তৈয়ার করিয়া দেয়। বন্ধুবান্ধব আর কাহারও বড় সাহায্য মিলে না, কিন্তু সোমেনের কামাই নাই। যত কাজই থাকুক দুইবার আসিবেই। তবে সময়টা ঠিক রাখিতে পারে না, রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজে খুব ব্যস্ত। কথা শেষ হইতেই সোমেন আসিয়া হাজির, হাতে একটা বাটি বাসা হইতে তরকারি তৈয়ার করিয়া আনিয়াছে।" আজকের দিনে এমন মমতা, এত দরদ, কমরেডদের প্রতি এতখানি ভালবাসা আর কোথায়? বাড়ির সকল কাজ সেরে, রান্না করা থেকে বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়া থেকে বাজার করা—সব কিছু সেরে কিভাবে যে সোমেন সাহিত্য ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিতেন — ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

শহীদ সোমেন : হে মহামরণ

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে স্পেনের রণাঙ্গণে যে সকল লেখক শিল্পী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েলদের সহযাত্রী হলেন সোমেন চন্দ। সোমেন ছিলেন প্রতিভাধর সাহিত্যিক। কিন্তু সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয় একথা উপলব্ধি করে মানবতার মুক্তি যুদ্ধে অগ্রণী সৈনিক ছিলেন সোমেন চন্দ। প্রগতির সংগ্রামে নিবেদিত ভারতবর্ষের প্রথম শহীদ সাহিত্যিক। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঢাকার মহাশশ্মানে সোমেনের শেষকৃত্যের সময় (উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, জ্যোতি বসু,

রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ) দেখেছেন শশ্মানযাত্রীদের মধ্যে কেউ ছুরির ফলা দিয়ে দেওয়ালে খোদাই করে দিয়েছিলেন নিজেদের ক্ষোভ এবং আবেগকে। লিখেছিলেন "সোমেন চন্দ: আমাদের প্রিয় সংগ্রামী লেখক।"

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর মত অকমিউনিস্ট ব্যক্তিও চুপ করে থাকতে পারেন নি। সোমেনকে হত্যার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তার একটি অবিস্মরণীয় কবিতায়। যার শেষ পংক্তিগুলি ছিল : "পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদ রেখাতে/আজ হোক উদ্দীপিত/আমার কবিতা।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় শহীদ সোমেন চন্দকে নিবেদিত 'প্রাচীর' কাব্য সংকলন। সম্ভাবনাময় তরুণ লেখক সোমেনের মৃত্যুতে বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ছাত্র-যুবা, শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলি এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সভা সমাবেশে ধ্বনিত হয় তাদের প্রতিবাদের ভাষা। তৎকালের প্রগতিশীল সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রগুলিতে এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রগতিশীল দল ও সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ তীব্রকণ্ঠে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানান। সোমেনের মৃত্যুর পরই বাংলায় ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলন দ্বিগুণ বেগে প্রসারিত হতে থাকে। যে সমস্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন পূর্বে এই আন্দোলনের বাইরে ছিলেন, এই হত্যাকাণ্ড তাঁদেরও অনেকের চোখ খুলে দেয়। সক্রিয়ভাবে তাঁরাও অংশগ্রহণ করেন ফ্যাসিস্ত আন্দোলনে।

বস্তুতই সোমেন চন্দ-র নৃশংস হত্যাকান্ডের ফলে বাংলাদেশের প্রগতিশীল লেখকেরা সচকিত হয়ে ওঠেন। সোমেনের আত্মদান তাদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপুল প্রেরণারূপে দেখা দেয়। বাংলার প্রগতিশীল লেখক ও সাহিত্যিকেরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করেন যে আর দেরি নয়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মৌখিক ধিক্কার উচ্চারণই নয় — অবিলম্বে ফ্যাসিবিরোধী লেখকদের একটি সংগঠনের মধ্যে এনে সুসংহতভাবে কাজও শুরু করতে হবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে চেতনা জাগ্রত করার জন্য বাস্তব কার্যক্রমও শুরু করতে হবে। আর তা না করতে পারলে সভ্যতার শত্রুরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের রত্নাগার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এরই সূত্র ধরে ১৯৪২-এর ২৮ শে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনের মঞ্চেই গঠিত হয় ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ ও জাপানের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি পরোক্ষ প্রেরণা হলেও প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল অবশ্যই সোমেনের আত্মদান। কলমধারী সৈনিক সোমেন চন্দ-র জীবন ও আদর্শ তাই আজও প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের চলার পথের আলোকবর্তিকা।

সূত্র নির্দেশ

১। **সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা** সংগ্রহ, দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত।

২। **আগুনের অক্ষর**, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সংকলিত।

৩। **৪৬ নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে**, চিন্মোহন সেহানবীশ।

৪। **ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ** (৪র্থ খণ্ড), নেপাল মজুমদার।

৫। মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক, ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত।

৬। **মার্ক্সিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া**, সংকলন ও সম্পাদনা সুধী প্রধান।

৭। **ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা**, সুস্নাত দাশ।

মুর্শিদাবাদি ওসোয়াল সমাজ

কাজী সুফিউর রহমান

মুঘল যুগে এবং বিশেষ করে নবাবী আমলে বাংলার জনবিন্যাসের এক অসামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অবাঙালী মুসলমান শাসক সম্প্রদায়, স্বীয় ধর্মীয়সমাজ এবং ব্যবসায়ী মহল ছাড়াও অবাঙালী অমুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরের লোক বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন এবং কালক্রমে তাঁরা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাঁদের বংশধরেরা আজও বাংলার রাজনৈতিক আর্থিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আজ তাঁদের 'সুনির্দিষ্ট পরিচয় ব্যতিরেকে' সবটাই বাঙালীয়ত্বে পর্যবসিত হয়েছে। বর্ধমানের মহারাজা, চক্‌দীঘির সিংহ পরিবার, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ার উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় মুর্শিদাবাদের জৈন প্রমুখ সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে মুঘলবাদশাহ বা নবাবের আদেশে শাসন কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে বাংলায় আসেন। এরা কেউই আর ফিরে যান নি এদেশ থেকে।

বাংলার (এখন পশ্চিমবঙ্গ বলাই ভালো) জৈন সম্প্রদায়কে মূলত তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। (ক) মারওয়ারী সাথ (খ) জহুরী সাথ (গ) মুর্শিদাবাদি। এই শেষোক্ত দলটি আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ-মহিমাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বসতি স্থাপন করেন। আজিমগঞ্জের লোকেরা নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে 'শহরওয়ালি' নামে পরিচিত। অন্যদিকে, জিয়াগঞ্জের অধিবাসীদের 'বালুচরী' বলে পরিচয় দেওয়া হতো। শহরওয়ালি এবং বালুচরি সমাজের মধ্যে উচ্চারণ বিধির একটু তফাৎ ছিল। আজও আছে। মুর্শিদাবাদের সামগ্রিক জৈন সমাজকে এককথায় 'মুর্শিদাবাদি' বলা হয়।

মুর্শিদাবাদের জৈনদের অধিকাংশই শ্বেতাম্বর-মূর্তিপূজক এবং ওসোয়াল সমাজভুক্ত। প্রাচীনকালে রাজস্থানে 'ওসিয়া' বলে একটি জনপদ ছিল। ওসিয়া হল বর্তমানের যোধপুর-জয়সলমিরের মধ্যবর্তী এক স্থান। কথিত আছে শ্রী রত্নপ্রভুসূরী নামে জনৈক এক জৈন সাধুর প্রভাবে ঐ জনপদের একটি বড় ক্ষত্রিয় সমাজ জৈন মতাবলম্বী হয়ে যান। এদের বংশধরেরা আজও 'ওসোয়াল' বলে পরিচিত। এই ধারার কয়েকটি শাখা পর্যায়ক্রমে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ শহরদ্বয়ে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এরা বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী হয়ে যান। অচেনা অজানা পরিবেশে পৃথক ধর্মীয় সত্তা এবং পারিবারিক সংস্কৃতির চেতনা ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই এরা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক

স্রোতের সঙ্গে মিলেমিশে যান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোকে তাঁদের জমিদারি-বেনিয়া কার্যকলাপ, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চেতনা এবং পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এই সমাজকে কতটা অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিল আলোচনা নিবন্ধে সেকথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে বাংলাদেশে জৈন সম্প্রদায় ছিল। 'শরাক' নামেব এক ধরনের জৈন রাঢ় অঞ্চলে ছিল এবং আজও তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'শ্রাবক' কথাটি থেকে 'শরাক' কথাটি এসেছে। জৈন ধর্মগুরুদের 'শ্রাবক' বলা হয়। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর ও প্রধান সংস্কারক মহাবীর বা বর্ধমান রাঢ়দেশে এসেছিলেন এবং তাঁব নাম থেকেই 'বর্ধমান' স্থানের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। যাই হোক, আধুনিককালে ওসোয়াল সমাজের 'মানিকচাঁদ জগৎ শেঠ'-এর আজিমগঞ্জের অদূরে মহিমাপুরে স্থায়ী বসতি স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ের এক নতুন যুগ সূচিত হয়।

মানিকচাঁদ অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ আসেন এবং সেখানে কুঠি ও টাঁকশাল স্থাপন করেন। নবাবি আমলে বাংলার রাজনৈতিক-আর্থিক জগতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইনি ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে পবলোকগমন করেন। মানিকচাঁদের দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তবাধিকারী হন। তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেন। এরপর থেকে নাম ও পদবি সমন্বিত হয়ে পদবিতেই বেশী পরিচিতি লাভ করেন এঁরা। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফতেঁচাদ জগৎশেঠ দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে আলিবর্দির শাসক-স্মারক ফারমান প্রাপ্তির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জগৎশেঠ আমিল বা রাজস্ব সংগ্রাহকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে আমানত হিসাবে দিল্লীতে পাঠাতেন। মুর্শিদাবাদে ব্যাঙ্কার হিসাবে জগৎশেঠ একক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ফলে এই সময়ে ক্ষমতার দিক থেকে বাদশাহ-নবাব জগৎশেঠ সমান্তবালভাবে অবস্থান করেন। জগৎশেঠ বিশ্বমানের ধনকুবেরে পরিণত হন। তাঁর মুদ্রার পরিমাণ গঙ্গার জলের মতই অবাধ ছিল বলে জনারণ্যে প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকেরা তুলনাটি ঠিক এভাবেই করেন জার্মানীর চার্লের কাছে যেমন Augsburg এর Fuggers, Papacy কাছে Florence-এর Medicies, ঠিক তেমনি বাংলার নবাবের কাছে মহিমাপুরের জগৎশেঠ। পলাশীর যুদ্ধে এই জগৎশেঠ পরিবার যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা সবার জানা। এই সময়ে তারা যে শুধু ক্লাইভের ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আর্থিক-মানসিক সাহায্য করেছিলেন তাই-ই নয়, তাঁরা ১৭৫৭ সালে ওলন্দাজ কোম্পানিকে ৪ লাখ এবং ফরাসি কোম্পানিকে ১৫ লাখ টাকা ৯ শতাংশ হারে সুদে ধার দিয়েছিলেন। এই সময়কার ওলন্দাজ নথিপত্রে শেঠদের 'Greatest money changer of Hindustan' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যাই হোক ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দিকে ফারমান প্রাপ্তির ব্যাপারে সাহায্য করে তাদের মান ও ব্যবসা বিকাশের চূড়ান্ত সহায়ক হয়। অনুরূপভাবে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

পলাশীর ষড়যন্ত্রে শেঠবংশের সহায়তায় রায় জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ ব্রিটিশ কোম্পানী ও মিরজাফর বাহিনীকে সাহায্য করেন। পলাশীযুদ্ধে এঁরাই জয়লাভ করেন। কিন্তু কালের কুটিলচক্রে লক্ষ্য করা যায় পলাশীযুদ্ধের মাধ্যমেই শেঠসহ এঁদের সকলেরই পতন অন্তর্নিহিত ছিল। ১৭৬০ সালে মিরকাশিমের আংশিক সাফল্য এবং পরিশেষে ১৭৬৫-তে বৃটিশ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে শেঠদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। ১৭৬৭-তে লর্ড ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে শেঠ ও কোম্পানীর মধ্যে যে মিলন সেতু ছিল তা মিলিয়ে গেল। ফলে শেঠ সম্প্রদায়ের ধন ও মান ক্রমশ পড়তে থাকল। শেঠদের ক্রমাবনতি বুঝতে তিনটি উদাহরণ যথেষ্ট। প্রথমতঃ পলাশী বিজয়ের মাত্র তের বছর পর (১৭৭০) বাংলায় দুর্ভিক্ষ সংগঠিত হয় যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। সেই দুর্ভিক্ষে দিনাজপুরের জনৈক গোপীনাথ মণ্ডল নামক ব্যবসায়ী ৫০,০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ভাণ্ডারে দান করেন যেখানে খুশলচাঁদ জগৎশেঠ মাত্র ৫,০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে বরাদ্দ করেন। দ্বিতীয়ত, ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অতীতের সাহায্য স্মরণ রেখে শেঠদেব মাসিক ৩ লাখ টাকা ভাতা মঞ্জুর করেন। কিন্তু খুশলচাঁদ তা নিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু মাত্র একশত বছরের মধ্যেই গোবিন্দচাঁদের স্ত্রী প্রাণকুমারী মাত্র ৩০০ টাকার মাসিক ভাতা গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, একদিনের বিশ্বনন্দিত ব্যাঙ্কার সম্প্রদায়ের বংশধরেরা জমিদারি হতে আয় ও সরকারি ভাতার উপব নির্ভর করে দিন গুজরাতেন।

জগৎশেঠ পরিবারের ইতিহাস রাজনৈতিক-আর্থিক উপাদানে ভরপুর যা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। শেঠ পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তাদের সগোত্রীয় ওসোয়াল শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেনিয়া জমিদার কার্যকলাপ ছাড়াও সাংস্কৃতিক চেতনার ঐতিহ্য এবং তার প্রকোপ ও প্রকাশ বরাবরই সাবলীল।

শেঠদের বাংলা আগমনের অর্ধ শতাধিক বছর পরে স্বজাতীয় লোকজনেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের আশায় এখানে আসতে শুরু করেন। এটা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে এতে শেঠ পরিবারের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ছিল। এরা আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য, এর আগে এই অঞ্চলে জৈনদের কোন বসতি ছিল না। যতদূর জানা যায়, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বীরদাসজি দুগড় মুর্শিদাবাদে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং দুগড় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচাঁদ নলাক্ষা মুর্শিদাবাদে নলাক্ষা পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নাহার পরিবারের খড়্গা সিংহ নাহার এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুধোরিয়া পরিবারের হারজিমল দুধোরিয়া আজিমগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। তবে এটা ঠিক পলাশী ষড়যন্ত্রের পরবর্তী সময়েই গোলেছা, কোঠারি, বোথরা, বাছাওয়াত, সিংঘি, শ্রীমল, নাহাটা, শ্যামসুখা, বয়েদ লোড়হা, ভুরা প্রভৃতি পরিবার জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে আগমন করেন এবং পাকাপাকিভাবে এই দুই শহরদ্বয়ে বসতি স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, উপরোক্ত পদবিসমূহ বিশেষ কারণে পরিবর্তিত পদবি। এঁরা নিজেদেরকে প্রায় সবাই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন।

এই ওসোয়াল সমাজভুক্ত পরিবারসমূহের বেশ কিছু লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপনের পর এঁরা সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য দিয়ে জীবন শুরু করেন। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদাবাদে আগমনের পর খুব শীঘ্রই অর্থাৎ দ্বিতীয়পুরুষ বড় জোর তৃতীয়পুরুষ উত্তরপুরুষ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তৃতীয়ত তাঁদের কুঠির বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সর্বদা পিতা বা পিতামহের নামের সঙ্গে যুক্তভাবে করা হয় যথা ভূতসিংজি-প্রতাপসিংজি ফার্ম, মানিকচাঁদজি-আনন্দচাঁদজি ফার্ম প্রভৃতি। চতুর্থত, এঁরা কুঠিতে ও বাড়িতে যে ভাষা ব্যবহার করতেন তা 'কোঠিয়ালি' ভাষা নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এই ভাষাতে আকার ওকার প্রয়োগ হয় না। পঞ্চমত, এঁরা আজও যে ভাষা ব্যবহার করেন তা হিন্দির সঙ্গে বাংলা, প্রাকৃত মিলিয়ে মিশিয়ে নিজের মত করে। ষষ্ঠত, এঁদের মহিলা ও পুরুষ পোষাকে নবাবি বা মুঘল ঢং লক্ষণীয়। সপ্তমত, এঁরা সম্পূর্ণভাবে নিরামিশাষী এবং মূর্তিপূজক। অষ্টমত, সচ্ছল পরিবারগুলির ধর্মীয় ও সামাজিক অনুদান স্মরণ করার মত।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধকাল থেকে ওসোয়াল সম্প্রদায়ের দুগড়, দুধোরিয়া, নলাক্ষা, গোলেছা প্রভৃতি পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিশেষভাবে অর্থশালী হয়ে ওঠেন। এই সময়ে তাঁরা কলিকাতা, ধুলিয়ান, আজিমগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, আসাম, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁদের বাণিজ্যিক লেনদেন সাগর পাড়ি দিয়েও হতো। সঙ্গে চালু ছিল টাকার লেনদেনের কারবার। ময়মনসিংহ জেলায় দুধোরিয়ারা $\frac{১}{৪}$ টাকা শতাংশ হারে সুদে টাকা দিতে থাকলে এক শতাংশ হারে টাকা দেওয়া Union Bank, Bengal Bank কোণঠাসা হয়ে যায়। উল্লেখ্য, তখন ঐ ব্যাঙ্কগুলি টাকা ধার নেওয়ার জন্য সরকার গঠন করেছিল।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এরা উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে জমিদারি ক্রয় করতে থাকেন। দুগড়দের বিহারের ভাগলপুর জেলায় ৪০০ বর্গমাইলব্যাপী জমিদারি ছিল যা হারাওয়াত পরগনার জমিদারি নামে খ্যাত। এখানে এঁদের প্রভাব কি ধরনের ছিল তা ঐ স্থানের নামকরণের মধ্যেই অনুমান করা যায়। আজও সেখানকার ৪টি শহর প্রতাপগঞ্জ, নরপতগঞ্জ ও সুরপতগঞ্জ দুগড়বংশের বিশেষ ব্যক্তিদের নামের স্মৃতি বহন করে চলেছে। অনুরূপভাবে নাহার পরিবারের নানাস্থানে জমিদারি ছিল এবং তাঁদের সর্ববৃহৎ জমিদারি ছিল দিনাজপুর জেলায়। সেখানে সিতাবচাঁদ নাহারের নামকরণে গড়ে উঠেছে সিতাবগঞ্জ শহর যা এখন বর্তমান বাংলাদেশে। দুধোরিয়া পরিবারের জমিদারি ছিল আজিমগঞ্জ অঞ্চলে এবং বীরভূম, নদীযা, ফরিদপুর, পূর্ণিয়া, রাজশাহি প্রভৃতি জেলায়। নলাক্ষা পরিবারের জমিদারি ছিল মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে। কোঠারি পরিবার আসামে ব্যবসা ও জমিদারি শুরু করেন বৃহদাকারে। বড় জমিদারি ছিল গোলেছাদের। এছাড়া বাকি যে সব ধারার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অনেকেরই জমিদারি ছিল বাংলা-বিহারের আসামের নানাস্থানে।

এই জমিদাররা প্রজারঞ্জক অথবা প্রজাপীড়ক উভয় ধরনেরই ছিলেন। বলাবাহুল্য, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর জমিদারের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এঁদের মধ্যে স্বভাবতই বর্তমান

ছিল। তবে এটা ঠিক তাঁদের ধর্মের অহিংস প্রভাবের দরুন তারা বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে ১৯০৬-০৯ সালে ক্রয়ক্ষমতা জনিত কারণে খাদ্যাভাব দেখা গিয়েছিল। বুধ সিং দুধোরিয়া টাকায় ৬-৭ সের প্রতি চাল কিনে প্রজাদের টাকা প্রতি ১০ সের করে চাল বণ্টন করেন। অনুরূপভাবে ১৯২৯ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাবু নির্মলকুমার নলাক্ষা একটি মরশুম প্রতিদিন ধর্ম-বর্ণ ভেদে দশহাজার মানুষকে দুপুরের আহার মুক্তহস্তে দান করেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দানসত্র, জলসত্র, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণে উদ্যোগী হন। হারাওয়াত জমিদারীর বিভিন্ন স্থানে আজও তাঁদের নামে বেশ কিছু স্কুল-প্রতিষ্ঠান চালু আছে। দুধোরিয়া, নাহার, নাহাটা, নলাক্ষা, গোলেছা প্রভৃতি পরিবার তাঁদের জমিদারীর বিভিন্ন স্থানে ধর্মশালা, অতিথিশালা, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করেন। অবশ্য এগুলো জৈনধর্মের অঙ্গ হিসেবেই প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এদের অনেক অবদান আজও চালু আছে। শ্রীপৎ সিং দুগড় নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে জিয়াগঞ্জে শ্রীপৎ সিং কলেজ, কলকাতার কলাকার স্ট্রীটে জৈনভবনের শ্রীপৎ সিং হল স্থাপন করেন। তিনি আজিমগঞ্জে স্ত্রীর নামে ধন্যকুমারী কলেজ এবং কলাকার স্ট্রীটে ধন্যকুমারী লাইব্রেরী স্থাপন করেন। রায়বাহাদুর ধনপৎ সিং দুগড় আজিমগঞ্জে ধনপৎ সিং মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন। রায়বাহাদুর সেতাবচাঁদ নাহার মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে আজিমগঞ্জে 'বিবি প্রাণকুমারী জুবিলী হাইস্কুল' স্থাপন করেন। তিনি ১৮৮০ দশকে এটা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। একই সময়ে আজিমগঞ্জে একটি পাবলিক হল নির্মাণ করেন এবং নাম দেন 'মেকেঞ্জি পাবলিক হল।' পরে এর নামকরণ করা হয় নাহার পাবলিক হল। এই পরিবর্তিত নামকরণটা কুমার সিং করেন। পরবর্তীকালে ঐ হল কলিকাতার ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয় এবং নামকরণ করা হয় কুমার সিং হল। এতে বিশেষ উদ্যোগ নেন বিজয় সিং নাহার। উল্লেখ্য, এখানে জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখরা সভা করেন নানা সময়ে। ১৯০৫ সালে সেতাবচাঁদ নাহার কুড়ি হাজার টাকা দানপ্রকল্পে জৈন শ্বেতাম্বর হেল্প ফান্ড গঠন করেন। এতে গরীব ছাত্রদের বৃত্তি ও দরিদ্র পরিবারের লোকেদের সাহায্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই তহবিল এখন অনেক বড় হয়েছে, যেখান থেকে গরীব ছাত্ররা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তিনি 'বিশ্ববিনোদ' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। বিশ্ববিনোদ হল মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম ছাপাখানা। এখানে কোন ব্যবসায়িক কাজ হতো না, কেবল ধর্মসংক্রান্ত বইপত্র সেখানে ছাপা হতো। পূরনচাঁদ নাহার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের নামে গুলাবকুমারী লাইব্রেরী স্থাপন করেন।

মুর্শিদাবাদের ওসোয়াল সমাজ জমিদারি ও বেনিয়া কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতিতে কেউ কেউ যথারীতি অংশগ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করেছেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে ও পরে শেঠ সম্প্রদায় এক বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্বলাভ করে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এবং বিশেষ করে আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ

মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলে এদের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতির নেশা পেয়ে বসে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মণিলাল নাহারকে হাবিয়ে একই সম্প্রদায়েব বিজয় সিং দুধোবিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া জমিদারির, ব্যবসায়িক এবং ব্রিটিশ আমলাদের তুষ্টিকরণের বাজনীতি অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। ১৯২০ সালে গান্ধীজি কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে এঁদের অনেকেই সেই ধারায় যুক্ত হন। গোলাপচাঁদ বোথরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ছিলেন। জগৎ সিং লোহ্ড়া ছিলেন খদ্দরভূষিত স্বদেশী এবং শুদ্ধ গান্ধীবাদী। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আজিমগঞ্জের 'রোজভিলাতে' পদার্পণ করেন বাবু নির্মলকুমার সিং নলাক্ষার আমন্ত্রণে। তখনই মুর্শিদাবাদবাসীর বাপুকে দেখার সরাসরি সুযোগ হয়। তখন থেকে নির্মলকুমার শুদ্ধ খদ্দরবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি নিজ খরচে আজিমগঞ্জে 'জৈন খাদি স্টোর' স্থাপন করেন যাতে লোকেরা সস্তায় আসল খাদি বস্ত্র কিনতে পারেন। তিনি বাংলার নানাস্থানে গঠিত খাদি ভাণ্ডার ও প্রতিষ্ঠানে অকাতরে টাকা দান করেন। বলাবাহুল্য বাংলার খাদি আন্দোলনে নির্মলবাবুব বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি দশ হাজার টাকা তিলক-স্বরাজ ফাণ্ডে দান করেন।

এই সম্প্রদায়ের অনেকেই দেশের বিভিন্নস্থান থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে দিল্লী ও বাংলার আইনসভাতে যোগদান করেছিলেন। এঁরা হলেন সুরপত সিং দুগড়, ভূপত সিং দুগড়, রাজপত সিং দুগড়, তাজবাহাদুর সিং দুগড়, রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া, নরেন্দ্র সিং সিংঘী, বাজেন্দ্র সিং সিংঘী এবং বিজয় সিং নাহার। ১৯৪৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেউ কেউ পরিকল্পনামাফিক পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সুরপত সিং দুগড় এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করেন। রাজপত সিং দুগড় রাজ্যসভার কংগ্রেস দলের মুখ্য সচেতক মনোনীত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র সিং সিংঘী বিধান রায় মন্ত্রিসভার পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন। বিজয় সিং নাহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই সম্প্রদায় সমষ্টিগতভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির মতই এদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি-শিক্ষা, ক্রীড়া প্রভৃতি ভাণ্ডারকে সাধ্যমত সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। স্থাপত্য শিল্পে অনুরাগ লক্ষ্য করার মত। মহিমাপুরের রাজপ্রসাদ, মন্দির, লক্ষ্মীপত সিং দুগড়ের কাঠগোলা মন্দির এবং নলাক্ষা পরিবারের আজিমগঞ্জের রোজভিলা মুঘল স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে রাজস্থানী ঢঙের এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

কেশরী সিং নাহার গানবাজনার বড়ই সমঝদার ছিলেন এবং বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উপর তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি বেঙ্গল মিউজিক এ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বেশ কয়েকবার কলিকাতাতে All India Music Conference করান যেখানে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, গাঙ্গুলবাই, গাঙ্গল, হিরাবাঈ বারোদেকার, হাফিজ আলী, শম্ভু মহারাজ প্রমুখ শিল্পীরা জমায়েত হয়েছিলেন। তিনি রাইচাঁদ বড়ালের দাদা গাঙ্গু বড়ালের অভিন্ন বন্ধু ছিলেন। কেশরীবাবুর মৃত্যুতে রাইচাঁদ বড়াল 'আমাদের পরিবারের বন্ধু বিয়োগ' সম্বোধন করে বিজয় সিং

নাহারকে শোকবার্তা পাঠান। তাঁর অনুজ পৃথ্বী সিং নাহার দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীতের ভক্ত। তিনি বিচিত্রা পত্রিকাতে (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের কবি কাহিনীর সমালোচনা করেন। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম রচনা। পৃথ্বী সিং নাহারের কয়েকটি বাংলায় প্রকাশিত পুস্তক আছে। কেশরী সিং নাহার, ভ্রমর সিং দুগড়, লক্ষ্মীপত সিং কোঠারী রেকর্ডসংখ্যক স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তেমনি নরেন্দ্র সিং সিংঘী ও নরেন্দ্র সিং দুগড় দু'জনের ভাণ্ডারে বিপুলসংখ্যক মুদ্রা সংগৃহীত আছে।

চিত্রাঙ্গনে হীরাচাঁদ দুগড়, ইন্দ্র দুগড় ও গণেশ লালওয়ানজীর নাম অনেকেরই জানা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হীরাচাঁদ সিং দুগড়ের নামে ফেলোশিপ প্রদান করেছে। পুষ্পা বয়েদ চিত্রাঙ্কনে নামডাক করেছেন। যুগল শ্রীমল নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরের লোকেদের কাছ থেকে মনমত পুতুল তৈরি করে নিয়ে তাব সাহায্যে জওহরলাল নেহেরুর, 'ডিসকভারী অব্ ইণ্ডিয়া', রামায়ণ এবং মহাভারতের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশ করে এক নজির স্থাপন করেন। কান্তি শ্রীমল বেশ কিছু বাংলা হিন্দি ছবি ও সিরিয়ালে অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছেন।

এঁদের অনেকেই ক্রীড়াজগতে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। দলীপ সিং কোঠারী গোষ্ঠ পালের সময়ে মোহনবাগান দলের গোলরক্ষা করেছেন। তিনি সাত বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নের দলনায়ক ছিলেন। বাহাদুর সিং বোথরা মোহনবাগানের নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড ছিলেন। খড়্গা সিং কোঠারী কুমারটুলিতে খেলেছেন। বিজয় সিং নাহার হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে বক্সিং ম্যানেজার নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, তিনি একজন প্রাক্তন বক্সার। ধনপত সিং কোঠারী গোবর গোহ্ সমমানের কুস্তিগীর ছিলেন। অমল কোঠারী হলেন বিশ্বমানের ওয়াটার পোলো গোলকিপার। মনোজ কোঠারী ১৯৯১ সালে অ্যামেচার বিলিয়ার্ড ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হন। এছাড়া রবীন্দ্র কোঠারী ও রঞ্জন সিং কোঠারী রণজি ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিতে যশস্বী হয়ে আছেন রণধীর সিং বাছাওয়াত। তিনি কলিকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হন। ডঃ বিমল বাছাওয়াত ভাটনগর ও পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন বিজ্ঞান বিষয়ক অবদানের জন্য। নরেন্দ্র সিং সিংঘী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূ-বিদ্যাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৫৬ খ্রীঃ তিনি Indian Mining Federation-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি Indian Geological, Mining and Metallurgical Society-র সভাপতি পদে আসীন হন। এছাড়া তিনি Indian Chamber of Commerce-এর ম্যানেজিং কমিটির ও মধ্যপ্রদেশ Electricity Board-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে নরেন্দ্র সিংঘী Council of the American Geographical Society-এর সদস্য নির্বাচিত হন। রায়বাহাদুর ধনপত সিং দুগড় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা সোসাইটি অব্ প্রিভেনশন ক্রুয়েলটি টু এ্যানিম্যালস্-এর মেম্বার ছিলেন।

১৯০৯ সালে বাংলার লেফ্টেন্যান্ট গর্ভনর বেকারের উপস্থিতিতে রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে জিয়াগঞ্জে এডওয়ার্ড করোনেশন স্কুল উদ্বোধন করেন। রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া ছিলেন শিক্ষাব্রতী। তিনি জঙ্গীপুর হায়ার ইংলিশ স্কুলের 'বয়েজ হস্টেল' এবং জঙ্গীপুর ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুলকে বাড়ি নির্মাণের জন্য মোটা সংখ্যক টাকা দান করেন। তিনি ১৯১৩ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ তহবিলে চার হাজার টাকা দান করেন। কুমারচন্দ্র সিং দুধোরিয়া এবং জয়কুমার সিং দুধোরিয়া আজিমগঞ্জ শহরে যথাক্রমে রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া এবং রায় বাহাদুর বুধ সিং দুধোরিয়া হাইস্কুল স্থাপন করেন। নরেন্দ্র সিং সিংগী লালবাগে সিংঘী হাইস্কুল, আজিমগঞ্জে কেশর কুমারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যা আজও সুনামের সঙ্গে আছে। বাবু নির্মলকুমার সিং নলাক্ষা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজের বাড়িতেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যার বার্ষিক বাজেট ছিল ৩৫-৪০ হাজার টাকা। তাঁর জমিদারভুক্ত গ্রামগুলিতে প্রাথমিক স্কুল স্থাপনে তিনি সদা তৎপর ছিলেন।

আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ শহরে জৈনদের অবস্থানকালের প্রথম দিকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস ছিল না। তাই সেখানে কর্তৃত্বের লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল জৈন সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে। এঁরা নিজ নিজ জমিদারভুক্ত এলাকায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে স্কুল, হাসপাতাল বা বিভিন্নপ্রকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেন। মণিলাল সিং নাহার ছিলেন জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। বহু বছর তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন।

১৯০৪ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে রায়বাহাদুর ধনপৎ সিং নলাক্ষা ২০,৬৫০ টাকা দান করে আজিমগঞ্জে গোলাব চাঁদ নলাক্ষা হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিল্ডিং গড়ে তোলেন। ১৯০৯ সালে এটি উদ্বোধন করেন তদানীন্তন বাংলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনর এডওয়ার্ড নরম্যান বেকার। রায়বাহাদুর বুধ সিং দুধোরিয়া ও বিষেণ সিং দুধোরিয়া একত্রে জঙ্গীপুরে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

শুধু মুর্শিদাবাদই নয়, কলকাতা এবং বাংলার নানাস্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অকাতরে নানাভাবে দান করেছিলেন এঁরা। উল্লেখ্য, ধর্মীয় স্বার্থে মন্দির, আশ্রম প্রভৃতি নির্মাণ ও ব্যয়ভার বহনে এঁদের অবদান অপরিসীম। রায়বাহাদুর ধনপৎ সিং দুগড় ছিলেন দানশীল ব্যক্তি। তিনি কলকাতার চিড়িয়াখানাকে মোটা অঙ্কের টাকা দান করেন। রায়বাহাদুর ধনপৎ সিং নলাক্ষা কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালকে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন শল্যচিকিৎসার ওয়ার্ড নির্মাণে। তিনি ১৯০৩ সালে দু'হাজার টাকা করে Victoria Memorial Fund ও Edward Memorial Fund এ এবং সাত হাজার টাকা করে Lady Dufferin Fund, Woodburn Memorial Fund ও Transval War Fund -এর প্রত্যেকটিতে দান করেন। বিজয় সিং দুধোরিয়া ছিলেন একমাত্র রাজা, যিনি এক লাখ টাকা মিন্টো ফেট-এ এবং কুড়ি হাজার টাকা ইমপিরিয়াল

ওয়ার রিলিফ-এ দান করেন বহরমপুরের গ্রান্ট হলের এক মহতী সভায়। নরেন্দ্র সিং সিংঘী ভারতীয় বিদ্যাভবনকে বিশাল অঙ্কের টাকা দান করেন।

মণিলাল নাহার এবং পূরণচাঁদ নাহারের মৃত্যুর পর বিজয় সিং নাহার মণিলাল নাহারের প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা, কিউরীও সংগ্রহাদি কলিকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়মকে দান করেন, যা একটি পৃথক ঘরে 'নাহার কালেকশন' নামে রক্ষিত আছে। অন্যদিকে পূরণচাঁদ নাহারের সংগ্রহের এক বিরাট অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে 'পূরণচাঁদ নাহার কালেকশন' নামে রক্ষিত আছে। তাঁর অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জৈনধর্মের উপর গবেষণার জন্য 'পূরণচাঁদ নাহার ফেলোশিপ' চালু করেন এবং কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি মধ্য কলিকাতায় তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ শোকপ্রকাশ করে বলেছিলেন যে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলেই এমন করে একে একে আত্মীয়মণ্ডলীর ক্ষয় স্বীকার করে নিতে হয়।

নিজ ধর্ম ও সমাজের উপর এঁদের প্রভাব ছিল উল্লেখ করার মত। সমাজভাবনা ও ধর্মীয় চেতনাতে এঁরা বরাবরই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন সারা ভারতে। রায়বাহাদুর ধনপৎ সিং দুগড় জৈন ধর্মশাস্ত্রকে একত্রিত করে ৪৫ খণ্ডে প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তিনি গুজরাটের পালিতানা পাহাড়ের পাদশিখরে জৈনমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি সারা ভারতে অনধিক ৩০টি জৈন মন্দির নির্মাণ করেন। রায়বাহাদুর বুধ সিং দুধোরিয়া, রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া সেতাবচাঁদ নাহার, নরেন্দ্র সিং সিংঘী, নির্মলকুমার নলাক্ষা প্রভৃতিরা বিভিন্ন সময়ে সর্বভারতীয় জৈন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। জৈন সমাজের এমন কোন পবিত্র ভূমি নেই যেখানে তাঁরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় ট্রাস্ট গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করেন নি। এ থেকেই সারা ভারতবর্ষের জৈনদের উপর তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনুমান করা যায়।

১৯৩২ সালে আজমীর শহরে প্রথম ওসোয়াল মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পূরণচাঁদ নাহার। সম্মেলনে মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথা তুলে দেবার প্রস্তাব করা হয় এবং বিবাহ ও নানাকার্যে স্ত্রী আচার সঙ্কুচিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই সমাজের মহিলাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করার মতো। নলাক্ষা পরিবারের মহাতাব বিবি কোন এক মন্দির নির্মাণে নিজ হাতে প্রত্যেকটি ইট ধুয়ে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত হীরাকুমারী কোঠারীর ধর্মজ্ঞান অনেকেরই থেকে বেশী ছিল। মহিলাদের প্রায় সবাই এবং পুরুষদের অধিকাংশই রাতে কোন খাবার এমনকি জল গ্রহণও করতেন না। তবে এই রীতির কঠোরতা আগের থেকে অনেক কমেছে। পূরণচাঁদ নাহার তিনখণ্ডে Jain inscription এবং Epitome of Jainism লিখে ভারতীয় ধর্মীয় সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেন।

এই সমাজের ধর্মীয় কঠোরতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইন্দ্রচাঁদ দুধোরিয়ার সমাজচ্যুতীকরণ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রচাঁদ দুধোরিয়া ইন্দ্রচাঁদ নাহাটা কাউকে না জানিয়ে

'প্যারিস এগজিবিশন' এ যোগদান করেন। নাহাটা ফিরে না আসলেও, দুধোরিয়া ফিরে আসেন কিছু দিনের মধ্যে। বিদেশে অবস্থানকালে খাদ্যাভ্যাস ও সমুদ্রযাত্রাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল যুবকের পক্ষে অর্থাৎ বিলিযাতি এবং অন্যদল সনাতনপন্থী বা দেশী। মুর্শিদাবাদীদের কাছে আজও এটা 'দেশী-বিলিয়াতি' ঝগড়া নামে চিহ্নিত। ইন্দ্রচাঁদ দুধোরিয়াকে কেন্দ্র করে কলিকাতা হাইকোর্টে Jain Deformation Case হয়। সমাজের চাপে রায়বাহাদুর বুধ সিং দুধোরিয়া ছেলেকে ঘরে নিতে অস্বীকার করেন। বলাবাহুল্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদী সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় কঠোরতার ছাড় লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৪ সালে ইন্দ্রচাঁদ দুধোরিয়ার সন্তানদেব সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। ১৯৩৪ সালে বিজয় সিং নাহার ও ভমরমল সিংঘীর সম্পাদনায় 'ওসোয়াল নবযুবক' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে এরা ধর্মীয় কঠোরতা, সাধুদের আচরণ এবং স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে লেখালেখি করেন। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধতায় সে পত্রিকা অবশ্য বেশীদিন চলে নি। ধর্মীয় ও সামাজিক কঠোরতার ফলেই ঋষভ শ্যামসুখা, পরিচাঁদ কোঠারী, পৃথ্বী সিং শ্রী অরবিন্দের খুব কাছের লোক হয়ে যান এবং তাঁদের সম্পত্তি ঐ আশ্রমকে দান করেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এই সম্প্রদায়ের সচ্ছল অধিকাংশ লোকই মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা শহরে চলে আসেন। তবে যাতে তাঁদের নিজস্বতা বা মুর্শিদাবাদ ঘরানা হারিয়ে না যায় সেজন্য তাঁরা 'মুর্শিদাবাদ সংঘ' স্থাপন করেন। এই সঙেঘর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে নরেন্দ্র সিং সিংঘী ও পূরণচাঁদ শ্যামসুখা। বর্তমানে সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে কান্তি শ্রীমল ও শশিকান্ত নলাক্ষা। সংঘের শর্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম আজও নিয়মিত হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। **House of Jagat Seth — J. H Little, Calcutta 1967.**

২। **History of Nawlakhma Family**

৩। **History of Dugar's**

৪। **History of Dudhoria's**

৫। **নাহার বংশ বৃত্তান্ত**

সাক্ষাৎকার

১। বিজয় সিং নাহার

২। রতন সিং নাহার

৩। জলি শেঠ

৪। এন. এস. দুগড়

৫। শশীকান্ত নলাক্ষা

৬। খেমচন্দ্ দুধোরিয়া

৭। বিমল দুধোরিয়া
৮। যুগল শ্রীমল
৯। কান্তি শ্রীমল
১০। হরি সিং বাছাওয়াত
১১। মামাজী কোঠারী।

বিভিন্ন সময়ে এঁদের একাধিকবার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং এঁরা প্রায় সকলেই নানা তথ্য ও প্রমাণ পুস্তিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : তত্ত্ববোধিনী সভা ও উনিশ শতকের বাংলায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি সংস্কারের প্রয়োজনে কলকাতায় 'আত্মীয়-সভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই অসংখ্য ছোট ও বড় সভা-সমিতি আত্মপ্রকাশ করে।[১] এই সভা-সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা, তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ও কর্মসূচী অনুধাবন করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইংরেজি শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে সমাজের পরিবর্তিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা সেই সময়কার বাঙালি যুব সম্প্রদায়ের মন আন্দোলিত ও উদ্বেলিত করে তুলেছিল। তবে, উল্লেখ্য যে, এই সভা-সমিতিগুলি চিন্তায়, কাজে ও কর্মধারায় একই রকমের ছিল না। কিছু সংখ্যক সভা ঔপনিবেশিক বা পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ভাবধারা ও আদর্শ অনুপ্রবেশের সহায়ক ছিল। অন্যান্য কয়েকটির মধ্যে তৎকালীন ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রভাব, দেশীয় ঐতিহ্যের উপর তার আধিপত্য ও মাতৃভাষা চর্চা থেকে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান প্রবণতাগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা ও সচেতনতা লক্ষণীয়। এই শেষোক্ত পর্যায়ের অন্তর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'[২]। যা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যাবলী সভ্যদের লেখা ও বক্তৃতাগুলি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় যে, এই সভা নিছক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনামুখর সভা ছিল না। সভার মতাদর্শ ও কর্মসূচী এই নির্দেশ করে যে, এই সভার সভ্যদের মনে স্বদেশপ্রীতি, দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও বিশেষত ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও তার বিজাতীয় প্রভাব সম্পর্কে দুশ্চিন্তা বিদ্যমান ছিল।[৩]

১

বিগত শতাব্দীর ভারতীয় সমাজসংস্কারকগণ প্রায় সকলেই তৎকালীন প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক অন্ধবিশ্বাস, জাতিভেদ প্রথা, শিক্ষার অভাব ইত্যাদিকেই পরিবর্তন বা প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। সেই সময়কার ধর্ম ও সমাজের অনেক রীতি-নীতি তাঁদের কাছে এক পশ্চাদগামী সমাজের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ বলে মনে

হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন এক পরিবর্তিত সমাজ যার বৈশিষ্ট্য হবে স্বাধীনতা, যুক্তি, সহনশীলতা ও আধুনিকতা। এক কথায়, একটি সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে তাঁরা এক আধুনিক সমাজে উত্তরণে আগ্রহী ছিলেন।[৫]

এই উত্তরণের পদ্ধতি ও প্রকৃতি ও নির্দিষ্ট পথ সম্বন্ধে সংস্কারকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এক বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন যে, সমাজে অনুন্নতি ও অযৌক্তিক রীতি-নীতির প্রাধান্যের প্রকৃত কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার ও চেতনার অভাব। তাই তাঁরা সমাজে শিক্ষাব প্রসাবের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে শিক্ষাকে তাঁদের কর্মসূচীতে শুধু অন্তর্ভুক্ত নয়, বিশেষ গুরুত্বও দিয়েছিলেন।[৫] কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাধারা অবশ্যই ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যগত ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনেকাংশেই পৃথক ছিল। সমাজসংস্কারকদের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সমাজের উন্নতি, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষার প্রসার ও নীতির পিছনে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, (ক) ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রসার, (খ) শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনে মানব সম্পদ তৈরী। আর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তঃকরণ। ঔপনিবেশিক শাসন শুধু পুলিশ বা সৈন্যের সাহায্যে কায়েম করা হত তা নয়, বিদেশী শাসন সম্বন্ধে এক অলীক মায়া বা illusion সৃষ্টি করেও উপনিবেশবাসীদের মনে শাসকবর্গ সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি করাও ছিল অভীষ্ট।[৬] আর, এক্ষেত্রে শিক্ষাই ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার দ্বারা ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ, পাশ্চাত্য মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা ও ভাষা সব ক্ষেত্রে এক উচ্চ ধারণা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হত। সুতরাং, প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষা যাই হোক না কেন, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারি প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা চরিতার্থ করা[৭]।

২

ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মিশনারীদের বেসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিঃসন্দেহে ক্রীশ্চান ধর্মের প্রচার, প্রসার ও ধর্মান্তঃকরণ। মিশনারী প্রচারকগণ এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন যে, ভারতীয়দের অযৌক্তিক ধর্ম ও সামাজিক বিশ্বাসই তাদের অনুন্নতির একমাত্র কারণ ও তার থেকে ভারতবাসীদের উদ্ধার করার জন্য চার্লস গ্রান্টের মত সবাই প্রায় একযোগে জোর দিয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের উপর।[৮] তাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্ম প্রচার অপেক্ষা, স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি উদ্যোগ ও উৎসাহ তাদের বেশী ছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম এ্যাডামস-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সারা বাংলায় মোট ১৩৪টি মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল আট হাজার।[৯]

এইসব মিশনারী স্কুল বাংলার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের সুবিধার্থে পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও বিতরণের সাহায্য করতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা স্কুল

বুক সোসাইটি।[১০] এই সময়কার বাংলায় পাঠশালাগুলিতে পঠন-পাঠনের দুরবস্থা ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব লক্ষ করে, কিছু ইউরোপীয় ও ভারতীয় তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই সোসাইটির গোড়াপত্তন করে।[১১] তবে, এই সোসাইটির পাঠ্যপুস্তক তালিকায় কোনো ধর্মপুস্তক বা ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক অন্তর্ভুক্ত না রাখার সিদ্ধান্তে সোসাইটির সদস্য একমত থাকলেও সব সংস্থার মিশনারীরাই স্কুল বুক সোসাইটির উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, মিশনারীদের বদ্ধমূল ধারণা এই ছিল যে, স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে 'নেটিভ'দের মন ক্রীশ্চান ধর্ম গ্রহণের জন্য আরও প্রস্তুত হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্য ভাবধারা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা তাদের ক্রীশ্চান ধর্ম গ্রহণে উৎসুক করে তুলবে, আর যা প্রকারান্তরে মিশনারীদেরই সাহায্য করবে।[১২]

১৮২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, স্কুল বুক সোসাইটি প্রায় এক লক্ষেরও উপর বই বিক্রি করতে সমর্থ হয়। তাদের পাঠ্যপুস্তক তালিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ছিল রেভারেন্ড পিয়ার্স-এর 'ভূগোল', কীথ-এর 'ব্যাকরণ' আর 'নীতিকথা'র তিনটি ভাগ। তবে, পরবর্তী কয়েক বছরে বাংলা বই-এর চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও, অর্থনৈতিক সঙ্কটজনিত কারণে, ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সোসাইটি শুধু পুরনো বইগুলিরই পুনর্মুদ্রণেই নিজেকে ব্যস্ত রাখে, নতুন কোনো বই আর ছাপানো হয়নি।[১৩] সোসাইটির এই বইগুলি পাঠ্যপুস্তকের রূপে প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হলেও, এর ভাষা ও বিষয় বক্তব্য সাবলীল ছিল না।

মিশনারীদের এই উদ্যোগের তুলনায়, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের তরফে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টাগুলি তেমন দানা বাঁধে নি। ১৭৭২ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত, তারা শিক্ষায় কোনো দায়িত্বই স্বীকার করে নি এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সগদ আইনে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা খরচ করতে স্বীকৃত হলেও উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি।[১৪] ১৮১৭-তে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও, পরের দশকে প্রাচ্যবাদী ও প্রতীচ্যবাদীদের বিতর্কের কারণে অবস্থার উন্নতি হয়নি। শেষপর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে তার আইনসদস্য টমাস ব্যারিংটন মেকলের প্রচেষ্টায় সরকার ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের পক্ষে নীতি গ্রহণ করে।[১৫] ইংল্যান্ডের সংস্কার আন্দোলন, অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তাদের চাপ, উপযোগীবাদীদের মতামত ও বিশেষ করে প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের ব্যবহারের প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষার উপর কোম্পানী জোর দেয়।[১৬] ফলস্বরূপ বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু কলেজ, কলকাতা স্কুল সোসাইটি এবং কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতির সময় থেকে যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা গড়ে উঠতে থাকে তা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতা আরও বাড়ে যখন ১৮৪৪ খ্রীঃ হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, ইংরেজি শিক্ষিত না হলে সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার একদিকে যেমন মনের প্রসার ঘটিয়ে চেতনা বৃদ্ধি ও আধুনিকতার পথ সুগম করেছিল, তেমনি অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। এই অনুপ্রবেশকে কাজে লাগিয়ে কায়েমী ঔপনিবেশিক স্বার্থ দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির

উপর আধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিল। এই পটভূমিকায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যবৃন্দ স্বজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন, বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রাচীন ভারত তথা পুরাতত্ত্বচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্যের (Colonial Cultural Domination) বিরোধিতা করতে সক্রিয় হয়।[১৭]

৩

একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার অন্যদিকে সরকারের নীতি ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের স্বধর্মে অনাস্থা, স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, এমনকি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ট বিচলিত হন। প্রখর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শাসনের সুযোগে বিদেশীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তৎপর হন। এ কাজে তাঁর সহায়ক হন অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। তত্ত্ববোধিনী সভার মূল কর্মধারা এজন্য খ্রীষ্টতত্ত্বের বিরুদ্ধে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য' সত্য ধর্ম প্রচার হলেও, তাঁরা বাংলা ভাষাচর্চা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং পুরাতত্ত্ব, ভারততত্ত্ব ও প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৮]

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রথমে দেশেব তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে উদ্যোগী হন। পত্রিকার ১৭৬৫ শতকের আশ্বিন সংখ্যায় লেখা হয়,[১৯] "আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খ্রীষ্টান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এ দেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব, এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।" তত্ত্ববোধিনীর পাতায় পাতায় এই দেশানুরাগ পরিস্ফুট এবং পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় দেশের শাস্ত্রোদ্ধার, তার ব্যাখ্যান, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের আলোচনা,. কু-প্রথা দূর করার উপদেশ ইত্যাদিই বেশী লেখা হত।[২০] অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকীয়গুলি ও তাঁর বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চা, বাংলা ভাষাকে সকল রকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তোলে। এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'যুগান্তর' উপস্থিত করেছিল।[২১]

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সমাজে পাশ্চাত্য রীতি-নীতি অনুকরণ, খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ ও মাতৃভাষা চর্চার প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি যেসব প্রবণতা দেখা দেয় এবং বিজাতীয় শিক্ষাই এই অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ বলে সভায় বিবেচিত হওয়ায়, বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রদানের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] সভার তরফে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, 'ইংরেজি ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ — এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা।'[২৩] পাঠশালাটি তিন বছর অর্থাৎ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল বাংলা এবং পাঠশালার ক্লাস সকালে হত, যাতে ছাত্ররা পরবর্তী সময়ে অন্য স্কুলে ইংরেজি শিখতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক সবই স্থান পেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না, তাই ইংরেজি অনুরাগীদের দ্বারা অধ্যুষিত কলকাতা শহরে পাঠশালা বেশিদিন স্থায়িত্বলাভ করেনি।[২৪] দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে যাঁরা তাদের ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাতেন, তারাও ক্রমে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এইরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, সভার সদস্যগণ পাঠশালার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ইংরেজি সংযোজন করলেও অবস্থার উন্নতি হয় না।[২৫] অবশেষে, কলকাতার বিদ্যালয়টি বন্ধ করে, সভা বাঁশবেড়িয়া গ্রামে (হুগলী জেলায়) অরেকটি স্কুল স্থাপন করে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল বাঁশবেড়িয়ায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকে।[২৬] তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য এই গ্রামে বসবাস করায়, দেবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যে, পাঠশালাটি এখানেই সার্থক রূপ নেবে। অক্ষয়কুমার দত্ত এই পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হতে অস্বীকার করলে, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, যিনি ওই গ্রামেই থাকতেন, তিনি ওই পদে নিযুক্ত হন।[২৭] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে এই স্কুল বিষয়ে জানা যায় যে, এখানে বিনা বেতনে বিদ্যা দান করা হত এবং প্রায় ১০০ জন ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করত। এই স্কুলের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সবই বহন করতেন সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাই দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু ও তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হলে, বাঁশবেড়িয়ার এই পাঠশালাটিও উঠে যায়।[২৮] আর যে বাড়িটিতে স্কুল হত, কয়েক মাস পর সেখানে ডাফ মিশন তাদের মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে।[২৯]

এইভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই উদ্যম তৎকালীন বঙ্গসমাজের অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। এমনই দুটি স্কুলের একটি ব্যারাকপুরে ও অপরটি সুখসাগরে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০]

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থায়িত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হলেও, সভার তরফ থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি বা খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের পাঠ্যপুস্তক রচনার বোধ ও শৈলী ছিল নিঃসন্দেহে উন্নতমানের। স্কুল বুক সোসাইটির তরফে রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য' (১৮১৮), তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'ভাষা পরিচ্ছেদ' (১৮২১) ইত্যাদি বইগুলি প্রকাশিত হলেও, ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে, তা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়।[৩১] পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৮৩০-এর পরে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রীক দেশের ইতিহাস' (১৮৩১) ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১) ভাষার দিক থেকে কিছুটা সহজ হলেও তা পাঠ্যপুস্তকের সমগোত্রীয় হয় না।[৩২] আর মিশনারীদের লেখাগুলি ছিল নিছক ধর্মীয় প্রচারের জন্য।

তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য ছিল উপরিউক্ত পাঠ্যপুস্তকের যা যা ত্রুটি তা সংশোধন করে ভাল ও সেই সময়ের উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মাতৃভাষা চর্চার অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভূগোল' বইটির শুরুতে লেখেন, "এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে। এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"[৩৩] অক্ষয়কুমার দত্তের এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৪১-এ। তারপর প্রকাশিত হয় 'চারুপাঠ' (তিনটি পর্বে, যথাক্রমে ১৮৪৩, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯)। শেষোক্ত বইটিতে নানা বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, বিজ্ঞান থেকে নীতিকথা পর্যন্ত। অক্ষয়কুমারের সব থেকে জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক ছিল 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)। উপরন্তু 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১ ও ১৮৫৩) গ্রন্থের শেষে তিনি ছাত্রদের সাহায্যের জন্য ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষাও সঙ্কলন করেন।[৩৪] তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তকগুলির বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তা লাভের সব থেকে বড় কারণ ছিল, তাঁর সাবলীল ও স্বচ্ছ ভাষা ও চিন্তার সহজতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লেখেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষের অনুরোধে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৮), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১-৫৩), 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১৮৫৩), 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫), 'কথামালা' (১৮৫৬) ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ সংস্কৃত বা ইংরাজী রচনার ভাবানুবাদ

হলেও, রচনা ও ভাষার গুণে বইগুলি অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সভার অপর আরেক গুরুত্বপূর্ণ সভ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখাগুলিও এইসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর 'শিশু-শিক্ষা' (তিনটি পর্যায়ে, ১৮৬৪-৬৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে সমাদৃত হয়। এছাড়া উল্লেখ করা যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' ও 'পুরাবৃত্ত সার'। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যবৃন্দের পাঠ্যপুস্তক রচনার এই প্রয়াস পরবর্তী সময়ে আরও বেশীমাত্রায় সফল হয় এবং আদর্শ পাঠ্যপুস্তক রচনায় বহুজনে ব্রতী হন।

মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা চর্চা দেবেন্দ্রনাথের[৩৫] বা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের প্রধান অভিপ্রায় ছিল বলেই বিদেশী শাসনের অধীনতার ফলে বিদেশী ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী যুবকদের বাংলা ভাষা চর্চার জন্য নানাবিধ সাহায্য করতে সচেষ্ট হন।[৩৬] তাই শুধু পুস্তক প্রকাশ নয়, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করাও এই উদ্দেশ্য সাধনের একটা বড় অঙ্গ। পত্রিকার পাতায় বা সম্পাদকীয়তে বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিশুদ্ধতার প্রতি নজরদানের কথা উল্লেখ শুধু নয় — বাংলা ভাষায় কথোপকথনের সময়ে যাঁরা ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন তাঁদের সমালোচনাও করা হয়েছে।[৩৭] এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৮] একই সঙ্গে বাংলা ভাষাচর্চার মতই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ, পুরাতত্ত্ব অনুশীলন, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ইতিহাসচর্চা, নানা উপাসক সম্প্রদায়ের উপর তথ্যমূলক আলোচনা ইত্যাদি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করলেও এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষিত হলেও ছাত্রসমাজের মনের প্রসারের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর প্রাচীন হিন্দুদের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সমুদ্র অভিযান বিষয়ক রচনা লিখেছিলেন তৎকালীন কালাপানি সংক্রান্ত হিন্দু সমাজের কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে। উপসংহারে বলা যায় যে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্র উনিশ শতকের মধ্যভাগে এক যুগসন্ধিক্ষণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার চাইলেও সভার উদ্যোক্তারা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্লাবনে ভেসে যাওয়া থেকে কিংবা দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখ হওয়া থেকে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, এই বৃহত্তর কাজেরই অঙ্গ। উত্তরকালে বিপিনচন্দ্র পাল[৩৯] এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন যে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা ছিল, "The first to lay bare the ancient treasures of this land before the wandering gaze of our educated young men of those days, and to open their eyes to the existence in their ancient literature of refined system of religion and subtle school of philosophy." ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এক দেশীয়

সংস্কৃতির চেতনা গড়ে তোলাই তত্ত্ববোধিনী সভার সর্বাপেক্ষা বড় দান। কারণ, এই দেশীয় সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যেই নিহিত ছিল উত্তরকালের জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা।

সূত্র নির্দেশ

১। যোগেশচন্দ্র বাগল, **বাংলার নব্যসংস্কৃতি**, কলকাতা, ১৯৫৮, বিনয় ঘোষ, 'বাংলার নবজাগরণে বিদ্যোৎসভার দান' **বিশ্বভারতী পত্রিকা**, সংখ্যা ১২, অথবা বিনয় ঘোষ, **বাংলার বিদ্যোৎসমাজ** কলকাতা, ২য় সং, ১৯৭৮।

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আত্মজীবনী**, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, ৪র্থ সং, কলকাতা, ১৯৬২, যোগানন্দ দাস, 'তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর' **প্রবাসী**, চৈত্র, ১৩৪৫ সন, Dilip Kumar Biswas. 'Maharshi Debendra nath Tagore and the Tattvabodhini Sabha' in A C Gupta, ed. **Studies in the Bengal Renaissance**. Calcutta. 1958

৩। "...... এদেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগেব সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না — তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এ দেশের জাতীয ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি।" **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**, ১ আশ্বিন, ১৭৬৫ শক। [অতপর ত. প.]

৪। A. F. Salahuddin Ahmed. **Social Ideas And Social Change In Bengal, 1818-1835**, 2nd ed., Calcutta. 1976 K N Panikkar. 'Culture and Consciousness in Modern India A Historical Perspective' in **Social Scientist**, Vol. 18. No 4. April. 1990.

৫। ঐ

৬। Amikar Cabral. **Unity and Struggle**. London. 1980. pp 142-43.

৭। A. F. Salahuddin Ahmed. **op. cit.** pp. 181-86

৮। K. P. Sengupta. **The Christian Missionaries In Bengal, 1793-1833.**. Calcutta. 1971. p.66.

৯। ঐ, পৃঃ ১০২।

১০। Amalendu De. 'Publication of Text-Books In Bengali : A Movement For Child Education in 19th Century Bengal ' **David Hare Bi-Centenary Vol.** ed. R Bhattacharya.

১১। এই সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, "that the objects of this society be the preparation, publication and cheap and gratuitous supply of works useful in schools and seminaries of learning". **Calcutta School Book Society**, Second Report. 1819. pp. 88-89.

১২। K. P. Sengupta **op. cit.**, pp. 98-99.

১৩। Amalendu De. op. cit

১৪। D P Sinha **The Educational Policy of the East India Company in Bengal to 1854**. Calcutta. 1964 pp 30

১৫। David Kopf. **British Orientalism and the Bengal Renaissance** Calcutta. 1969 . pp 247-48

১৬। A F Salahuddin Ahmed. **op. cit.**, pp 197-99

১৭। For a detailed study see Arundhati Mukhopadhyay. Attitudes Towards Religion and Culture in Nineteenth Century Bengal 1829-59'. in **Studies in History**. Vol III. No 1 . Jan-June. 1987

১৮। 'কি কি উপায়ে এদেশের উন্নতি হইতে পারে'. **ত. প** , ফাল্গুন, ১৭৮৩ শক. নং ১২৩।

১৯। **ত. প.**, আশ্বিন ১৭৬৫ শক।

২০। **ত. প.** পৌষ, ১৭৬৬ শক।

২১। এই পরিপ্রেক্ষিতে রমেশ দত্ত মন্তব্য করেছেন যে, "People all over Bengal awaited every issue of that paper (Tattwabodhini Patrika) with eagerness" দ্রষ্টব্য, অজিত কুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৬২।

২২। এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখের **Calcutta Courier** পত্রিকা লেখে : "We have been given to understand that a new school, having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country is about to be established "

২৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, '**আত্মজীবনী**, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃঃ ২৯৯।

২৪। **ত. প.**, ভাদ্র এবং আশ্বিন, ১৭৬৫ শক, নং ১ ও ২।

২৫। **ত. প.**, ভাদ্র, ১৭৬৬ শক, পৃঃ ১০২-০৪।

২৬। **ত. প.**. ভাদ্র, ১৭৬৫ শক ও অগ্রহায়ণ, ১৭৬৬ শক, পৃঃ ১১-১২।

২৭। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, **অক্ষয়চরিত**, ১২৯৪ সদন, পৃঃ ১৬-১৭।

২৮। **আত্মজীবনী**, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৯। **The Friend of India**. 6 April. 1848

৩০। Kasiswar Mitra. **The Late Govindaram Mitter's Family**, Calcutta. 1869. p 53

৩১। মনমোহন ঘোষ, **বাংলা গদ্যের চার যুগ**, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৪৯, পৃঃ ৫৪-৫৭।

৩২। ঐ, পৃঃ ৭৭-৭৮।

৩৩। 'অক্ষয়কুমার দত্ত', **সাহিত্য-সাধক চরিতমালা**, নং ১২, পৃঃ ৩৩।

৩৪। ঐ পৃঃ ৩৫।

৩৫। দিলীপকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৯।

৩৬। **ত.প.**, শ্রাবণ, ১৭৭০ শক, নং ১৬৮।

৩৭। **ত.প.**, আশ্বিন, ১৭৯৪ শক, নং ৩৯৮।

৩৮। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, **মহর্ষির পত্রাবলী**, কলকাতা, পৃঃ ৩০।

৩৯। Bipin Chandra Pal, **The Present Social Reaction, What Does it Mean?** Calcutta. 1884. p.5

উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

গৌতম নিয়োগী

স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৫৭)-কে নিয়ে কোনো ইতিহাসবিদ আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই, এমনকি কোনো প্রবন্ধ পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে নি। অথচ আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হলে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার এই মানুষটি বিস্মৃত থাকতেন না। অবশ্য আপামর জনগণের মধ্যে এই বিস্মৃতি লক্ষ্য করা গেলেও হুগলী জেলার, বিশেষত উত্তরপাড়ার মানুষজন তাঁকে ভোলেন নি। আমাদের রাজা প্যারীমোহন কলেজ যে রাস্তায়, তার নাম বর্তমানে অমরেন্দ্র সরণি। এই অমরেন্দ্র সরণি আর জি. টি. রোডের সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অমরেন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি; অমরেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠও তাঁর নাম বহন করে আজও শিক্ষাবিস্তারে নিযুক্ত। আর অমরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র, প্রয়াত বিপ্লবী সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, পিতার জীবনীমূলক অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের জন্য আমি মূলত তাঁর ব্যবহৃত সেই সব উপকরণের সাহায্য পেয়েছি এবং এজন্যে কৃতজ্ঞচিত্তে সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করি।

অমরেন্দ্রনাথের পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মায়ের নাম সরলা দেবী। গোঁড়া হিন্দু সচ্ছল পরিবার। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথে জন্ম হয়। তিনি পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। চট্টোপাধ্যায় পরিবার হুগলি জেলারই লোক, পরে সাকিন উত্তরপাড়া। অমরেন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারিকানাথ (জন্ম ১৮২৭) এবং পিতা উপেন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৫২) উভয়েই ওকালতি করতেন। উপেন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথের পিতা, উত্তরকালের আইনচর্চা করলেও উত্তরপাড়া সরকারি স্কুল থেকে পাশ করে, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ এ উত্তীর্ণ হয়ে, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফার্স্ট ব্যাচের ইঞ্জিনিয়ার। পরে বি ই কলেজ হাওড়ার শিবপুরে স্থানান্তরিত, উপেন্দ্র কিছুদিন সেখানে পড়িয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের মা সরলা ছিলেন ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী খিয়াড়া গ্রামনিবাসী রামনিধি বাচস্পতির পৌত্র উত্তরপাড়া নিবাসী নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা। মাতামহ নবীনকৃষ্ণ ওকালতি করতেন। অমরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিতাকে সর্বদা কাছে পাননি, আইন ব্যবসার কাজে তিনি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। মা, সরলা দেবী, এককালে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বালিকা

বিদ্যালয়ে পড়া মেয়ে, তিনিও শিক্ষিতা, পুত্রকে গৃহশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা দেন। উত্তরপাড়া সরকারি বিদ্যালয় ও ভাগলপুরে, যেখানে পিতা কর্ম করতেন, সেখানকার স্কুল থেকে অমরেন্দ্রনাথ বিদ্যালয় জীবন শেষ করে কলেজে পড়তে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন ডাফ (= বর্তমান স্কটিশচার্চ) কলেজে।

এই কলেজ জীবনে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী, জ্যোতিভূষণ হালদার, ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। অনেকেই উত্তরকালে খ্যাত, কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক। সে কথায় পরে আসব। বি. এ. পাশ করার পর পিতার কথায় আইন পড়তে শুরু করলেও সে পাঠ সাঙ্গ হয়নি। আইনের কচকচিতে জীবন না কাটিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের পরাধীনতার মুক্তিযজ্ঞে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন বিহারের দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের কর্মচারী প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলবাসিনীকে।

অমরেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র তখন বাংলার যুবকদের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল স্বামী বিবেকানন্দের। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, অমরেন্দ্র মার সঙ্গে আলোচনা করলে, তাঁর মা উপদেশ দিয়েছেন, 'কর্মযোগী হও।' সেই 'কর্মযোগী' হয়েছিলেন অমরেন্দ্র। বিবেকানন্দের প্রভাব ছিলই, তাঁর মায়ের প্রভাব তাঁর উপর কম ছিল না। ১৯০১ খ্রীঃ জাপান ফেরৎ জনৈক বঙ্গসন্তান রামকান্ত রায়ের কাছ থেকে জাপানে যুবকদের সমাজসেবা ও দেশপ্রেম বিষয়ে শুনে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৫-এ স্বদেশী বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কলকাতায় আলাপ হয় অমরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘাযতীনের সঙ্গে। বাঘাযতীনের মামাতো বোনের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের ছোট মামা সুধানাথের বিবাহ হয় ঐ বছরই। এই পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। তার আগে তিনি মনস্থির করেন যে চাকুরি বা ব্যবসা তিনি করবেন না, এ ব্যাপারে তাঁর পিতা-মাতার সায় ছিল। ক্রমে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচয় হলেও যুবক অমরেন্দ্র তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উত্তরাপাড়াকেই। বিশেষত স্বদেশী অর্থনৈতিক উদ্যোগ অর্থাৎ স্বদেশী নুন, কাপড়, চিনি ইত্যাদি তৈরি করার কাজে নেতৃত্ব দিতে তিনি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী ভাবধারা প্রচারের কাজ তো ছিলই।

উত্তরপাড়ায় তাঁর কাজের বিশেষ সহায়ক হিসেবে পেয়েছিলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা মিছরিবাবুকে। উত্তরপাড়ায় বিলিতি পণ্য বর্জন, বয়কট ও স্বদেশী প্রচারের জন্য অমরেন্দ্রনাথ 'শিল্পসমিতি' নামে এক প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী ভাণ্ডার, 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির' উত্তরপাড়া শাখা ইত্যাদি গঠন

করেন। এছাড়া তাঁর নানাবিধ কর্মযজ্ঞের মধ্যে রয়েছে 'ফিল্ড অ্যাকাডেমি' স্থাপন করে ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করা, একটি পাঠচক্র গড়ে তুলে হরিহর মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকদলকে টেনে আনা, উত্তরপাড়া বাজারে বিশাল সভার ব্যবস্থা (যে সভায় বক্তা হিসেবে গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি। ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে উত্তরপাড়া থেকে সদলে যোগ দিয়েছিলেন, উত্তরপাড়ার 'শিল্প সমিতি'র সামগ্রীর প্রদর্শনীও হয়। কিন্তু ১৯০৬ থেকেই কংগ্রেসের মধ্যেকার চরমপন্থী-নরমপন্থী বিভেদে অমরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শুধু কংগ্রেসের ভিতরকার চরমপন্থীদের সঙ্গে নয়, তাঁর যোগ হয় বিপ্লবী দলের সঙ্গেও। বস্তুত ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জাতীয় বিপ্লবী দলভুক্ত হন।

ঐ বছরই অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে কলকাতায় চলে আসেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভার নেন এবং 'বন্দে মাতরম্' ইংরাজী পত্রিকা বের করেন বিপিনচন্দ্র পালকে সম্পাদক করে। অচিরেই অরবিন্দের সঙ্গে অমরের আলাপ হয়, পরিচয় হয় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে। যোগসূত্র ছিলেন তাঁর দুই পূর্বোক্ত কলেজ সহপাঠী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। অমর, অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমারের বন্ধুতা সূত্রে, অরবিন্দকে ডাকতেন 'সেজদা' বলে। অমরেন্দ্রনাথ ১৯০৭-এর কোন এক সময় লিখছেন "২৩ নং স্কটস্ লেনে তখন সেজদা থাকেন। ত্যাগের, সংযমের, সাহসিকতার, দেশপ্রাণতার মূর্ত বিগ্রহ। একদিন সেখানে বসে আছি, একটি যুবা এসে আমার সঙ্গে আলাপ করল। সে হচ্ছে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, প্রবর্তক দলের এক বিশিষ্ট সভ্য। সেই দিনই আলাপ হল কানাইলাল দত্তের সঙ্গে। এক সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম। তারা দুজনে চন্দননগর গেল, আর আমি উত্তরপাড়ায় নামলাম।"

অমরেন্দ্র 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাগুলি রাখতেন, যে পত্রিকাগুলি ছিল বিপ্লববাদ তথা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তদানীন্তন সংগ্রামী চেতনার মুখপত্র। ঔপনিবেশিক সরকারও নানা দমন-নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা কড়া হাতে নিতে শুরু করে ১৯০৭ থেকেই। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই শুধু অতি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা দরকার। একদিকে কংগ্রেসের মধ্যে চলছে তীব্র বিরোধ, যার চূড়ান্ত পরিণতি তিলকপন্থীদের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়ে মারা। অন্যদিকে বাংলায় বিপ্লবীদের তৎপরতা শুরু হয়েছে আর ইংরেজ সরকার ধড়-পাকড়, নিপীড়ন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'পড়ে গেছি প্রেমের দায়ে' শীর্ষক রচনা 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তাঁকে রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু। তাঁর মরদেহ নিয়ে বাঙালী যুবকদের বিশাল শোভাযাত্রা ছিল দেখার মতো। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা হয়। সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সম্পাদকীয় আসলে অরবিন্দের রচনা। বিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাঁর ছ'মাসের কারাদণ্ড হয়। সেই বিচারের দিন আদালতে এক ঘোড়সওয়ার পুলিশকে চড় মারার অপরাধে পনের বছরের কিশোর সুশীল সেনের

উপর পনেরো ঘা বেতের আঘাতের আদেশ দেন অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। ১৯০৭-এর ১ ডিসেম্বর সরকার সিডিশন মিটিং অ্যাক্ট পাশ করে। তবু, অগ্নিগর্ভ বাংলাকে শান্ত করা গেল না, বরং বিপ্লববাদের প্রসার ঘটল।

আমরা আবার অমরেন্দ্র প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই জানিয়েছি, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী উত্তালতরঙ্গে, ১৯০৫-এ তিনি মূলত উত্তরপাড়ায় কাজ করেছেন। পরের বছর তিনি উত্তরপাড়ার শিল্প সমিতিকে কলকাতায় নিয়ে এলেন, নাম হলো শ্রমজীবী সমবায়, তা যুক্ত হলো বৌবাজারের 'স্বদেশীভান্ডার'-এর সঙ্গে। উত্তরপাড়ায় বিলাতি কাপড়, নুন ও সিগারেটের বিরুদ্ধে বয়কট অব্যাহত রাখলেন। ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখল 'উত্তরপাড়া পশ্চিমবঙ্গের বরিশাল হতে চলেছে।' পুলিশের নজর পড়ল অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের উপর। অমর বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব নিলেন। অমর যে ধর্মরক্ষিণী সভা উত্তরপাড়ায় স্থাপন করেছিলেন, সেখানে ঘুরে গেলেন স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ।

পুলিশের খাতায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উঠল। গোয়েন্দা দপ্তরে তাঁর নাম, 'উত্তরপাড়ার গোবিন'। তাঁর বাড়ি তল্লাশি করা হলো কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না, তাকে গ্রেপ্তার করাও গেল না। এখানে দুটি তথ্য জানা গেছে। অমর যে অর্থ সংগ্রহ করতেন সে কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন রাজভক্ত রাজা প্যারীমোহনের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ বা মিছরিবাবু। আর কলকাতায় অরবিন্দের দলের সঙ্গে ছাড়াও অমরের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল চন্দননগরের দলের সঙ্গে। বিপ্লবীদের গোপনে প্রস্তুতি শুরু হলো বোমা বানাবার।

তারপর বিপ্লবী তৎপরতার ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত। ১৯০৮ খ্রীঃ অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমা মারার প্রচেষ্টা, ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার হওয়া, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, কলকাতার মানিকতলার মুরারিপুকুরের বাগান থেকে ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার, অরবিন্দকে ধরা হয় গ্রে স্ট্রীট থেকে, আলিপুর বোমার মামলা, নরেন গোস্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা, বিপ্লবী সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্তের হাতে জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাই-এর মৃত্যু, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, কানাইয়ের ফাঁসি এবং আলিপুর বোমার মামলায় বহু বিপ্লবীর কারাদণ্ড সত্ত্বেও অরবিন্দের অব্যাহতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যতটুকু বলা দরকার তা হলো, (১) ১৯০৮-এর ১লা মে ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার দিন অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সন্তোষকুমার বসু ও সুধীর কুমার বসুর নেতৃত্বে একদল উত্তরপাড়ায় যায়। অমর এক মিছিলের আয়োজন করেন। তাঁরা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিখ্যাত গান 'যায় যাবে জীবন চলে' গাইতে গাইতে শহর পরিক্রমা করেন। সারাদিন উত্তরপাড়ায় থেকে, মিছরিবাবুর আতিথ্য নিয়ে দল কলকাতায় ফেরে। (২) ১৯০৮-এর ২রা মে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উত্তরপাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেদিনই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। অমর কলকাতায় গিয়ে সে খবর পান

পরদিন ৩ মে। (৩) সেদিন উত্তরপাড়ায় ফিরে আসার পরদিন ভোরবেলা তার বাড়িতে পুলিশ হানা দিলে গ্রেপ্তারীযোগ্য সূত্র পায়নি।

১৯০৮ খ্রীঃ মে মাসের মধ্যভাগে অমর, চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল রায় এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাগিনেয় বাবুরাম পরারকর চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে মতিলালের বাগানে মিলিত হয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা আলোচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় উত্তরকালে লিখেছেন : "সেই সভায় স্থির হয় অমরেন্দ্র অর্থ সংগ্রহ ও বিপ্লবীদের সংহতি পুনর্গঠন করবেন, শ্রীশচন্দ্র সন্ত্রাসবাদকে উদ্দীপিত রাখবেন, মতিলাল রায় চন্দননগর থেকে বিপ্লবীদের সর্বরকমে সহায়তা করবেন এবং যোগাযোগ রাখবেন এবং পরারকর থাকবেন পরামর্শদাতা হিসাবে।" অমর সে কাজ করেছিলেন।

আলিপুর বোমার মামলা থেকে অরবিন্দ মুক্তি পান ১৯০৯-এর ৬ মে। এ খবর পেয়ে অমরেন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন কলকাতায় কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার অফিসে এবং ১৯০৯-এর ৩০ মে উত্তরপাড়া ধর্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অরবিন্দ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা মতো অমর ১৯০৯-এর ৩০ মে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) অরবিন্দকে ট্রেনে উত্তরপাড়ায় নিয়ে আসেন। বিশাল এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সভা হয় লাইব্রেরী (- বর্তমানে জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী) প্রাঙ্গণে। সভাপতিত্ব করেন রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'আবাহন' কবিতা আবৃত্তির পর সভার কাজ শুরু হয়। এখানে অরবিন্দ যে ভাষণ দেন ইতিহাসে তা উত্তরপাড়া অভিভাষণ নামে সুবিখ্যাত। এই ভাষণেই অরবিন্দর রাজনীতি ছেড়ে ধর্মপথে যাওয়ার আভাস পাওয়া যায়।

২৭শে জুন অরবিন্দ কলকাতায় বাংলা 'ধর্ম' এবং ইংরাজী 'কর্মযোগিন' (দুটিই সাপ্তাহিক) পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। অমরেন্দ্রনাথ শুরু করেন বাংলায় 'কর্মযোগিন' যা দু'বছর চলেছিল। ১৯১০-এর ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা কর্মযোগিন অফিসেই অরবিন্দ জানতে পারেন সরকার তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করতে মনস্থ করেছে। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বীরেন গুপ্তকে নিয়ে তিনি চলে যান ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর। সেখানে অবস্থান করেন ৩০শে মার্চ পর্যন্ত। অরবিন্দের নিজের লেখা **'Aurobindo about Himself and the Mother'** পুস্তিকায় জানিয়েছেন "Then there came to him a call to proceed to Pondichery. A boat manned by some young revolutionaries of Uttarpara took him to Calcutta; there he boarded the Dupleix and reached Pondichery on April 4, 1910"। ৩১শে মার্চ চন্দননগর থেকে কলকাতায় তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন নৌকোতে অমরেন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা। ডুপ্লে জাহাজে কেবিন আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র সুকুমার মিত্র। অমরেন্দ্র, বিজয় নাগ ও রঘুনাথ দাসসহ সেই জাহাজে শেষযাত্রী হিসেবে তুলে দেন রাত এগারোটায়। মিছরিবাবুর নাম করে হাতে তুলে দেন কিছু অর্থপ্রণামী। ১লা এপ্রিল জাহাজ ছাড়ে এবং পণ্ডিচেরী পৌঁছায় ৪ঠা এপ্রিল। একদা বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ভবিষ্যৎ

শ্রীঅরবিন্দ হওয়ার পথে যুগসন্ধিক্ষণে এই ভূমিকা পালন করেন উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অরবিন্দ চলে যাওয়ায় অমরেন্দ্র যে দু'জন বিপ্লবী নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন তাঁরা হলেন বাঘাযতীন এবং রাসবিহারী বসু। এবার সেই প্রসঙ্গে আসি।

আগেই জানিয়েছি, অমরেন্দ্র কলকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়' গড়ে তুলেছিলেন। তা বৌবাজার থেকে হ্যারিসন (= বর্তমান মহাত্মা গান্ধী) রোড ও কলেজ (= বর্তমান বিধান সরণি) স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ওযাই এম সি এ বাড়ির নীচ তলায় নিয়ে আসেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন বন্ধু ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী। এই শ্রমজীবী সমবায় প্রতিষ্ঠা করা হয় শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজের যোগ স্থাপন করে কুটির শিল্পের প্রসার এবং তা থেকে বিপ্লবী কাজে অর্থ সাহায্যের জন্য। এই সমবায় বিপ্লীদের এক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অমরের আর এক সহযোগী ছিলেন সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। মতিলাল রায়ের চন্দননগরের দল, রাজাবাজারের শশাঙ্কের বোমা তৈরির কেন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের বোমার আড্ডার সঙ্গে সমবায়ের যোগ ছিল।

১৯০৯ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের জীবনের আর এক পর্ব। ঐ সময়কালীন জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনার পরিসর বর্তমান প্রবন্ধে নেই, শুধু অমরেন্দ্র প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বলা দরকার। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘাযতীন তো তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, পূর্বপরিচিত। ১৯০৯ খ্রীঃ বিপ্লবী রাসবিহারী দেরাদুন থেকে বাংলায় আসেন এবং চন্দননগরে অমরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। অমরের কলেজের সহপাঠী ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী নদীয়া জেলার মুড়াগাছা স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছাত্র মন্মথনাথ বিশ্বাস ও বসন্তকুমার বিশ্বাসকে তিনি অমরের হাতে দিয়েছিলেন। এঁরাও বিপ্লবী দলে যোগ দেন, চন্দননগরের গুপ্ত সমিতিতে থাকতেন। এই বসন্ত বিশ্বাসকে অমর রাসবিহারীর সঙ্গে উত্তর ভ রতে পাঠান। বসন্ত রাসবিহারীর পরিচালনায় বড়লাট হার্ডিংকে বোমা মেরেছিলে· এবং দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। সেই মামলাতেও বসন্তের খরচ যুগিয়েছিলেন অমরেন্দ্র যদিও শেষপর্যন্ত বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি ঠেকানো যায়নি।

অমরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকেই জানা যায় যে তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বন্যাত্রাণের কাজের মধ্য দিয়ে দলের সংগঠন বাড়ানো এবং কর্মী সংগ্রহের কাজ করতেন। ১৯১২-তে বর্ধমান ও মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণে তিনি মাখন সেন, সুষেণ মুখুয্যে প্রমুখ সহকর্মী নিয়ে কাজে নামেন। সঙ্গে ছিলেন বসন্ত বিশ্বাসের দাদা মন্মথ বিশ্বাস। এই ত্রাণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে বিপ্লবীরাও কর্মী সংগ্রহ করত। বর্ধমান ত্রাণ কেন্দ্রে মতিলাল রায়ের সঙ্গে বাঘাযতীনের যোগাযোগ ঘটান অমরেন্দ্র। তাঁকে যারা অর্থ সাহায্য করতেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম পাই তাঁরা হলেন রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সূর্যকুমার আচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী।

লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণের পর রাসবিহারী বসু বাংলায় এলে শ্রমজীবী সমবায়ে একদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন বাঘাযতীনের বিপ্লবী

অমরেন্দ্রনাথই। আবার তিনিই আত্মগোপনকারী কর্মিবৃন্দের জন্য চন্দননগর, রিষড়া, কলকাতা, সালকিয়া ও অন্যান্য কিছু জায়গাতে গোপন আস্তানার ব্যবস্থা করেন।

রাসবিহারী উত্তরভারতে সৈন্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে রওনা হন এবং ১৯১৪ খ্রীঃ কাশীতে উপনীত হয়ে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করেন। সারা উত্তর ভারতে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিদেশী, বিশেষত জার্মানীর সাহায্য নিয়ে, ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাবার উদ্দেশ্য ছিল। জার্মানি সাহায্য ছাড়াই শেষপর্যন্ত ১৯১৫ খ্রীঃ ২১ ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের দিন ঠিক হয়। শেষপর্যন্ত জনৈক শিখ সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী বসুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে, তিনি নানা ছদ্মবেশে বাংলায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনাম নিয়ে জাপানে পালিয়ে যান। জাপান যাওয়ার ফলে রাসবিহারীর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু জার্মানি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর যোগ অচ্ছেদ্য যেমন ছিল তেমনই রইল।

বাঘাযতীন, অমরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, নলিনচন্দ্র সমেত ষোল জন বিপ্লবী উত্তরপাড়ায় এক গোপন নৈশসভায় মিলিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখও ছিলেন। বাঘাযতীনের নেতৃত্বে আগেই ঠিক হয়েছিল বিপ্লবের কাজে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য জার্মানীর সাহায্য নেওয়া হবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ায় (- বর্তমান জাভা, ইন্দোনেশিয়া) লোক পাঠিয়ে, সেখানকার ডাচ কনসালের মাধ্যমে জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিপ্লবীরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকবেন। এই বৈঠকে ঠিক হলো যে অমরেন্দ্রনাথ হবেন রিসিভিং কেন্দ্র। অর্থাৎ বিদেশের চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, অর্থের ড্রাফট ইত্যাদি গ্রহণ ও ভাঙানোর ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে আত্মগোপনকারীদের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাদির ভারও রইল তাঁর উপরেই। বহির্দেশীয় পত্রালাপের জন্য অমরেন্দ্রনাথের শ্রমজীবী সমবায় ছাড়াও ৪১ নং ক্লাইভ স্ট্রীটের হরিকুমার চক্রবর্তীর হ্যারি অ্যান্ড সন্স এবং ১০১/১ নং ক্লাইভ স্ট্রীটের সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের সোনুয়া স্টোন অ্যান্ড লাইম কোম্পানির ঠিকানা ব্যবহৃত হত।

প্রথম দিকে স্বদেশী ডাকাতির সাহায্যে কিছু অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা গিয়েছিল। বিদেশ থেকেও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রয়াস সফল হয়নি। বীর বিপ্লবী বাঘাযতীন ও তাঁর সঙ্গীদের মহান আত্মত্যাগের কাহিনী সুপরিচিত। সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যেমন নিষ্প্রয়োজন জার্মানীর বার্লিন কমিটির কথা কিংবা বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ঐ সময় পালিয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ে রূপান্তরের কাহিনী।

গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান করতে করতে হ্যারি অ্যান্ড সনস্-এর সঙ্গে শ্রমজীবী সমবায়ের যোগ দেখতে পায়। খানাতল্লাশী করা হয়। অমরেন্দ্রনাথের সহযোগী দু'জন ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হলেও পুলিশ অমরকে ধরতে পারেনি। তিনি আগেই আত্মগোপন করেন। উত্তরপাড়ার বাড়িতে হানা দিয়েও তাঁকে না পেয়ে পুলিশ পুঙ্গবরা

তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। এদিকে শ্রমজীবী সমবায়ের আর্থিক অবস্থা চরমে ওঠে। একদিকে বিপ্লবী কাজে অর্থ ব্যয় অন্যদিকে পুলিশের তৎপরতার ফলে ব্যবসার দফা রফা হয়। অমরেন্দ্রনাথ আত্মগোপন থাকাকালীন পিতা উপেন্দ্রনাথ লোকের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, শ্রমজীবী সমবায় ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে, অমরেব স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে ভাগলপুরে চলে যান। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মা সরলা দেবীর মতোই স্ত্রী কমলবাসিনী দেবী তাঁর বিপ্লবী কাজের সমর্থক ছিলেন, বহুবার নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আর ছিলেন অমরেন্দ্রনাথের পিতার মেসোমশাই সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ননীবালা দেবী — অমরের পিসিমা, ক্রমে তিনি সমগ্র বিপ্লবী সমাজের পিসিমা হয়ে উঠলেন। এমন অনেক মা-বোন, পিসি-মাসি, স্ত্রী, সেদিন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গোপনে। সেজন্য কম নির্যাতিতা হন নি ঘরে-বাইরে। কিন্তু সে ইতিহাস আপাতত আলোচনার বাইরে।

১৯১৫-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯২১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অজ্ঞাতবাস পর্ব। উত্তরপাড়া থেকে কলকাতা, সেখান থেকে চন্দননগর, আবার কলকাতার তিলজলা। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখায় তাঁর কিছু খবর পাই। কলকাতা থেকে আসাম, সেখান থেকে বিহার ইউ পি হয়ে পাঞ্জাব পর্যন্ত, আবার নাসিক হয়ে পণ্ডিচেরী পর্যন্ত। কখন খ্রীষ্টান পাদরি, কোথাও বাঙালী মাস্টার, কোথাও অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী এবং বহু দাড়ি-গোফ-জটাধারী হিন্দু সন্ন্যাসী। এই রোমহর্ষক অভিযাত্রার কাহিনী চিত্তাকর্ষক, তবে ইতিহাসের বর্তমান প্রবন্ধে কাহিনী বিস্তারের স্থানাভাব।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অ্যামিনেস্টি ঘোষণার পরেই অমর চ্যাটার্জী উত্তরপাড়ায় ফিরে আসেন। বন্ধু উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন বাড়িতে পুরনো বিপ্লবীদের নিমন্ত্রণ করেন। তিনি লিখেছেন : "সেই দিন বাংলার বহু বিপ্লবী একত্রে মিলিত হয়ে সকলের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। বারীনদা কোন কারণে আসতে পারলেন না। উপেন, মতিলাল, যদুগোপাল, অতুল, জ্যোতিষ, শ্রীশ প্রভৃতি প্রায় দুইশত বন্ধু ও সহকর্মীরা একত্রে মিলিত হয়।' ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার জন্য তিনি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে পত্র পাঠান। অরবিন্দ জানান, তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা মতো কাজ চালিয়ে যাও।' তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। জাতীয় বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেন। আবার উপেন্দ্রনাথের সহযোগী হয়ে 'আত্মশক্তি' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে থাকেন। 'আত্মশক্তি' ছাপানো হত শ্যামবাজারের এক প্রেসে, কার্যালয় ছিল শঙ্কর ঘোষ লেনে। পরে পত্রিকাটি এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বিজলী'র ভারও অমরের উপরে আসে। অমর চেরী প্রেসের মালিক কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের কাছ থেকে প্রেসের ভার নিয়ে তার দায়িত্ব দেন বন্ধু হৃষীকেশ কাঞ্জিলালের উপরে। পত্রিকা দুটি সেখান থেকেই বেরুতে থাকে।

বস্তুত ১৯২১-এর পর অমরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ না দিয়েও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। বিশেষত অনেক বিপ্লবীকে

তাঁর নিজ বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন, যেমন কুন্তল চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, নিবারণ ঘটক, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত চক্রবর্তী, বাখাল দে প্রমুখ। ১৯২৩-এ পিসতুতো ভাই গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এক বিদ্যালয় (= বর্তমান নাম অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ). যে বিদ্যাপীঠে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা ও আর্তের সেবা ছিল বিদ্যার্জনের মতোই অভীষ্ট। এদিকে ধাপ্পাবাজ ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের কিছুদিন ছেড়ে রেখেই ১৯২৩ থেকে পুনরায় গ্রেপ্তার করেন অমরেন্দ্রও বন্দী হন। তাঁর আত্মশক্তি লাইব্রেরীর ভার নেন মন্মথনাথ বিশ্বাস। আত্মশক্তি লাইব্রেরী পরে বাংলায় শুধু বিপ্লবী আন্দোলন নয়, সাম্যবাদী তথা শ্রমিক-কৃষক অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

১৯২৩ খ্রীঃ অমরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের পর বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। সে কাহিনী স্বতন্ত্র। গোপীনাথ সাহার ফাঁসি, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা উত্তরভারতে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা, দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর ১৯২৬ খ্রীঃ তিনি মুক্তিলাভ করেন। অনেক বিপ্লবীর মতো অমরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কারাবরণ থেকে মুক্তিলাভের পর অমরেন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যেকার 'কর্মিসংঘ' দলভুক্ত হন। কর্মিসংঘের কাজ শুরু হয়েছিল আগেই, আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে সভাপতি এবং সুবেশচন্দ্র দাসকে সম্পাদক করে কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকেব দক্ষিণকোণে গৌরাঙ্গ প্রেসের পাশে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর সভ্য ছিলেন। অমরেন্দ্র যোগ দেওয়ার পর সুরেশচন্দ্রের স্থলে তিনিই হন সভাপতি। কর্মিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা। বাংলার কংগ্রেসের মধ্যে তখন ঘোর দলাদলি, সে কাহিনীও স্বতন্ত্র। তবে এই দলাদলিতে জড়িয়ে প্রায়শই বিপ্লবীদেরও ক্ষতি হয়েছিল। কংগ্রেসের নানা দলের সঙ্গে অবশ্য তাঁর ব্যক্তিসম্পর্ক ছিল খুব ভালো।

কংগ্রেসের দলাদলির জের কখনও কখনও অমরেন্দ্রনাথের উপরে পড়েছে। যেমন ১৯২৬ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তাঁকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিপ্লববাদ বিরোধী কথার তীব্র প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে কর্মিসংঘের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিও অনেকে সুনজরে দেখেন নি। অনুশীলন-যুগান্তরের মধ্যে তখন রেষারেষি কমে নি, শেষপর্যন্ত কর্মিসংঘের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয়। ১৯২৮ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ।

১৯২৬ থেকে ১৯৪৭ পর্বের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের অনেক পরিবর্তন ঘটে। তার বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের আয়তন অনেক বেড়ে যাবে। আমরা প্রবন্ধের পূর্ণতা দান ও অঙ্গহানি না হওয়ার জন্য কতকগুলি তথ্য শুধুমাত্র উল্লেখ করব। ১৯২৯-এর ১৫ই জানুয়ারি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতার উত্তাল আন্দোলনের সময় শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কে এক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন অমরেন্দ্রনাথ পুত্র ও সহকর্মীদের সত্যাগ্রহে যোগ দিতে ও লবণ আইন ভঙ্গ করতে কাঁথি পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে বন্দী হয়ে দমদম স্পেশাল জেলে বন্দী। পরে পুত্র সত্যব্রত ও অনুজ বরেন্দ্রনাথও বন্দী হন।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার সময় থেকেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ ছিল

অমরেন্দ্রনাথের। বস্তুতপক্ষে প্রাক্তন জাতীয় বিপ্লবী ও তখন কংগ্রেস নেতা অমরেন্দ্র গান্ধীপন্থায় খুব যে বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়, বরং মনের মিল ছিল বিপ্লবীদের সঙ্গেই। ১৯৩০ থেকে নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রত যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। চট্টগ্রামে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে, ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায়, চন্দননগর, উত্তরপাড়ায় ও মেদিনীপুরে বিপ্লবীরা তাঁর সহায়তা পেয়েছেন। হিজলির হত্যাকাণ্ড যখন ঘটে তখন অমরের ভাই বরেন্দ্র সেখানে ছিলেন। ১৯৩১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ঐ বর্বরোচিত উপায়ে পুলিশের গুলি চালনার খবর পেয়ে অমরেন্দ্রনাথ ছুটে গিয়েছিলেন হিজলি। খড়্গপুর স্টেশনে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে দেখে বললেন, 'অমরদা, আমাকে ওরা আটকে দিয়েছে। আপনি যান, খবর নিয়ে আসুন। ' ১৯ শে সেপ্টেম্বর কলকাতা মনুমেন্টের পাদদেশে বিশাল জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অমর। যেদিন প্রধান বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন বিপ্লবীদের ডাকে, অসুস্থ শরীরে। তীব্র ধিক্কারে রবীন্দ্রনাথ 'শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব'কে নিন্দা করলেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে বিপ্লবীদের পাল্টা প্রত্যাঘাত আসে। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, কলকাতা থেকে ঢাকা সর্বত্র। ফাঁসি, গুলি, দ্বীপান্তর কিছুই তাঁদের দমাতে পারেনি। আবার তিরিশের দশকেই বহু জাতীয় বিপ্লবীর ক্রমে মার্ক্সবাদীতে উত্তরণ। অমরেন্দ্রনাথ সেই প্রগতিশীল কর্মীদের অনেকের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কলকাতার আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে যাতায়াত করতেন বহু সাম্যবাদী। যেমন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মজফ্‌ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, সোমনাথ লাহিড়ী, ভূপাল বসু, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। বিপ্লবী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেখানেই থাকতেন। পুলিশী তৎপরতায় শেষপর্যন্ত লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত কংগ্রেসের মধ্যে থাকা, আবাব গান্ধীবাদী নীতিতে অনাস্থা, প্রাক্তন জাতীয় বিপ্লবী ও পরবর্তী কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ এই দুইয়ের মধ্যে দোলাচলে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন দ্বিধাগ্রস্ত, বলিষ্ঠ পথ গ্রহণে অক্ষম। শেষপর্যন্ত ১৯৩৭-এর পর মানবেন্দ্রনাথ রায় বাংলায় ফিরে এলে (= দেশে ফেরেন ১৯৩১, তারপর জেলে ছিলেন) অমরেন্দ্রনাথ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন এবং পরে রায়পন্থী হয়ে ওঠেন। প্রথমে লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন এবং পরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে তিনি যোগ দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবনে মানবতাবাদী হয়েছিলেন এম এন রায়ের প্রভাবেই।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ জীবনের অবসান ঘটে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর। শুধু দেশমাতৃকাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত নয়, নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কেমন সে সমাজ? 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতার কয়েক পংক্তি থেকেই তুলে ধরছি:

সাম্যহীন স্বাধীনতা মূল্য নাই জেনো।
সাম্য ও স্বাধীনতা একই বস্তু মেনো।।
স্বাধীনতা সহযোগে সাম্যের উপরে।
নূতন সমাজ আসি দেখা দিবে পরে।।
নূতন সমাজ যেথা রচিত হইবে।
সেথায় মানুষ সদা আনন্দে রহিবে।।

কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের চোখে গান্ধী

ধ্রুব গুপ্ত

১৯৫০-৬০-এর দশকের গান্ধীবাদী মার্টিন লুথার কিং তাঁর 'Stride Towards Freedom' পুস্তকে লেখেন, 'Christ furnished the spirit and motivation while Gandhi furnished the method.' গান্ধীর মধ্যে খৃষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্যকে এক করে দেখার রেওয়াজ তেমন কিছু অভিনব নয়, বহু মনীষী তা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের চোখে গান্ধী বিষয়ক আলোচনাতে আমাদের আরো পিছিয়ে গিয়ে ১৯২০-১৯৪৭ সালের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান চোখে গান্ধী - একটি আলোচনার বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে নয়, জীবদ্দশাতেই তাকে তারা কীভাবে দূরবর্তী প্রেরণামূল হিসেবে দেখেছিলেন সেটা আলোচনার বিষয় হতে পারে। ঠিক এখানেই আরেকটা কথা বলা ভাল, যারা অবহিত নন তাদের জ্ঞাতার্থে। যদিও মার্কাস গার্ভের (Gurvey) প্রতিষ্ঠিত দলের নাম ছিল ইউনিভার্সাল নিগ্রো ইম্‌প্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, (UNIA), কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা এখন তাদের 'নিগ্রো আমেরিকান' পেরিয়ে 'আফ্রিকান - আমেরিকান' বলাকে দস্তুর করেছেন। ফলে যে পুস্তকটি আমার এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন, অধ্যাপক সুদর্শন কাপুরের সেই পুস্তকের নাম 'Raising up A Prophet : The African - American Encounter with Gandhi (OUP, 1993) .

কিন্তু গান্ধীর প্রতি মনোভঙ্গি প্রসঙ্গেরও একটা পটভূমিকা আছে — সেটাকেও গোড়াতেই নজর করে নিতে হবে। সেটি হল — গান্ধীযুগের অনেক আগে থেকেই কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা, — শ্বেতাঙ্গ ছাড়া দুনিয়ার আর সমস্ত অশ্বেতকায়দের সকলকেই 'কৃষ্ণাঙ্গ' হিসেবে একাত্ম করে নিচ্ছে। একে ইংরেজি করে Widest possible homogenisation বলা যেতে পারে। ব্যাপারটা যে কলোনিয়ালিজমের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত তা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। প্রথমেই এ ব্যাপারে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্যান - আফ্রিকান, কংগ্রেসের নেতা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তার The Souls of Black Folk পুস্তকে কী লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করা যাক, "The problem of the Indians can never be simply a problem of autonomy in the British Commonwealth of nations. They must always stand as representatives of the coloured races — as the yellow and black peoples as well as the brown — of the majority of mankind, and

together with the Negroes they must face the insistant problem of the assumption of the white peoples of Europe that they have a right to dominate the world and especially so to organize it politically and industrially as to make most men slaves and servants.''

যেটা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করার মত তা হল এরা দুনিয়ার সমগ্র অশ্বেতাঙ্গদের একত্র করে নির্যাতিক শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত অশ্বেতাঙ্গদের একটি 'আইডেনটিটি' প্রস্তুত করে। অর্থাৎ এখানে Race ছাপিয়ে যাচ্ছে Classকে, ভূগোলকেও।

দুনিয়ার অশ্বেতাঙ্গকে এক করে ভাববার এরকম উদাহরণ অবশ্য অরেকটু পুরনো এবং কাজেই প্রাক্-গান্ধী তা বলা হয়েছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড ওয়াকারের 'appeal to the co-citizens of the World'' এবং মার্টিন ডেলানির উপন্যাস Blake (1859)-এ এই 'আবেদন' সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে। দুবোয়ার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ্ কালার্ড পিপ্‌লস্ (NAACP) প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই একাত্ম হবার আকাঙ্খাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও ভারতকে সঙ্গী করার বা ভাবার ব্যাপারে দুবোয়া একা ছিলেন না, দলের সেক্রেটারী জেমস্ ওয়েলড্‌ন জন্‌সন্ বা সদস্য হিউবার্ট এইচ হ্যারিসন একই ধরনের মত পোষণ ও প্রকাশ করতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরই হ্যারিসন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ মনে করতেন, যদিও দুই ক্ষেত্রে অবদমনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি 'the Negro of the Western World' কে উদ্বোধিত করেন 'to follow the path of Swadesha (অর্থাৎ স্বদেশী)'। এই উক্তিতে গান্ধীজির অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছিল। সে বছরেই যে দুবোযা নিউ ইয়র্কে সোশ্যালিস্টদের এক সভায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দাবী ঘোষণা করেন সেকথাও স্মর্তব্য। এ সংবাদ মিলবে কাপুর রচিত Raising up a Prophet পুস্তকেই।

কৃষ্ণাঙ্গ-আমেরিকানের এই যে ভারত আগ্রহ ও গান্ধীবন্দনা, এতে কিন্তু সেক্ষেত্রে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাসিন্দাদের একটা সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। সেটা কেবল ১৯১৭ সালে লালা লাজপৎ রায়ের ইন্ডিয়ান হোম রুল লীগ অফ্ আমেরিকা গঠন এবং ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকা প্রচলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গান্ধীর বক্তব্য, যারা কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান (বা আফ্রিকান-আমেরিকান)দের ভালভাবে গোচর করেন, তাদের মধ্যে তারকনাথ দাস, সৈয়দ হোসেন এবং বিশেষ করে হরিদাস মজুমদার অন্যতম। জামাইকা থেকে আগত বর্ণাঢ্য কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্কাস গার্ভেকে গান্ধীমন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্যাপারে এবং গার্ভের রাজনৈতিক দল ইউনির্ভাসাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা (১৯১৪)-র পিছনে মজুমদারের সক্রিয় ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য।

ভারতবাসীর সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান এক যোগে আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার স্বপ্নকে ১৯২২ সালে নিউইয়র্কে এক জনসভায় এইভাবে ব্যক্ত করেন গার্ভের দ্বারা নিমন্ত্রিত, গান্ধীবাদী ডঃ শিং ''If the 40,00,00,000 Negroes of the

World come together and join hands with the 3500000000 East Indians (অর্থাৎ প্রকৃত ভারতীয়, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নয়) of the same race, this great alliance of the two people will be so strong, so all powerful, that unless justice be done to them, they can and will stop the world itself from turning on its axis, for they are determined that they shall be free" — এই অপূর্ব রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ভরা উদ্ধৃতি (কাপুর, ২.২০) নিশ্চয় এখন আমাদের প্রবল না হলে মৃদু হাস্যোদ্রেক করবে, কেন না ঠিক কাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম, সে সংগ্রামের পদ্ধতি কী হবে, (গান্ধীবাদী হলে ত' 'অহিংস' হতে বাধ্য)। মুক্তিলাভের পর এই অসম্ভব সংখ্যার মানুষ, দুনিয়ার, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থিত মানুষের সেই মুক্তিকে বাস্তব কী চেহারা দেবে— অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় 'governaility'র কী হবে - সেইসব কোন চিন্তার প্রকাশ এতে নেই, একজন ধর্মগুরুর নেতৃত্বে বিশ্বের সমস্ত অশ্বেতাঙ্গ একত্র হলেই স্বর্গ থেকে মুক্তি ঝরে পড়বে, ভাবখানা এই। তাছাড়া শিং-এর ভাষা লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাকে খুব একটা 'ডিকনস্ট্রাকশন' করতে হবে না — 'two people will be so strong, so all powerful, that unless justice be done to them, they can and will stop the world itself from turning on its axis." এই কথাটাকে নিশ্চয় খুব গান্ধীবাদী নরম অহিংসাবাচক মনে হচ্ছে না! বরং প্রেক্ষিত থেকে ছিঁড়ে একে একটু বদলে নিয়ে 'সব অর্থে এক হলে' ধরে নিয়ে একে হিটলারের মুখের বচন বলে চালিয়ে দেওয়া যায় — কেননা কক্ষপথে পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ করে দেবার স্পর্ধা চ্যাপলিনকৃত গ্রেট ডিক্‌টেটর ছবিতেই বরং মানানসই! দেখা যাচ্ছে, অনেক তাত্ত্বিকরা যা মনে করিয়ে দেন, 'ভাষা' জিনিসটা মোটেই খুব সুবিধার নয়!

যাই হোক, গার্ভের কাছে গান্ধীবাদের শিক্ষক হরিদাস মজুমদার গার্ভের প্রতিষ্ঠান UNIA আয়োজিত একাধিক সভাতে বক্তৃতা করে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান (বা আফ্রো-আমেরিকান মানসে, গার্ভের মনে গান্ধীর সন্ত-মূর্তিটি (Sainty image) অঙ্কিত করে দেন, এবং মজুমদারের শিক্ষায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীর রাজনীতি বিষয়েও গার্ভে গান্ধীর মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন "তাঁর দেশবাসীদের (অর্থাৎ ভারতীয়দের) প্রতি সেখানকার শ্বেতকায় সরকারের বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করার জন্য ('Crusade in South Africa against social injustice and discrimination against his people in that part of the World.'). গান্ধীর বর্ণনায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে কৃষ্ণাঙ্গদের 'lynch' করার খবর পেয়ে গার্ভে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

মজুমদারের প্রভূত প্রচেষ্টা (বই Asian-Indians Contribution to America, 1986, আরকান্সাসের গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ্ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত) সত্ত্বেও, 'Negro World' পত্রিকায় লেখা বা বিভিন্ন সভাতে বক্তৃতার মাধ্যমে গার্ভের গান্ধীবন্দনা বেশি দিন টেঁকেনি। কারণ, বিড়লাদের যতই গান্ধী 'অছি' বলে মনে করুন,

গার্ভের কৃষ্ণাঙ্গ ক্যাপিটালিজমের প্রচেষ্টাতে, কালোদের জাহাজী কোম্পানী খেলার রাজনীতিতে ঠিক গান্ধীবাদের অর্থনীতি খাপ খায়নি — এবং গার্ভের আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে এল এরপর আমেরিকাতেও, ত্রিশের দশকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেলেন দুবোয়া (Dubois) এবং তার পত্রিকা 'Crisis'.

দুবোয়াও ছিলেন যাকে মোটের ওপর বলা যায় — Romantic Indophile (রোমান্টিক ভারতপ্রেমিক) তাঁরও গান্ধী ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে ভারতীয় সহায়ক ছিল, — একজন ছিলেন বসন্ত কুমার রায়। তিনি New York American পত্রিকায় গান্ধীর 'Saintliness' এবং 'religious grounding'-এর উপর জোর দিতেন নানা লেখাপত্রে, গান্ধীর 'Christian Sentiment' বিষয়ে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের অবহিত করতেন, এবং তাদের এমন একটা ধারণা তৈরি করতে সহায়তা করতেন যাতে তারা মনে করেন যে গান্ধীর প্রতি সকল ভারতীয়র 'Unconditional Obedience' আছে। গান্ধীর এই খ্রীষ্ট-ইমেজ সৃষ্টির কাজে কোয়েকার নেতা রিচার্ড গ্রেগ্ বা কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস শিক্ষিকা ড্রুসিলা জন্‌জি হুস্টন (Drusilla Dunjee Houston) — এঁদেরও বিশেষ 'অবদান' ছিল। ড্রুসিলা 'শিকাগো ডিফেনডার' নামক পত্রিকায় 'দ্য লিটলম্যান গান্ধী' নামক এক প্রবন্ধে বলেন যে, ঐ little bare, brown skeleton of a man, not professing christ, but living his teachings, is the most powerful single individual in the universe.' সুদর্শন কাপুর তাঁর পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন। রিচার্ড গ্রেগ্ ভারতে চারবছর থেকে গান্ধীবাদী অহিংসা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'The Power of Non-Violence' নামে যে পুস্তকটি প্রণয়ন করে প্রকাশ করেন তা দুবোয়া ও 'ক্রাইসিস্' পত্রিকায় পাঠকদের মনে গান্ধী – খ্রীষ্ট সমীরকরণটিকে স্থায়ীভাব করে তুলেছিল। সুদর্শন কাপুর আমাদের জন্য এই ধরনের গান্ধী ধারণা নির্মাণে সহায়ক লেখাপত্রের অজস্র নজির রেখেছেন তাঁর যে বইতে, তার নাম তিনি কেন 'Raising Up a Prophet' দিয়েছেন তা এসব নিদর্শন থেকেই বোঝা যাবে! তবে বলা বাহুল্য, এখানে 'Power' কথাটিকে ফুকো (Foucault)র অর্থে নিলে চলবে না। কেন না তাহলে 'nonviolence'-এর ক্ষেত্রে 'power' শব্দটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। এবং তখন 'violence' -এর সংজ্ঞা নিয়ে নানা তর্কের মধ্যে আমরা পড়ে যাব। আগেই বলা হয়েছে 'ভাষা' ব্যাপারটা খুব নির্ঝঞ্ঝাট নয়।

এইসব রচনার অন্বীক্ষা দুবোয়াকে পূর্ণ গান্ধীভক্তে পরিণত করেছিল, তিনি গান্ধীকে 'Living Maker of Miracles' বলে বন্দনা করে চললেন গোটা ত্রিশের দশকে। তাঁর অনুরোধে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের 'ক্রাইসিস' পত্রিকার প্রথম পাতায় আমেরিকান নিগ্রোদের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর বাণী ছাপা হলঃ **'Let not the 12 million Negroes be ashamed of the fact that they are the Grandchildren of slaves. There is dishonour in connection with the past. Let us realise that the future is with those who would be truthful, pure and**

loving. For, as the old wise men have said, truth ever is, untruth never was. Love alone binds and truth and love accrue only to the truly humble.'

ক্রীতদাস বংশে জন্ম হলেও কুণ্ঠাবোধ না করার এবং প্রকৃত অসম্মানজনক কাজ করেছেন তাদের পূর্বপুরুষ নয় — দাস ব্যবসায়ীরা, এই আশ্বাস এখন তাদের সত্যে, প্রেমে (শত্রুকেও) এবং বিনয়ে স্থিত থাকার উপদেশ যে ক্রাইসিস পত্রিকার পাতা ছাপিয়ে অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সংবাদ সুদর্শন কাপুর দিয়েছেন তাঁর পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠাতে।

এ থেকে অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে 'গান্ধী নীতি' ও পন্থার বিরূপ সমালোচনা আলোচ্য ক্ষেত্রে একেবারে হয়নি। ই. ফ্রাংকলীন ফ্রেজিয়ার (E. F. Frazier) নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ সমাজবিজ্ঞানী, যিনি হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, তিনি ব্ল্যাক আমেরিকানদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গান্ধীর অহিংসনীতির কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে সন্দেহ করেছিলেন। তিনি যিশুর 'unrestrained denunciation of the injustice and hypocrisy of his day and his refusal to make any truce with wrong-doers' – এর ওপর বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বলেন 'Where love has appeared of such dubious value, as in south, we take our stand under the banner. Fiat Justitia, ruat Amar'' - অর্থাৎ আগে ন্যায় বিচার চাই, তখন প্রেমধারা আপনিই উৎসারিত হবে। ক্রাইসিস পত্রিকায় তাঁর গান্ধী সমালোচনা নিয়ে একটু বাদানুবাদ হয়, উত্তরে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন — 'it would be better for the Negro's soul to be seared with hate than dwarfed by self-abasement', । দুবোয়ারই সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর্ অ্যাডভান্স সেন্ট অফ কালার্ড পিপ্‌ল (NAACP)-র এক বিশিষ্ট কর্মী উইলিয়ম পিকেন্‌স্ (Pickans) ও আমেরিকাতে অহিংসানীতির কার্যকারিতাকে প্রবলভাবে সন্দেহ করেছিলেন এবং গান্ধীর পথকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকার পথ বলে মনে করাকে 'Shallow analogies' — ভিত্তিক বলে ব্যঙ্গ করেন তার New York Amsterdom News পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে (১০.২.১৯৩২), সেখান থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে কাপুরের বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠাতে। গান্ধীর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তীব্র সমালোচনা এসেছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বরের 'পিট্‌স্‌বার্গ কুরিয়ার' পত্রিকায় জর্জ শুইলার (Schuyler)এর এক প্রবন্ধ থেকে, যাতে তিনি গান্ধীর কর্মপরিকল্পনাকে বলেন, So mythical and absurd, বিশেষ করে তার বয়কট আন্দোলনকে। নিরীশ্বরবাদিতা না করেও তিনি বলেন ''Whenever a big leader begins talking about 'God' taking a hand, he is either insincere or ignorant.' বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে 'শান্তির ললিতবাণী' 'ব্যর্থ পরিহাস' এর মত শোনাবে— গান্ধী সম্পর্কে ঠিক এই একই কথা বলেছিলেন কতিপয় জার্মান বুদ্ধিজীবী, যাদের মধ্যে অধ্যাপক এবার্ট (Ebert — জন্ম ১৯৩৭, স্টুটগার্ড) হিটলারকেও প্রেমমন্ত্রে সাজানো যায়'— এই বিশ্বাসকে সমালোচনা

করে। তিনি বলেন 'Gandhi's appeal to the Jews, Czechs and Poles to resist the Hitler regime with non-violent measures was without effect as Gandhi had no actual understanding for the differences between the British Colonial rule and the totalitarian forms of Government.'' (Mahatma Gandhi As Germans see Him, Editor : Heimu Rau, Bombay, 1976, p. 17) শুইনাররাও এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন প্রকারান্তরে, গান্ধী ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয় এবং বর্ণবিদ্বেষী আমেরিকান শ্বেতকায়দের মধ্যে নিগ্রো (যেমন আপার্ট হাইড আমলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ) — এই অবস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে সর্বত্রই 'মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না' — গেয়ে বেড়াচ্ছেন।

তবু বলতেই হবে, দুবোয়ার 'রোমান্টিসিজম' (কাপুর নিজেই কথাটা ব্যবহার করেছেন)-এ প্রচুর আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ মজেছিল, তারা গান্ধীর মধ্যে খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাবই দেখতে চেয়েছিল। 'প্রফেট' নির্মাণের এই অভীপ্সাই পরে মার্টিন লুথার কিং-এর আন্দোলনেও বজায় ছিল।

একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে — নির্যাতিত'র পক্ষ থেকে এই রকম 'ঐ মহামানব আসে' বলে উদ্বেলিত হওয়াকে যুক্তি দিয়ে হয়ত বিচার করে সমালোচনা করা যায়, কিন্তু এ মনোবৃত্তি অশ্রদ্ধেয় নয়, যেমন অশ্রদ্ধেয় নয় গোরক্ষপুরের নিপীড়িত কৃষক ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে গান্ধীকে দেবতার আসনে বসাবার আকুতি। কিন্তু যেটা সইদ আমীন দেখিয়েছেন Subaltern Studies III র বিস্তৃত প্রবন্ধে, সেই আকুতিকে যারা ভাঙিয়ে খেয়েছিল, সুযোগ নিয়েছিল — এবং এখনও চালাকি করে সুবিধাজনক গান্ধীমূর্তি নির্মাণ করে যারা সুযোগ নিচ্ছে — তাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় অশ্রদ্ধেয়। আর একথা ত নজর করতেই হবে যে আফ্রিকান-আমেরিকানরা গান্ধীর 'অস্পৃশ্যবিরোধী আন্দোলন' এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য আন্দোলন — এই দুই অবিসংবাদিতভাবে সদর্থক দিকের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবেশ করেছিল।

ধর্মে বাস্তবতা : বাস্তবতার ধর্ম—আমেরিকার প্রেক্ষিতে বৈষ্ণববাদ

মহুয়া সরকার

বাস্তবতা ও ধর্মের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। ভারতীয় শাস্ত্রের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ অনুসারে বলা যায় যে, সচেতন সত্তাবিশিষ্ট কোন জৈব অস্তিত্বকে যা ধারণ করে রাখে, তাই হল ধর্ম।[১] এই ধর্ম মানুষের অস্তিত্বর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এবং সেই অর্থে এর একটা বাস্তব প্রেক্ষিত আছে।

কিন্তু এই ধর্ম রিলিজিয়নের প্রতিশব্দ নয়। আধুনিক বিবেচনায় 'রিলিজিয়ন' বলতে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-ঋদ্ধ, গণহিতৈষী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত যে পথনির্দেশকে বোঝায়, সেই অর্থনির্মাণসাপেক্ষ ধর্মেরই বর্তমান পৃথিবীর সমস্যার নিরিখে প্রকৃত মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, কারণ, এই ধর্মের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে তথ্য, তার বিনির্মাণ করে, বা শব্দের, মননের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন তত্ত্বের নির্মাণ ঘটানো সম্ভব।

জনসাধারণ নানা কারণে এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা রিলিজিয়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অথচ ইতিহাসের চর্চায় ধর্মের প্রভাব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা আজও অবহেলিত।

কার্ল মার্কস জনগণের উপর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা সর্বজনবিদিত। তাঁর মতে, ''ধর্মীয় সংকটপ্রসূত অস্থিরতা হল একই সঙ্গে এক বাস্তব যন্ত্রণার অভিব্যক্তি এবং বাস্তব দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ধর্ম নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, এক হৃদয়হীন জগতের হৃদয় ..... ধর্ম জনসাধারণের আফিম।[২]

ধনী, দরিদ্র— এই দুই ধরনের মানুষকেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আকর্ষণ করে।

শুধু দরিদ্র, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ নয়, বিত্তশালী উচ্চশিক্ষিতরাও এই আফিমের বশবর্তী হয়ে ধর্মীয় উন্মাদনায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত সত্য। এই প্রসঙ্গেই আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার একাংশ মানুষের, প্রাচ্যধর্মের প্রতি সাম্প্রতিক আকর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ও ভারতের ধর্ম সম্পর্কে অতি প্রাচীন কাল থেকেই পশ্চিমের একটা বিজাতীয় কৌতূহল ছিল। প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে শুধুমাত্র ভাববাদ, রহস্যময় পরলোকতত্ত্ব, দুর্জ্ঞেয় অলৌকিকতা প্রভৃতির সমীকরণও পশ্চিমের প্রাচ্যচর্চার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্মসভায় ভারতীয় ধর্মের প্রতি প্রদর্শিত প্রবল আগ্রহের কথা সকলেরই জানা আছে।

কিন্তু অন্যান্য নানা কারণে, ১৯৬০-এর দশক থেকে অতি সাম্প্রতিককালে আমেরিকার জনগণ বিশেষ করে যুবসমাজ, ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মগুরুদের

দ্বারা নতুন করে আকৃষ্ট হচ্ছে। ধর্মের মধ্যে শিখধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও গুরুদের মধ্যে মহেশযোগী, মহারাজজী, রজনীশ ও প্রভুপাদের উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও জেন, চিলড্রেন অফ গড, সায়েন্টোলজি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি আমেরিকার মানুষের উৎসাহ দেখা গেছে। এই ধর্মমতগুলিকে আমেরিকার লেখকরা 'কাউন্টার কালচার' বা বিরুদ্ধ সংস্কৃতি বলে বর্ণনা করেছেন।[৫]

পাশ্চাত্য ধর্মের যে সাংস্কৃতিকবাতাবরণ, তার বিপরীত মেরুতে এই ধর্মমতগুলির অবস্থান বলে তাঁরা মনে করেন। একই সঙ্গে আবার অনেকের মতে, আমেরিকার এই নতুন ধর্মীয় আন্দোলন ছিল সেই দেশেরই উদার, বহুমাত্রিক সমাজের বাহ্যিক প্রকাশমাত্র।[৬]

তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিত থেকে বোঝা যায় যে উপরোক্ত মতগুলির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। বিরুদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার আগেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বহুমাত্রিক সমাজের ঔদার্য প্রকাশের পরিবর্তে সত্তরের দশকের ধর্ম আন্দোলনগুলি আমেরিকার তৎকালীন রাজনৈতিক হতাশা ও সামাজিক উন্মাদনারই পরিচায়ক ছিল।

ববার্ট বেলা এই নতুন ধর্মে যোগদানকারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এরা বেশীরভাগই ১৯৬০ দশকের রাজনৈতিক বিচারে চরমপন্থী ছিলেন।[৭] বস্তুতপক্ষে গত দুই শতকের স্বাধীনতার যুদ্ধ, দাস শ্রমিকদের নিয়ে সমস্যার মত ১৯৬০-এর দশকেও আমেবিকার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে জটিল সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন, ভিয়েতনামে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ওয়াটার-গেট স্ক্যান্ডাল প্রমুখ দুর্নীতি, মধ্যবিত্ত সুখী অস্তিত্বের বিরক্তিকর নিস্তরঙ্গতা ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতা— সব মিলিয়ে আমেরিকার জনমানসে নানা বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। স্টুডেন্টস ফর এ 'ডেমোক্রেটিক সোসাইটি', 'স্টুডেন্ট মবিলাইজেশন কমিটি টু এন্ড দ্য ওয়ার ইন ভিয়েতনাম', দ্য ইয়ুথ ইন্টার - ন্যাশনাল পার্টি' ইত্যাদি দলগুলো তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তাকে আমেরিকার বহু প্রযুক্তিবিদ 'সোস্যাল মুভমেন্ট ইন্ডাষ্ট্রী' বা সামাজিক আন্দোলনের শিল্পায়ন বলে উপহাস করতেও দ্বিধা করেননি।[৮] রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যেও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। 'পারমিসিভ সোসাইটি' বা উন্মুক্ত সমাজ, চরম ভোগবাদ, বিজ্ঞানের প্রবল অগ্রগতি, মহাকাশে ক্ষমতাবিস্তৃতি, জীবনধারণ ও উন্নতির জন্য প্রতিযোগিতা—সব মিলিয়ে মানুষের অচেতন অনেক টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মানবিক মূল্যবোধের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তাই বহু সম্পদের মাঝেও, নানা বিলাস উপকরণ ও বহুমাত্রিক ভোগের মধ্যেও আমেরিকার ধনী যুবক নিজের জীবনের কোন তাৎপর্য খুঁজে পায় না। পরিবারের মধ্যে বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে, মানবিক সম্পর্কের পরিমণ্ডলের বদলে সবাই যেন ক্ষণিকের অস্তিত্ব ও ভাসমান বিচ্ছিন্ন সত্তা হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সঙ্গীহীন

যুবক-যুবতী অবলম্বনের খোঁজে দিশাহারা হয়ে পড়ে। হেরোইন, কোকেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য এই দিশাহারাদের পৌঁছে দেয় এক স্বপ্নবিলাসের জগতে, অন্যদিকে প্রাচ্যধর্মের তথাকথিত রহস্যময়তার আশ্রয়ে তারা শান্তির সন্ধান পায়।[৭]

এককথায়, ধর্মীয় উন্মাদনা, মাদকের নেশা ও সামাজিক অবক্ষয়—এই তিনটি ধারাকে একই কাঠামোয় আলোচনা করা যায়। পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় যে আমেরিকার সমাজদেহে নানা ব্যাধির ফলে মারাত্মক মাদকদ্রব্যের ব্যবসা যেমন বেড়েছিল, তেমনি পাশাপাশি ধর্মীয় নেশারও বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছিল। ১৯৮০ সালে ৩০ লক্ষ মার্কিন নরনারী প্রায় ১০০০টি ধর্মীয় উপসাম্প্রদায়িক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৮]

এই প্রেক্ষাপটেই আমেরিকায় ইসকন্ (ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস) বা হরিভক্তির সাফল্য। এর পিছনে আমেরিকার বাস্তবগত বিশৃংখলা বা মানসিক অস্থিতি যত দায়ী, ধর্মীয় ভক্তি বা প্রীতি ততটা নয়। ১৯৮৫ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে আমেরিকার প্রায় ২৫০০ নরনারী ইসকনের সন্ন্যাসী—আর ভক্তদের সংখ্যা এর প্রায় দশগুণ।[৯] আমেরিকায় ইসকনের ইতিহাস, আমেরিকান রাষ্ট্রের ইসকনের প্রতি আচরণ ও ভারত থেকে ইসকনের প্রচারের ধারার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করলে এই ধর্ম ব্যবসার মূল চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক, লোকায়ত বা বিরুদ্ধ কোন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইসকনের কোনসময়ই যোগযোগ ছিল না। প্রথম থেকেই এই আন্দোলন ছিল প্রাতিষ্ঠানিক, এলিট, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অভয়চরণ দে নামক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এক যুবক ১৮৯৬ সালে বিখ্যাত প্রচারক সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। সরস্বতী ঠাকুর সারা ভারতে ৬৪টা মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরই নির্দেশে অভয়চরণ ইংরেজিতে বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি ও প্রীতির বাণী প্রচার করতে মনস্থির করেন। ইতিমধ্যে তিনি গীতার ইংরেজী ভাষ্য রচনা করেন এবং 'ব্যাক টু গডহেড' নামক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের জন্য ভক্তিবেদান্ত উপাধি লাভ করেন (১৯৪৭)। বৈষ্ণবদর্শনের উপর আরো ৮০টি প্রবন্ধ লেখার পর ১৯৬৫ সালে তিনি আমেরিকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে যাত্রা করেন। ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কে ইসকন্ প্রতিষ্ঠিত হয়। লস এঞ্জেলসে ভারতবর্ষের বৃন্দাবনের নামে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়। সেখানে সম্মিলিত জীবনযাপন, বা কমিউনিটি লিভিং-এর বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালে অভয়চরণ বা প্রভুপাদের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ডেনভার, শিকাগো, বোস্টন ইত্যাদি শহরে ইসকনের মঠ স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষেও পশ্চিমবঙ্গ, বম্বে, দিল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে ইসকনের মন্দির আছে।[১০]

এই স্থাপন-প্রতিস্থাপন চলাকালীন আমেরিকার বিভিন্ন বিচারালয়ে, ইসকনের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলির নথিপত্র দেখলে বোঝা যায় যে, আইন ও বিচারের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের বৈধকরণই করা হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ও ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোন ধর্মচর্চার কোন বিরোধ কখনই হয় নি। ইসকনের ভক্তরা তাদের জীবনচর্যার মাধ্যমে পশ্চিমের মূল্যবোধকে সেভাবে আক্রমণ করেনি। উপরন্তু প্রাতিষ্ঠানিক

বৈষ্ণবধর্মেরও মূল দর্শনের চেয়ে ব্যবহারিক জীবন, আচার-আচরণ ইত্যাদির অনুকরণেই তাদের অধিক আগ্রহ দেখা যায়। গেরুয়া পোশাক ধারণ, সংকীর্তন ও নৃত্যসহযোগে প্রার্থনা প্রভৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাথমিক অপরিচিতি থাকলেও তা সংস্কৃতি বিরোধী, জীবনরোধী কোন আচরণ নয়। ইসকনকেও তাই আমেরিকার প্রাতিষ্ঠানিক সভ্যতা ও রাষ্ট্র প্রান্তিক ধর্ম হিসেবে পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ধর্ম কোন বিরুদ্ধ সংস্কৃতি নয়, তাই এখানে উদারতা-অনুদারতার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনচর্যা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণবধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এদেশে, গ্রামীণ সমাজে যে সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক, লোকায়ত গোষ্ঠী আছে, তাদের জীবনধর্মে দারিদ্র্য, দুঃখ এবং অতিপ্রজ পরিবার কাঠামোর একটি ইতিবাচক বিকল্প পাওয়া যায়। ইসকনের মন্দির ও হরিভক্তি এইসব দরিদ্র জীবন-পথিকদের থেকে বহুযোজন দূরে অবস্থিত। আমেরিকার বৈষ্ণববাদ সেই দেশের বাস্তব পটভূমিতে প্রোথিত, তার সঙ্গে দরিদ্র ভারতের লোকায়ত গোষ্ঠীর কোন সংযোগ নেই। ইসকনের হরিভক্তি ধনতান্ত্রিক সমাজের মানসিক বিচ্ছিন্নতা, আত্মিক সঙ্কট ও ধর্মীয় উন্মাদনাবৃদ্ধিকেই সুস্পষ্ট করেছিল।

সূত্র নির্দেশঃ

১। নাবায়ণ চৌধুরী, 'ধর্ম ঃ মৌলিক বনাম আনুষ্ঠানিক',
'যুক্তিবাদীব চোখে ধর্ম' প্রবীর ঘোষ সম্পাদিত
(কলকাতা, ১৯৯২), পৃঃ ১১।

২। Marx and Engels **Collected Works**, Vol III, (MOSCOW, 1976), P 175

৩। Theodore Roszak, 'Ehics, Ecstasy and the study of New Religions in Jacob Needleman and George Baker (eds)
Understanding The New Religions
(NEW YORK 1978) PP 49-62

৪। Sydney E Alestorm, **Ibid.** - P 20

৫। Robert N Bellah, "The New Consciousness and the Berkeley New left", in Charles Y Glock and R Bellah eds, The New Religious Consciousness (California 1976) PP 77-92

৬। জ্যোতি ভট্টাচার্য, 'জীবন, ধর্ম, রাজনীতি, যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৪৪।

৭। পূর্বোক্ত।

৮। মহুয়া সরকাব, 'Vaisnavism in Bengal and the USA in the 1960's. in A G Mathur Felicitation Volume, (Agra, 1995) PP – 525-530

৯। স্বামী প্রভুপাদ, শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা, (মায়াপুর, ১৯৯০), মুখবন্ধ।

বৃহৎ সাতটি দেশের ডাকটিকিটের ইতিহাস

প্রবীর কুমার লাহা

ডাকটিকিট আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর প্রসারতা, পরিধি ও স্পর্শকাতরতার দিকটার ব্যাপকতা কম নয়। শক্তির বিচারে G7 (Great Seven) শক্তির দেশগুলি হল — United States of America. (U.S.A.), United Kingdom (U.K), জার্মানী (সংযুক্তি), ইটালি, জাপান, ফ্রান্স, কানাডা।

এ নিবন্ধে জার্মানী ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলিব ডাকটিকিটের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭৬৯ সাল থেকে 'No taxation without representation' থেকে আমেরিকার জনগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দক্ষিণ আমেরিকার ৫০টি রাজ্য নিয়ে Federal Republic গঠিত হয়েছিল। পূর্বে মার্কিন মুলুকে ডাক ব্যবস্থার অবস্থা ছিল যে সারা মার্কিন দেশে Adhesive Postage Stamp স্থানীয় ভিত্তিতে ব্যবহার করা হত, উদ্যোক্তা ছিলেন কতিপয় প্রাইভেট কোম্পানী, এরা ১৮৪২ সালে তাদের স্ট্যাম্প বের করেছিল। ১৮৪৫ সালে কোন Uniform ডাকমাশুল ছিল না। কিন্তু Postmaster General-র ডাকটিকিট বের করার অধিকার ছিল। সেই অধিকার মোতাবেক ১৮৪৫ সালে New York 5C মূল্যের Lock Port ডাকটিকিট প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে যেসব বাজ্য (State) নিজস্ব ডাকটিকিট বের করে। সেগুলি হল যথাক্রমে — Virginia (Alexandria), Maryland (Annapolis) এবং Baltimore, New Hamshire (Boscanen), Vermont (Brattle Boro), Massachu setts (Millury), Connecticat (New Haven), Rhode Island (Provipence) এবং Missouri (St Louis)।

উপরি উল্লিখিত বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রায়ণ বিবৃত হয়েছে।

১৮৫১ সালে US ডাকবিভাগ ডাকঘর থেকে প্রাপকের কাছে পাঠানোর জন্য বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছিল। সেটির ব্যবহার জেলা ডাকঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ডাকটিকিটগুলি সেমি অফিসিয়াল মর্যাদা পেল। এই সময়ে অনেক প্রাইভেট কোম্পানী সরকারী ঠিকাদার হিসাবে কুরিয়ারের কাজ করত। ১৮৬৩ সালে US ডাকঘর প্রকাশ করে দুটি ডাকটিকিট, তাতে চিত্রিত হয় US প্রথম Post Master General Benjamin Franking ও প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন।

১৮৫১ সালে US Civil War সময়ে নূতন সিরিজের ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে জর্জ ওয়াশিংটন সহ ৮ জন US প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরা।

১৮৬৩ সালে প্রথম স্থানীয় চিঠিবিলি (Delivery of letter) প্রবর্তন করা হয়। প্রথম মূল্যের ডাকটিকিটটি জনপ্রিয় ছিল Black Jack নামে, চিত্রিত ছিল দেশপ্রেমিক জেনারেল Andrew Jackson.

১৮৬৬ সালে বিশ্বে প্রথম শোক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল Abraham Lincon-এর হত্যাকাণ্ড স্মরণে, ডাকটিকিটের রঙ ছিল কালো।

US ডাকটিকিটের ইতিহাসের পর্যায়ক্রমে লক্ষিত হয় যে ১৮৬৭ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে National Bank Note Corporation মুদ্রিত করে নতুন নিয়ত ডাকটিকিট সিরিজে (Definative Series) চিত্রিত ছিল - Franklin, Washington, Landing of Colombus, স্বাধীনতা ঘোষণার স্বাক্ষর। ১৮৯৩ সালে US প্রকাশ করে প্রথম স্মারক ডাকটিকিট, চিত্রিত হয় ১৮৭৬তে ফিলাডেলফিয়ার মহাদেশীয় Exposition. ১৯১৮ সালে প্রথম বিমান যান ডাকটিকিটেব চিত্রায়ণে আনল।

U.S.A. ডাকটিকিট মালাটি দু'ভাগে বিভক্ত — (১) ব্যক্তিত্ব, (২) বিষয়মুখী ডাকটিকিট প্রকাশমালা।

ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট মালায় পরিব্যাপ্ত রয়েছে — নিয়ত ডাকটিকিটমালায় ২২ জন মার্কিন রাষ্ট্রপতির মুখশ্রী (১৯৩৮), মার্কিন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বেরা (১৯৪০), নিয়মিতভাবে ১৯৬৪ সাল থেকে বিখ্যাত মার্কিন শিল্পীর ডাকটিকিট ও বিদেশী ব্যক্তিত্ব হিসেবে মহাত্মা গান্ধী (১৯৬৯)। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের ডাকটিকিট মালায় চিত্রায়ণে ছিলেন — Washing Irving (লেখক), J. Fenimere Cooper (দেশপ্রেমিক), Stephen Colling Foster (কবি) প্রমুখেরা।

১৯৬০ তে Air stamp-তে Champion of Liberty শীর্ষক ভাবনায় চিত্রিত ছিলেন Simon Bolivar Lajos Thomas Masaryk, Janpaderewski, Gustav Mannerheim, Garibaldi, Sunyatsen প্রমুখেরা। রাষ্ট্রপতি Franking Roosevelt ছিলেন একজন ডাকটিকিট সংগ্রহকারী। ১৯৩৬ তে Airmail বিশেষ বিলি ডাকটিকিটের তিনি নকশাচিত্রী ছিলেন। বিষয়মুখী ডাকটিকিট প্রকাশনায় রয়েছে — আমেরিকার বিখ্যাত স্বাধীনতার মূর্তি, Goldern Gate, Tennessee State সার্ধশতবর্ষ (চিত্রিত - রাষ্ট্রপতি Andrew Jackson ও Gover John Stvier) (১৯৬৪), স্বাধীনতা ভাবনায় নিয়ত ডাকটিকিট মালায় Status of Liberty চিত্রিত (১৯৬০), Christmas (১৯৬১) প্রভৃতি। ডাকটিকিটকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ১৯৬৫ সালে এই ভাবনায় Early Diagnosis Saves Lives' ধ্বনি ক্যানসারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শীর্ষক ডাকটিকিট প্রকাশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জ (১৯৭১), আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিশতবর্ষ (১৯৭৩, ১৯৭৬), মানচিত্র, পতাকা, প্রাণী, বিমান প্রভৃতি হেন কোন বিষয় নেই যে ডাকটিকিটের চিত্রে আসে নি।

১৯৭১ সালে অভ্যন্তরীণ ডাকমাশুল 6C থেকে বৃদ্ধি করে 8C করা হয়। ডাকটিকিট প্রকাশ ভাবনায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে - জাতীয় দিবস শীর্ষক ভাবনা চিত্র এবং সংবিধানে স্বাক্ষরিত বিষয় (১৯৩৭)। ডাকটিকিটের বৈচিত্র্যে এসেছে লম্বা, সমান্তরাল, ক্ষুদ্র, বড়। ডাকটিকিটের লিপি, মূল্যমান, মূল্যনির্দেশককে একক ভাষা হিসেবে ইংরাজীর প্রাধান্য।

মার্কিন শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্য, ঐতিহ্য সবই ডাকটিকিটের প্রকাশ ভাবনায় আশ্রিত হয়েছে।

ফ্রান্স — ১লা জানুয়ারী, ১৮৪৯ তারিখে ফ্রান্সের প্রথম ডাকটিকিট 'ফেঞ্চপেনি ব্ল্যাক' প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত এটিতে ১৮৪০-এর ব্রিটিশ 'পেনি ব্লাকের' প্রভাব দৃষ্ট হয়েছে। এর নকশাকার ছিলেন Jeanjac Quesbarr মূল্য ছিল ১০-৪০ Cent.

১৮৫২ সালে লুই নেপোলিয়ান ফরাসী দেশ করায়ত্ত করে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে কায়েম করলে তৃতীয় লুই নেপোলিয়নের মুখমণ্ডল ডাকটিকিটে চিত্রিত হয়ে থাকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত।

১৮৬১ সালে Albert Barre কৃত নতুন ডাকটিকিটের নকশায় ঐক্যভাবনা স্থান লাভ করে।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত প্রথম যুগ্ম ডাকটিকিট ছিল 'Victory of Samotherace in the Louvre' শিরোনামে। ১৯৪১ এবং ১৯৪৪ সালে জাতীয় নীতির উপর যথাক্রমে ৩ এবং ৫টি ডাকটিকিট প্রকাশ ব্যতীত অন্যান্য ডাকটিকিটে প্রকাশমালাটি সমৃদ্ধ রয়েছে — ছয়জন দেশপ্রেমিক (১৯৫৫, ১৯৫৯), Braque, Matisse, Cezanne অঙ্কিত চিত্রকলা (১৯৬১), নিয়ত ডাকটিকিট (১৯৬০)। প্রথম উপগ্রহ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা (১৯৬২) এবং বিষয়ভাবনা ঘিরে রয়েছে বন্যপ্রাণী, রেলপথ, যুদ্ধ ও শান্তি, বাণিজ্য প্রভৃতি।

ডাকটিকিটের সাইজের লম্বা ও চওড়া, চতুষ্কোণ। লিপিতে ফরাসী ভাষার ব্যবহারে — Republic Que Francaise লেখা। এ ব্যতীত ফরাসী সরকার যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আধিপত্য কায়েম করেছিল সেখানে ফরাসী ডাকটিকিট প্রচলিত করেছিল। উল্লেখ্য হল — French Colonies (১৮৬২, ১৮৮১), Alsace Lorraine (১৯৭০ ও ১৯৪০)। Monalo (১৯২৩, ১৮৯১, ১৯৪৬, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৬৩, ১৯৫৮, ১৯২৫, ১৯৩৯, ১৯৫২, ১৯৪৮, ১৯৬৪, ১৯৫৩), Council of Europe (১৯৫৮), Unesco (১৯৬৬) এবং ফরাসী ডাকঘর কাজ করেছিল চীন (১৯০২-০৩), Morocco (১৮৯১-৯৩, ১৯০২-১৯১১), এবং Tangier (১৮১৮, ১৯২৮) দেশগুলিতে।

ইটালী — এই দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্য (Kingdom) নিয়ে United Kingdom of Italy গঠিত হলে ১৮৬২ সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। মুদ্রক ছিলেন De Larue. ইটালী ভাষায় লিপিতে লেখা ছিল— Franco Bollo Italiano-

এর পূর্বে ঐ Kingdom গুলির নিজস্ব ডাকটিকিট প্রকাশনা ছিল। ১৮৮২ সালে ছয়টি বিভিন্ন মূল্যের অছিদ্রন ডাকটিকিট প্রকাশিত হলে চিত্রিত হয় King Victor E Mmanurl II ডাকটিকিটের প্রকাশ ভাবনায় যেসব বিষয় স্থানালাভে বঞ্চিত হয় নি — রাজা Humbert II এবং Victor Emmanurl III Sicity স্বাধীনতা এবং Southern Plelisite of 1860 (১৯১০), Assumption of power by the Fascists শীর্ষক ছয়টি ডাকটিকিট, নকশাকার G. Balla (১৯২৩) কৃত নিয়ত ডাকটিকিটের ভাবনায় শীর্ষক 'Every one must contribute to the public expense' -- এটি ইটালীর কর সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই আবেদন করা হয়। মধ্যযুগের ইটালীর প্রজাতন্ত্র (১৯৪৬), কৃষি, বিমান, কর্ম, বিচার, ওলিম্পিক গেমস্, শিল্পী মাইকেল এ্যাঞ্জেল ডাকটিকিট (সাইজ - ২২ x ২৬.৫ mm), স্থাপত্য, International Labour Organization (ILO), ভাস্কর্য, মানচিত্র, ডাকটিকিট দিবস (Philatelic Day) প্রভৃতি বিষয়মুখী ডাকটিকিট আর ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট প্রকাশনায় চিত্রিত Prince Hembert ও Princess Marie Jose (যুগ্মভাবে), ভলটেয়ার, জুরিয়াস Caeser, Antonia Pacinotti, Luigigalvani প্রমুখেরা।

Official Stamp প্রচলিত ছিল- ১৮৭৮, ১৮৬৫, ১৮৭৯-৯১, ১৯০১-১৯০৫, ১৯০৮, ১৯১১-১৭, ১৯২২ এবং ১৯৪৩ সালে Military Stamp প্রকাশিত হয়।

ইটালীর ডাকটিকিটের চিত্রকরেরা ছিলেন — R. Pierbattista, G. Balla প্রমুখেরা।

১৯২৪ সালে নিয়ত ডাকটিকিট ও Setanant ডাকটিকিট প্রকাশিত হলে তাতে চিত্রিত হন ডাকটিকিট চিত্রী Federici এবং A. Blasi সাইজের, বিভিন্ন ধরনের ডাকটিকিট ছিল। লিপির ভাষা ছিল ইটালীতে — Posteitacine. বিভিন্ন সময়ে ইটালী যেসব দেশ অধিকার করে, সেখানে ইটালী ডাকটিকিট প্রকাশিত করেছিল, যথাক্রমে— Trentino (১৯১৮), Venezia Tridentina (১৯১৮), Venezia Giulia (১৯১৮), Fiume (১৯১৮-১৯২২, ১৯২৪), Veglia (১৯২০), Dalmatia ১(১৯১৯), Carnaro (১৯২০), Veglia (১৯২০), ইটালী উপনিবেশিক (১৯৩৩-৩৪), Trieste (১৯৪৫, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৫১), Istria ও Pola (১৯৪৫) প্রভৃতি।

জাপান — পূর্ব এশিয়ার দেশ। প্রথম সূর্যোদয় হয় এই দেশে। ১৮৭১ সালে 'সূর্য' চিত্রে অছিদ্রন প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালের প্রকাশনাগুলি হল, যথাক্রমে— ১৮৭২, ১৮৭৫-৭৬, ১৮৯৪, ১৮৯৬, ১৮৯৯, ১৯০০, ১৯০৫-১৯০৬, ১৯১৩, ১৯১৫-১৬, ১৯১৯-২০ সালগুলিতে। বিভিন্ন সময়ে জাপান যেসব অন্য দেশাঞ্চল অধিকৃত করত সেখানে জাপানের ডাকটিকিট ব্যবহৃত হয় এবং ডাকঘর কাজ করে, তার তালিকাটি এরূপ— চীন (১৯০০), কোরিয়া (১৯০০), North Borneo (১৯৪২), Philippine, ইটালী (১৯৪২)। জাপানী ডাকটিকিটের বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয় যে ১। ডাকটিকিট প্রকাশনায় দুটি ধারা — (১) ব্যক্তিত্ব — এখানে চিত্রিত হয়েছেন

Prince Kitashirawa ও Arisugave, রাজ্যাভিষেক উৎসব এবং রাজকীয় উৎসব।

১৯৬৯ সালে ডাক সপ্তাহ উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিটে ১৮ জন দেশপ্রেমিক চিত্রিত হয়েছেন, এঁরা হলেন — Nidegonogachi, সম্পাদক Bifukuzav, উপন্যাসিক G. Soseki Nastsume প্রমুখেরা।

বিষয়মুখী ডাকটিকিট প্রকাশনায় রয়েছে — আগ্নেয়গিরি, নদী, যুদ্ধ, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় উদ্যান, কৃষ্টি, পশুপাখী ওলিম্পিক গেমস, UNO.

২। ভাষার ব্যবহার লিপিতে জাপানী ভাষা মূল্যমান ও মূল্য নির্দেশক উল্লেখ জাপানী ও ইংরাজী ভাষায়।

৩। ডাকটিকিটের সাইজের বৈচিত্র্যময়তায় রয়েছে চতুষ্কোণ, লম্বা চতুষ্কোণ এবং একই ভাবনায় বিষয়মুখী বৈচিত্র্যময় লম্বা চতুষ্কোণ ত্রিকোণী চতুষ্কোণ ডাকটিকিট।

৪। বিষয়বস্তুতে বুদ্ধদেব ডাকটিকিটে চিত্রিতে।

৫। চারটি সেটে লম্বা সাইজের প্রকাশিত ডাকটিকিটগুলি হল, যথাক্রমে — জাতীয় পার্ক হিসাবে নিক্কো পার্ক (১৯৩৮), ডাক সম্মেলন (১৯৫০), Bandaiasahiর জাতীয় পার্ক (১৯৫২), ফজি Hakene (১৯৬২)।

লম্বা-চতুষ্কোণ ডাকটিকিট হল — Sceneitrio (১৯৬০), লম্বা ডাকটিকিট হল জাতীয় উদ্যান Jalehitahikoseh (১৯৫৯) প্রভৃতি। প্রথম ত্রিকোণ ধরনের চতুষ্কোণ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং Javelin Throw — ১৯৬৪-এর ওলিম্পিক গেমস উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিটে।

৬। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য — (১) ১৮৭২ সালে Cherryblossom প্রকাশনা (২) ১৮৭১ সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। কিন্তু ডাক সেবা প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৬১ সালে। (৩) লিপির বিবর্তন প্রথম যুগের ডাকটিকিটে লেখা হল ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় — Imperial Japanese Post অথবা Japanese Empire Post (৪) ১৮৯৪ সালে দুটি প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। (৫) ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত নিয়ত ডাকটিকিটে (Definative series stamps) চিত্রিত হয়েছিল — জেনারেল Nogi, নৌ এডমিরাল Toga, বিমান ও নৌবহর। (৬) ১৯৪৩ সালে নব নকশায় ১টি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল। (৭) ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত ধ্বনিভিত্তিক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, যেমন — Enemy will surrender (৮) ১৯৪৬ তে ব্রিটিশ, Occupation জাপানে এবং Ryukyu দ্বীপপুঞ্জে. ১৯৫২, ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭১ বহিঃ দেশের অনুপ্রবেশ ঘটলে সেখানে সংশ্লিষ্ট দেশের ডাকটিকিটের ব্যবহারে প্রভাব লক্ষণীয়।

কানাডা — ৭ এপ্রিল, ১৮৫১ সালে কানাডার Adhesive Postage Stamp চালু করা হয়। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ডাক প্রশাসন থেকে লন্ডনের সাধারণ ডাকঘরের স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়। ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল নিউ ইয়র্কে Rawdon, Wright,

Hatch and Epson Firm পরে নাম হয় -- American Bank note company, নকশাকার ছিলেন Sandford Fleming. চিত্রিত ছিল কানাডাব জাতীয় প্রতীক, Victoric মূল্য ছিল Twele Pence এটি 'Twele Pence Black Stamp' নামে পরিচিত — যা কানাডার সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট। কানাডাব ডাকটিকিট প্রকাশ মালায় রয়েছে — কানাডার কনফেডারেশন (১ এপ্রিল, ১৮৬৭), সংসদ ভবন, পাখী, বন্যপ্রাণী, শিক্ষা, Redcross, সমবায়, কানাডার মানচিত্র (১৮৯৮) প্রভৃতি। ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট মালায় সমৃদ্ধ — রাজা পঞ্চম জর্জ, রানী মেরি দুরার ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও রানী Alexandar, রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী এলিজাবেথ (একধিকবার চিত্রিত), Edizah II ও Duke of Ediburgh (১৯৬৭) যুগ্মভাবে যেমন ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন, তেমনি রানী এলিজাবেথ একাধিকবার ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন, যথাক্রমে— ১৯৪০, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪২, ১৯৫৩, ১৯৬২, ১৯৫৯, ১৯৭৭।

কানাডার ডাকটিকিটের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য হল ঃ

১। বিভিন্ন সময় থেকে সময়ান্তে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছেন, যেমন — Registration Stamp — ১৮৭৫, সাইজে বড়; Special Delivery Stamp — ১৮৯৮, ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৭, ১৯৩০, ১৯৩৫, ১৯৩৮-৩৯, ১৯৪২-৪৩, ১৯৪৬-৪৭। Postage Due Stamps -- ১৯০৬, ১৯৩০-৩৩, ১৯৩৫, ১৯৬৭, Official Stamp (Ohms) – ১৯৪৯-৫৩, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬২-৬৩ (টাইপ ছিল G-02-04); Official Special Duty Stamps —১৯৫০।

২। ডাকটিকিটের সাইজে বৈচিত্র্যময়তা।

৩। ১৮৫১-তে প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিট Capex 124 নামে বিশ্ব ডাকটিকিট প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে (১৯৭৮)।

৪। ডাকটিকিট নকশাকারেরা হলেন — Helenfitzgerald, K. C. Lochhead.

৫। জুলাই ১৮৫৯ সালে প্রবর্তিত হয় দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা।

৬। ১৮৯৮ সালে কানাডায় প্রবর্তিত হয় বিশেষ বিলি সেবা ডাকটিকিটে লিখিত হয় — Special Delivery Express. এটি প্রচলিত ছিল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এগুলি সবই সাধারণ ডাকটিকিটের উপর Overprint করা হত।

৭। ১৯০৮ সালে Quebec ত্রিশতবর্ষে ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশনায় চিত্রিত Cartier ও Clamplain, Montcalm And Wolfe king & queen, Prince And Princess of Wales.

৮। ১৯৬৭-তে UN ডাকঘর (Postoffice) In Montrac স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

৯। নিয়ত ডাকটিকিটমালা প্রকাশিত হয় — ১৯৩৮, ১৯৬৮।

১০। ডাকটিকিটের লিপি (Inscription) ও মূল্যমান লেখা ইংরাজীতে, লিপির [illegible] ইংরাজীতে লেখা — Canada Postage.

১১। যেখানে যেখানে কানাডার Provinces ছিল, সেখানে কানাডার ডাকটিকিট প্রচলিত হয়েছিল, সেগুলি হল — British Columbia ও Voncouvers Island (১৮৬০), Vancouver Island ও British Columbia (১৯৬৫), Prince Edward দ্বীপপুঞ্জ (১৮৬২, ১৮৭০, ১৮৭২) Novascota(১৮৫১, ১৯৬০), New Brunswick (১৯৬০) এবং New Foundland (১৮৯৭, ১৮৯৪, ১৮৭০-৭১, ১৮৫৭, ১৮৬৬, ১৯১০-১১, ১৯২৮, ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৭, ১৯৪৩।)

গ্রেট ব্রিটেন (United Kingdom) — এই দেশটি হল পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিটের প্রবর্তক ও আধুনিক ডাকব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রবক্তা। এসব ঘটনার নেপথ্যে যে মানুষটি ছিলেন তিনি হলেন স্যার Rowland Hill, ১৮৩৯ সালে প্রাক ডাকমাশুল নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেন। হিল ছিলেন ডাকবিভাগের একজন কর্মচারী। তাঁরই সুপারিশমত ১৮৪০-এর ৭ মে বিশ্বে প্রথম ডাকটিকিট চালু করে গ্রেট ব্রিটেন, যা ডাকটিকিটের ইতিহাসে 'পেনি ব্যালা' নামে খ্যাত। ১৮৪১ সালে এরই কালো রঙ পরিবর্তন করে লাল রঙ করা হয়। তা ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। গ্রেট ব্রিটেনের ডাকটিকিটের ইতিহাস পর্যালোচনায় পর্যায়ক্রমে যে চিত্রটি পরিস্ফুটিত হয় তা হলঃ

১৮৬৭ সালে ডাকটিকিটের ধরন পরিবর্তন করেন Delarue নামে সংস্থাটি। চিত্রে রানী ভিক্টোরিয়ার নকশাটি করেন Jean Ferdinand Joubert এটি ১৯০২ সালের পরেও প্রচলিত ছিল। ১৮৯০ তে প্রকাশিত রানী ভিক্টোরিয়ার ডাকটিকিটের নকশাকার ছিলেন Delarue। ১৯০২ সালে ডাকটিকিটেব নব নকশার রূপকার ছিলেন Harrison & Sons। দামও ছিল উচ্চমূল্যের। এই বছরেই রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড চিত্রিত বিভিন্ন মূল্য, সাইজ ও রঙের নিয়ত ডাকটিকিটমালা প্রকাশ ঘটে, ১৯১১ তে রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে প্রকাশিত দুটি ডাকটিকিটের নকশাকার হলেন J. A. Charrison এবং ১৯১৩ সালে Sir Bertram Mackennac নকশাকৃত বিভিন্ন মূল্য, সাইজ, রঙের রাজা পঞ্চম জর্জের চিত্রিত ডাকটিকিট। এপ্রিল, ১৯২৪ সালে Harold Nelsen নকশাকৃত Wembbeyতে British Empire প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ পায়। ১৯৩৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের রজত জয়ন্তী (২৫ বছর) পূর্তি উপলক্ষে ৪টি ডাকটিকিট প্রকাশ, ১৯৫৩ সালে রানী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ৪টি ডাকটিকিট প্রকাশ হওয়া ব্যতীত তিনি নিয়ত ডাকটিকিট মালায় চিত্রিত। ১৯৬৬ সালে Battle of Hasting-এর নয়শত বার্ষিকীতে ৮টি ডাকটিকিট সংখ্যক Setenant Strip Stamp চিত্রিত ছিল Bayeux Tapestry দৃশ্য। নকশাকার ছিলেন David Gentleman। ১৯৬৯-তে ডাকঘরকে সরকারি থেকে জাতীয় চরিত্র দেওয়ার ভাবনায় যে সভা হয়, সেই উপলক্ষে প্রকাশিত চারটি ডাকটিকিটে চিত্রিত হয়েছিল আধুনিক প্রযুক্তির ডাক ব্যবস্থাটি। লিথোগ্রাফিক ছিলেন Delaru. ১৯৫৮ সালে Scotland-এর উপর তিনটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, বিষয়বস্তুর বিন্যাসে Elizabettan Gallen থেকে আধুনিক

যুগ পর্যন্ত একটি ডাকটিকিট মালায় সচিত্র ব্রিটিশ জাহাজের ইতিহাস (১৯৬৯), ফোটোগ্রাফি করেন Harrison & Sons। অন্যান্য উল্লেখ্য ডাকটিকিট প্রকাশনায় রয়েছে— ৪টি ওলেস ও Monmouthshire (১৯৬৬), ত্রি দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল — Isle of man, Gurnsey, Jersey (১৯৫৮) এবং Isle Man দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি আরো অনেক ডাকটিকিট।

এদেশের ডাকটিকিটে যেসব বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়, যথাক্রমে —

১। বিভিন্ন ধরনের সাইজ,

২। লিপিতে কোন নাম নেই, তার বদলে রাজা বা রানীর ছবি

৩। রানী এলিজাবেথ ও ষষ্ঠ জর্জ যুগ্মভাবে ৩ বার ডাকটিকিটে চিত্রিত।

৪। ১৯৫২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রথম ডাকটিকিটে চিত্রিত হওয়ার পরেও তিনি নিয়ত ডাকটিকিটমালা (Definative Series) স্থান পেয়েছে।

৫। বিদেশী ব্যক্তিত্ব হয়েও ভারতের মহাত্মা গান্ধী ১৯৬৯ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে ডাকটিকিটে চিত্রিত হয়েছেন।

৬। ইংলন্ডের অধিশ্বর বা অধিশ্বরণী বদলের সঙ্গে সঙ্গে ডাকটিকিটের চিত্রে রাজা বা রানীর চিত্রের বদল ঘটেছে, এই চিত্রটি এইরূপ —
রানী ভিক্টোরিয়া (১৮৪০-১৯০১), রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড (১৯০১-১৯১০), রাজা পঞ্চম জর্জ (১৯৩৬-১৯৫২), রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড (১৯৩৬) এবং রানী এলিজাবেথ (৬.২.১৯৫২ থেকে এখন পর্যন্ত)।

৭। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ প্রশাসন ডাকঘর ছিল তার সরণিটি এইরূপঃ
তুর্কী Empire (১৮৭৩, ১৮৭৫), Constonitinosile ও Smyrina (১৯১৯-১৯২৩) — এখানে ছিল ব্রিটিশ ডাকঘর এবং যেসব দেশ ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীন থেকে ব্রিটিশ ডাকব্যবস্থা প্রচলিত সেগুলি হল ঃ Salonica (১৯১৬), Channal Island (১৯৪৮), Guernery (১৯৪১-৪২), Alderney (১৯৮৪-১৯৯২), Isleofman (১৯৫৮-১৯৯২), Jorsey (১৯৪১-১৯৮২), Somalia (১৯৪৮), Crete (ডাকঘর ছিল) (১৮৯৮-১৯৯০) এবং Siomlban (১৮৭৭-১৯৫৭)।

৮। ব্রিটিশ ডাকটিকিটই হল পৃথিবীর প্রথম ও প্রাচীন ডাকটিকিট।
সাতটি বৃহৎ দেশের (U.S.A., U.K. জাপান, জার্মানী, কানাডা, ফ্রান্স) ডাকটিকিটের ইতিহাস পর্যালোচনার নিরীক্ষে মূল্যায়ন করলে দৃষ্টতঃ হয় যে উক্ত দেশগুলির ডাকটিকিট প্রকাশ ধারায় বিভিন্ন সাইজ, রঙ, বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর ডাকটিকিট প্রকাশনায় ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট প্রকাশে অগ্রণী। লিপিতে দ্বিভাষা—দেশীয় ও ইংরাজী ভাষায় ব্যবহার, আবার কোথাও কোথাও শুধুমাত্র দেশীয় ভাষা। সামগ্রিক ডাকটিকিট প্রকাশনায় উক্ত দেশগুলির শিক্ষা, সংস্কৃতি পরিস্ফুটিত করেছে। এক কথায় জাতীয়তা অধিকতর পরিস্ফুটন ঘটেছে।

জাতিসমস্যা প্রসঙ্গে লেনিন

নন্দিনী ভট্টাচার্য

লেনিন মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের বাস্তবরূপায়ণের একজন তথাকথিত অগ্রণী পথিকৃৎ। তদানীন্তন জাতিসমস্যা ও বিভিন্ন পটভূমিতে জাতীয়তাবাদের জাগরণকে তিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন — মার্কসীয় মূল ধারণার সূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রেখে। জাতিসমস্যা প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস্ থেকে শুরু করে ধ্রুপদী মার্কসবাদী রাজনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কিছু জটিলতা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁরা আন্তর্জাতিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ায় জাতীয়তাবাদের ধারণা ও তার প্রভাবকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেননি — তাঁরা জাতিসমস্যা বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বুর্জোয়া সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করেন এবং সেই কারণেই বিষয়টিকে সমধিক গুরুত্ব দিতে অপারগ হন। লেনিনের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে আন্তর্জাতিকতাবাদের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সমসাময়িক পৃথিবীর উপনিবেশিক চরিত্রে বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষিত ও অবদমিত জাতিগুলির সপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ এ বিষয়ে পাঠকের স্বাভাবিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর রচনা সমগ্রের ২০, ২১, ২২, খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self-Determination", "The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination", "On the National Pride of the Great Russians". ও আরও বহু প্রবন্ধর উল্লেখ করা যায়।

লেনিনের চিন্তাধারাতে কিন্তু আপাতভাবে সর্বহারার আন্তর্জাতিক ঐক্য স্থাপনের সঙ্গে জাতির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারণা একই সূত্রে গাঁথা ছিল। তাঁর মতে জাতীয় স্বাধীনতা বা জাতিগুলির অধিকার বোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মনোভাবের একটি দ্বন্দ্বমূলক (dialectical) সম্পর্ক রয়েছে। তিনি মনে করেন যে প্রাথমিকভাবে স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই কালক্রমে জাতিগুলির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মেলনের এক বন্ধুত্বপূর্ণ পথ প্রস্তুত করবে। তাঁর এই ধারণার পশ্চাতে দুটি বাস্তব পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত ছিল — আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর ইউরোপীয় শক্তি যথাক্রমে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতির হিংস্র উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও রাশিয়ার অভ্যন্তরে মূল ভূখণ্ড রাশিয়া ব্যতীত মধ্য এশিয়া,

ইউক্রেন, ককেশাস প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদেব সপক্ষে ও জারতন্ত্রের দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চাব হওয়া।

লেনিনেব জাতিব আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারণায় অত্যন্ত প্রাথমিক স্থান হয় প্রাচ্যেব উপনিবেশগুলির—যাদের উপর ক্ষমতাশালী ধনতন্ত্রী ইউরোপীয় দেশগুলির কর্তৃত্ব ও শোষণ এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সেই সব দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই অবদমিত জাতিকে শোষিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একটি সুষম সম্পর্কে আনয়নের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র সর্বহারার জাগরণ হলেও সর্বহারার আন্দোলনে যদি অন্য প্রথায় নিগৃহীত মানুষের স্থান না থাকে তবে সেই সমাজতন্ত্র তার দায়িত্বে অসম্পূর্ণ রূপে গণ্য হবে।[১] তবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও পদানত দেশ উভয়ের ক্ষেত্রেই সর্বহারাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করেছে। তিনি বলেন যে, দুটি দেশের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক হলেও উভয় দেশের সর্বহারাদের মধ্যে ঐক্যের স্পৃহা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এই আগ্রহকে সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও অবিচল রাখা সকল দেশের সর্বহারাদের প্রাথমিক দায়িত্ব।[২] উপরন্তু তিনি এ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন যে কোন দেশের জাতীয় বা স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব বহুক্ষেত্রেই শোষিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর কুক্ষিগত থেকে থাকে — সে ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন যে সর্বহারারা এই জাতীয় আন্দোলনে সর্বদা শর্তসাপেক্ষে তাদের সমর্থন প্রদান করবে।[৩] কোন নিঃশর্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দেবে না। তবে তিনি একথাও জোরের সঙ্গে বলেন যে, এই ঐতিহাসিক ধাপটি আপাতভাবে কেবলমাত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সপক্ষে অনুষ্ঠিত হলেও বৃহত্তর অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভিত্তি প্রশস্ত করে তা সমাজতন্ত্রের অন্যতম নীতিকে সমর্থন করে। লেনিনেব নিজের ভাষায়, "This principle would surely help bringing the proletariats of the oppressed nation near to the proletariats of the oppressor nation who would launch their joint campaign against their common enemy imperialism the highest stage in the development of capitalism."[৪] অর্থাৎ তাঁর মতে জাতীয় আন্দোলন ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এবং এই ঐতিহাসিক স্তর থেকে সর্বহারা শ্রেণীর যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনও ছিল। তবে সর্বহারাদের লক্ষ্য এই ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট থাকার প্রয়োজন তাদের শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী স্বার্থের উন্নতিকল্পে।[১] তবে একই সাথে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্যের জন্য এই স্তর অতিক্রম করে আরো বহুপথ অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

এই একই আদর্শের অনুসরণে লেনিন আগ্রাসনের ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। আবার তথাকথিত 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার যুদ্ধ' — এই ধারণাকেও তিনি পরিস্থিতি সাপেক্ষে বর্জন বা গ্রহণ করা উচিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি থেকে উদ্ভূত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পিতৃভূমি রক্ষার

ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে — যা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়[৬] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, "The present imperialist war stems from the general conditions of the imperialist era ...... Talk of defence of fatherland (on the part of France, England, Belgium) is, therefore, a deception of the people ...." কারণ এই দেশগুলির কোন জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন উপস্থিত ছিল না — সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে যুদ্ধের সূচনা তাতে পিতৃভূমি রক্ষার অজুহাত সম্পূর্ণ বর্জনীয়।[৭]

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সমর্থন বহুলাংশে একটি বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত। সমসাময়িক রাশিয়ার জারতন্ত্রের দমননীতিতে ক্লিষ্ট ইউক্রেন, ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার জাতিগুলির স্বার্থেও এ দাবী রেখেছিলেন — কারণ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে তাঁদের প্রয়োজন ছিল অন্যান্য শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা — যে সহযোগিতা এই অঞ্চলগুলিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ লেনিন জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাকে যথেষ্ট বুর্জোয়া মানসিকতার পরিচায়ক জেনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধের ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি।

কিন্তু এই যুক্তি থেকেই তিনি ধীরে ধীরে রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ ও তাঁর শিষ্যদের সমালোচনার শিকার হতে থাকেন। কারণ, তাঁদের যুক্তিতে লেনিনের জাতীয়তাবাদের দাবীকে ঐতিহাসিক পারম্পর্যে প্রাথমিক গুরুত্ব দেবার ফলে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্র খর্ব হয়।[৮] ফলশ্রুতিতে সর্বহারা বিপ্লব বিলম্বিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়—যা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। তিনি (লুক্সেমবুর্গ) আরো বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে জাতিসমস্যার অস্তিত্বই থাকবে না কারণ সেখানে শ্রেণীস্বার্থবিহীন আন্তর্জাতিক মানবসমাজ বিরাজ করবে। পক্ষান্তরে যে কোন জাতিকে জাতীয় স্বাধীনতা আনয়নে বা জাতীয় দুর্দশা দূরীকরণে সাহায্য করলে তা সমাজতন্ত্রের আগমনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কারণ এতে পরোক্ষভাবে বুর্জোয়া শক্তিই অধিক লাভবান হয়।[৯]

লেনিন এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলেন যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণাটিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া সমতার পথে প্রথম পদক্ষেপ — আন্তঃরাষ্ট্র সাম্যের ধারণা বৃদ্ধি না পেলে কখনোই বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের একই স্তরভুক্ত মানুষরূপে অনুধাবন সম্ভবপর নয়। লেনিন বাস্তব পটভূমি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, লুক্সেমবুর্গ পোল- জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচারী হয়ে পক্ষান্তরে বৃহৎ রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী জাতীয় অহমিকায় ইন্ধন যোগান দিয়েছেন।[১০] বৃহৎ রাশিয়ার জাতীয় নেতৃত্ব তখন সামন্তযুগীয় ভূম্যধিকারী ও জারনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রে প্রতিফলিত — যার প্রমাণ জাজ্বল্যমান স্বৈরতন্ত্র, রক্ষণশীলতা ও ভূমিদাসদের ত্রিশঙ্কু অবস্থানেই সুস্পষ্ট। এবং লেনিন স্পষ্টভাবে বলেন যে এই প্রাচীন শক্তির প্রাচীর অতিক্রম না করলে সর্বহারা শক্তির পক্ষে অগ্রসরণ অসম্ভব — তাই সেক্ষেত্রে বুর্জোয়া শক্তির

নেতৃত্ব থাকলেও সর্বহারাদের কেবলমাত্র মানবিকতার প্রয়োজনে নয়, তাদের আন্দোলনের সকল ভবিষ্যতের প্রয়োজনেও এই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা স্বীকার ও সমর্থন করা প্রয়োজন। লেনিনের ধারণায় বিভিন্ন জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ স্তরের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক সমাজের মুক্তাঙ্গনে উপনীত হওয়া সম্ভব।

তবে লেনিন তাঁর রচনায় এটি স্পষ্টত বারংবার উল্লেখ করেছেন যে 'জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ' একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং জাতির ধারণাটি একটি রাজনৈতিক মানসিকতার প্রতিফলন। সুতরাং জাতিগত সমস্যার সমাধানের মধ্যে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুরাহা বা সাংস্কৃতিক সাফল্যের অনুসন্ধান বৃথা। তিনি এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শোষণের মধ্যে একটি বিভাজন রেখা সৃষ্টি করেন এবং আরও বলেন যে, জাতীয় আন্দোলন কোন অর্থনৈতিক শোষণকে প্রশমিত করবে এই প্রত্যাশা ভ্রান্ত।[১১] Michael lowy তাঁর প্রবন্ধ "Marxists and the National Question"[১২] — এ বলেছেন "On the national question, while most other Marxist writers saw only the economic, cultural or 'psychological' dimension of the problem, Lenin stated clearly that the question of self-determination 'belongs wholly and exclusively to the sphere of political democracy, i.e. to the realm of the right of political secession and the establishment of an independent nation state.'"[১৩] কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে কিছু ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ বহু দেশের ক্ষেত্রেই লেনিনের সময়েতেও অবদমিত জাতির রাজনৈতিক অবমাননার সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ অঙ্গাঙ্গি জড়িত হয়ে পড়েছিল এবং তিনি স্বয়ং সেই শোষণের কথা দৃষ্টান্ত বিশেষে স্বীকার করেছেন। তার ফলে জাতির ধারণাতে অর্থনৈতিক স্বার্থকে অনুপস্থিত রাখা বিভ্রান্তিকর হয়েছে। বস্তুত তিনি স্বয়ং রাশিয়াতে শ্রমজীবী সর্বহারার মিত্ররূপে নিপীড়িত জাতিগুলিকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচারে নয় — অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রেরণাতেও। এর ফলে এই ধারণাটিতে তাঁর দৃঢ়ভিত্তির অভাব ঘটেছে বলা যায়। যদিও একথা নিঃসন্দেহে সত্যি যে ব্যুৎপত্তিগতভাবে জাতির ধারণাটি রাজনৈতিক ও তার প্রাথমিক দাবীগুলিও রাজনৈতিক তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বহু অর্থনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা এই জাতিসমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত থাকে এবং জাতীয় চেতনা ও জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণার পশ্চাতে সেই অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্খা ক্রীয়াশীল থাকে।

লেনিন সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গকে জাতিসমস্যায় নাকচ করেছিলেন জাতীয় নেতৃত্ব বুর্জোয়া নায়কত্বের অস্তিত্ব স্মরণে রেখে। কারণ বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংগ্রামশীল জাতিগুলির অর্থনৈতিক দাবী বহুলাংশে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী ছিল। জাতীয় সংগ্রামে যে সর্বহারার অর্থনৈতিক প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব নয় তা তিনি অনুভব করেছিলেন — কিন্তু তত্ত্বগতভাবে জাতীয় আন্দোলনে অর্থনীতির ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। লেনিন স্বয়ং সোভিয়েত শাসনকালে রুশ-ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বনির্ভরতার তুলনায় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়তঃ লেনিন জাতীয় সংস্কৃতির নিজস্বতার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর মতে, তদানীন্তন পৃথিবীতে 'জাতীয় সংস্কৃতির' ধারণা ছিল বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিফলন। রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ ও তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য (cultural autonomy) প্রদানে বিশ্বাস করতেন।[১৪] কিন্তু লেনিনের বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক দেশে জাতীয় সংস্কৃতির নামে যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রাধান্য পায় তবে তা বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সমাজের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তাঁর ''National culture'' [১৫] প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট বলেন, ''The slogan of national culture is a bourgeous fraud. Our slogan is : the international culture of democracy and of the world working-class movement''.[১৬] তিনি একথাও বলেন যে এই নবজাত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী নয় — প্রতিটি জাতীয় সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের এক মেলবন্ধন — প্রত্যেক দেশেই শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও সাম্যের পথে অগ্রসর হবার স্বপ্ন উপস্থিত থাকে। সেই ধারণারই চূড়ান্ত সফল প্রতিফলন ঘটবে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে। কিন্তু সাধারণত প্রত্যেক দেশেই নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর সংস্কৃতিরই ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে জাতীয় সংস্কৃতিতে এবং সমসাময়িককালের জাতীয় সংস্কৃতি তাই বুর্জোয়া সংস্কৃতির দর্পণ। তাই সেই জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে কাম্য নয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায় যে কোন জাতির সংস্কৃতিকে কি বাস্তবিকই একটি শ্রেণীর পক্ষে কুক্ষিগত করা সম্ভব? সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কি সে দেশের ঐতিহ্য ও নিজস্বতার চিরাচরিত প্রতিফলন নয়? সেও কি কোন সময় সাপেক্ষে, কোন বিশেষ শ্রেণীর মানসিকতারই প্রতিফলন মাত্র? উপরন্তু, বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য রূপে সাংস্কৃতিক নিজস্বতা বর্জন করতে শুরু করলে দেখা যাবে যে সে দেশের উপস্থিত কোন স্পষ্ট সাংস্কৃতিক ধারা বা রূপ গঠন অসম্ভব। বুর্জোয়া সাংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে কোন প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতির জন্ম সম্ভব নয় তার পূর্ববর্তী ধারাকে অগ্রাহ্য ক'রে। কারণ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হ'ল ইতিহাসের গতিতে নির্ভর করে কালের পরম্পরায় জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুষ্ঠু ও স্পষ্ট রূপ প্রদান। এক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণা দিয়ে সংস্কৃতির প্রবাহমানতাকে ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভবও নয়, যথার্থও নয়।

বস্তুতঃ বর্তমান পৃথিবীতে যে জাতিসমস্যা নতুন ক'রে দেখা দিয়েছে — যাকে আজ 'Ethnic question' আখ্যায় প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই "Ethnicity"-র ধারণাও সম্পূর্ণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টিভিত্তিক। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার দাবী যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতখানি শক্তিশালী হ'তে পারে ও সেই সাংস্কৃতিক অসন্তোষ যে একসময় রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হতে পারে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রয়েছে ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ানেরই মধ্য এশীয় দেশগুলির বর্তমান দাবীগুলির মধ্যে। লেনিনের চিন্তাধারা এক্ষেত্রে এক মারাত্মক ভুলের পথে পা বাড়িয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমান রাশিয়া এই ভ্রান্ত ধারণার ফলশ্রুতি তীব্রভাবে অনুভব করছে।

জাতির ভাষার মর্যাদা প্রসঙ্গেও লেনিনের বক্তব্যটি কিছুটা অস্পষ্ট ও স্থান বিশেষে অপরিণত। বস্তুতঃ ভাষার ভূমিকা জাতিগঠনে স্থান বিশেষে সহায়ক বা পরিপন্থী হয়ে ওঠে। মূল ভূখণ্ড ইউরোপের অধিকাংশ বৃহৎ দেশগুলির ক্ষেত্রেই জাতিগঠনে ভাষা সমস্যা হয়নি — সহায়ক হয়েছে কারণ সেগুলি একভাষিক অঞ্চল। কিন্তু বহুভাষিক দেশগুলিতে এই ভাষাই ঐক্যের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। লেনিন মনে করেছিলেন বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক সুবিধার উপযোগী ভাষাকে জনগণ স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নেবে[১৭] - এক্ষেত্রে লেনিনের বিশ্বাস ছিল যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও অসাম্যের অবসান ঘটবে তাই বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ তাদের ক্ষুদ্রস্বার্থের অভিমান ভুলে সমষ্টির কল্যাণের সপক্ষে যে ভাষার ব্যবহার সহায়ক হ'বে তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বীকার ক'রে নেবে[১৮]। কিন্তু বাস্তবে জনগণ স্বাভাবিক ভাবে রাষ্ট্রভাষারূপে রুশভাষাকে মেনে নিতে পারেনি—সরকারের পক্ষ থেকে তা সকল অ-রুশ ভাষাভাষী গোষ্ঠীদের উপর নানা পরোক্ষ উপায়ে আরোপিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানীয় আঞ্চলিক মাতৃভাষাগুলির চর্চা অবহেলিত হ'তে থাকে। এর ফলে অ-রুশ জাতিদের উপরে রুশ ভাষাভাষীদের নানা প্রকার আধিপত্য বিস্তারের সূচনা হয়। এই নীতিরও নানা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া আজকের রাশিয়া অনুভব করছে প্রতিনিয়ত।

লেনিনের জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থনের প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিচ্ছিন্নতার ধারণা চলে আসে। লেনিন অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাকে আমন্ত্রণ জানাননি। তাঁর নিজের ভাষায়, "The aim of socialism is not only to end the division of mankind into tiny states ......"[১৯] তাঁর বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীন সমপর্যায়যুক্ত জাতিগুলি বৃহত্তর স্বার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হবার বাসনা পোষণ করবে। তিনি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতার প্রায় অনিবার্য যে পরিণতি পরবর্তীকালে প্রায়শঃ পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা দিয়েছে তা অনুমানে অক্ষম হ'ন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির পথে প্রথম পদক্ষেপ। যে দেশের স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতা যত বেশী থাকবে সে দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকতে তত বেশী আগ্রহী হ'বে কারণ — বৃহৎ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নয়নের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। তাঁর মতে অবদমিত ও শোষিত অঞ্চলেই আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনের সম্ভাবনা বেশী তাই এই অধিকারকে প্রসারিত করলে স্বাভাবিক ভাবেই বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা হ্রাস পাবে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে লেনিন একথা অনুধাবনে অপারগ হ'ন যে কোন দেশ ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় একতার উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হ'তে পারে না। রাশিয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতাতেই দেখা গেছে যে দীর্ঘকালের জারতান্ত্রিক অত্যাচার থেকে মুক্ত হ'বার পরে ককেশাস, জর্জিয়া ও মধ্য-এশীয় দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের ছত্রছায়ায় আত্মসমর্পণে কতটা অনিচ্ছুক ছিল। অর্থাৎ লেনিনের ধারণায়

বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের যে স্বতঃস্ফূর্ত উপায় জন্ম নিয়েছিল বাস্তবে তা খুব কার্যকরী হয়নি। যদিও বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক সংগঠনে বসবাসের সুবিধা ও নিরাপত্তার আশ্বাস সংহতির ক্ষেত্রে কার্যকরী না হ'বার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই তবু দেখা গেছে যে লেনিনের এই প্রত্যাশার বাস্তব রূপায়ণ সর্বদা অসম্ভব না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা তার বিভিন্ন মাত্রায়, অসংখ্য জটিলতায় ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের সমসাময়িক কালের ইতিহাসের দর্পণে স্পষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই আজ আবার নতুন ক'রে জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হচ্ছে।

অর্থাৎ লেনিন সে যুগের পটভূমিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের যে রাজনৈতিক রূপের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতি সর্বদা সুখপ্রদ হয়নি। বস্তুতঃ লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক মহামিলনের পথে এক অধ্যায় মাত্র। লেনিনের এই সামঞ্জস্যের ধারণার জন্য তিনি জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী উভয়গোষ্ঠীর দ্বারাই সমালোচিত হ'ন। রোজা লুক্সেমবুর্গের সমালোচনা সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিকোণ থেকে লেনিনের জাতি ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণার বলিষ্ঠ সমালোচনা যা এই রচনার মূল অংশে স্থান পেয়েছে। আবার L. Kolakowsky'র গ্রন্থ "Main currents of Marxism"— লেনিনের তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে এক বিপরীত মেরু থেকে[২০]। তিনি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে লেনিনের অবস্থানকে দেখেন এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, "He (Lenin) was a convinced opponent of national oppresson and proclaimed the right of self-determination, but always with the reservation that it was only in exceptional circumstances that social democracy could support political separatism ..... This reservation in effect nullified the right of self-determination and turned it into a purely tactical weapon. The party would always try to utilize national aspirations in the struggle for power, but the 'interest of the proletariat' could never be subordinated to the desire of a whole people'[২১]" তবে এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে একজন মার্কসবাদী প্রলেতারিয়েত গণনায়কের পক্ষে সর্বহারার স্বার্থকে জাতির স্বার্থের ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া অস্বাভাবিক নয় — কোন নৈতিক বিচ্যুতিও নয় — বস্তুতঃ লেনিনের চিন্তাধারাতে জাতির মুক্তি বা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটিই অত্যন্ত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্র একজাতীয় সমস্যা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হ'বে — সমসাময়িক ঐতিহাসিক অধ্যায়ে উদ্ভূত এই সমস্যাকে তিনি এই বৃহত্তর বিশ্বাসের পরিধিতেই স্থান দিয়েছেন — স্বভাবতঃই সেখানে তাঁদের মৌলিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য —সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের পথ প্রস্তুতিকরণের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রাথমিক গুরুত্ব লাভ করেছে — জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা তার প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

লেনিনের তত্ত্বগত ত্রুটি যা সে যুগে ও এ যুগে সমালোচিত হয়েছে তা স্বীকার ক'রে নিয়েও একথা অনস্বীকার্য যে মার্কসবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেও বাস্তব পৃথিবীর জাতিসমস্যার তাৎক্ষণিক দাবীকে গুরুত্ব প্রদান নিঃসন্দেহে তাঁর চিন্তার একটি স্বাধীন ও প্রয়োজনানুগ মানসিকতার পরিচায়ক। অবশ্যই লেনিনের বক্তব্যে কোন জাতীয়তাবাদীর জাতীয় চেতনার অনুসন্ধান বৃথা এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেনিনের সীমাবদ্ধতা বিচার্য নয় — আন্তর্জাতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থেকেও যে সমসাময়িক জাতিসমস্যাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন বা বাস্তবেও নিগৃহীত জাতিগুলির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন প্রদান করেছিলেন সেখানেই তাঁর চিন্তার ভারসাম্য প্রতিফলিত হয় এবং আজও প্রশংসার দাবী রাখে।

সূত্র নির্দেশঃ

১। লেনিন রচনা সমগ্র (Lenin Collected Works-Vol-22) রচনা— The Socialist Revolution and the right of Nations of Self-Determination) পৃষ্ঠাঃ ১৪৭-১৪৮; 'প্রগ্রেস' প্রকাশক, ১৯৭৭ সংস্করণ।

২। Ibid পৃষ্ঠা : ১৪৮-৪৯।

৩। Ibid পৃষ্ঠা : ১৪৫।

৪। Ibid পৃষ্ঠা : ১৪৩।

৫। লেনিন, The Right of Nations to Self-Determination, লেনিন রচনা সমগ্র, খণ্ড-২০; পৃষ্ঠা : ৩৯৫-৪০৯।

৬। লেনিন রচনা সমগ্র (Vol-21) পৃষ্ঠা : ১৬-১৯। Op cit এবং লেনিন রচনা সমগ্র (Vol-23) পৃষ্ঠা : ২৯-৩৫। Op cit

৭। লেনিন রচনা সমগ্র (Vol-23), রচনা শিরোনাম— "The Marxist Attitude Towards War & "Defence of The Fatherland" পৃষ্ঠা : ২৯-৩০। Op cit

৮। L. Kolakowski - 'Main Currents of Marxism,' Vol-2 অধ্যায়— 'Rosa Luxemburg and the Revolutionary Left' পৃষ্ঠা : ৯০-৯১।

৯। রোজা লুক্সেমবুর্গ, "Nationalitat and Autonomie" (১৯০৮), Neuwied 1971, পৃষ্ঠা : ২৩৬-২৩৯; রোজা লুক্সেমবুর্গ, 'The Junius Pamphlet', মারী অ্যালিস্ ওয়াটার অনূদিত "Rosa Luxemburg Speaks" নিউ ইয়র্ক, পৃষ্ঠা : ৩০৪।

১০। লেনিন, "The Discussion on Self-Determination Summed up"; লেনিন রচনা সমগ্র, খণ্ড, ২২, পৃষ্ঠা : ৩৩৪-৩৩৭; Op.cit.

১১। লেনিন, "The Socialist Revolution and The Right of Nations to Self-Determination"; লেনিন রচনা সমগ্র, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা : ১৪৫;

১২। M. Lowy, "Marxists and the National Question", 'New Left Review, No. 96, 1976.

১৩। Ibid. পৃষ্ঠা : ৯৭

১৪। Ibid. পৃষ্ঠা - ৮৮।

১৫। লেনিন, Critical Remarks on the National Question, অংশ '২' - National Culture: লেনিন রচনা সংগ্রহ, খণ্ড-২০;

১৬। Ibid. পৃষ্ঠা : ২৩।

১৭। লেনিন, Is A Compulsory Official Language Needed?", লেনিন রচনা সমগ্র, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা : ৭২-৭৩।

১৮। Ibid. পৃষ্ঠা : ৭৩।

১৯। লেনিন, "Socialist Revolution and Self-Determination"-এর অন্তর্গত "The Singificance of the Right to Self-Determination & its Relation to Federation লেনিন রচনা সমগ্র; খণ্ড-২২; পৃষ্ঠা : ১৪৬

২০। Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism, খণ্ড-২; প্রকাশক, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৭৮, ১৯৮২;

২১। Ibid. পৃষ্ঠা : ৪০১;

ইন্দোনেশিয়ায় গণআন্দোলন
জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদ

জহর সেন

ক. সুকর্ণর ত্রিশরণ মন্ত্র ঃ—

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে "ন্যাশনালিজম, ইসলাম অ্যাণ্ড মার্কসিজম" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ইন্দোনেশিযার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুকর্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ **Suluh Indonesia Muda** (The Torch of Young Indonesia) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয় 1969 সালে[১]। এখানে সুকর্ণর বক্তব্যের সারকথা আলোচনা করছি।

এশিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে উত্তাল। এশিয়া অপরাজেয়। সদা জাগ্রত এশিয়ার আত্মা অনির্বাণ শিখার মতো। ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার একটি অন্যতম বৃহৎ দেশ। সেখানে গণআন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ঃ স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই গণআন্দোলন প্রবাহিত ত্রিধারায় ঃ জাতীয়তাবাদ, ইসলামধর্ম ও মার্কসবাদ। কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়াকে গড়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐক্যগ্রন্থি। ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঐক্যগ্রন্থি বন্ধনে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অপরিহার্য অনুঘটক। তাঁর প্রবন্ধে সুকর্ণ প্রাসঙ্গিক গান্ধীবাণী উৎকীর্ণ করেছেন ঃ "For me, my love of my country is part of my love for all mankind. I am a patriot because I am a human being and act as a human being. I do not exclude any one." কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর মতো মহামানব নেই। সুকর্ণ প্রত্যাশা করেছেন, মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতৃত্বের আবির্ভাব নিশ্চয়ই সেখানে ঘটবে। সেই পথ অন্বেষণ ও প্রশস্ত করার জন্যই তিনি সগর্বে আত্মনিয়োগ করেছেন।

১৯০৮ সালের ২০ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বুদি উতোমো (Budi Utomo) দল। ইন্দেনেশিয়ার ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম আধুনিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন। এই দলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুখ্যত জাভাকেন্দ্রিক। ডচ শাসনের প্রতি তাদের আচরণ ছিল সতর্ক সহযোগিতামূলক। ১৯১১ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয় ন্যাশনাল ইনডিজ পার্টি (National Indies Party)। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন এবং বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা ছিল এই দলের কর্মসূচির প্রধান বিষয়। ১৯২০

সালের ২৩ মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারেকাৎ ইসলামের কমিউনিস্ট-বিরোধী নেতৃবৃন্দ গড়ে তোলেন ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশন পার্টি (Pertai Sarekat Islam)। সারেকাৎ ইসলাম বিভক্ত হয়ে পড়ে মার্কসবাদী ও ইসলামি, এই দুই ভাগে। সুকর্ণ অনুক্ষণ ভেবেছেন, কি ভাবে এই সব বিবাদপ্রিয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকাগ্রন্থি গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয়তাবাদ! জাতিত্ব!

ফরাসি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আর্নেস্ট রেনান [Earnest Renan (1823-1892)] ১৮৮২ সালে বলেছিলেন, প্রতিটি জাতির নিজস্ব আত্মা আছে, স্বতন্ত্র বুদ্ধি শক্তিবাদী পটভূমি আছে। জাতীয়তাবাদে আছে দুটি অবিচ্ছিন্ন উপকরণ ঃ ঐতিহাসিক পরম্পরাপুষ্ট জন এবং এক জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার তীব্র স্পৃহা। এই প্রসঙ্গে সুকর্ণ স্পষ্টোক্তি করেছেন, এক গোষ্ঠী, এক ভাষা, এক ধর্ম, একই ধরনেব প্রয়োজন এবং সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখা, শুধুমাত্র এইসব উপকবণ থাকলেই জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনা, জাতি সৃষ্টি হয়না। এছাড়া সুকর্ণ উল্লেখ করেছেন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট তাত্ত্বিক কার্ল কাউটস্কি [Karl Kautsky (1854-1938)] এবং বলশেভিক সাংবাদিক ও কমিনটার্ন জ্যোতিষ্ক কার্ল রাডেক [Karl Radek (1885-1939)] এর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা। অষ্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের অগ্রণী তাত্ত্বিক অটো বয়ার (Otto Bauer (1881-1938)] ১৯০৬ সালে লিখেছেন, একটি গোষ্ঠীতে বা একটি জাতি হিসেবে মানুষ ঐক্যবদ্ধ, জাতীয়তাবাদ হলো জনগণের এই প্রত্যয় ও চেতনা। এই সব শ্রুতকীর্তি তাত্ত্বিকের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, জাতীয়তাবাদ ও আত্মনির্ভরতাবোধ পরস্পর অঙ্গবদ্ধ।

জাতীয়তাবাদের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অহমিকা। ইসলাম এই ধরনের জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করে। মার্কসবাদ, তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় অর্থেই, আন্তর্জাতিক। সুতরাং জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য। সুকর্ণ প্রশ্ন তুলেছেনঃ ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী কেন ইন্দোনেশীয় ইসলামধর্মীকে অগ্রাহ্য করবে? কেনই বা তারা ইন্দোনেশীয় মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে? এই প্রসঙ্গে তিনি গোপাল কৃষ্ণ গোখেল (1866-1915), মহাত্মা গান্ধী (1869-1948) এবং চিত্তরঞ্জন দাশ (1870-1925) যে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন জাতীয়তাবাদের দুটি ভিন্নমুখী চারিত্রিক প্রবণতা। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী, লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রমত্ত বাণিজ্যিক জাতীয়তাবাদ। কিন্তু প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদ সমন্বয়ধর্মী ও উদারপন্থী। শুধু ইন্দোনেশিয়াতে নয় এশিয়ার প্রায় সব দেশেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ইসলামি আন্দোলন ধনতন্ত্র বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। অভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট থেকে জন্ম নিয়েছে গণআন্দোলনের এই দুই ধারা, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি আন্দোলন। একথাও সত্য, যে কোন দেশেই তার বসবাস

হোক না কেন, প্রকৃত মুসলমানের কাছে সেই দেশই তার স্বদেশ, সেই দেশের সেবাই তার ধর্ম। আরব, ভারতবর্ষ, মিশর ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত অভিবাসী মুসলমান ইন্দোনশিয়ায় বসবাস করে। প্রকৃত ইসলামি অনুশাসন মতে, ইন্দেনেশিয়া তাদের স্বদেশ, ইন্দোনশিয়ার স্বাধীনতা ও কল্যাণ তাদের স্বপ্ন ও সাধনা। এই হলো ইসলামি জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি জাতীয়তাবাদ, এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

ইসলাম

একই বাস্তব পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মার্কসবাদী আন্দোলন। সুতরাং মার্কসবাদীকে অগ্রাহ্য করার অর্থই হলো সহযাত্রী বন্ধুর আন্তরিক সহযোগিতা অস্বীকার করা। চিনের সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন একনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে চিনা কমিউনিস্টরা ছিল তাঁর সহযাত্রী। অন্যান্য দেশেও মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছে ইসলামি দেশপ্রেমিক ও মার্কসবাদী সহযোদ্ধা।

উনিশ শতকের ইসলাম ধর্মের দুজন বলিষ্ঠ ভাষ্যকারের বক্তব্য সুকর্ণ আমাদের গোচরে এনেছেন। একজন হলেন অল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত শেখ মহম্মদ আব্দু [Sheikh Mohammed Abduh (1849-1905)]। মধ্যযুগের ইসলামি রীতিনীতির প্রতি অচল অটল আনুগত্য নয়, ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় জন হলেন অল-সৈয়দ জামাল অল-দিন অল-আফগানি [Al-Sayyid Jamal al-Din al-Afgani (1838-1897)]। তিনি ছিলেন বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি প্যান-ইসলাম অর্থাৎ নিখিল ইসলামি আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ইসলামের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন ও সজাগ করেছিলেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনগণকে। সুকর্ণর ইসলামি ধ্যানধারণায় এই দুই চিন্তানায়কের প্রভাব ছিল গভীর। একথা সত্য, ইসলাম বস্তুবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাস করেনা। জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সীমারেখার মধ্যে ইসলামের আদর্শ আবদ্ধ নয়। আবার একথাও সত্য, ইসলাম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদী দায়দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান। ইসলামি জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত কয়েকজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিকের কীর্তিকাহিনী উদাহরণ হিসাবে সুকর্ণ উল্লেখ করেছেন ঃ আহমদ আরবি পাশা (1839-1911), মুস্তাফা কামাল পাশা (1874-1908), মহম্মদ ফরিদ (1868-1919), আলি পাশা (1815-1871) ইত্যাদি। মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু ইসলামি সমাজতন্ত্র আধ্যাত্মিক। এই পার্থক্য মেনে নিয়েও বলা চলে, ইসলাম প্রকৃত অর্থেই সমাজতন্ত্র। ইসলাম ধনতন্ত্রবিরোধী, মার্কসবাদও ধনতন্ত্র বিরোধী। উদ্বৃত্ত মূল্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা ইসলামের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুদখোরদের ইসলাম ঘৃণা করে। ব্যক্তিগত ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় ও অতিলোলুপতা ইসলাম ধর্মে ও মার্কসবাদে নিন্দিত। ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামি আন্দোলন

ও মার্কসবাদী আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণআন্দোলন। এই দুই প্রবাহের সাঙ্গীকরণ একান্তই কাম্য।

মার্কসবাদ

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস বিশ্বের সব সর্বহারা শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকতা মার্কসবাদের মর্মকথা। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের এক অভিনব পদ্ধতির সন্ধান মিলেছে মার্কসবাদে। এই পদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্র, এমনকি ইন্দোনেশিয়াতেও, অমূল্য উত্তরাধিকার। মানুষ দরিদ্র কেন? প্রতিকারের পথ কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর মেলে ঐ পদ্ধতির আশ্রয় নিলে? ইন্দোনেশিয়াতে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি রাজনীতির ধারা মার্কসবাদ-বিরোধী ছিল। কিন্তু চিনে মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। আফগানিস্তানেও ইসলামি ও মার্কসবাদী গোষ্ঠী অভিন্নহৃদয় সখা।

ইউরোপে ও এশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। এশীয় দেশগুলিতে প্রাধান কর্মসূচী স্বাধীনতা অর্জন। একারণে সমাজতান্ত্রিক দলগুলিও এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী। ইন্দোনেশিয়ায় শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি মূলধনের প্রাধান্য। শ্রমিক আন্দোলনও এখানে তাই জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেবে। ইউরোপে ধর্মীয় সংগঠন ছিল প্রতিক্রিয়ার দুর্গ। মার্কসবাদ সেখানে ছিল অবশ্যই ধর্মবিরোধী। কিন্তু ইন্দোনশিয়ার ইসলাম সাধারণ মানুষের ধর্ম; বঞ্চিত, শোষিত শৃঙ্খলিত মানুষের ধর্ম। ইসলাম এখানে ধনতন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ। ইসলামি আন্দোলন ও মার্কসবাদী আন্দোলন মূলত সমধর্মী।

সুকর্ণ বিলাপ করেছেন, ইন্দোনেশিয়া বিপন্ন, অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, আলোর শিখা অবশ্যই আছে। তা হলো গণআন্দোলনে ঐক্যের সাধনা। সম্ভাব্য ঐক্যের গৌরব তিনি পরিকীর্তন করেছেন তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে।

খ. ত্রিশরণ মন্ত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঃ—

১৯২৭ সালে খ্যাতনামা ডচ বিশেষজ্ঞ এন. ডবলিউ. এফ. ট্রুব (N.W.F. Treub) তৎকালীন ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন[১]। তিনি ছিলেন প্রধান ডচ অর্থনৈতিক সংস্থার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। তাঁর মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি। ইন্দোনেশিয়া সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির ভয়াবহ আবর্তে নিমগ্ন। স্থানীয় আদি অধিবাসী ও বহিরাগত চিনা, এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের টানাপোড়েন চলছে। নানা আন্দোলনও ঘটছে। আন্দোলনের তিনটি প্রবণতা খুব স্পষ্টঃ স্বাধীনতার জন্য আকুল আকাঙ্খা, ধর্মীয় উন্মাদনা ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। এই তিন প্রবণতাকে তিনি জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলাম, এই তিন শিরোনাম শব্দে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে, এই সব আন্দোলন ও প্রবণতা ছিল পরস্পর অঙ্গবদ্ধ। সুকর্ণ ও ট্রুব-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে রুথ. ভি, ম্যাকভি লিখেছেন, ১৯২৬

বা ১৯২৭ সালে নয়, এর এক দশক অগে যদি তারা ইন্দোনেশীয় পরিস্থিতির বিচার করতেন, তাহলে তাঁদের দৃষ্টিতে এই তিনটি ধারার স্বতন্ত্র, স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রবাহ ধরা পড়ত না। জাতীয়তাবাদ সেই সময় ছিল অস্বচ্ছ। তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ইন্দোনেশীয় মুক্তি সংগ্রামকে দু'টি ধারা সমন্বিত জটিল অবস্থারূপে বর্ণনা করতেন। এই দুই ধারা হলো ধর্মীয় এবং অধর্মীয়। ১৯২৬ বা ১৯২৭ সালে নয়, কিছুদিন পর যদি তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে তাঁদের মনে হতো, মার্কসবাদ সেখানে স্বতন্ত্র ধারারূপে অবদমিত। তখন মার্কসবাদ স্বতন্ত্র আদর্শগত প্রবাহ নয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদ ছিল যথার্থই অভিন্ন। কিন্তু পরিস্থিতির গুণগত রূপান্তর ঘটে ১৯২৬-২৭ সালের ক্রান্তিলগ্নে। নিম্ন বর্ণিত ঘটনা তখন স্পষ্টতর ভূমিকা নিয়েছিল। ১. ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম; ২. ইন্দোনেশীয় জাতীয় দলের (P.N.I) আবির্ভাব; ৩. ইসলাম ধর্মীয় সংগঠন দু'ভাগে বিভক্তঃ ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও আধুনিকপন্থী। ১৯৪৫-৪৯ সালের ক্রান্তি পর্বে ওলন্দাজ ও জাপানি শাসনের অপসারণই ছিল ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবর্গের একমাত্র লক্ষ্য। এই সময়েই স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের নেতৃবর্গের চিন্তাধারাকে গভীর ও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে জাতীয়তাবাদ, ইসলামধর্ম ও মার্কসবাদ।

এই ত্রিধারার প্রবক্তা ছিলেন সুকর্ণ স্বয়ং। ত্রিশরণ মন্ত্রে তিনি সহযাত্রী উচ্চবর্গীয় নেতৃবর্গকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। হতাশাক্লিষ্ট গ্রামীণ মানুষ এবং সর্বহারা বিপ্লবী জনগণকে তিনি তাঁর বক্তব্য শোনাতে চাননি। তাঁর নিজস্ব দল পি. এন. আই (PNI) এর অনুগামী এবং মুসলমান শান্ত্রি (Santri) সমাজকেও তিনি বিশেষ আমল দেননি। এদের প্রাণবান অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি জানতেন, সমাজের যে উচ্চবর্গশ্রেণীকে তিনি সহযাত্রী করতে চেয়েছেন, তাঁরাই তাঁর কাঙ্খিত গণআন্দোলনের অগ্রদূত। Geertz এই উচ্চবর্গশ্রেণীকে 'metropolitan super culture' এর ধারকরূপে অভিহিত করেছেন[৩]। ভাষাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ইন্দোনেশীয় সমাজ নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তা তিনি জানতেন। ১৯২০-এর দশকে তিনি ভেবেছিলেন, সংহতিনাশক উপাদানকে বিনষ্ট করে নয়, জাতীয় আন্দোলনে তাদের সদর্থক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেই সংহতিসাধন সম্ভব। জাতীয় উচ্চবর্গ শ্রেণীভুক্ত নবজাগ্রত সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের মনে ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার স্বপ্ন সঞ্চারিত করতে পারলেই, সেখানে সংহতিসাধন সম্ভব হবে, সার্থক হবে। এই উদ্দেশ্যেই সুকর্ণ ১৯২৬ সালে আলোচ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জননেতা হিসাবে সুকর্ণর আসন ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উচ্চবর্গশ্রেণীর উপর তাঁর আস্থা কখনই স্তিমিত হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন নানা রাষ্ট্রে এমন ঘটেছে। নেতৃত্বের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও সামাজিক রক্ষণশীলতা যুগপৎ সক্রিয় ছিল। 1959 সালের 17 আগষ্ট পরিচালিত গণতন্ত্রের (Guided Democracy) রাজনৈতিক দর্শন সুকর্ণ ব্যাখ্যা করেন। ১৯৬৫ সালের ১৮ মে তারিখে তিনি ঘোষণা করেন নিজেকে যাবজ্জীবন রাষ্ট্রপতি

রূপে। ঐ বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট সমর্থিত অভ্যুত্থান নিদারুণ ব্যর্থ হয়। এমনকি ১৯৫৯-১৯৬৫ কালপর্বেও সুকর্ণ শুধুমাত্র উচ্চবর্গশ্রেণীর প্রতিভূ নন, তিনি নিজেকে দাবি করেছেন গণকণ্ঠরূপে (**Rakjat**/Voice of the People)। সংসদীয় গণতন্ত্র পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু উচ্চবর্গশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা খর্বিত হয়নি, বরঞ্চ সুরক্ষিত হয়েছে।

সুকর্ণর রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষায় তখন শ্রেণী সংগ্রাম এতটুকু স্থান পায়নি। অথচ সমসাময়িক ইন্দোনেশীয় নেতাদের অনেকেই কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক দর্শনকে আশ্রয় করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি বিচার করে দেখা গেছে, নেতাদের অনেকেই দেশি-বিদেশি আমলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষাগত কারণে এবং উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে, অনেকেই অনুকরণীয় মনে করেছেন ঔপনিবেশিক জীবনাচরণ। ওলন্দাজ শাসনের পরিবর্তে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা। মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রামে তাঁরা ব্রতী হন নি। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চিরাচরিত স্বার্থদ্বন্দ্ব তাঁদের প্রত্যয়বোধকে প্রভাবিত করেনি। নেতৃত্বের মূল কাজ হলো পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। পরস্পর বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ নেতৃত্বের জন্মদাতা। কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্ব সবরকম শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী ও সক্ষম। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত এবং নেতৃত্ব বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষক। এই ধারণাকে ইন্দোনেশিয়ায় কার্যকর করতে গেলে পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হতে বাধ্য।

সুকর্ণ যদি মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করতেন, তাহলে বিপ্লবোত্তর কালপর্বে নগরসভ্যতা পুষ্ট উচ্চবর্গশ্রেণীর সৃজনশীল ভূমিকা তাঁকে অস্বীকার করতে হতো। তাঁর মতে, উচ্চবর্গশ্রেণী ছিল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ও রূপায়ণে প্রধান অঙ্গ, রাষ্ট্রপতি ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে একমাত্র সেতু। এই শ্রেণীর ভূমিকা ছিল সর্বাংশে প্রতিনিধিমূলক। তাঁর মতে সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বে এই শ্রেণী ছিল শান্তির দূত। ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক প্রভেদ, গোষ্ঠীগত বিভেদ ইত্যাদি নানা কারণে সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি ছিল নিঃসন্দেহে জটিল। কিন্তু মূল বিভাজন ছিল তিনটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধঃ ১. বিমূর্ত ভাবাদর্শের ধারক অভিজাত উচ্চবর্গ priyayi শ্রেণী, ২. ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিভূ santri শ্রেণী, এবং ৩. গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রবক্তা abangan শ্রেণী। এই বিভাজন শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য হেতু বিভাজন নয়। সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও প্রসারিত হয়েছিল এই বিভাজন। বিপ্লবী চেতনা কালক্রমে পশ্চিমী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত উচ্চবর্গ শ্রেণীর বৃত্তকে অতিক্রম করে বৃহত্তর প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে উক্ত বিভাজনের আদর্শগত নামকরণ হয় যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও মার্কসবাদ। এই আদর্শগত বিভাজনের সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক আনুগত্য বিশেষ সম্পর্কিত। জাভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপরও এই বিভাজনের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সুকর্ণ পরিকল্পিত /পরিচালিত গণতন্ত্র (Guided Democracy)-এ এই সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত ত্রিধারা বিভাজন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি

পায়। এই স্বীকৃতির স্লোগান হলো সুকর্ণর ভাষায় NASAKOM অর্থাৎ "ন্যাশনালিজম, ইসলাম অ্যানড কমিউনিজম"।

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে মধ্য এবং পূর্ব জাভার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট বিরোধী অভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের আনুগত্যের সীমানায় নানা হেরফের ঘটেছে। রাজনৈতিক দলগুলি হারিয়ে ফেলেছে তাদের যথার্থ ভূমিকা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জনগণ থেকে। শাসকশ্রেণী অস্বীকার করেছে ত্রিধারার আদর্শগত ও প্রায়োগিক বাস্তবতা। শ্রেণীস্বার্থকেই তারা মেনে নিয়েছে অবশ্যম্ভাবী প্রবণতারূপে। ১৯৬৫ সালের পর যে চিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে সুকর্ণ প্রবর্তিত ও প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সক্রিয় বা বাস্তবানুগ, তার প্রকৃত মূল্যায়ন অদ্যাপি অসম্পূর্ণ। এটা কিন্তু সুনিশ্চিত যে উচ্চবর্গশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনার মধ্যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান।

সূত্র নির্দেশঃ

1 Soekarno Nationalism, Islam and Marxism Translated by Karel H Warouw and Peter D Weldon with an Introduction by Ruth T Mcvey (mimeographed) Translation Series Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University Ithaca, New York 1969

2 M W F Treub **Het gist in Indie** (Haarlem H D Tjeenk Willink & Zoon, 1927, p 3

3 Hildred Geertz 'Indonesian Cultures and Communities,' in McVey (ed) **Indonesia** (New Haven HRAF Press 1963), pp 33-38

নাম পরিবর্তনের আবর্তে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী

সতী দত্ত

খুলনা জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) বহু ব্যক্তি ও পরিবার ঔপনিবেশিক ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা বা স্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত বিভক্ত হওয়ায় তাঁরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এবার আর আন্দোলন নয়, ভিটেমাটি ছাড়তে হল দলে দলে অনিশ্চিত জীবনের পথে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এই জনগোষ্ঠীর বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের সাংগঠনিক কেন্দ্ররূপে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী (১৯০২) ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের ধর্ম-দর্শন ও পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বর্তমানে কিন্তু বাংলাদেশে উপরোক্ত নামের কোন প্রতিষ্ঠানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রায় একশ বছরে ছয়বার প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে সাময়িক উত্তেজনা বা আবেগের বশে কোন স্থান, রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের প্রবণতা আমাদের আছে। নাম কিন্তু বহন করে ইতিহাস। নাম পরিবর্তনের ফলে কোন স্থানের ইতিহাস পুরোপুরি লুপ্ত না হলেও তা কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই হিন্দু একাডেমীর নাম পরিবর্তনের পটভূমিকা আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের উপস্থাপনা।

ভবতোষ দত্ত লিখেছেন — কলকাতার বড় উকিল ব্রজলাল চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন মিলে খুলনা শহরের কাছে ভৈরব নদের তীরে দৌলতপুর গ্রামটিকে বেছে নিলেন একটি আদর্শ আবাসিক কলেজ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে — যার নাম হবে হিন্দু একাডেমী। ছাত্র এবং অধ্যাপকরা কলেজেই থাকবেন। ছোটখাটো সব ব্যাপারে কলেজ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ..... তৈরী হল দধিবামনের মন্দির। সমস্ত কলেজ আর তার সম্পত্তি দধিবামনের নামে দেবোত্তর করা হল। (ভবতোষ দত্ত — আট দশক। পৃঃ ১২-১৩)

হিন্দু একাডেমীর ট্রাস্ট ডীড অনুযায়ী —

"The aim of this institution is to provide education for Hindu boys ..... and to revive the ancient system of Brahmacharya as far as practicable ..... It will teach the Dharma Sastras and also science and other subjects required by the circumstances of the country and the time. (This deed was executed by Trailokya Nath Chatterjee and Brajalal Chakraborty on the 5th April, 1994). নিজ দেশের সাধনার সাথে নিবিড় পরিচয়ের জন্য

তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল — মূল লক্ষ্য ছিল গুরু-শিষ্যের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য প্রণালীর পুনঃপ্রবর্তন। একাডেমীর দুটি শাখা — চতুষ্পাঠী ও কলেজ। চতুষ্পাঠীর ভিতর দিয়ে নতুন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, তার প্রকাশ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হল, তাই একই সাথে একই অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে আশ্রয় করে কলেজও স্থাপিত হয়। চতুষ্পাঠীর ছাত্র হতে পারবেন কলেজের শিক্ষকরাও। যাঁরা আশ্রমের (অর্থাৎ চতুষ্পাঠীর) সাথে যুক্ত থাকবেন তাঁদের সমস্ত ব্যয় বহন করবেন কর্তৃপক্ষ আশ্রমের অবস্থানুযায়ী। কলেজের অধ্যক্ষ চতুষ্পাঠীর আচার্যের নির্দেশে কলেজ পরিচালনা করবেন।

"জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষা চাই। কিন্তু সেই লাভের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের ভাবধারাটির সাথে প্রাণের যোগসূত্র ছিন্ন যেন না হয়ে যায় — প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ প্রতিষ্ঠার জন্য নগরের কোলাহল ও ব্যস্ততা থেকে বহু দূরে শান্ত প্রকৃতি ঘেরা নিভৃত পল্লী বেছে নিয়ে ছিলেন ব্রজলাল চক্রবর্তী। ১৯০২ সালে দৌলতপুরে হিন্দু একাডেমী স্থাপিত হল।" (দেবায়তন — খুলনা - কৃষিশিক্ষা প্রসঙ্গ)

এই কর্মে প্রতিষ্ঠাতার কোন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ছিল না আর্থিক সম্বলও নয় কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক মহান ব্যক্তির সহায়তায় স্থাপিত হয়েছিল একাডেমী। অতি ক্ষুদ্রভাবে সমগ্র দেশের মানুষের পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ব্যাকুলতাকে অগ্রাহ্য করেই। গোলপাতার চাল ও মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা দুটি মাত্র কুঁড়ে ঘর আর চারজন শিক্ষক দিয়ে যাত্রা শুরু। কিন্তু গুরু-শিষ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ ও মধুর সম্পর্ক এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষকদের বেতন ছিল যৎসামান্য কিন্তু তাঁদের আদর্শ নিষ্ঠা ও সততা হল প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ। তাঁদের সুপরিচালনায় অল্প দিনের মধ্যেই অবিভক্ত বাংলার নানা জেলা থেকে এসেছিলেন ছাত্ররা—আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সবার সাথে — "যে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল দৌলতপুরে, সেটা কখনো ছিন্ন হয়নি।" (ভবতোষ দত্ত — আট দশক - পৃঃ ২৬)

এখানকার ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্ম শিক্ষার বিষয়টি বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল দূর থেকে যাঁরা আসতেন, তাঁরা প্রতিষ্ঠানটির ভাবরূপটি সহজেই অনুভব করতে পারতেন — তাই তাঁরা বলতেন "এমনটি অন্যত্র দেখিনি"।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের মূলগত পার্থক্য থাকায় "খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ..... তার আকর্ষণে অনেকে আসতেন — আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘন ঘন আসা যাওয়া ছিল ..... স্যাডলার কমিশনের সাথে এসেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ..... আর একবার খুব ঘটা করে এসেছিলেন লাট সাহেব রোনাল্ডসে একটা বড় স্টীমারে চড়ে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব।" (ভবতোষ দত্ত — আট দশক পৃঃ ১৮)

বাংলার প্রাক্তন গভর্নর স্যার রোনাল্ডসে তাঁর "The Heart of Aryavarta" নামক গ্রন্থে - (পৃঃ ৬৭) এবং Royal Society of Arts-এ A clash of ideals as

a source of Indian unrest (1923) নামক বক্তৃতায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর লেখার ও বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল — ধর্ম বিবর্জিত ইংরাজী শিক্ষার পরিবর্তে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রথাবহির্ভূত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়ে উঠেছে, যেমন আর্য সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হরিদ্বারের গুরুকুল, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং দৌলতপুরে হিন্দু একাডেমী। ১৯২০ সালে তিনি এই স্বল্পপরিচিত একাডেমী পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাই তাঁর প্রতিবেদনে এর বিশদ বর্ণনাও দিয়েছিলেন — "The whole scene was a crystalisation of secular education with moral and religious training based on ideals of life exponded by the Hindu Acharyas of old". (Sir Ronald Shay - The Heart of Aryavarta. P-69)

কেবলমাত্র বর্ণহিন্দুদের জন্য "হিন্দু একাডেমী" ১৯০২ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই নিয়মাবলী সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট বলে বিবেচিত হবে। প্রকৃত মূল্যায়নের স্বার্থে আমাদের ফিরে যেতে হবে শতাধিক বৎসরেরও পূর্বেকার সামাজিক ব্যবস্থা ও বিশ্বাসের পটভূমিতে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করে বলা যায় কোন মানুষই তাঁর যুগকে অতিক্রম করতে পারেন না। একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তীর জন্ম (১৮৭২ সাল) যদিও খুলনা জেলায় কিন্তু তাঁর পিতামহ, পিতার কর্মস্থল ছিল কলকাতা এবং তাঁর নিজের উচ্চ শিক্ষালাভ এবং কর্মকেন্দ্রও ছিল এই মহানগরী কলকাতা।

সুমিত সরকারের মতে — "তখন শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের পক্ষে কলকাতা হয়ে উঠেছিল মহানগর। সাহিত্য চর্চার উপযোগী ভাষার বিবর্তন, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রচনা এ সবই লালন করছিল, এক নতুন আত্মবিশ্বাস — ক্রমবর্ধমান হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মনোভাব (বিবেকান্দ যার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ) (সুমিত সরকার আধুনিক ভারত - পৃঃ ৯৮)

এই পুনরুত্থানবাদীদের মতে প্রাচীন হিন্দুধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবাদর্শ নিহিত আছে তার জন্য নূতন কোন ভাবাদর্শ বাইরে থেকে আমদানী করা অর্থহীন। স্বামীজি আবেদন করলেন ভারতের অতীত ইতিহাসকে অনুসরণ করতে, যুবসমাজকে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব নিতে। ব্রজলাল চক্রবর্তী (শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ব্রজলাল শাস্ত্রী নামেও পরিচিত ছিলেন) এই ভাবাদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি জীবনের নানা পর্যায়ের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তিনি একজন প্রাচ্যাভিমানী ছিলেন। তাঁর যুগাদর্শের বাস্তব রূপায়ণই জীবনের প্রধান ও প্রথম স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র জীবনেই তিনি আচার্য রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনিও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জেলার সামগ্রিক উন্নতির চিন্তায় মগ্ন হতে। তখন থেকেই তাঁর

পরিকল্পনা ছিল প্রাচীন ভারতের তপোবন আশ্রমকে বর্তমানের উপযোগী ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সম্ভারে ঐশ্বর্যবান করে — আধুনিক ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। (সাক্ষাৎকার — ব্রজলাল চক্রবর্তীর পুত্র মধুসূদন চক্রবর্তীর সহিত লেখিকার - ২৪/১/৯৬)

সেকালে কলকাতার ঢেউ বাংলা দেশের মফস্বলে আছড়ে পড়ত কলকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর খুলনা, জেলাতেও বহু ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না — তাই এন্ট্রান্স পরীক্ষান্তে জেলার ছাত্ররা (প্রধানত বর্ণহিন্দু) কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতেন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। বর্ণহিন্দুদের এই অভাব পূরণের জন্যই একাডেমীর জন্ম।

কলকাতার সমাজ সংস্কার বা ধর্মীয় আন্দোলনের ঢেউ জেলাতে এসে পড়লেও জেলার সামাজিক বিন্যাস বা অস্পৃশ্যতারূপ ব্যাধিকে স্পর্শ করতেও পারেনি। একই প্রতিষ্ঠানে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রবেশাধিকারের কথা প্রথমেই ভাবাও সম্ভব হয়নি। তবে জেলার সামাজিক বিন্যাস আলোচিত হলে, বর্ণহিন্দুদের জন্য কেন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল, তার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। সতীশ চন্দ্র মিত্র ও ওম্যালির মতে সমগ্র জেলার প্রায় ৮৮ শতাংশ মানুষ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। (সতীশ চন্দ্র মিত্র — যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯)। (O Malley - District Gazetteer, Khulna, P-65.,)

১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এই জেলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ লক্ষ (১২,৫১,০৪৩) — হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান, সমাজের নির্যাতনে পলায়িত নমশূদ্র, কৈবর্ত, ধীবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের জাতিরা যখন খুলনার দক্ষিণাংশে (সুন্দরবন অঞ্চলে) স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতেন তখন মুসলমান যাজকগণ ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে সাহসী হন এবং সমগ্র জনসমূহকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন — এরা বেশীর ভাগ ছিলেন কৃষিজীবী। নানা শ্রেণীর হিন্দুদের সাথে তুর্কী, আফগান মুসলমানদের সংমিশ্রণের অল্প সংখ্যক আসরাফ বা অভিজাত সম্প্রদায় মুসলমানের সৃষ্টি হয়েছিল — খুলনায় এদের সংখ্যা খুবই সামান্য। তাঁরা ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে নিজেদের ভাবধারার আপোষ করতে পারেন নি। ফলে ইংরাজী শিক্ষাবাহিত নবযুগের প্রাণচাঞ্চল্য মুসলমান সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নি — খুলনা জেলাতে মাত্র দু-একটি পরিবারের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ দেখা যায়"।

সতীশ চন্দ্র মিত্র — যশোহর খুলনার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড — পৃঃ ৭০৩ হান্টারের মতেও জেলার উন্নত শ্রেণীর মানুষরা সবাই হিন্দু। মুসলমানরা নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত — প্রধানত কৃষিজীবী ও ধীবর। (W. W. Hunter - The Statistical Accounts of Bengal. Vol.I - P, 217)

সতীশ চন্দ্র মিত্র হিন্দুদের সামাজিক বিন্যাসে দেখিয়েছেন — বর্ণহিন্দুদের মধ্যে (মোটজনসংখ্যার ১৬ শতাংশ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য) শিক্ষার প্রচলন ছিল। শিক্ষিতের

অনুপাতে বৈদ্যের সংখ্যা বেশী। সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ ছিল নিম্নবর্ণের, তাঁদের অনেকের জল অনাচারণায়— এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে পোদ (১,৫১,৯৫৩), নমশূদ্র (২,২৭,৮১১), চাষী কৈবর্ত (১১,৩৩৫) — এই বিশাল সংখ্যক নিম্নবর্ণের মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন ছিল — নিম্নবর্ণের লোকেরা নিজবৃত্তি দ্বারা স্বাধীন ও সুখী জীবন যাপন করতেন, ফলে তাদের মধ্যে ছিল না শিক্ষার জন্য আগ্রহ বা আন্দোলন।

সতীশ চন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪৩ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে — খুলনা জেলার প্রায় অর্ধেক অঞ্চল সুন্দরবনের অন্তর্গত, বহু চাষী পরিবার এখানে বাস করতেন তারাই সুন্দরবনের প্রধান আবাদকারী জাতি— সুন্দরবনে শষ্যের স্বর্ণবৃষ্টি হত। ফলে তাদেরও গ্রাম্যজীবন ছিল শান্ত ও নিস্তরঙ্গ।

খুলনা জেলার এই সামাজিক বিন্যাস প্রমাণ করে কৌলিন্য রক্ষার জন্য কলেজ সংবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও মুসলমান ও নিম্নবর্ণের মানুষেরা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা ১৯০৭ সালে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয় কিন্তু ১৯২৬ সালে একাডেমীর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪২৫ জন তার মধ্যে মাত্র ২০ জন মুসলমান আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের ৫ জন।

Report of Daulatpur Hindu Academy edited by B. L. Chakraborty. এই সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন তখন সামাজিক ভাবেও অনুভূত হয়নি। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছে অক্টোপাশের মত, তখন তা ছিল না। সুতরাং ব্রজলাল চক্রবর্তী যে আদর্শে বিশ্বাস রাখতেন সেই আদর্শের বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণের জন্য তাঁর প্রচেষ্টারও অন্ত ছিল না। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না তাই তিনি সমসাময়িক দানবীরদের সাহায্যে একাডেমী স্থাপন করেন — যাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। পরবর্তী কালে তাঁদের দানের টাকায় কলেজে বহু বাড়ি তৈরী হয়েছে। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে এই মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টায় সে সময়কার সমস্ত শিক্ষকবৃন্দের নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্মরণ করার যোগ্য। বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে তাঁরা তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য। তাঁদের এই মহৎ কাজে অনুপ্রেরণা যোগাতেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

প্রায় ১৬শ বিঘা জমিতে ভৈরব নদের তীরে সবুজ সমারোহের মাঝে এখানে তপোবনের শান্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে কিন্তু যুগের হাওয়া অগ্রাহ্য করা যায় না তাই ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জেলার মুক্তি সংগ্রামীদের সাংগঠনিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। একাডেমীর শিক্ষক ও ছাত্ররা ছিলেন সমগ্র জেলার আন্দোলনের সংগঠক ও পরিচালক। তাঁদেরই নেতৃত্বে বিভিন্ন ধারার আন্দোলন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

"বড় দালানের হস্টেলে একটা ঘরে থাকতেন এক রহস্যময় ব্যক্তি.....নাম মণি শেঠ, হস্টেলে বোধ হয় সহকারী সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন, কিন্তু আসলে ছিলেন গুপ্ত সমিতির একজন বড় কর্ণধার"। (ভবতোষ দত্ত — আট দশক, পৃঃ ১৪)

ছাত্র-শিক্ষকদের এই সংগ্রামী মনোভাবের জন্য মাঝে মাঝেই কলেজে লাল পাগড়ীর আবির্ভাব হত, খানা - তল্লাসী চলত, কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে যায় .... যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্রর বাড়ীতেও একদিন খানা-তল্লাসি হয়ে গেল ..... পুলিশের লোক প্রত্যেক ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালায়।

(ভবতোষ দত্ত — আট দশক-পৃঃ ১৩। অমৃতবাজার পত্রিকা — ১৯১৬, ১৬ই জুলাই)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৃটিশ উচ্ছেদের যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তার সাথে যুক্ত ছিলেন একাডেমীর ছাত্ররা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তর নেতৃত্বে। তখন তাঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ছাত্রদের শান্তিনিকেতন আবাস বা খাজুরা বাগান আশ্রম। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন মনোজ বসুর "ভুলি নাই" বইটি দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর পটভূমিকায় লেখা। ভবানী সেন, দেবেন সেন প্রভৃতিরা এখানকারই ছাত্র — বলা যেতে পারে এখানেই তাঁদের রাজনীতির হাতে খড়ি। প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

পুলিশের তাণ্ডবে মাঝে মাঝে কলেজ চত্বরে বিভীষিকার ঢেউ আছড়ে পড়লেও, এখানে জীবন ছিল সহজ ও শান্ত। জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ছিল স্বপ্নালু পরিবেশ — আর দিনগুলি ছিল সোনালী — (ভবতোষ দত্ত-আট দশক, পৃঃ ১৮)

১৯৪৭ সালে খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায়, জেলার সামাজিক বিন্যাস নতুন ভাবে গড়ে ওঠে। বহু স্মৃতি বিজড়িত এই প্রতিষ্ঠানটি তার গুরুত্ব না হারালেও পূর্বনাম ও সংবিধানকে হারিয়ে নতুন নামে কালের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯০২ সালের হিন্দু একাডেমী —

১৯৪৬ সালে ব্রজলাল হিন্দু একাডেমী নামে পরিচিত হ'ল।

(প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী ১৯৪৪ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে হিন্দু একাডেমীর সাথে তাঁর নামটি যুক্ত করা হয়।)

১৯৪৯ সালে বাদ পড়ল হিন্দু — এবার হল "ব্রজলাল একাডেমী"।

১৯৫১ সালে আবার পরিবর্তন — একাডেমী আর নয় - "ব্রজলাল কলেজ"

১৯৬৭ সালে সরকার কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, আবারও নতুন নামে পরিচিত — সরকারী ব্রজলাল কলেজ।

কলেজের প্রধান ফটকে লেখা আছে —

'সরকারী ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' — যদিও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় নি। প্রকৃতির কি নির্মম পরিহাস - নামসহ বর্ণহিন্দুরা একাডেমী থেকে

প্রায় নিশ্চিহ্ন। তবে ঐ অঞ্চলের মানুষেরা প্রতিষ্ঠাতার নামটি কলেজের সাথে যুক্ত রেখে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা রক্ষা করে চলেছেন।

সূত্র নির্দেশঃ

সতীশ চন্দ্র মিত্র	যশোহর খুলনার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড ২য় সংস্করণ ১৬৫
ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত	স্বামী বিবেকানন্দ ২য় সংস্করণ ১৩৯৩
ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত	বিপ্লবের পদচিহ্ন
ভবতোষ দত্ত	আট দশক ২য় সংস্করণ ১৯৮১
সুশীল কুমার গুপ্ত	ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯
সুমিত সরকার	আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭) প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
Sir Ronald Shaw	The Heart of Aryavarta 1925
L S S O'Malley	Bengal District Gazetteers Khulna 1908
W W Hunter	The Statistical Account of Bengal Vol I 1875 (1st Reprinted in India Delhi 1973)

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন

শিহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীন গ্রীসের কবি ও নাট্যকার এসকাইলাসের রচনায় প্রমিথিউস বিদ্রোহের প্রতীক। একালেও প্রমিথিউসকে দেখেছি আমরা, উপলব্ধি করেছি তার সবল অস্তিত্ব। একালে বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যাপীঠের যে ছাত্রসমাজ বা ছাত্রশক্তি দেশে দেশে বিক্ষুব্ধ মানব গোষ্ঠীর, শোষিত সংগ্রামী মানব সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেছে, সকল রকম অন্যায় অবিচার শোষন শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে — তাদের ভূমিকাও প্রমিথিউসের ন্যায় গৌরবজনক। দেখি, সেই সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডেও তারা বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছে, মানুষকে সচেতন করেছে, পুরনো জরাজীর্ণ সব কিছু ভেঙে দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার আন্দোলনে নিজেদেরকে সামিল করেছে সাহসী সৈন্যদল হিসাবে - দিয়েছে মুক্তির পথের সন্ধান[১]।

১৮৪৮ সালে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের মূল শক্তিই ছিল ছাত্রসমাজ। এই সময় পূর্ব ইউরোপে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, শিল্পায়ন, সুযোগ ও সম্পদের সমতা ইত্যাদি আধুনিক ধারণাগুলো ছাত্ররাই ব্যাপকভাবে শিক্ষাবঞ্চিত মানবমণ্ডলীর কাছে পৌছে দিয়েছিল। জার আমলের রাশিয়ার ছাত্ররাই বিভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা ঘটায়। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র। সাম্রাজ্যিক চীনে ছাত্ররাই আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাধান্যশীল গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করেছে। তারা সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক ধারণা। ১৯১১ সালে মাঞ্চু বংশের উৎখাত বা পতনে ছাত্ররাই সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতেও ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকা লক্ষণীয়। ১৯৬০ সালে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখেই কোরিয়ায় সিং-ম্যান-রী শাসনের উৎখাত ঘটে। এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলোতে ছাত্ররা প্রায়শই উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে কেন্দ্রীয় উপাদান ছিল। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির একটা ঐতিহাসিক সূত্র রয়েছে[২]।

মস্কোতে চীনা ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষানবীশদের সাক্ষাৎদান কালে প্রদত্ত ভাষণে (১৭ই অক্টোবর ১৯৫৭) মাও-সে-তুং যথার্থই বলেছিলেন, "পৃথিবীটা তোমাদের এবং আমাদেরও, কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা তোমাদেরই। তোমরা তরুণেরা সজীব ও প্রাণ শক্তিতে উচ্ছল, তোমরা রয়েছ জীবনের স্ফুটন্মুখ অবস্থায় সকাল আটটা-নটার সময়কার সূর্যের মতো"। বস্তুত, ছাত্ররা সমগ্র বিশ্বে দেশে দেশে এবং বিশেষ করে

বাংলাদেশে তাদের পারিপার্শ্বিক সচেতনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সুখী শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলন ইত্যাদি দ্বারা উল্লিখিত উক্তির সত্যতাই প্রমাণ করেছে[৩]।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে আমরা দেখি এখানকার ছাত্র সমাজ প্রমিথিউসের ভূমিকাই নিয়েছে। ধর্মীয় পাকিস্তানের উগ্রচণ্ডী চেহারা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে তারাই সর্বপ্রথম অধিকাংশ মানুষকে সচেতন করেছে। ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা উর্দুকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেবার চক্রান্তকে রুখেছে। জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছে কিভাবে শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে কোণঠাসা করার অভিলাষেই পাকিস্তানী শাসক এলিটগন উর্দু চাপানোর প্রয়াস পেয়েছিল। সচেতন ছাত্র সমাজ তাই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে। জোয়ার এনেছে পূর্ব বাংলায় ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের[৪]।

১৯৫৮-৬২ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানে সকল রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ কঠোর সামরিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ থাকাকালে এদেশের ছাত্রসমাজই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সময় সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হয়েছে। বলা বাহুল্য ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি উঠিয়ে দেবার পেছনেও সে সময়কার ছাত্রদের ছিল বিরাট অবদান। জেনারেল আয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ তোলা এবং আন্দোলনে নামার কাজ ছাত্রদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে[৫]।

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসে ভারত ত্যাগ করার সময়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ ভারতকে সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সক্রিয় সহযোগিতা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের কতকগুলি রাজনৈতিক ভুলের সুযোগ নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ জনবিরোধী কাজ হাসিল করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা পাকিস্তানের শাসনক্ষমতাও তুলে দিয়েছিল তাদের বহুদিনের সহযোগী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তথা পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ ধনিক ও বৃহৎ সামন্তবাদী ভূস্বামীদের হাতে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনটা ছিল এক বিশেষ ধরনের। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান - হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ঐ দুটি অঞ্চল যাদের মধ্যে কোন ভৌগোলিক যোগাযোগ ছিল না, তাদের নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। এছাড়া এই রাষ্ট্রে ছিল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতি - যথা পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচ। এইভাবে দুটি পৃথক অঞ্চল ও পাঁচটি ভাষাভাষী জাতিকে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ধনিক ও বৃহৎ ভূস্বামীরা সারা পাকিস্তানে তাদের শোষণের জাল বিস্তার করতে তৎপর হয়েছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের পাট, চা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ৫ কোটিরও বেশী মানুষের বাজার প্রভৃতি ঐ শোষকদের লুব্ধ দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল। এই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আদমজী, দাউদ, বাওয়ামী প্রমুখ বৃহৎ পুঁজিপতি, পরবর্তীকালে যারা 'বাইশ পরিবার' বলে কুখ্যাত হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পগঠন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করেছিল। এইভাবে সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গোটা অর্থনীতিতে তাদের প্রাধান্য কায়েম করেছিল।

অতএব, পাকিস্তানের জন্মের পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিদের যে শোষণ চেপে বসেছিল, সে শোষণটা ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের। আর এই ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ করতে যারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল তারাই হল অধুনা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ।

১৯৬৮-৬৯ এর আয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের যেটুকু সফলতা এসেছে, স্বৈরাচারী আয়ুবের বাস্তিল দুর্গের যে পতন ঘটেছে তার মূলে নিহিত ছিল প্রধানত ছাত্রদের প্রচেষ্টা। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববাংলার বিপুল বিজয়ের পেছনেও ছাত্রদের অবদান অসামান্য। নির্বাচনের পর পাকিস্তানী ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর নির্বাচনের গণরায়কে নিয়ে চক্রান্ত করার অপচেষ্টা সম্পর্কে ছাত্ররাই জনগণকে সচেতন করে দেয়। এই সময় তারা 'পাকিস্তানের মুখে পদাঘাত' করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলে। তারাই শ্লোগান তোলে "তোমার দেশ-আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ", "বীর বাঙালি অস্ত্রধর - বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। অতঃপর যখন ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বাঙালি জনগণের ওপর ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা চাপিয়ে দেয় তখন ছাত্রদের দ্বারা একসময়ে প্রচারিত বাঙালি জাতীয়তাবাদই যেন গণজাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। ব্যাপক জনগণ সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধ শুরু করে[৬]।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন একটি ইতিবাচক আপস বিরোধী এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী আন্দোলন। জনগণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের একটি দিকচিহ্ন বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন জাতিগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত প্রতিবাদী আন্দোলন। সামসুর রাহমান যখন লিখলেন 'বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে' কিংবা 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'র মত আবেগময় অথচ দৃপ্ত কবিতা তখন তা সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল তরুণ ছাত্রদের মুখে মুখে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ছিল তা পরবর্তীকালের গণআন্দোলনকে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এই ভাষা আন্দোলন সমার্থক। কমঃ মাও সে তুং বলেছিলেন 'একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে

ছাত্রদের ওপর যে গুলি বর্ষন চলেছিল সেগুলি ছিল তেমনই এক একটি স্ফুলিঙ্গ। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ছাত্রসমাজের মধ্যে যে প্রবল উৎসাহের জোয়ার আসে তা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয় সমগ্র উপমহাদেশে এক নতুন নজির স্থাপন করে।

ভারতে যেমন অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন কিংবা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মনে দৃঢ় জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিল, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের কঠিন কঠোর নীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা আকাঙ্খা নিয়ে নিষ্ঠুর উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রবণতাকে জাগ্রত করে। তারা উপলব্ধি করে যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ক্ষমতায় থাকলে তাদের মূল দাবী কখনই পূরণ হবে না। ভাষাকে কেন্দ্র করে যেমন - বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে তেমনি জোরালো হয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র। ছাত্ররা উপলব্ধি করেছিল যে একটি বিশেষ ধর্মের বাতাবরণে প্রকৃত শিক্ষা কখনই আলোকিত হয়ে উঠতে পারে না - এর জন্য দরকার ধর্মীয় অন্ধত্বের অবসান, মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জোরদার লাগাতার আন্দোলন। বাংলাদেশের ছাত্ররা এইভাবে সবধরনের, সব ধর্মের ছাত্রদের একটি সাধারণ মঞ্চে নিয়ে এসে তাদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। বিভেদবাদী শাসক শ্রেণী ধর্মের নামে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা বাধালে ছাত্র ইউনিয়নগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছিল তা লক্ষণীয়। যুক্তির আলোকে ও যথার্থ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিকে তারা সত্যকে যাচাই করে নিতে শিখেছিল। এদিক দিয়েও বাংলাদেশের ছাত্রদের ভূমিকা গৌরবজনক।

ওপরের বিস্তৃত তথ্য থেকে আমি বোঝাতে চাইছি বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা পেরিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ভাষা আন্দোলন দ্বিধাগ্রস্ত একটি জাতির সামনে জাতীয়তাবাদের দিগন্ত উন্মুক্ত করেছিল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিল। দাঙ্গা, বিধ্বস্ত দেশভাগে বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছিল ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্বাস। একটা জাতির মুক্তি আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ - যার ফল এই উপমহাদেশে বিভিন্নভাবে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশঃ

১। হাসানউজ্জামান, **আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন**, ঢাকা, ১৯৮৪

২। তদেব

৩। তদেব

৪। দেবাশিস দাসগুপ্ত (সম্পাদনা), **একুশে ফেব্রুয়ারী**, কলকাতা, ১৯৯৪

৫। মোহাম্মদ হাননান, **বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস**, ঢাকা, ১৯৮৭

৬। কে.এস.শামসুল আলম, **বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস**, ঢাকা, ১৯৯৩

ভূটানবাসী নেপালি শরণার্থী সমস্যা

দেবমিত্রা মিত্র

হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত স্বল্পজ্ঞাত ও স্বল্প পরিচিত রাজ্যগুলির নিজস্ব সমস্যা আমি এই প্রবন্ধে আলোকপাত করতে চেয়েছি। অভিবাসন প্রক্রিয়া হিমালয় অঞ্চলে অনাদি কাল থেকে চলেছে। প্রায় খৃষ্টপূর্বাব্দ সময় নাগাদ তিব্বতি-বর্মি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তখন থেকে অভিবাসন সতত নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক অর্থে, হিমালয় অঞ্চলে রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটি জটিল আকার নিয়েছে।

শরণার্থী সমস্যা একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। এই বিশ্বসমস্যার একটি অঙ্গ হল ভূটানবাসী নেপালি শরণার্থী সমস্যা। সার্ক (SAARC) নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে নেপাল-ভূটান উভয়ই সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানটি এই সব বিষয়ে কতটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা লক্ষণীয়। শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক সমস্যা বলে এটাকে এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। এটিই আমার অন্যতম মূল বক্তব্য।

ভূটানে ব্যাপকার্থে নেপালি অভিবাসন শুরু হয় ১৮৬৫ সালের সিনচুলা চুক্তির (Treaty of Sinchula) পর। এই চুক্তি ইঙ্গো-ভূটান যুদ্ধের অবসান ঘটায়। ভূটান সরকারের মতে এই অঞ্চলে প্রচুর কাজের সুযোগ-সুবিধা ছিল। উর্বর জমিকে আইনত বা বেআইনীভাবে দখল করে লাভজনক পণ্যশস্যের চাষআবাদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এই অঞ্চলে বিদেশীদের আকর্ষণ করে[১]। কিন্তু নেপালি অভিবাসীদের ভূটানে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিষয়টি এক নতুন রূপ ধারণ করে ১৯৫৮ সাল থেকে। অতএব আলোচ্য বিষয়ের কালপর্ব হল ১৯৫৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত। কারণ এই সমস্যা বর্তমানে বিরাটাকার শরণার্থী সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

১৯৫৮ সালে একাদশ অধিবেশনে ভূটানের সংসদ সঙ্দু (Tsongdu) নাগরিকতা সংক্রান্ত আইন (Nationality Act or Citizenship Act) প্রণয়ন করে। এই আইনে ১৯৫৮ সালকে ছেদবর্ষ (cut-off year) বলা হয়েছে। ভূটান সরকারের মতে ১৯৫৮ সালের আগে যে নেপালি অভিবাসীরা ভূটানে এসেছিল তারা স্বতই ভূটানি জাতীয়তা (Nationality) লাভ করে। তাদের ভূটান রাজকীয় সরকার লথশম্পা (Lhotshampas) নামে অভিহিত করে। ১৯৫৮-উত্তর অভিবাসীরা রাজকীয় সরকারের কাছে বিদেশী এবং বেআইনি, কারণ ভূটান সরকারের মতে তারা বেআইনি ভাবে ৭০০ কিঃমিঃ ভারত-ভূটান সীমান্ত দিয়ে ভূটানে অনুপ্রবেশ করে এবং লথশম্পাদের সঙ্গে মিশে যায়।

এই ১৯৫৮-উত্তর বেআইনি বিদেশিদেব ভূটান সরকার নঙলোপ (Nglops) বলে নামকরণ করে[২]।

রাজকীয় সবকারেব অভিমত যে, ভূটানে অসংখ্য নেপালি অভিবাসীদের প্রবেশের ফলে নেপালি গোষ্ঠীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে এবং তার ফলে ভূটানের জনতাত্ত্বিক ভারসাম্য (demographic balance) ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। সরকার আরো মনে কবেন যে, বেআইনি নেপালি অভিবাসীরা ভূটানে সন্ত্রাসবাদ এবং ভূটানবিরোধী কার্যকলাপে নিযুক্ত হয়েছে। ফলে রাজকীয় সরকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজকীয় সরকারের মতে, এরা ভূটানেব অভ্যন্তরে নেপালি রাষ্ট্র গঠন করতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়তঃ বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভূটান রাষ্ট্রকে নিরঙ্কুশ ভাবে চালনা করা[৩]।

ভূটান সরকারের মতে সন্ত্রাসবাদ বিশেষ আকার ধারণ করে বিশেষতঃ ১৯৮৮ সাল থেকে। প্রথমতঃ ভূটান সরকার এই প্রথম সুনিপুণভাবে জনগণনা শুরু করে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৮৫-এর নাগরিকতা আইনে রাজকীয় সরকার পুনরায় ১৯৫৮ সালকে ছেদবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে। ভূটান নরেশ মনে করেন যে, ভূটানে ভূটানি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন। সেই কারণেই তিনি সারা দেশব্যাপী ড্রিগলাম নামজ্যা (Driglam Namzha) নামক একটি আইন জারি করেন। এই আইনের অর্থ হল, সারা দেশে কেবলমাত্র ভূটানি ভাষা প্রচলিত থাকবে এবং পুরুষ ভূটানিকে ঘো (gho) নামক পোষাক এবং মহিলা ভূটানিকে কিরা (Kira) নামক পোষাক পরিধান করতে হবে[৪]। রাজকীয় সরকার মনে করে যে এই আইনটিকে সন্ত্রাসবাদীরা অপব্যাখ্যা করেছে। মানবিক অধিকার এবং নেপালি সংস্কৃতি ও ভাষাকে অবমাননা করার একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হিসাবে সন্ত্রাসবাদীরা এই আইনটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করেছে। সরকার আরও মনে করে যে নঙলপদের এই সন্ত্রাসবাদ কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন নেপালি নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ভূটানে নেপালিদের মানবিক অধিকার লংঘিত হচ্ছে — এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দেবার জন্য নঙলোপরা বহুসংখ্যক নেপালিকে ভূটান ছাড়তে বাধ্য করছে এবং নেপালের পূর্বপ্রান্তে শরণার্থী শিবির তৈরী করে সেখানে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। সরকারের মতে বহু নেপালি যারা ভূটানের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চপদে কর্মরত তারাও ভূটান ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। রাজসরকারের মতে সন্ত্রাসবাদীরা নানারকম ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে এদের শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের মতে ১৯৮৯-এর মাঝামাঝি থেকে সন্ত্রাসবাদ বিপুলাকার ধারণ করে দুটি সংস্থার মাধ্যমে। তাদের মধ্যে একটি হলো ভূটানস্ পিপলস পার্টি (BPP) এবং অপরটি হলো পিপলস ফোরাম ফর হিউম্যান রাইট্স (PFHR)[৫]।

ভূটান রাজসরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের প্রচুর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। তাদের মতে ভূটানের রাজার বিরুদ্ধে তাদের যে প্রত্যক্ষ সংঘাত, সেই সংঘাত রাজার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজার স্বৈরচারিতার বিরুদ্ধে। তাদের উদ্দেশ্য মূলত দুটি — প্রথম ভূটানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়তঃ, মানবিক অধিকারকে রাজশক্তি যাতে

শ্রদ্ধা এবং গুরুত্ব দেয় তার ব্যবস্থা করা[৬]। তাদের বক্তব্য যে রাজা তাঁর আইনের মাধ্যমে ভূটানে নেপালি জাতির মানবিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছেন। ভূটানে কেবল ভূটানি জাতির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ভূটানে বসবাসকারী নেপালি জাতিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে এথ্‌নিক্ ক্লিন্‌সিং (Ethnic Cleansing)। এদের মতে এক লক্ষ ভূটানি নাগরিকদের রাজ্য থেকে রাজা বহিষ্কার করেছেন। নঙলোপদের মতে রাজার অত্যাচারে ভূটানের দক্ষিণাঞ্চল ভীত সন্ত্রস্ত ও নিপীড়িত। তারা মনে করে যে রাজার বর্ণবৈষম্য নীতির সম্পূর্ণ শিকার হচ্ছে অগণিত ভূটানি শরণার্থী[৭]।

নেপাল সরকার জানাচ্ছেন যে, নেপালের পূর্বাঞ্চলে অগণিত শরণার্থীর অনুপ্রবেশের ফলে দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে ভীষণাকারে। এছাড়া আরও অনেকরকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন বেশ কিছু গোপন বেআইনি আশঙ্কাজনক সংস্থা নেপালে গড়ে উঠেছে। দালালরাও ভূটানিদের নানারকম লোভ দেখিয়ে শরণার্থী শিবিরে নিয়ে আসছে। বিভিন্ন রকম অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী হচ্ছে নেপালের এই শরণার্থী শিবিরে ।

নেপাল-ভূটান উভয় দেশই একমত যে একমাত্র ভারত এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই সূত্রে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পি. ভি. নরসিমা রাও মনে করেন যে, শরণার্থী সমস্যা নেপাল ভূটানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। তারা নিজেরাই মিলিত হয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ উভয় দেশের পক্ষে সমীচীন নয়[৯]।

শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে নেপালে নেপাল-ভূটান মন্ত্রীমহলের বৈঠক সম্পন্ন হয়। তার ফলস্বরূপ শরণার্থীদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে — প্রথম, নেপালি যারা ভূটানি নাগরিকতা লাভ করেছে কিন্তু ভূটান থেকে বলপূর্বক বহিষ্কৃত; দ্বিতীয়, নেপালি যারা ভূটানি নাগরিক কিন্তু স্বেচ্ছায় ভূটান থেকে বেরিয়ে এসেছে; তৃতীয়, নেপালি যারা ভূটানি নাগরিকতা লাভ করেনি কিন্তু বেআইনিভাবে নিজেদের ভূটানি নাগরিক বলে পরিচয় দেয় এবং চতুর্থ, ভূটানি যারা ভূটানে সমাজবিরোধী এবং অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত (অর্থাৎ যাদের Criminal records ছিল) এবং দেশ থেকে পলাতক। উভয় দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভূটান সরকার কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যথার্থ ও প্রকৃত ভূটানি নাগরিকদেরকে তিনি ভূটানে ফিরে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

শরণার্থীরা এখন বিভিন্ন নেতার মাধ্যমে বিভিন্ন দলে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হল নেপাল এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে ভূটানে ফিরে যাবে। শরণার্থীদের রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনকে ভারত সরকার সমর্থন করেনা সংবাদপত্রের সূত্র থেকে তা জানা গেছে। আরো জানা গেছে যে ভারত তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক অভিযানে ভারতের মাটিকে ব্যবহার করার অভিসন্ধিকে একেবারেই সমর্থন করে না। এর কারণ হল যে, ভারত-ভূটানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

বজায় রাখতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্ক ১৯৫০ সাল থেকে অদ্যাবধি সক্রিয়। এই সম্পর্কের কাঠামো হল ১৯৪৯ সালের ভারত ভূটান মৈত্রী ও বন্ধুত্বের চুক্তি।

নেপাল দরবার যদিও প্রথম দিকে এই শরণার্থীদের সমর্থনে ভূটান সরকারকে আহ্বান জানায় যে ভূটানরাজ যেন সমস্ত শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে এই সমস্যাটিকে নেপাল দরবার এখন গৃহ মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশ দপ্তরে স্থানান্তরিত করেছে — অর্থাৎ নেপাল এখন শরণার্থী সমস্যাটি নিয়ে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। নেপাল সবকার বর্তমানে আরো মনে করছেন যে শরণার্থীরা যেহেতু ভূটানবাসী কাজেই এই সমস্যাটি ভূটানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। অনেকের ধারণা যে নেপাল সরকারের আকস্মিক নীতি পরিবর্তনের কারণ হয়তো ভারত সরকারের মনোভাব। ভারত কোনমতেই শরণার্থীদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার নীতিকে সমর্থন করে না এবং এই কারণেই হয়তো বিভিন্ন শরণার্থী সংগঠন যেমন আ্যাসোশিয়েশন ফর দা ডেমোক্রেটিক রাইটস (Association for the Democratic Rights) ; ভূটানিস কোয়ালিশন ফর ডেমোক্রেটিক মুভমেণ্টস (Bhutanese coalition for Democratic movements) ; দা সাপোর্ট অরগ্যানাইজেশন্ ফর ভূটানিস বেফিউজিস্ (The support organization for Bhutanese Refugees) , এ্যাপিল্ মুভমেণ্ট কোয়ার্ডিনেটিং কাউন্সিল (Appeal movement coordinating council) বর্তমানে তাদের কঠোর নীতির থেকে সরে এসেছে। তাদের একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা, শ্রী যোগেন গাজমের যিনি তিন বছর ভূটানের কারাগারে আটক ছিলেন এক বিপুল সমাবেশে জানান --

"We are leaving for our homeland, never to return here (Nepal Camps). We are undertaking this mission to forge national reconciliation with our king. But we are not very positive about Nepal's role. Like India, it also seems to have changed its attitude towards us after last week's cycle rally in North Bengal. We want to make it clear that we are not seeking democracy or change in the political system in Bhutan. We are merely seeking our rights to reenter our country."[১৩]

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ঘটনাবলীর কোন নিশ্চিত পরিণতি অনুমান করা দুঃসাধ্য। আসলে হিমালয় অঞ্চল জুড়ে নানা ধরনের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন হিমালয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষত নেপাল ও ভূটানের মধ্যে পারস্পরিক সামগ্রিক সম্পর্ক কি ধরনের রূপ নেবে তারই উপর নির্ভর করছে আলোচ্য সমস্যার গতি প্রকৃতি।

সূত্র নির্দেশঃ

1 Royal Government of Bhutan. Ministry of Home Affairs, Department of Information, **Anti-National Activities in Southern Bhutan -- An Update on the Terrorist Movement,** Thimpu, 1991 p-34

2. Ibid. P-37

3 Ibid P-42

4 Ibid P-43

5 Royal Government of Bhutan. Ministry of Home Affairs Department of Information **Anti-National Activities in Southern Bhutan : A Terrorist Movement,** Thimpu 1991

6 Peoples Forum for Human Rights Bhutan (PFHRB). **Bhutanese Strugle for Human Rights and Democracy : Charges and counter-charges,** presented to the seminar on Bhutanese Refugees and Human Rights Calcutta on 26 March 1995 P 1

7 Peoples Forum for Human Rights. Bhutan (PFHRB), **Bhutan : Ethnic cleansing in the Himalayas : A Documentation on Human Rights Violations is the kingdom of Bhutan,** Kathmandu 1994 P 1

8 Girish Chandra Regmi, "Nepal in 1992", **Asian Survey,** February 1993

9 Pranay Sharma, "India not to mediate on Bhutan Refugees'. **The Telegraph,** 29 January 1996 P 5

10 Keshav Pradhan. "150 Bhutanese begin march to Thimpu" **The Telegraph,** 15 January 1996 P 6

ভারত-তাই সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া ঃ তাই-অহম পর্বের ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য

লিপি ঘোষ ও অনসূয়া বসু রায়চৌধুরী

বর্তমান থাইল্যাণ্ড বা প্রাচীন শ্যামদেশ ভারতবর্ষের সরাসরি প্রতিবেশী রাষ্ট্র না হলেও দীর্ঘকাল ধরেই দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান। একদিকে যেমন ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগোষ্ঠী উপস্থিত হন শ্যামদেশে, অন্যদিকে তেমনি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক অভিবাসনের পর্যায়ে শ্যামদেশ থেকে ভারতবর্ষে আগমন ঘটে তাই (Tai) উপজাতির মানুষজনের। ঐতিহাসিকেরা গবেষণার মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি যথাযথরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঐতিহাসিক তাই-অভিবাসন ও তার ফলশ্রুতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ অসম রাজ্যের উত্তরাংশে তাই প্রজাতির অনুপ্রবেশ ও ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। এই অভিবাসনের সূত্রপাত ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তাই প্রজাতির 'আহম' গোষ্ঠীটিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে দীর্ঘ ৬০০ বছর সময় জুড়ে। ১২২৮-১৮২৬ পর্যন্ত এরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব চালায়। পরবর্তী পর্যায়ে 'অহোম' ব্যতীত অন্যান্য যে সকল গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটে তারা হল 'খামতি' 'ফাচে' বা ফাকিয়াল, 'তুরং', 'আইতন', 'খাম-ইয়াং' এবং 'নোরা'। তাই প্রজাতির জনগণের মূল বাসভূমি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। এবেনহার্ড-র (Ebenherd) মত ঐতিহাসিকেরা মনে করেন — তাই প্রজাতির জনগণ ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে মধ্য এবং পূর্ব চীনে রাজত্ব করত। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। কিন্তু কালক্রমে চীনারা শক্তিশালী হয়ে উঠলে ক্রমেই তাই সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। মূলতঃ চীনাদের চাপের মুখে এরা অন্যত্র অপসারিত হতে শুরু করে। ক্রমেই এরা দক্ষিণমুখে অভিবাসন শুরু করে এবং ইরাবতী, সালউইন, মেনাম, মেকং এবং ব্রহ্মপুত্র নদীকে ঘিরে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে[১]। অন্যদিকে, আর্থার ফেয়ার এবং ম্যাক্সমুলারের (Arthur Phayre ও Maxmuller) মত ঐতিহাসিকদের মতে 'তাই' প্রজাতির জনগণ যারা ব্রহ্মদেশে 'শান' নামে পরিচিত তারা মূলতঃ মধ্য এশিয়ার জনগণ। মধ্য এশিয়া থেকেই তাঁরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে মেকং, মেনাম, ইরাবতী ও ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলে জনবসতি গড়ে তোলে[২]।

তাই প্রজাতিটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে সুকাফা বা চাও-লুং-সো-কা-পা'র নেতৃত্বে (১২২৮-১২৬৮) পাটকাই পর্বতাঞ্চল অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে উত্তর আসামে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম তাই-অহম রাজ্য। সুকাফা চীনের মন-কাওয়াং অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে হুকাং উপত্যকা অতিক্রম করে পাটচাই পর্বতাঞ্চলে পৌঁছান। পথে বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠী সমূহের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন[৩]। এরপর মারুকা, হুকাং, তিথাং, লাতিমা, লাংপান, টারু প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামগুলিকে জয় করে স্বীয় প্রভাবাধীন একটি অঞ্চল গড়ে তোলেন কাং-খ্রমন (kang-khrumon) নামক জনৈক সেনাপতিকে সেই অঞ্চলে শাসক নিযুক্ত করে তিনি নিজে অগ্রসর হন ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী ডিহং (Dihong)-র দুই প্রান্তে তিনি তাই রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি দীর্ঘ ৩৬ বছর রাজত্ব করার পর ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তাই সম্প্রদায়ের আগমনের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'তাই-অহম' ব্যতীত তাই সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য কয়েকটি গোষ্ঠী অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিভিন্ন সময়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোষ্ঠীটির অভিবাসন ঘটে মূলতঃ শরণার্থী হিসাবে। বর্মী ও কাচিনদের অত্যাচারের ফলেই পূর্ব ভারতে অনুপ্রবেশ করে এরা। এদের অন্যতম প্রধান গোষ্ঠীটি 'খামতি' (Khamti) নামে পরিচিত। উত্তর ব্রহ্মের শান বংশীয় শেষ স্বাধীন রাজ্য ছিল মোগং (Mogong)। বর্মীরাজা আলোমপায়া (Alompaya) অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই মোগং রাজ্যটি অধিকার করেন। এর ফলস্বরূপ কিছু সংখ্যক 'তাই-খামতি' উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বর্তমান লখিমপুর জেলার সীমানা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। এই অঞ্চলে বর্তমান আসামে "Great Khamti Land" নামে পরিচিত[৪]।

খামতিদের পাশাপাশি তাই প্রজাতিভুক্ত 'ফাকে' বা 'ফাকিয়াল' নামক একটি গোষ্ঠীও মোগং অঞ্চল পরিত্যাগ করে আসামে চলে আসে আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম দিকে তারা বুড়ি ডিহিং অঞ্চলে এবং পরবর্তীকালে জোড়হাট অঞ্চলে এবং শিবসাগর এলাকার বিভিন্ন অংশে বসতি গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে যখন বর্মীরা আসাম আক্রমণ করে তখন অন্যান্য শান প্রজাতির মানুষজন পুনরায় মোগঙে প্রত্যাবর্তন করে এবং এরও পরে এই অঞ্চলটি ইংরাজ অধিকার ভুক্ত হয়। খামতিদের মত 'ফাকিয়াল'রাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ফাকিয়ালদের সংখ্যা ছিল ৫৬৫ জন[৫]।

অপর উল্লেখযোগ্য তাই প্রজাতিভুক্ত গোষ্ঠীটি হল নোরা (Nora)। অন্যান্যদের মত এরাও কাচিনদের অত্যাচারের চাপে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আসামে অনুপ্রবেশ করে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে এই 'তাই-নোরা' গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা ছিল ৭৫১[৬]।

'তাই অহম' প্রজাতির অপর গোষ্ঠীটি আসামে 'তুরং' (Turong) বা 'তাই রং' (Tairong) নামে পরিচিত। উত্তর ব্রহ্মদেশ থেকে আগত এই গোষ্ঠীটি তুরংপানি নদীতীরে এসে বসবাস শুরু করে। এই নদীর নামানুসারেই এদের নামকরণ হয় বলে মনে করা হয়। ১৮৯৯ র আদমসুমারি অনুসারে এদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০১'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিবাসনকারী তাই প্রজাতিভুক্ত শেষ গোষ্ঠীটি হল আইতোনিয়ান (Itonian)। এরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম মাত্র ১৬৩ জন। এরা মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং নাগা পর্বতমালার চতুস্পার্শ্বে ও শিবসাগর জেলায় এদের বাস।

উপরোক্ত অংশের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তাই প্রজাতির জনগণ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আসামের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন অংশে বিস্তৃতি লাভ করে। এই দুই পর্যায়ের অভিবাসনকারীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে তাই-অহমরাই নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করে'।"

অহম রাষ্ট্র নির্মাণে প্রথম যুগের চরিত্রটি ঐতিহাসিক মহলে একটি বিতর্কিত বিষয়। বিতর্কটি মূলতঃ আবর্তিত হয় শাসকশ্রেণীর ভারতীয় ধর্ম বা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মনোভাবকে কেন্দ্র করে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে — অহম রাজারা শাসনকার্যের সুবিধার্থে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করে নেন, যখন অন্যদল বিশ্বাস করেন যে আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে প্রাধান্য দিলেও অহম রাজারা কখনোই প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাননি।

প্রথম গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক মহলে বিশ্বাস করা হয় যে, রাজ্য বিস্তারের প্রথম দিকে অহম রাজারা হিন্দুধর্ম বা ভারতের নিজস্ব ধর্ম বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাই রাজাদের আগ্রহের বিষয় ছিল মূলতঃ রাজ্য জয় বা ভূখণ্ড দখল এবং এ বিষয়ে তাঁরা এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে ধর্মের প্রতি তাঁরা দৃষ্টিপাত করেননি। ফলতঃ এইযুগে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধর্ম 'ফ্রা লুং' (Phra-Lung) আচরণেই কালাতিপাত করতেন। কিন্তু ধীরে রাজ্য পরিচালনার কার্যে ধর্মের গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষের কাছাকাছি আসার জন্য তাঁরা হিন্দুধর্মের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেন। প্রথম তাই অহম রাজা যিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন তিনি হলেন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালীন রাজা জয়ধ্বজ। তাঁর পূর্ববর্তী যুগে অহম রাজাদের প্রতি হিন্দুধর্ম বিষয়ে পরধর্ম সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা গেলেও রাজা স্বয়ং ঐ ধর্ম গ্রহণ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্য মতের প্রভাব প্রথমে রাজপরিবারে এবং পরে রাজসভার গণ্যমান্যব্যক্তিদের উপর লক্ষণীয়। অপরদিকে ষোড়শ শতাব্দীর 'নয়া বৈষ্ণববাদী' দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হন বলে এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস[১০]।

এই মতের বিরোধী মতাবলম্বী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর বিশ্বাস, অহম রাজারা কয়েকজন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও সামগ্রিকভাবে তাঁরা নিজেদের ফ্রা-লুং ধর্মাচরণ থেকে বিরত হননি। এই ধর্মানুসারেই অহম রাজারা পূর্বপুরুষদের নির্দেশ অনুসারে স্বীয় ক্ষমতা রক্ষার তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। এছাড়া ফ্রা-লুং ধর্মানুসারেই তাঁরা রাজার ঐশ্বরিক

উৎপত্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রজাহিতকামী অহম রাজারা কখনো স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী হন নি। এঁরা তাঁদের যুক্তির সপক্ষে বলেন — অহম রাজারা অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁরা কখনো বিজিত অংশের জনগণের উপর অত্যাচার চালাননি বরং স্থানীয় মানুষজনের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে নিয়ে নূতন শাসকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁদের রাজ্য শাসনের এই নীতিটি স্বাভাবিক ভাবেই জনগণকে আকৃষ্ট করে। অর্থাৎ শান্তি ও সহাবস্থানের নীতিই অহম রাজাদের সাফল্যের কারণ ছিল — ধর্মাচরণ নয়। দ্বিতীয়তঃ এঁরা আরো বলেন যে তাই-অহমরা জলসেচ নির্ভর কৃষি পদ্ধতির (Wet-rice cultivation) প্রচলন করেন। এই নবাগত পদ্ধতি স্থানীয় জনগণকে কৃষি বিষয়ক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ বহিরাগত প্রজাতিটির কৃষি অভিজ্ঞতা এদেশে তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ[১১]। সর্বোপরি, তাই-অহম রাজারা স্থানীয় শাসক পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম হন[১২]।

এই দুই বিপরীত ধর্মী মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তাই-অহমদের উপর হিন্দুধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল — এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ নেই - তেমনি কয়েকজন মাত্র রাজা ব্যতীত সকল তাই-জনসংখ্যা হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন অথবা তাই অহমরা সকলেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন একথাও সত্য নয়। আজও উত্তর আসামের অহম অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যপকহারে তাই দেশীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও ধর্মবিধি প্রতিপালিত হয়[১৩]।

আলোচনা প্রসঙ্গে তাই-অহম রাষ্ট্র নির্মাণে প্রথমযুগীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে পৃথক করা যায়। প্রথমতঃ, অহম রাজারা ঐশ্বরিক উৎপত্তিতে বিশ্বাসী হলেও স্বৈরাচারী ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ পূর্বপুরুষদের নির্দেশানুযায়ী তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্য স্বীয় পরামর্শদাতাদের সাহায্য নিয়ে একধরনের সংবিধানসম্মত উপায়ে রাজ্য শাসনের চেষ্টা করতেন। তৃতীয়তঃ, প্রজাদের সার্বিক কল্যাণ ও ন্যায়-সাধন তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল[১৪]।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, প্রাচীন তাই-অহম রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমে ভারতীয় হিন্দু এবং তাই-ফ্রা-লুং সংমিশ্রণে এক নবগঠিত ব্যবস্থারূপে স্বীকৃতি পায়। ১৪৯৭ থেকে তাই রাজারা যেমন হিন্দু নাম ও সংস্কৃত ভাষার উপাধিসহ রাজ্য শাসন শুরু করেন, তেমনি রাজদরবারে অহম-ভাষাই প্রচলিত হয়। কিন্তু হিন্দু প্রভাবের মাত্রা ছিল অধিকতর, ফলে তাই-অহমরা নিজেদের বর্ষগণনার প্রচলিত রীতি পরিবর্তন করে শকাব্দের ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রমে 'তাই-অহম' ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয় অসমীয়া ভাষা। কিন্তু দুই সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের চিত্রটি পরিষ্কার। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে অহমদের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাবের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এছাড়া অহমদের নিজস্ব তাই-সমাজের পুরোহিত শ্রেণীটিও হিন্দুধর্মের প্রভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন[১৫]।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই-অহম অভিবাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলতঃ দুইটি পর্যায়ে অভিবাসনকারী অহমরা এদেশে স্থানীয় ধর্মব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে এক বিচিত্রধর্মী মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় রীতিনীতি সম্পর্কে অহম রাজত্বের প্রথম অধ্যায় ছিল উদাসীন। রাজনৈতিক কারণে পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও তারা এই ধর্মের কুপ্রভাব গুলিকে পরিষ্কার করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এরা হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতাকে বর্জন করে। তবে হিন্দুধর্ম বিরোধী একটি অন্তঃস্রোত বরাবরই উভয় সংস্কৃতির মধ্যে একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এছাড়া অর্থনৈতিক কারণ বা জলসেচ ব্যবস্থায় কৃষিকার্য নির্বাহের পদ্ধতিও স্মরণীয়। অহমদের আনীত এই নতুন ধরনের কৃষিব্যবস্থাই এদেশে তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি ছিল— একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

সূত্র নির্দেশঃ

১। W Ebenherd. **History of China**. London. 1950

২। A P Phayre **History of Burma**. London 1883

৩। Padmeswar Gogoi. **The Tai and Tai Kingdoms : With a Fuller Treatment of the Tai - Ahom Kingdom in the Brahmaputra Valley**, Gauhati. 1968

৪। ঐ

৫। G A Grierson. **Linguistic Survey of India Vol. II, London, 1904**, পৃঃ-২৮৩

৬। ঐ

৭। Gogoi. পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮৫

৮। ঐ

৯। তাই-প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। **ভারতবর্ষে** এদের ৬ টি গোষ্ঠী অহম, খামতি, আইতন, ফাকে, খাম-ইয়াং ও নোরা নামে পরিচিত। **ব্রহ্মদেশে** এরা খামতি, শান, সুন এবং লাএম্ নামে পরিচিত। **থাইল্যাণ্ডে** এদের গোষ্ঠীসমূহ হল — থাই, লাও-থাই, ইউয়ান প্রমুখ। **লাওসে** তাই গোষ্ঠীগুলি হল — লাও, উআন, লুয়ে, তাই - ড্যাঙ্ নুয়া, তাই-ডাম্ প্রভৃতি। **ভিয়েতনামে** এরাই তাই-ডাম্, তাই-খাও, তাই-ড্যাঙ্ লা-ত্তি, থস্, নাং প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সর্বোপরি চীনে এদের গোষ্ঠীসমূহ হল চুয়াং। লুইয়াই, ডাইতাই ও কাম্ প্রমুখ।

১০। Debasis Sen. "Local Influence upon the Ahoms". **Proceedings of North East India History Association** 1985. পৃঃ ১৬০-১৬২

১১। Amalendu Guha. "The Ahom Political System An Enquiry into the State Formation Process in Medieval Assam". **Social Scientist Vol II**, December, 1984

১২। Jack Goody. "Marraige Policy and Incorporation in Northern Chains", in Ronald Cohen and John Middleton ed **From Tribe to Nation**, London, 1970

১৩। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য - B. J. Terwiel, **The Tai of Assam and Ancient Tai Ritual** Vol I & II, Gaya, 1980

১৪। R. Buragohain, "Myths, Rituals and traditions : Some Aspects of State Formation in the early Tai-Ahom State", **Proceedings of the North-East India History Association** 1985.

অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন — একটি পর্যালোচনা

কিশলয় মজুমদার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের সমাপ্তি ঘটেছে। তথাপি নয়া উপনিবেশবাদী কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বের শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শোষণ করে চলেছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক মেরুকরণের সংজ্ঞায় বিশেষভাবে ধনী দেশগুলিকে "উত্তর" নামে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 'দক্ষিণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই দুই মেরুর মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানায়। এই শতাব্দীর সাতের দশক থেকে এই দাবী তীব্রতা লাভ করতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তরের শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি স্বেচ্ছায় এই দাবী মেনে নেয় নি। আবার অসম শক্তি নিয়ে উত্তরের শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েও দক্ষিণের দেশগুলির পক্ষে তাদের দাবীগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার পথই বেছে নিয়েছে। কিন্তু উত্তরের সদিচ্ছার অভাবে এই আলোচনাও ফলপ্রসূ হয় নি। ফলে তারা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আঞ্চলিক সহযোগিতা ও যৌথ আত্মনির্ভরশীলতার ধারণাটি গুরুত্ব অর্জন করেছে।

এই শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষ পর্ব থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কমিটি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে[১]। অনেক দেশই নিজেদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যৌথ আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি ১৯৭৬ সালের মে মাসে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আংকটাড সম্মেলনের পরেই বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে[২]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি ১৯৬৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম গুরুত্ব লাভ করে[৩]। পরবর্তী প্রতিটি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনেই এই বিষয়টি গুরুত্ব অর্জন করেছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এই ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণাটি গড়ে ওঠার কারণ হিসবে বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলি উপলব্ধি করেছে যে, তাদের পক্ষে এককভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান করা সম্ভব নয়। আমরা এই প্রবন্ধে

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার যৌক্তিকতা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের তাৎপর্য আলোচনা করতে চাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সহযোগিতামূলক সংস্থা গড়ে উঠেছে। যেমন, ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি, ল্যাটিন আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন, অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি, এশীযান (ASEAN) নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, এশিয়া - প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন। এজিয়ানের সাফল্যই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গড়ে তোলার প্রেরণা জোগায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গড়ে তোলার ধারণা এই শতাব্দীর ৮-এর দশকেব প্রথম থেকে শুরু হয়। ১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়ায়ুব রহমান দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সংস্থার সৃষ্টি করেন[৪]। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের ৮ তারিখে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ক-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি হল বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

যৌক্তিকতা ঃ এই অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে ওঠার পশ্চাতে বিশেষ যৌক্তিকতা রয়েছে। প্রথমতঃ একক প্রচেষ্টায় দক্ষিণ এশিযার দেশগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক - সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর অক্ষমতা, উন্নত দেশগুলির বাণিজ্য ও সাহায্য দানের নীতি, দরিদ্র দেশগুলির ব্যাপক ঋণভার, রপ্তানী ক্ষেত্রে হতাশা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে যৌথ প্রয়াস ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাস্তবোচিত বলে প্রতিভাত হয়[৫]।

দ্বিতীয়তঃ উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাব বিশেষ অর্থবহ রূপ প্রদানের জন্য এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ[৬]।

তৃতীয়তঃ বহুজাতিক সংস্থা সমূহের প্রভাব হ্রাস করার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা কাম্য বলে বিবেচিত হয়[৭]।

চতুর্থতঃ দক্ষিণ এশিয়া একটি একক-পরিবেশীয় অবস্থান বা "সিংগল ইকো সিস্টেম"-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে[৮]। এছাড়াও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা স্থাপন, এই অঞ্চলের দেশগুলির নিরাপত্তা, বহিঃশক্তির আক্রমণের সম্ভাবনা দূরীকরণ, উত্তেজনা প্রশমন প্রভৃতি কারণে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার যৌক্তিকতা ক্রমবর্ধমান[৯]।

এক কথায় বলা যায়, উন্নয়নমূলক আঞ্চলিকতাই দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি[১০]।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও আঞ্চলিক সংহতি ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব নয়। দক্ষিণ এশিয়া

উপমহাদেশের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়াই আঞ্চলিক সহযোগিতার পূর্ব শর্ত।

দিল্লী ঘোষণাপত্র ঃ—

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতির (সার্ক) অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালের ২রা মে থেকে ৪ঠা মে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সার্কভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্র বা সরকারের প্রধানগণের সর্বসম্মতিক্রমে দিল্লী ঘোষণা পত্র গৃহীত হয়। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সার্কভুক্ত দেশগুলি[১১]। শুল্ক ছাড়ের জন্য পাকিস্তান ৩৫টি, শ্রীলঙ্কা ৩১টি, মালদ্বীপ ১৭টি, ভারত ১০৬টি নেপাল ১৪টি, বাংলাদেশ ১২টি ও ভুটান ৭টি দ্রব্য ও পণ্যের তালিকা পেশ করে[১২]। "সাপটার" বাস্তবায়ন এই অঞ্চলের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলির স্বাধীনতার বিষয়ে নিঃসন্দেহে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। "সাপটা" কে এক ব্যাপক কর্মসূচী হিসাবে অভিহিত করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। তিনি অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেন। সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই আশা ব্যক্ত করে যে, "সাপটা" বাস্তবায়িত হলে আন্তঃ-সার্ক সদস্য রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই.এম.এফ) ও বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত নীতিগুলির বাস্তবায়নের ফলে সার্ক সদস্যদের অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ মসৃণ হবে[১৩]। দিল্লী ঘোষণাপত্রে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়নমূলক ভাণ্ডার (এস.এ.ডি.এফ) আঞ্চলিক ভাণ্ডার এবং সামাজিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ভাণ্ডার গঠনের কথা বলা হয়[১৪]।

এই ঘোষণায় দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) গঠনের কথাও বলা হয়[১৫]।

এই ঘোষণায় সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে[১৬]।

সন্ত্রাসবাদ দমনে আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বদানের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদের বিস্তার এই উপমহাদেশের সমাজজীবনে নিরাপত্তার অভাব, নৈরাজ্য ও শৃঙ্খলাহীনতা তৈরী করে, বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে সন্ত্রাসবাদের ফল হিসেবে কোথাও দেখা যায় জাতিবিদ্বেষের ভয়ঙ্কর রূপ, কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের, আবার কোথাও মৌলবাদের। গুপ্তহত্যা, অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবী, দূরনিয়ন্ত্রিত বোমারু বিমানের হানা, এমনকি ক্ষেপণাস্ত্র হানায় বিমান নামানো— বিভিন্ন গোষ্ঠী এই সব কাজে লিপ্ত। একদেশের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী অন্য প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় ও শিক্ষালাভ করছে। কাজেই সন্ত্রাসবাদ দূর করার ব্যাপারে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা

ও সমন্বয় বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, সন্ত্রাসবাদ, জনসাধারণের জীবন, সম্পত্তি, আর্থ সামাজিক উন্নতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি, সহযোগিতার দিক থেকে এই প্রবণতা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি 'সার্ক' এর দৃঢ় দায়বদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করে এই ঘোষণাপত্র এই আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনায় তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্মরণ করে[১৭]।

সাম্প্রতিককালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটলেও এখনও জাতিবিদ্বেষ, বিশ্বে নয়া উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশের মধ্যে বৈষম্য বর্তমান। সুতরাং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নেই একথা মনে করা বোধ হয় যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আন্দোলনে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের দাবী আদায়ের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'সার্ক'ই একমাত্র আঞ্চলিক সংস্থা, যা তার সনদে জোট নিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শের প্রতি তার আস্থা জ্ঞাপন করে ঐ নীতি ও আদর্শকে মেনে চলার কথা উল্লেখ করেছে[১৮]।"

এই সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক সমঝোতা সম্পর্কে উরুগুয়ে রাউণ্ডের সফল পরিসমাপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছে[১৯]।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ সমর্থন ও সাহায্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্ক নেতৃবৃন্দ মানব অধিকার রক্ষায় তাদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি সার্ক-এর দায়বদ্ধতার উল্লেখ করে এই ঘোষণাপত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শক্তিবৃদ্ধির সংকল্প ঘোষণা করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে শান্তি, নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ, উন্নয়ন, বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় মাধ্যম বলে উল্লেখ করা হয়[১৯]।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে, এই ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির উপর জোর দেয়[২০]।

পরিবেশের অবনতি এবং বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগের বারবার সংঘটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই ঘোষণা। সার্কভুক্ত দেশগুলির পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ এবং তার অবনতি রোধের কর্মসূচী জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন স্তরে বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে[২১]।

বর্তমান[১৩]। এই উপমহাদেশের দাবিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে না পারলে এবং অধিকাংশ জনগণের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন না ঘটানো পর্যন্ত কোন রক্ষণযোগ্য উন্নযন সম্ভব নয়। তাই সার্ক সম্মেলনের এই সংকল্প নিঃসন্দেহে বাস্তবোচিত ও প্রশংসনীয়।

এই ঘোষণায় নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে[১৪]। একথা সত্য যে, আইনগত বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও নারী-পুরুষের সাম্যব্যবস্থা এই উপমহাদেশে আজও প্রতিষ্ঠা পায়নি। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন জাতিরই উন্নতি সম্ভব নয়। অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন কর্তৃক এই দশককে "কন্যা সন্তানের সার্ক দশক" রূপে ঘোষণা নাবীর মর্যাদার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধেরই পরিচায়ক।

অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর যুগে আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে[১৫]। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐকমত্য ও সংহতি। তবে ভারত সম্পর্কে সার্কভুক্ত কোন কোন সদস্য রাষ্ট্রেব এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ভীতির অস্তিত্ব আছে[১৬]। তা হল, বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তাদের স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হবে না। যদিও এই পূর্বানুমান কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কথা বলা যায় না। বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সরকারকে এই সংশয় সম্পর্কে সচেতন থেকে তা উৎপাটিত করবার দায়িত্ব নিয়েই কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তা না হলে সার্ক-এর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে এবং সার্ক এর কার্যকারিতায় সংশয় দেখা দেবে। সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বিরাজমান ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো দরকার। তা দ্বিপাক্ষিক স্তরেই আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। সার্ক-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার ধারণা তাদের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ[১৭] এবং আঞ্চলিক সংহতির মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়া আন্তর্জাতিক সংস্থায় তার কার্যকরী বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে।

ধনী দেশগুলির সংগঠন 'জি সেভেন'-এর মত নিজেদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং তার সঠিক কার্যকারিতার মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব বিকাশ লাভ করবে। সার্ক-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়ক হবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখেই অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের কথায়, "একটি হল চ্যালেঞ্জ, অন্যটি সুযোগ"। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা করব এবং পারস্পরিক সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করব।

বস্তুতঃ সার্ক দশ বছব ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির সুনিশ্চিত করার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে দিল্লী সম্মেলনেব ঘোষণাপত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে[৮]।

সার্কের বিগত সাতটি সম্মেলনে কোন আশাপ্রদ ফল লাভ করা সম্ভব হয় নি। এর অন্যতম কারণ হল সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদেব আঞ্চলিক, দ্বিপাক্ষিক সমস্যার উপব বেশী গুরুত্ব আবোপ করেছে। আবাব কেউবা নিজের অমীমাংসিত সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন, ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা, ভূটান ও নেপাল উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষযগুলির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। অষ্টম সম্মেলন অনেকাংশেই দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলিব উপর গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিশেষ করে বাণিজ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে[১১]। বস্তুতঃ বহুপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই সার্ক-এর সৃষ্টি। তাই এই সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ স্পর্শকাতর দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি পরিহার করে এই সংগঠনের মৌল নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখায সচেষ্ট হয়েছেন। এখানেই অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনেব গুরুত্ব। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এক নবতর দৃষ্টিভঙ্গি সার্কভুক্ত দেশগুলিকে আজ উন্নয়নশীলতার নতুন আগ্রহে সঞ্জীবিত কবতে পেরেছে।

সার্ক সদস্য রাষ্ট্রগুলির একথা মনে রাখতে হবে যে, সার্বভৌমত্বেব উপব প্রতিষ্ঠিত সমতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, বাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার নীতির ভিত্তিতে সহযোগিতাই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি।

সূত্র নির্দেশঃ

1 Atiur Rahaman **Political Economy of SAARC**, The University Press Limited Red Cross Building 114 Motijheel Commercial Area, P O Box 2611 Dhaka 2 Dec, 1985 p 1 পৃঃ ১

2 **Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development,** Fourth Session Nairobi Vol-III Basic Documentation United Nations Document (TD/192) P 240

3 Governement of India Ministry of External Affairs, **India, U.A.R., Yugoslavia Conference,** New Delhi, 1966, P 29

4 S D Muni and Anuradha Muni, **Regional Cooperation in South Asia,** New Delhi National Publishing House, 1984

5 Atiur Rahaman, op cit P P 5-6 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫-৬.

6 Ibid P-5 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫

7 Ibid P-6 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬

8 Godfrey Gunatilleke, **Co-operation Among Small Nations in Asia in the Context of the changing Asian Political Economy,** Colombo Marga Institute, September, 1979, পৃষ্ঠা ১৩-১৪ (P P 13-14)

9 Atiur Rahaman, op cit P.6 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ৬

10. Emajuddın Ahamed, Regional Cooperation in South Asia and India's Role, in **Foreign Policy of Bangladesh : a Small State's Imperative,** Edited by Emajuddinn Ahamed, The University Press Ltd., Red Cross Building, 114, Motijheel Commercial Area P O Box 2611, Dhaka 2, Bangladesh, 1984. পৃষ্ঠা ১৩৩

11 Asian Recorder, May 28-June 3, 1995, Vol. XXXXI, No 22, P 24817. পৃষ্ঠা ২৪৮১৭

12. Asian Recorder, May 21-27, 1995, XXXXI No. 21, P. 24803 পৃষ্ঠা ২৪৮০৩

13 John Cherian, "On a New Course, SAARC Summıt focus on Trade", Front line, June 2, 1995. P. 41.

14 Asian Recorder, op.cit. P. 24801 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪৮০১

15 Asian Recorder, op.cit. P 24803 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪৮০৩

16 Asian Recorder, op.cit. P. 24801 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪৮০১

17. The Economic Times, Calcutta, 4th May, 1995.

18. K.R. Narayanan, "Regional Co-operation in Common Interest", Mainstream, Vol XXXIII No. 23, April 29, 1995. P.8.

19. Asian Recorder, op. cit. P. 24803 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪৮০৩

20. The Economic Times, Calcutta, 5 May, 1995

21. Ibid. ঐ

22. Asian Recorder, op.cit. P 24801. প্রাগুক্ত পৃ: ২৪৮০১

23. Emajuddin Ahamed, op.cit P.P. - 128 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১২৮

24. Asian Recorder, op.cit.

25. Eric Gonsalves, "South Asian Co-operation, An Agenda and a vision for the Future", Mainstream, op.cit. P P 10-11. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১০—১১

26. Pran Chopra, "Regional Cooperation", in Dharam dasan(ed) cooperation Among South Asian Nations. (Studies in South Asian Regional cooperation) Shalimar Publishing House, 27, Prafullanagar, Lanka, Varanası - 221005. P.4. পৃষ্ঠা ৪

27 Eric Gonsalves, op cit. P. 15 প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৫

28 The Economic Times, op cit. প্রাগুক্ত

29. Asian Recorder, op.cıt P. 24817. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪৮১৭

সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ পর্বে ট্রটস্কী চর্চা
(১৯৮৫-১৯৯১)

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ পর্ব, অর্থাৎ গর্বাচিভ যুগে (বা পেরেস্ত্রোইকা-গ্লাসনস্তের যুগে), সোভিয়েত সমাজে বড় রকম আলোড়ন শুরু হয়। এক দশক পরে পিছনে তাকালে শেষ অবধি যারা বিজয়ী হল, সে পথ বেছে নেওয়া হল, তাকে অনিবার্য বলার একটা প্রবণতা থাকে। কিন্তু ইতিহাসে অনিবার্য খুব কম বিষয়ই। বাস্তবে, পেরেস্ত্রোইকা যুগ অনেকগুলো দরজা আংশিকভাবে খুলে দিয়েছিল। শাসক দল ও শাসক সামাজিক স্তরের মধ্যে টানাপোড়েন ছিল। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭-র গোড়া পর্যন্ত গর্বাচিভ ধনতন্ত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে কোনো পদক্ষেপ নেন নি। কিন্তু শাসকদের সামাজিক ভিত্তি নড়বড়ে, এবং অর্থনীতিতে কড়া পদক্ষেপ নিতে হলে জনমত সংহত করতে হবে, এই বোধ তাঁর ছিল। খোলা মন (গ্লাসনস্ত) এবং গণতন্ত্রীকরণের যে বক্তব্য তিনি রাখেন, তার সরকারী উদ্দেশ্য ছিল এটাই। কিন্তু এই সুযোগে নীচু তলা থেকে নানারকমের চাপ আসতে থাকে। সমাজতন্ত্রের নবীকরণের আশা দেখা দেয়। গর্বাচিভের বাজারমুখী পথ যখন উন্মোচিত হয়, তখন থেকে এর 'মার্ক্সবাদী' তাত্ত্বিক সমর্থনের উদ্দেশ্যে অপব্যবহার শুরু হয় নিকোলাই ইভানোভিচ বুখারিনের মতামতের।

গ্লাসনস্তের যুগে স্তালিনবাদের হাতে নিহত ও নির্যাতিত বহু পুরনো কমিউনিস্টের সম্বন্ধে নতুন পর্যালোচনা হয়। কিন্তু সরকারী-আধা সরকারী পক্ষ অনড় থাকে লেভ ডেভিডোভিচ ব্রনস্টাইল বা ট্রটস্কী সম্বন্ধে।

এর কারণ এই নয় যে, ১৯৮৫-র পরও সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো বড় ট্রটস্কীবাদী বিরোধী পক্ষ ছিল। কিন্তু ট্রটস্কী এমন ধাঁচের স্তালিনবাদ বিরোধী ছিলেন যে, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের নয়া অবতারের যুগেও তাঁকে আত্মসাৎ করা অসম্ভব ছিল। তিনটি মূল কারণের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ট্রটস্কীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শাসক দল শ্রমিক দল ছিল না, শাসকরা ছিল একটি পরগাছা আমলাতন্ত্র। উপর থেকে সংস্কার নয়, বরং তলা থেকে নতুন বিপ্লব সংগঠিত করেই তাদের উচ্ছেদ করতে হবে, এই ছিল তাঁর মত।[১] দ্বিতীয়ত, ট্রটস্কী সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে যে নীতি প্রস্তাব করেছিলেন, তার সঙ্গে পেরেস্ত্রোইকা-গ্লাসনস্তের মৌলিক প্রভেদ ছিল। তাঁর মতে, হঠকারীভাবে যৌথখামার গঠন ও অতিক্রান্ত শিল্পায়ন শুধু ভ্রান্ত

ছিল না, তার সঙ্গে ভ্রান্ত ছিল পূর্ববর্তী বুখারিনপন্থী নীতিও। (NEP) থেকে রাষ্ট্র ও বাজারেব দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের পথে ক্রমে বাজারের এবং মুদ্রা-অর্থনীতির পরিচিতি সংকুচিত করার কোনো বিকল্প ছিল না। আর সেই সঙ্গে আবশ্যক ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিপ্লবের অগ্রগতি।[২] "ইউরোপ আমাদেব সকলের সাধারণ বাসভূমি", এই ধরনের গর্বাচভবাদী বৈদেশিক নীতির সঙ্গেও তাই ট্রটস্কীর নীতি খাপ খেত না। আর তৃতীয়ত, একমাত্র ট্রটস্কীই স্তালিনবাদের বাস্তব বিকল্প গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। আয়তন ও প্রভাব যেমনই হোক না কেন, চতুর্থ আন্তর্জাতিকের অস্তিত্ব ট্রটস্কীকে আত্মসাৎ করার পথে একটি মৌলিক প্রাচীর ছিল। অথচ, অরওয়েলীয় কায়দায় সর্বাত্মক মিথ্যা বলা বন্ধ হওয়ার ফলে, ট্রটস্কী সম্পর্কে নানা ধরনেব তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে। ট্রটস্কীবাদীদের উদ্যোগে বিদেশ থেকে প্রকাশিত রুশ সংস্করণ ট্রটস্কীর বিভিন্ন লেখাপত্র আসতে থাকে। মহাফেজখানাগুলির রুদ্ধ কপাটের ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু তথ্য বেরিয়ে পড়ে। এমনকি ট্রটস্কীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ক্রীশ্চান জর্জেভিচ র‍্যাকভস্কির 'পুনর্বাসন' ঘটে। ফলে ট্রটস্কী নতুন করে এক সমস্যা হিসেবে দেখা দেন। বিভিন্ন যে ধরনের ট্রটস্কীচর্চা হয়, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

সবার প্রথমে আসে সরকারী ট্রটস্কী চর্চা ও তার বারে বারে ভোল পাল্টানো। দ্বিতীয় স্থানে আসে নানারকম সরকার বিরোধীদের লেখা, বিশেষত স্বাধীন ইতিহাস চর্চা। আর তৃতীয় স্থানে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন করে ট্রটস্কীবাদী মতামতের বিকাশ। এই তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধে বেশী আলোচনা করা হবে না, কারণ ১৯৯১-এর পরই এই ধারা বেশী সংহত হয়।

শয়তান থেকে ট্র্যাজিক খলনায়ক : সরকারী ধারাভাষ্যের নতুন বিকৃতি

২৪শে আগস্ট ১৯৪০, স্তালিনবাদী চর মার্কেডর ট্রটস্কীকে হত্যা করার চারদিন পর, প্রাভদায় খবরও বেরোয় এই শিরোনামে : একটি আন্তর্জাতিক গুপ্তচরের মৃত্যু। অনন্তকাল ধরে লেনিনবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের চর, সমাজতন্ত্র গঠন বিরোধী — এই ছিল সরকারী ভাষ্যে ট্রটস্কীর ছবি। বিংশতি সি. পি. এস. ইউ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের ভাষণ জানিয়ে দিল, স্তালিন ১৯৩৮ থেকে (অর্থাৎ স্তালিনবাদীদের একাংশের মাথা কাটার সময় থেকে) কিছু বিচ্যুতি করলেও ট্রটস্কী-জিনোভিয়েভ ইত্যাদিদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল সঠিক।

কিন্তু ১৯৬০-এর দশক থেকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন সীমিতভাবে হলেও ট্রটস্কীবাদী প্রভাব বাড়তে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিরোধীদের মধ্যে নানারকম বিকল্প সমাজতান্ত্রিক ধারণা নতুন করে দেখা দেয়। ফলে ট্রটস্কী ও ট্রটস্কীবাদ বিরোধী পুস্তিকার সংখ্যা বাড়ে। এককালে এ কাজে অগ্রগণ্য ছিলেন বোরিস পানামারিয়েভ এবং এম ফেদোসিয়েভ। ১৯৭০-এর দশকের শেষ থেকে একটি নতুন মুখ আত্মপ্রকাশ করে। লেখকের নাম নিকোলাই ভাসেটস্কি, ইতিহাসে ডক্টরেট ও ট্রটস্কী বিশারদ।

১৯৮৪-তে ভাসেটস্কি লেখেন, ট্রটস্কীবাদীরা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ও তারা সমাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে ধনতন্ত্র ফেবাতে চায। ১৯৮৬-তে তিনি একটু অতীত চর্চা করে লেখেন. ট্রটস্কী চেয়েছিলেন যেন বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাস্ত হয়. এবং তিনি তাঁর সমর্থকদের ফ্যাসীবাদী জার্মানী ও সমরবাদী জাপানেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরী করতে বলেন।[৩] পরবর্তী পুস্তিকাটি সারা পৃথিবীতে লাখ লাখ কপি বিলি করা হয়। কিন্তু তারপর এল গর্বাচভের অন্যতম পদক্ষেপ। সোভিয়েত আইনী কর্তৃপক্ষ তিনটি মস্কো প্রহসনের মূল অভিযোগগুলি মিথ্যা বলে ঘোষণা করল। অর্থাৎ ট্রটস্কী ধনতান্ত্রিক সরকারদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন. এই বক্তব্য এতদিনে প্রত্যাহার করা হল। বিপন্ন ভাসেটস্কি এবার বক্তব্য পাল্টালেন। ১৯৮৮ সালে নোভোস্তি প্রেস তাঁর একটি প্রবন্ধ বিলি করল, যার নাম 'আধুনিক ট্রটস্কীবাদ : মতাদর্শ ও অনুশীলন'। ১৯৮৬র অপবাদ উধাও। তার বদলে আমরা পড়তে পেলাম, 'দুর্ভাগ্যক্রমে, আধুনিক ট্রটস্কীবাদীরা সর্বাগ্রে ট্রটস্কীর সেইসব অবদান অধ্যয়ন করেন না, যা তিনি করেছিলেন বিপ্লবী হিসেবে .....।' দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কাজগুলি যে কি, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া কঠিন। ভাসেটস্কি এরপর একটি গোটা বই লিখেছেন। সে প্রসঙ্গে আমরা আসব, জেনারেল ভলকোগনভের বইয়ের সঙ্গে একত্রে আলোচনার সময়ে। তার আগে দেখা দরকার, সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় আর কি বলা শুরু হল।

স্তালিন যুগ সম্পর্কে অনেকটা সত্য কথন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বর্বর অত্যাচার, কৃষক দমন, পুরনো বলশেভিকদের হত্যা, শ্রমিক শ্রেণীর উপর তীব্র চাপ ও শিল্পায়নের সামাজিক চরিত্রে আমলাতান্ত্রিকতার ফলে এবার বলা হল, স্তালিন কার্যত ট্রটস্কীর পথ নিলেন। প্রাভদা ১৬ই এপ্রিল ১৯৮৮-তে লিখল, লাখে লাখে কৃষক পরিবারের কাছে ট্রটস্কীবাদের অর্থ দাঁড়িয়েছিল অনন্ত করভার, বাধ্যতামূলক ঋণ, সমবায়দের ভেঙে দিয়ে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া ও সর্বশেষে দমন হত্যা কারাদণ্ড এবং সাইবেরিয়ায় প্রেরণ।[৪] ঐ বছরেই প্রাভদা জেনারেল ভলকোগনভের বইয়ের কিছুটা ছাপে। তাতে অতীতের মিথ্যার সবচেয়ে কদর্য অংশগুলি বাদ দিলেও বলা হয় যে স্তালিন ট্রটস্কীর ধারণাগুলিকেই বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন, এবং ট্রটস্কীর মত ছিল বোনাপার্টতন্ত্র, সীজারতন্ত্র ও সামরিক একনায়কতন্ত্র ঘেঁষা। এমন কি, তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ History of the Russian Revolution বইটি লিখেছিলেন আত্মকেন্দ্রিকতার ঝোঁকে[৫] অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশিত হয় ওগোনিয়োক এবং নাশ সভরেমেন্নিক পত্রিকায়। দ্বিতীয়টি নিরন্তর বিপ্লব তত্ত্বের পুরনো অপব্যাখ্যা (জোর করে বাইরে থেকে 'বিপ্লব' চাঁপিয়ে দেওয়া) করে বলে, ট্রটস্কীর হাতে ক্ষমতা পড়লে ইউরোপীয় জাতিদের যে কি হাল হত তা ভাবা শক্ত।[৬]

নতুন পর্যায়ের সরকারী ভাষ্যের সর্বোচ্চ স্তরের রূপরেখা অবশ্য এর এক বছর আগেই পাওয়া গিয়েছিল। রুশ বিপ্লবের সত্তর বছর উপলক্ষে তাঁর বক্তৃতায় মিখাইল গর্বাচভ বলেন যে, লেনিনের মতে ট্রটস্কী ছিলেন একজন অতিমাত্রায় নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত রাজনীতিবিদ, যিনি সর্বদা দোদুল্যমান এবং সর্বদা ঠগবাজী করেন। প্রথম

অংশটি লেনিন বলেছিলেন, কিন্তু দোদুল্যমান ও ঠগ, এগুলি লেনিন রচনাবলীতে পাবেন না। এগুলির উৎস ১৯২০-র দশকের মধ্যভাগের ট্রটস্কী বিরোধী প্রচার। গর্বাচভ আরও বলেন যে, স্তালিন ১৯২০-র দশকে সঠিকভাবে ট্রটস্কীর বিরোধিতা করেছিলেন।

তাহলে, সরকারী গল্পটা দাঁড়াল এইরকম : ট্রটস্কী প্রতিবিপ্লবী ছিলেন না বটে, কিন্তু দোদুল্যমান, আত্মকেন্দ্রিক, ঠগ এবং স্তালিন ১৯২০-র দশকে সঠিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে লড়ে ১৯৩০-এর দশকে ভুল করলেন এবং ট্রটস্কীর পথ ধরলেন।

১৯৮৯ সালে স্বীকৃত হল যে ট্রটস্কীর হত্যাকারী 'জ্যাকসন' কোনো 'মোহমুক্ত ট্রটস্কীবাদী' নয়, বরং জি. পি. ইউ-র পাঠানো চর, র‍্যামন মার্কেডর। (বাকি পৃথিবী এটা ১৯৪০ থেকেই জানত এবং জেনারেল সালাজার মেক্সিকোর পুলিশ প্রধান ও আইজ্যাক ডন লেভিন, স্পেনের পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া মার্কেডরের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে স্পেনীয় স্তালিনবাদী মার্কেডর ও 'জ্যাকসনের' অভিন্নতাও প্রমাণ করেছিলেন)। কিন্তু তারপর পর পর বেরোতে শুরু করল হত্যাকারী ও তার মদতদাতাদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রবন্ধ। এগুলিতে বলা হয় মার্কেডর বা মেক্সিকান শিল্পী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডেভিড আলফারো সিকুইয়েরোস (যিনি ১৯৪০-এর মে মাসে ট্রটস্কীকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন) এরা সবাই বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় ফ্যাসিবাদের চেয়েও নিকৃষ্ট শত্রু হিসেবে ট্রটস্কী হত্যার চেষ্টা করেন।[৭] ১৯৮৯-এর মে মাসে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ভাসেটস্কি। কমসমোলস্কায়া প্রাভদায় তাঁর সাক্ষাৎকারের শিরোনাম, 'আমি দ্বিতীয়স্থানে থাকব না'।[৮]

ভাসেটস্কি এবার জানালেন, ট্রটস্কী বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করলেও, তিনি ছিলেন অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর, অতিশয় উচ্চাকাঙ্খী এবং আমলাতন্ত্রের প্রাণপুরুষ।

ইতিমধ্যে ট্রটস্কীর সম্পর্কে ইতিবাচক ও তথ্যানুগত কিছু রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। তার 'গবেষণামূলক' উত্তরও বেরোয়। সোভিয়েত রাশিয়া পত্রিকায় ভি-ইতানভ লেখেন, 'ওরা জুডাসকে নতুন রঙে সাজাচ্ছে'। ভাপ্রোসি ইস্তোরি কে. পি. এস. এস. পত্রিকায় এল. এম. মিনায়েভ লেখেন যে নেতৃত্বের জন্য সংগ্রামের পর্বে ট্রটস্কী ও তাঁর দলবল লেনিনবাদকে বিকৃত করেন। লালফৌজ গঠনে ট্রটস্কীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন এ. ইয়া পোনোমারেভ।[৯] তিনি দাবী করেন, ট্রটস্কী বিপ্লবী নীতিতে নয়, দমননীতির মাধ্যমে সেনাবাহিনী গড়েছিলেন। এই প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য কারণ আপাতভাবে ট্রটস্কীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়। কিন্তু ট্রটস্কী তাঁর আত্মজীবনীতে বাস্তবে যা লিখেছিলেন, তা হল, যতদিন শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে, সেনাবাহিনী গড়তে হবে এবং সেখানে দমননীতি পুরো বর্জন করা যাবে না বটে, কিন্তু জারের সেনাবাহিনী ও লালফৌজের মধ্যে প্রধান ফারাক ছিল, লালফৌজ মুখ্যতঃ গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী প্রেরণায়। গৃহযুদ্ধের সময় ট্রটস্কীর ভূমিকা দেখায়, তিনি এই বিপ্লবী প্রেরণার উপরই জোর দিতেন। একদল দলত্যাগী সৈনিকদের তিনি কীভাবে ফের লালফৌজে ফেরান,

তার বিবরণ বা পুরনো জারতন্ত্রী অফিসারদের সঙ্গে 'শৃঙ্খলা'র অর্থ নিয়ে তাঁর বিতর্ক তাই দেখায়।[৯]

তবে, এ সবের মধ্য দিয়ে ট্রটস্কীর একটা নতুন ছবি তৈরি হল। প্রতিবিপ্লবী না, বরং আধা বিপ্লবী, হঠকারী, ক্ষমতালিপ্সু, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবের জন্য কাজ করেছেন, এবং শয়তান না, বরং বিয়োগান্ত চরিত্র, যাঁর চারিত্রিক ত্রুটি তাঁকে ভুল পথে নিয়ে গেল।

এই চরিত্রায়নের চূড়ান্ত রূপ পাওয়া যাবে জেনারেল ভলকোগনভের লেখা লেনিনের জীবনী ও স্তালিনের জীবনীতে এবং ভাসেটস্কির বই, 'বিলোপসাধন — স্তালিন, ট্রটস্কী, জিনোভিয়েভ : রাজনৈতিক ভবিতব্যের খণ্ডসমূহতে। তাঁদের বইগুলির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা দরকার। তারও আগে ভলকোগনভকে জানার দরকার। ভলকোগনভ ১৯৮০-র দশকের শেষদিক থেকে একজন বড় মাপের দরবারী ইতিহাসবিদ। তাঁর লেখা লেনিনের জীবনীর দাবী, তিনি বহু এতাবৎকালীন অব্যবহৃত প্রাথমিক তথ্য দেখে লিখেছেন। এ দেশের ও পাশ্চাত্যের আধা-ইতিহাসবিদ আধা পীত সাংবাদিকরা অনেকে তাঁর উপর নির্ভর করে লেনিন সম্বন্ধে বহু বিষোদগার করেছেন। মজার কথা এই, যেখানেই তথ্য মিলিয়ে দেখার সুযোগ আছে, সেখানেই দেখা গেছে ভলকোগনভের লেখা বিকৃতিপূর্ণ। তাঁর লেনিন সংক্রান্ত বক্তব্যের দীর্ঘ সমালোচনা করেছেন মার্কিন লেখক পল সীগেল।[১০] আমাদের আলোচ্য বিষয় ভলকোগনভের চোখে ট্রটস্কী। স্তালিনের জীবনী, 'বিজয় ও ট্রাজেডি' তিনি যখন লিখেছিলেন, রুশ দরবার তখন লেনিন বিরোধী ছিল না। তাই সেখানে ট্রটস্কীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ১৯০৩ থেকে ১৯১৭ ট্রটস্কী ছিলেন বলশেভিকবাদ বিরোধী, এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সবকটি প্রশ্নে তিনি সুবিধাবাদীদের সঙ্গে ছিলেন।[১১] লেনিন ১৯১৭-তে ট্রটস্কীকে সুযোগ দিলেন এবং ট্রটস্কী 'সাময়িক নায়ক' হলেন। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত উচ্চকাঙ্খী ছিলেন, তাই লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি স্তালিনবাদের শত্রু শিবিরে চলে যান ও তার ফলে সোভিয়েত রাজের বিরোধী হন। ভাসেটস্কি যোগ করেছেন, ট্রটস্কীর নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব ছিল উদারনৈতিক বুর্জোয়া নীতিব কাছাকাছি।

লেনিন ট্রটস্কীকে ১৯১৭-র পরও সন্দেহের চোখে দেখতেন, এ কথা প্রমাণ করার জন্য ভলকোগনভ গোর্কির ১৯৩১-এর স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যদি গোর্কির ঐ লেখার প্রথম সংস্করণ দেখা যায়, তাহলে ঠিক উল্টো কথা পাই। অর্থাৎ, স্তালিন যুগে যখন ট্রটস্কী সম্পর্কে সব পুরনো তথ্য চেপে নতুন গল্প ফাঁদা হচ্ছে, ভলকোগনভ সেই যুগের তথাকথিত তথ্যকে এখনও ব্যবহার করছেন।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি আসার পর ট্রটস্কীর মত কি ছিল, তা ভলকোগনভ এবং ভাসেটস্কির পরবর্তী প্রশ্ন। তাঁরা দাবী করেছেন, ট্রটস্কী 'যুদ্ধ সাম্যবাদের' নীতি ছাড়েন নি। উপরন্তু, তাঁর এবং প্রিয়ব্রাঝেনস্কির মতের মধ্যে এঁরা সম্পূর্ণ ঐক্য দেখেছেন। বাস্তবে, প্রিয়ব্রাঝেনস্কির আদিকল্প তুলনায় স্তালিনের কাছাকাছি ছিল, কারণ তিনি বিশ্ব অর্থনীতির দিকে না তাকিয়ে সমাজতন্ত্র গঠনের কথা ভেবেছিলেন। ট্রটস্কী এই মতের বিরোধী ছিলেন।

গণতন্ত্র সম্পর্কে ট্রটস্কীর সমস্ত বক্তব্য, ভাসেটস্কি ও ভলকোগনভের চোখে, নির্ভেজাল গরম বুকনি, আর কিছু নয়। তাঁদের মতে, পার্টি-রাষ্ট্রের অধঃপতন সম্পর্কে ট্রটস্কীর কথাবার্তা ছিল সমাজতন্ত্র গঠনের নির্দিষ্ট কাজ থেকে মানুষের দৃষ্টি সরানো। ১৯২০-র দশকে এটাই ছিল স্তালিনবাদী ভাষ্য — দেশ আলোচনা চায় না, 'ওরা' জোর করে আলোচনা চাপিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা শুধু একটা কথাই ব্যাখ্যা করেননি। ১৯২৩ সালে যখন আন্তঃ পার্টি লড়াই শুরু হয়, ট্রটস্কী তখন পলিটব্যুরো সদস্য, লাল ফৌজের নেতা এবং পার্টির পাঁচজন প্রধান নেতার একজন। তিনি কেন এত ক্ষমতা থাকতেও ফের লড়তে গেলেন, যদি ব্যক্তিগত ক্ষমতাই তাঁর কাম্য হত? শেষ অবধি তাঁরা তথ্যভিত্তিহীন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দাবী করেছেন, ঐ পূর্বোল্লিখিত উচ্চাকাঙ্খাই একমাত্র ব্যাখ্যা।

দরজায় ইতিহাসের কড়া নাড়া

১৯৮০-র দশকের রাশিয়ায় বহুকাল পরে অর্থনৈতিক সংকট গোপন জায়গা থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু ১৯৮০-র দশকে এবং ১৯৯০, এমনকি ১৯৯১-এর গোড়াতেও, রুশ রাজনৈতিক জীবন অনেক প্রাণবন্ত ছিল। শ্রমিক শ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষক, সকলেই নিজের মত খোলাখুলি বলতে শুরু করে। আর, প্রথম দিকে বাজারের অর্থনীতির প্রতি যে মোহ ছিল, তা কাটতেও শুরু করে। মনে রাখতে হবে, শেষ অবধি বাজার রাশিয়াতে খুব গণতান্ত্রিকভাবে আসেনি। ১৯৯৬-এর অগাস্টের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর জনমত গণতন্ত্রের পক্ষে আরো দৃঢ় হয়, কিন্তু বাজারের পক্ষে নয়। বোরিস ইয়েলৎসিন ১৯৯১-এর অগাস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ইউনিয়ন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির দপ্তরে কুক্ষিগত করেন এবং ১৯৯৩-এর মধ্যে আধা আইনী, আধা ক্যু দেতা এক পন্থার সাহায্যে বাজারমুখী নীতি চাপিয়ে দেন।

কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকল্প ব্যর্থ হল মানে এই নয় যে তা ছিল না। গণতান্ত্রিক বিকল্প ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল। ইয়েলৎসিনের সরকারী গণতন্ত্রের বিপরীতে এবং একই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিপরীতে, ছিল সাধারণ মানুষের স্ব-সংগঠন ও স্ব-মুক্তির জন্য লড়াই। কয়েক দশক ধরে কমিউনিজম কথাটার সঙ্গে বাস্তবে আমলাতান্ত্রিক শাসন যুক্ত হওয়ায়, এই লড়াই সোজা পথ ধরেনি। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠকরা উদারপন্থীদের সমর্থন করেছিল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল, উদারপন্থীরাই গণতন্ত্রী। কিন্তু বারে বারে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রশ্ন হাজির করছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় কয়লাখনি শ্রমিকদের কথা। সাম্প্রতিক রুশ ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা জানেন যে কয়লাখনি শ্রমিকদের ইউনিয়ন ছিল ইয়েলৎসিনের সমর্থক। কিন্তু যখন ৫০০ দিনে বাজার ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব পরিকল্পনা আকারে হাজির হয়, তখন এই ইউনিয়নে তুমুল ঝড় ওঠে। এখনও রুশ ফেডারেশনে বহুদলীয় রাজনীতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষে শতকরা ৬০ জন, কিন্তু বাজারমুখী সংস্কারের পক্ষে মাত্র শতকরা ৪০।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাস থেকে বিকল্পের সন্ধান তাই এই গোটা পর্ব ধরেই চলেছিল। আর, আজকের দিনে ট্রটস্কির রাজনীতি উপযোগী কি না তা নিয়ে নানা মত থাকলেও, এই বিকল্পের সন্ধানীদের কাছে অতীত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ট্রটস্কীর তাৎপর্য ক্রমেই বাড়তে থাকে।

এখানেও শুরুটা ছিল সরকারী বা তার কাছাকাছি স্তর থেকেই। ইতিহাসবিদ ইউরী আফানাসিয়েভ গ্লাসনস্তের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি এবং পার্টির এক তাত্ত্বিক অটো ল্যাটসিস, ট্রটস্কীর রচনা প্রকাশের দাবী করতে শুরু করেন। 'এগিয়ে চলো ... এগিয়ে চলো .... এগিয়ে চলো' নাটকে ট্রটস্কীকে দেখানো হয় স্তালিনের একজন সৎ প্রতিপক্ষ হিসেবে।

ইস্তোরিয়া এস এস. এস. আর পত্রিকার নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় লেনিনগ্রাদের (বর্তমানে সেন্ট পিটার্সবুর্গ) হার্জেন পেডাগজিকাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ভিতালী স্তার্তসেভ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লেনিনের জীবনের শেষ সংগ্রামের পর্যালোচনা করে লেখেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে ঐ পর্যায়ে মৌলিক প্রসঙ্গগুলিতে ট্রটস্কী লেনিনের সমর্থক ছিলেন। গ্লাসনস্তের অন্যতম প্রধান মুখপত্র, মস্কোভস্কি নোভোস্তি ও তার বিভিন্ন ভাষার সংস্করণ আরো একধাপ এগিয়ে যায়। পত্রিকাটির রুশ সংস্করণে একটি প্রবন্ধে বলা হয়, বামপন্থী বিরোধী গোষ্ঠী পার্টি ঐক্যের পক্ষে ছিল, কিন্তু তারা আমলাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে লড়াই করেছিল।

১৯৮৯-এর অগাস্টে সোবেসেদনিক পত্রিকায় অধ্যাপক ভ্লাদিমির বিলিকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়ে দেন, তাঁরা বিলিকের সঙ্গে একমত নন। কিন্তু বিলিক যা বলেন, তার গুরুত্ব এই যে, তিনি দীর্ঘ গবেষণার সংক্ষিপ্তসার ব্যাখ্যা করছিলেন, নিছক মামুলী কথা বলছিলেন না। ট্রটস্কীর নতুন সমালোচকদের সঙ্গে তর্ক করে তিনি বলেন, 'ট্রটস্কী ছিলেন এদেশে যে মেকী-মার্কসবাদী ব্যবস্থা নির্মাণ করা হচ্ছিল, অর্থাৎ স্তালিনের যে একনায়কতন্ত্র গড়া হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে একনিষ্ঠ যোদ্ধা। কিন্তু এটা ইতিহাসের ব্যঙ্গ যে, যে ব্যক্তি রক্তাক্ত দমনপীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে সেই অলীক দাবীর বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিলেন, যা ছিল, এ সবই 'বিষয়গত প্রয়োজন' থেকে উদ্ভূত, সেই ব্যক্তিকে — স্তালিনের মূল ও সবচেয়ে একনিষ্ঠ বিরোধীকে .... হঠকারীতা, সেনা ছাউনীর সমাজতন্ত্রের কথা বলা, ইত্যাদির দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।'

জেনারেল ভলকোগনভের ও অন্যদের সমালোচনার জবাবে বিলিক বলেন, ট্রটস্কী লালফৌজে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিলেন, এবং শৃঙ্খলার নামে যাতে সাধারণ সৈনিকের মর্যাদাহানি করা না হয় সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

ট্রটস্কী নেপের বিরোধী ছিলেন কি না, প্রসঙ্গে বিলিক বলেন, ট্রটস্কী, লেনিনের একবছর আগে পার্টিতে নেপ ধাঁচের নীতি আনার প্রস্তাব করেছিলেন, এবং নেপের পক্ষে তাঁর বক্তৃতাকে লেনিন জনশিক্ষামূলক কাজে পুস্তিকা হিসেবে ব্যবহার করতে

বলেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আইজ্যাক ডয়েটশার, বারুখ নেই পাজ এবং আরো অনেকেই এই তথ্য অতীতে দেখিয়েছেন। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই এই তথ্য এত কম জানা ছিল যে, রয় মেডভেডিয়েভ পর্যন্ত এ নিয়ে বেশী কিছু লেখেন নি।

রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ট্রটস্কী সাম্যবাদ বিরোধী ছিলেন, এই দাবীকেও বিলিক অস্বীকার করেন এবং এই পর্বে ট্রটস্কীর প্রধান কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করেন।

১৯৩০-এর দশকে ট্রটস্কী পার্টির ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল, স্তালিনের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা একত্রে প্রকাশ করেছিলেন, The Stalin School of Falsification নাম দিয়ে।

১৯৮৯-র জুন থেকে, ভাপ্রোসি ইস্তোরি (ইতিহাসের সমস্যা) এই বইটির কিছু কিছু অংশ ছাপতে শুরু করে। পরে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ট্রটস্কীর বই সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ার সুযোগে সে সময়ের পক্ষে বেশ চড়া দামে (১০ রুবল) বইটি বাজারে ছাড়া হয়।

বইটির সঙ্গে ছিল একটি 'শেষ কথা'। তা লিখেছেন ভি. পি. ভিলকোভা এবং এ. পি. নেনারোকভ। তাঁরা লেখেন, কেন্দ্রীয় পার্টি মহাফেজখানার এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের একদল গবেষক প্রতিটি দলিল ও প্রতিটি উদ্ধৃতি খুঁজে বার করে মিলিয়ে দেখেছেন, কোথাও কোনো ভুলচুক আছে কি না। তাঁরা লেখেন, 'এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, দলিল-দস্তাবেজ সম্পর্কে ট্রটস্কী কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে সাবধানতা দেখিয়েছেন'। লেনিনের বেশ কয়েকটি লেখা/বক্তৃতা যা এতদিন লেনিন রচনাবলীতে ছিল না, তা ট্রটস্কীর এই সংকলন থেকে পাওয়া যাওয়ার পর মহাফেজখানায় মূল ভাষ্যের সন্ধান মিলেছে[১২]।

এই বইটি পুনর্মুদ্রিত হওয়া এবং এরকম একটা স্বীকৃতি পাওয়া, শুধু ট্রটস্কী নয়, আরো অনেকের পুনর্মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বলশেভিক-মেনশেভিক বিভাজনের প্রথম দিকে স্তালিন ছিলেন মেনশেভিক এবং ১৯১১-তে, ১৯১২-তে এবং ১৯১৭-তে পার্টি ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। বা, ব্রেস্ট লিটভস্ক আলোচনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রটস্কীর 'না যুদ্ধ, না শান্তি' অবস্থানকেই অনুমোদন করেছিল। বা, লালফৌজ গঠনে ক্লিমেন্ট ভরশিলভের ভূমিকা ছিল নগণ্য এবং স্তালিনেরও সামান্য। এ সব বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষণায় কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু রুশ দেশে তখন এ সব খুবই বড় মাপের নতুন তথ্য ছিল।

আলাক্সান্দর ভি পান্তসভের মার্ক্সিস্ট মান্থলী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তিনি ট্রটস্কীর পক্ষে-বিপক্ষে বা ট্রটস্কী সম্বন্ধে, যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের অর্ধেকের বেশী ছিল ভলকোগনভ ও ভাসেটস্কির বইয়ের সমালোচনা। ভলকোগনভের গবেষণা পদ্ধতি কতটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিকৃতিপূর্ণ, তিনি তা বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরেন।

ট্রটস্কী ও ট্রটস্কীবাদ

সরকারি তথ্য থেকে জানা গেছে, ব্রনস্টাইন পরিবার ও তাদের নিকটাত্মীয়দের ১৪ জনকে ১৯৩৬-১৯৪০-এর মধ্যে 'বিলুপ্ত' (liquidated) করা হয়। ১৯৮৮-র শেষে ট্রটস্কীর দৌহিত্র এস্তেবান ভলকভ পাঁচদিনের জন্য রাশিয়া যেতে পারেন। সেখানে তিনি তাঁর বোন আলেক্সান্দ্রার দেখা পান। তাঁরা পরস্পরকে শেষবার দেখেছিলেন ১৯৩১ সালে, যখন ভলকভের বয়স ছিল পাঁচ। এস্তেবান ও আলেক্সান্দ্রা একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে ট্রটস্কীর সম্পর্কে ও নিজেদের সম্পর্কে কথা বলেন।

ভলকভ, ফরাসী ট্রটস্কীবাদী ইতিহাসবিদ পিয়ের ব্রুয়ে, মার্কিন ট্রটস্কীবাদী মারিলিন ভগ্‌ট-ডাউনি প্রমুখ ১৯৮৮ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৯৯০-এর অগাস্টে মস্কোতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দু'ধরনের অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এক অংশ ইতিহাসে ট্রটস্কীর ভূমিকার পুনর্মূল্যায়নে উৎসাহী ছিলেন। অপর অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রটস্কীবাদী দল গড়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন আলেক্সেই গুসিয়েভ। তিনি ট্রটস্কীবাদী সংগঠন নির্মাণে যেমন উৎসাহী, তেমনি ট্রটস্কীর উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. থিসিসও জমা দিয়েছেন।

সব শেষে যে ঘটনার উল্লেখ করব, তা হল অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা। মিখাইল বাইতালস্কি ছিলেন ১৯২০-র দশকের বামপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্য। কারারুদ্ধ হয়েও তিনি শেষ অবধি প্রাণে বেঁচে যান (খুব কম ট্রটস্কীবাদীর ক্ষেত্রেই এ কথা বলা যায়)। তাঁর স্মৃতিচারণ, Notebooks for the Grand-children, স্তালিনবাদের উত্থানের যুগে ট্রটস্কীবাদী বিকল্পের চরিত্র কি ছিল তা ব্যাখ্যা করে। বাইতালস্কি একটি মার্কিন ট্রটস্কীবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁরা বইটি ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন। লেভ কপোলভ, বাইতালস্কি, ও এইরকম পুরনো রুশ ও পূর্ব ইউরোপীয় ট্রটস্কীবাদীরা (কপোলভের মৃত্যু হয় ১৯৯২ সালে) ট্রটস্কীচর্চা থেকে ট্রটস্কীবাদী আন্দোলন গঠনের পথে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবে সে ইতিহাস প্রধানত ১৯৯১-এর পরবর্তী যুগের।

সূত্র নির্দেশঃ

১। এজন্য দ্রষ্টব্য L. Trotsky. **The Revolutioh Betrayed**, New York. 1987. এই বিশ্লেষণের পক্ষে আধুনিক গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা E. Mandel. **Power and Money**, London, 1992.

২। ট্রটস্কীর নিজের রচনার মধ্যে দ্রষ্টব্য **Towards Capitalism or Socialism?** যা সংকলিত আছে L. Trotsky. **The Challenge of the Left Opposition (1923-1925)**, New York, 1975-এ, **The Third International After Lenin**, New York. 1980, On China, New York, 1976: 'The Soviet Economy in Danger,' Writtings of

Leon Trotsky, 1932-33 New York 1976 ইত্যাদি।
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে বর্তমান লেখকের ডক্টরাল থিসিস **Leon Trotsky's Theory of Revolution : A Critical Defence**-এ এবং E Mandel. **Trotsky As Alternative**, London. 1995 ও **Society & Change** পত্রিকায় বর্তমান লেখকের ঐ বইটির পর্যালোচনায় (প্রকাশিতব্য)। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য কুণাল চট্টোপাধ্যায়, ট্রটস্কী প্রিয়ব্রাজেনস্কি ও সমাজতন্ত্র গঠন, গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **ইতিহাস অনুসন্ধান-৫**, কলকাতা, ১৯৯০।

৩। Vasetsky **Trotskyism Today : What Interests does It Serve?** Moscow 1984 এবং ঐ **Trotskyism Today : Against Peace and Detenfe**, Moscow 1986

৪। **Pravda** 15 April 1988

৫। **Pravda**, 9 September 1988

৬। **Nash Sovremennik** Issue 3 1988

৭। যেমন **Komsomolskaya Pravda**, 22 March 1989

৮। **Komsomolskaya Pravda** 19 May 1989

৯। দ্রষ্টব্য L Trotsky **My Life** New York 1987 এবং L Trotsky **How the Revolution Armed Itself**, 5 Vols London 1979-1981

১০। দ্রষ্টব্য, **Socialist Action**, April 1996

১১। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য K Chattopadhyay **Leninism and Permanent Revolution** Baroda 1987

১২। V P Vilkova and A P Nenarokov Afterward to the Soviet Edition of Leon Trotsky's **The Stalin School of Falsification**, in M Vogt-Downey, ed **The USSR 1987-1991 : Marxist Perspectives** New Jersey 1993. pp 309-316

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ

দীপক রঞ্জন দাস

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সুধী বৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলনে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ আমার কাছে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। এ যেন পত্তনের মণিকারকে ছেড়ে গ্রাম্য সোনারের কাছে রত্নের মূল্যায়ণ প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে রত্নের অবমূল্যায়ন হওযার সম্ভাবনাই অধিক।

বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নিজের অজ্ঞতা ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করার আগে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। সম্প্রতি একটি অব্যবহৃত ধর্মীয় সৌধকে ধর্মান্ধ জনতার হাতে বিধ্বস্ত হতে দেখে সমগ্র দেশের সুস্থ মনোভাব সম্পন্ন নাগরিকের সঙ্গে ঐতিহাসিক মহলও সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যেভাবে তাঁদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন সেভাবে এই প্রাচীন সৌধটি ধ্বংস হওয়ার ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল তার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে বিরত থাকায় ঐতিহাসিকরূপে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেননি। অনুরূপভাবে ভুবনেশ্বরের নিকট ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দ্বারা সংরক্ষিত খণ্ডগিরির গুহা মন্দির দর্শনকারীদের কাছে অর্থোপার্জনের আকাঙ্খায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুসারী ভণ্ড সাধুদের দ্বারা ধুনি জালিয়ে গুহাভ্যন্তরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ জৈন দেব-দেবীর মূর্তিগুলিকে কালিমা লিপ্ত করে বিনষ্ট করা অথবা দামোদর নদের উপর নির্মিত জলাধারে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মন্দির নগরী তেলকূপীকে নিমজ্জিত করা এর কোন ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকদের বিচলিত হতে দেখা যায় নি। সাহাগঞ্জে শূরশৈলীর সম্ভবত প: বঙ্গের অনন্য অষ্টকোণাকৃতি শরিফ সৈয়দের দরগাটির জরাজীর্ণ অবস্থা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে সতর্কীকরণ ঐতিহাসিকদের উদ্বিগ্ন করেনি এবং এই স্থাপত্য কীর্তিটিকে অনিবার্য ভূমিসাৎ হওয়া থেকে রক্ষাও করা যায়নি। চুঁচুড়ার অষ্টভুজ ওলন্দাজ গীর্জাটি সরকারী নির্দেশে ধূলিসাৎ করে দেওয়াতেও তাঁরা কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন নি (ব্যতিক্রম প্রয়াত অধ্যাপক নুরুল হাসান)। জরুরী অবস্থার সুযোগে তৎকালীন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দ্বারা সংরক্ষিত হরিয়ানার একটি সমাধি ক্ষেত্রকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জমিটিকে পণ্য বিক্রয়ের উপযোগী করে তোলেন। সে সময়ও ঐতিহাসিকদের কোন প্রতিবাদ শোনা যায়নি। এ ধরনের নজিরের তালিকা বৃদ্ধি না করেও সিদ্ধান্ত করা যায় ইতিহাস রচনার

উপাদান হিসেবে প্রাচীন স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার গুরুত্ব উপলব্ধিতে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকদের অনাগ্রহ রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের গতি প্রকৃতি অনুধাবন ও ব্যাখায় এদের অন্যান্য উপাদানের পরিপূরক অথবা একমাত্র উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পুনরুদ্ধারে এই অবহেলিত উপাদানটির উপযোগিতার প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী উড়িষ্যা একটি সুসংহত এবং নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাজ্য, কিন্তু উড়িষ্যার এই রাজনৈতিক সীমা দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত কবা বহু যুগের আশা আকাঙ্খার ফলশ্রুতি। মৌর্য সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ রাজ্যটি উত্তরপূর্বে নিম্ন মহানদী উপত্যকা থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলাঞ্চল ধরে দক্ষিণ পশ্চিমে অন্ধ্রপ্রদেশের সীমা কিংবা তারও কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপকূলাঞ্চলের উত্তরে এই রাজ্যের বিশেষ বিস্তৃতি হয়নি বলেই মনে হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে মূলগত অভিন্নতা সত্ত্বেও তার বহিঃপ্রকাশে কিছু কিছু অমিল থাকার উপলব্ধি মৌর্য সম্রাটকে তাঁর বিজিত রাজ্যটিকে নিম্ন মহানদী উপত্যকা ও গঞ্জাম অঞ্চল এই দুটি প্রশাসনিক ভূ-ভাগে বিভক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি প্রথমোক্তটির তোসলী (সম্ভবত: ধৌলি, পুবী জেলা) ও শেষোক্তটির সমাপা (জৌগড়, গঞ্জাম জেলা)-তে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তোসলী অঞ্চল অর্থাৎ পুরী-কটক জেলায় জমির উর্বরতা, যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতি কারণে জীবন যাত্রা তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায় এই প্রদেশটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। একই কারণে আঞ্চলিক রাজ্য গঠনের পর্বটিও এখানে প্রথম দেখা যায়। খৃ: পূ: ১ম শতাব্দীতে মহামেঘবাহন বংশীয় নৃপতিদের উদ্যোগে কলিঙ্গনগর বা ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের পৃষ্টপোষকতায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গায়ে খোদাই করে জৈন সাধুদের সাময়িক আবাসস্থলরূপে কয়েকটি গুহা নির্মিত হয় এবং গুহাগাত্রে জৈন দেব-দেবী ও অন্যান্য ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করা হয়। তৎকালীন সর্বভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতির অন্তর্ভুক্ত হলেও এ সবের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

মহামেঘবাহন বংশের পতনের পর নিম্ন মহানদী উপত্যকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ সে সময় থেকেই ভৌগোলিক প্রকৃতি, জনগোষ্ঠীর চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চল ধরে এক উপ-আঞ্চলিকতাবাদের সুস্পষ্ট রূপ দেখা দিতে থাকে। এই সময়ই উড়িষ্যার মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দুটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূ-ভাগে বিভক্ত হওয়ার প্রবণতায় দ্রুততা লাভ করে। একই সঙ্গে কলিঙ্গের রাজনৈতিক কেন্দ্রও নিম্ন মহানদী উপত্যকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থানান্তরিত হয়। বিস্তৃত অর্থে কলিঙ্গের ভৌগোলিক সীমান্তর্গত হলেও নিম্ন মহানদী উপত্যকা উৎকল নামে অধিকতর পরিচিতি লাভ করে। কলিঙ্গ মূলত গঞ্জাম জেলার

কিয়দংশ শ্রীকাকুলাম ও বিজয়নগরম জেলাকেই বোঝাতে থাকে। এভাবে যে উপ-আঞ্চলিকতাবাদ মৌর্যপূর্ব যুগে উপ্ত ছিল এবং যার অঙ্কুরোদগম ঘটে অশোকের শাসনকালে তা ক্ষুদ্র চারা গাছ রূপে পঞ্চম শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে।

অনুমেয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিম্ন মহানদী উপত্যকা সহ ঢেঙ্কানল, ময়ূরভঞ্জ ও গঞ্জাম জেলায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশেব উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হতে দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পূর্বগঙ্গ বংশের উত্থানেব ঠিক পূর্বে মাঠর বংশের শেষ রাজা 'সকল কলিঙ্গাধিপতি' উপাধি গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর রাজ্য নাগাবলী-বংশধারা নদী উপত্যকাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্বগঙ্গ বংশীয় রাজাগঞ্জ নিজেদের কলিঙ্গাধিপতিরূপে ঘোষণা করলেও তাঁদের রাজ্য সীমা পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণ কলিঙ্গের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আদি-মধ্যযুগের সূচনা থেকেই এই অঞ্চলটি এককভাবে কলিঙ্গ ভূ-ভাগকে বোঝাতে থাকে। পূর্ব গঙ্গ রাজেরা পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ গিরি গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি শিখরে নিজেদের আরাধ্য গোকর্ণশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেবতা কর্তৃক দৃশ্যমান উপজাতি অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবাধীন করার মাধ্যমে এই ধর্মের ধ্বজাধারী গঙ্গরাজ বংশের আধিপত্য দৃঢ় মূলে প্রতিষ্ঠা করার অপ্রত্যক্ষ প্রয়াস করে বলে মনে হয়। এই সময় থেকে কলিঙ্গে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপক উদ্যোগও একই কারণ সম্ভূত বলে অনুমান করা যেতে পারে। গঙ্গ রাজধানী কলিঙ্গ নগরী (শ্রীমুখ লিঙ্গম, শ্রীকাকুলাম জেলা) একটি পবিত্র শৈব তীর্থ স্থান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক এবং অংশত ভৌগোলিক পরিধির অন্তর্ভুক্ত কলিঙ্গের উপ-আঞ্চলিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উড়িষ্যার শিল্পশাস্ত্র 'সম্মত রেখ শ্রেণীভুক্ত দেউলগুলিও নিজস্ব চরিত্র লাভ করে। এই বৈশিষ্ট্য সকল কেবলমাত্র দেউলের আসন পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ না থেকে প্রলম্ব দেওয়াল গাত্রে দেবদেবীর মূর্তি সংস্থাপনেও স্থানীয় রীতিনীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হয়। মূর্তির গঠন প্রণালীতে ও আয়ুধ সংযোজনেও আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষণীয়। মন্দির গঠনেও কলিঙ্গের নিজস্বতা ছিল। মন্দির নির্মাণে যে আনুপাতিক হার তা সমকালীন নিম্ন মহানদী উপত্যকায় অনুসৃত থেকে পৃথক। মন্দিরের অন্তর ও উভয়ক্ষেত্রে ভিন্ন। মন্দিরের সম্মুখভাগে শিবের বাহন নন্দীকেশ্বরের জন্য পৃথকভাবে নির্মিত চারদিক উন্মুক্ত যে ক্ষুদ্র দেউল এখানে দেখা যায় তা ভৌমকর পূর্ব এবং ভৌমকর মন্দিরে অনুপস্থিত। এই সকল বৈশিষ্ট্য সমন্বিত একটি স্থানীয় স্থাপত্য শৈলী ওড়িয়া শিল্পশাস্ত্র সম্মত রেখ শৈলীর গণ্ডীভুক্ত হয়েও কলিঙ্গ রাষ্ট্রের মন্দির স্থাপত্যকে স্বকীয় চরিত্র দান করে। এভাবে কলিঙ্গের উপ-আঞ্চলিকতা তার স্থাপত্য রীতি দ্বারাও পরিস্ফুট হয়। উপকূলবর্তী উড়িষ্যাকে বোঝাতে প্রাচীন নাম তোসল/তোসলী প্রচলিত থাকলেও এর আঞ্চলিক সীমা পূর্ব গঙ্গ রাজ্যের কোন অংশকে অন্তর্গত করেছিল বলে মনে হয় না।

অষ্টম/নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রাজত্বকালীন ভৌমকর নৃপতি বর্গ উত্তর ও দক্ষিণ তোসলের শাসকরূপে উল্লিখিত হয়েছেন এবং তাঁদের রাজ্য সীমা দণ্ডভুক্তি মণ্ডল (বালেশ্বর-মেদিনীপুর অঞ্চল) থেকে কোঙ্গদ মণ্ডল (গঞ্জাম জেলার অংশ বিশেষ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁদের সমসাময়িক রাজকুলগুলো (যথা বাংলার পাল বংশ) র কাছে সম্ভবত এই ভৌমকর রাজবংশ উৎকল রাজ্যের অধিপতিরূপে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় শিককরদেবের চৌরাশি (পুরী জেলা) তাম্র শাসনেও এই রাজ্য উৎকল বলে উল্লিখিত হয়েছে। একটি ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে উৎকলের উদ্ভব খ্রীষ্টিয় চতুর্থ/পঞ্চম শতাব্দি থেকেই পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে উৎকলের অবস্থান দেখানো হয়েছে। ভৌমকর তাম্রশাসনগুলি গঞ্জাম জেলার উত্তর-পূর্বাংশ, পুরী কটক ব্যতীত উপজাতি অধ্যুষিত কেওঞ্ঝর, ঢেঙ্কানল ও বৌধ-ফুলবনী জেলাতেও আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান করা যায় উপকূলাঞ্চলের সীমা অতিক্রান্ত মধ্য উড়িষ্যাতেও তাঁদের আধিপত্য প্রসারিত হয়। নব বিদিত অঞ্চলকে সংস্কৃতিগতভাবে আদি ভৌমকর রাজ্যের সঙ্গে একাত্মকরণের প্রচেষ্টায় সেখানে সুগম দুর্গম স্থান নির্বিশেষে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় উপজাতি বর্গকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবাধীন করা হয়। এইভাবে ভৌমকর রাজগণ সমুদ্র সন্নিকটস্থ ভূ-ভাগসহ উড়িষ্যার মধ্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তাঁদের রাজ্যান্তর্গত করায় বর্তমান উড়িষ্যা তার রাজনৈতিক ঐক্য লাভের পথে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই রাজ্যের রাজধানী গুহেশ্বর পর্যটক (বর্তমান জাজপুর অথবা নিকটস্থ কোন স্থান)-এ স্থাপিত থাকায় সিদ্ধান্ত করা যায় পূর্বের ন্যায় উৎকল রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি নিম্ন মহানদী উপত্যকা বহির্ভূত হয় নি।

ভৌমকর রাজেরা যখন রাজনৈতিকভাবে নিম্ন মহানদী কেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী অঞ্চল বহির্ভূত ভূ-ভাগকেও অন্তর্গত করার প্রচেষ্টা করছিলেন তখন পশ্চিম উড়িষ্যার উত্তর মহানদী উপত্যকা অঞ্চলে একটি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অধীনে রাজ্য গঠন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। সোমবংশী আখ্যাধারী রাজবংশটিকে প্রধানত মহানদী তীরস্থ রায়পুর, বিলাসপুর ও রায়গড় জেলা কেন্দ্রিক শাসক পাণ্ডুবংশীদের বংশধর বলে মনে করা হয়। কলচুরিদের আক্রমণে এঁদের ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে আসতে হয় এবং নবম/দশম শতাব্দীতে সম্বলপুর জেলায় সোমবংশী নামে পরিচিত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পকালের মধ্যেই এঁরা বোলাঙ্গীর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকেও তাঁদের শাসনাধীন করেন। এভাবে উৎকল বহির্ভূত একটি উপ-ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক ভূ-ভাগ এক রাজনৈতিক ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে। পূর্বতন স্মৃতি বিস্মরণে অপারগ সোমবংশী রাজেরা নব বিজিত অঞ্চলকে কোশলেরই প্রসারণ বলে মনে করতেন। ফলে তাঁদের রাজ্যও কোশল নামে পরিচিত হয় যদিও এর রাজনৈতিক সীমা কলচুরি রাজ্য বহির্ভূত ছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত সোমবংশী রাজগণ তাঁদের অনুসৃত প্রসারের মাধ্যমে এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে সংহতি দানের

চেষ্টা করেন। এই সময় থেকে কোশল রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কোশলেশ্বর শিবের মন্দির স্থাপনের সূত্রপাত ঘটে। কোশলেশ্বর অভিধায় ভূষিত শিবের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের আকর্ষণ করে প্রকৃত পক্ষে বহিরাগত সোমবংশী কোশল রাজেদের প্রতি আনুগত্য লাভের প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য করা যায়। অচিরেই সোমবংশী রাজেরা কোশলে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে উড়িষ্যার তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চল কলিঙ্গ (যার অধিকাংশই অন্ধ্রপ্রদেশে প্রসারিত ছিল)। উৎকল ও কোশল নামে পরিচিতি লাভ করে।

পৃথক ভৌগোলিক সত্তা এবং সাংস্কৃতিক চরিত্রের ফলশ্রুতি স্বরূপ ভৌমকর শাসনের সময় থেকেই সমগ্র উড়িষ্যাকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার প্রবণতা নজরে আসে। এই প্রবণতা সোমবংশী শাসনকালে বৃদ্ধি পায়। এই বংশের প্রথম জনমেজয় মহাভাবগুপ্ত (আ. ৯৩৫-৭০) নিজেকে কোশলরাজ বলে অভিহিত করে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি অভিধা গ্রহণ করেন। প্রথম যযাতি মহাশিব গুপ্ত (আ. ৯৭০-১০০০) দক্ষিণ তোসলের চন্দ্রগ্রাম (চাঁদগা, কটক জেলা)-এ ভূমি দান দ্বারা সোমবংশী রাজ্যের নিম্ন মহানদী উপত্যকায় বিস্তারের প্রমাণ রাখেন। এভাবে প্রথম যযাতি উৎকল এবং কোশলকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে বর্তমান উড়িষ্যার রূপদানের প্রাথমিক পর্বটি সমাধা করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোশল ও উৎকলের উপ-আঞ্চলিকতার বিস্মরণ হয় নি। অতএব উদ্যোত কেশরীর বালিঝরি (নরসিংহপুর, পুরী জেলা) তাম্র শাসনে কোশল ও উৎকলকে দুটি পৃথক রাষ্ট্র রূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে প্রথম যযাতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের পৌত্র দ্বিতীয় যযাতি (আ. ৯০২৫-৪০) এই অঞ্চলদ্বয়কে পুনরায় যুক্ত করেন। তিনি প্রখ্যাত প্রথম যযাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভৌগোলিক ও উপ-আঞ্চলিকতা অস্বীকার না করেও প্রায় সমগ্র উড়িষ্যাকে রাজনৈতিক ঐক্য দান করেন। তাঁর তৃতীয় রাজবর্ষে প্রদত্ত মারগুমুবা দানপত্র থেকে জানা যায় তিনি নিজ শক্তি বলে ত্রিকলিঙ্গ জয় করেন। এই সময়ই যযাতি/যযাতি নগরে উড়িষ্যার মূল শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগে যযাতিপুর ও উড়িষ্যা সমার্থকরূপে ইসলামী ঐতিহাসিকদের লেখাপত্রে দেখা যায়। পশ্চিম উড়িষ্যা শাসনকারী একটি রাজবংশ যযাতিপুরে তাদের রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র রূপে নিম্ন মহানদী উপত্যকার গুরুত্ব স্বীকার করে।

সোমবংশী শাসনকালে অখণ্ড উড়িষ্যার ধারণা কলিঙ্গাগত গঙ্গ রাজাদের এই অঞ্চলকে একটি মাত্র রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করতে সাহায্য করে। গঙ্গ রাজ অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গদেব ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে কর্ণদেবকে পরাজিত করার পূর্বেই কোশল সোমবংশীদের অধিকারচ্যুত হয়। চোড়গঙ্গদেব দ্বারা এই হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা কৌশল, উৎকল ও কলিঙ্গের অংশবিশেষকে একটি সুসংহত ভৌগোলিক ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করে যার সম্পূর্ণতা দান করা কোশলের গঙ্গরাজ্যে পুণর্ভূক্তি ব্যতীত সম্ভব ছিল না। চোড়গঙ্গদেবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি পুরীতে পুরুষোত্তম জগন্নাথের মন্দির স্থাপন করে সমগ্র উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক মিলনের বীজ

বপন করেন। চোড়গঙ্গদেবের শিবানুভক্তি পরিবর্তিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আসক্তির কারণ স্পষ্ট না হলেও অনুমান করা যায় স্মার্ত আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতা অপেক্ষা ভক্তিরসাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্মের সার্বজনীন আবেদন গঙ্গরাজকে এই ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে এবং পুরীব জগন্নাথ মন্দিরে সম্পূর্ণ লোকায়াতভাবে উদ্ভূত জগন্নাথদেবের মূর্তি বিষ্ণুর অবতাবরূপে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর উৎকল বিজেতার পরিবর্তে উৎকলের ভূমিপত্ররূপে প্রদর্শনের প্রচ্ছন্ন প্রয়াস দেখা যায়। জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপত্যেও নিম্ন মহানদী উপত্যকায় প্রচলিত পূর্বতন ভৌমকর রীতি ও সোমবংশী রাজকুল কর্তৃক আনীত কোশল ধারার মিলন সম্ভূত শৈলীর সঙ্গে কলিঙ্গ উপধাবার মেল বন্ধন লক্ষণীয় এভাবে মূলত উত্তর ভারতে প্রচলিত নাগর শৈলীর এক আঞ্চলিক প্রকাশ ঘটে যার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ গঙ্গবংশের কুল দেবতারূপে পূজিত হওয়ার ফলে জগন্নাথদেবের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিছুকাল পরে চোড়গঙ্গদেবের বংশধর তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের শাসনকালে উড়িষ্যার ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অতি অর্থবহ ঘটনা ঘটে। ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা নিকটবর্তী কোন এক সময়ে তিনি তীর্থযাত্রা করে পুরীতে উপস্থিত হন এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবকে প্রায় সমগ্র উড়িষ্যা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গ রাজ্যকে পুরুষোত্তম সাম্রাজ্য এবং নিজেকে জগন্নাথদেবের পুত্র ও রাউত (সামন্ত) রূপে ঘোষণা করে তাঁর আদেশে রাজ্য শাসন করছেন বলে প্রচার করেন (শ্রী পুরুষোত্তমস্য প্রবর্ধমান বিজয় রাজ্যে রাউত-শ্রীমদ-অনঙ্গ ভীমদেব)। মনে রাখার প্রয়োজন 'রাউত' কথাটি 'রাজ পুত্র' থেকে উদ্ভূত। মাদলাপঞ্জীর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় সম্রাটরূপ পুরুষোত্তম-জগন্নাথ দেব স্বীকৃত হওয়ার অনঙ্গভীমদেবের উত্তরাধিকারীদের আনুষ্ঠানিক অভিষেক সম্ভব ছিল না। জগন্নাথদেব রাষ্ট্র অধিপতিরূপে ঘোষিত হওয়ার দিন থেকে অঙ্ক সন শুরু হয় এবং গঙ্গ রাজদের রাজ্যভার গ্রহণের দিন থেকে বৎসর গণনার প্রথার অবসান ঘটে। এভাবে চোড়গঙ্গদেব তাঁর আন্ধ্র ঐতিহ্যকে পশ্চাদপটে রেখে নিজেকে উড়িষ্যার প্রাণকেন্দ্র নিম্ন মহানদী উপত্যকার স্বাভাবিক অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের সময় সফলভাবে সমাপ্ত হয়। জগন্নাথদেবকে রাষ্ট্র অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠায় এবং নিজেকে তাঁর প্রতিভুরূপে সেই রাষ্ট্র শাসনকারী বলে ঘোষণা গঙ্গরাজগণকে একটি দৈব অধিকার দান করে। গঙ্গদেব আদি কন্নড় ও পরবর্তী তেলুগু পরিচয়টি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। পূর্বেই গঙ্গদের রাজধানী অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গনগর থেকে কটক অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অনঙ্গভীমদেব তাঁর সমস্ত দানপত্রই অভিনব-বারাণসী কটক অথবা বারাণসী-কটক থেকে প্রদান করেন।

একটি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক লোক দেবতাকে রাজ দেবতা রূপে গ্রহণ ও রাষ্ট্র দেবতায় উন্নীত করায় উড়িষ্যার উপ-আঞ্চলিকতা অতিক্রান্ত অন্তর্নিহিত ঐক্যবদ্ধ রূপটি প্রকাশ পায়। প্রজা সাধারণ এতদিনে রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা স্বীকৃত একটি দেবতা লাভ করল যা তাদের একান্ত নিজস্ব এবং একান্তই আঞ্চলিক অর্থাৎ যাঁর অনুগামীরা একটি অনির্দিষ্ট

সাংস্কৃতিক সীমা রেখার দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসী। সর্বসাধারণ পূজিত রাষ্ট্র দেবতা তথা রাষ্ট্র অধিপতির আদেশে তাঁর প্রতিভূরূপে গঙ্গরাজের উড়িষ্যা শাসন প্রজাপুঞ্জের অমান্য করা দেব নির্দেশ অমান্য করার সমার্থক ছিল। গঙ্গরাজ কর্তৃক নির্মিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জাতীয় দেবতা পুরুষোত্তম-জগন্নাথের মন্দির, যা মূলত সোমবংশী স্থাপত্য শৈলীর চরমতম রূপ, উড়িষ্যার জাতীয় মন্দিরের স্থান লাভ করে। অতঃপর এই মন্দিরের আদলে দেবালয় নির্মাণ করাই এ অঞ্চলের প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয়ভাবে রেখ শৈলী নামে পরিচিত এই মন্দির শৈলী ভারতীয় নাগর স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট আঞ্চলিক বিকাশরূপে উড়িষ্যার মন্দির শৈলীকে গোরবোজ্জ্বল করে তোলে। পববর্তীকালে উড়িষ্যার বাস্তু শাস্ত্রে রেখ শৈলীকে অতি গুরুত্ব দান কবে তার নির্মাণ পদ্ধতি ও বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করে দেয়। ভবিষ্যৎ ওড়িয়া স্থপতিকুলকে এই শাস্ত্র সম্মত অনুশাসনের অনুসরণ ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করার পর্যায়ভুক্ত হয়।

এ সমস্ত কিছুর ফলস্বরূপ উড়িষ্যা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে তার সুপ্ত ভৌগোলিক সত্তার্থ মূর্ত করে তোলে।

পাঠান, মুঘল ও মারাঠা শাসনকালে উড়িষ্যার রাজনৈতিক ঐক্য বিঘ্নিত হলেও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারা অব্যাহত থাকে। ইংরেজ শাসকরা শাসনকার্যের প্রয়োজনে প্রায় সমগ্র উড়িষ্যাকেই ভৌগোলিক নৈকট্য বিচার করে প্রথমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস, বিহার ও বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে। কিছুকাল পরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সঙ্গে যুক্ত অঞ্চল বাদে প্রয়ে বাকি অংশ ও বিহারকে যৌথভাবে পাটনা কেন্দ্রিক বিহার-উড়িষ্যা নামক একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করে। উড়িষ্যাবাসীরা কখনই নিজ ভূমির এই ভৌগোলিক অখণ্ড সত্তার বিলুপ্তিকরণ মেনে নেয় নি। অচিরেই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমান্তরালভাবে উড়িষ্যার আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই প্রদেশের পূর্বতন ভৌগোলিক সীমারেখার স্বীকৃতির দাবীতে পরিচালিত হয়। অবলুপ্ত মধ্যযুগীয় উড়িষ্যা সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতীক জগন্নাথদেব ও তার প্রতিভূ রূপী খুর্দার রাজা ওড়িয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। মধুসুদন দাস, গৌরীশঙ্কর রায় এবং রামশঙ্কর রায় তাঁদের কার্যকলাপ ও লেখনীর মাধ্যমে উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা বহির্ভূত ওড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলে ওড়িয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অস্বীকৃত না হলেও তা কখনই ওড়িয়া জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। উৎকল সম্মিলনীর ১৯২০-২১ সালের অধিবেশনে গোপবন্ধু দাসের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও এই সম্মিলনী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। কিন্তু এই মিলন মানসিকভাবে না হওয়ায় ১৯২৩ সালে উৎকল সম্মিলনী পুনরায় তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রহণ করে। ওড়িয়া জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিরোধিতা গোপবন্ধু দাসের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। অতএব ১৯২৩-২৪ সালে

তাঁর কারাবাস থেকে ওড়িয়া জনগণকে আশ্বস্ত করে বলতে হয়েছিল—প্রভু জগন্নাথ এখনও নীলাচল (পুরী)-এ অবস্থান করছেন, তবে কেন তোমরা (আমার কারান্তরালে থাকায়) উৎকলকে অনাথ ভাবছ।

ওড়িয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সার্থক পরিণতি ১৯৩৬ সালে একটি পৃথক উড়িষ্যা প্রদেশের গঠন। পূর্বে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গঞ্জামে পার্লাখিমেদিব রাজা কে. সি. গজপতি নারায়ণদেব, যিনি এই আন্দোলনকে সফলতার দিকে পরিচালিত করেন, নবগঠিত প্রদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ নেবার পর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্যরূপে পুরীতে জগন্নাথদেবের অর্চনা করেন।

ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে উপ-আঞ্চলিক ভূ-ভাগে বিভক্ত একটি অঞ্চলের মূলগত ঐক্য বিভিন্ন কারণ ও ঘটনা প্রবাহ তাকে সুনির্দিষ্ট ও সংহত রূপ প্রদান করে। এই আঞ্চলিক ভূ-ভাগ ও তার উপআঞ্চলিক বিভাগ বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা পরিস্ফুট হয়। এসব লক্ষণ সমূহ নানা ধরনের উপাদান দ্বারা দর্শিত অথবা রক্ষিত হয়। এর যে কোন একটির প্রাপ্তিই ঐতিহাসিককে কোন এক অঞ্চলের ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বুঝতে ও পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারে। প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিগুলিও যে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে তা কিছু কিছু উদাহরণ দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ সব উদাহরণের কোন একটির বিলুপ্তিই ইতিহাস চর্চায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উন্মত্ত জনতার দ্বারা কোন একটি ব্যবহৃত অথবা পরিত্যক্ত ধর্মীয় সৌধের ধ্বংস সাধনকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক নির্বিচারে প্রত্যেকেরই নিন্দা করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে পেশাদার ঐতিহাসিক অথবা তাঁদের সংগঠন সমূহের অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব তো নেইই পৃথক কোন অস্তিত্বও নেই। সৌধটিকে ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ যাই হোক না কেন, ইতিহাসের একটি নথি হিসেবে গুরুত্ব বিচার করে তার অবলুপ্তিতে আক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাই আশা করা যায়।